নব-নীতা

নবনীতা দেবসেন

১৯৯৯ সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার

BanglaBook.org

নব-নীতা

[নির্বাচিত রচনা সংকলন]

নবনীতা দেব সেন

১৯৯৯-এর সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার-প্রাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৩
সপ্তম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪০৭

—একশ পঞ্চাশ টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : রাজা প্রিন্টার্স

NABA-NEETA

A collection of writings by Nabaneeta Dev Sen.
(Selections from nine different genres)
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd,
10 Shyama Charan De Street, Calcutta 700 073, India

Price Rs. 150/-

I S B N : 81-7293-366-5

শব্দগ্রন্থন : দি নিউ ইণ্ডিয়া অফসেট

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

আমার সেই না-দেখা প্রিয়জনদের জন্যে,
আমার পড়'-লেখাও আবার পড়তে
যাঁদের আপত্তি হয় না!

"ভালো-বাসা" নবনীতা
১লা বৈশাখ
১৪০৩

প্রকাশকের নিবেদন

ঔপন্যাসিক বা কবির স্বক্ষেত্র ছেড়ে অন্য জগতে বিচরণ সাহিত্যে খুব একটা দুর্লভ ঘটনা নয়। সার্থক ঔপন্যাসিক ভাল প্রবন্ধ লিখেছেন বা জনপ্রিয় কবি মূল্যবান সমালোচনা লিখেছেন কি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন এমন দৃষ্টান্ত একাধিক আছে। কিন্তু যখন দেখা যায়, কারও লেখনী স্বচ্ছন্দভঙ্গিতে কবিতা লিখতে লিখতে উপন্যাস-রচনাতেও ব্যস্ত, অথবা পাঠক-চিত্তজয়ী ভ্রমণকাহিনী সাঙ্গ করেই গবেষক-সমালোচকের সম্ভ্রম উদ্রেককারী মূল্যবান তুলনামূলক সাহিত্য-আলোচনায় ব্যাপৃত তখন আমাদের বিস্ময় না জেগে পারে না তারপর যখন দেখি সেই লেখনী থেকেই অবলীলায় বেরিয়ে আসছে নিটোল এক-একটি গল্প, নাটক, রম্যরচনা তখন সেই লেখনী সম্বন্ধে কোন প্রশংসাই ভাষার সাহায্যে কুলোয় না। আমাদের সৌভাগ্য বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এই রকম একটি দুর্লভ লেখনীর সৃষ্টিবৈচিত্র্য আমরা উপভোগ করছি এবং এই যে অদ্বিতীয় লেখনীটির বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাবলীল সঞ্চারের উল্লেখ করা হলো, তার নিঃসপত্ন অধিকারী এই গ্রন্থের রচয়িতা নবনীতা দেব সেন। তাঁর অসামান্য বৈচিত্র্যময় প্রতিভার একটি সামগ্রিক নিদর্শন এই 'নব নীতা' গ্রন্থখানি। নয় রকম সাহিত্য-কর্মের সংকলন বলেই গ্রন্থের এই নামকরণ। ইংরেজিতে 'অমনিবাস' বলে সংকলনের চলন আছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় এত ভাল 'অমনিবাস' আগে বেরিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এবং সেক্ষেত্রে নয়টি ভাগ বিশিষ্ট এই 'নব নীতা' গ্রন্থখানি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের এবং বাংলা প্রকাশন জগতের প্রথম সার্থক অমনিবাস বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।

গ্রন্থের প্রথম ভাগে আছে দুটি ভ্রমণকাহিনী—'ডামাস্কাস গেট' (অগ্রন্থিত—দেশ ১৯৯৫-এ প্রকাশিত) এবং 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে' (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৯৭৮-এ, প্রথম প্রকাশ দেশ ১৯৭৭-এ)। প্রথমটির ভ্রমণ-বিষয় নামেই প্রকাশ। দ্বিতীয়টি লেখিকার প্রথম-কুম্ভমেলা ভ্রমণের বৃত্তান্ত। যদিও ভ্রমণের প্রস্তুতি পর্বে হায়দ্রাবাদের সভাপর্ব ও হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লি হয়ে প্রয়াগ যাত্রাও মূল ভ্রমণ-কাহিনী-পাঠের মতো সমান উপভোগ্য। গভীর বিষয়ে সকৌতুকে লেখার ক্ষমতাটি নবনীতার নিজস্ব।

গ্রন্থের পরবর্তী অংশে আছে দুটি উপন্যাস -'আমি অনুপম' ও 'প্রবাসে দৈবের বশে'। প্রথমটি ১৯৭৬এ শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে ১৯৭৮এ। দ্বিতীয়টি ১৯৭৭এ, শারদীয় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যদিও গ্রন্থাকারে ১৯৮৭-তে। দুটি বিভিন্ন উপন্যাস হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে, যে কারণে শেষোক্তটিকে প্রথমটির পরিপূরক বা 'সিকোয়েল' বলা যেতে পারে। প্রথমটির পটভূমি সত্তর দশকের অশান্ত রাজনীতির কালে এ-দেশে, দ্বিতীয়টির তারই উত্তরকালে বিদেশে ইউরোপে। অশান্ত বিভ্রান্ত যুবশক্তি ও ভীত সন্ত্রস্ত বুদ্ধিজীবীর পরাভব এবং আদর্শবাদী যুবচিত্তের পুনরুত্থান আশ্চর্য নিপুণতায় চিত্রিত এই দুটির আখ্যান কাহিনীতে।

গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে আছে ছয়টি মূল্যবান সাহিত্য প্রবন্ধ—প্রবাসী জন্মান্তর, বিবাগী ফুলের গন্ধ, বজ্রগর্ভ কুসুম রাজা থেকে রক্তকরবী, একটি মেট্রোপলিটান শিল্পীমন ও মধ্যযুগের বিদ্রোহের উদাহরণ, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী : লক্ষ্মী ও রিল্কে, পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক এবং/অথবা। বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৩৯০ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যকর্ম ও শিল্পী-মানস নিয়ে সারগর্ভ তুলনামূলক আলোচনা। মানিক ও কমলকুমার বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে পথিকৃৎ বলা যায়।

এর পরের ভাগে আছে তিনটি রম্যরচনা। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রসঙ্গ যে কত সুরম্যভাবে

আলোচনা করা যেতে পারে। 'বৃষ্টি কালান্তরে যাবে,' 'কবিতা, ফুটবল, মাছ ও মারুতি', যা 'ওরা আর আমরা' তার নির্দশন। সর্বশেষ রম্যনিবন্ধটির প্রকাশকাল ১৯৯৫।

গ্রন্থের পঞ্চম ভাগে স্থান পেয়েছে ছয়টি বিভিন্ন স্বাদের ছোট গল্প। ভালোবাসা কারে কয়, চোখ (দেশ ১৯৭৫), পরীক্ষা (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার ১৯৭৯), মধ্যরাতের ভয়ংকর, মেসোমশাইয়ের কন্যাদায় এবং মূল রামায়ণ (১৯৮৬'র শারদীয় দেশ)।

ষষ্ঠভাগে 'নিজের কথায়' আছে দুটি নিবন্ধ—প্রথম প্রত্যয় (সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ') ও আমার কোনও তাড়া নেই প্রথমটির প্রকাশকাল বাংলা ১৩৮২, শেষোক্তটির ইংরেজী ১৯৯৪। এই দুটি অসাধারণ নিবন্ধে নবনীতা তাঁর শিল্পীজীবন ও ব্যক্তিজীবনের একটি চমৎকার ছবি উপহার দিয়েছেন। পিতা নরেন্দ্র দেব এবং মাতা রাধারানী দেবী এই দুই প্রখ্যাত কবির সন্তান হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা যেন উত্তরাধিকার অর্জন করা। অথচ সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ভাবে নিজের কৃতিত্ব উহ্য রেখেই নবনীতা তাঁর আত্মচরিত তথা আত্মপরিবার-চরিত উপহার দিয়েছেন পাঠকদের। নবনীতার নিজের কথায় আত্মাভিমান নেই বলেই তার স্বাদ এত গভীর।

সপ্তম বিভাগে আছে মোট তেরোটি কবিতা। সর্বশেষ কবিতা 'লায়নটেমারকে' প্রকাশিত হয় ১৯৯৫এর দেশ পত্রিকায়।

এর পরের বিভাগে আছে 'মেদেয়া' কাব্যনাট্য (প্রথম প্রকাশ কৃত্তিবাস ১৩৮২, গ্রন্থাকারে আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৯৪)

গ্রন্থের সর্বশেষ বিভাগে আছে ১২ শতকের কন্নড় কবি বাসবান্নার বচন ('শতেক বচন' প্যাপিরাস, ১৯৮৩) থেকে ৬টি কবিতার মূল কন্নড় থেকে বাংলায় কাব্যাকারে অনুবাদ, যা কারও কারও কাছে অমূল্য ঐশ্বর্য বলে বিবেচিত হবে।

কবি নবনীতা, ঔপন্যাসিক নবনীতা, ভ্রমণকাহিনীকার, গল্পকার, রম্যরচনাকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, অনুবাদক—একটি মানুষের বিস্ময়কর প্রতিভার সামগ্রিকরূপ আমরা একটি গ্রন্থে একত্র ধরে দেবার চেষ্টা করেছি। নবনীতার শিশুসাহিত্যও অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু এই সংকলনে শিশুদের নবনীতাকে আমরা রাখিনি। বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ, বোদ্ধা, পরিণত পাঠকরাই আমাদের আশা-ভরসা। আমাদের এই প্রচেষ্টা তাঁদের আনন্দ দিলেই সকল শ্রম সার্থক মনে করব।

বিনত
সবিতেন্দ্রনাথ রায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

নব নীতা

বিষয়সূচী

ভ্রমণ

ডমাস্কাস গেট ১
করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে ২৭

উপন্যাস

আমি অনুপম ১০৭
প্রবাসে দৈবের বশে ১৯৫

প্রবন্ধ

প্রবাসী জন্মান্তর ২৪৯
বিবাগী ফুলের গন্ধ ২৬৯
বজ্রগর্ভ কুসুম : রাজা থেকে রক্তকরবী ২৮৭
একটি মেট্রোপলিটান শিল্পীমন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহের উদাহরণ ৩০০
ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ৩০৪
পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক : এবং অথবা ৩১৯

রম্যরচনা

বুঝি কালান্তরে যাবে ৩৪৩
কবিতা, ফুটবল, মাছ ও মারুতি ৩৫৯
ওরা আর আমরা ৩৭৫

গল্প

ভালোবাসা কারে কয় ৩৮১
মেসোমশায়ের কন্যাদায় ৩৯৭
চোখ ৪১০
পরীক্ষা ৪১৩
মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর ৪২১
মূল রামায়ণ ৪২৯

নিজের কথা

প্রথম প্রত্যয় ৪৩৭
আমার কোনও তাড়া নেই ৪৫১

কবিতা

একেকে এক ৪৫৭
প্রেম ৪৫৭
অগ্নিদিনের কবিতা ৪৫৮
আমাকে তবে গ্রহণ করো ৪৫৮
আরণ্যক ৪৫৯
মাৎসর্য সঙ্গীত ৪৬০
পাণিগ্রহণ ৪৬১
আসাম, ১৯৮০ ৪৬২
দুই গৃহস্থ ৪৬৩
পূর্ণিমা রাত্রের দৃশ্য ৪৬৪
বাস্তিটা ৪৬৫
উৎসব ৪৬৭
লায়নটেমারকে ৪৬৮

নাটক

মেদেয়া ৪৬৯

অনুবাদ কবিতা

কন্নড় কবি বাসবন্নার বচন থেকে ৪৭৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভ্রমণ

ডামাস্কাস গেট

ডামাস্কাস গেট

'ইৎসহাক', মানে হাসি। বৃদ্ধ আব্রাহামের যখন নিরানব্বই আর জরতী সারার প্রায় নব্বই, প্রভু তখন তাঁদের পুনর্বার দিলেন। সেই শুনে হেসে ফেলেছিলেন আব্রাহম আর সারা। সন্তানধারণের ক্ষমতা তাঁর বহুদিন ফুরিয়ে গেছে, আর সেজন্যেই তিনি মিশরদেশীয় দাসী তরুণী হাসরের গর্ভে, আব্রাহামের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন করিয়েছিলেন তেরো বছর আগে। তার নাম ইশমায়েল। সেই আব্রাহামের প্রথম পুত্র, সারার সতীনগর্ভজাত।

কিন্তু প্রভুর কৃপায় অসাধ্যসাধন হয়, সারা নব্বই বছর বয়সে জননী হলেন। সেই পুত্রের নাম 'হাসি' না হয়ে আর কী হতে পারে? ইৎসহাক সেই দৈবপ্রদত্ত বর, যার সন্তানদের মাধ্যমে আব্রাহামের বংশরক্ষা হবে। আর ইশমায়েল? সারা তাকে তার মায়ের সঙ্গে মরুভূমিতে নির্বাসন দিলেন, পাছে তারা ঈর্ষাবশত ইৎসহাকের ক্ষতি করে! প্রভু কিন্তু তাদের রক্ষা করলেন; ইশমায়েল মরুভূমিতেই বেড়ে উঠলো, তার এক মিশরদেশিনী পত্নী হলো। আর সেই শুরু হলো এক পিতার ঔরসে দুই জননীর গর্ভে জাত দুই ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পিতার অসম আচরণ থেকে যার শুরু।

আমরা যাঁকে আইজ্যাক বলে জানি, হিব্রুতে তিনিই ইৎসহাক—আব্রাহাম যাঁকে বলি দিতে পর্বতের ওপরে নিয়ে বেদীতে শুইয়েছিলেন। প্রভু শেষ মুহূর্তে একটি ভেড়া পাঠিয়ে ইৎসহাকের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মিরাক্‌লের যুগ শেষ। ইৎসহাককে আরেকবার প্রভুর কাছে বলির জন্য উপস্থিত করেছিলো নিয়তি, এবার বলি সুসম্পন্ন হয়েছে। এবারে প্রভু কাকে পরীক্ষা করছিলেন জানি না। সমগ্র ইজরায়েলভূমিকে কি? দেখা যাক ইৎসহাকের আত্মবলির দৈবী প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়!

এই লেখাটি জুন মাসে তৈরি। ইজরায়েল নিয়ে আরও কিছু লেখার কথা আছে বলে সম্পাদকমশাই অপেক্ষা করছিলেন। ইতিমধ্যে ইজরায়েলের ও প্যালেস্তাইনের সম্পর্ক অনেক বদলেছে। কিন্তু হৃদয়ের বদল হয়নি। জনজীবন ওখানে কেমন ছিল, এখানে সেই ছবিটি কিছুটা হয়তো ধরা যায়। বোঝা যায় ইৎসহাক র‍্যাবিনের মৃত্যু অবাক হবার মতো কোনও ঘটনা নয়। তাই পূর্বের নিবন্ধটিতে কোনও পরিবর্তন করা হল না।

সত্যি, ছেলেদের বিশ্বাস করা মানেই ঠকা! সে প্রেমেই হোক আর game-এই হোক! আমাকে west bank এ নিয়ে যাবে—আর কেউই যদি রাজি না হয়, ডেভিড বুর্ট বদাই রাজি—আর সেই কিনা এমনধারা পথে বসিয়ে দিল আমায়? একা একা রামাল্লা ঘুরে এল? বেশ হয়েছে ট্যাক্সিওলা ওকে ঠকিয়েছে, ছ'শো শেকেল নিয়ে নিয়েছে। এখন দুঃখু করলে হবে কী? যদি আমায় নিয়ে যেত, দেখিয়ে দিতুম দর-কষা কাকে বলে। কেয়ারনের আর জাস্টিস শিখতে হয় কলকাতার ফুটপাতে, হাইড পার্কের লেকসাইডে নয়।

রামাল্লাতে ডেভিডের চেনা এক কবি আছেন, মানে আবদাল্লার চেনা। আবদাল্লা ইংলণ্ডে প্রবাস করেন, আরবী ভাষাতে কবিতা লেখেন। হিব্রুতেও লিখতে পারেন, ইংরিজিতেও। ওয়েস্ট ব্যাংকে তাঁর অনেক সোশুনো, আবদাল্লা মূলত ইজরায়েলেরই আরব বাসিন্দা, এখন প্রবাসী। এই আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে স্বদেশে এসেছেন। মার্চ মাস—ইজরায়েল এখন বসন্তে উল্লাসিত। এই মরুভূমির দেশেও এত ফুল, এত রং!

ভীষণ রাগ হয়ে গেল ডেভিডের ওপর, রামাল্লা যাবার কথা ছিল আমাদের একসঙ্গে—কিন্তু

BanglaBook.org

ডেভিডটা চলে গেল হঠাৎই, ঠিক সেই দিন, আমি যেদিন গেছি জুডাইয়ান ডেজার্টে ডেড-সি দেখতে, যেখানে মানুষ জলে ভাসে, যার তীরে লট-এর বউ নুনের স্তম্ভ হয়ে গিয়েছিল; তার পাশের মরূদ্যান এইন গেদির খেজুরবন দেখতে। কুম্‌রান পাহাড়ের যে গুহাতে মেষপালকেরা ২,০০,০০০ বছর আগেকার পুঁথি "ডেড সি স্ক্রোল" কুড়িয়ে পেয়েছিল সেই সব আশ্চর্য গুহা-পাহাড়, আর মাৎসাদা পাহাড়ের চূড়োতে দু' হাজার বছরের পুরনো রোমানদের বিলাসবহুল কেল্লার ধ্বংসাবশেষ দেখতে। যাবি তো যা, ওই দিনই ঠিক তোকে রামাল্লা যেতে হলো? এমনিতেই ওয়েস্ট ব্যাংকে যাওয়া মুশকিল। কোনও ট্যাক্সি যেতে চায় না। তায় ইজরায়েলে যদিও ইহুদি তরুণীদের মিলিটারি ডিউটি করতে হয়, তবু জেরুসালেমে মেয়েদের খুব একটা একা একা ঘোরার রেওয়াজ নেই। বিশেষ করে আরবদের পাড়ায় সাদা মেয়েদের ঘোরাফেরার চল বিশেষ নেই। আমাদেরও জেরুসালেম পৌঁছুনোর পরে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, জেরুসালেম যদিও খুবই নিরীহ শহর, তবু দামাস্কস গেটের ওধারটায় একা একা ঘোরাঘুরি না করাই ভালো আর যদি প্রাচীরঘেরা পুরনো শহরে যেতে হয় সেখানে দল বেঁধে যাওয়াই বুদ্ধির কাজ; আরও বুদ্ধির কাজ হবে কোনও স্থানীয় লোকের সঙ্গে যাওয়া।

নাইবা হলুম সাদা, ভিনদেশী মেয়ে তো? রামাল্লা আরবদের শহর। ওয়েস্ট ব্যাংকে। জেরুসালেমের বাইরে, আমি কেমন করে একা একা যাই? ডেভিডটা ঘুরে এসেছে। আমি উপস্থিত কবিদের অনেককেই প্রস্তাব দিয়েছি—কেউই গ্রহণ করেননি। এই "কবি-কবি" কেউ নন যিনি সেধে ওয়েস্ট ব্যাংকে গিয়ে হঠাৎ সন্ত্রাসবাদীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে পড়তে চাইবেন। আছে আছে, দিব্যি আছে, হঠাৎ দিল একখানা সুইসাইড বম্ব মেরে একটা গোটা বাসসুদ্ধু নিরীহ মানুষ উড়িয়ে। এতে হামাস-এর বিন্দুমাত্র লাভ নেই। লাভ নেই গোটা আরব গোষ্ঠীর। দু'পক্ষেরই বরং ক্ষতি এতে। কিন্তু অবিমৃষ্যকারী মৌলবাদীরা আর কবে কোথায় বুদ্ধিমানের মতন কাজ করে? তারা চোখের দু'পাশে ঠুলি বেঁধে এক মনে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ পৃথিবীর সর্বত্র জুড়েই দেখতে পাচ্ছি নাশকতাবাদের কুড়ুল নাশকতাবাদীর নিজের ঘাড়েই এসে পড়ে একদিন। কাগজে দেখি আরাফতেরও ঠোঁট নড়ছে, র‍্যাবিনেরও ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু বাক্যবিনিময় আর সুরে উঠছে না। সুরে কেমন করে? এদিকে 'হামাস' আর 'ইসলামিক জিহাদ', ওদিকে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী—প্রতিটি তরুণ-তরুণীকেই সৈনা হতে হয়। প্রত্যেকের কাঁধে বন্দুক তুলে দেয় ইজরায়েল। এই তো যুগ্ম শান্তিপ্রকল্প। সন্ত্রাসবাদীদের শুধু র‍্যাবিন কেন, আরাফতও বহু অনুনয় করেন এখন—"ক্ষ্যান্ত দেও বাবাগণ!" কিন্তু ভবী ওতে ভুলবে কেন? শান্তি তো তাদের কাম্য নয়।

যুদ্ধের আবহাওয়াটা তৈরি হয়েই আছে। এদেশে পা দেবার অনেক আগেই টের পাওয়া যায় একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। বম্বে এয়ারপোর্টে "এল্‌ফে অ্যাল্" বিমানসংস্থার ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ইজরায়েলি অফিসারেরা যা দুঃসহ কুটখামেলা বাধান, প্রতিটি যাত্রীরই নিশ্চয়ই মনে হয়—"ধুত্তোর! কক্ষ নেই বাবা তোদের দেশে গিয়ে!" ইজরায়েলে যাওয়া হবার মুহূর্ত থেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করা যায় যেখানে যাচ্ছি সেখানে শান্তি নেই, মানুষকে মানুষের বিশ্বাস নেই। জীবন জটিল। ইজরায়েলের প্রধান অভিবাদন "শ্যালোম", অর্থাৎ "শান্তি"। এটাই স্বাভাবিক, এটাই এদেশে সবচেয়ে মহার্ঘ্য।

ডেভিডের সঙ্গে সবে আলাপ হয়েছে, এই এখানে এসে। জেরুসালেমে আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব হচ্ছে, সেখানে ডেভিড চলে এসেছে তার বন্ধু আবদাল্লার সঙ্গে। আবদাল্লা আরব কবি কিন্তু লণ্ডন-প্রবাসী। দুই ভাষাতেই লেখে। ডেভিড নিজেও কবি। কিন্তু নিমন্ত্রিত নয়। সে ছুটে এসেছে পৃথিবীর নানা দেশের কবিদের দেখবে বলে, তাদের কবিতা শুনবে বলে। আর

জেরুসালেমের টানেও বটে। রামাল্লায় আবদাল্লার এক বন্ধু আছেন, ডেভিড তাঁরই কাছে যাবে। শুনেই আমিও নেচে উঠেছিলুম, আমিও যাবো, আমিও যাবো। ডেভিডও সঙ্গে সঙ্গে রাজি। একলা যাবার চেয়ে তো আঁচলে একটা গুবরে পোকা বেঁধে নেওয়াও ভালো। কিন্তু কপালে নেই ঘি, ঠকঠকালে হবে কী! ডেভিড ব্যাটা আমাকে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস না করে এমনই একটা দিনে ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেলল রামাল্লায় যাবার জন্যে, যে দিনটাতে আমার একগাদা কর্তব্যকর্ম রয়েছে কবিতা উৎসবে। আমি তো ওর মতন দায়মুক্ত নই! আমি নিমন্ত্রিত অতএব পরাধীন। ওই দিনটাতে আমার পক্ষে পোঁ-ধরা একেবারেই অসম্ভব। পরদিন সকালে তাই রেগেমেগে "মিশকেন্ট শা' আনানিম"কে শহর থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলি। আজ আমাদের কবিরা সকলে তেল আভিভে যাচ্ছেন, ইজরায়েলি কবি-সমিতির বিশেষ নিমন্ত্রণে। এবং মেয়রের লাঞ্চে। ওসবে যেতে আমার কোনও উৎসাহ নেই। সংবর্ধনা-সভা থেকে আমি মাপ চেয়ে নিয়েছি। ফর্মাল নিমন্ত্রণে আমার অরুচি।

—"কোথায় যাবেন?"

—"দেখি ভেবে।"

ট্যাক্সিতে চড়ে ভাবছি—"রামাল্লা" বলব, না "জেরিকো" বলব? জেরিকোয় যাবার খুব শখ, (পল রোবসনের গানের ধুয়ো ধরে!) সেই যে জেরিকোর প্রাচীর!

—"জেরিকো।" বলে দিই।

—"জেরিকো?" ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে, "আপনার হাতে সারাটা দিন আছে তো?"

—"ও, তাই নাকি? তাহলে"—এবার আমি মনে মনে সময় হিসেব করতে থাকি। সময় সত্যিই বেশি নেই। বিকেলবেলায় খান থিয়েটারে আমাকে কবিতা পড়তে হবে, ইজরায়েলি রেডিওয় বিশেষ প্রোগ্রাম আছে—জেরিকোতে গিয়ে খুশিমতন ঘুরিয়ে গেলে চলবে না আজকে। তেল আভিভের যাত্রী কবিরাও ফিরে আসবেন ওই কবিসভার জন্যে। নাঃ, আজ জেরিকো হল না। আর একটু ভেবেই বলে দিই—

—"আচ্ছা, তবে বরং ডামাস্কাস গেটের দিকেই যাই চলুন।"

এটা ঠিক কিরকম হলো বলব? ট্যাক্সিকে "চলুন দাদা—বর্ধমান!" বলবার ঠিক পরেই বলছি, "ও, বর্ধমান হবে না? আচ্ছা, তা হলে চলুন ভবানীপুর!"

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। শাড়ি পরনে, টিপ কপালে, কিম্ভূত মূর্তি, গম্ভীরসে বসে আছি। ঝোলা কাঁধে, ক্যামেরা হাতে। রোদচশমা চোখে। গন্তব্য অনিশ্চিত।

—"ওল্ড সিটি দেখবেন? ঘণ্টা তিন-চারেকের মধ্যে হয়ে যাবে।"

ওল্ড সিটিতে কয়েকবার গিয়েছি। সারাদিন ধরে ঘুরেছি সেই অত্যাশ্চর্য প্রাচীরঘেরা পুরাকালের নগরীতে। ডেভিড রাজার মিনার, অল্ আক্সা মসজিদ, সোনার মন্দির, টেম্পল অব দা রক্। যেখানে তিনটি ধর্মেরই পবিত্র কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে। যিশু খ্রিষ্ট যে-পথটি দিয়ে তাঁর ভারী ক্রুশ বহন করে উঠেছিলেন, গলগথার পাহাড়ে সেই দুঃখ-পথ, ভিয়া দোলোরোসা বেয়ে। তার যাবোটি স্টেশন—যেখানে যেখানে তিনি থেমেছিলেন—ছুঁয়ে ছুঁয়ে পৌঁছেছি গিয়ে গল্‌গথাতে। হোলি সেপাল্‌কার চার্চে। পুরনো জেরুসালেমের চারটে ভাগ, ইহুদি, আর্মিনিয়ান, ক্রিশ্চান ও ইসলামি—প্রতিটি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সে গল্প আরেক দিনের।

আজকে ইচ্ছে অন্য ছিল। ইচ্ছে ছিল প্যালেস্টিনীয়দের জীবনযাত্রা দেখবো। ওয়েস্ট ব্যাংকে যাবো। যদিও ইজরায়েল খুব ছোট্ট দেশ, হাইওয়ে দিয়ে উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে যেতে লাগে ঘণ্টা তিনেক আর কৃশকায়া জর্ডান নদীর পূর্ব তীর থেকে পশ্চিম তীরে যাত্রা এত সময়সাপেক্ষ হবার কোনই ভৌগোলিক কারণ নেই। তবু যেহেতু স্থানীয় রাজনীতির ঘোঁচঘাঁচ

BanglaBook.org

জানি না (আবদাল্লার কল্যাণে তবু ডেভিড কিছুটা জানে!), ড্রাইভার যা বললো বিনা তর্কে মেনে নিলুম। কিন্তু আজ আর ওল্ড সিটি নয়। ইস্ট জেরুসালেম দেখি।

—"আমাকে বরং ডামাস্কাস দরওয়াজার সামনে নামিয়ে দেবেন।"

—"ওখান দিয়ে ঢোকা যাবে না—বন্ধ।"

—"ঢুকতে চাই না তো? আমি একটু কেবল বাইরে আরব পাড়াতে ঘুরে বেড়াতে চাই: ধরুন একটা পথের ধারে কাফেতে বসবো, একটু কফি খাবো, লোকজন দেখবো, বাজারহাটে হেঁটে বেড়াবো—" বলতে বলতেই খেয়াল হলো আমার ট্যাক্সি-চালক সম্ভবতই ইহুদি। এইসব কথায় তার চিত্তে কীদৃশ প্রতিক্রিয়া জাগছে?

জেরুসালেমের সোনার রঙের পাথরে তৈরি প্রতিটি বাড়ি, পথঘাট। নতুন যত বাড়ি হয় সেও ঠিক ওই একই পাথরে গড়তে হবে এমনিই শহরের আইনকানুন। যাতে "সোনার জেরুসালেম" স্বনামধন্য থাকতে পারে। ওই পর্যন্তই ঐক্য। ওই সবগুলি বাড়ির রং এক। শহরের সব বাসিন্দার হৃদয়ের রংও যদি এক হত! হত যদি ওমনি ঝকঝকে পরিষ্কার, ক্লীন! তবে তো ইতিহাসই বদলে যেত। পৃথিবীর রংটা ওই সোনার জেরুসালেমের মতন হত। কে জানে এখন এই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে শত্রুভাবাপন্ন করে ফেললুম কিনা? অবশ্য শত্রু হলেই বা আমার কী ক্ষতি? আমি তো উড়োপাখি। আমি তো এদের কেউ নই, কিছুই নই। স্পষ্টতই 'বাহিরি'। তাই দুঃসাহসী হয়ে উঠি। বলি: —"আসলে আমি তো লিবি? আমার একটু জানতে ইচ্ছে করে এখানে আরবদের জীবনযাত্রাটা কেমন? এরা কীভাবে বাঁচে, কীভাবে কাজকর্ম করে, এইসব আর কি! কাগজে তে অনেক কিছু পড়ি, স্বচক্ষে দেখতে চাই।"

—"ডামাস্কাস গেটের সামনে এসে গেছি।" চালকটি বললো, আয়নায় চোখ রেখেই—"যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের বাড়িতে গিয়েও কফি খেতে পারেন। নিজের চোখেই দেখে আসবেন প্যালেস্টিনিয়ানরা কেমনভাবে বাঁচে এখানে।"

—"আপনি—"

—"আমরা প্যালেস্টিনিয়ান। আপনি যাদের কথা জানতে চাইছেন।"

একমুহূর্ত ভাবি। যাবো? এইভাবে? ট্যাক্সিচালকের বাড়িতে চলে যাবো? চেনা নেই শোনা নেই, নাম জানি না ধাম জানি না। যদি—?...তার পরই মন স্থির করে ফেলি। ধ্যাত্তোরিকে! যাব না কেন? কী আর করবে? সে তখন দেখা যাবে। ছেলেটাকে ভদ্র এবং বেশ বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। তবু বলি: - "আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?"

—"মা, বাবা, স্ত্রী, আমার ছোট্ট ছেলেটা, আমার স্ত্রীর ছোট ভাই, আমার ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, কাকারা, বাবার ঠাকুমা"—

—"বাঃ, চমৎকার! ঠিক আমাদের দেশের মতন।"

—"সব গরিবদের মতন। ইহুদিরা কিন্তু এভাবে থাকে না। কী, যাবেন?"

—"নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। অনেক ধন্যবাদ।"

বলতে বলতে যেন স্বপ্ন দেখার মতন দেখতে পেলুম, রাস্তা দিয়ে অন্যমনে দোকান দেখতে দেখতে ওই যে একটা লম্বা মতন লোক হেঁটে যাচ্ছে, সেটা ডেভিড না? ডামাস্কাস গেটের কাছে পথে পথে ঘুরছে, কে আবার? ডেভিডই।

—"অ্যাই ডেভিড!" জানলা থেকে গলা বাড়িয়ে মহউৎসাহে চেঁচাই। একেই বলে সাদর আহ্বান। চেঁচানোটা এ দেশে "সভ্য" না হোক! সভ্য হতে কে চায়!

—"যাবে নাকি একটি প্যালেস্টিনিয়ান পরিবারে? কফি খেতে?"

এই হচ্ছে নোবল রিভেঞ্জ! তুমি তো কালকে আমাকে রামাল্লাতে নিয়ে গেলে না? ডেভিড আমার ডাক শুনে ট্যাক্সির কাছে চলে এসেছে—স্পষ্টতই খুব খুশি দেখাচ্ছে তাকে। এ ঠিক

BanglaBook.org

কাঙালকে ভাত খেতে ডাক দেবার মতন। না, 'হাত ধোবো কোথায়?' ডেভিড এক লাফে উঠে এল।—"কী আশ্চর্য এই সাক্ষাৎ—অনেক ধন্যবাদ—কী মজা!" তার পরেই—"কার বাড়িতে ঠিক যাচ্ছি আমরা? কোনও প্যালেস্টিনীয় কবি বুঝি? নাকি তোমার ইউনিভার্সিটি কানেকশনের কেউ?"

—"ভুল। দুটোই ভুল আমরা যাচ্ছি এই ভদ্রলোকের বাড়িতে বেড়াতে। যাঁর গাড়িতে আমরা বসে আছি।"

ডেভিডের মুখের চেহারা এক মুহূর্তের জন্য অস্কার বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড পাবার যোগ্য হয়েছিল। বিষাদ, উদ্বেগ, আনন্দ—স্পষ্টত পরপর খেলা করে গেল ওর বয়স্ক নীল চোখে। ডেভিড খুব সুপুরুষ। অমনি কিন্তু প্রেম করার দিকটা যেন ধরে নেবেন না আপনারা। ও আমার কপালে নেই। ডেভিডের ঘরে অতি সুন্দরী তরুণী ফরাসিনী শিল্পী বউ আছে। লণ্ডনে। তাকে নিয়ে ডেভিডের অহংকারের শেষ নেই, যেমন তার অহংকার নিজের দুটি মেয়েকে নিয়ে। মেয়ে দুটি ও স্ত্রীটি প্রায় একই বয়সী। একসঙ্গে তারা ডেভিডের দোকান চালায়। ডেভিডের প্রথম পত্নী মৃত। অনেক দিন পরে তার এই প্রেম, এই বিবাহ। বউ ফরাসি, কিন্তু জন্মেছে, বড় হয়েছে সিরিয়ায়। তাই হয়তো ডেভিডের প্যালেস্টিনিয়ানদের প্রতি এই বিশেষ কৌতূহল এবং সহানুভব। সে নিজে কবি, কিন্তু মাপে বড় নয়। নিজে শিল্পী, কিন্তু মাপে বড় নয়। অথচ ডেভিডের মধ্যে অন্য কবি, শিল্পী, যাঁরা জীবনে জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁদের প্রতি কোনও ঈর্ষা তো নেই, বরং প্রচুর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আছে। সেই ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার টানে ধরাকৃত হয়েই নিজের খরচে আবদাল্লার সঙ্গে জেরুসালেমে চলে এসেছে ডেভিড, নিজে আলাদা আছে এক মাঝারি হোটেলে ইস্ট জেরুসালেমে, পুরনো শহরের কাছাকাছি। আমাদের চেয়ে অনেক স্বাধীন সে। যেমন খুশি ঘুরে বেড়ায়, যে-দেশে ইচ্ছে আসে যায়। যেখানে যা খুশি খায়। আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত হিসেব করা।

—"তুমি একে চেনো?" ডেভিডের প্রশ্নের উত্তরে আমি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হই। যা করছিলুম করছিলুম, আবার সাক্ষী রাখতে গেলুম কেন? এবার কৈফিয়ৎ দাও। দূর হাই! না ভেবেচিন্তে কাজ করি, মাথায় ভাবনাটা পরিষ্কার হবার আগেই মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়ে ইচ্ছেটা। এর জন্যে কম ভুগেছি জীবনে?

—"চিনি না তো কী হয়েছে? চিনে নেব। তোমাকেই কি চিনতুম আমি তিনদিন আগেও?" এর উত্তরে ডেভিডের কিছু বলার থাকে না। খুব ভদ্র স্বভাব তার। সে বেচারা অভিজাত ইংরেজ, আমার সঙ্গে পারবে কেন? আমি কলকাতার, বালিগঞ্জের মেয়ে। অতএব:

—"তাহলে আলাপ করা যাক। মশাই, আপনার নাম কী?"

—"মহম্মদ। প্রফেটের নামে নাম।"

—"আমাদের পরিচয়, আমরা কবি। ইনি ডেভিড, ইংলণ্ডের লোক। আমি নবনীতা, ভারতবর্ষের।"

—"আপনারা কি ইহুদি?"

এবার ডেভিড জবাব দেয়, "আমি কোনও ধর্মেই ঠিক বিশ্বাস করি না—জন্মেছি অবশ্য ইহুদি পরিবারে। আর আমার স্ত্রী ক্রিশ্চান পরিবারে। আমরা আসলে বৃহত্তর মানবধর্মে বিশ্বাসী। সেকুলার।"

—"আচ্ছা! আর আপনিও কি তাই? কোনও ধর্মেই বিশ্বাসী নন?"

—"আমি জন্মেছি হিন্দু পরিবারে। ডেভিডের আমি উল্টোটে বলতে পারেন। কেননা আমাদের দেশে সেকুলারিজম মানে জগতে যত ধর্ম আছে, সবেতেই বিশ্বাসী হওয়া। প্রত্যেক ধর্মের পবিত্র দিনে আমাদের সরকার ছুটি পালন করেন। মোট কথা, আপনি ধরে নিন, ডেভিড এবং আমি

BanglaBook.org

দু'জনেই খুব ধার্মিক লোক। কিন্তু সেই ধর্মটাতে আপনিও আছেন, ডেভিডও আছে, আমিও আছি।"

—"ঠিক তাই"—ডেভিড বলে।

মহম্মদ রাস্তার দিকে চোখ রেখে কেবল বলল—"ইজরায়েলের সবাই যদি এই ভাবে ভাবতো!"

রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। আজ শনিবার। ইহুদিদের ছুটির দিন। তাদের সব দোকানপাট, বাজারহাট বন্ধ। এটা আরবপাড়া। এখানে শুক্রবার ছুটি। শুধু বড় বড় দোকানগুলোই এখানে বন্ধ থাকে শুক্রবারে। খুব দরকার পড়লে আরবরা শুক্রবার যায় ইহুদি পাড়ায় দোকান করতে। আর ইহুদিরা আসে শনিবার আরবপাড়ায়, খুব দরকার পড়লে। আমার চোখে পড়ল রাস্তাভর্তি আরব স্ত্রীপুরুষ। পুরুষদের মাথায় বেদুইনদের মত চাদর বাঁধা, সবার পরনে হয়তো আলখাল্লা নেই, পশ্চিমী পোশাকই। বয়স্কদের পরনে কিন্তু আলখাল্লা। আর পথে যত মেয়ে দেখলুম সকলেই মধ্যবয়স্ক, সুন্দরী। অল্পবয়সী মেয়ে চোখে পড়ল না। মুখ ঢাকা বোরখা পরা মেয়েও চোখে পড়েনি, তবে মাথায় ওড়না আর পরনে সূক্ষ্ম কারুকার্য-করা কাফতানের মতো কালো পোশাক। পুরনো জেরুসালেমের অন্তর্বর্তী দোকানে সেই সব পোশাক ঝুলতে দেখেছি, দেড়শো দু'শো ডলার করে দাম। রাস্তায় ভিড় বলে গাড়ি যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আস্তে যাচ্ছে বলে দেখতে পাচ্ছি, ওই সব মূল্যবান পোশাক পরা নারীরা পথের ধারে টাটকা শাকসব্জি বিক্রি করছে। ওরা কি গ্রাম থেকে এসেছে? বেদুইন মেয়ে? ওই পোশাক বেদুইনদের হাতে বোনা।

একটি লোককে দেখলুম, অনেকগুলি নলওলা পিতলের সুরাপাত্রের মতো অত্যন্ত সুন্দর কলসী তার পিঠে বাঁধা—ভিস্তি যেমন চামড়ার জলপাত্র নিয়ে যায়, তেমনি ভাবে।

—"ওই লোকটি কে, মহম্মদ?"

—"ও? ও পানীয় জল বিক্রি করছে।" ক্যামেরা বের করতে করতে তাকে পেরিয়ে চলে এলুম আমরা। কিন্তু সেই আশ্চর্য সুন্দর বহুমুখী জলপাত্রটি আমার চোখে ধরা রয়েছে।

ইতিমধ্যে হেরডস গেটও পেরিয়েছি। সুলতান সুলেইমান রোড ছেড়ে হটবাজার পেরিয়ে গাড়ি গলিতে ঢুকল, এটা যেন অন্য একটা পৃথিবী। আমরা যে পাড়াতে থাকি, সেই ধনীপাড়ার চওড়া, ঝকমকে রাস্তায় শুধু গাড়ি চলে। লোকজন বেশি দেখা যায় না। পায়ে-হাঁটা মানুষরা সবাই ট্যুরিস্ট। এ পাড়ায় অপ্রশস্ত, কিছুটা অপরিচ্ছন্ন রাস্তা, দোকানভর্তি ফুটপথ, পথচলতি মানুষে ভরা। গাড়ি বলতে ট্যাক্সিই প্রধানত ভিড় করেছে রাস্তায়। দিল্লিতে যেমন রাস্তায় হাতি (কিংবা উটও) দেখা যায়, এখানে উট দেখিনি কিন্তু। ছেলেবুড়ো সবাই দিব্যি আছে রাস্তা জুড়ে। আড্ডা মারছে অল্পবয়সীরা, লাঠি হাতে বৃদ্ধ, নাতির হাত ধরে বৃদ্ধা। এটা-ওটা কিনছে লোকে। দেখতে দেখতে গাড়ি একটি বাড়ির সামনের ড্রাইভওয়েতে উঠে পড়ল।

—"এই যে আমাদের বাড়ি!"

সামনে একটি দোতলা অর্ধসমাপ্ত বাড়ি। ঢুকতে গিয়ে অনেক কাঠ, পাথর, সুরকি পেরুতে হল। তারপর অসমাপ্ত সিঁড়ি। সিঁড়িটি ঢালাই হয়েছে, ব্যবহৃতও হয়েছে রীতিমত। কিন্তু তার আর কিছুই শেষ হয়নি। কাঠ দিয়ে যেমন তেমন করে একটা রেলিং মতন করা।

—"সাবধানে উঠবেন", বলে মহম্মদ আগে আগে উঠে যায় দোতলায়। গিয়ে বন্ধ দরজায় ঘণ্টি বাজায় না, চাবি খুলে ঢুকে আমাদের আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে যায়। ভিতরে ঢুকেই চক্ষু চড়কগাছ। বাইরের সেই অসমাপ্ত-অর্ধসমাপ্ত চেহারা নয়, দিব্যি সুসজ্জিত ঘর-গেরস্থালি। বসবার ঘরে সোফা সেট, মেঝেতে কার্পেট, প্রত্যেক সোফাতে ভেড়ার লোম ভর্তি চামড়া পাতা। ভালো একটি মিউজিক সিস্টেম আছে। ঘরটি হলঘরের মতো, সেখানে একদিকে খাবার টেবিল। ঝাড়লণ্ঠন-আলো ঝুলছে। আবার একটা খুব সাজানো ক্রিসমাস ট্রিও রয়েছে। আমাদের সেইখানে

BanglaBook.org

বসিয়ে মহম্মদ ভিতরে যায়। ফিরে আসে একটি স্বাস্থ্যবতী তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে। আলাপ করিয়ে দেয়।

—"আমার স্ত্রী।" মেয়েটি করমর্দন করে। তার পরনে পশ্চিমি পোশাক ট্রাউজার্স, শার্ট। চুল খুব সাধারণভাবে ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখটি সরল। পঁচিশের নিচে বয়েস, সন্দেহ নেই, বিশের নিচেও হতে পারে। লাজুক হেসে সে তার স্বামীকে কিছু বলে। স্বামী বলে, "ও বলছে আপনাদের ওঘরে বসাতে। ওটা একটু ঠাণ্ডা।" এল শেপের ঘর—এ ঘরটি বড়, এতে আলো আসে প্রচুর। পাশের ছোট ঘরে আরেকপ্রস্থ সোফাকৌচ পাতা। আরো ভালো গালচে বিছানো। এককোণে টেলিভিশন চলছে। তাতে প্যালেস্তিনীয় পোশাক পরা এক ব্যক্তি কিছু বলছেন। না, তিনি আরাফত্ নন (একমাত্র তাঁকেই আমরা টেলিভিশনে কথা বলতে দেখতে অভ্যস্ত ওইরকম পোশাকে!), আর কোনও রাজনীতিক। সত্যিই এ ঘরটি শীতল। পাখা চলছিল। জানলা নেই বলেও গরম কম। মহম্মদ আবার বেরিয়ে যায়। এবারে ফিরে আসে একটি সদ্য ঘুমভাঙানো শিশুকে নিয়ে।

—"হোসেন।" সগৌরবে হেসে মহম্মদ জানায়। "আমার ছেলে এ-বাড়িতে আমরা পাঁচ প্রজন্ম বাস করি। আমার বাবার ঠাকুমাও আছেন। তাঁর একশো বছর হয়ে গেছে। কিন্তু রান্নাবান্না করতে পারেন, আমার ছেলের সঙ্গে খেলতে পারেন।"

—"তিনি কোথায়?"

—"ওঁরা থাকেন এর পিছনের বাড়িতে। এখানে এই বাড়িটা আমাদের বেশিদিনের নয়, পুরনো বাড়িতে আর কুলোচ্ছিল না, জমি ছিল, তাই এ বাড়িটা করেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ করবার সাহস নেই।—সাহসও নেই, পয়সাও নেই।"

—"সাহস নেই মানে?"

—"মানে সরকার তা ভেঙে দেবে।"

—"ভেঙে দেবে? কেন ভেঙে দেবে?"

—"প্যালেস্টিনিয়ানদের পুরসভা থেকে লাইসেন্স দেওয়া হয় না আর বাড়ি তৈরি করতে। অ্যাপ্লাই করে বসে থাকতে হয় পাঁচ বছর, দশ বছর। ঘুষটুষ দিলেও ফল হয় না।"

—"আশ্চর্য! কী করে তাহলে মানুষে?" ডেভিডের সরল অধৈর্য প্রশ্নের উত্তরে মহম্মদ জানালো:

—"বিনা লাইসেন্সেই বাড়ি বানায়। তখন ওরা সব নড়েচড়ে বসে, আর ফিফ্‌টি থাউজ্যান্ড শেকেল্‌স ফাইন চায়। নইলে বাড়ি ভেঙে দেবে। যেখান থেকে হোক যোগাড় করে ওটা দিয়ে দিতেই হয়। ঘুষও নেবে, ফাইনও নেবে। ও থেকে রক্ষে নেই, আগে ঘুষ দিলেও।"

—"পঞ্চাশ হাজার শেকেল্‌স! ট্যাক্সি চালিয়ে এতখানি জরিমানা সংগ্রহ করা সহজ নয়!"

—"সহজ তো নয়ই। তবু সমস্ত পরিবারসুদ্ধ সবাই মিলে টাকাটা সংগ্রহ করে যদিও-বা দেওয়া হয়, তাইতেই যে বাড়িটা ভেঙে দেবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। জরিমানা নেবার পরেও বাড়ি ভেঙে দেয় বুলডোজার চালিয়ে।"

—"য্যাঃ!" আমার বিশ্বাস হতে চায় না। ইতিমধ্যে ট্রে-তে সুন্দর টার্কিশ কফির পটে কফি আর ছোট্ট ছোট্ট কাপ নিয়ে ঘরে চলে এসেছে মহম্মদের বউ। ইংরিজি বলতে পারে না, কিন্তু বোঝে দিব্যি। ভুরু কুঁচকে স্বামীকে কিছু বলল। মহম্মদ অনুবাদ করে দিল আমাদের—

—"ও বলছে আমার বোনের কথা। আমার বোনেরা বাড়ি করেছিল ওয়েস্ট ব্যাংকে। মাউন্ট অলিভের দিকে। কিছুতেই তো লাইসেন্স দেয়নি, তার পরে পঞ্চাশ হাজার শেকেল জরিমানা করলো। বোন সেটা ধরেই রেখেছিল, দিয়ে দিলো। তার পর এক বছরও হয়নি, ওরা বুলডোজার এনে বাড়ি গুঁড়োতে মিশিয়ে দিয়েছে। আমার বোনের এখন মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই।"

BanglaBook.org

—"কাগজপত্র ছিল না? জরিমানার সেই রসিদ?"

ডেভিডকে খুব বিচলিত দেখায়। মহম্মদ হেসে ফেলল।

—"কী হবে রসিদ দিয়ে? কে দেখবে? ছিল বইকি রসিদ। বাড়ি ভাঙবার পরে দুঃখিত! ভুল হয়েছিল'—এটা বললে কিছু হবে? ক্ষতিপূরণ দেবে নাকি? দূর!"

এবার ঘরে এলেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। মহম্মদ বললে—"আমার বাবা।"

ডান হাত এগিয়ে দিয়ে ডেভিড বলে, "ডেভিড।"

হাতটি নিজের হাতে ধরে নেড়ে "হোসেন" উত্তর দেন তিনি।

"হোসেন? তোমার নাতির নামও তো হোসেন?" আমি বলেই ফেলি।

হোসেন ও মহম্মদ হেসে ওঠেন একসঙ্গে।

—"আমার বাবার নাম মহম্মদ, আর তাঁর বাবার নাম হোসেন। হোসেন আর মহম্মদ, মহম্মদ আর হোসেন। আমাদের পরিবারের প্রথাই এই। প্রথম পুত্রের নামকরণে অন্যথা হবে না। পরের ছেলেদের অন্য অন্য যা খুশি নাম। আমারই তো আরও দুটো ছোট ছেলে রয়েছে। তাদের সন্তানের বেলায় অন্য নাম হতে পারে। বংশের প্রথম ছেলের বেলাতেই নামটা বাঁধাধরা।"

মহম্মদের বাবার বয়েস বেশি নয়, শক্তপোক্ত, মাঝবয়েসী।

—"আপনি কী করেন?"

—"চাকরি করি না আমি রিটায়ার্ড স্কুল টিচার এই পাড়াতেই একটা হাইস্কুলে, প্যালেস্টাইনের প্রাচীনতম হাইস্কুল সেটা, আগে পড়াতাম ওই যে সেন্ট্রাল বয়স স্ট্যাণ্ডের কাছে।"

—"এরই মধ্যে রিটায়ার করেছেন?" প্রৌঢ় ভদ্রলোককে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস না করেই পারি না।

খুদে হোসেনকে ঘরে শুইয়ে রেখে আরেক কাপ কফি ঢেলে দিয়ে গেল মহম্মদের বউ নাদিয়া। তার আগে কিছুক্ষণ অবশ্য বাবা মা এবং ঠাকুমা মিলে শিশু হোসেনের অলৌকিক কীর্তিকলাপ (হাত বাড়িয়ে কাপ ধরার চেষ্টা, আমার চশমা কেড়ে নেওয়া, ফোকলা মুখের অনর্গল অট্টহাসা ইত্যাদি) সগৌরবে প্রদর্শন করেছেন। এদেশেও দেখছি শিশুদের একেবারেই বাঙালী পরিবারের মতো দুরবস্থা, পশ্চিমে এ রেওয়াজ নেই!

—"রিটায়ার ঠিক বলব না, ধরে নিন রিজাইন করেছি। রিটায়ারমেন্টের সময় আমার তো এখনও হয়নি।"

—"হঠাৎ?"

—"স্কুল ছেড়েছি অনেক দিন। চাকরি করা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রচণ্ড চাপ পড়ছিল মনের ওপর।"

"থাক বাবা, ওসব কথা এখন থাক।"

মহম্মদ চাপা দিতে চায়। কিন্তু আমি ছাড়বো কেন? মনের ওপর কিসের চাপ পড়ছিল সেটা জানতে হবে না? হোসেন বললেন—"আমি ছিলাম পি.টি. টিচার, অর্থাৎ খেলাধুলো শেখাই আর কি! এসব ওই ৬ দিনের যুদ্ধের আগের কথা—আমাদের ওপর নানান ধরনের চাপ আসতে লাগলো, তার সবটা এখানে আলোচনা করেও লাভ নেই। প্রতিটি পদে অসুবিধা হতে লাগলো। ফাইনালি চাকরিটা ছাড়তে হলো একটা চরম সমস্যার মধ্যে পড়ে। আমাকে একটা টুর্নামেন্ট অরগানাইজ করতে বলা হচ্ছিল। সেই টুর্নামেন্ট অরগানাইজ করা মানেই আমার সর্বনাশ ডেকে আনা হত।"

—"কেন, সর্বনাশ কেন?" ডেভিডের প্রশ্ন।

—"পরিবারসুদ্ধু শেষ হয়ে যেতাম আমরা। এখন আমার চাকরি নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রুতা করারও কেউ নেই ওই সর্বনেশে টুর্নামেন্টের ব্যবস্থা করা সেই মুহূর্তে একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার

BanglaBook.org

হিংসে। এমনিতেই এদেশে এত হিংসা, এত শান্তিহীনতা, তার ওপর স্কুলে এরকম একটা ভয়াবহ প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত মানে তো সেধে ঘরের ভেতরে যুদ্ধটাকে তুলে আনা।"

—"কেন, কিসের টুর্নামেন্ট?"

—"ইজরায়েলি স্কুলের সঙ্গে আমাদের।"—

আমরা বোকার মতন চেয়ে আছি দেখে হোসেন আবার বলেন, "ইজরায়েলি টিমের সঙ্গে আমার প্যালেস্তিনীয়ান টিমের খেলা। খেলাতে যদি আরবরা হারত, তা হলে আমার নিজের লোকেরা আমাকে 'খারাপ টিচার' কিংবা 'খারাপ কোচ্' বলে নিন্দে করত না। বলত, ইহুদিদের চর, খেলা সাবোটাজ করেছে। আর যদি আরবরা জিততো, তাহলে আমার চাকরিটা থাকত না। ইহুদিদের হাতেই তো শাসনযন্ত্র। ব্যাপারটা ঠিক খেলাধুলোর পর্যায়ে ছিল না, যেভাবে চাপা উত্তেজনা তৈরি হচ্ছিল, হার-জিৎটা সাম্প্রদায়িক মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল খেলা শুরুর আগেই। আমি খেলাধুলোর টিচার, রাজনীতিতে অত ঘোরপ্যাঁচ আমার সহ্য হয় না। টুর্নামেন্টটা করানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। চাকরি ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন কোনো সমাধান আমি খুঁজে পাইনি।"

—"বাড়িতে আমার ঠাকুর্দা, আমার বাবার ঠাকুর্দা সকলেই রোজগার করছিলেন। বাবার চাকরি না থাকলেও আমাদের সংসার চলে যেত। তাই বাড়িতেও কেউ চায়নি বাবা ওই ঝুঁকির মধ্যে যান। উঃ, ওটা সত্ত্ব একটি বিপদের ফাঁদ পাতা হয়েছিল!"—বাবার হয়ে ছেলে মহম্মদ বলে।

হোসেন আবার শুরু করেন—"হারলেও মরতাম, জিতলেও মরতাম। তার চেয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করা ভাল মনে হল। ট্যাক্সি চালানো ধরলাম।"

—"এই ট্যাক্সিটা আপনার?"

—"এখন আমার ছেলেই এটা প্রধানত চালায়। আমিও চালাই অবশ্য। দুজনেই পালা করে চালাই। আমার মেজ ছেলেও চালায় মাঝে মাঝে।"

—"ট্যাক্সিটা বাবারই?" মহম্মদ জানায়।

—"বাড়িটা?"

—"আসলে এ অংশটা হচ্ছে এপ্রটেনেন্সের মতন। এর পিছন দিকে আমাদের প্রধান বাড়ি। পরিবারের সবাই সেখানে। একটা নয়, আমাদের অনেকগুলো পরপর লাগোয়া বাড়ি, আমার ঠাকুর্দার, বাবার, আমার। আরও দুই ছেলে যে বিয়ে হলে কোথায় থাকবে!"

"আর তো বাড়ি বানাতে দিচ্ছে না এ বাড়ির একতলাটা এখনও তৈরি হয়নি। ভাইরা সেখানে থাকতে পারবে—যদি এই 'শান্তি প্রচেষ্টা' সফল হয়, যদি কোনও দিন নির্ভয়ে এই বাড়ি শেষ করতে পারি। হয়তো গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে এসে এ বাড়িটাকে একদিন।"

—"যাস জেরুসালেমের মাঝখানে এই বাড়ি—এটা গুঁড়িয়ে দেবে কেমন করে?"

—"দিতেই পারে। শাসানি লিখে রাখছে তো সব দেয়ালে দেয়ালে। দেখেননি? যখন ঢুকলেন? এ পাড়ার দেয়ালগুলো কি আপনাদের পাড়ার মতন পরিষ্কার? সব গ্রাফিটিতে ভরা। একটা দেয়ালও পরিষ্কার থাকতে দেবে না।"

—"কারা লেখে এসব? কখন লেখে?"

—"Zionist-রা রাত্তিরবেলা এসে লিখে যায়। বাধা দেবার তো উপায় নেই। পাড়ার মধ্যে যুদ্ধ-দাঙ্গা-অশান্তি ডেকে আনতে কে চায়? ছেলেপুলে নিয়ে বাস করি তাই দেয়ালে দেয়ালে ঘৃণা-দ্বন্দ্ব নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। মুছে দিয়ে লাভ নেই, আবার লিখবে।"

—"জেরুসালেমে ওরা আমাদের থাকতে দিতে চায় না। অথচ পুরুষানুক্রমে তো এটাই আমাদের বাসভূমি। কোথায় যাব বলুন তো? এদিকে জেরুসালেম ভাগ করাও পছন্দ নয়।

BanglaBook.org

র‍্যাবিনের পছন্দ 'বিচ্ছেদনীতি'। তিনি আমাদের মুখদর্শন করতে চান না। ইজরায়েলি ইহুদিরা আর আরবরা পাশাপাশি থাকুক, কিন্তু একদম বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা আলাদা থাকুক এইরকম শান্তি তাঁর পলিসি। সেটা কি সম্ভব?"

ইতিমধ্যে মহম্মদের সুন্দরী ঠাকুমা চলে এসেছেন। তাঁর পরনে ধবধবে সাদা দিশি পোশাক। মাথায় ঘোমটা, সাদা গোলাপের মতন ধবধবে পাতলা চামড়া, মুখে হাসি। তিনি কিন্তু কথাটথা বললেন না। অতিথিদের দেখে, কৌতূহল মিটিয়ে নাতির ছেলের সঙ্গে খেলতে চলে গেলেন। আমার মনে পড়লো এঁর ঘরে এখনও শাশুড়ী আছেন। এঁর বয়েস আমি আন্দাজ করতে পারলুম না। মহম্মদকে প্রশ্ন করে শুনলুম প্রায় আশি বছর। এঁর স্বামীও আছেন। তাঁর আশি পেরিয়ে গেছে। তিনি মোটর মেকানিকের কাজ করেন। তাঁর বাবাও তাই করতেন। নিজেদেরই গ্যারাজ আছে। হোসেনের ভাইরাও ওই বিজনেসে, মহম্মদের ভাইরাও—। "ফ্যামিলি বিজনেস।" রোজগার ভালই হয়। ওই জোরেই হোসেন চাকরি ছেড়েছিলেন।—"আপনার বাবা এখন কোথায়?"

—"কেন? কারখানায়?" সহজ উত্তর এল: "বাবা এখনও সারাদিন খাটেন। আশি পেরিয়েছে, তাঁর সেটা মনে নেই। আমার ঠাকুরদাও তো এই সেদিন পর্যন্ত হাতেনাতে কাজ করতেন কারখানাতে। মাত্র দু'বছর আগেই মারা গেছেন। মৃত্যুটা খেটেছেন, অসুস্থ হননি।"

আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ স্বভাবপরহিতৈষী ডেভিড আমাকে বলল, "এঁদের আমরা ভীষণ সময় নষ্ট করছি। এতক্ষণ গাড়ি চালালে এঁদের কত রোজগার হত ভেবেছো? এবার ওঠা উচিত!" হোসেন এবং মহম্মদ দুজনেই অবিকল ভারতীয়দের মতন কান পেতে অন্যের কথা শুনছিলেন। ডেভিডের ফিসফিস্ করে আমাকে বলা বাক্যগুলি সযত্নে শ্রবণপূর্বক প্রবল গোলমাল করে আপত্তি জানালেন সমস্বরে: না না, একদমই সময় নষ্ট হয়নি। রোজ রোজ কি ওঁদের বাড়িতে ভারতবর্ষ থেকে আর ইংলণ্ড থেকে অতিথি আগম হয়? সত্যি বলতে কি, এর আগে কোনওদিনই হয়নি। ওঁদের মহাভাগ্য যে ওঁদের সংসারে অতিথি এসেছেন। বসুন, বসুন। না, না, কোনওই তাড়া নেই।

আমার একদম ইচ্ছে ছিল না, তবুও আমরা উঠি। তাড়া ডেভিডের ভাবটা যেন তখুনি তার কোথাও যাবার ছিল। সে হঠাৎ পকেট থেকে ছোট্ট একটি কৌটো বের করে টেবিলে রেখে দেয়, সংকোচে। বলে— "মহম্মদ, তোমার স্ত্রীর জন্য সামান্য কিছু উপহার।"

আমি তো দেখে চমৎকৃত। কখন ইতিমধ্যে ডেভিড উপহার কিনল? গাড়ি তো কোথাও থামেনি? ইতিমধ্যে মহম্মদের ঠাকুমা কিন্তু আমার হাতে একটি আলবাম তুলে দিয়ে গেছেন। তাতে শিশু হোসেনের জন্ম থেকে এই ন'মাস বয়স পর্যন্ত নানা রকমের ছবি। ওই আলবামে মহম্মদের বাবার ঠাকুমাও আছেন। একটি অতি মূল্যবান ছবি আছে—মাঝখানে সেই বৃদ্ধা, তাঁর চারিপাশ ঘিরে ডালপালার মতো তাঁর পরবর্তী চারটি প্রজন্ম। কোলে নবীনতম অতিথিটি। আমার খুব ইচ্ছে করেছিল ছবিটা চেয়ে নিতে। সাহস হল না। কিন্তু ক্যামেরা বের করি। ডেভিড আমনি বাধা দেয়।

—"না না, তুমি ওদের প্রিভেসি যথেষ্ট ধ্বংস করেছো, ক্যামেরা নিয়ে আর আক্রমণ করো না! ওটা এই পশ্চিমি সভ্যতার চরম অসভ্যতা! তুমি ভারতীয় কন্যা, এ অসৌজন্য তোমাকে মানায় না!"

—"আমি তো কোনো উপহার আনিনি তোমার মতন। আমি ছবি তুলে নিয়ে যাই, পাঠিয়ে দেব উপহার। প্রিভেসির ওপর অত্যাচার বলে কেন মনে করছো? তোমরা ভদ্র পশ্চিমিরা আবার বড্ড কেমন যেন! এতে এত জটিলতার কী আছে? আমি কি স্পাই? স্মৃতিচিহ্ন রাখা যাবে না?"

যেহেতু আমাদের সমস্ত কথাবার্তাই হচ্ছে ইংরিজি ভাষাতে, গোপনীয়তা রক্ষার উপায় নেই। আমাদের নিজেদের মধ্যেকার কথাবার্তাতেও মহম্মদ এবং তার বাবার অসীম মনোযোগ। তাতে

BanglaBook.org

বাধা দেবারও কোনো উপায় নেই। তাঁরা পুনরায় সমস্বরে উত্তর দিয়ে দিলেন—"না না, ছবি তুললে কী হয়েছে? আমরা হোসেন আর নাদিয়াকে আর আমার মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।"

ডেভিড চুপ। আমি বিজয়গর্বে স্ফীত। কিন্তু মহম্মদের ঠাকুমা কৌতূহল নিবৃত্তি করেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন। পিছন দিক দিয়ে পুরনো বাড়ির সঙ্গে একটা সংযোগসূত্র আছে, যেখান দিয়ে এঁরা আবির্ভূত ও নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন। সেটা আমরা দেখিনি। কিন্তু যাকে ধরে আনা হল সে একটি নওজ কিশোর। ইস্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র, মহম্মদের কনিষ্ঠ শ্যালক, নাদিয়ার ছোট ভাই। আমি পুটপুট করে ছবি তুলি। ডেভিডকে বলি, আমারও দু'-একটা তুলে দিতে। ততক্ষণে তার ইংরেজ সৌজন্যের অতিরিক্ত খানিক ভাঁটা পড়েছে, সংকোচ একটু কেটেছে। কিশোরটির সঙ্গে হেসে আলাপ করবার চেষ্টা করে ডেভিড। ছেলেটি হ্যাণ্ডশেকের পরে একগাল হাসে, কিন্তু কথা বলে না, "নো ইংলিশ" বলে মাপ চেয়ে নেয়। কেন, ক্লাস নাইনে "নো ইংলিশ" কেন হবে? প্রশ্নটা মনে থেকে যায়।

অবশেষে ফেরত রওনা হই। পরিবারসুদ্ধ সবাই আমাদের গাড়িতে তুলে দিতে আসেন—আর মহম্মদের বাবা হোসেন আমাদের সহযাত্রী হন। ওদিকেই কোথাও যাচ্ছেন। পথে বেরুতেই আঙুল তুলে দেখালেন, দেয়ালে বড় বড় হরফে প্রার্থিটি। "হেট্ ওয়ার্ডস"—বলেই হোসেনের সম্ভ্রান্ত মুখে বিষন্নতা ঘনিয়ে আসে।

আর "হেট্ ওয়ার্ডস" শব্দটা আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় অবিকল বিপরীত এক পরিস্থিতি যখন ইহুদিদের ঘরে ঘরে দেয়ালে দেয়ালে লেখা হত ঘৃণা-শব্দ। সকালে উঠে বিভীষিকা দেখতেন ইহুদি গৃহস্থ, দেয়ালে পড়ে গেছে মৃত্যুর পরওয়ানা পঞ্চাশ বছর পরে আবার নব-নাৎসিরা দেশে দেশে সেই কাজই শুরু করেছে। বস্টনের একটি পাড়ায় ইহুদিদের দেয়ালে তরুণ কৃষ্ণকায়রা লিখছে "হেট্ ওয়ার্ডস"—সদ্য এ নিয়ে অনেক আলোচনা শুনে এসেছি। এক সংখ্যালঘুকে আরেক সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে যাঁরা লাগিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের বাহবা দিতেই হয়।

জার্মানিতে তো অনেক দিনই শুরু হয়েছে নব-নাৎসিবের দাপট। ১৯৯২তে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখে এসেছি ছাত্র-অধ্যাপকদের মিলিত সভা বসেছে, কিভাবে এই ইহুদিবিদ্বেগী অশুভ শক্তির বিরোধিতা করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে, কর্মসূচি নির্দেশ করতে। কিন্তু জার্মানিতে নিও-নাৎসিরা কেবল ইহুদি-বিদ্বেষীই নয়, তারা বিদেশিবিদ্বেষী। যে সব দরিদ্র তুর্কি পরিবার এখন জার্মানিতে বসবাস করছে, একদা তাদের সেধে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সস্তার শ্রমিক হিসেবে আমদানি করা হয়েছিল এশিয়া থেকে। নিও-নাৎসিরা তাদেরও প্রবল শত্রু। এশিয়া/আফ্রিকার "অনার্য" মানুষদের প্রতি জার্মানির সেই পুরনো আক্রোশ মাথাচাড়া দিয়েছে। তাদের দাবি—"জার্মানদের জন্য জার্মানি"। (অবশ্য মার্কিন সৈন্যদের একথা বলে তাড়া দেওয়া হয় বলে শুনিনি।)

অথচ যুদ্ধের পাঁচ বছর পরে ভগ্ন, বিধ্বস্ত, দীন জার্মানিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে নেহাৎ বালিকা আমি যখন ঘুরেছি ভাঙা হামবুর্গে, বিধ্বস্ত মুনিখে—এই মনোভব অনুভব করিনি আমার শালপ্রাংশু গুম্ফশোভন পিতৃদেব আর শাড়িতে সুন্দরী মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কুচোচিংড়ি-গোছের আমার কপালেও কিন্তু প্রচুর আদর জুটেছিল, টেগোর-গান্ধীর দেশের লোক হিসেবে। বহু বছর বন্ধ থাকার পরে সে বছর ওবেরামেরগাও গ্রামের মানুষেরা তাঁদের মানত-করা ব্রত পালন করছিলেন, "প্যাশন প্লে" অভিনয় করে। বৎসরকাল যাবৎ তাঁরা মনেপ্রাণে সৎভাবে জীবনযাপন করছিলেন, যিশুর প্রেমের শিক্ষাকে প্রয়োগ করছিলেন কর্মে। তখন জার্মানির ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটেছে, সদ্য সদ্য নম্রতার শিক্ষা হয়েছিল।

কিন্তু তার দশ বছর পরে যখন কেমব্রিজ থেকে সদ্যবিবাহিত আমরা আশ মিটিয়ে জার্মানি চষে বেড়াচ্ছিলুম গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, রাইন নদীর উপত্যকায়, মোজেল নদীর উপত্যকায়—তখন

BanglaBook.org

তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেক পিছনে সরে গেছে। কোথাও কিন্তু মৈত্রীর অভাব বোধ করিনি।

১৯৭৯তে চেক পয়েন্ট চার্লি দিয়ে যখন পূর্ব বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে এলুম, তখনও পর্যন্ত ওখানে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষরা শান্তিতে ছিলেন। যদিও ইহুদিবিরোধী নিও-নাৎসিরা তখনই মাথা তুলছে পুনরায় দুই জার্মানিতেই। অত তুর্কি শ্রমিক কিন্তু সেবারে নজর করিনি। পূর্ব-পশ্চিমের উত্তেজনায় হয়তো।

কিন্তু ১৯৯২তে হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যাই, দুই জার্মানি তখন এক হয়ে গেছে, আর পথে পথে দেয়ালে দেয়ালে এই "হেট্ ওয়ার্ডস" ফুটে উঠেছে সেই খেয়াল করলুম। দাউদ দেখিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে আমার বন্ধু সুলানও ছিল, তার মুখে শুনেছিলুম তার পাড়াতেও এই উপদ্রব শুরু হয়েছে। ইহুদি এবং তুর্কি—এক ঘৃণাতেই বাঁধা! ১৯৯৩তে ফ্র্যাংকফুর্ট বুকফেয়ারে আমার বাংলাদেশি ভাইদের মুখে অপু, ইউনুস, খসরু, বাবুলদের কাছেও যা শুনেছি (এবং দাউদ তো ছিলই) তাতে মনে হয়নি ওখানে এখন ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশিদেরও পরিস্থিতি খুব একটা প্রেমময় আছে! বিশ্ববিদ্যালয়ের সারস্বত আঁচলের তলায় থাকলে অনেক সময়ে পুরো দৃশ্যটা নগ্নভাবে নজরে আসে না আমাদের

কিন্তু ওদেশটার নাম জার্মানি। আর এই দেশটা ইজরায়েল। এই সব "হেট্ ওয়ার্ডস" যারা লিখেছে তারা নিজেরা ইহুদি; Zionist। মহাজ্ঞানী জার্মানি "যে পথে করে গমন হয়েছেন চিরস্মরণীয়—" সেই পথে পা বাড়ানো কি ইজরায়েলকে সাজে? মনে হয়, এই দেশটা যাঁরা নতুন করে গড়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের স্বদেশ হারিয়ে দূর কিংবদন্তীতে "প্রতিশ্রুত ভূমির" খোঁজে এই যাত্রা করেছেন। "ঘৃণা-শব্দ" তাঁরা কেমন করে রচনা করেন, ঘৃণার অর্থ যাঁদের জীবনে উল্কির মতো পুড়িয়ে লিখে রেখেছে ইতিহাস? গেটো জীবনের যন্ত্রণা, স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হবার তীব্র হাহাকার, বিজাতীয়দের প্রতি বিদ্বেষের জ্বালা—ইহুজগতে ইহুদিদের মতো করে আর কে জেনেছে?

এখানে এখন স্থানীয় বাসিন্দারা, প্যালেস্টিনিয়রা ক্রমশ গেটো-বন্দী হয়ে পড়ছে—ওয়েস্ট ব্যাংকের আরব বসতিগুলির চারপাশে নিত্যনতুন ইহুদি বসতি স্থাপন করে ক্রমশ তাদের যেন চক্রব্যূহ রচনা করে ঘিরে ফেলা হচ্ছে—শেষ পর্যন্ত যাতে তারা উঠে যেতে বাধ্য হয়। জল, বিদ্যুৎ নিয়ে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। বন্দুক ঘাড়ে সৈন্য ঘুরছে সর্বদা। এ আবহাওয়াতে কি যৌথ শান্তি পরিকল্পনা সফল হতে পারে!

এদিকে আছেন 'জায়োনিস্ট' মৌলবাদীরা, আর ওদিকে আছেন 'হামাস'! কার্যত প্যালেস্টিনিয়ানদের এত বড় শত্রু জায়োনিস্টরাও নয়। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতে সন্ত্রাসবাদীদের তুলনা নেই। সেই শান্তির কণ্ঠ একটু এগোয় অমনি উগ্রপন্থী দল "হামাস" একটা সুইসাইড বোমা মেরে নিরীহ ইজরায়েলি নাগরিকদের বাস-টাস উড়িয়ে দেবে, আর অনন্যোপায় র‍্যাবিন তৎক্ষণাৎ বর্ডার বন্ধ করে দিয়ে, দরিদ্র দিন-এনে-দিন-খাওয়া আরব মজুরদের ইজরায়েলে কাজ করতে আসা বন্ধ করে দেবেন। ব্যস, সাতদিন দশদিন আরব শ্রমিকদের হাঁড়ি চড়বে না। ফলে তাদের মধ্যে যারা ইজরায়েলবিরোধী ছিল না, এতে তারাও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে যাবে। এই তো হচ্ছে। 'ইসলামিক জিহাদ্' বলে আরেকটাও মারকুটে পার্টি আছে। তারা সুইসাইড বম্বে আরও ওস্তাদ। অন্তহীন অন্তর্ঘাতী কাজকর্মে অবোধ আনন্দ পায় তারাও। হিংস্র কাজে, নির্দোষ মানুষের প্রাণহানিতে কী করে যে একটা ধর্মের আত্মতুষ্টি বা স্তিপুষ্টি সম্ভব? অথচ কোন ধর্মেই বা এটা নেই?

এ বছরের 'পাস-ওভার' উৎসবের দিনটির ৫৭৫৫তম জয়ন্তী উৎসব ছিল। এই 'সেদের'-এর উৎসবটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

BanglaBook.org

ইহুদি ধর্মের প্রায় প্রতিটি উৎসবের দিনই পবিত্র স্মরণের দিন। দুর্ভিক্ষের স্মৃতি, দেশত্যাগের স্মৃতি, দাসত্বের স্মৃতি, বিতাড়নের স্মৃতি, মহামারীর স্মৃতি, অত্যাচার, অপমান, যন্ত্রণার, অবিচারের স্মৃতি। পুজোপাঠের শুরু—"এই বিশেষ দিনটিতে তুমি তোমার পুত্রদেরকে ডেকে বলবে"—যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানে ইহুদি ধর্মের গোড়ার কথাই হলো, মনে রাখা। পাঁচ হাজার বছর ধরে মনে রাখা। "আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।" এই উচ্চারণ পরবর্তী প্রজন্মকে গায়ত্রী মন্ত্রের মতো শিখিয়ে দিয়ে যাওয়া। দ্বন্দ্বের, যন্ত্রণার, যুদ্ধের, জয়পরাজয় শোধবোধের স্মৃতিতে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ পরিপূর্ণ। এবং আছে অনুশোচনার দিনও। আছে বিজয়ের উৎসবের অলৌকিক কৃপার স্মৃতিও। এত—এত যন্ত্রণার কাহিনী যাদের ধমনীতে নিত্য বহমান, তারাই আবার কেমন করে একইভাবে অন্যদের যন্ত্রণা দেয়? এ হচ্ছে জন্মজন্মান্তরের শত্রুতা, কিংবদন্তীর যুগযুগান্তের বৈরি ভাব। একজন র‍্যাবিন আর একজন আরাফতের কর্ম নয় এই রক্তে বাহিত বদ্ধমূল ঘৃণার মূলোচ্ছেদ করা। অন্তরের বোধবুদ্ধির আমূল বদল না হলে, কোনও উদ্ভূল শান্তিপথ, রাজনীতির কোনও পরিবর্তনই এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান করবে না। এ সমস্যার বীজই আলাদা, এর মূল অনেক গভীরে, বাইবেলী সভ্যতার সেই একেবারে প্রথম পর্বে—যখন দুটি সৎ ভাই তাদের পিতার কাছে দু'রকমের আচরণ পেয়েছিল। এরা সেই আদরের পুত্র আইজ্যাক আর পরিত্যক্ত পুত্র ইশমাইল।

আমাদের মহম্মদের সেই কিশোর শ্যালকটির নাম, যতদূর মনে পড়ে, হাইমান। নামের মানেটা কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। মানে হলো—"যিনি ডান হাতে সকল কাজ করেন।" অর্থাৎ যিনি ন্যাটা নন। বাংলায় এককথায় এমন কোনো শব্দ আছে বলে জানি না। ("দক্ষিণ হস্তের কর্মের" সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই কিন্তু!) বেশ আশ্চর্য নামটা! গাড়িতে আসতে আসতে হোসেন মহা উৎসাহে আঙুল দিয়ে আমাদের তাঁর স্কুলটি দেখালেন।

—"প্যালেস্টাইনের প্রাচীনতম হাইস্কুল, রশিদা হাইস্কুল। ওখানেই পড়ে হাইমান।" হোসেনের কর্মস্থলও ছিল এই স্কুল। পুরনো বাড়ি, বড় মাঠ। পাঁচিলে ঘেরা। ইস্ট জেরুসালেমের জনবহুল অঞ্চলে, সেন্ট্রাল বাস স্টেশনের কাছেই। সবচেয়ে পুরনো মানে যে কত পুরনো, সেটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। জেরুসালেমের মতো শহরে "পুরনো" শব্দটা ব্যবহার করা বেশ মুশকিল। হিসেব বড় গোলমেলে।

হোসেন ১৯৬৫তে চাকরি ছেড়েছিলেন। তখনও ছ'দিনের যুদ্ধ (১৯৬৭) বাধেনি, কিন্তু তখনই পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। হোসেন বললেন তাঁর বয়েস এখন সাতান্ন, বাবার তিরাশি, ঠাকুমার একশো দুই। বাবা দিনে আটঘণ্টা কারখানাতে খাটেন এখনও।

—"কিন্তু হাইমান এত ভালো স্কুলে পড়েও ইংরিজি বলতে পারে না কেন—ক্লাস নাইনে পড়ছে! আপনারা এত সুন্দর ইংরিজি বলেন!"

—"ও ইংরিজি জানে, বলতে লজ্জা পায়। ওর দিদিও জানে। আসলে আরবদের স্কুলে তো গোড়া থেকে ইংরিজিটা শেখায় না, প্রাইমারি স্কুলে কেবল হিব্রু আর আরবিই শেখে। ইংরিজিটা পরে শুরু করে, ততদিনে আত্মবিশ্বাসী হবার বয়েসটা চলে যায়। আমরা ইংরিজি বলি চাকরির খাতিরে। ট্যাক্সি চালালে—"

—"এখানে কি দু'রকমের স্কুল নাকি?"

—"দু'রকম নয়। আরবদের স্কুলের অ্যাকাডেমিক কারিকুলাম ঠিক জর্ডনের স্কুলের মতো। অন্য কারিকুলাম চলে ইজরায়েলি ইহুদিদের স্কুলে। এই ভাগাভাগির ব্যবস্থা তো একেবারে গোড়া থেকে। দু' পাড়াতে বসবাস, দু' ধরনের স্কুল, দু' রকমের শিক্ষাপ্রণালী। ইহুদির প্রথম থেকেই ইংরিজিটা শেখে, আরবরা শেখে তিন ক্লাস পার হবার পরে। এক দেশে থেকে দু'রকমের পড়াশুনোর ব্যবস্থা হলে দুই শ্রেণীর নাগরিক তৈরি হবে না?"

BanglaBook.org

মাঝখান থেকে মহম্মদ বলে ওঠে—"কেবল তো পড়াশুনোতেই নয়, পাড়াগুলো আলাদা হওয়ায় ওদের খেলাধুলোর পার্কগুলোও আলাদা। ইহুদি বাচ্চারা যেসব পার্কে খেলে, আরব বাচ্চারা তো সেই পার্কে খেলা করে না। ফলে ওরা খেলাধুলোর সুযোগ পাবে কেমন করে? না দেখা হয় স্কুলে, না পার্কে। ভাব-ভালবাসাটা হবে কোথা থেকে? সন্দেহ, অবিশ্বাস—এটাই তো বাড়া স্বাভাবিক।"

—"যা হয় আর কি! গরিবের সঙ্গে ধনীর বন্ধুত্ব কি হয়?" হোসেন হঠাৎ আগের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন—"গোড়া থেকে ইংরিজি শিখলে আরবরাও ইহুদিদের মতো আধুনিক হতে পারত, কিন্তু তার জন্যে প্রাইভেট স্কুলে পাঠাতে হয়। পয়সা থাকলে, প্রাইভেট স্কুলে পাঠাতে পারলে খেলাধুলোও হতে পারতো—সেরকম স্কুলও আছে বইকি। কিন্তু আরবদের অত পয়সা কোথায়?"

কানে হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগে—"আরবদের অত পয়সা কোথায়?" এটা আরার একটা বাক্য হলো? পয়সা তো সব আরবদেরই! পেট্রোডলারে ভাসমান শেখদের অমলধবল পালগুলি এসে বোম্বাইয়ের বন্দরে ঠেকে—ওটাই ওঁদের মূর্তি লোটাবার নিকটতম শহর ছিল এককালে। মেরিন ড্রাইভের এক হোটেলের দক্ষতলার জানলা থেকে নিচের পথে একশো টাকার নোটের হরির লুট দিয়ে ভিড় জমিয়ে রাস্তা জ্যাম করে দেবার গল্প শুনেছিলাম বছর দশেক আগে। হোটেলবয়দের অর্থলোভে বালক-বেশ্যাগিরির কাহিনী কাগজে ঢের পড়েছি। হায়দারাবাদে আরবদের বৌ-বাজার তো এখনও চালু।

ভারতবর্ষ না হয় গরিব দেশ। একদা যে-সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না, সেই ব্রিটেনেও একটা সময় এসেছিল। সত্তরের দশকে, যখন আরবদেশীয় আলখাল্লায় সুসজ্জিতে কোনও পরদেশী খরিদ্দার দোকানে একবার পায়ের ধুলো দিলেই হল। বাস, অমনি চেখে-চোখে "শেখ! শেখ!" সম্ভ্রম ফুটে উঠত। আর আমাদের মতন তুচ্ছ ক্রেতারা পেট্রোডলারের ডাকিনী মন্ত্রের জাদুবলে মুহূর্তেই অদৃশ্য। মুহূর্তেই এক-দোকান-মানুষ "নেই" হয়ে যেতুম বিক্রেতাদের দৃষ্টিপথে। ব্রিফকেস থেকে ক্যাশ টাকার তোড়া বের করার দৃশ্য, সিনেমায় নয়, স্বচক্ষে দেখা। তাই "আরবদের পয়সা কোথায় বলুন?" শুনলে কানে একটা ধাক্কা লাগেই এবং খেয়াল হয় "স্থানমাহাত্ম্য" বলে একটা কথা আছে। এটা ইজরায়েল।—এখানেই এই বাক্য উচ্চারিত হওয়া সম্ভব।

—"আমরা এবার কোথায় যেতে চাই?" মহম্মদের প্রশ্নে খেয়াল হলো আমরা ট্যাক্সিতে বসে আছি এবং গন্তব্যস্থল উল্লেখ করিনি। হেরডের তোরণ পার হয়ে এগিয়ে এসেছি। সুলতান সুলেমান সরণি দিয়েই যাচ্ছি এখনও আমরা। সামনেই সালাহুদিন রাস্তা। সেই যে সুলতান সালাদিন, যাঁর সঙ্গে ক্রুসেড যুদ্ধ করেছিলেন রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট। রিচার্ডের শৌর্যবীর্যে মুগ্ধ হয়ে নাকি সালাদিন তাঁকে নিজের ভগ্নীপতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এহেন অনার্য-সম্বন্ধ পাতাতে মোটেই আগ্রহী হননি রিচার্ড। সুলতান সালাদিন ইতিহাসে নানাভাবে খ্যাতি পেয়েছেন। সুশাসক হিসেবে তাঁর রাজ্যে বিক্রমাদিত্যের মতো সুনাম ছিল। সেই সুনাম এসে পৌঁছেছিল মধ্যযুগের ইওরোপে, তুর্কি আগন্তুকদের মাধ্যমে অ্যালজেব্রা, জ্যোতির্বিদ্যা আর চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে। বোকাচ্চিওর কাহিনীতে পাই সুলতান সালাদিনের সঙ্গে বুদ্ধিমান ইহুদি বণিক মেলচিজেডেক-এর সুচতুর বাক্যালাপ—যে গল্পটি আবারও ব্যবহৃত হয়েছে অষ্টাদশ শতকের জার্মানিতে 'ঈশ্বরের নেত্রে সকল ধর্মের সমান মূল্য'—এই তত্ত্ব প্রচারের প্রসঙ্গে। ধর্ম নিয়ে মানুষের কুক্তিহীন অন্ধতার বিরুদ্ধে লেসিংয়ের নাটক "প্রাজ্ঞ মাথান"-এ। সুলতান সালাদিনকে নিয়ে আরও অনেক কিংবদন্তী আছে। সেই জেরুসালেম শহর, সেই সালাদিনের নামে পথ। সেখানে আমি স্টুটস!

আমি আর ডেভিড নেমে গেলাম ডেরেখ সাল-এদ-দীনের মোড়ে। ডেরেখ মানে রাস্তা। মহম্মদকে পঞ্চাশ শেকেল দিয়ে দিল ডেভিড—আমি কিছু দেবার আগেই এবং চমকে উঠে

BanglaBook.org

মহম্মদ বলল, "এ কি! এ কি! এ তো অনেক বেশি!"

আমার ব্যাগে দুটি একশো শেকেলের নোট। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে বুঝতে পারিনি। এখন যেমন ট্যাক্সিভান তৈরি হল, চেঞ্জ চাইবার আর সুযোগ নেই। ডেভিড মহম্মদের হাত ধরে সাধছে, "নাও, নাও, প্লিজ নাও।" বুঝতে পারছি এটা তার আতিথ্যের প্রতিদান দেবার চেষ্টা। কিন্তু আমার কী হবে? ট্যাক্সিটা ডেকেছিলুম আমি। ভাড়া দেবার কথা আমার। ডেভিডকে পথে দেখে ডেকে তুলে নিয়েছি, ডেভিডের টাকা বের করারই কথা ছিল না। তারপর টের পাই ডেভিডের চোখ দেখে, সে আশা করছে আমিও পঞ্চাশ শেকেল দেবো। আমার কাছে দুটি একশো শেকেলের নোট ছাড়া একটি দশ ডলারের নোট ছিল। আমি সেইটে দিলুম তার আপত্তি সত্ত্বেও মহম্মদকে মুঠোয় গুঁজে (যাতে কত দিচ্ছি ডেভিড না দেখতে পায়!)। আমার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট, মহম্মদেরও তার চেয়ে বেশি কখনও পাওনা হত না, শুধু এই যাতায়াতে। আর তার আতিথ্যের মূল্য—ওই শিশুর খেলা, ওই ঠাকুমার উঁকি দিয়ে যাওয়া, ওই খুদে শ্যালকের সলজ্জ হাসি—এ সব কোনও অঙ্কের টাকাতেই শোধবোধ হবে না। (দশ ডলার ত্রিশ শেকেলের মতো। আপনাদের নিশ্চয় খুব হিসেবটা জানতে ইচ্ছে করছে!)

সুলতান সুলেইমান সুলতান সালাদিনের অনেক যুগ পরের লোক। তিনি তুর্কি সুলতান, জেরুসালেম শহরটাকে যত্ন করে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। সারা শহরে কোয়ারা বসিয়েছিলেন, দীঘি কাটিয়েছিলেন, রাস্তা বানিয়েছিলেন—যা যা করার কথা আর কি ভালো রাজাদের, ইতিহাস বইতে যেমন পড়ি, তা সবই করেছিলেন। সুনামও কিনেছিলেন। তাঁরই নামে ইস্ট জেরুসালেমের সবই বড় রাস্তা, প্রধান রাজপথ। সালাদিনের নামের বড় রাস্তাটি এর গা থেকেই বেরিয়েছে—এটিও বিখ্যাত, দোকানপাট হোটেল কাকে এসবের জন্যে। একদা এই ইস্ট জেরুসালেম জর্ডনের দখলে ছিল। এই অঞ্চলটি আরবপাড়া রয়ে গেছে। এখানে চারিদিকে আরবদের দোকানপাট, ঘরবাড়ি।

ডেভিড আর আমি মহম্মদ ও হোসেনের কাছে বিদায় নিয়ে একটু হাঁটি। বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ি, পায়ে পায়ে দুজনেই। আরবিতে, হিব্রুতে মানের বই কবিতার বই আছে, ছেলেদের ছবির বই, অনেক সুন্দর রঙিন পোস্টকার্ড। পোস্টাল দেখলুম না কোনো। পুরনো ম্যাপের খোঁজ করলুম; হর্স্টজর্গেনের (আমার হবু ছোট জামাই) খুব পুরনো ম্যাপ পছন্দ। পুরনো, নতুন, কোন ম্যাপই নেই। শুধু হিব্রু আর আরবিতে লেখা কিছু ভ্রমণ-নির্দেশিকা। আশ্চর্য তো! এই শহরে ট্যুরিস্টরা তো ইংরিজি গাইডই খুঁজবে? কিনবে? কিংবা ফরাসি, জর্মন?

—"তারা এপাড়ার বইয়ের দোকানে আসবে না, তাদের জন্যে অন্য পাড়া আছে—আর তাদের সুভেনিরের জন্যে আছে প্রাচীর-নগরীর দোকানের সারি। এ সব ছোট দোকান স্থানীয় মানুষদের জন্যে।" আমরা দ্বিভাষী কবিতার বই খুঁজছিলুম হিব্রু, আর ইংরিজি দুই ভাষাতে ছাপা। আরবিতে আছে আর হিব্রু কবিতার বই আছে। কিন্তু দ্বিভাষিক কিছু নেই। ডেভিডের কথাই ঠিক। এ পাড়ার বইয়ের দোকান স্থানীয়, আরবদেশীয় ট্যুরিস্টদের জন্য, মার্কিনিদের জন্য নয়। সত্যি অতক্ষণ যে ও-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করলুম সেদিন, পথে একজনও "মার্কিনি ট্যুরিস্ট" মার্কামারা চেহারা চোখে পড়ল না কিন্তু।

ডেভিডকে বললুম, "খিদে পেয়েছে, চল একটা দোকানে ঢুকি।"

ডেভিড বলল, "এ পাড়াতে? না, না, এখানে কোনও খাবার দোকান নেই। তুমি ও পাড়াতে ফিরে যাও। সব রেস্তরাঁ ওদিকে।" শুনে আমি অবাক।

স্পষ্ট দেখছি খাবার মতন সব দোকান রয়েছে, সেখানে বড় বড় ঘুরন্ত শূলে চড়ানো কী যেন জন্তু ঝলসানো হচ্ছে, চমৎকার গন্ধও বেরুচ্ছে, লোকজনে খাচ্ছে, খেতে খেতে হাঁটছে আর বলে কিনা খাবার দোকান নেই! ডেভিডের কি মাথা খারাপ? "ওই দোকানটা তবে কী?

BanglaBook.org

ওটা তো একটা রেস্তরাঁ। ওই তো ওখানে সিরিয়ান ব্রেড আর স্যালাড, আরও কী সব বিক্রি হচ্ছে!" মেনুও লেখা আছে সামনে ব্ল্যাক বোর্ডে, কিন্তু পড়বার উপায় নেই।

—"ওসব তো সিরিয়ান দোকান! তুমি ওই খাবার খেতে পারবে?"

আরে! এ আমাকে ভেবেছে কী! কলকাতার রাস্তায় ফুচকা, আলুর চপ, মাটনরোল খাওয়া পাকস্থলী আমার। আমি কি ডেভিডের মতন সেদ্ধআলু আর সেদ্ধমাংস খেয়ে বড় হয়েছি? ডেভিডই আসলে খেতে পারবে না ওই বস্তু, তাই বলছে।

—"আমাদের খুব অভ্যেস আছে গুরুপাক (এবং ধুলোপাক!) ভোজন। তুমিই বরং পারবে না। ব্রিটিশ রান্না যা হালকা!"

ডেভিডের চোখমুখে হাজার বাতি জ্বলে উঠলো।—"আরে আমি তো এই ইস্ট জেরুসালেমে একটা হোটেলে আছি প্রত্যেক দিনই এই সব দোকানে খাই। আমি তো ব্রিটিশ গায়ানাতে ছিলুম—ঝাল-ঝাল গোট-কারি রান্না করতে পারি—আমি ভেবেছি তোমারই হয়তো—"

দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা ফরোয়ার্ড মার্চ করে আমরা দুজনে সামনের ছোট্ট নামহীন একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়ি। নোংরা নয়। তিনটে টেবিল আছে, ছ'টা চেয়ার। একটা লম্বা কাউন্টার আছে। বেশ দ্রুত বিক্রি হয় দেখলুম। বসে-খাওয়ার লোক নেই, সবাই ঠোঙায় করে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরাই রাজার মতন আপ্যায়ন পেলুম। শূলে চড়ানো মাংসটা ভেড়ার। ওটা একটা কাবাব। মশলাদার নয়, ডেভিড বলল, খুব সুস্বাদু। আর কাচের কাউন্টারে দেখলুম ভালো ভালো দেখতে মাংসটাংস আছে। একটা মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের আচার, আরেকটা বুঝি কলিজার কালিয়া—ঝাল মশলাদার। তেলে ভাসছে। আর স্যালাডও রয়েছে। সিরিয়ান ব্রেডের মধ্যে এই তিন রকম জিনিস দিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে দিল। লংকা, বেগুন, টোমাটো, পেঁয়াজ, লেটুস—চমৎকার জিরে জল আসবেই। ওখানকার জলটা খাই না। আমার কোলাতে সবসময়ে মিনারেল ওয়াটার থাকে। ডেভিড কোকাকোলা অর্ডার দিল। আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারি না, বলেই ফেলি, "আচ্ছা, তুমি ওর বউয়ের জন্য উপহার কী করে পেলে?"

সলজ্জ হেসে ডেভিড জানায় হাঁটতে হাঁটতে, "মা ওর নিজের বউয়ের জন্যে কিনে ফেলেছিল, তাই পকেটে ছিল। ওদের সৌজন্যের তুলনায় ওটা তো কিছু নয়। একটা দুল কেবল!"

খেতে খেতে ডেভিড তার স্ত্রী-কন্যাদের ছবি দেখালো। ঠিকানা দেওয়া-নেওয়া হলো। আমি যখন অক্সফোর্ডে তিন মাস থাকবো, সম্মনের ট্রিনিটি টার্মে, এই তো এক মাসের মধ্যেই তখন নিশ্চয় দেখা হবে। হয় লণ্ডনে, নয়তো অক্সফোর্ডে।

(হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল। লণ্ডনে। ডেভিডের চমৎকার "বাসা"তে। ফরাসি বউয়ের সঙ্গেও খুব ভাব হয়ে গেছে—আর সানন্দে আবিষ্কার করেছি, ডেভিড দারুণ রান্না করে, খুব খাওয়াতে ভালোবাসে। দারুণ ছবিও আঁকে।)

যে যার বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলুম, ডেভিড গেল তার কাজে, আমার হাতে তখনও খানিকটা সময় আছে। আর মনে অসীম কৌতূহল।

অতএব হাঁটতে শুরু করি সুলতান সুলেইমান ধরে ডামাস্কস গেট-এর দিকে। ইচ্ছেটা, হেঁটে হেঁটে মিশকেনট শা'আনানিমে পৌঁছে যাওয়া। মিশকেনট একটি সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান জেরুসালেমে। বিশিষ্ট শিল্পী, লেখক, পণ্ডিত, গবেষকদের আহ্বান করে এনে আতিথ্য দেয়। তিন বছর অন্তর আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলন করছে কিছুকাল যাবৎ। এটি তৃতীয়। ভারতবর্ষের অংশগ্রহণ এই প্রথম। সাধে কি বলেছি, আমার দারুণ কপাল ভালো? মিশকেনট খুব দামী পাড়াতে, ডেভিড হামেলেখ রাস্তায়, পথ সোজাসুজি বলেই তো মনে হয়েছিল, যদিও সঙ্গে না আছে ম্যাপ, না ভায়াগ্রা।

হাঁটছি তো, ঠিক যেন গড়িয়াহাটের ভিড়। ফুটপাতে গিজগিজ করছে মানুষ আর মাটিতে বেসাতি নিয়ে হকাররা বসেছে। আইসক্রিম খেতে খেতে দুটো ছেলে যাচ্ছে, আমার গায়ে যে

BanglaBook.org

বানিকটা আইসক্রিম গড়িয়ে পড়লো ধাক্কা লেগে, তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই ঠিক যেন দেশের বোকারা! এটা যে এশীয় অঞ্চল টের পেতে সময় লাগে না

অস্বীকার করবো না ইজরায়েল আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিংবদন্তী, ইতিহাস আর প্রকৃতির যুগপৎ আক্রমণে আমি কাত—ছাত্রবয়সের ইজরায়েল-অ্যালার্জি উবে গেছে। আজ হোসেন-মহম্মদ-হাইমান-নাদিয়াদের সঙ্গে দেখা হবার পরে ভুলতে পারছি না, যতই মোহিনী হোক এ দেশ বড়ই জটিল। বড় কঠিন ঠাঁই। এই জট আমাদের ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ-শ্রীলংকা সুবিশাল জটের চেয়ে তীব্রতর, কঠোরতর। এই দ্বৈত ঘৃণার ইতিহাস কিংবদন্তীর কাল থেকে এদেশের মানুষের চিত্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

মন ভালো লাগছিলো না। যদিও আমার ইজরায়েল যাত্রা আরাফত ও র‍্যাবিনের নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণের পরবর্তী ঘটনা—কিন্তু শান্তি কোথায়? যুদ্ধ না চলা মানেই কি শান্তি? ইহুদি তরুণ-তরুণীদের আর্মি ট্রেনিং বাধ্যকরী (আরব তরুণ-তরুণীদের কিন্তু সেটা দেওয়া হয় না)—এই তরুণ মিলিটারি ইহুদিকুল পথেঘাটে বাসে রেস্তরাঁয় সর্বত্র উদ্যত বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়ান। তাঁদের দেশের এটাই আইন। এতে কি শান্তি আসে? এক দলের ঘাড়ে বন্দুক, আরেক দল নিরস্ত্র—, এতে কি পারস্পরিক বিশ্বাস সম্ভব? মৈত্রী দূর অস্ত!

আমরা যারা প্রায় "ইজরায়েল" রাষ্ট্রের কাছাকাছি বয়সী, আমাদের মধ্যে এই রাষ্ট্রটির প্রতি একটা মিশ্র অনুভূতি ছিল বরাবর। এক দিকে হলোকস্টের ভয়াবহতা, এক উন্মাদের পরিপাটি ব্যবস্থায় ষাট লক্ষ ইহুদির প্রাণনাশ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বীভৎস, অমানুষিক কাহিনী, অ্যানি ফ্রাংকের ডায়েরি, প্রিমোলেভির লেখাগুলি—নুরেমবার্গ বিচার, আইখম্যান বিচার এসবের মধ্যে আমাদের বড় হওয়া।—মন থেকে আমরা জার্মানিকে কখনও ক্ষমা করতে পেরেছি কি?

অন্য দিকে শিশুরাষ্ট্র ইজরায়েলকে প্রথম থেকেই আমরা জেনেছি যুদ্ধবাজ, রাজনীতির দিক থেকে প্রচণ্ড দক্ষিণপন্থী, এমনকি রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে প্রায় বর্ণবিদ্বেষী (রেসিস্ট) আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। উদ্দাম 'জায়োনিস্ট'দের কল্যাণে নবীন রাষ্ট্রের সদর্থক দিকগুলি চাপা পড়েছিল, দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর ভোট। এক দিকে যত বামপন্থী রাষ্ট্র আর যত গরিব দেশ, তৃতীয় বিশ্বের সব ভোট। আর তাদের সঙ্গে ছিল তেল-ধনে-ধনী আরব-রাষ্ট্রগুলি। অন্য দিকে কারা? বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলির সাদা মানুষের ধনী রাষ্ট্রের ভোট। কিন্তু সাদা মানুষের অনেক রাষ্ট্রই ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল। তাই বিশ্বসভায় রাষ্ট্রপুঞ্জে হেরে গিয়েছিল ইজরায়েলের আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা। ইতিহাসের কত বড় বিদ্রূপ "রেসিস্ট" দুর্নাম রটে গেল তাদেরই, পশ্চিমি সভ্যতার ইতিহাসে যারা রেসিজম-এর উৎকটতম শিকার। কিন্তু যা রটে তা কিছু বটে!

ফলে আমাদের মধ্যে ইহুদি-প্রীতির গভীরতা থাকলেও, "ইজরায়েল"-প্রীতি ছিল না। আমাদের কাছে "ইহুদি" আর "ইজরায়েল" এক ছিল না। বরং বিচিত্র এক বিচ্ছিন্নতা ছিল। মাথার মধ্যে শব্দ দুটিতে একটির প্রতি গভীর মমতা, নৈতিক দায়িত্ববোধ, আর অন্যটির প্রতি স্পষ্ট অপ্রীতি। তখন পৃথিবীতে ইজরায়েল ছিল আমেরিকারই হাতনুড়কুং। বামপন্থী ইহুদিদের মধ্যেও তখন ইজরায়েল-প্রীতি ছিল না। আমার বিদেশে ছাত্রবয়সের অভিজ্ঞতায় দেখেছি অধিকাংশ বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের সঙ্গে—ইংলণ্ডে, আমেরিকায়। বোধহয় তারা সর্বত্রই নিজেদের "বহিরাগত" মনে করে বলে। আর আমি তো "বহিরাগত"ই তাই মনের মিল হয়ে যেত আর বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রধানত বামপন্থী ইহুদিদের দেখা মিলত। কউকেই দেখতুম না ইজরায়েলে যাবার কথা ভাবতে। আশ্চর্যভাবে এখন দিনকাল পালটেছে। সেই ইহুদি-বন্ধুদের মধ্যে ধর্মভাব জেগেছে অনেকের, যেমন ঘটছে হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের মধ্যেও। মৌলবাদ যে কেমন করে

নিঃসাড়ে বিষাক্ত শিকড় সম্প্রসারণ করে আত্মার দখল নিয়ে নেয়, তা বোঝা কঠিন। বড় ভুতুড়ে ব্যাপার!

ইজরায়েলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি গত কয়েক বছর হল। যখন থেকে কিছু ব্যক্তিগত ইজরায়েলি বন্ধু হয়েছেন, তাঁদের দেখে শিখেছি সব ইজরায়েলিই মৌলবাদী নন, সব ইজরায়েলিই আরব-বিদ্বেষী নন, ইজরায়েলে প্রচুর খোলামনের বামপন্থী মানুষ এখন রয়েছেন—ছাত্র, শিক্ষক, কবি, শিল্পী। দিনকাল সব অর্থেই পালটেছে। ইজরায়েলেই এখন অনেক ইহুদি আছেন যাঁরা আরবদের শুভার্থী, যাঁরা প্রকৃত অর্থেই শান্তি চান।

ইজরায়েলে খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি সর্বত্র আমাকে প্রশ্ন করা হত, কবিতা উৎসবের পরে আমি কেন হিব্রু শিখতে উলপাম আকিভাতে যাচ্ছি? কেন হিব্রু? সত্যিই তো, দুটি কারণে। পৃথিবীর "ক্ষুদ্রতম গণতন্ত্র"টি কীভাবে চলে একটু জানতে ইচ্ছে ছিল। "বৃহত্তম গণতন্ত্র" যে কীভাবে চলছে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি এটা বুঝতে হলে কবিতা উৎসবের দশ দিন যথেষ্ট নয়। সেখানে তো মেলামেশা বিদেশি কবিদের সঙ্গে মিরেব্লাভ হলুব, গলওয়ে কিনেল, লুসিল ক্লিফটন, জন সিলকিন—ওদেশি কবিরাও রয়েছেন, অমিহাই, নাতান ৎজাক্, ইংসহাক লাঅর, ইজরায়েল হার, নীলা কাউফম্যান আরও অজস্র কবি। কিন্তু কবিদের দিয়ে কি একটা গণতন্ত্রকে চেনা সম্ভব? আজ্ঞে না। কবিদের একটা অন্য গণতন্ত্র আছে। নাতান ৎজাককে দেখে খুব চেনা মনে হল। অবিকল শক্তি। চেহারাটা একদম আলাদা। ভাষাটা হিব্রু। স্বভাবটা যমজ ভায়ের মতন। আর স্বদেশী পাঠকের ভালোবাসাও পান তেমনি। যা হোক কবিতা উৎসবের কথা আজ নয়, অন্যদিন। কিছুদিন থাকার ইচ্ছে ছিল ইজরায়েলে। দেশটাকে চিনতে। কেন চেনার ইচ্ছে? কিসের কৌতূহল আমার? দুটো। প্রথমত, দেশ-বিদেশের ভিন্ন জাতের, ভিন্ন পাতের, ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন ভাষার আলাদা আলাদা এসে পড়া মানুষগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে, কেবল একমাত্র ইহুদি ধর্মের বাঁধনে বেঁধে, যে "প্রতিশ্রুত স্বদেশ"টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা কেমন শক্তপোক্ত? কী করে এরা "এক জাতি-এক প্রাণ-একতা"র উদাহরণ হয়ে বসবাস করছেন একটা নতুন দেশে এসে, যেটা তাঁদের পুরনো দেশ? দ্বিতীয়ত, অতি প্রাচীন একটি ভাষাকে (এঁরা বলেন পাঁচ হাজার বছর?) যেটি বহুকাল ধরে কেবল ধর্মশাস্ত্রের ভাষাতে পর্যবসিত হয়েছিল, তাকে ধর্মের সিন্দুক থেকে বের করে, ঝেড়ে ঝুড়ে, ইস্ত্রি চালিয়ে, রিপুকর্ম করে, হাট-বাজার, অফিস-ইস্কুল, সিনেমা-থিয়েটার, আড্ডা-প্রেম, আদালত-বরবরকগজ, রেডিও-টিভির ভাষা করে তুলতে পারলেন? গল্প-গান কবিতা-নাটকের ভাষা? সংস্কৃতর পাশাপাশি লাতিনের পাশাপাশি হিব্রুকে রেখে দেখলে, অবিশ্বাস্য মনে হয় এই অসামান্য দক্ষতা। আধুনিক ইজরায়েলের প্রতি এই দুটিই আমার প্রধান ঔৎসুক্য। আর কিংবদন্তীর দেশ, বাইবেলের "দুধ-মধুর রাজ্য", যিশুর দেশ—বেদুইনদেরও দেশ—এর প্রতি আমার আশৈশবের মুগ্ধতা!

পথের ধারে কত কিছু বিছিয়ে মাটিতে বসেছে ফিরিওয়ালারা। নারী, পুরুষ। যে যার সওদা হাঁকছে। খদ্দের ডাকছে। মেয়েরা কিন্তু চেঁচাচ্ছে না, মেয়েরা প্রধানত বসেছে ফলমূল শাকসবজি নিয়ে। আমার চেনা ফল, চেনা সবজি দেখে এগিয়ে গিয়েই হল মুশকিল। কিনে তো লাভ নেই। মিশ্‌কেনটে যা খেতে দেওয়া হয়, ফুরোতে পারি না। কিন্তু শাড়ির প্রান্ত চেপে ধরে টানে যে! এ-পাড়াতে শুনেছি পকেটমার হয়। শক্ত করে ঝোলাটি আঁকড়ে আছি।

রাস্তায় ঢেলে জামাকাপড় টি-শার্ট বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে চটি বই। ওঁচা ছবি। হঠাৎ দেখি অমিতাভ। হ্যাঁ, ফুটপাতে শাহেনশা বচ্চনের ছবি। জেরুসালেমের ফুটপাতে অমিতাভর সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই আনন্দ হলো বলা বাহুল্য। তখন কি জানি, এরপরেই দেখবো ফুটপাতে ঢেলে ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে, এবং সেখানে আছে অসংখ্য হিন্দি ছবি। "হাম আপকে হ্যায়

BanglaBook.org

কৌন" পর্যন্ত এসে গেছে। অমিতাভ ছাড়া আছেন জ্যাকি শ্রফ, শাহরুখ খান এবং ভিড়ের মধ্যে আহ্লাদের সঙ্গে আমি আবিষ্কার করি দেবানন্দের চিরযৌবনের সেই পরিচিত দুষ্টু হাসি, দিলীপকুমারের সেই চেনা উদাস সুদূর দৃষ্টি, রাজকাপুর-নার্গিস, রেখা, হেমা মালিনী। সেই ক্যাসেটের দোকানের মালিকের আমাকে দেখে কী যে উল্লাস জাগলো, যেন কতদিনের চেনা বান্ধবীকে ফিরে পেয়েছে! একের পরে এক ক্যাসেট তুলে আমাকে দেখায় আর অজানা ভাষাতে কিনতে বলে।

এতক্ষণে আমার খেয়াল হলো, জেরুসালেমে আমি আজ পর্যন্ত একটিও ভারতীয় মুখ দেখিনি, একটিও শাড়ি পরা মেয়ে দেখিনি শহরের পথেঘাটে কোথাও, অথচ কোন অস্বস্তি বোধ করিনি হেঁটে বেড়াতে। কাউকেই আমার দিকে অবাক্-অবাক্ চোখে চেয়ে থাকতে দেখিনি। যেমন ঘটেছিল স্পেনে একা একা ঘোরার সময়ে গত বছরে, অথবা ইতালির গ্রামে ১৯৯৩-তে। অবাক হবে কেন? এরা তো অনবরতই শাড়ি পরা মেয়েদের দেখছে! তারা নাচছে, গাইছে, গাছ ধরে ঘুরছে, হাপুসনয়নে কাঁদছে, প্রবল পরাক্রমে প্রেম করছে। আমি তো কেবল হাঁটছি। এ আর দেখবার কী আছে! (তায় গায়ের কাপড় গায়েই রয়েছে!—)

একের পর এক থামের সারি দেওয়া গাড়িবারান্দার তলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি—পথে ঠেলাগাড়িতে ঝল ঢেলে বিক্রি হচ্ছে—পিতল, পাথর, পুঁতির গয়না, নানারকমের সুন্দর সুন্দর কৌটো, পেতলের বাসন, কত কী—দেখতে দেখতে যাচ্ছি—হঠাৎ "গুড আফটারনুন, মাদাম।"—চমকে উঠি। কে? একটি থামের পাশ থেকে এগিয়ে আসে একটি যুবক। লম্বা মতন। সুশ্রী জিনস্-টি-শার্ট। আলখাল্লা নয়। —"ইউ ফ্রম ইণ্ডিয়া?" আমি বলি, হ্যাঁ।

—"আই ওয়াজ ইন ইণ্ডিয়া। ইন বম্বে।" শুনেছি ইদানীং ইজরায়েলি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ভারতবর্ষ-ভ্রমণে যাবার হিড়িক লেগেছে। এখানে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ফলে ছেলেমেয়েরা আত্মার শান্তির খোঁজে ছুটে যাচ্ছে ইণ্ডিয়াতে। বাবা-মায়েদের সেটা পছন্দ নয়। ("কেন? ইজরায়েলে বুঝি তোমাদের আধ্যাত্মিক আশ্রয় নেই? পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতায়? বললেই হল? পেগান ইণ্ডিয়ার কী আছে, যা ইজরায়েলের নেই?") এ নিশ্চয় সেই ছেলেদের কেউ। এরা নেপালে যায়, গাঁজা খেতে শেখে, দিল্লি-আগ্রা-গোয়া ঘুরে বেড়ায়। ফিরতে চায় না দেশে। কিন্তু এ তো বলছে 'বম্বে'। ছেলেটি আমার পাশে পাশে হাঁটছে। ইংরিজি ভাষার প্রতি আমার বিদেশে গেলেই একটা কেমন অস্বাস্থ্যকর প্রীতি জন্মায়। ভাষার আড়ালটা মাঝে মাঝে ধস নামার মতো মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয় কিনা। সে বাধা অতিক্রম করার পন্থাও অবশ্য জীবজগতে আছে। সেও সত্য বটে, তবু আহ্লাদিত প্রাণে প্রশ্ন করি—"কী করছিলেন বম্বেতে?" "সেইলর।" এক কথার উত্তর। এবং তার পরেই "মি, রহমান। ইউ? ইউ অ্যালোন?" নিদেনে কেউ এই প্রশ্নটা আমাকে করলেই আমি সাবধান হয়ে পড়ি। এবং একাই একশো হয়ে যাই। "সঙ্গে কেউ নেই।" এই উত্তরটা সর্বনেশে। তাই বলি—"আমরা তো একটা দল এসেছি। ইজরায়েলের সরকারী নিমন্ত্রণে।" ভাবলুম খুব বুঝি একটা ওজনদার উত্তর দিয়েছি। তাতে ছেলেটি বলল—"আই লাভ ইউ।" আমি ভাবলুম ভুল শুনেছি। চমকে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে নির্বিকার চিত্তে আবার বলল—"আই লাভ ইউ। ইউ লাভ মি? ইয়েস!" একটু সপ্রতিভ দত্ত টাইপের চেহারা। কেবল চুলটা লালচে, চোখটা নীলচে, চামড়াটা গোলাপি। মরুভূমির বেদুইনরা কি এখন সমুদ্রের নাবিক হয়? রহমান কি ড্রাগ-অ্যাডিক্ট? ও কি ঘোরের মধ্যে রয়েছে? মনে হচ্ছে ও আসলে ফিউচার টেনসেই কথা বলতে চায়—আমাকে ওর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করছে না, উদ্দেশ্যটা জ্ঞাপন করছে। আমাকে "কুপ্রস্তাব" দিচ্ছে।

—"নো। আই ডোন্ট লাভ ইয়ু।"

BanglaBook.org

স্বকর্ণে শুনলাম, এই সহজ উত্তরটি চটপট খুবই সহজ গলায় আমি দিচ্ছি। হাঁটতে হাঁটতে। স্পীড বাড়িয়ে ফেলেছি। আর চমকিত মন চকিত নয়নে ট্যাক্সি খুঁজছি। রহমানও স্পীড বাড়িয়েছে। অতএব আমি রাস্তায় নেমে পড়ি। মস্ত বড় গাড়িঘোড়া-ভর্তি রাস্তাটা খুব মন দিয়ে ক্রস করতে থাকি। ওই তো ওই ফুটপাতে, তমাস্কাস গেটের ওদিকেই ঈশ্বরের করুণা-হস্তের মতো একটি ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে!

দ্রুতগতিতে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসি। ড্রাইভার প্রশ্নালু চোখে চায়।

—"মিশকেনট শ' আনানিম। ওই যে উইণ্ডমিলের কাছে ডেভিড হ্যামেলেখ্ রাস্তা—"

—"জানি, জানি। পোয়েট্রি ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে।" —মধ্যবয়সী। কাঁচাপাকা চুল। গম্ভীর। তার জ্ঞানের ব্যাপ্তিতে মুগ্ধ হই আমি। তবু বলি, "এখান থেকে দশ শেকেলে হয়।"

—"কে বলল?"

—"আমি জানি। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে।" আমার জ্ঞানের ব্যাপ্তি তাকে মুগ্ধ করে না।

—"পনেরো।"

—"থামান। নেবে যাই।"

—"বারো।"

—"থামান মশাই, থামান। আমি অন্য গাড়ি নেবো।"

গাড়ি থামে না। ড্রাইভার বলে, "আমার নাম এবি। আপনার নাম কী? আমাকে অবশ্য আবুও বলতে পারেন।"

—"আমি নবনীতা।" অত্যন্ত অবাক হয়ে উত্তর দিই। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সঙ্গে সেধে সেধে গল্প করা আমার চিরকেলে স্বভাব। কি কলকাতায়, কি ফ্রিবুর্গে, কি লণ্ডনে, কি নিউইয়র্কে: কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারই সেধে সেধে আমাকে নিজের নাম বলছে, আমার নামও জানতে চাইছে, এ বস্তু ঘটেনি আগে আমার জীবনে।

অন্য ব্যাপার অবশ্য ঘটেছে। গত বছরই নিউ ইয়র্কে দুপুরবেলায় মেট্রোপলিটান মিউজিয়মে এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। অ্যাপ্রেন্টা অ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে আসছি, (স্প্যানিশ এমব্যাসি থেকে ভিসা নিয়ে) দেরি হয়েছে, তাই বাধা হয়েই ট্যাক্সি নিয়েছি। ড্রাইভারকে দেখে মনে হল আমাদের সিন্ধি ছেলে। সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম—"আচ্ছা, এখান থেকে কত টাকা হবে? পাঁচ ডলারের মধ্যে হবে তো?" ছেলেটি বলল—"ওই পাঁচ ডলারই হবে।" আমি তো বক্তিয়ার খিলজী। (কেবল বক্তৃতা দিতে বললেই কথা বুঝে পাই না এই যা!) আমি বললুম—"আপনি কি পাকিস্তানী? ছেলেটি বলল—"না। আমি বাংলাদেশী।" ব্যস, তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। বাংলাতেই বললুম—"আমি অধ্যাপনা করি কলকাতাতে। আমার দুটি মেয়ে আছে। আপনার পরিবারে কে কে আছেন?"

সে তৎক্ষণাৎ গ্লভ কমপার্টমেন্ট থেকে একটা খাম বের করে দেখালো একটি শিশুর দুটি ছবি। —"আমার ছেলে, তন্ময়।" তারপর সলজ্জভাবে গাড়ির চাবির ঝুলন্ত রিংটা উল্টে দেখাতে চেষ্টা করলো, তাতে প্লাস্টিকের মধ্যে একটি মেয়ের রঙিন ছবি—"মণি, আমার স্ত্রী।"

—"এরা সবাই কোথায়?"

—"এতদিন দেশেই ছিল, ঢাকার কাছেই আমাদের গ্রামে। আট মাস হলো নিয়ে এসেছি। এখন নিউ ইয়র্কে।" ছেলেটির নাম তৈবুর রহমান। তৈমুরই শুনেছি, তৈবুর এই প্রথম শুনছি। গল্প করতে করতেই মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম এসে গেল। মিটারে পাঁচ ডলার। আমি নোটটা হাতে ধরেই ছিলুম। কাচের ফাঁক দিয়ে ওর হাতে তুলে দেবার আগেই তৈবুর আমার হাতে দুটো এক ডলারের নোট গুঁজে দিল।

BanglaBook.org

—"ভাঙানি তো পাবার কথা নয়?"

—"এইটা আপনার ভাই দিচ্ছে, দিদি, একটা হ্যামবার্গার আর কোক খেয়ে নেবেন আমার নাম করে।"

আমার চোখে কি জল এসেছিল?. মেট্রোপলিটানের সামনে অনেক ঠেলাগাড়িতে হটডগ বুথ আছে, এক পঁচিশে হটডগ, আর পঁচাত্তরে কোক খেয়েছিলুম। তৈবুরের খাওয়ানো লাঞ্চ। তার ঠিকানা জানি না। জানি না এই লেখা তার চোখে পড়বে কিনা। তবে ট্যাক্সি ড্রাইভার যে খুশি হয়ে প্যাসেঞ্জারকে টিপ্‌স দেয়, সেটা দেখলুম জীবনে সেই প্রথম!

এই জেরুজালেমের ড্রাইভার কি আরেক তৈবুর? আবু ওরফে এবি বলে, "তুমি মিশ্‌কেনটে কী করছ?"

—"কবিতা পড়তে এসেছি।"

—"তুমিও কবি? ইনডিয়ার কবি?"

—"ওই হেলো!"

—"তুমি তবে একাই এসেছো?"

—"একা মানে কি? ওখানে তো কবি চল্লিশ জন"—

—"তোমার ঘরেই কি চল্লিশ জন কবি থাকে?"

আমি হেসে ফেলি।

এই হাসিটা চরম ভুল হয়। এবি বলে, "আমাকেও তোমার ঘরে নিয়ে চলো।"

—"কেন বল তো?"

—"দেখবো মিশ্‌কেনটের ভিতরটা কীরকম? কখনো যাইনি তো।"

—"অন্য দিন দেখো।"

—"কেন, আজই চল তোমার ঘরে আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াও। ট্যাক্সিভাড়াটা দিতে হবে না।—ফ্রী রাইড।"

—"এবি, এ ধরনের অনুরোধ আমাকে না করলেই খুশি হবো আমি এখন ব্যস্ত তা ছাড়া তোমার শহরে আমি অতিথি।"

হিন্দি ছবির ভিলেনের মতো মৃদু মৃদু হাসি খেলা করতে থাকে আবুর ঠোঁটে। আমি ওকে আয়নাতে দেখতে পাচ্ছি। তার মানে, আবুও আমার মুখখানা দিব্যি দেখছে। চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি—এবং ওই চোখ দুটো দেখে আমার ভেতর ডেভিল শরীরও কিঞ্চিৎ শীতল বোধ হলো। আবু বললো, "তাহলে চলো, আমার ডেরাতেই একটু আতিথেয়তা দিই তোমাকে?"

এখনও বড় রাস্তায় রয়েছি, চারিদিকে ভিড়।

—"প্লিজ স্টপ দা কার, আই ওয়ান্ট টু গেট আউট!"

—"কোথায় নামবে? মিশ্‌কেনট অনেক দূর!"

—"হোক দূর! তুমি থামাও।"

—"এখানে নামলেও দশ শেকেলই দিতে হবে।"

—"তুমি থামবে? আমি চেঁচাবো কিন্তু!"

চেঁচানোর আগেই ট্রফিক দেবতা আমার আবেদন শুনে লালবাতি দিয়ে দিলেন। সাধে বলি, আমি কখনও একা নই? মধুসূদনদাদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। ট্যাক্সি থামবামাত্র দরজা খুলে নেমে যাই: এবি চেঁচায়—"টাকা?"

ভাগ্যিস লাঞ্চের পরে ব্যাগে ভাঙানি আছে। জানলা দিয়ে শেকেল এক মুঠো প্রায় ছুঁড়ে দিই। পথে দাঁড়ানোও যে খুব মুশকিল। অন্য গাড়িরা মহাবিরক্ত হচ্ছে। বিদেশি ভূত বলেই

BanglaBook.org

না এইরকম অজায়গায়, আইন ভেঙে, স্বার্থপরের মতন নেমে যাচ্ছে ট্যাক্সি থেকে? নিজের সুবিধেমতন এভাবে কেউ নেমে পড়ে? নিয়মকানুন নেই? এ কী অসভ্যতা!

প্রবল বিক্রমে আলোতে দাঁড়িয়ে-থাকা গাড়িরা আমাকে বকুনি দেবার জন্যে হর্ন বাজাতে থাকে। তখন কে শোনে কার হর্ন? আধা-চোখ-খোলা, আধা-কান-খোলা, আধা-মন-বোজা অবস্থায় রাস্তা পার হতে থাকি। রাস্তাটা এত চওড়া? যেন গড়ের মাঠ, ফুরোতে আর চায় না—অচেনা গাড়িগুলোর অভদ্র হর্ন মাথার মধ্যে অবিরল কনকন করে বেজে যাচ্ছে।

মিশ্‌কেনটে পৌঁছে দেখি রেডিওর লোকজন এসে গেছে।

কাউন্টারের মেয়েটি বললে—"তোমার এক বন্ধু তোমার জন্যে এটা রেখে গেছেন।" সুন্দর কারুকাজ-করা মাটির ঘটে পোঁতা, সবুজ ফোয়ারার মতো পাতায় ঘেরা একটি উদ্ধত সাদা মঞ্জরী—সুগন্ধ সারাটা লাউঞ্জ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ঘটটি দু'হাতে জড়িয়ে নিজের ঘরের দিকে ফিরতে থাকি। কী গাছ? কী ফুল? দেখতে খুব চেনা চেনা, কিন্তু গন্ধটা চিনি না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে

।। উৎসর্গ ।।

স্বর্গত নবেন্দ্র দেব স্বর্গত আশুতোষ সেন

আজ যাঁরা নেই বলেই আমার এতাবে প্রয়াগযাত্রা সম্ভব হয়েছে, সেই দুই প্রযাত পিতাকে স্মরণ করি, স্নেহৈশ্বর্যে যাঁরা ছিলেন আমার পূর্ণকুম্ভ
আর স্মরণ করছি গঙ্গাদ্বীপের পথেঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া আমার সেই অজানা স্বজনদের যাঁদের কাছে আমি চিরঋণী এবং মনে করছি তাঁদের কথাও, যাবো-যাবো করেও যাঁদের কুম্ভে যাওয়া আজও হয়ে ওঠেনি

এঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে।

নবনীতা দেব সেন
১লা বৈশাখ
১৩৮৬

"আলোবাসা"
৭২ হিন্দুস্থান পার্ক
কলকাতা ৭০০০২৯

১

উদ্যোগ পর্ব

"এ্যাঁ? তুমিও কুম্ভে? কী কাণ্ড! তবে যে কাকীমা বললেন তুই হায়দ্রাবাদে সেমিনারে গেছিস, ন্যাশনাল ইন্‌টিগ্রেশন না কী সব নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিস?" এই দেড়দিন ফিরে অবধি অন্তত বিশবার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। মা বেচারীকে একটু ফল্‌স পজিশনে ফেলা হয়ে গেছে সত্যিই! ঠিকঠাক করে তো আর যাইনি, যে বলে-কয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে যাব? কাঁচুমাচু গলায় বলি, "হ্যাঁ, ঐ হায়দ্রাবাদের সেমিনারটা থেকেই ফেরবার পথে অমনি বড্ড ইচ্ছে হল, তাই টুক করে একটু কুম্ভমেলাতে'—" বলেই শেষ হয়ে গেছি! "ইচ্ছে হল অমনি টুক করে কুম্ভ-মেলায় একটু? বলি ঘরে ফেরবার সিধে পথ কি ঐটে? কবে থেকে হায়দ্রাবাদের পথে এলাহাবাদটা পড়েছে? কাকীমা এদিকে ভেবে ভেবে অস্থির...ছি ছি ছি'..." দূর ছাই! কৈফিয়ত দিতে দিতে মাথা খারাপ হয়ে গেল। তাও তো এখনো কর্মস্থলে মুখপ্রদর্শন করিনি। সেখানে আরেক দফা রিপিট-প্রোগ্রাম হবে। গেছি তো গেছি। বেশ করেছি! তোমাদের তাতে কি? পাপকার্যে নিরত তো হইনি। গেছি পুণ্যকর্মেই। তাতেও এত কথা? কোথায় তীর্থ করে এলাম আমাকে যত্ন করে পা ধুইয়ে দেবার কথা, তা নয়, ফিরে অবধি আপাদ-মস্তক আড়ং ধোলাই চলছে। এর চেয়ে বাপু পাপটাপ করা অনেক সোজা হতো। প্রথমত, লোকে জানতেও পারতো না। দ্বিতীয়ত, যদি বা জেনে ফেলতো, কেউ কৈফিয়ত চাইতো না, কেননা ওটা সবাই বোঝে। ওতে লোকে অবাক হয় না, ওটা মনুষ্যধর্ম, এক্সপেক্‌টেড্ অ্যাকশন। কিন্তু হঠাৎ কুম্ভ? না বলে-কয়ে? এত বড়ো আস্পর্ধা! কই ছেলেদের বেলায় তো কেউ কিছু প্রশ্ন তোলে না? এই যে পড়ি, নীললোহিতবাবু যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ান, তাঁকে কি বাড়ির বড়োরা কেউ কিছু বলে? শুধু আমার বেলাতেই—? নেহাত মেয়ে বলেই এত কিছু বলে? শুধু আমার বেলাতেই—? নেহাত মেয়ে বলেই এত কথা? রেগে-মেগে চুপ করে থাকি। —"তা হঠাৎ কুম্ভে যে? ভালো দল পেয়ে গেছিলি বুঝি হঠাৎ?" —দল! "দল পাবো কোথায়?" —"তার মানে? তুই—তুই...এ্যাঁ? বলিস কি? একা একাই...?" বড়দার বাকি বাক্য লোপ হয়ে গেল। আর তাই দেখে আমার ধড়ে প্রাণ সঞ্চার হল। —"নয়তো কি, দোকা পাবি কোথেকে?" —"এই মরণ ভিড়ে, বিনা ব্যবস্থায়, এক কোটি মানুষের মধ্যে একদম একলাটি...হ্যাঁ রে খুকু, তুই কি পাগল?" পাগল আমি কেন হবো? যে বলে "এককোটি মানুষের মধ্যে একদম একলাটি", পাগল তো সে ই! না, উইমেন্স লিব-টিব এদেশে অদ্যাপি দূর অস্ত! যদিও, শিক্ষিত মেয়েদের একা ভ্রমণের পক্ষে এত নিরাপদ, এত সুসভ্য সমাজ আমাদের এই গরীব দেশটির তুলনায় পৃথিবীতে আর একটাও আছে কিনা জানি না। অবিশ্যি আমার নিজের কথা দিয়ে বিচার করা হয়তো খুব ঠিক নয়, কেননা আমি সর্বত্রগামী, মুক্তকচ্ছ জীববিশেষ। সেই জন্মাবার সময় যা 'হিন্দু ফিমেল' ছিলাম, আবার মরবার পরে হবো। ইতিমধ্যে আমি হিন্দুও নই, ফিমেলও নই, ধর্মভীরু ভারতীয় মাত্র। অর্থাৎ মুক্তপ্রাণী। আমাকে ডাকে হরি তো রাখে কে?

গল্পটা গোড়া থেকেই বলা যাক।

সেমিনারে-টেমিনারে বক্তৃতা দিতে যাওয়া মানেই আরেক হাতা পাপ আঁচলের কোণে বেঁধে আনা। অথচ এ ক্ষেত্রে ঘটলো উল্‌টোটাই। কোত্থেকে কি হয়ে গেল! সেদিনটা ছিল পৌষসংক্রান্তি, ১৪ জানুয়ারি আমাকে হায়দ্রাবাদে যেতে হবে, বিকেলে প্লেন ধরার বেদম তাড়া, তার আগে টুকিটাকি একশোটা কাজ শেষ করতে হবে—ব্যাংক, র‍্যাশন, মেয়েদের নতুন ক্লাসের বইখাতা, মার ডাক্তার-ওষুধ, তদুপরি একটা ডিপার্টমেন্টাল মিটিং আছে ১-৪০এ...এবং পেপারটা যথারীতি

BanglaBook.org

টাইপিং অসমাপ্ত। এরই মধ্যে বেলা দশটায় গলায় কণ্ফর্টার, পায়ে বুট জুতো, পরনে ধুতির ওপর কোট এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক এলেন, আমার সঙ্গে—"সাহিত্য বিষয়ে আলাপ আলোচনায় সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে।" গ্রামাঞ্চল থেকে কষ্ট করে আমার বাড়িতে এসেছেন, আমার মহাসৌভাগ্য, কিন্তু সময় যে সত্যিই নেই? অতএব বলি "আজ বরং আলাপটুকুই থাকুক, আমি ফিরে এলে পরে আলোচনাটা হবে এমন আরেকদিন?" তিনি বললেন—"যাচ্ছেন কোথায়? কুম্ভে বুঝি? হ্যাঁ, মৌনী আমাবস্যে তো এসে পড়ল। উনিশে।" সেই পড়ে গেল মগজের মধ্যে টেয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি কক্সের বিপুল ঘণ্টায় ঘা...ঢং ঢং করে তার প্রতিধ্বনি বাজতেই লাগলো স্নায়ুতন্ত্রে। ভদ্রলোক যেন দৈববাণী করলেন। আরে? সত্যিই তো। কোথায় যাচ্ছি? কোথায় যাচ্ছি আমি? কুম্ভে কেন নয়? এক যুগ পেরিয়ে যে পূর্ণকুম্ভের মহাযোগ হয়—আমি তো ছুটি নিয়ে ১৭ই অবধি বাইরে থাকছিই, ১৮ই না ফিরে ২০শে ফেরা যায় না? কেন যাবে না? পথে কুম্ভ নাইবা পড়ল—পথ তো কেটে নিলেই পথ, পথ খুঁজে নিলেই পথ।—মাকে বলতেই মা বললেন, —"যাবি না কেন, যা না, তবে একা যেতে দেবো না।" কি মুশকিল! এখন সঙ্গী পাই কোথায়? তার সময় কই? আজই যে বেরুচ্ছি তিনটের সময়ে। তখন মা বললেন আমার এক কাকাবাবুর কথা। যদি খুড়িমার কাছে এলাহাবাদে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়, তবেই আমাকে একা যেতে দেবেন। কাকাবাবু জানালেন তিনি অসহায়—হাঁই নাই হাঁই নাই ছোটো সে বাড়ি, ভি. আই. পি. যাত্রীতে গিয়াছে ভরি! অবশ্য আমি একটা ফরম্যাল লিখিত আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেখতে পারি। হায় রে পিতা-পিতৃব্যের অক্ষম স্নেহ! হায় আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গৃহস্থালি! একরাত্রির জন্যও যেখানে আমরা স্নেহাস্পদ লঘুজনের ঠাঁই করে দিতে পারি না! অবশ্য আমার যে অতিদূর ভবিষ্যতেও কদাচ ভি. আই. পি. হবার সম্ভাবনা নেই, তা এতই স্পষ্ট যে এ নিয়ে আমি কাউকে সত্যি দোষ দিতে পারি না। মা ভয় পেয়ে বললেন—"হল না? সে কি রে? তবে দ্যাখ যদি কোনো প্রেস-ট্রেস থেকে অফিসিয়াল একটা সিকিওরি যোগাড় করতে পারিস!" —দেখলাম দু'চার জায়গায় ফোনটোন করে। এ ব্যাপারে বলা মানেই শুভার্থীদের বিব্রত করা—ওসবের জন্য প্রস্তুতিপর্ব লাগে। প্রেসকার্ড কি ছেলের হাতের মোয়া? সবাই সাহায্যে প্রস্তুত, ঘোঁতঘাত অনেক বলে দিলেন, কিন্তু আমারই কেমন লজ্জা করল দ্বারস্থ হতে। যাদের সুখে-দুঃখে গিয়ে দাঁড়াই না, প্রয়োজনে কেমন করে বলি? যাকগে। যেতে হলে একলাই যাব। সেই তো ভালো। অবশ্য মাকে একুনি সেটা বলা চলবে না, ভয় তো পেয়েই আছেন সর্বদা! মায়েরা তো গুরুজন না, ভীরুজন!

এই সব করতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে সময় পালালো। সবগুলো কাজ নয় হলো, একে ওকে তাকে বকেয়া কাজকর্মগুলোর ভার বিলি করে দিয়ে তিনটের সময় রওনা হলুম দমদমে—সুটকেস রইল হায়দ্রাবাদের জন্য গোছানো, মন রইল কুম্ভস্নানের জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু তার জন্যে যে কাপড়গামছা লাগে, গঙ্গাদ্বীপে যে ভীষণ ঠাণ্ডা, মেলায় যে ভীষণ ধুলো-ময়লা, এসব কিছুই মনে পড়ল না। আমার মনের ভিতর তখন একটা খোলা বাতাস বইছে—অনেক দূরের বাতাসে সব বন্ধ দরজাগুলো আপনা থেকে খুলে যায়। আর অমনিতে মাথার মধ্যে খোলা দোর-জানলাগুলো সব বুজে যায়।

ট্যাক্সি ছাড়ছে, মা তখনও বলছেন—"খুকু, পাগলামি করবি না বাবা, একে তোর অ্যানার্জির ধাত, মেলাটেলায় ভয়ংকর ধুলো (আসলে আমার দারুণ হাঁপানি, মা বলেন অ্যাস্মার্জি), তায় এই ব্রঙ্কাইটিস থেকে উঠলি—বাঁ-পাটা সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়ে মচকে ফুলে রয়েছে—প্রেসারটাও হাই—এই অল্পবয়সী মেয়ে, একলা ওই ভয়ংকর ভিড়ের ভিতর যাবার কথা চিন্তাও কোরো না খবরদার"... অর্থাৎ সব বয়েসের যাবতীয় রোগটোগ, বাত-হাঁপানি-প্রেসার, আবার ওদিকে যৌবন-টৌবন—বেচারী মা একা কতদিক সামলাবেন? তাঁর যুবতী কন্যাটি যেন সেই মেঘদূতের

BanglaBook.org

যক্ষপুরী, যেখানে সব ঋতুর ফুল একসঙ্গে ফুটেছে। এ কী দুর্দৈব বল দেখি!

২

আবুহোসেন পর্ব

হায়দ্রাবাদে নেমে দেখি কেরা তাজ্জব কী বাত! অন্ধ্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি. ভি. নরসিংহরাও স্বয়ং ও প্রচুর হোমরাচোমরা হাজির। (সবাই অবশ্য প্রাক্তন! যথা, সোমালিয়ার প্রাক্তন অ্যামবাসাডর, হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন মেয়র, ইত্যাদি)। এঁরা কি আমাকেই নিতে এসেছেন নাকি? নিশ্চয়ই না। নিশ্চয়ই এই সঙ্গে কোনো (প্রাক্তন) ডি. আই. পি,-ও আসছেন। নমস্কার। নমস্কার। ওমা, একি, এঁরা আমাকেই নিয়ে গিয়ে ডি. আই. পি. লাউঞ্জে বসাচ্ছেন যে!—চা?—কফি?—না না, কিছু চাই না। তবে কি সোজাই গেস্ট হাউসে? বেশ বেশ। —আমার বয়স ও ওজন দেখে এঁরা বেশ হতাশ হয়েছেন বোঝা গেল। এ আমার ললাটের লিখন চেহারাটায় কিছুতেই 'বাক্তিত্ব' ফোটে না! দর্শকের এ হতাশা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। বক্তৃতাটা একবার দিয়ে ফেলবার পরে অবশ্য এঁদের আর এরকম ভাবসাব থাকবে না, তাও জেনে গেছি।

গ্রীনল্যাণ্ডস্ গেস্টহাউসে গাড়ি ঢুকল। বিশাল সুরম্য প্রাসাদ। তার বিপুল আউট হাউসে একটি আরামকেদারায় মুণ্ডিতমস্তক এক গৈরিকধারী সন্ন্যাসী শুয়ে আছেন। কে উনি? শুনি উনিই সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু চমনলাল— বিখ্যাত 'হিন্দু আমেরিকা' বইয়ের লেখক, যিনি নানাভাবে প্রমাণ দেখিয়েছেন যে দক্ষিণ আমেরিকার সুপ্রাচীন মায়াআজটেক সভ্যতা, আসলে হিন্দু সভ্যতা। বইটি মার্কিন মুলুকে প্রচুর সাড়া জাগিয়েছে। মনটা উৎফুল্ল হল। বাঃ, প্রবেশপথেই পুণ্যসঞ্চয়, সাধুসন্দর্শন! গেস্ট হাউসের গাড়িবারান্দার সিঁড়ি থেকেই লাল গালিচা বিছোনো। হেড্‌বাবুর্চি অ্যাণ্টনি ও চার-পাঁচ জন কর্মচারী এসে সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানালো। ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ বাঁদিকে মস্ত ঘরের ভেতর খোলা দরজাপথে চেয়েই দেখি মুখবানি পাউডারে সাদা রং করা, লিপস্টিক পরা টুকটুকে ঠোঁটের ওপরে কার্তিক-মার্কা গোঁফ, তোরাকাটা কর্ডেরয়েটাইপ জামা গায়ে, বাবরিচুলো এক বিস্তৃত ভদ্রলোক ওঠ-বস জাতীয় কিছু একটা ব্যায়াম করছেন। খুব অবাক হয়ে গেলেও, স্টেট গেস্ট তো, যথাসাধ্য গাম্ভীর্য বজায় রেখে প্রশ্ন করলুম না। আবেকটু এগিয়ে দেখি বারান্দায় সোফার ওপরে একটি রংচঙে রূপযৌবনবতী স্খলিত-বসনা আলুলায়িত-কুন্তলা কেমন যেন আলুথালু হয়ে শুয়ে আছেন, এবং ঢুলু ঢুলু নয়নে আমাকেই নিরীক্ষণ করে দেখছেন। একজন আয়া তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। নাঃ, অতিথিশালার ব্যাপারস্যাপার ঠিক সুবিধার লাগছে না। কী জানি, এসব নিজামশাহী অঞ্চলের বানদানী কায়দাকানুন, আমি শহর কলকাতার উটকো মানুষ, কী বা জানি, কী বা বুঝি! আপাতদৃষ্টিতে করিডরে এই দৃশ্য খুবই বেয়ানান মনে হল, কিন্তু আমি বাবা স্পিকটি নট! কিছু জিজ্ঞেস করে বোকা হয়ে যাব আর কি! মুখে-চোখে যথাসাধ্য 'এ আর এমন কি, এ রকম আমরা কতে দেখেছি'—ভাবখানা আনবার চেষ্টা করে ডিগনিফায়েড পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকি। উঠতে উঠতে যেই আড়চোখে আরেকবার ঐদিকে চেয়ে ফেলেছি, অমনি অ্যাণ্টনি, বহুবাটের জল খাওয়া অতি চালু পার্টি ঝট করে বলে ওঠে—"স্যরি ম্যাম্, আজ তামিল ছবির শুটিং হচ্ছে কিনা, আমাদের বাগিচাতে সুইমিংপুলে প্রায়ই শুটিং হয়। এঁরা নায়ক-নায়িকা, নাউ রিল্যাক্সিং এ বিট্।" ও হরি, তাই বলো! এ কোথায় এসেছ, নবনীতা? ওপাশে আজটেক সভ্যতা নিয়ে বৌদ্ধভিক্ষু, এপাশে ওঠবস করে বিশ্রাম নিচ্ছেন তামিল নায়ক, মধ্যপথে তুমি শ্রীমতী! বাপ্ রে!

এ্যাঁ, এত বড়ো সুইটটা পুরো একা আমার? রাজকীয় কাণ্ডকারখানা! বিশাল ঘর, বাথরুম, অ্যান্টি চেম্বার, মস্ত মস্ত দু'খানা খাট (হায়রে! আমার কুচোকাচা মেয়ে দুটোকে আনলে কি মজাই হতো), মস্ত গোল ড্রেসিং টেবিল, এখানে আয়না, ওখানে আয়না, সেখানে আয়না, বাথরুমই বা কী! ঠাণ্ডাপানি গরমপানি পাখা এয়ারকনডিশনার সব কুছ হ্যায়। আধুনিক পাঁচতারা হোটেলের যাবতীয় সুবসুবিধা, সব। কিন্তু আরাম আয়েসের সুযোগ, অর্থাৎ স্পেসটা তার চেয়ে ঢের বেশি। এই ধরটাই তো কলকাতার যে কোনো মাইডস্টারের লবি হতে পারতো। অ্যান্টনি বলে—"টী? কফি?"

—"কফি, প্লীজ!" বলেই বুঝলুম বেজায় খিদে পেয়েছে। এত লম্বা একটা ট্রিপে এলুম কলকাতা থেকে হায়দ্রাবাদ—প্লেনে কিছুই খেতে দেননি মহামান্য সরকার। অ্যান্টনি নির্ঘাত থট্‌রিডিং জানে। সে বললে—"ডিনার কখন চাই? ইংলিশ ডিনার? বেঙ্গলী ডিনার? সিংহলীজ? চাইনিজ? আপ হুকুম ইয়ে হুম সার্ভ করেঙ্গে। মেরে পাস সব কিসিমকে কুক হ্যায়।" কী সর্বনাশ! রাঁধুনীর প্রদর্শনী নাকি! গুণীলোকে কুকবুক কালেক্ট করে, অ্যান্টনি যে দেখি জ্যান্ত কুক-কালেক্টর। চীনে, সিংহলী, আবার বাঙালীও?

—"অর অ্যান্টনি, তুমি? তুমি নিজে কী? গোয়ানিজ?" কালোমুখে ধবধবে হেসে উঠে অ্যান্টনি বলে—"নো ম্যাম। মি ম্যাড্রাসী। ট্যামিল। ক্রিশ্চান।" অ্যান্টনি এর আগে এক অ্যাম্বাসাডরের সঙ্গে ঘুরে এসেছে ওদিকে সাউথ আমেরিকা (নো স্পীকিং ইংলিশ নেয়ার ম্যাম! নো হিন্দি! অদার ল্যাংগুয়েজ) এবং এদিকে আফ্রিকা পর্যন্ত (ওনলি ব্লাক মান দেখার, ম্যাম, অল ব্লাক) "বাট নো কান্ট্রি মোর বিউটিফুল দ্যান ইন্ডিয়া ম্যাম। ও, ইয়েস।" -অ্যান্টনি কলকাতাতেও ছিল। বহুকাল আগে, কিশোর বয়সে। তখনও দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধেনি। অর্থাৎ এই শ্রীমতীর জন্ম হয়নি। —"লিভিং নিয়ার দি ময়দান ম্যাম। বিউটিফুল সিটি। বিকোর ওয়ার। মাই আংকল ওয়ার্কিং অ্যাট গ্র্যাণ্ড হোটেল ম্যাম। কালকাটা, ওনলি বিগ সিটি ইন ইণ্ডিয়া দ্যাট টাইম। নর্থ দিল্লি বম্বে বিগার দেন বি। বাট আই লাভ কালকাটা ম্যাম।"

আমিও কলকাতাকে ভালোবাসি, অ্যান্টনি। তোমার সঙ্গে এখানে আমার মিল।

ইংলিশ ডিনারের অর্ডার নিয়ে অ্যান্টনি চলে যেতেই কফি এনে দিল রুম বয়। কফি খেতে খেতে খাটে চিংপটাং হয়ে ঘরের শোভা পর্যবেক্ষণ করছি। বড়ো বড়ো আলো জ্বলছে দুদিকে দুটো। আরো যে কত ছোটোখাটো খুচরো আলোর ব্যবস্থা! মাঝে একটা ঝাড়লণ্ঠনও আছে। সোনালী নকল ব্রোকেডের সোফা কৌচ। মেহগনির কফিটেবল। বালিশের কাছে এটা কী? বেডসুইচ নিশ্চয়। টেপা যাক তাহলে। দেখি ঘরের আলোক বিন্যাসে কী কী বদল হয়। টিপলুম বেডসুইচ। আলো যেমন কে তেমনি রইল। সে কি? কেন জ্বললো না? আবার টিপলুম, সবলে। এবারেও আলো জ্বললে না।

কোথাও কোনো প্লাগ খোলা আছে কিনা দেখতে উঠবো, এমন সময় হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, ঘরের মধ্যে হুশ করে উদয় হলেন এক সেলামরত মূর্তি।—"ইয়েস ম্যাডাম! ফরমাইয়ে!"

তবে কি ওটা ম্যাজিকল্যাম্প, এই তার দৈত্য? তার মানে এটা বেডসুইচ নয়, নির্ঘাত কলিংবেল! হায় হায়! এখন কী করি? কী বলি? কী চাইব? দাঁড়িয়ে আছে যে! হঠাৎ মস্তিষ্কে একটা বুদ্ধি খেলে যায়। খুব গম্ভীর গলা করে বললুম—

—"একটা টাইপমেশিন আনো।"

—"জী মেমসাব! কা চাইয়ে আপকো?" রুমবয় হতচকিত। হয় চা, নয় তো কফি, না হলে আরেকটু জোরালো কিছু—এই ফরমাশেই সে অভ্যস্ত! আচমকা এ আবার কি আবদার!

—"টাইপমেশিন হ্যায় ইঁহাপর?"

BanglaBook.org

—"হ্যাঁ জী। অফিসমে।"

—"চালু মেশিন?"

—"পাক্কা নেই সাব।" ফরমাশের গুণে আমি 'সাব' হয়েছি।

—"চলে না?"

—"উওভি পাক্কা নেই সাব।" কিছুই জানে না। বাঃ, কী শিশুসুলভ সারল্য। দরজায় টোকা পড়ল।

—"আসুন।" ঘরে ঢুকলো স্মার্ট, সুদর্শন, দক্ষিণী এক যুবক। সবিনয়ে নমস্কার করে জানালো—

"আমি চন্দ্রশেখর। আপনার কম্প্যানিয়ন-গাইড। আপনার যখন যা প্রয়োজন আমাকে বলবেন।" চন্দ্রশেখরের চাঁচাছোলা ভদ্রতায় আমার কেন জানি না ঝট্ করে মনে পড়ে যায় মেফিস্টোফিলিসকে। আমি কি ফাউস্ট?

—"আচ্ছা চন্দ্রশেখর, একটা টাইপরাইটার হবে?"

—"টাইপরাইটার!" চন্দ্রশেখর শিহরিত হয়। —"কেন, টাইপরাইটার দিয়ে কী করবেন ম্যাডাম, আমি এক্ষুনি স্টেনো এনে দিচ্ছি। ক'টায় চাই বলুন?"—

প্রোগ্রাম চেক করে দেখা গেল আগামীকাল রাত্রি নয় ঘটিকার পূর্বে আমার মোটেই সময় নেই। পরশু সকাল ন'টাতে আমার বক্তৃতা। কাল সকালেই সভা শুরু হয়ে যাচ্ছে। বেশ তো, চন্দ্রশেখর তক্ষুনি রাজি। এতে আর মুশকিল কি? কাল রাত্রি ন'টাতেই স্টেনোমশাই আসবেন আমার দায় উদ্ধার হবে বৈকি! বিশিষ্ট আতিথ্য বলে কথা!

—"নো প্রোবলেম ম্যাডাম।" যন্ত্র সমেত স্টেনো ধরে আনবে চন্দ্রশেখর। —"আর কিছু?"

—"হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার। চন্দ্রশেখর, আমার এই হায়দ্রাবাদ-কলকাতা এয়ারটিকিটটা হায়দ্রাবাদ- বারাণসী করে দিতে হবে। যেমন করে হোক ২৮ই আমাকে সকাল বেলাই বারাণসী পৌঁছুতে হবে। ঐ রাত্রেই এলাহাবাদে কুম্ভস্নান।"

—এলাহাবাদ, ম্যাডাম? কুম্ভে যাচ্ছেন? কার সঙ্গে ম্যাডাম?—

ধুৎ তোর! কম্প্যানিয়ন গাইডের নিকুচি করেছে। সবতাতেই কম্প্যানিয়ন চাই? —"সঙ্গে আবার কি? হায়দ্রাবাদে ক'র সঙ্গে এসেছি?"

—"আহাহা, ব্যাপারটা কি এক হলো ম্যাডাম?" —সবিনয়ে সার্ভিসের লাইন থেকে চন্দ্রশেখর মুহূর্তেই গ্যালান্ট প্রোটেকশনের লাইনে। ওই যে, আমার যে ব্যক্তিত্ব নেই। তারই বিষময় ফল। আবার দরজায় টোকা। ধীরপায়ে ঘরে প্রবেশ করলেন দুধেল পোশাকে সোনরূপোর তকমা আঁটা, মাথায় এরোপ্লেনের পাইলটের মতো ঘুড়ওলা টুপি, রাশভারি এক ব্যক্তি। তাড়াতাড়ি কক্তি-টক্তি, আঁচল-টাঁচল সামলে-সুমলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতেই তিনি এক বিনম্রাবনত সেলাম ঠুকে ঘোষণা করলেন— "আমি রাজ্যেশ্বর। আপনার শোকার। গাড়ি তৈরি। কোথাও বেরুবেন কি এখন?"

বুক থেকে একটা পাথর নামলো। ড্রাইভার! আমি ভেবেছি কে-না-কে। নেটিভ স্টেটের রাজা-রাজড়ারাও তো ঠিক এমনি ড্রাইভার-ড্রাইভার রাজবেশ পরেন, তকমা আঁটেন, এমন কি রয়্যাল-ফ্লনসর্ট প্রিন্স ফিলিপ পর্যন্ত। এরও যেমন সাজ, তেমনি নাম। রাজ্যেশ্বর! তা ভালো। ড্রাইভার। সারা-জীবন গাড়ি চালাতে চালাতে হাতে তো কড়া পড়ে গেল। এখানে তবু দুদিন আরাম করা যাবে। আ-হু। এই তাহলে স্টেট-গেস্ট হওয়ার মানে! সত্যি সত্যিই আবুহোসেন? এ কক্তৃতা যে সত্যিই প্রায় সেই জাদুপ্রদীপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ মণিহার আমায় নাহি সাজে, তবু, এসেছে যখন থাকুক। (মণিহার বলে কথা!) কিন্তু ড্রাইভার জুটেছে বলেই এই ক্লান্ত শরীরে কোথাও বেরুতে পারবো না বাপু। —"রাজ্যেশ্বর, কাল সকাল পৌনে ন'টায় তুমি এসো। চন্দ্রশেখর, আপনি বরং রাজ্যেশ্বরকে নিয়ে এখনই এয়ারপোর্টে চলে যেতে পারেন, হায়দ্রাবাদ-কলকাতা টিকিটটাকে হায়দ্রাবাদ-বারাণসী—"

BanglaBook.org

—"কেন চিন্তা করছেন ম্যাডাম? এই তো এলেন। যাবার ব্যবস্থা পরে হবে। ওটা একটু মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে, একলাটি এই ভিড়ে কুম্ভ!" দূর ছাই, একি ঝামেলা! এ যে দেখি স্নেহময়ী জননীর প্রতিচ্ছবি! —"মেরি করলে আর রিজার্ভেশন পাব না যে?" —খুব পাবেন। দেখুন, হুট করে কিছু করবেন না ম্যাডাম।" ম্যাডাম যে তেমনি-তেমনিই ম্যাডাম, হুট করে ছাড়া প্ল্যান করে কিছুই পারেন না, চন্দ্রশেখর তো তা জানে না। অবতে অবতেই দবজায় আবার টোকা। এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পি. ভি. নরসিংহরাওজী স্বয়ং। এখনো তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখলে আশ্চর্য হতেই হয়। —"কী ব্যাপার? ঘর ঠিক আছে? ঠা? কফি? আপনি তো ননভেজিটেরিয়ান? ঘর পছন্দ?" সঙ্গে রয়েছেন সেক্রেটারি শ্রীদামোদরন্।

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘর ঠিক আছে। খুব আরাম। কেবল এই টিকিটটাকে যদি বদল করে....." এই সময়ে শ্রীদামোদরন্ আমার হাতে আরেকটা টিকিট দিলেন।

—"এই যে, আপনার তিরুপতি দর্শন সব ঠিকঠাক।" দেখি হাতে হায়দ্রাবাদ-তিরুপতি এয়ার টিকিট, ১৭ তারিখের জন্য ও. কে. করা। —"এটা ইন্‌স্টিট্যুট থেকে আপনাকে প্রীতি-উপহার দেওয়া হল। ১৭ই ওখানে থাকবেন, ১৮ই ভোরে ভেঙ্কটেশ্বরে স্নান ইত্যাদি সেরে ফিরবেন। ঐ রাত্রেই কলকাতা। ঠিক আছে?"

—"কলকাতায় তো যাব না!" —এবার ওঁদের অবাক হবার পালা। "তবে? কোথায় যাবেন?" যথাসাধ্য দৃঢ়নিশ্চয় গলার সুরে বলি, "আমি তো এখন কুম্ভে যাব। ১৮ই বারাণসী পৌঁছতে চাই। মৌনী অমাবস্যা ১৮ই রাত্রি থেকে শুরু।"

—"কুম্ভযাত্রী? ওখানে আপনাকে কারা মীট্ করছেন? কোথায় থাকবেন বলে ঠিক আছে?"

—"কিছুই ঠিক নেই এক স্নানের লগ্নটি ভিন্ন। কাউকেই মীট্ করছি না গঙ্গাযমুনাসরস্বতীকে ছাড়া।"

—"আর ইউ ক্রেজী?" শুভ্রকেশ সত্তরছোঁয়া দামোদরনের ধৈর্যচ্যুতি হয়। —"ম্যাডাম ওসব ছাড়ুন, তিরুপতিদর্শনেই যথেষ্ট পুণ্য হবে আপনার। আর পুণ্যে কাজ নেই। আপনাকে আরামসে স্পেশাল দর্শন করিয়ে দেবেন টাউন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং, আপনাদের বন্ধু হন—ওসব কুম্ভটুম্ভ শিয়ার ম্যাডনেস, ওসব ছাড়ুন, ওখানে অবিশ্বাস্য ভিড়। ভাবতে পারেন, টেন মিলিয়ন? এক কোটি মানুষ?"

—"আমাদের তো গ্রেটার ক্যালকাটা ধরলে নিজের শহরেই রোজ দিনের বেলায় এক কোটি, আর দুর্গাপুজোর ক'দিন আরো বেশি—"

—"সে অন্য পরিস্থিতি, এ অন্য। পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা না করে রাখলে ওখানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।"

আমি তাতে একটুও দমি না—"মশাই, বলি এক কোটি লোকের প্রত্যেকের কি ওখানে চেনাশুনো আছে?"

—"ওদের কথা ছেড়ে দিন। ওরা দল বেঁধে যায়। আপনি একা স্ত্রীলোক...তার চেয়ে বরং দুটো কাজের কথা বলি শুনুন, মুক্তোটুক্তো কিছু কিনবেন? এখানে সস্তায় ভালো জহরত পাওয়া যায়।"

চন্দ্রশেখর জুড়ে দেয়— "পোছমপল্লী শাড়িও।"

বারে বা! মেফিস্টোফিলিস, বাঃ! আমি কোথায় মুক্তি কিনতে বেরুতে চাই, তোমরা আমাকে মুক্তো দিয়ে ভোলাচ্ছো! এই তো সেই মোহিনীর মায়ার ফাঁদ! আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি আমাকে অমৃতের ভাগ দিতে চাও না। এই তো, ঠিক আছে, আমিও ছাড়ছি না। আমি ভুলছি না বাপু। হ্যাঁ।

—"দেখুন, ওসব মুক্তোটুক্তো কেনার পয়সা আমার নেই। আমি এখন বারাণসী যাব। আমার

BanglaBook.org

একটাই কেবল আরজি, আমার টিকিটটা যদি দয়া করে একটু শিগগির বদলে—"

স্বল্পভাষী শ্রীপি. ভি. নরসিংহরাওজী এতক্ষণ একটাও মন্তব্য করেন নি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৪এ। দুজনেই একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে বক্তা হিসেবে গিয়েছিলুম। তিনি সেই প্রথম বিদেশে গেলেন। হঠাৎ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কচকচির মধ্যে কেমন যেন ডাঙায় তোলা মাছের মতো একা পড়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রিত্বের বিভা, এবং মদ-মাংসবিহীন আহার—এই দুই সাত্ত্বিক গুণের কারণে। বেশ বোঝা যায় ওঁর বুকের ভেতরে সত্যিই এক সন্ন্যাসীর বাস। জানি না কীভাবে উনি রাজনীতি করেন! সেই বেখাপ্ বিভূঁইয়ে আমি যতটুকু পারি ওঁর কাছে কাছে ছিলুম। বড়ো মায়া হতো ওঁর নিঃসঙ্গতা দেখে। যতই মন্ত্রী-টন্ত্রি (অর্থাৎ যত পাপীই) হোন—আসলে ভদ্রলোক সাহিত্যিক, এবং বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে সত্যিই তাঁর ব্যাপক জ্ঞান এবং আগ্রহ। সেই সেমিনারেই বিজয়লক্ষ্মীর কন্যা শ্রীমতী নয়নতারা সেহগলের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। আমাকে এখানে মোটামুটি রাওই একমাত্র চেনেন। এবারে তিনি কথা বললেন—"আমার এক বন্ধু আছেন এলাহাবাদে, দেখি তাঁকে ফোন করতে পারি কিনা। দেখছ না, ও মেয়ে তো যাবেই! চন্দ্রশেখর, কাল বরং দুপুরে সেশনে ওকে তুমি কলেরা ভ্যাকসিনেশনটা দিইয়ে সার্টিফিকেটটা যোগাড় করে দিও। নইলে ঢুকতে দেবে না ওকে কুম্ভমেলায়। আর ওর হায়দ্রাবাদ-কলকাতার টিকিটটা এখনই বরং হায়দ্রাবাদ-বেনারস-ডায়া-দিল্লী করে আনো। এলাহাবাদ যাবার ওই একটাই পথ কিনা এখন থেকে। অবশ্য একটু ঘুরপথ হয়।"

—আহ্লাদের এক ধাক্কায় হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে যেন গলার ভেতর উঠে এসে কণ্ঠরোধ করে দিল আমার! হবে? হবে তাহলে? কুম্ভযাত্রা শুরু হয়ে গেছে আমার? ঈশ্বর তোমার অসীম করুণা!

নরসিংহরাওজী বললেন—"ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে'খন, এখন আসুন কালকের প্রোগ্রামটা ফিক্স করে নিই। কাল সকালের সেশনের বক্তা স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। উনি বলছেন ইণ্ডিয়ার স্পিরিচুয়াল ইনটিগ্রেশন নিয়ে। পরশু সকালের সেশনে আপনি আছেন, বিষয় লিটরারি ইনটিগ্রেশন। কাল দুপুরে আছেন ডাঃ এ. এম. খুসরো, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিষয় হচ্ছে ইকনমিক ইনটিগ্রেশন, পরশু দুপুরে নায়েক আসছেন দিল্লী থেকে, তাঁর বিষয় লিংক ল্যাংগুয়েজ। এই যে আমার ওয়েলকম অ্যাড্রেসের কপি—"

দোরে আবার অসহিষ্ণু টোকা, তারপরেই একসর খুশি নিয়ে পদভরে ধরণী কম্পিত করে প্রবেশ করলেন স্বয়ং খুসরো সাব, একদা আমাদের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়শিবেশী বন্ধু, এখন আলিগড়বাসী। হৈহৈ করে বলে উঠলেন—"আরে আরে নবনীতা, প্রোগ্রামে তোমার নাম দেখেই দৌড়ে এলাম. হাউ ওয়াণ্ডারফুল টু সী য়ু আফটার সাচ আ লং টাইম! আমিও এখানেই উঠেছি, ওপাশের ঘরটায়—যদিও আমি হায়দ্রাবাদীই।"

প্রতিবেশীদের উচ্ছ্বসিত পুনর্মিলনে নরসিংহরাওজী মৃদুমৃদু হাসছেন, কিন্তু দামোদরন্ প্রোটোকলে অদম্য বিশ্বাসী। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিতে থাকলেন—"উনি ডঃ অমুক, ফ্রম আলিগড়, ইনি ডঃ তমুক, ফ্রম ক্যালকাটা"—আমাদের তুমুল হল্লায় ওঁর ভদ্র বাক্যগুলি চাপা পড়ে গেল। তখন খুসরো সাব বলছেন—"তারপর বাচ্চারা কত বড়ো হল?"

গল্পগুজবের মোড় ঘুরে গেল, আবার কফি এল, কিন্তু আমার বুকের ভেতরে আর সব কথাবার্তা ছাপিয়ে একটাই খুশি কেবল ভাঙা রেকর্ডের মতো ঘুরছে—হবে, হবে। চন্দ্রশেখর চলে গেছে টিকিট বদল করতে। সতেরোই তিরুপতি, আঠারোই প্রয়াগ! মহাকুম্ভ! পূর্ণকুম্ভ! অমৃতকুম্ভের যাত্রা আমার শুরু হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

৩

সভাপর্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ভালো বক্তা শুনেছিলুম। কত ভালো, তা জানা ছিল না। খুব সুন্দর বললেন। ভারতের আত্মিক একতা বিষয়ে তাঁর সাবলীল মৌখিক ভাষণ গীতা-উপনিষদ-পুরাণের ফুল তুলে সাজানো। এঁরাই স্বামী বিবেকানন্দের পথের পথিক। বুদ্ধিজীবী সন্ন্যাসী কেরালার মানুষ, বাংলা দিব্যি বলেন—চমৎকার রসিকতার ক্ষমতা, বার বার সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, বক্তৃতায় সেই বিস্তৃতির ছাপ। আধুনিক মনন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে অধ্যাত্মচিন্তার মিলনে তাঁর বচনে যে জ্যোতিটি ফুটে ওঠে সেটি খুব ভালো লাগলো। সাধু সন্দর্শন শুরু হয়েছে আমার। কুম্ভে তো এজন্যেই যায় মানুষে।

দুপুরে চন্দ্রশেখর আমাকে প্রিভেন্টিভ মেডিসিন হাসপাতালে পাকড়াও করে নিয়ে গেল। কলেরার ইঞ্জেকশন ও সার্টিফিকেট নিয়ে এলুম। তারপর গেলুম প্রফেসর মোহনের নেমন্তন্নে সেন্ট্রাল ইনস্টিট্যুট অফ ইংলিশে। ওখানে আজ প্রসিদ্ধ ইন্দ-ভারতীয় লেখক রাজারাও বক্তৃতা করবেন। বিষয়— 'লেখক এবং পৃথিবী' (Writer and the World)। এই বিষয়ে খুব উৎসাহ আছে আমার। আজকাল সাহিত্যের শিল্প-জিজ্ঞাসার দিকটার চেয়ে জগৎ-জিজ্ঞাসার দিকটাকে আমার ঢের বেশি জরুরী বলে মনে হয়। অন্যরা এ নিয়ে কে কী ভাবছেন জানতেও উৎসাহ বোধ করি। ইন্দ-ভারতীয় সাহিত্যে অবশ্য আমার জ্ঞান বেশি নয়। বাংলা ছাড়া ভারতীয় সাহিত্য পড়তে হলে আমি কষ্ট করেও ওড়িয়া—অসমীয়া—হিন্দী পড়তে চেষ্টা করি; ভারতীয় ইংরাজি ঠিক ততটা উৎসাহ পাই না। রাজারাও-এর 'কণ্ঠপুরা' উপন্যাস পড়েছি। ভালোই লেগেছে। তবে কিনা তাকে বিভূতিভূষণ, তারাশংকরের লেখা উপন্যাসের স্তরের বলে মনে হয়নি। তবুও রাজারাও শুনে উৎসাহিত হলুম তার কারণ আমাদের স্বভাবগত সাহেবভক্তি। গতবার প্যারিসে সরবনের অধ্যাপক ভূয়াজিন সাহেব বলেছেন, তাঁর কাছে দুটি ছাত্র (একটি পাকিস্তানী পাঞ্জাবী ও একজন ফরাসিনী) রাজারাও বিষয়ে গবেষণা করছেন। যেহেতু রাজারাও ফ্রান্সে ছিলেন, তাঁর ফরাসী যোগাযোগ কী কী ও রসনায় যথারীতি প্রভাব কতটা আছে ইত্যাদি নিয়ে। দিল্লীর নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়েও একজন ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সেও সরবন্‌ফেরত এবং যথারীতি রাজারাও-পাগলা। সাহেবরা যখন এত ভালো বলে, দেখি তো একবার রাজারাও কেমন ? এজন্যেই যাওয়া। প্রথমেই আবিষ্কার করলুম—বক্তৃতার বিষয় 'The writer and the world' নয়—ওটা হবে 'The writer and the word'—লেখক এবং শব্দ! উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল, কবিতা লিখি বলে সমস্যাটি কবিতাসৃষ্টির মূল মন্ত্র। কিন্তু উৎসাহ বাড়লো না। এখন আমার word-এর চেয়ে world এর দিকেই ঝোঁক বেশি। মনে হয় শিল্পে ওই যোগাযোগটাই বেশি জরুরী। ওটাই প্রথম—লেখক এবং বিশ্বভুবন। শব্দের কৃত্য সেই ঘটকালিটা করা। রাজারাও আমাকে সেরেফ্ বসিয়ে দিলেন।—এত অবিশ্বাস্য বাগাড়ম্বর, এমন অসহনীয় কৃত্রিম তথা ক্লান্তিকর বক্তৃতারাজি আমি ঠিক কল্পনা করতে পারিনি। ইন্দ-ভারতীয় লেখকরা অনেকে নানা ধরনের মানসিক ব্যাধিতে ভোগেন বটে, কিন্তু ভালো বক্তাও যে অনেকেই আছেন। সুস্থ সুন্দর বক্তৃতাও (যেমন পুরুষোত্তমলাল, আর. কে. নারায়ণ অথবা এ. কে. রামানুজনের মুখে) তো কম শুনিনি।

সন্তপ্রতিম ঢঙে শ্রীরাজারাও উবাচ—"জগতে বক্তাও নেই, শ্রোতাও নেই আছেন কেবল বলা। কেবল শব্দরহস্য। যোগাযোগ (Communication) বলে কিছুই নেই এই দুনিয়ায়। তাই লেখকও নেই, পাঠকও নেই। আছেন কেবল লেখা। শব্দ কেবল শব্দ।" এখানে আমি একটু গুছিয়ে বলে ফেলেছি ঘটনাটা মাত্র তিন লাইনে এটা মাস্টারি করার বদভ্যাসের ফল উনি

এটা বললেন ঠিক পুরো পঞ্চান্ন মিনিট সময় নিয়ে। খুব বেশি সরল অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এবং ইতিউতি শিল্প-দর্শনের নাক তুলে। এবং সেই জাতের উন্নাসিকতার মার্জনা থাকা উচিত নয়। না, উদাসকণ্ঠে "Only the word exists" বলাটা দোষের বলছি না—দোষের হল, তাঁর বিদেশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার কারণ দর্শানোটা। তিনি নিজের মুখে বললেন—ইংরাজিতে লেখেন, কেননা তিনি 'Precision'-এর পূজারী, "like Mallarme, that French poet" এবং তিনি 'Silence'-এর ভক্ত—"like Rilke, my favourite German"! অথচ কান্নাড়া, তাঁর মাতৃভাষাটি বড়োই নাকি দুর্বল, বড়োই অনুন্নত ভাষা, রাজারাওয়ের সূক্ষ্ম চেতনাকে শিল্পে প্রকাশ করার মতো গূঢ় শক্তি তাতে নেই। সেই Precision এবং silence-এর খেল' ওসব কাঁচা ভাষাতে দেখানো যায় না। হ্যাঁ, ভারতবর্ষে আরো একটি অন্তত জবরদস্ত ভাষা আছেন ইংরিজি বাদে, যাঁহাতে উহা সম্ভবে, তিনি হচ্ছেন সংস্কৃত। যদি সাধ্যে কুলে'তো—তাহলে রাজারাও সংস্কৃতেই নিয়মিত লিখতেন। খাস দেবভাষায়। কেননা পাঠক তাঁর কাছে অস্তিত্বহীন। দেবভাষাটা ভালো জানেন না বলেই রাজভাষাতে লিখে থাকেন তিনি, অর্থাৎ ইংরিজিতে, যেহেতু সেটা অবশ্যই অতি সুপক্ক ভাষা। পরভাষান্নভোজী লেখকটির এই অতিপক্ক ভাষাটি শুনে বিশেষত আপন মাতৃভাষা বিষয়ে, তাঁর শ্রদ্ধাভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখে আমার তো মাথা গরম! এ কেমন বুদ্ধিমান পুত্র, যে নিজের মাকে বলে চরিত্রহীন? এ যে নিজেকেই বলছে পিতৃপরিচয়শূন্য? কলকাতা শহরে কেউ বংলাভাষার সম্পর্কে এরকম কথা বললে তিনি যত বড়োই যশস্বী হোন, বাঙালী ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় তাঁকে অক্ষত ছেড়ে দিত না। অন্তত তাদের কাছে আমার তো তাই আশা। যশোলোভে শখ করে (অর্থাৎ ভুবনজোড়া পাঠক পাবার আশায় আকাঙ্ক্ষায়) ইঙ্গ-ভারতীয় লেখক হতে চাইলে যদি বাংলাকে আগে দুর্বল ভাষা বলে জারি করে নিতে হয়, তাহলে কলকাতা শহরে সে-লেখকের কপালে দুঃখু আছে। কিন্তু হায়দ্রাবাদ সত্যিই খুব ভদ্র শহর। তাছাড়া কান্নাড়া ওখানকার স্থানীয় ভাষাও নয়। ফলে রাজারাও-এর গলায় বাঁধা লাল টুকটুক রেশমী রুমালের ভাঁজটিও এদিক-ওদিক হয়নি। তাঁর শুভ্র দীর্ঘ কেশ যথাস্থানেই ধ্যানসম্মত বিবশতায় ঝুঁকে রইলো। অবশ্য ভদ্রভাবে যাসারকম টুকটাক্ প্রশ্নাদি হচ্ছিল—আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল এই প্রশ্নটি। একজন তরুণ ছাত্র উঠে ভক্তিভরে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা আপনি তো তাহলে ধ্যান করা (meditation), এবং সাহিত্যসৃষ্টি করাকে একই পর্যায়ের বলে মনে করেন?"—শ্রীগুরুগম্ভীরভাবে রাজারাও দামী মাথাটি নাড়লেন—"হ্যাঁ, আমার কাছে দুটোই এক কাজ।" ছেলেটি তখন বললো সবিনয়ে—"দুটোই যখন এক, তাহলে বরং আপনি ধ্যানই করুন না কেন? কষ্ট করে আর নাইব' লিখলেন?" এই ছেলেটিকে আমার শতকোটি সাধুবাদ। তার ঠিক আগেই স্থূলভাবে আমি বৃথাই তর্ক করেছি—"যদি আপনি Communicationএ বিশ্বাস নাই করেন, Silence পালন করার পক্ষে তো না লেখাই সবচেয়ে ভালো। তাছাড়া জগতে পাঠক যখন নাস্তি (non-existent), লেখকও যখন নেই—তাহলে আপনার প্রকাশক বেচারা কেন মাঝখান থেকে খামোকা অস্তিত্ব-যন্ত্রণা ভোগ করেন? শুধু লেখাই যদি সব—তবে সেই লেখা নিজের দেরাজে রেখে না দিয়ে ছাপেন কেন আপনি?" তিনি উত্তরে স্মিত হেসে বললেন—"লিখে আমি আনন্দ পাই তাই লিখি, এবং ছেপেও বড়ো আনন্দ পাই, তাই ছাপি।" এই 'বিশুদ্ধ আনন্দে'র পরিপেক্ষিতে আমার আর কিছুই বলার ছিল না। ছেলেটির প্রশ্ন এবং উত্তর আমার সেই নিরুত্তরতার জবাব দিয়ে দিয়েছে। রাজারাওদের ধ্যানস্থ থাকাই তাবৎ জগৎসংসারের পক্ষে মঙ্গল। সন্দেহ নেই, রাজারাওদের টেক্সাসের তৈলখনিতেই মানায় ভালো। (উনি এখন সেই অঞ্চলেই চাকরি করেন।)

ইতিমধ্যে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ হলো ওখান থেকে ফিরে এসে, তিনি কৃষ্ণ মেননের ভাগ্নে, সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস করেন এবং সুযোগমতো রাজনীতি ঘাঁটেন, নাম রাজগোপাল।

BanglaBook.org

তিনিও ওই অতিথিশালায় আতিথ্য নিয়েছেন। কুম্ভে যাচ্ছি শুনেই বললেন—"কুছ ভাবনা নেই, ওখানে আমার বন্ধু বহুগুণা আছেন, ওঁকে ফোন করে একবার..." শুনেই তো আমি আঁতকে উঠি—ককিয়ে উঠি! —"থাক থাক। হয়েছে হয়েছে। ওরে বাপরে! অত বড়ো বড়ো নামে আর কাজ নেই। আপনারা কি ছোটোখাটো মানুষ কাউকেই চেনেন না, যিনি আমার সমান মাপের?" নিজের গায়ের চেয়ে বড়ো সাইজের জামা পরে আর তো চলতে পারছি না। তা ছাড়া এ এক রাজনীতিক বৃত্তে পা জড়িয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। আমি বেচারী গরীব মাস্টার। বে-জায়গায় এসে কী মুশকিলেই পড়েছি। না পালালে মুক্তি নেই। কী ভাগ্যি, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইংলিশে আমার পুরনো বন্ধু মাখনলাল টিকু এলাহাবাদের দুজন ইংরিজির অধ্যাপকের নামে চিঠি লিখে আমাকে দিয়েছেন। এলাহাবাদে গিয়ে নেহাত মুশকিলে পড়লে তাঁদের শরণ নেওয়া যেতে পারবে।

আমার আবুহোসেনী, অথবা কাউন্টগিরি, যাই বলা যাক না কেন, এ যেন এখন চরম স্বপ্নাদ্য পর্যায়ে। চন্দ্রশেখর ছায়ামূর্তি সহচর হয়ে আমাকে প্রচণ্ডভাবে গাইডেন্স দিচ্ছে। ঠিক রাত্রি ন'টায় যন্ত্রপাতিসুদ্ধ একজন হাস্যবদন অতি এফিশিয়েন্ট স্টেনো এসে হাজির। অচিরাৎ পেপার তৈরি হলো. আমি ইতিমধ্যে বেডসুইচ আর কলিংবেলের তফাতটা শিখে ফেলে প্রায়ই চা-কফি চাইছি আর স্যাটাস্যাট মেমো সই করছি। আমাকে পায় কে? ভি. আই. পি. হতে শেখা খুব সোজা কাজ। কেবল চোখ বুজে মেমো সই করতে পারলেই হলো। আমি এক কুম্ভে যাচ্ছি শোনার পর থেকে সেই 'আহা বেচারী' ভাবটাও আর কারুর মধ্যে নেই। চন্দ্রশেখরও এখন আমাকে একটু (একটু সংশয় মিশ্রিত) সমীহের চোখে দেখছে বলে আমার ঘোরতর আশা হচ্ছে। রাত বারোটায় যখন স্টেনো, চন্দ্রশেখর এবং তাঁদের পৌঁছে দিতে রাজেশ্বর বিদায় নিলেন, তখন আমি খাটে গা এলিয়ে পেপারটাতে চোখ বুলোতে শুরু করি। হাজার হোক এই জন্যেই তো আসা। কাল সকাল নটায় এটা পেশ করতে হবে।

সকাল হলে গিয়ে দেখি স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এসেছেন আমার বক্তৃতা শুনতে। খুবই কৃতজ্ঞ হলুম, লজ্জা পেলুম তার চেয়ে বেশি। বক্তৃতা অবশ্য জমে গেল কপালগুণে। ইনস্টিটিউটের বন্ধুবান্ধব যথেষ্ট, হল ভর্তি। রঙ্গনাথানন্দজীর কি যে পছন্দ হয়ে গেল আমার বলা, এবং তার সঙ্গে যে কজন আশ্রমিক-আশ্রমিকা এসেছিলেন তাঁদেরও, আমাকে ওঁর বিকেলে ওঁদের রামকৃষ্ণ মিশনে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। এই তো আমার সাধুসঙ্গের গোড়াপত্তন। কুম্ভে তো যায় লোকে আসলে এই করতেই। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে রঙ্গনাথানন্দজীর অবিস্মরণীয় গীতাভাষ্য শুনলুম। তার পর উনি আমায় ওঁর লেখা কয়েকটি বই উপহার দিলেন। আমি তো ধন্য। না, তীর্থযাত্রার শুরুটা জমেছে চমৎকার।

সালারজং জাদুঘর যদিও দেখা হলো না, তবুও রাত্রে যখন অতিথিশালায় ফিরলুম মনে তখন বিমল আহ্লাদ। একটু আধটু বেড়ানো হয়েছে চারমিনার অঞ্চলে, নেমন্তন্ন খাওয়া হয়েছে ভালো রেস্তোরাঁয়, আর যে বক্তৃতার কল্যাণে এই ভি. আই. পি. সমাদর কপালজোরে, সে-বক্তৃতাটিও দিব্বি উতরে গিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা কুম্ভে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিশেষ ফাউ পেয়ে গেছি: তিরুপতি! কাল ভোরে তিরুপতির প্লেন—ছ'টার সময়।

দীর্ঘকায় সুদর্শন তরুণ ব্যারিস্টার রাজাগোপাল দেখি বেশ ভক্তমানুষ। সন্ধ্যেবেলায় নগ্নপদে হায়দ্রাবাদের নবনির্মিত বিড়লা-তিরুপতি মন্দিরে গিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে, একশটা কিউ দিয়ে পুজো দিয়ে, কপালে ফোঁটা-তিলক এবং নাকে সর্দি নিয়ে ফিরেছেন। তিনি দুঃখু করতে লাগলেন, আগে জানলে আমার সঙ্গে আসল তিরুপতিতেই যেতেন। কিন্তু কালই তাঁকে ভোরের প্লেনে দিল্লী ফিরতে হচ্ছে! একই সঙ্গে এয়ারপোর্টে রওনা হব ঠিক হলো। উনি চা চাইলেন তোর

BanglaBook.org

চারটেয়। আমি পাঁচটায়। উনি থ'!

—"সে কী? পাঁচটায় তো আপনার রিপোর্টিং টাইম?" আমিও সেটা জানি। কিন্তু কাল রাত্রে উদ্বেগে মোটেই ভালো ঘুমোইনি। সেটা তো ওঁকে বলা যায় না। চক্ষুলজ্জায় তখন বলি—"বেশ পৌনে পাঁচটায় চা। এয়ারপোর্ট তো কাছেই।" রাজাগোপাল সানন্দে রাজী হলেন আমার আরেক অনুরোধে, দিল্লী পৌঁছে আমার মামাবাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দেবেন যে ঐদিনই রাত্রের প্লেনে আমি দিল্লী যাচ্ছি। পালামে যেন গাড়ি পাঠানো হয়। খুবই ভদ্রলোক—যদি ফোন-যোগাযোগ ব্যর্থ হয়, তা হলে উনি নিজেই এয়ারপোর্টে আসবেন বললেন। ভাবনা নেই। কেউ না কেউ প্রতীক্ষিয়া থাকবেই, উৎকণ্ঠ আমার লাগি, পালামে!

কিন্তু গোলমাল বাধলো ভোরে। সোয়া তিনটের সময়ে দোরে ধাক্কা। দোর খুলে দেখি চন্দন তিলকধারী, সদোস্নাত শ্রীযুত রাজাগোপাল! ঘোর বেগুনীতে বড়বড় খাদা রসগোল্লা প্রিন্টেড সিল্কের শানদার শার্ট গায়ে দিয়ে, পেভলের গুল্ বসানো ইয়া চওড়া বেল্ট দিয়ে কোমর বেঁধে, তাবাক্ আফ্টার শেভ লোশনে ডুব দিয়ে ভুরভুরে সুসজ্জিত। বললেন—"উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, স্নানটান করুন, চারটেয় তো চা আসবে।"— দূর ছাই, আমি চা দিনে তবে উঠি! আগেভাগে উঠে চায়ের অভ্যর্থনার জন্যে কে কবে তৈরি হয়ে বসে থাকে? কিন্তু অমায়িক হাস্যসহকারে বলতে হলো—"অনেক ধন্যবাদ! ভাগ্যিস ডেকে দিলেন। অবশ্য আমি পৌনে পাঁচটায় চা চেয়েছি। এখন সোয়া তিনটে বেজেছে।" রাজাগোপাল সরলভাবে বললেন—"হ্যাঁ, এবার তা হলে গরমজলটা অন্ করে দিন, তৈরি-টৈরি হোন—আমি তো পৌনে তিনটেয় উঠেছি।" পুনশ্চ অমায়িক হাসা করে, দোরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু শুলে কি হবে? কপালে কি ঘুম আছে? চারটের সময় দোর-ঠেলাঠেলি।—"ওকি মশাই? আবার ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? সর্বনাশ! প্লেন ধরবেন কি করে? চারটে যে বেজে গেল, চা এসে যাবে এক্ষুনি—উঠে পড়ুন উঠে পড়ুন—" এবার দন্তকিড়িমিড়ি সজোরে নিয়ন্ত্রণ করে মৃদু উদ্বেগে বলি—"ওঃ হো, তাই তো! ঘুমিয়েই পড়েছিলাম বটে! অবশ্য আমার চা-টা পৌনে পাঁচটায় দেবে। এখন চারটে।" রাজাগোপাল বললেন—"কিন্তু স্নান?"—"স্নান তো আমি রাত্রেই করে শুয়েছি, ভোরবেলা আমি বড্ড আস্তে আস্তে নড়ি-চড়ি কিনা?" রাজাগোপাল বললেন—"দূর—রাত্রে করলে হবে কেন? মন্দিরে যাচ্ছেন না? পবিত্র হয়ে যেতে হবে না?" ও হরি, তাই তো? আমি কেবলই পরিচ্ছন্নতার টেকনিক্যাল দিকটা ভেবেছি। বাসি তাজা ইত্যাদি অর্থাৎ পবিত্রতার ফর্মাল দিকটা আমার মাথায় আসেনি। সাধারণত স্নান না করে মন্দিরে ঢোকবার জন্য আমার কাছে একটা 'পাশ' আছে—"অপবিত্রো পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোঽপিবা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষম্"—এই উপায়ে আমি সর্বদাই বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হয়ে মন্দিরে ঢুকি স্নান করার ঝামেলা থাকে না। কিন্তু ঘুমুতে তো ইনি দেবেন না! হায়! একেই কি বলে আমার মনের শান্তি ও রাতের নিদ্রাহরণকারী? যুবকের প্রতি আমার হৃদয়ে যে কীদৃশ ভাবের উদয় হলো, তা কবি কালিদাস কল্পনাও করতে পারতেন না! শরীরে অনিদ্রার এই ক্লান্তি একমাত্র জলেই দূর হবে, মন্ত্রে নয়। স্নান না করে পথ নেই। অতএব হাস্যবদনে..."থ্যাংক ইয়ু সো মচ মিস্টার রাজাগোপাল।" উঠে গরম জলের কল খুলি। পবিত্র হয়ে চা খেতে বসতে হবে এবারে রাজাগোপাল চারটেয় চা খেয়ে, পৌনে পাঁচটায় পরিপূর্ণ ফুল ব্রেকফাস্ট খেয়ে, পাঁচটায় এয়ারপোর্টে। তাঁর দিল্লীর প্লেন অবিশ্যি সাতটায়।

৪

তিরুপতি পর্ব

তিরুপতিতে নেমে দেখি ওখানকার টাউন কংগ্রেসের তেলুগুভাষী সভাপতি আই. এস. বাসু

BanglaBook.org

ও মন্দির অঞ্চলের মিউনিসিপাল কাউন্সিলার শ্রীপার্থসারথি আমাকে নিতে এসেছেন। আমাকে দেখবামাত্র তাঁরা যারপরনাই দুঃখিত হলেন, বেশ বোঝা গেল। হায়, কেন যে ঈশ্বর আমাকে এমন ব্যক্তিত্বহীন দৃশ্য দিয়েছেন! বাবার খানদানী গোঁফজোড়াটা যদি না-ও পাই, নিদেনপক্ষে মায়ের মতো ওজনদার ব্যক্তিত্বটা তো দিতে পারতেন। ত্রিপুরায় যেবার যাই, আমার প্লেনে দিল্লীর একটি ফিটফাট ছাত্রীও যাচ্ছিল, দিব্যি মেমসাহেবী কায়দায় শাড়ি চুল মুখ নখ সব তৈরি করা। বাপ্‌রে—সে কী স্মার্ট! প্লেন থেকে নেমে হেঁটে টার্মিনাসে যেতে যেতে দেখলুম ফুলটুল নিয়ে কিছু মানুষ তার দিকে সম্মোহিত হয়ে ছুটে গেলেন। ওদিকে আমি এক শিশু-কোলে বিব্রত মহিলাযাত্রীর পোঁটলা বগলে করে পেছন পেছন আসছি। এবার অবশ্য তাঁরা সহজেই আমাকে চিনলেন। কেননা তৃতীয় কোনো মহিলাযাত্রী ছিলেন না। আমার তাই এহেন দুর্ভাগ্যে দিব্যি অভ্যাস আছে।

বাসু ও পার্থসারথি বিরসবদনে আমাকে প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দেখাতে নিয়ে গেলেন। পাহাড়ের কোলে সুদৃশ্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি মন্দিরের টাকায় চলে। ওপাশে শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বয়েজ স্কুল সেও মন্দির ফাণ্ড থেকে। এঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার, নানা বিভাগ রয়েছে। ছাত্রদের, অধ্যাপকদের বাসস্থানের দিব্যি সুব্যবস্থা দেখলুম। উপবন গড়ে আশ্রমিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টাও আছে, পথের দুদিকে পাথরের বেদীতে প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি বসানো সারিবন্দী। দেখেই কুচিন্তা মনে এল—হায়রে! সম্ভবত এগুলো উপড়ে নিয়ে অচিরেই মার্কিন টুরিস্টদের কাছে বেচা হয়ে যাবে। প্রত্যেকটিই যে হিন্দু দেবদেবীর মিথুনমূর্তি। বিদেশীদের বড়ো মনের মতো। গৃহস্থালির শোভাবর্ধন করবে। পরের বারে এলে কি আর এঁদের সঙ্গে দেখা হবে? হয়ত তদ্দিনে এঁরা সাগরপারে ড্রয়িং-রুমে!

এরপর শ্রীবাসুর বাড়িতে। বাসুবাবুর এখানে প্রবল প্রতিপত্তি। বিরাট বিরাট বিজনেস ম্যাগনেট তিনি। তাঁর একটি সিনেমাহাউস আছে, তারও নাম 'আই এস' সেখান থেকে খেয়েদেয়ে মন্দিরের পথে রওনা। সাতমাইল হেঁটে মন্দিরে ওঠবার রাস্তা আছে, তিরুমালা পাহাড়ের গা বেয়ে। অতীতে একসময়ে চোল রাজা কৃষ্ণদেব ছিলেন তিরুপতিনাথের মহাভক্ত, তিনি তিরুপতিকে প্রণাম না করে জল খেতেন না। তিনি তাই এ মন্দিরের নকলে পাহাড়ের নিচে একটি মন্দির করেছিলেন নিজের প্রাসাদের কাছেই। তাতেও তিরুপতিনাথ ভেঙ্কটেশ্বরের অবিকল মূর্তি আছে। দুই মন্দিরের মাঝখানে সারাটা পথেই একসারি ঘণ্টা বসিয়েছিলেন তিনি। পাহাড়ের চূড়োয় মন্দিরে পুজো শুরু হবার ঘণ্টা বাজলেই সেই ঘণ্টা থেকে আর এক ঘণ্টায় ধ্বনিত হয়ে খবর পৌঁছে যেত রাজা কৃষ্ণদেবের মন্দিরে। সেখানেও তক্ষুনি পুজো শুরু করতেন রাজা স্বয়ং। এত ভক্তি সত্ত্বেও রাজা যে শুধু নিজেই যবনদের কাছে হেরে গেলেন তাই নয়, শেষ পর্যন্ত তাঁর বংশলোপ হলো। কেন যে এমন হয়? আমাকে গল্পটা বলে শ্রীপার্থসারথি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তখন আমি বললুম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এঁদেরও তো বংশলুপ্তি ঘটেছে। যাঁরা সন্ত, পুণ্যবান ব্যক্তি, তাঁদের তো পুনর্জন্ম হয় না। তাঁরা সবংশেই উদ্ধার পেয়ে যান বোধ হয়। এই ব্যাখ্যাটি পার্থসারথির মনঃপূত হলো। তিনি বলতে শুরু করলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি পড়ে তাঁর কেমন লেগেছিল, পঞ্চাশ বছর আগে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলে মনে করেন। সাধক না হলে কেউ অমন লিখতে পারে না। বাসু কথা কন কম। ড্রাইভার ছাড়া একটি বৃদ্ধ আর একটি খোকা এই দুটি ভৃত্যও চলেছে সামনের সীটে। বাসু মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন তেলুগু ভাষায়। হঠাৎ বললেন—"বড্ড মুশকিল! তিরুপতিতে আজকাল বড্ডই ভি. আই. পি. সমাগম হচ্ছে। তাদের আনো, রাখো, ঘুরিয়ে দেখাও—ওঃ কী ঝামেলা!" ইংরিজিতেই বললেন। বেশ স্পষ্ট ভাষায়। "আ রিয়াল নুইস্যান্স"! আমার মাথায় বাজ পড়ল। তাঁর গাড়িতেই বসে আছি। পেটে তখনও গজগজ করছে তাঁর সুন্দরী স্ত্রী কৃষ্ণবেণীর রান্না করা

BanglaBook.org

অপরূপ কেশর হালুয়া। বাসুর নতুন ঝকঝকে বাড়িতে তাঁর রূপসী স্ত্রীকে খুব মানায়। স্ত্রীর রন্ধনপটুত্বে স্বামী রীতিমতো গর্বিত। বিশিষ্ট অতিথিরা কে কী বলে গেছেন তাঁর হাতের রান্না খেয়ে, বাসুর তা ঠোঁটস্থ। যত্ন করেই তো ঠাকুরঘর শোবার ঘর সব ঘুরিয়ে দেখালেন নতুন বাড়ির। তারপর এইরকম কথা বলাটা কি ঠিক হলো ওঁর? এ কেমন আতিথ্য? তারপরেও বাসু কিন্তু বলেই চললেন—"তাঁদের রিসিভ করতে করতেই প্রাণ গেল! খরচ কি কম? ট্রাকে করে গাঁ থেকে লোক বয়ে আনো, পথে পথে তোরণ বাঁধো, ওরে বাব্বা, সেকি কম পরিশ্রম! তারপর মিটিং ডাকা আছে।" আমি তো ক্রমশই খ হয়ে যাচ্ছি। অ্যাঁ, তোরণ? ট্রাকে করে লোক? এসবও কি হবে নাকি? আমারই জন্যে? এই রোগা আমি! কী জানি বাবা, কত অঘটনই তো ঘটে আমার কপালে, এও হতে পারে। বলা তো যায় না। এবারে যে-রেটে ভি. আই. পি. ট্রীটমেন্ট জুটছে! কিন্তু একটা ব্যাপার—অভিযোগের তালিকায় বাসু একবার একটা মীটিং ডাকার কথাও যেন বললেন না! নাঃ,—তাহলে নিশ্চয়ই আমি না। আমি তো চলেই যাচ্ছি। এ নির্ঘাত রাজনীতির নেতা ব্যাটাদের বিষয় আলোচনা হচ্ছে। উদ্বেগটা ঝেড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি আমিও মহামুরুব্বির মতো আলোচনায় যোগ দিলুম—

"সত্যিই! খুবই ঝামেলা তো? টাউন কংগ্রেসের সভাপতিই বুঝি এসবগুলির ব্যবস্থা-টাবস্থা করেন? টাকাকড়ি আপনাদের কেমন?" এইবার ওঁর সবচেয়ে নরম জায়গায় হাত পড়ল।—"সেইটেই হয়েছে মুশকিল! আমাদের মোটেই টাকাকড়ি নেই। এসবে প্রায়ই প্রাইভেট ফাণ্ড লেগে যায়।"—তিরুপতিনাথ ভারতবর্ষের সবচেয়ে ধনীদেবতা। তাঁরই কিনা কংগ্রেসের টাকা নেই? হায়রে, তবু ভালো যে বাসুবাবুর আছে! নইলে ভি. আই. পি. বেচারীদের তোরণ-টোরণগুলো আর জুটতো না হয়তো। আমি এখানে এসেছি বন্ধুর বন্ধু হয়ে নেহাতই অরাজনৈতিক তীর্থযাত্রী হিসেবে, স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিগত আতিথ্য পেয়েছি। ভাগ্যিস নেতা নই? আমার জন্যে যে তোরণ বাঁধতে হয়নি, ট্রাকে করে লোক আনতে হয়নি—এতেই বাসু যারপরনাই কৃতজ্ঞ মনে হচ্ছে। যতদূর বুঝলাম এমনিতে তিরুপতি দর্শনে বার বার যেতেও ওঁদের বিরক্তি নেই, বরং তৃষ্ণা আছে। প্রায় সপ্তাহেই আসেন।

তিরুপতি মন্দিরের সোনার চূড়ো ঝিকিয়ে উঠলো দূর থেকে—এঁরা সবাই হাতজোড় করলেন। দেখাদেখি আমিও। সুন্দর জায়গা এই তিরুমালা পাহাড়—ঠিক উৎকামণ্ডের মতো। চমৎকার একটি লেক রয়েছে—তার চারিদিকে অজস্র ছোটো ছোটো কটেজ—সব যাত্রীনিবাস। বিভিন্ন ভক্তদের দেওয়া ডোনেশনের টাকায় তৈরি। প্রতি বাড়ির গায়ে দাতাদের নামের তালিকা গাঁথা আছে কালোপাথরে—কে কে কোন বাড়িতে কত টাকা ঢেলেছেন। আশ্চর্য এই ঝরঝরে, পরিচ্ছন্ন ছোট্ট তীর্থনগরী, ঠিক যেন পাশ্চাত্যের কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে এসেছি। সত্যি, হেল্‌থ রিসর্ট, হলিডে রিসর্ট হিসেবে তিরুমালার মধ্যে অতুল সম্ভাবনা। ওখানে চমৎকার একটি বাগান আছে, বোধহয় সেটা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণই হবে—যেখানে একটা পাথরের রথ বসানো আছে। তার চাকাগুলো নেই, শুনলাম মাটির নিচে থেকে গিয়েছে, শহরের যেখান থেকে রথটা তুলে আনা হয়েছে সেখানেই। রথের চারিদিকে ফুলের বাগান, তার ওপাশেই পাহাড়ের সীমানা। নিচে, বহু নিচে দেখা যাচ্ছে সবুজ উপত্যকা, ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি। দূরে ওটা কী? সেই মন্দির না? মহারাজ কৃষ্ণদেবের? হ্যাঁ, ওখানেই ছিল রাজা কৃষ্ণদেবের কেল্লা। ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে দুর্গপ্রাচীর দেখা যায়।

এখানে টুরিস্ট লজ জাতীয় একটা সরকারী অতিথিশালা আছে, সেখানে দ্বিপ্রহরের জন্য একটি ঘর নেওয়া হয়েছে। আমার বাক্স-টাক্স, ঝোলা-টোলা সেইখানে রেখে, আমরা বেরুলুম মন্দির দেখতে।

BanglaBook.org

মন্দিরের পথ পরিচ্ছন্ন, পাথর বাঁধানো। দক্ষিণের তীর্থস্থানের এই গুণটি আছে। পাণ্ডার অত্যাচার নেই, ভিক্ষুকের উপদ্রব নেই, ভক্তদের থুতু, পানের পিচ ইত্যাদি অবশ্যকরণীয় নোংরামিও নেই।—অর্থাৎ ভক্তির সুযোগ আছে কিছুটা।

গাড়িতে চটি রেখে, সবাই খালিপায়ে চললুম।—পথে একটি ছেলে এল তিরুপতিমাহাত্ম্য বেচতে। তাকে বললুম ফেরার পথে কিনব। একটু পরেই দেখি দীর্ঘ, সর্পিল কিউ। সেখানে যেই দাঁড়াতে গেছি—ওটা নয়, ওটা নয়। ওটা 'সর্বদর্শনে'র কিউ। 'স্পেশাল দর্শনে'র দরজা আলাদা। হা ভগবান তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বর! তোমার কাছে যাবার বুঝি ভিন্ন ভিন্ন পথ? যমের দুয়োরের মতো? জন্মের দ্বার যেমন একটাই—তেমনি দেবদর্শনের দ্বারও একটাই হওয়া উচিত। অবশ্য তা যদি সত্যিই হতো তবে দেবদর্শন সেরে আজই সন্ধ্যার প্লেনে আমার হায়দ্রাবাদ হয়ে দিল্লী যাত্রাটি আর সম্ভব হতো না। অতএব শত শত পূর্ববর্তী মানুষ, শিশু-নারী-বৃদ্ধকে পিছনে সর্বদর্শনের কিউবন্দী রেখে, চোরের মতো মাথা নিচু করে বাসু ও পার্থসারথির পিছু পিছু 'স্পেশাল-দর্শনে'র চওড়া দরজা দিয়ে চুপি চুপি মন্দিরে ঢুকে পড়লুম। মন কিন্তু সায় দিল না।

৫

দর্শন পর্ব

দরজার সামনে সিঁড়ির নিচে দিয়ে শাওয়ার মতো করে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ক্ষীণধারার ঝিরঝিরিয়ে জল বেরিয়ে আসছে, যাত্রীদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। প্রথমেই বিরক্তি হলো। কী জ্বালা, পা কাদাকাদা হয়ে গেল! তারপরে হঠাৎ সন্দেহ হয়, এ বুঝি আচমনের অঙ্গ—পা দুটি জোর করে ধুইয়ে নেওয়া হচ্ছে মন্দিরে প্রবেশের আগে। মন্দিরে ঢুকতে গেলে বিশাল রুপোর তোরণ পার হতে হয় দু'একটা। গুনিনি ঠিক কতগুলো। অত মোটা-সোটা রুপোর পাত বাঁধানো উঁচু চওড়া চৌকাঠ পা দিয়ে মাড়াতে মাথা ঘোরে—কথাটা বলতেই বাসু সগর্বে বললেন—"এর পরেরটা তো সোনার চৌকাঠ, বাটি সোনার তোরণ।" বেজায় রাগ হয়ে গেল। সোনা রুপো বুঝি এমনি মাড়িয়ে যাবার জিনিস? ওদিকে 'সর্বদর্শন' কিউ এর দিকে তাকিয়ে দেখলুম—যাঁরা কত কষ্ট করে চলেছেন সোনার গেট মাড়িয়ে, তাঁদের অধিকাংশেরই আপন অঙ্গে সোনার কুচি থাকার চিন্তাও স্বপ্নবৎ। অবশ্য দক্ষিণে দারিদ্র্যের সেই উৎকট হতশ্রী চেহারাটি নেই, উত্তরে নগ্নভাবে যেটা চোখে বেঁধে। দক্ষিণে দরিদ্রের মধ্যেও একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। এটা কেন, কী কারণে, অতঃশত অর্থনীতিবিদরা জানবেন অথবা সমাজতাত্ত্বিকেরা। এটা আর্থিক কারণে, না সমাজচরিত্রের গুণে, তা আমি জানি না: কিন্তু পার্থক্যটা খুবই স্পষ্ট।

তিরুপতি যাবার পথে প্রায়ই নেড়া-মাথা বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ চোখে পড়ে। ছেলেদের মতো চুল, যাকে 'বয়জ কাট' বলে, তেমনি ফ্যাশনেবল চুল নিয়ে বহু গ্রাম্য স্ত্রীলোক হরদম হাটবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রথমে এটা খুব অবাক লাগলেও যেই মনে পড়লো এই মন্দির প্রচুর বিদেশী মুদ্রা কুড়িয়ে আনে বহির্বিশ্বে চুল বেচে, পরচুলার ব্যবসায়ে—অমনি ব্যাপারটা বোঝা গেল। এখানে হামেশাই চুল মানত করা হয়। "মেয়েদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান, প্রিয়তম বস্তু হলো রূপ"—বললেন পার্থসারথি। "সেই রূপ চুলেই অনেকটা নিহিত। মেয়েরা যখন ভেঙ্কটেশ্বরের কাছে কিছু চেয়ে পায়, তখন তাঁর কাছে সেই প্রিয়তম বস্তুটিই নিবেদন করে যায়। ভেঙ্কটেশ্বর আমাদের বড়ো জাগ্রত ঠাকুর। মন্দিরে ঢোকার আগে আপনাকে নাপিতখানাটা দেখিয়ে নিয়ে যাব, যেখানে মস্তক মুণ্ডন করা হয়।"

বড়ো বেড়া দেওয়া দরজার পাশে ছোটো বেড়া দেওয়া দরজা—সেখানেও দুটো ভাগ, সর্বদর্শনের

BanglaBook.org

প্রবেশপথ এক কোণে—আর স্পেশাল দর্শনের প্রবেশ মধ্যভাগে—হায় দৈব সুবিচার! বিজ্ঞাপনে পড়লুম, ২৫ টাকায় স্পেশাল দর্শন টিকিট কেনা যায়। কিন্তু আমরা, আমি যতদূর বুঝলুম, বিনা টিকিটের যাত্রী। আমাদের বোধহয় 'পাশ' আছে। সেই পাশ হলো মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের পদ, আর টাউন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব। আমি হচ্ছি ফাউ। ঢুকলুম মন্দিরে। সুমুখেই সোনার ধ্বজদণ্ড দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মন্দিরেই এই লক্ষণটি আছে—গর্ভগৃহের আগে চওড়া দালান—নাটমণ্ডপ, তারও আগে ধ্বজদণ্ড। ধ্বজদণ্ড এবং একটি সোনামোড়া স্তূপমতন—এটা যে কী বুঝতে পারিনি। সবাই দুটোকেই প্রদক্ষিণ করছে। ওগুলির গায়ে মাথা ঠেকাচ্ছে। সিঁদুর-কুঙ্কুম ঢালছে, ঘৃতপ্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছে নিচে। তারপর আবার তোরণ। আবার একচিলতে উঠোন—তারপর দুটো বড়ো বড়ো, সোনারই বোধহয়, দরজা। তারই একটা দিয়ে ঢুকে দেখি অহা স্বর্গের দৃশ্য! ফুল-চন্দন ধূপ-ধুনোর সুরভির মধ্যে শুদ্ধ পবিত্র এক পরিবেশে বেশ কয়েকজন ফোঁটাকাটা ব্রাহ্মণ গোল হয়ে বসে মনের সুখে গাদা গাদা টাকা-পয়সা গুনছেন দালানের একদিকে। আরেকদিকে আরো কয়েকজন ব্রাহ্মণ বসে ক্রমান্বয়ে নিবিষ্টচিত্তে পাহাড়প্রমাণ সরু চাল বাছছেন। এই দালানে অর্থ, অন্ন, দুয়েরই ছড়াছড়ি। এ কোন্ ভারতবর্ষ? আরো একদিকে সর্বদর্শনের প্রবেশ ঘটছে এবং নিষ্ক্রান্ত হওয়াও। আমাদের জন্য এককোণে কম্বলের আসন পেতে দেওয়া হলো। চালটা ভোগের জন্য। টাকাগুলো প্রণামী। আমি বসে বসে আদেখলে হয়ে মুগ্ধ নয়নে টাকা গোনা দেখতে লাগলুম। ভগবৎচিন্তা চুলোয় গেল। এতটাকা একসঙ্গে জীবনে দেখিনি। দশটাকার নোট, একশো টাকার নোট, পাঁচ, দুই, এক আলাদা আলাদা তোড়া বাঁধা হচ্ছে, খুচরোও গুনে গুনে স্তূপ করা হচ্ছে ভাগে ভাগে। ওই বিশেষভাবে পবিত্র অঞ্চলটির পবিত্রতা রক্ষায় রাখছেন বন্দুকধারী পুলিশের দল। ঘিরে দাঁড়িয়ে। দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণে, পিছনদিকে লোহার বেড়াজালের মধ্যে প্রকাণ্ড এক সাদা কোরা কাপড়ের থলি—হ'সাত ফুট উঁচু হবে। ভক্তেরা সারি বেঁধে এসে তার মধ্যে টাকাকড়ি ঢালছেন। সেখানেও ঝিকঝিকে সশস্ত্র পাহারা। ওই থলির নাম হুন্ডি—এটা মানতের থলি যে যা মানত করেন, ওরই মধ্যে ফেলে দেন। মানত করা চুলের জন্যেও হুন্ডি আছে। ঢোকবার আগেই দেখে এসেছি মন্দিরের বাইরে একটা নাপিতঘর—সেখানে সারি বেঁধে পাশাপাশি ভক্তেরা উবু হয়ে বসে চুল কাটছেন। মেয়েরাও মাথা কামাচ্ছেন হাসিমুখে। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের এমন একটি একক নিখরচার কারখানা ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। আমি কদাচ কুত্রাপি যা দেখিনি—এই মন্দিরে হতবাক হয়ে তাই দেখছি। এমন সময়ে ডাক পড়লো, উঠে গর্ভগৃহের দরজায় ঢুকলুম—এবারে সবাই সমান! এখানে সর্বদর্শন আর স্পেশাল দর্শনের আলাদা কিউ নেই। কি ভাগ্যি!

ঢুকেই অন্ধকারে একটা উঁচু চৌকাঠে উঠে দাঁড়ালুম, খুব ভিড়, দম আটকানো, যদিও শৃঙ্খলায় সুবিন্যস্ত যাত্রীদল। যেই মনে হলো সোনার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি, অমনি কেমন তিক্ত বিস্বাদ হয়ে গেল মন। পা যেন পিছলে যেতে চায়। টাল সামলাতে হাত বাড়ালুম সোনার দরজা ধরতে: ধরি কাকে—দরজাগুলো বিরাট। চৌকো চৌকো ফোকর অবশ্য কাটা আছে, তার ভেতর আমার ক্ষুদ্র হাতটি ভরতে চেষ্টা করলুম। সামনেই একটি আধো-আঁধারি ঘরের দেওয়ালে সাত-আটটি গডরেজের লৌহসিন্দুক অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো। সিন্দুকবৃন্দ দানবীয় গরিমায় খাড়া হয়ে আছেন সারি সারি প্রহরীর মতো। বুঝলুম ওদের মধ্যেই তিরুপতিনাথের বহু প্রসিদ্ধ রত্নাভরণ সব সুরক্ষিত: ওপাশে একটি প্রমাণমাপের বিশাল রুপোর সিংহাসন অনাদরে উল্টে আছে পাথুরে মেঝেয়. দেখে আবার মনে পড়লো, আমার পায়ের নিচে রয়েছে সোনা বাঁধানো চৌকাঠ। অমনি পা-টা বড়ো দুর্বল বোধ হলো, আপনিই হাত এগিয়ে এল অবলম্বনের আশায় হুন্ডেটে সোনার দরজার দিকে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় 'পেতল' শব্দটা, সঙ্গে সঙ্গে হাতে লাগে শীতল ধাতুর স্পর্শ—মনে হলো 'ধাতু' শব্দটা এবং কেউ যেন আমার মধ্যে বলে উঠলো—ওহে হাঁদারাম, দেবতার কাছে

BanglaBook.org

পেতলও যা, সোনাও তা, রুপোও তা, লোহাও তা, সবই তো ধাতু। মাটির বুকের জিনিস। সোনার আর লোহার যা তফাত তা কেবল তোমার কাছেই—ভেঙ্কটেশ্বরের তাতে ভারি বয়েই গেল! মানুষের দোষে দেবতার উপর রাগ করে কী করবে!

তক্ষুনি সামনে চেয়ে দেখি পুরোহিত মস্ত স্বর্ণপ্রদীপ তুলে ধরেছেন, তাতে ঝলমলিয়ে উঠেছে ভেঙ্কটেশ্বরের মণিরত্নখচিত, বিপুল তিলকশোভিত, চোখে চন্দনের পট্টি-বাঁধা বিগ্রহ। চিবুকেও মস্ত এক ধাবলা চন্দনতিলক। মোটামুটি তাঁকে খুব সুশোভন, সুদর্শন ভাবতে কিন্তু পারলুম না। মুখখানিই যে মুখোশের মতো তিলকে তিলকে ঢাকা। আর অত ধনরত্নে অঙ্গ ভারী। দক্ষিণ হস্ত নত বরদমুদ্রায়, হাতের পাতাটি পর্যন্ত মণিরত্নের দস্তানায় ঢাকা। স্বয়ং ঈশ্বরেরও এত ঐশ্বর্যে মন বড়ো ধাক্কা খায়। ভাবতে ভাবতে দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার ঠিক পিছনের গ্রাম্য মানুষটি কাকে যেন চিৎকার করে ডেকে উঠল—"গোবিন্দ! গোবিন্দ-ও-ও-ও! গো-ও-বিন্দ—!" গোবিন্দ বুঝি হারিয়ে গিয়েছে? গোবিন্দ কোথায় গেল এই ভিড়ে, এই অন্ধকারে? ওহে গোবিন্দ, তুমি কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে পিছনে একদল ব্যাকুল স্ত্রী-পুরুষ স্তব্ধ মন্দির কাঁপিয়ে দিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে ডেকে ওঠে—"গোবিন্দ! গোবিন্দ-ও-ও-ও! গো-ও-বিন্দ-ও!" সেই কাতর গোবিন্দ ডাক আর থামলো না। সর্বদর্শনের মানুষের সঙ্গে আমারও বুকের গভীরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলে সেই আহ্বান। না, এ কোনো একজনের হারানো সন্তানের প্রতি নয়—এ ডাক প্রত্যেকের যার যার নিজের হারিয়ে যাওয়া স্বকীয় সত্তার প্রতি। ফিরে আসার ডাক। জীবনে তীর্থ করতে যাইনি, জানি না এটাই নিয়ম কিনা। কিন্তু আমি এর আগে কোনো দেবতার প্রতি কখনো শুনিনি এমন নিবিড়, এমন আকুল, এমন আন্তরিক বিনা-সাজের পারিবারিক সুরের ডাক—। এ যেন সন্ধ্যের পর মাঠে গিয়ে না-ফেরা গোরুটির নাম ধরে ধরে উদ্বিগ্ন রাখালের হাঁক। কিংবা দুধের গেলাস হাতে বাগানে গিয়ে দুষ্টু ছেলেটিকে মায়ের ব্যাকুল ডাকাডাকি। এই পাগল-করা গোবিন্দ-হাঁকের মধ্যে কখন যেন চলে এসেছি বিগ্রহের ঠিক সামনে। পুরোহিত মাথায় স্পর্শ করিয়েছেন পবিত্র রত্নমুকুট, হাত পেতে কখন বুঝি অঞ্জলিতে নিয়েছি চরণামৃত। সামনে থেকে দেখেছি সেই চন্দনচর্চিত রত্নমূর্ছিত মূর্তি। বিগ্রহের মুখ দেখা গেল না, মুখ দেখতে পেলুম না, মনে এই খুঁতখুঁতুনি নিয়ে বেরিয়ে এলুম। মাঝখানে দড়িবাঁধা, একপাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে ফিরে বেরিয়ে আসছেন ভক্তরা। ভেতরে মন্দিরের প্রহরী—পুরুতের চেড়ীর দল কঠোর স্বরে হাঁকছেন—"বেরিয়ে যান...বেরিয়ে যান...।" হায়! এই কি দেবতার মন্দিরে উচ্চারণ করার যোগ্য কথা? এঁরা তিনচার ঘণ্টা ধরে কড়া রোদের মধ্যে সারি বেঁধে অপেক্ষা করছেন কত ভালোবাসায়, কত ধৈর্যে; শান্ত হয়ে। কত দূর দূর থেকে ভক্তরা ছুটে এসেছেন—মাত্র এইটুকুর জন্যে? এই অতিকৃপণ একটি মুহূর্তের ঝাঁকি দর্শন? এ তো ফাঁকি দর্শন। এ কী অতৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফেরা! মুখখানি তো মনেই থাকবে না; দেখাই হলো না যে। ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এসেই আবার ওপাশের দড়ির তলা দিয়ে গলে ঢুকে পড়ি। আরেকবার যাই। মুখখানা দেখে আসতেই হবে সামনে গিয়ে, পৌঁছেও সেই চন্দন-কলঙ্কিত, মুখোশ-পরা মুখ আবার অতৃপ্তি নিয়ে বেরিয়ে আসছি, মনে মনে ঝগড়াই করে ফেলি এবার তিরুপতিনাথের সঙ্গে। কেমন দেবতা হে তুমি? খুনে ডাকাতের মতো চোখে পট্টি বেঁধে মুখে মুখোশ পরে বসে আছ? মুখই যদি না দেখতে দিলে তবে ডেকে এনেছ কেন এই এতজনকে? একি কেবল সোনার বেলা রুপোর বেলা দেখে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে? অঙ্গ তো মুড়ে রেখেছ মণিমুক্তোয়। মুখখানা পর্যন্ত ছোপছোপ চন্দনে লেপাপোঁছা! চোখই যদি না দেখতে পেলুম, তাহলে দেখাটা হবে কার সঙ্গে? কেমন করে?

এমন সময়ে দেখা হয়ে গেল। একেবারে অভাবিত। চোখে চন্দনের পট্টি বাঁধা, চিবুকে চন্দনের পট্টি বাঁধা, কিন্তু ঠিক মধ্যিখানে ঝিকিয়ে উঠলো নিখুঁত নাসার তলায় একজোড়া ঠোঁটে কালোপাথরের

BanglaBook.org

দুষ্টু হাসি। স্পষ্ট কৌতুকে উজ্জ্বল। "কেমন জব্দ? মুখ দেখা হয়নি? নাই বা হলো। দেখি তো কেমন করে ভুলবে আমাকে? এ না-দেখা মুখখানই মনে থাকবে, তাড়া করে ফিরবে তোমাকে এই হাসিটা।" কষ্টিপাথরে খোদা সেই অনিন্দাসুন্দর হাসিটি সত্যিই বুকের ভেতর খোদাই হয়ে যায়। যেমন বহু-পরিচিত প্রিয় বন্ধুর ঠাট্টা। ধন্য সেই নামহীন শিল্পী, যাঁর হাতে গড়া এই বিশাল কালোপাথরের বিগ্রহ। একটিই পাথর কুঁদে গড়া ভেঙ্কটেশ্বরের মূর্তি। পুজো করবার জন্যে দেবতার রূপ ঠিক কেমন হবার কথা জানি না—তবে কানামাছি খেলার কোনো প্রিয় সাথীকে দেখছি বলে আমার মনে হলো। খোলা তো কেবল দুটি ঠোঁট, তাতেই রূপ, তাতেই প্রাণ, তাতেই অফুরন্ত কৌতুক। সেই রূপে আধ্যাত্মিক শান্তি বা পারত্রিক মুক্তি কে কী দেখেন জানি না, আমি দেখেছি অখণ্ড ভালোবাসা। অঢেল তারুণ্য। প্রাণশক্তি। বেরিয়ে এসেই হাতে শালপাতার বাটিভর্তি খিচুড়ি-প্রসাদ পেলুম 'পোঙ্গল রাইস'—সেদিন ১৭ই। ১৪/১৫ই ছিল পুণ্য 'পোঙ্গল' তিথি, দাক্ষিণাত্যে মকর সংক্রান্তির নবান্ন উৎসব। বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাদ খেলুম—সামনেই দুটি বড়ো বড়ো ঝুড়ি রাখা, সবাই প্রসাদ খেয়ে ঠোঙাটি তার মধ্যে ফেলছেন। পরিচ্ছন্ন পাথরের প্রাঙ্গণে সিঁদুরটুকু পড়লেও তুলে নেওয়া যায়, এমনই পরিপাটি। উত্তরাঞ্চলের কোনো তীর্থেই এটা কল্পনা করি না। সেখানে এই ঝুড়িটা পড়ে থাকতো শূন্য হয়ে, আর এঁটো ঠোঙাগুলো থাকতো ইতস্তত মাটিতে ছিটোনো। তারপর কাকে-কুকুরে ধাঁড়ে-ভিখিরিতে টানাটানি চলতো। এবারে এলো মন্দির-প্রদক্ষিণ পর্ব। সেদিকটা বোধহয় মন্দিরের উত্তরেই হবে—মন্দির-শিখরের কাছে এক কোণে একটা কালো টিনের তীরচিহ্ন লাগানো আছে—সেটা দেখিয়ে বাসু বললেন— "বাইরের এই সিঁড়িতে বসে বহু একজন সাধক বহুকাল সাধনা করেন। তাঁকে দেখা দিতে তিরুপতিনাথ ভেঙ্কটেশ্বর স্বয়ং একবার এইখানেই মন্দিরের গায়েই আবির্ভূত হন, বলসে ওঠেন। ঐ দেখুন তার চিহ্ন।" মন্দিরের সোনার চূড়োর গায়ে বহুবিধ সোনার কারুকার্য—তারই মধ্যে এককোণে দেখি বসিয়ে রাখা আকস্মিক একটি ভেঙ্কটেশ্বরের সোনার মূর্তি। তাঁর হঠাৎ দেখা দেওয়ার স্বর্ণচিহ্ন। ভিজিয়ে ভাঙ, বেখাপ্পা।

বাইরে এসে শিশ্‌মহলের সিঁড়িতে বসে রইলুম। ওঁরা মন্দিরের পেশকারের সঙ্গে কথা বলে 'নির্ভেজাল' মহাপ্রসাদ কিনতে পাঠালেন। এ জীবনে সর্বত্রই মহাপ্রসাদে বড় ভেজালের ভয়! শুনলাম শিশ্‌মহলের সর্বত্র দেওয়ালে আয়না বসানো। একটা কী দিলে ভেঙ্কটেশ্বরের একটি নকল মূর্তি ওই ঘরে এনে দেখানো হয়—চতুর্দিকে ঘরভর্তি করুণায় ঝলমলিয়ে ওঠেন ভেঙ্কটেশ্বর। ইন্দ্রিয়ের সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। মোগল বাদশারা এটা ভেবে বের করেছিলেন—(রাজপুত রাজারাও) নর্মের প্রসঙ্গে। এঁরা সেটাই প্রয়োগ করছেন ধর্মে। মন্দ কি? অবশ্য আপাতত সে ঘরে বিরাট তালা ঝুলছে! মহাপ্রসাদের অপেক্ষায় সিঁড়িতে বসে রইলুম। অন্তবিহীন কাল ধরে আমার কানের ভেতরে কান জুড়ে বাজতে লাগল সেই আকুল করা গোবিন্দ ডাক, আর চোখের ভেতরের চোখদুটি ঝলসে রইলো একজোড়া কালো ঠোঁটের চাপা হাসির আলোয়।

বেরুবার পথে সেই ফেরিওলা ছেলে এল তিরুপতি মাহাত্ম্য বেচতে। ঠিক যেন অরণ্যদেব জাতীয় 'কমিক' ছবিতে দৈব মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। বেশ কমার্শিয়াল বস্তু। তারপরে দেখতে গেলুম শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবীকে। তিনি সমতলের বাসিন্দা, স্বামীর সঙ্গে পাহাড়ে ওঠেন নি। পাদদেশেই আছেন, আলাদা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা। দক্ষিণী মন্দিরের নিয়মে, পদ্মাবতীর মন্দিরের সামনেও সুন্দর চৌকো পুষ্করিণী। শুনলাম সধবা মেয়ের অত্যাবশ্যক তুক—পদ্মাবতীর সিঁদুর। স্বামী-সোহাগিনী পদ্মাবতী হলেন বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী। ওদিকে পাহাড়ের ওপরে তিরুপতিনাথ স্বয়ং নারায়ণ—শুনলাম তিনি নাকি শনিদেবতা—তাই তাঁর চক্ষুদুটি অমন চন্দনে বাঁধা। এক চিমটি সিঁদুর নিয়ে যাব নাকি সঙ্গে? এ দেখি বেশ মজার দাম্পত্য! পদ্মাবতী ছায়া ইব স্বামী-সন্নিধানে থাকেন না, দিব্যি সিবারেটেড দেবী। (মা কালীর মতো অবশ্য নন!) স্বনির্ভরা পদ্মাবতী যখন

অতদূরে একা থেকেও সতীলক্ষ্মী স্বামী-সোহাগিনী, তখন অন্যে পরে কা কথা!

৬

স্বর্গারোহণ পর্ব

প্রথম সর্গ

পদ্মাবতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট। বিকেলের প্লেনে ছুটবো হায়দ্রাবাদ। ওখানে গিয়ে ধরতে হবে দিল্লীর সান্ধ্য জাহাজ। রাত সাড়ে দশটায় দিল্লী। কাল ভোরবেলা কাশীর প্লেন। হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্টে শ্রীদামোদরন্ ও চন্দ্রশেখর তো উপস্থিত ছিলেনই। তাছাড়াও ছিলেন মামার বন্ধু বিজনবাবু, আর ইন্দুর বন্ধু সতীশ গুপ্তাজী। আমার কুম্ভযাত্রার সংবাদে তাঁরা দুজনেই যারপরনাই উদ্বিগ্ন, বিমর্ষ হয়ে পড়লেন ও সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে দুটি চিঠি দিলেন—একজন দিলেন এলাহাবাদের মিলিটারী হাসপাতালের সার্জন কর্নেল সিন্‌হাকে, অন্যজন দিলেন—বারাণসী অঞ্চলের ডিভিশনাল কমিশনার শ্রীমিট্টালকে। ব্যাস আর ভাবনা নেই, ওঁরা বললেন, দে উইল টেক গুড কেয়ার অফ য়ু। আমি সবিনয়ে চিঠি দুটি নিলুম। হায়দ্রাবাদের টিকিও দুটি ঠিকনা দিয়েছেন। বেশ সশস্ত্র বোধ হলো নিজেকে। এতগুলি সম্ভাব্য অভিভাবক, এ ছাড়াও একটা জরুরী চিঠি পেয়েছি, পি. বি. আই.-এর এক কর্তাব্যক্তির কাছে। এখন মুশকিল হচ্ছে যোগাযোগটা করব কার সঙ্গে, আমি মোটেই চয়েস থাকা পছন্দ করি না। চয়েস থাকলে ডিসিশন নেবার প্রশ্ন, বাছবাছির ঝামেলা। তার চেয়ে একটাও না থাকা ঢের ভালো। অতএব সর্বোত্তম পন্থা হবে আমার পক্ষে কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ না করা।

ওদিকে আসল খবরই মন্দ। দিল্লী থেকে বারাণসীতে যাবার বুকিং এখনও কনফার্মড্ হয়নি। রিকোয়েস্ট গেছে ১৪ তারিখেই, এখনও খবর আসেনি। তবে সবাই বললেন, ভাবনা নেই, ও ঠিক হয়ে যাবে। মস্ত বড়ো জেট্ প্লেন। বহু সীট খালি থাকে।

ঘণ্টা তিনেক বাদে, উদ্বিগ্ন চিত্তে ১২০০ মাইল পেরিয়ে, দিল্লীতে নামলুম। খবর নিতে গিয়ে শুনি আমার নামে কদাপি কোনো রিকোয়েস্ট আসে নি মোটেই। সীট তো দূরের কথা, আমি কোনো ওয়েটিং লিস্টেও নেই। কারণ কেন, ২০এর আগে বারাণসীর কোনো প্লেনেই একটাও সীট নেই। সব ভর্তি। শুনে আমি পপাত ধরণীতলে! আঃ, তাহলে বৃথা আমি দিল্লীতে এলুম কেন? মধ্যপথে কে স্ট্র্যাণ্ডেড্ হতে চায়? এই সুদূরে? এখন দিল্লী থেকে এলাহাবাদ যাই কী উপায়ে? ট্রেন? বেশ ট্রেনেই যাব। অনেক স্পেশাল ট্রেন দিচ্ছে কুম্ভে, শুনেছি। কিন্তু তাতে কি ঠিক সময়ে, অর্থাৎ মৌনী অমাবস্যার লগ্ন থাকতেই পৌঁছুতে পারব? মৌনী অমাবস্যা নাকি মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে। অর্থাৎ সোম রজনী। অর্থাৎ প্রধান স্নান কালই মধ্যরাত্রের পরে। ওটাই তো দেখতে চাই। ওই মহাস্নানে যোগ দিতে চাই।

অগত্যা স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্টের ঘরে গিয়ে হানা দিই। মরিয়া। "দয়া করে যদি আমার নামটা ওয়েটিং লিস্টে তুলে নেন কাল ভোরে ছ'টার বোয়িং ফ্লাইটেও, ছ'টা পঞ্চাশের কক্ষার ফ্রেণ্ড-শিপেও?"—প্রায় সাহেবী চেহারার পাঞ্জাবী অফিসার ভুরু তুললেন—"দুটোতেই? দুঃখিত, দুটোতে হবে না। একটা ঠিক করুন।" আবার চয়েস!

—"নহীঁ জী! নহীঁ ভাইসাব! প্লীজ সার! কাইন্‌ড্‌লি, মেহেরবানি, দুটোতেই রাখুন আমাকে! ভয়ানক আর্জেন্ট! আমাকে যেতেই হবে যে?" শেষ পর্যন্ত ভুরু নামলো; নাম উঠলো দুটোতেই। এক তালিকায় আমি তেত্রিশ নম্বর, অন্যটায় পঞ্চদশ। অর্থাৎ কোনো ফ্লাইটেই ঠাঁই নেই! রাত সাড়ে বারোটার পরে মন খারাপ করে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসি। কি ভাগ্যি ঠিক সময়ে রাজগোপালের টেলিফোনে খবর পেয়েছে মামাবাড়ির ভীম ড্রাইভার। ভাগ্যিস ভীম ছিল! ঢের

BanglaBook.org

রাত হয়ে গেছে। 'মামাবাড়ির আদর' বস্তুটা আমার মতো করে কেউ চেনেনি। মামাবাড়ির বাধা গ্রেটডেন সীজার পর্যন্ত আমাকে মামাবাড়ির আহ্লাদ সাপ্লাই করে। পালামে নেমেই দেখেছিলুম এয়ারপোর্টে শ্রীমতী মায়া রায় এবং শ্রীনীতীশ সেনগুপ্ত প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। না, এঁরা ঠিক আমাকে রিসিভ করতে আসেননি অবশ্য। সিদ্ধার্থ রায়ের প্রত্যাগমনে উৎসুক হয়ে এঁরা সমাগত। কলকাতার প্লেন আসছে মুখ্যমন্ত্রীকে পিঠে নিয়ে। তাই তো! আমার প্লেনে ঠিক সামনের সীটেই শ্রীভেঙ্কলরাও দিল্লী এলেন বটে, তিনি অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী। কাল তবে একটা কিছু মিটিং-টিটিং আছে বোধহয় মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে। [দুদিন পরেই বোঝা গেল ১৭ই রাত্রে দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীদের আগমন কেন ঘটেছিল, পরদিন ১৮ই ডিসেম্বর মীটিং ছিল তাঁদের। ১৯শেই ঘটলো লোকসভার নির্বাচনের ঐতিহাসিক ঘোষণা।] নীতীশ আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধু। হঠাৎ দেখা হতে খুব খুশি হলো, আমারও খুব ভালো লাগল। সুন্দর রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে পারতো নীতীশ—তার মধ্যে একটি কবিপ্রকৃতি লুকিয়ে আছে। একবার লণ্ডন থেকে কেম্ব্রিজে আমাদের বাড়িতে আসতে গিয়ে রাস্তার শোভা নিরীক্ষণ করতে করতে নীতীশ পথ ভুলে সোজা নরিচে চলে গিয়েছিল। সেখানে নেমে স্টেশন থেকে কেম্ব্রিজে ফোন করে বললে—"এবার কী হবে?" সেই নীতীশ।

হায় হায়, তখনই কেন নীতীশকে বললুম না? ডি. আই. পি. কোটায় একটা সীট হয়তো বা যোগাড় করে দিত। এখন রাত্তির সাড়ে বারোটা, কাকেই বা পাব, কোথায় বা যাব। কাল প্রথম প্লেন ছটায়,—রিপোর্টিং টাইম পাঁচটা। তার আগে কোনো রকমেই দড়ি-টানাটানি করা যাবে না। মহামান্য দড়িরা সবাই নিদ্রামগ্ন থাকবেন। দিল্লীতে বহুদিন বাস করেছি—একদম সেন্টিমেন্ট নেই তা নয়, কিন্তু সময়টা যে বড়োই বেয়াড়া! কী করি? হঠাৎ মনে পড়ল সুনীলদার কথা। অমনি গাড়িটা নিয়ে সোজা উপস্থিত হলুম আমার দাদাভাইয়ের বন্ধু সুনীল ভট্টাচার্যের বাড়িতে। ঘুমন্ত পাড়া। নিস্তব্ধ ঘুমন্ত বাড়ি। ভীম আর আমি বেপরোয়া পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে খুবসে পুলিশী হামলা জুড়ে দিলুম। আমি সদরে, ভীম খিড়কির চার্জে! বৌদি ঘুমচোখে উঠে ভয়টয় পেয়ে এক ইঞ্চি দোর খুললেন—আমাকে দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। এই না হলে ননদিনী রায়বাঘিনী? মাঝরাত্তিরে উৎপাত করে ভালোবাসা আদায়! কী উপদ্রব! কিন্তু এযা বৌদি অন্যজাতের বৌদি। অম্লানবদনে উঠে এসে আড্ডা জমালেন—কিছু তো বললেনই না, উল্টে সংক্রান্তি উপলক্ষে এক জামবাটি নলেনগুড়ের পায়েস জোর করে খাওয়ালেন। সুনীলদার বন্ধু নটরাজন আছেন পালামে রিজার্ভেশনে, তাই কাল সুনীলদাকে ধরে নিয়ে যাব পাঁচটার সময়ে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমাদের সুনীলদা সর্বশক্তিমান। আড্ডা মেরে দেড়টা নাগাদ ফিরলুম। তারপর এলার্ম লাগিয়ে ঘুম। ভোররাত্রে উঠে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দে দৌড়। সুনীলদার বাড়িতে গিয়ে হাজরে, আবারও সেই দুর্ধর্ষ কাণ্ড! সুনীলদার ঘুম আর ভাঙে না। ধাক্কড় ধাঁই করে ধাক্কিয়ে দরজা তো খোলানো হলো। লজ্জিত, ঘুমন্ত সুনীলদাকে কোনোরকমে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে পুরে নিয়েই ছুট্ ছুট্—পালাম—সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে! না, ছ'টার বোর্ডিং-এ আর হলো না। কেবল খাজুরাহোমুখী শিল্পকাতর মার্কিনী ভ্রমণার্থীতেই তিনি পরিপূর্ণ। তাছাড়া বাকি সবকটা সীটও ভরা। তেত্রিশজনের ওভারবুকিং লিস্টের একজনেরও ঠাঁই হবে না! এবার বারাণসীর ফকার ফ্রেণ্ডশিপের দিকে ভিড়ি। নাঃ, ওতেও হবে না। ভদ্রলোক অনায়াসে মাথাটি নেড়ে চলে গেলেন, "তার চেয়ে বরং লক্ষ্ণৌ যান" বলে। সত্যি এঁদের আচরণ দেখে মনে হয়, যন্ত্রমানব দিয়ে কাজ চালানোর বরং আরেকটু দয়ামায়া থাকার চান্স আছে। অনেকক্ষণ ধরে কাতর অনুনয়-বিনয় করে ব্যর্থ হয়ে শান্ত মানুষ সুনীলদা এবার চটে উঠে বললেন—"তাহলে তো আমার বন্ধু নটরাজনকে বলতে হয়"—অমনি ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারলুম নিঃশব্দে, কোথায় কী একটা অঘটন ঘটলো। কেসটি পুরোপুরিই ফেঁসে গেল। নটরাজনের নামে কর্তব্যরত অফিসারের নির্বাক মুখে যে সূক্ষ্ম ভাবের উন্মেষ হলো, তাতে দর্শকের হৃদয়ে আর যাই হোক ভরসা জন্মায় না। শান্তকণ্ঠে তিনি

BanglaBook.org

বললেন "বেশ তো তবে যান মিস্টার নটরাজনের কাছে। তাঁর ডিউটি সাড়ে দশটায়।"...এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। আমার প্লেন ছ'টা পঞ্চান্নতে—এটি ছাড়া আর প্লেন নেই কালকের আগে। আমি হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলে উঠলুম—"অ মশাই, নটরাজন্ জাহান্নমে যান, তাঁকে আমি চিনি না। এখানে আপনিই সর্বেসর্বা, আপনিই আমার হুজুর-মা-বাপ, উদ্ধারকর্তা, সেভিয়ার—দয়া করে আমাকে রক্ষা করুন। সীটটা দিয়ে দিন ভাই, পুণ্য করতে কুম্ভে যাচ্ছি। আজকের ফ্লাইট মিস করলেই একশো চুয়াল্লিশ বছরের মতো ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে কিন্তু। তখন দায়ী হবেন আপনি!"—"গোইং আগোন? টু কুম্ভ্?" এক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকালেন।

—"একা নয় তো কি? পাপ-পুণ্য কি দল বেঁধে ভাগাভাগি হয়? এই দেখুন আমার টিকিট, আমি সেই তিরুপতি থেকে এখানে ছুটে এসেছি—কি জন্যে? কেবল এই আজ এলাহাবাদে যাব বলে। আপনি একটু ইচ্ছে করলেই হয়ে যাবে।—ভি. আই. পি. সীট-টিট অনেক কিছু ফাঁকফোকর থাকে। আমি জানি, আপনার হাতেই সব।" ভদ্রলোক উত্তর না দিয়ে কী সব লিখতে লাগলেন। অন্য মনে।

আমার কথাটা যে অভ্রান্ত, তার প্রমাণস্বরূপ মিনিট পঁচেকের মধ্যেই আমার সীট জুটে গেল। সেই সঙ্গে আরও তিনজন যাত্রীর। আমি আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে পড়লুম, এবং ধন্যবাদ দিতে গিয়ে ভদ্রলোকের নিরপরাধ হাত দু'খানা বোধ হয় মুচড়ে ভেঙেই ফেললুম জন্মের শোধ। পরোপকারের মশুল। আমাদের যে-চারজনের সীট মিলল তার মধ্যে দু'জনকে মনে হলো ব্যবসাদার, আর একটি খুব শীর্ণ, জরাজীর্ণ মানুষ ছিলেন। তাঁর মাথা ঢেকে সাদা রঙের বাঁদুরে টুপি, তারই ফাঁকে ফাঁকে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়িগোঁফ ক'দিন কামানো হয়নি, বাইফোকাল সোনালী ফ্রেমের চশমার পিছনে শান্ত ঘোলাটে চোখ, পরনে মিলিন মিলিটারির রিজেকশনের মাল, খাকি সোয়েটার, খাকি কোট, পায়ে ময়েরি কেডসের ফুটো দিয়ে কালো মোজাপরা আঙুল দেখা যাচ্ছে। কী করে এই বুড়ো মানুষটি এত দাম দিয়ে প্লেনের টিকিট কিনতে পারলেন? ইনি নির্ঘাত কুম্ভপার্টি! সর্বঅঙ্গে লেখা আছে—অযুতম কুম্ভযাত্রী ভো! এই প্লেনটা লক্ষ্ণৌ হয়ে, কাশী ঘুরে একদম কলকাতা পর্যন্ত যাচ্ছে।—ইনি কাশী যে সন্দেহ নেই। হয়তো পুত্র এয়ারলাইনসে কাজ করে। এয়ারলাইনসেও কি পাস পায়? কি জানি!—সুনীলদা এবার হাস্যবদনে আমাকে নিয়ে চা-কফি অভিমুখে ধাবিত হলেন। গাড়িতে বসে বসেই জুতো-মোজাটা কোনোরকমে পায়ে গলিয়েছেন, কিন্তু গাড়িতে বসে বসে চা-টি তো গলায় গলেনি! গলা শুকিয়ে সাহারা।

প্লেনে চড়ে বসে বলি জয় বাবা বিশ্বনাথ! কুম্ভে পৌঁছে দিও ঠাকুর। তিরুপতিনাথ তো দিল্লী আনলেন। আর দিল্লিপতি সরকারঠাকুরের কৃপায় কাশী অবধি যাচ্ছি! এবারে কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ রিলে-রেসে তোমার টার্ন। এবার তোমার করুণা! আমি তো বেটনমাত্র, রিলেখেলা তোমাদেরই! তারপর ব্রিফকেস থেকে পোস্টকার্ড বের করে মাকে চিঠি লিখি: "কুম্ভমেলাতে যাচ্ছি মা। লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না, একটুও ভয় পেয়ো না, সঙ্গী বহু জুটেছে।" (কথাটা মিথ্যে নয়। সঙ্গী এক কোটি।)—"কাশীতে যখন পৌঁছুচ্ছি আর ভাবনা নেই। ওখান থেকে বাসে, ট্রেনে, ট্যাক্সিতে, যে করে হোক ঠিক কুম্ভে পৌঁছে যাবই। মৌনী অমাবস্যার স্নানের লগ্নে।—লেখা শেষ করে সুন্দরী আকাশদেবীকে ডেকে বলি—"ভাই, তুমি তো কলকাতায় যাচ্ছ, আমার চিঠিটা দমদমে নেমে ডাকে ফেলে দেবে?" আকাশদেবী বরদা হলেন..."তথাস্তু! কিন্তু তুমি কলকাতায় না গিয়ে কোথায় যাবে?" আমাকে বোধহয় দেখলেই কলকাতাপার্টি বলে চেনা যায়। মার্কামারা বঙ্গবালা।—"আমি? আমি তো কুম্ভে যাচ্ছি!"

—"কুম্ভে? হঠাৎ? ট্যুরিস্ট হয়ে? নাকি স্নানে?"

—"বা রে বা, কুম্ভে যাব, স্নান করব না? তাই হয়? স্নান করতেই যাচ্ছি।"

এবার মেয়েটি একগাল হেসে বলে—"সত্যি? কী আশ্চর্য! আমি তো ভাবতেই পারিনি—আচ্ছা

আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে ?"

—"কী বলো ? পারলে রাখব নিশ্চয়।"

—"আমার নামে কুম্ভে একটা পুজো দেবে ?"

এবারে আমারই—কী আশ্চর্য, আমি তো ভাবতেই পারিনি'র পালা। এই দিব্যি পাকা মেমসাহেবটি পুজো দিতে চায় ?

—"নিশ্চয়ই দেব। তোমার নাম কী ?"

—"গুরদীপ কওর।"

দেখতে এবং শুনতে পুরোপুরি ফিরিঙ্গি গুরদীপ ছুটে চলে গিয়ে কোত্থেকে একটা পাঁচটাকার নোট নিয়ে ফিরে এল। সেটা আমার মুঠোয় গুঁজে দিয়ে বললেন—"হাউ লাকি য়্যু আর। আই উইশ আই কুড গো উইথ ইউ।" আমি তো ওদিকে ভাবছি গুরদীপ নিজেই কত ভাগ্যবতী। কত অনায়াসেই অচেনা অজানা একজনের হাতে সে টাকা গুঁজে দেয়, পরমাত্মীয়ের কাজটা সেরে দেবার জন্যে। আমি তার মঙ্গলকামনা করে পুজো দেবার কে ? তা ছাড়া আসল কথা তীর্থে-টির্থে 'পুজো' কেমন করে 'দিতে' হয়, তাই তো আমি জানি না। দিব্যি হিংরিজি করে গুরদীপ বলে দিলে—উইল ইয়ু গিভ আ পূজা ফর মি ? আমি স্মার্টলি বললুম—শিওর ! হোয়াই নট ? অথচ জীবনে নিজের স্বামী-সন্তানের জন্যেও কখনো কোথাও পুজো দিইনি আমি। রিফ্লেক্স অ্যাকশনে টাকাটা ইতিমধ্যে ব্যাগে পুরে ফেলেছি। ঠিক আছে, থাকুক। আরও তো কত লোক থাকবে, কেউ না কেউ জানবে। পাণ্ডা-টাণ্ডা তো থাকবেই। আমার মায়ের চিঠি গুরদীপ নিয়ে গেল। আজ আঠারোই। আজ ডাকে দিলে মা কালই পাবেন। মা তো ভাবছেন আমি আজকালের মধ্যেই ঘরে ফিরবো।

কলকাতার মেয়ে, প্রয়াগধামে যাচ্ছি। কিন্তু পথটি বড়ো সরল হলো না। কলকাতা-হায়দ্রাবাদ-তিরুপতি—হায়দ্রাবাদ-দিল্লী-(লক্ষ্ণৌ)-বেনারস এখন পর্যন্ত এতটা হয়েছে। এবার এলাহাবাদটা হলে হয় শেষ অবধি। কলেরার সার্টিফিকেটটা আছে তো ? ইঞ্জেকশনের দৌলতে বাঁহাতে যে কোনো 'বিশ্বশ্রী'র ঈর্ষার যোগ্য গুলি হয়েছে আমার। কিন্তু গুলি দেখালে তো হবে না, 'পড়ছি' চাই। এই সেই 'পড়ছি'। আমার মনিব্যাগে কেবলই 'পড়ছি' ভর্তি, টিকুর চিঠি, গুপ্তাজীর চিঠি, বিজনবাবুর চিঠি—আমি বেশ ভাকহরকরা। পরিচয়পত্রের বহুল ছড়াছড়ি। প্রেমের ফাঁদ পাতা সবখানে—ইংলিশ ইনস্টিটুট থেকে মিলিটারি হসপিটাল পর্যন্ত। সবগুলোই সযত্নে রেখেছি। কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে ?

বেনারস নামার আগে অনেক চেষ্টা করলুম নিচে কাস্তে-আকৃতির গঙ্গাটা আকাশ থেকে দেখতে—ট্রেন থেকে যা দেখেছি আগে অনেকবার। কিন্তু আকাশ থেকে গঙ্গা দেখা গেল না।—নেমে দাঁড়িয়ে আছি, মাল নামেনি এখনও। ওপাশে দেখতে পেলুম সেই বৃদ্ধটি ঠিকই ধরেছি, কুম্ভ-পার্টি। এমন সময়ে দেখি এক সর্দারজীর সামনে লাইন বেঁধে লোকেরা কি যেন কুপন কিনছে। কিসের কুপন ? কুম্ভে যাবার কিছু নয় তো ?—না না। সিটি অফিসে যাবার বাসের টিকিট। পাঁচটাকা। "কুম্ভের সব কনেকশন বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি—সব কিছুর খবর ওখানেই পাবেন।" হিন্দীতে আমি এবারে ওই অন্যমনস্ক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করি :—"আপনি কি বাসে করে শহরে যাবেন ?" তিনি বললেন—"হ্যাঁ।"—"তাহলে কি আপনার টিকিটটাও কেটে দেব ?" উদাসভাবে বৃদ্ধ বললেন—"দিজিয়ে। শুক্রিয়া।" টিকিট কিনে এনে তাঁর কাছে পাঁচটাকা চাইব কিনা বুঝতে পারলুম না। চাইতে হলো না, উনি নিজেই পাঁচটা টাকা এগিয়ে দিলেন। আমি তখন ওঁর মালের রসিদটা চাইলুম, মাল নামলে বালাস করে এনে দেব। উনি নীরবে রসিদটা বাড়িয়ে দেন, মিষ্টি হাসি সমেত। মাল এলে দেখি ওঁরটা বেডিং ; একটি ছোটো মিলিটারি কিট্‌ব্যাগ ওঁর হাতেই ছিল। ওঁর মাল, আমার মাল দুটোই টেনেহিঁচড়ে বাসের ভেতরে তুললুম আমি।

BanglaBook.org

উনি কিন্তু হাঁ হাঁ করে "মুঝে দিজিয়ে, মুঝে দিজিয়ে" করে এসেছিলেন। তারপর দুজনে উঠে বসলুম বাসে। গল্প শুরু করলুম।

—"বাবুজী কি কুম্ভে যাচ্ছেন?"

—"জী হাঁ।"

—"একলাটি

—"না না, ওখানে আমার মেয়ে জামাই আছে।"

– "বেনারস থেকে কী উপায়ে যাবেন ঠিক আছে?"

—"দেখি কী করি! শুনেছি অনেক স্পেশাল ট্রেন দিয়েছে, তা ছাড়া বাস আছে, ট্যাক্সিও যায়।"

—"ট্যাক্সি ভাড়া কত হবে কোনো ধারণা আছে?"

—"শুনেছি শেয়ারে পনেরো টাকা করে, আর পুরোটা নিলে আশি। তবে এখন নিশ্চয় আরো বাড়িয়েছে।"

—"কত আর বাড়বে? ডবল?"

—"ঐ রকমই হবে আর কি। দেখি তো গিয়ে।"

হঠাৎ পথে একটি বিরাট সাদা বাংলো পড়ল। মস্ত হাতাওয়ালা বাড়ি, গেটের থামে বড়ো বড়ো অক্ষরে নাম লেখা—"ডিভিশনাল কমিশনার, শ্রী জে. পি. মিট্টাল।"

—"আরে অরে, এর সঙ্গেই তো আমার দেখা করবার কথা বেনারসে।"

—"কি কাণ্ড! গাড়ি থামিয়ে নেমে যান?"

—"নাঃ, আগে ফোন করে দেখি। আমার বন্ধু তো নন, বন্ধুর বন্ধু। উনি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কুম্ভে যাবার।"

—"বাঃ, তবে তো আপনার ভাবনা নেই।"

—"নাঃ তা নেই। তা আমি যে ভাবেই যাই না কেন, বাবুজী আপনাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আপ কুছ ফিকির মত্ কীজিয়ে।" বৃদ্ধ একগাল হাসলেন।

বেনারসে পৌঁছে ফোন করে শুনি শ্রীমিট্টাল হঠাৎ মোগলসরাই চলে গেছেন। পরে বুঝেছি, কেন গিয়েছিলেন। সেই ১৮ই তারিখে মোগলসরাইতে কুম্ভগামী এক ট্রেনের নিদারুণ দুর্ঘটনা হয়। সে কথা আমি পরে শুনেছি। ফিরতিপথে। যিনি মিট্টালের হয়ে ফোন ধরেছিলেন তাঁকেই আমার প্রয়োজনটি জানালুম, সতীশ গুপ্তার রেফারেন্স দিয়ে। আমি কুম্ভে যাবার ব্যবস্থা চাই। তিনি বললেন—"আপনি টি. ও.র কাছে চলে যান, আমি তাঁকে ফোন করে দিচ্ছি। তিনি সব বন্দোবস্ত করে দেবেন।" এইরে! টি. ও. আবার কি? ও. টি. মানে তো অপারেশন থিয়েটার। টি. ও. মানে কি থিয়েট্রিকাল অপারেশন? বিনীত প্রশ্ন করি—

—"টি. ও. কাকে বলে?"

—"ট্যুরিস্ট অফিসার! কি আশ্চর্য, তাও জানেন না? আপনার সঙ্গে কে আছেন, তাঁদের কাউকে দিন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

—"আর কেউ তো নেই!"

—"অ্যাঁ, কেউ নেই? একা? কি মুশকিল! আপনি এক্ষুনি চলে যান টি. ও. মিস্টার চক্রবর্তীর কাছে। ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে। আমি ফোন করে দিচ্ছি। আপনার নাম?" বললুম। তাঁর নামটা আর জানা হলো না।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে মাল পাহারা দিচ্ছিলেন। রিকশাওলারা ছেঁকে ধরেছে। ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি, সর্বত্রই তারা নিয়ে যাবে। তবে প্রয়াগ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে না, এই যা। বাসের চেহারা যা দেখলুম, বোঝা গেল ওতে যেতে পারব না। বমি হবেই। রিকেটি, রংচটা, ঝড়ঝড়ে মাল আর মানুষের

BanglaBook.org

ভিড়ে হেলে পড়েছে। বৃদ্ধও আমার সঙ্গে একমত হলেন। বললেন, "তবে ট্রেনেই যাওয়া যাক।"—"ট্রেন?" রিকশাওলাদের সমবেত বিদ্রূপহাস্য শোনা গেল। "ট্রেনে উঠতে পারলে তো? টেক্সি লিজিয়ে, টেক্সি!" তৎক্ষণাৎ জাদুবলে কোথা থেকে এক ট্যাক্সি এসে ঢুকলো বাস স্ট্যাণ্ডের কমপাউণ্ডে। হ্যাঁ হ্যাঁ করে ছুটলো রিকশাওলারা। "—কুমড়্? তিনসও রূপাইয়া!" আমি এবার একটু উদ্বেগের সঙ্গে বৃদ্ধের ছেঁড়া কেডসের দিকে দৃষ্টিপাত করি। উঁকি মারছে কালো মোজা পরা বুড়ো আঙুল। তারপর আমতা আমতা করে বলি—"বাবুজী, আমরা একটুখানি অপেক্ষা করি? আমি ডবলভাড়া, অর্থাৎ একশো ষাট অবধি রাজী, কিন্তু তিনশো—ঠিক পারব না। আরো কয়েকজন সঙ্গী পেলে বরং শেয়ার করে যাব। আপনি কী বলেন?"—রিকশাওলারাই জবাব দেয়—"টেক্সি মিলেগা তব্ তো জাইয়েগা? টেক্সি মিলতা হী নহীঁ।" কী মুশকিল! এই বৃদ্ধের কাছে তো টাকা চাইবার প্রশ্ন নেই। অথচ তিনশো দিলে ফেরার টাকা কম পড়বে। ফেরার টিকিট তো কাটা হয়নি। এমন সময়ে কানের কাছে একটি খাস বিলিতি গলার মৃদু ইংরিজি শুনতে পেলুম —"আর ভিড় বাড়িয়ে কাজ নেই, আমার মনে হয় এইটেই নিয়ে নেওয়া উচিত হবে।"—হ্যাঁ, তিনিই সেই ফুটো কেডস, মাংকিক্যাপ। মুখে মিষ্টি হাসি. বৃদ্ধস্য বাক্যং শ্রদ্ধা আমি তো বাক্যহারা অতঃপর। ইনি ইংরিজি জানেন না ভেবে কত কষ্টে ভদ্রস্থ হিন্দীতে বাতচিত চালাচ্ছি এতক্ষণ!—"টাকার জন্যে ভাববেন না, ঈশ্বর আমাকে অনেক দিয়েছেন। আপনি ঐ আশি টাকাই দিন, বাকিটা আমার।" যদি এখন পুষ্পকরথ নিয়ে অপ্সরাকুল আমার সামনে আবির্ভূত হতেন, তাতেও এত আশ্চর্য হতুম না। এই খোঁচা-দাড়ি তাহলে কেবলই কৃপণতা? কিন্তু কার্পণ্যের লক্ষণ তো এই প্রস্তাবে নেই? তবে পরে বুঝেছি, উনি অন্য জগতের বাসিন্দা—সত্ত্বপ্রকৃতির মানুষ। আপন বহিরঙ্গের প্রতি তাঁর মমতা নেই, বরং নির্মমতা আছে। আশি থেকে দরাদরি করে একশো পর্যন্ত নামলেন, তারপরেই উনি ক্লোজ করে দিলেন, আমাকে কিছুতেই আধাআধি দিতে দিলেন না। বার বার বললেন—"বেটি, তুমি তো আমার কন্যার বয়সী, তোমার কাছে আমার কিছুই নেওয়া উচিত নয়, তবে পুণ্যক্ষেত্রে সর্বদা কিছুটা নিজে খরচ করা নিয়ম, তাতে তোমার তৃপ্তি হবে। কিন্তু ওখান-থার্ডের বেশি আমি কিছুতেই দেব না।" এবার মালপত্র সমেত ট্যাক্সিতে চড়ে বসা হলো। বৃদ্ধ বাবুজী ট্যাক্সিওলার সঙ্গে সামনে বসলেন—তাঁর নাকি পিছনে বসতে অসুবিধা হয়। আমি পুরো গাড়ি দখল করে হাত পা ছড়িয়ে বসে নির্দেশ দিই—'ট্যুরিস্ট অফিস! টি. ও.-র কাছে।"

চক্রবর্তীমশাই টেলিফোনটি পেয়ে গেছেন মনে হলো, তা ছাড়া একটি দৈনিক পত্রিকার কল্যাণে আমার কিছু বুচরো লেখাও তাঁর নজরে পড়েছে। ভদ্রলোক সত্যিই অতি ভদ্র, এবং যথেষ্ট কর্মকুশলী। হাসিমুখে একশো লোকের ন্যায়-অন্যায় একশোখানা আবদার শুনছেন, মাথা ঠাণ্ডা রেখে একা সামাল দিচ্ছেন। এই আসছেন ট্যুরিস্ট মেম, উস্কখুস্ক চুল, পরনে হাফপ্যাণ্ট আর তিনটে ক্যামেরা—'হ্যালো ম্যাডাম, আই ওয়াজ জাস্ট থিংকিং অফ্ য়ু'...এই আসছেন তীর্থযাত্রী বাবু, সঙ্গে আধ ডজন কেটের কাপড় পরা আলোয়ান জড়ানো ন্যাড়ামাথা বৃদ্ধা— 'এই যে দত্তমশাই, সবকিছু ব্যবস্থা হয়ে গেছে, শুনুন',...আমাকেও উনি পরমাত্মীয়ের মতো সত্ত্ব করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। একটা নয়, তিনটে। পি. বি. আই.-এর চতুর্বেদীর কাছে, কুলুর ট্যুরিস্ট অফিসের শ্রী ডি. কে. বর্মণ এবং তার সহকারী শ্রীকরমপাল সিং-এর কাছেও। বললেন—"কিছু ভাবনা নেই। এক জায়গায় না হয় আরেক জায়গায় হবে। এরা তিনজনেই খুব দক্ষ লোক, সাহায্যে পটু, যাবতীয় সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি একা মানুষ, শোবার প্রবলেম হবে না। প্রেসের ওখানে সব সময়ে একটা লোকের ব্যবস্থা থাকে, নিজের কোনো স্পেশাল ঝামেলা যদি না থাকে, দে উইল টেক গুড কেয়ার অফ য়ু। ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ওখানে পাকা বাথরুম, পাকা ঘরটর আছে, ঠিক গভর্নরের ক্যাম্পের পাশেই। প্রেসও ওই একই জায়গায়। চমৎকার কটেজ

BanglaBook.org

আছে সব, বসার ঘরে টিভি আছে, সোফাকৌচ আছে। ঘর না পেলেও ভাবনা নেই, কম্বলমুড়ি দিয়ে কৌচে লম্বা হয়ে পড়বেন। পরশু রাতেই তো আমি ওখানে ছিলাম, ঐভাবে শুয়েছি, তোফা আরামে।" ট্যাক্সিওলাকে ডেকে এনে বললেন—"এই যে লাল্লন সিং, এই মেমসাবকে খুব যত্ন করে নিয়ে যাবে। ঝুঁসির দিকে নয়, এঁকে নৈনির কাছে নামাবে। সেখান থেকে গঙ্গাদ্বীপে ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে যেতে খুব অল্পই হাঁটতে হবে, দু'কিলোমিটার মতন। কিন্তু মালপত্তর তো উনি বইতে পারবেন না, একটা ব্যবস্থা করে দিও।" কিন্তু আমার ললাটের লিখনই আলাদা। লাল্লন সিং পকেট থেকে ভাঁজকরা সেদিনের হিন্দী খবরের কাগজটি বের করে তখুনি দেখিয়ে দিলে—নোটিশ বেরিয়েছে, নৈনির রাস্তা বন্ধ। একমাত্র ঝুঁসির পথই সেদিন খোলা।—"আব্ ক্যা করেঙ্গে?"—দেখেশুনে চক্রবর্তীসাহেবের মুখের অলিম্পিক শিখার মতো অনির্বাণ হাসিটিও দপ্ করে নিভে গেল —"তাহলে মালের কী হবে? হাঁটলেন না হয়...কিন্তু মাল? ততটা পথ! ঝুঁসি থেকে মানে...লাল্লন সিং খবরদার তুমি ওঁকে মালসুদ্ধ একলা একলা ছেড়ে দিও না—অনেক টাকা নিচ্ছো মনে রেখো—আমি কিন্তু পরে খোঁজ নেবো তুমি কী ব্যবস্থা করেছিলে। মাল বয়ে ঝুঁসি থেকে ট্যুরিস্ট লজে যাওয়া এঁর পক্ষে অসম্ভব।" লাল্লন সিং হেসে এক সেলাম ঠুকে দেয়—"আরে সাব—লাল্লনকো তো আপ জানতে হেঁ! কুছ ফিকর মৎ কীজিয়ে, সব ঠিক হো যায়েগা। কুলি নহীঁ মিলেগা তো লাল্লন হ্যায়।" চক্রবর্তী ঝুঁকে হাত বাড়ান—"ঠিক তো?" টেবিলের ওপরে লাল্লন হাত মেলায়—"ঠিক বাত।" চক্রবর্তী হেসে বলেন—"চলে যান, ভাবনা নেই, ফিরে এসে একটা খবর দেবেন, স্নান কেমন হলো।"

আমি কৃতজ্ঞতায় দুমড়ে যাচ্ছি দেখে চক্রবর্তী হা-হা হেসে বললেন—"আরে দিদি, এই তো আমার কাজ, এ জন্যে আমি মাইনে পাই—এতে ধন্যবাদের কি আছে?"

অথচ আমি জানি, বেতনের বিনিময়ে কর্তব্যকর্ম বলে আর কিছু বাকি নেই। অন্তত এ দেশে। এখন যেখানে যেটুকু পাই সবটাই আমি কৃপা বলে মেনে নিই, প্রাপ্য বলে নয়। অধিকার বা দাবি এসব শব্দ এখন শ্লোগান মাত্র, প্রত্যহিক জীবনে আছে কেবল—আসি যাই মাইনে পাই। কাজ চাইলে ওপর-টাইম চাই। এই তো আমাদের কাজের ধারা। আমি জীবনের সব পাওয়াটাকেই ইদানিং ধরে নিই উপরি পাওনা। ওপর-টাইম। বাইট নয়, সবই প্রিভিলেজ।

BanglaBook.org

৭

স্বর্গারোহণ পর্ব

দ্বিতীয় সর্গ

লাল্লন পথে তুলে নিলে লতিফকে। তাদের পাশে সেই বৃদ্ধ—যাঁকে আমি বাবা বলে ডেকেছি। পিছনে আমিই একচ্ছত্র রাজত্ব করছি। গাড়ি চললো। বৃদ্ধ বললেন, "আপনি কোথায় উঠবেন?"

প্রশ্নটা সুবিধের নয় দেখে আমি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলি—"আপনি?"

—"আমি তো উঠবো আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে। আমার মেয়ে জামাই সেখানে আছে? আপনি?" —আবার 'আপনি'। দূর ছাই।

—"আমার কোন ঠিক নেই।"

"ঠিক নেই? সে কি? গঙ্গাদ্বীপে, না আলাহাবাদে থাকবেন সেটা ভেবেছেন?"

—"নিশ্চয়ই। গঙ্গাদ্বীপে অবশ্যই।"

—"কিন্তু এই ভিড়ে..."

—"আপনি ভাবছেন কেন? আমি তো একটুও ভাবছি না। এই তো মিস্টার চক্রবর্তী

তিনচারজনকে ইনট্রোডাকশন দিয়ে দিলেন, পি. বি. আই.-তে, ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে। কোথাও না কোথাও ঠাঁই মিলে যাবেই। লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে রয়েছে, বনবাসে তো যাচ্ছি না।"

বৃদ্ধ তবু গাঁইগুঁই করেন—"তাহলে অত ভিড়ে একজন লেডি হয়ে অল বাই য়োরসেল্ফ"...

তখন আমাকে মরিয়া হয়ে বলতেই হলো—"প্রথমত আমি মোটেই লেডি লাইক নই—দ্বিতীয়ত, বাবা, এই তো আপনিই আছেন। আমার ভাবনা কী? একা তো নই।"

বাবার মুখের জ্যোতি একথায় দপ্ করে নিভে যাবে ভেবেছিলুম কিন্তু নিভল না। শান্তস্বরে তিনি বললেন—"হ্যাঁ। আমি আছি বইকি। ঈশ্বর তোমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন আমার একাকিত্বের উদ্বেগ মোচন করতে। কিন্তু আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি, আমি কি তোমার জন্য ব্যবস্থা করতে পারব?"

অগত্যা আমি বলি—"বাবা, বিশ্বাস করুন আমি অতি গেছো মেয়ে। আমিই আপনাকে দেখব শুনব। আনন্দময়ীর কাছে না পৌঁছে যাওয়া অবধি আপনি আমার দায়িত্বে। আর আমাকে দেখাশুনোর কাজটা ঈশ্বরই করেন। আপনি বৃথা ভার বোধ করবেন না"—

বৃদ্ধ বললেন—"দীক্ষিত হলে আমার মত গুরুর আশ্রমেই থাকতে পেতে।"

সে কথার জের না টেনে আমি বলি—"আপনার দেশ কোথায়?"

বৃদ্ধ বলেন—"জয়পুর। আমি জয়পুর থেকেই আসছি। তুমি?"

—"কলকাতা। অবশ্য এখন কলকাতা থেকে আসছি না।"

—"কলকাতা? আমি ওখানেই দু'-একজনকে চিনতাম! জেনারেল জে. এন. চৌধুরীকে চেনো?"

—"আমি ওঁকে চোখে দেখেছি, এই পর্যন্ত। চিনি না।"

—"আমাদের স্কুলে পড়ত তা ছাড়া ব্যানার্জি, রাঘবেন্দ্র, সেও আমাদের স্কুলে পড়েছে। চেনো তাঁকে? অবশ্য ওঁরা দু'জনই আমার জুনিয়র।"

—"তাঁকেও দেখেছি। পরিচয় নেই। আমার বাবা মা চেনেন। আপনার নাম?"

—"শার্দূল সিং। ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়? কেমন আছে রাঘবেন্দ্র?"

—"ভালোই আছেন, যতদূর জানি।" আমি বলি, ওঁকে দেখেছি, রাঘবেন্দ্রবাবুকে মোটেই বৃদ্ধ বা অসুস্থ দেখায়নি। দিল্লীতে বছর পাঁচ ছয় আগে জেনারেল চৌধুরীকেও না। ওঁদের দুজনের মধ্যেই যৌবনদৃপ্ত প্রৌঢ়তা বজায় রয়েছে—অথচ শার্দূল সিংহ এমন বৃদ্ধ হলেন কি করে? প্রশ্নটা অবশ্যই করিনি। —এসব প্রশ্ন কেউ করে না। এর সম্ভবত কোনো উত্তরও হয় না। শার্দূল সিংহের হাসিটি সত্যি ভুবনমোহন—শিশুসুলভ সাবল্য ও সং অন্তঃকরণের একটা সহজ প্রকাশ আছে তাঁর মধ্যে। ক্রমশ বুঝলাম তিনি সংসারে থেকেও প্রায় সন্ন্যাসী। তাই এই খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এই ফুটোফাটা পোশাক—হাতের কিটব্যাগে মনে হলো পুজো-আহ্নিকের সরঞ্জাম আছে। —"আপনাকে মিলিটারী মানুষ ভাবতেই পারছি না বব্বা।"

—"এককালে আমি বেজায় রাগী, জেদী, আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলাম সবাই 'শার্দূল সিং' বলতে ভয় পেত।"

—"বাঃ।"

—"সত্যি, মাই ডিয়ার গার্ল, বিশ্বাস কর।"

—"কী করে বিশ্বাস করব?"

হাহা করে হেসে উঠে বৃদ্ধ বললেন—"তা যা বলেছ। আমার নিজেরও ঠিক বিশ্বাস হয় না। আনন্দময়ী মা যে আমাকে পথ বাতলে দিয়েছেন। আই অ্যাম আ চেঞ্জড ম্যান টু-ডে।"

—"কী করে এমন হলো বাবা?"

—"সে এক লম্বা গল্প। তোমার কি শুনতে ভালো লাগবে?"

—"লাগবে লাগবে, বলুন।"

BanglaBook.org

—"সে সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার। ওসব সিরিয়াস কথা থাক। জেনারেল মানেকশ'ও আমাদের ইস্কুলে ছিলেন, ওঁকেও তো জানো।"

—"আপনার বয়স মোটেই আমার তিনগুণ নয় বাবা, দুগুণ হতে পারে।"

—"ওই হলো। তুমি কবে জন্মেছ?" সালটা বললুম।

—"অ্যাঁ! আমার ছোটো ছেলেও তো ঐ বছরেই জন্মেছে। সে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াচ্ছে।"

—"আমিও তো! অবশ্য এখন ওটা বিশ্ববিদ্যালয়। এবং আমি কিছুই এঞ্জিনিয়ারিং জানি না।"

—"বা, বা। তবে তো তুমি আমার ছোটো মেয়ে।"

—"তা তো বটেই। বাবা বলে ডেকেছি যখন। এবার আপনার ধর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলুন। মেয়ের কাছে বলবেন না?"

—"হবে হবে, অল ইন গুড টাইম।"

রাস্তায় অনেক গাড়ি, ভিড়ে ও মালে একটেরে হয়ে বেঁকে যাওয়া বহু দুঃখী-দুঃখী বাস, কোনোটা আসছে পাটনা থেকে, কোনোটি আগ্রা, কোনোটা বারাণসী, কোনোটা মোগলসরাই। একটা কলকাতার মিনিবাস দেখলুম, পশ্চিমবঙ্গের যাত্রী নিয়ে আসছে। বাসের কপালে বাংলায় 'জয়গুরু' লেখা দেখেই হঠাৎ খুব আহ্লাদ হলো। বাংলায় নাম লেখা আরো অনেক বাস চোখে পড়ল পথে। দক্ষিণ থেকে আসছে এমন কোনো বাস অন্তত আমার চোখে পড়েনি। কুম্ভমেলা প্রধানত উত্তর ভারতীয় মিলন-মেলা বলেই বোধ হলো।

আমাদের একটা টেনডেন্সি আছে অবশ্য, ব্যাপকভাবে উত্তর ভারতীয় হলেই তাকে 'সর্বভারতীয়' আখ্যা দিয়ে ফেলা। দক্ষিণের মানুষও কুম্ভমাহাত্ম্যে বিশ্বাসী, কিন্তু সেখান থেকে ঠিক এমনিভাবে জাতীয় এক্সোডাস হয়নি মনে হয় কুম্ভমেলার উদ্দেশ্যে। একটা কারণ নিশ্চয় ভৌগোলিক দূরত্ব। আরও কি একটা কারণ থাকতে পারে। উত্তর-দক্ষিণের সাংস্কৃতিক দূরত্ব? দক্ষিণের মন্দিরে পাণ্ডাহীন ভিখিরিহীন নিরুপদ্রব শান্তিময়তা, এবং সাধুবঞ্চনাশূন্য নাগরিক পরিচ্ছন্নতা যে ভক্তির আবহাওয়া তৈরি করে দেয়, তা কি উত্তরের তীর্থে এসে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়?

বেলা গড়াচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল সকাল থেকে খিদে তেষ্টা ভুলে কেবল স্বর্গারোহণের ব্যবস্থায় মত্ত হয়ে আছি। সেই কোন্ রাত থাকতে দিল্লীতে ঘুম ভেঙেছিল—তারপর থেকেই ছুটছি।

গতকালই তো আমি তিরুপতিতে ছিলাম। গতকাল? হ্যাঁ কালই তো! কী আশ্চর্যভাবে, কত দ্রুত সময় কেটে যাচ্ছে এই দু'দিন ধরে। আজ মাত্র আঠারোই। দুপুরের মধ্যে প্রয়াগসঙ্গমে পৌঁছে একটা বাসস্থানের ঠিক করে নিতে হবে। মধ্যরাত্রে স্নান শুরু। চক্রবর্তী যেমন বলে দিয়েছেন তাতে বাসস্থানের কোনো ভাবনা নেই। শুনেছি নাকি পশ্চিমী কায়দার পাকা কল-জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত রয়েছে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর ওদিকে, সাহেবদের কথা ভেবে। অবশ্যই তা হায়দ্রাবাদী রাজকীয় আতিথ্যের মতো হবে না। কিন্তু কুম্ভমেলার তুলনায় রাজকীয়ই। শীর্ষেন্দুর লেখায় পড়েই এসেছি, এবারের ব্যবস্থা নাকি খুব ভালো। সাহেব-মেমে ছয়লাপ। মনে হবে বিলেতে এসেছি।

শার্দূল সিংকে বলি—"বাবা আপনি লাঞ্চ খাবেন কখন?"—

উনি বললেন—"আমি তো একবেলা খাই। সকালে ব্রেকফাস্ট করেছি, আবার রাত্রে খাব।"

কিন্তু আমি যে পথে বেরুলে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খাই-খাই? একেই ব্রেকফাস্ট করিনি, আমি বাপু লাঞ্চ খাবই। খাবারের কথা যেই না মনে পড়া, অমনি পেট চোঁচোঁ। কী করি এখন? উনি যদি থামতে না চান? হঠাৎ খেয়াল হলো—এই তো, সমাধান সামনেই।

—"ভাই লালন সিং, তোমরা লাঞ্চ খাবে না?"

—"হ্যাঁ মেমসাব, গোপীগঞ্জে খাব।"

—"ওখানে কি পাঞ্জাবীদের 'ধাবা' আছে?"

—"জী হুজুর, আছে।"

—"হুজুর-হুজুর কোরো না তো। শোনো, তোমরা একটা বেশ পরিষ্কার জায়গা দেখে খেয়ো, আমিও খেয়ে নেব।"

—"এখানে? সে আপনি পারবেন না মেমসাব। ঈশ, আগে বললেন না? বরং বানারসেই কোনো ভালো হোটেলে—"

—"খুব পারব। আমার পাঞ্জাবী তড়কা-রুটি খেতে খুবই ভালো লাগে লাল্লন সিং।" এবারে হেসে ফেলল লতিফ-লাল্লন দুজনেই।

—"ঠিক আছে মেমসাব।"

—"মেমসাব-মেমসাব করছ কেন? আমি কি মেম?"

—"তবে কী বলব?"

—"কেন, দিদি বলতে পার না?"

—"যো হুকুম, দিদি।" কিন্তু লতিফের চোখে প্রশ্ন। লাল্লন এবার লতিফকে বললে, দিদি মানে বেহেনজী। দিদি বাংলা কথা। লতিফের মুখে নিশ্চিন্ত হাসি। এবার আমার খেয়াল হলো সত্যি তো, দিদি বুঝি 'সর্বভারতীয়' নয়? 'দাদা' মানে যেমন ঠাকুরদাদা বা দাদামশাই, দিদি মানে হয়তো বিদিমা। কে জানে? তা হোক একই হলো।

—"লাল্লন সিং, তুমি বাংলা জানলে কি করে?"

—"কাশীতে তো বঙ্গাল-কে আদমি একদম ভরতি। লতিফ ঠিক কাশীর নয়, তাই বাংলাটা এখনও শেখেনি। তাছাড়া আমি তো বঙ্গালমে কতবার গেছি।"

—"কোথায় গেছ?"

—"তার্কেস্সুরের মে বাবা কো পাস।"

—"বাবার কাছে? তারকেশ্বরে? কেন, তোমরা তো বাবার কাছেই আছ, বিশ্বনাথের কোলে।"

—"না না, ওই যে মানসিকের জন্যে জল নিয়ে যেতে হয় বাঁকে করে—হেঁটে গিয়ে ট্রেনে চাপি। বর্ধমানে নেমে আবার হাঁটি। আমি প্রায়ই কনট্রাক্ট নিই। ওখানেই আমার বড়ি বেহেন আছে কিনা ব্যাণ্ডেলে।"

—"লাল্লন সিং, তোমার মতো নামের একজন খুব বিখ্যাত বাঙালী ছিলেন, জানো? তাঁর নাম লাল্লন নয়, লালন। ফকির। তিনি গান বাঁধতেন। খুব সুন্দর গান। ফকির তো বোঝো?"

—"জরুর। ফকির বুঝব না। কত ফকির আছে বনারসে। আমার নামও তো লা-লন। লা-আ, ল, ন। কিন্তু মুখে বলি লাল্লন। উও ফকিরকো কোই গানা আপ জানতে হেঁ ক্যা?"

—"আমি জানি, কিন্তু গাইতে পারি না যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে বাংলায় একজন খুব বড়ো কবি ছিলেন, লাল্লন, তিনি লালন ফকিরের গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। তুমি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছ?"

লাল্লন মাথা নাড়ে। শোনেনি। লতিফ নীরব। শার্দূল সিং বলেন—

—"টেগোর রাজপুতনা নিয়ে অনেক কবিতা লিখে গিয়েছেন আমি শুনেছি। তিনি রাজপুতদের খুব ভালবাসতেন। তাঁকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল রাজপুতদের জাতীয় চেতনা। অবশ্য আমি টেগোরের যা লেখা পড়েছি সে সমস্তই মিস্টিক কবিতা, স্পিরিচুয়াল পোয়েমস। দে আর লাইক হিম্‌স্। চমৎকার।"

—"আপনি কি রাজপুত?"

আবার একমুখ ক্ষত্রিয়সুলভ বিনয়ে পরম বৈষ্ণব হাসি ছড়িয়ে শার্দূল সিংহ নিচুস্বরে বললেন—"অফ কোর্স!"

লাল্লন কী জানি আর লালন ফকিরের গানের প্রসঙ্গ তুললো না। তুললে 'আরশিনগরে

BanglaBook.org

পড়শি বসত করে' ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে বড্ডই কষ্ট হত। একেই তো এই কুকর্ম করেই খাই! চাকরি-বাকরির প্রসঙ্গে মন একটু দমে যায়ই। তাই মন উৎফুল্ল করতে আবার গল্প শুনতে চাইলুম।

—"বাবা, কই বললেন না, আনন্দময়ীর প্রসঙ্গে আপনার কি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল?"

—"তুমি দেখছি না শুনেই ছাড়বে না। আমি কাউকে বলতে চাই না, কারণ পীপ্‌ল্ ওল্ট বিলীভ্ ইট। বলবে হ্যালুসিনেশন।"

—"আমি বিশ্বাস করব। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। অবশ্য গুরুরা অঘটন ঘটাতে পারেন কিনা জানি না, কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয় পারেন!"

—"ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, আমার চোখের দোষও হতে পারে। তবে আমার জীবনের ধারা বদলে দিয়েছে। —আমরা গাড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন বৃন্দাবনে গিয়ে আমার বোন বললে, আনন্দময়ীর আশ্রমে যাবে। সে ওঁর শিষ্যা। বেশ তো চলো। গেলাম, মায়ের সঙ্গে পরিচয় হলো যৎসামান্য—অর্থাৎ প্রণাম। তাঁদের নতুন মন্দির উদ্বোধন হচ্ছে সেখানে, নিতাই-গৌরের মন্দির। আমাদের সামনের সারিতে বসতে দেওয়া হয়েছে দেখি মন্দিরের সামনে মা আনন্দময়ী দুহাত তুলে নিতাই সেজে নাচছেন। আমার কি জানি বাপু পছন্দ হলো না। আমি বললাম আমার স্ত্রীকে— "হাউ অড্!" স্ত্রী বললেন— "কেন?" আমি বললাম— "মা আনন্দময়ীর কি ওরকম করাটা উচিত?" স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন— "কেন, উনি আবার কী করলেন? একটু বিশ্রাম করতে গেছেন বোধ হয়।" এবার আমি হকচকিয়ে গিয়ে বোনকে বললুম— "সামনে কী দেখছ?" বোন বললে— "কেন, নিতাই-গৌর? চিনতে পারছ না? নিত্যানন্দ আর গৌরাঙ্গ?" আমি ভয় পেয়ে এবারে একদম চুপ করে গেলুম। চোখের সামনে তখনও দেখছি একটিই দৃশ্য, লালপাড় সাদা শাড়ি পরা, ভাববিহ্বলা মা আনন্দময়ী, দুই হাত তুলে, এলোচুলে, নিমাইয়ের ভঙ্গিতে নৃত্য করছেন। হঠাৎ সবাই গুঞ্জন করে উঠলো "মা! মা!" তখন চকিতে দেখলুম সামনে মা নেই, সেই জায়গায় মস্ত দুটি গৌর-নিতাইয়ের মূর্তি। একপাশ থেকে মা সদ্য হেঁটে প্রবেশ করছেন, উদ্ভাস্তের সকলে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমি দাঁড়াতে পারলুম না। তার পরেই আমি দীক্ষা নিয়েছি মায়ের কাছে। আফটার দ্যাট ভিশন আই অ্যাম আ চেঞ্জড্ ম্যান।"

শার্দূল সিংহের কথার উত্তর দেবার কিছু ছিল না। স্বর্গেমর্ত্যে অনেক কিছুই রয়েছে, হোরেশিও, যা তোমার পরিধির বাইরে। আমি নিজেকে যুক্তিবাদী ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ বলে মনে করতে চাই। জগতে এই যুক্তি, বিশ্বাস, আর মনুষ্যত্ব হাতে-হাতে ধরে থাকে পরস্পরকে। আমি ঈশ্বরের করুণাকাঙাল—তা বলে মিরাক্লে বিশ্বাস করি না। ভেলকি আর করুণা এক নয়, তুলনীয় নয়। আমার বাবা কখনো ধর্মের ভেলকিতে বিশ্বাস করেননি। মা-ও তথৈবচ। মা আবার সেকেলে বেদ্ধ-টাইপের আছেন খানিকটা। দুজনেই ঘোরতর মিরাক্ল-বিদ্বেষী। এই তো গেল বাপের বাড়ি। ওদিকে স্বামী তো গোঁড়া অবিশ্বাসী। তাঁর নাস্তিকতায় ভক্তি আমার আস্তিক্যের চেয়েও জোরালো: তাঁর কাছেও দীর্ঘকাল ঘোর ট্রেনিং পেয়েছি। সে কি ভোলা যায়? ফলং—মিরাক্লে বিশ্বাস করার শক্তি আমার ভেতরে নেই। তবে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিশ্চয় হতে পারে মিরাক্ল জাতীয় অঘটনের যা যুক্তিগ্রাহ্য। এমনি একটি অঘটন তো ঘটেছিল আমারই চোখের সামনে। নিজের বাড়িতে. শার্দূল সিংহের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটি তাঁর কাছে এত মূল্যবান যে তার পাশে আমার যুক্তিবুদ্ধির অবতারণা করাটা ভাল হবে না। বরং ওই ধরনের আরেকটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে সুরটা থাকবে। আমাদের যা ঘটেছিল, সেটা ঠিক দৈবী ঘটনা নয়, তবে ডাঃ শৈলেন সেন সেটাকে বলেছিলেন 'একটা মেডিক্যাল মিরাক্ল।' ওই গল্পটাই বলা ঠিক করলুম ভাল হবে, ওঁর গল্পের পাশে মানাবে। তাছাড়া আমার বোনাফাইডিটাও প্রমাণিত হবে। এই ঘটনাটা শ্রীবিমল গোস্বামীও

BanglaBook.org

একবার উল্লেখ করেছিলেন তাঁর একটি লেখায়। আমি শার্দূল সিংহকে আমার গল্পটি বলতে শুরু করলুম।

আমার বাবার বয়স তখন একাশি, হঠাৎ করোনারি থ্রম্বসিসের স্ট্রোক হলো। বাবার ব্লাডসুগার তখন খুবই উচ্চে, কোমা অবস্থায় অচেতন আছেন দশ-বারোদিন। বাঁদিকটা অবশ হয়ে গেছে, বাঁ হাত পা কঠিন। বাবার বাঁচার সম্ভাবনা আছে কেউ বলছেন না। নাকে অক্সিজেনের নল, হাতে গ্লুকোজ ছাড়াও আরও একটি জলীয় দ্রব্যের ছুঁচ ফোটানো। বাবার জন্যে লোহার তৈরি ফাউলার্স বেড এসেছে। এসেছেন দিনে-রাতে দুজন সিনিয়ার নার্স। এবং আমি উড়ে এসেছি দিল্লী থেকে। মন সকলের খুব খারাপ। এমন সময় বাবার বন্ধুস্থানীয় সাধক সন্ন্যাসী শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ খবর পেলেন যে বাবা মৃত্যুশয্যায়। বাবার বাল্যবন্ধু 'নিরক্ষর'এর লেখক চরণদাস ঘোষ সীতারামদাসের কলেজের সহপাঠী সেই সূত্রে বাবার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বাবার অসুখ শুনে তিনি বাবাকে একদিন দেখতে এলেন। ওঙ্কারনাথ ঠাকুর সর্বদা রামনামে পরিবৃত থাকেন—তাঁকে ঘিরে একদল শিষ্য নাম সংকীর্তন করতে করতে এলেন। আমি মহাপাপী। সংকীর্তন শুনে ছুটে গিয়ে বললুম—"ঠাকুর, যদিও আমার বাবা অচৈতন্য হয়ে আছেন, তবু যদি ভেতরে ভেতরে জ্ঞান থাকে, তবে হরিনাম শুনে তো ভয়ে মারাই যাবেন। লড়াই করে বাঁচবার আত্মবিশ্বাসটা সেরে ওঠার পক্ষে খুব জরুরী বলে শুনেছি—হরিনাম শুনলে বাবা হয়তো ভাববেন ওঁর নির্ঘাত মৃত্যু ঘটেছে। তখন ভেতর থেকে মৃত্যুকে আর বাধা দেবেন না।" ওঙ্কারনাথ ঠাকুর সহাস্যে বললেন—"নাম গান নিচেই হোক তাহলে, চল্, আমি একা ওপরে যাব।" বাবার চোখ বন্ধ। ঘরের জানলাদরজাও বন্ধ। তখন গ্রীষ্ম সময় সকাল বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা হবে। বিদ্যুৎ বাল্ব জ্বলছে। খাণ্ডার নার্স তো ঢুকতেই দেবে না কাউকে, যেহেতু ভিক্টিরিয়স নট অ্যালাউড। আমরা নার্সকে ঘর থেকে চলে যেতে বললুম। সে গেল না। বরং আগে-ভাগে বলল— "রোগীকে প্রসাদ-টসাদ কিছু খাওয়ানো চলবে না কিন্তু, ডাক্তারবাবু না-এলে।" সন্ন্যাসী দেখেই সে ঘাবড়ে গেছে, ভেবেছে এবার কিছু তুকতাক হবে বোধ হয়। চলবে চরণামৃত-টৃত গেলানো। সীতারামদাস বাবার পাশে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। সস্নেহে তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বেশ জোরে জোরে ডাকলেন—"নরেন! নরেন! বলি ব্যাপারটা কি?" —বারোদিন ধরে বন্ধ চোখের পাতা থিরথিরিয়ে কাঁপতে লাগল। মা, আমি, আমার মাসীমা এবং নার্স অবাক হয়ে দেখলুম—চোখ মেলে বাবা তাকালেন। লাল টকটকে চোখ রক্তের মত লাল। চোখের দৃষ্টিতে ফোকাস নেই তেমন, তবু পাশের দিকে তাকালেন, ওঙ্কারনাথের দিকে। একমুখ হেসে ওঙ্কারনাথ বাবাকে বললেন—"বলি, আছো কেমন?" খুব জমাটি আড্ডার ভঙ্গীতে। কী আশ্চর্য, বাবার ঠোঁট খুললো, স্বাভাবিক সুরে একটু জড়িত স্বরে বাবা বললেন—"যেমন রেখেছো। আবার কেমন?" হেসে উঠে ওঙ্কারনাথ বললেন—"আবার ইয়ারকি করা হচ্ছে! আর নয়, এবার উঠে পড়ো দিকিনি।" ইতিমধ্যে বাবার চোখ আবারও বুজে গেছে! বাবা আর কিছু বললেন না। সীতারামদাস আমাকে বললেন—"ভাবিসনি আর তিন-চারদিন পরেই তোর বাবা উঠে পড়বে।" নেমে চলে গেলেন তিনি, হরিনাম সংকীর্তন জোরালো হয়ে উঠলো। বাবা দীক্ষিত তো ননই, যাকে ভক্তশিষ্য বলে তাও নন। ওঁদের দুজনের মানবিক সম্পর্কটি নেহাত হৃদ্যতার, বন্ধুতার! বড়ো মধুর! ওঙ্কারনাথ ঠাকুর তো চলে গেলেন। নার্স এদিকে একেবারে অধীর হয়ে পড়ল। বারোদিন ধরে অজ্ঞান অচৈতন্য কোমা রোগীকে এভাবে অনায়াসে 'হিপ্নোটাইজ করে' কথা কওয়ানো সে কখনো দেখেনি। সীতারামদাস ঠাকুর কী করে বুঝেছিলেন তা আমি জানি না, তবে সত্যিই তিন-চারদিন পরেই বাবার চৈতন্য ফিরলো। শুধু তাই নয়, পনের দিন ধরে অবশ পঙ্গু বাঁ হাত বাঁ পা দিব্যি নড়তে লাগলো। বাবা উঠে বাথরুমে গেলেন। ডাঃ শৈলেন সেন বললেন—"এটা মেডিক্যাল মিরাক্ল। কেবল মনের জোরেই উনি অসাধ্যসাধন করে

BanglaBook.org

ফেললেন।" সবচেয়ে ভক্তিবিহ্বল হয়ে পড়েছিল সেই দিশী খ্রীষ্টান নার্স, ব্রজাঙ্গনা যার নাম। সে এখন বরে না-থাকলে জানি না ডাক্তারবাবু আমাদের কথা বিশ্বাস করতেন কিনা।

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ কিন্তু ভানুমতীর খেল্ দেখান বলে শুনিনি। এটাও নিশ্চয় কোনো মিরাক্ল ছিল না—আমাদের মনে হয় বাবার সঙ্গে তিনি স্বাভাবিক কথাই বলেছিলেন। বাবার আচ্ছন্নতার তলায় তলায় যে চৈতন্য সুপ্ত ছিল, তকেই জাগ্রত করেছিলেন তিনি। যৌগিক সাধকের পক্ষে একাজ কঠিন নয়। এর পরে বাবা আরো দু'বছর বেঁচে ছিলেন। সুস্থ ও সমর্থ শরীর নিয়ে, চারতলা-একতলা ওঠা-নামা-হাঁটা-চলা করে। জ্ঞান ফেরবার পরে এই ঘটনার কথা শুনে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁর মনে আছে সীতারাম এসেছিলেন।

লাল্লন আর লতিফও আমাদের গল্প শুনেছে। লাল্লন বললে—"গুরু ভগবানেরা তো এরকম হামেশাই পারেন। বনারসে তো হরেক সন্ন্যাসী হরেকরকম জাদু কি খেল্ জানেন।" লতিফ বেশি কথা বলে না, সে কেবল সায় দেয়। সঙ্গত্ করে। ইতিমধ্যে গোপীগঞ্জ এসেছে। খাবারের দোকানে গাড়ি থামলো। নেমে এগিয়ে গেছে ওরা। আমি নামতেই শার্দুল সিং বললেন—"এইবেলা আমার দ্বিপ্রাহরিক আহ্নিকপুজোটা সেরে নেবো খালি গড়িতে।" বেশ ঠাণ্ডা। আমার গায়ে ভাগিস আছে উলেন সোয়েটার। মায়ের কীর্তি। মা বললেন—"কে জানে হায়দ্রাবাদে কম-বেশি কেমন-কীরকম ঠাণ্ডা হবে? একটা হাতপুরো নে, একটা হাফহাতা নে, আর একটা হাতকাটা নে। যেমন যেমন গিত বুঝবি, তেমন তেমন পরতে পারবি। আর একটা শালও নিবি।" খুব গাঁইগুঁই করেছিলুম তখন। —"কি হবে চারটে গরম জিনিসে? একটা জাকেই যথেষ্ট। এখন তিনটে সোয়েটারই পরে আছি দুপুরবেলায়। রাত্রে কি হবে? লাল্লন বললে—"দিদি, পরোঠা ঔর মীট লিজিয়ে গ্রাপ। ঔর সাথমে মটর পনীর, টাটাব তরকা ঔর দাল।"—লিস্টি শুনে আমার বেজায় রাগ হয়ে গেল। দোকানের সঙ্গে নিশ্চয় সাঁট আছে এদের। কেন রে বাবা? এত খাব কেন? তা ছাড়া কোনো সৎ আচারের 'মাসে সংযম' করে থাকতে হয়। যেমন বিবাহে! তিরুপতিতে কাল সারাদিন নিরামিষ খেয়েছি। এমনিতেই নিবি 'সংযম' হয়ে গিয়েছে, আজকে খামোকা মাংস খেয়ে পুণ্যিটা নষ্ট করি আর কি! আমি হাঁ হাঁ করে উঠলুম।—"সির্ফ চাপাটি ঔর তরকা। ঔর চায়। পহলে চায়, ফির খানা ফিরভি চায়।"

—"চাপাটি, তরকা?" আর্তনাদ করে ওঠে লাল্লন।—"বাস্?"

আমার খুব রাগ বেড়ে যায়।—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাস্।"

—"ঔর কুছ নহীঁ?"

—"কুছভি নহীঁ।" গটগটিয়ে একটা খাটিয়াতে বসতে যাই। অমনি হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে লতিফ।

—"জী নহীঁ মেমসাব। ইধর তো বহুৎ খটমল হোগা। আপ উধর তক্তাপর বৈঠিয়ে।"

—"কের মেমসাব?" ধমক শুনে লাজুক হাসে লতিফ। কিছু বলে না। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাতা এনে তক্তাপোশ মুছে সিংহাসনের মত ঝকঝকে করে ফেলেছে দোকানের ছোকরা ভৃত্য—"বৈঠিয়ে জী।"

এ মজা মন্দ নয়। আরেক রকম স্টেট্ গেস্ট হয়েছি। পাঞ্জাবী রঁধুনী মুহূর্তেই চমৎকার সুগন্ধি মশলা-চা এনে দেয় কাচের গেলাসে। লতিফ ধমক দেয়—"কাপ নহীঁ হ্যায়? কাপ দো!"

আমি হাঁ হাঁ করে বলি—আমার গেলাসই বেশি পছন্দ। বেশ বাগিয়ে ধরা যায়। গা-টাও তাপে গরম হয়। সাহেবদের ওই এক পেলে হাতলওলা বাটি আমার মোটে পছন্দ নয়। ধরাও বেশ শক্ত। দু আঙুলে শক্তি চাই, ব্যালান্স চাই, মনস্কতা চাই। ভাঁড়, গেলাস, বাটি—এসব ঢের মানুষের মতো বাসন।

রুটি তৈরি ছিল না। রুটি গড়বে এখন। ইতিমধ্যে দুজন লোক এসে ঐ খটমল অলংকৃত

BanglaBook.org

খাটিয়াতেই আরাম করে বসল, যেখানে আমার বসতে মানা। লাল্লন, লতিফ দূরের একটা খাটিয়ায় বসেছে। আমায় সঙ্গে বসতে চায় না, বোঝাই যাচ্ছে। আমি প্রথমেই ভেবলুম ওদের কাছে ডাকি—তারপর মনে হলো ওরা হয়তো শরাব-টরাব পিয়েগা, কে জানে বাবা? থাক—যেখানে ওরা স্বচ্ছন্দ সেইখানে বসুক। এখানে যাঁরা খাটিয়াতে এসে বসেছেন তাঁরা একদৃষ্টে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করছেন। আমার পরনে অন্তত একপো জরি আর আধসেরটাক্ সিল্কের সুতোয় বোনা এক পেল্লায় কাণ্ডিভরম শাড়ি। তার চাকচিক্য দেখে আমাকে ঠিক মহীশূরের মহারাণী মনে নাও হতে পারে, কিন্তু তাঁর কৃপাধন্য মন্থরা তো বটেই। কাঁধে ফুটানি-কি থলিয়া, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি, গায়ে প্রথমে হাতপুরো সোয়েটার (ভেবেছিলুম ওতেই হবে), আর ওপরে হাফহাতা সোয়েটার, তার ওপরে হাতকাটা সোয়েটার। তিনটেই ঘোর কালো রঙের এই রক্ষে! গাল যথাসাধ্য ফুলো, মুখ গম্ভীর। কারণ হাতের গরম গেলাসে আপ্রাণ ফুঁ দিচ্ছি তখন! গরম জিনিস আমি একদম খেতে পারি না। বিলেত-টিলেতের নেমন্তন্নে ওই সূপ খাবার পরীক্ষাটায় প্রত্যেকবার ফেল করি। জুলজুল করে দেখি না-খাওয়া সূপটা নিয়ে গেল। নইলে পরের কোর্সটা দেবে কেমন করে? ফুঁ দিতে দিতে আমিও চোরা-চাহনিতে তাঁদের দেখছি। চায়ের ধোঁয়ার আড়াল থেকে। তাঁদের পরনে পরিষ্কার ধুতি, পায়ের মলমল বুট জুতোয় ফিতে বাঁধা, গায়ে বন্দরের (একজন হলদে, অন্যজন সাদা) পাঞ্জাবি, তার ওপরে মোটা পশমী আলোয়ান জড়ানো। ফরসা রং, দুজনেরই গোঁফ আছে, একজনের আবার টিকিও আছে। ধোঁয়াওড়া দু' গেলাস চা নিয়ে মৌজ করে বসেছেন। আর আমাকে নিরীক্ষণ করছেন। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন হলো—"আপ কিধরসে আয়ে হেঁ?"

গম্ভীর মুখে বলি—"হায়দ্রাবাদসে।"

—"আচ্ছা, আপ হায়দ্রাবাদকে রহনেওয়ালী হেঁ!"

সাদা পাঞ্জাবি ফিসফিস করে হলদেকে কিছু বললেন। হলদে গম্ভীর মুখে জানালেন— "নহীঁ নহীঁ, ইলাহাবাদকে পাস নহীঁ, হায়দ্রাবাদ তো বহুত দূর হ্যায়, আমদাবাদকে পাস হোগা।"

তাড়াতাড়ি আমি বলি—"না না, আমেদাবাদ তো সেই গুজরাটে, আর হায়দ্রাবাদ অন্ধ্রপ্রদেশে। ঔরাঙ্গাবাদকে পাস।" দুজনেই এবার গুম হয়ে গেলেন। এটা ভুল হলো হায়দ্রাবাদ যেখানেই থাকুক, গোপীগঞ্জের কাছে নয়। আমি ডিটেক্টিভ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে প্রায়ই গোড়াটা কাঁচিয়ে ফেলি। সামাল দিতে কথা শুরু করলুম—"আপনারা কি গোপীগঞ্জে থাকেন?"

—"জী হাঁ।"

—"চাষবাস করেন?"

—"না না বিজনেস।" বললেন হলদে।

—"চাষও করি।" বললেন সাদা।

হলদের মাথায় দীর্ঘ টিকি।

—"আপনি ব্রাহ্মণ?"

—"জী হাঁ।"

—"আপনাদের গোপীগঞ্জের লোকেরা কি প্রধানত চাষী?"

—"হাঁ, অবশ্য আমরা কয়েকঘর বিজনেসম্যানও আছি। গোপীগঞ্জে মস্ত মার্কিট আছে তো। বানারসকা সব কুছ চীজ ইধরমে মিলেগা। লেকিন ভাও জরাসা জেয়াদা হ্যায়।"

—"ইস্কুল আছে?"

—"হাঁ।"

—"হাসপাতাল?"

—"হাঁ, ডিস্পেন্সারি আছে। ডাক্তার আছে।"

BanglaBook.org

এবার আমি আর কথা খুঁজে পেলুম না। সাদা পাঞ্জাবি কথা কন না বিশেষ। ফিসফিস করে তিনি কিছু বললেন হলদের কানে কানে। এবং হলদে মাইক হয়ে সেটা জোরে জোরে বললেন—"আপ কাঁহা যায়েঙ্গে? কুম্ভমেলা?"

—"জী হাঁ।" ইতিমধ্যে আমার রুটি-তরকা এসে গিয়েছে। কের এক গ্লাস চা-ও।—"আপনারা কুম্ভস্নানে যাবেন না?"

—"ওখানে বড্ড ভিড়! ভিড়ে যেতে আমার ভালো লাগে না।" বললেন টিকিওলা ব্রাহ্মণ বিজনেসম্যান।

—"বা, মার্কেটে বুঝি ভিড় নেই?"

—"মার্কেটের ভিড় তো সও আদমিকো, কুম্ভের ভিড় কোটি মানুষের।"

হলদে জামা এবার হেসে ফেললেন। —"আমরা বিজনেসম্যান, আমাদের পুণ্ আস্নান সে কা হোগা?"

আমি হতবাক্। গোপীগঞ্জে এ কেন্ কালা-পাহাড়? বন্ধুকে সামলে দিয়ে এবার সাদা পাঞ্জাবিই কথা বলেন "এত দূর দূর থেকে সবাই আসছে, আর আমরা এত কাছে থেকেও যাচ্ছি না! চলো তেওয়ারীজী, এবার আমরাও ঘুরে আসি।"

তেওয়ারী বললেন—"আপ যাইয়ে। ম্যায়-নহীঁ যাউঙ্গা" মাথায় কিন্তু দিব্যি পুরুষ্টু টিকি রয়েছে। প্রসঙ্গ বদলাতেই বোধহয় তিনি বললেন—"গাড়িতে উনি কে? আপনার বাবা?"

এবার আমার মুশকিল। বাবা? —"না ঠিক বাবা নন। সহযাত্রী।"

—"হায়দ্রাবাদের?"

—"না জয়পুরের।"

—"আপনি জয়পুর থেকে আসছেন এখন?"

—"না, হায়দ্রাবাদ থেকে।"

"তবে?"

—"বেনারসে সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের।"

—"অ! আপনি কার সঙ্গে এসেছেন?"—সেই প্রশ্ন।

—"কারুর সঙ্গেই না।"

—"একা?"

সাদা পাঞ্জাবি তাকালেন হলদের দিকে। —"একা?" হলদে চাইলেন সাদার প্রতি। তারপর খালি গেলাস সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে দু'জনেই হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন—"নমস্কার। এবার তবে আমরা আসি।"

—যে মেয়ে একা একা কুম্ভমেলায় যায়, পথে জয়পুরী বৃদ্ধ বাবা যোগাড় করে ফেলে, সে মেয়ে তো মেয়ে নয়, অপ্সরা নিশ্চয়! ছেঁয়াচ এড়াতে তাঁরা গোপীগঞ্জের স্বাস্থ্যবান হাটের দিকে দ্রুতপায়ে পালিয়ে গেলেন।

আমিও খাওয়া শেষ করে লাপ্সন-লতিফের দিকে তাকিয়ে দেখি—খাটিয়া খালি। কই, গেল কোথায় তারা? ঐ যে—দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। দেখে মনে হলো ওদের বিলটাও আমি দিয়ে দিই বরং—ভেবে বেশ উদার ফীল করি। তৎক্ষণাৎ দোকানীকে দিয়ে বলি, "ড্রাইভারদের বিল আর আমার বিল—"

পাঞ্জাবী রাঁধুনী এক-দাড়ি-গোঁফ বিনয়ী হাসি হেসে বললেন—"বিল্ দে দিয়া গয়া। আপকোভি!"

—"মুঝকো ভি? কৌন দিয়া?"

—"উও ড্রাইভার লোগ?"

BanglaBook.org

ছুটে গেলাম—"লাল্লন? লতিফ? বিল্ কেন তোমরা দিয়ে দিয়েছ?"

দুজনেই হাতজোড় করে বললে—"কিছুই তো খেলেন না আপনি। আমরা যা যা খাওয়াতে চাইলুম তার একটাও তো খেলেন না।"

—"এ চলবে না ভাই, খাবারের দাম নিতেই হবে।"

জিভ কেটে কান মলে লাল্লন বলে—"এই যে বললেন 'ভাই', ভাইরা বহেনকে খাইয়ে দাম নেয় কখনো?" আমার চোখে জল ভরে এল। স্টেট গেস্ট হওয়ার চেয়েও ঢের বড়ো সম্মান যে গোপীগঞ্জের রাস্তায় আমার প্রাপ্য ছিল, তা কি জানতুম? লতিফ কেবল মুচকি মুচকি হাসে।

আমার জীবনে ঈশ্বরের কৃপার সত্যিই শেষ নেই। ঠিক এই আশ্চর্য আনন্দের অভিজ্ঞতা আরও একবার ঘটেছিল। মহীশূর গেছি সেবার বক্তৃতার ব্যাপারে সেখান থেকে বাসে বেলুড় হালিবিড় ঘুরতে গিয়ে ঠিক এমনিই ভাই কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। দুজন নয়, তিনজন। সেই বাসেরই ড্রাইভার, ক্লীনার, আর গাইড। সে আরেক মস্ত গল্প! ঈশ্বর জগৎ জুড়েই মায়ার ফাঁদ পেতে রেখেছেন, ঘরে ঘরে সত্যিই ঘর গড়ে রেখেছেন; সেই ঘরই ঠিক আমাদের খুঁজে নেয়। যখন উটি-ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত ঘুরে ফিরে এলুম মহীশূরে, আমাদের বন্ধু অধ্যাপক দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়কের বাড়িতে, পিছনে পিছনে এসে উপস্থিত হলো আমার তিন বন্ধু, দুজনের মাথায় দুটি বিশাল উপহার, পাকা দুটো কাঁঠাল। একটি আমার মহীশূরের বন্ধুগৃহের জন্যে, অন্যটিকে কলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে।—"বাচ্চারা খাবে"। আরেকজনের সলজ্জ হাতে নীলগিরির চা। অকস্মাৎ কালিঝুলিমাখা ক্লীনার আর ড্রাইভার-বন্ধুদের দেখে আমার অধ্যাপক বন্ধুর গৃহস্থালি থ'। ওদিকে গাইডটি আবার সদ্‌ব্রাহ্মণ, শ্রীরঙ্গপট্টমের প্রধান পুরোহিতের পুত্র। সেবারেও এমনিই এক চমৎকার বন্ধুত্ব হয়েছিল। নাগেশ্বর, উবস আর গোপাল।

গাড়ি চলাতে চলাতে এবারে লতিফ কথা বলল—"বহেনজী, পান খায়েঙ্গে?" হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। পানের দোকানে গাড়ি থামল। পান এল গোবরে মিঠামসলা। বেগর জরদা। শার্দূল সিং খেলেন না। "নো থ্যাংকযু।" আমার মুখভরতি ভাইয়েদের দেওয়া মিঠেপানের খিলি। জরদা নেই। কেবলই মিঠে। এদিকে রাস্তায় ভীষণ ধুলো উড়ছে—সব কাচ তুলে দিয়েছে ওরা—ঘুম-ঘুম পাচ্ছে একটু আমার, বেশ গরম ওম্ হয়েছে গাড়ির ভেতরে, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। ঘুম ভাঙালো লাল্লন, বলছে "দিদি 'পড়ছি' দিখাইয়ে।" সামনে রাস্তা বন্ধ। যতদূর দৃষ্টি যায় লাইনকে লাইন শত শত গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রাফিক জ্যাম?—না। ওইখানে, অনেকদূরে, একটা চেকিং হচ্ছে। কলেরা ভ্যাক্সিনেশনের সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। তবে কি এসে গেছি? নাঃ ঠিক আসিনি। এখনও ঢের দূরে পথেই চেকিং হচ্ছে। এখানে ইঞ্জেকশন দেবারও ব্যবস্থা আছে। অনেকক্ষণ পরে আমাদের পালা এল। 'পড়ছি' দেখালুম। ছেড়ে দিলে আমাদের। পথে বার-তিন-চার এভাবে 'পড়ছি' চেকিং এবং গাড়িরও 'ঈশ্বর জানেন কী' চেকিং করা হলো। শেষ পর্যন্ত একটা বিশাল মাঠে স্তব্ধ গাড়ির সমুদ্রের মধ্যে এসে আমাদের গাড়িও থেমে গেল। সামনে মস্ত তোরণ বাঁধা হয়েছে। তাতে লেখা আছে—"কুম্ভমেলা"। তার মধ্যে দিয়ে যতদূর দেখা যায় কেবল মানুষের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। দোতলা মাচার ওপর থেকে পুলিশ নির্দেশ দিচ্ছে মাইকে, গাড়িদের কি করতে হবে, মানুষদেরই বা কী করতে হবে। ভাইরা নামলো। আমরা নামলুম না। গঙ্গা কোথায়? যমুনাই বা কোথায়? এ তো মাঠ! জলের চিহ্ন নেই।

লতিফ বলে—"জল এখনে কোথায়? এ তো ঝুঁসির কাছে এসেছি। সঙ্গম এখনও বহুদূর।"

"সর্বনাশ। মালের কী হবে?"

BanglaBook.org

লাল্টন বলে—"দাঁড়ান, দেখি কুলি পাই কিনা।" কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল কুলি নেই। অনেকেই গাড়ির মধ্যে বসে আছেন। গাড়ির মাথার ওপরে মাল। ফেলেও যেতে পারছে না, টেনেও নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। দুজন বাঙালী মহিলাকে যেতে দেখে ডাকলুম। তারা প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি। বিহার থেকে এসেছেন গাড়িতে। এতদূর এসেও স্নান হবে না? পুরুষটি চলে গেছেন ওঁদের গাড়ি পাহারায় বসিয়ে দিয়ে। আমার মাল কোথাও রেখে যাবার উপায় থাকলে ফেলে রেখেই চলে যেতুম। শার্দূল সিং দুর্বল হাতে বেডিংটি তুলে নিলেন, অন্য হাতে কিটব্যাগ। আমার এক হাতে কম্বল আর ব্রীফকেস, পেটফোলা অহংকারের ঝুলি ঝুলছে কাঁধ থেকে, তদুপরি জলের ফ্লাস্ক লগবগ করছে, অন্যহাতে ক্ষুদ্র হ'লেও জ্ঞানের বোঝায় অতীব ওজনদার সুটকেস (নবলব্ধ, বইপত্রে ঠাসা)—তৃতীয় একটা হাত না থাকায় শাড়ির কোঁচাটা অত্যন্ত বিনীতভাবে শ্রীচরণে লগ্ন হয়ে পড়েছে—তাকে তুলে ধরি কী করে? উদিকে আহ্লাদী লালখানি কেবলই খসে খসে পড়ছেন, সঙ্গে সিল্কের শাড়ির আঁচলটা সুদ্ধ নিয়ে, হিন্দী ছবির নায়িকাদের স্টাইলে। লাজলজ্জা বুঝি আর রইল না। আঁচল গোছাতে হেতেই সুযোগ বুঝে ইদিকে কম্বলটি ভাঁজ খুলে খুলে ধুলোয় অমনি এলিয়ে পড়ছেন। এইভাবে অবিশ্বাস্য উপায়ে দু'পা যেতে-না-যেতেই চতুর্দিকে প্রবল ধুলো উড়তে লাগল। হাত কৈ, যে নাকে চাপা দেব? হাত কৈ, যে কোঁচাটা তুলব? হাত কৈ, যে আঁচল সামলাব, কম্বল ভাঁজ করব, শালটা জড়িয়ে নেব? দ্বিভুজ প্রাণী মাত্র, হাত বড়ই কম। সে তুলনায় বোঝা ঢের বেশী। লাজলজ্জা, মালপত্র, স্বাস্থ্যটাস্থ্য। অতএব চটিতে, কোঁচাতে, শালেতে, শাড়িতে, ব্যাগেতে, বাক্সতে, জলে, কম্বলে—প্রচণ্ড এক কেলেঙ্কারি হয়ে যাকে বলে গোবর মাঠময়। নাঃ, এভাবে পিলগ্রিমের প্রোগ্রেস ইমপসিব্ল! লাল্টন দৃশ্যটি নজর করে ছুটে এসে সুটকেস কম্বল কেড়ে নেয় হাত থেকে। "দিদি, জরাসা ঠাহর যাইয়ে। কুলি না পেলে কী আর করা, আমাদেরই কেউ যাবে। আসলে আজ যত তাড়াতাড়ি বানারসে ফিরতে পারব, ততগুলো টিপ দিতে পারব এখানে! আজ মৌনী অমাবস্যা, হোল নাইট যাত্রী আসবে। সেইটেই মুশকিল হয়েছে। এর মধ্যেই লতিফ কোথায় চলে গেছে। তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। লাল্টন বললে—"মুশকিল এই যে, কুলি যদিও বা পান, আপনাদের কুলি নেওয়া উচিত নয়।" তোরণের নিচের অনাদান্ত জনস্রোতের দিকে আঙুল তুলে লাল্টন বললে—"কুলি তো মাল নিয়ে ভেগে যাবে। যাকে-তাকে মাল নিতে দেবেন না। এখানে অনেক চিটিং হয়। আপনারা একজন বুড্ঢা আর একজন ঔরৎ। ভিড়ে দৌড়ে চোট্টাকো পকড়নে কোইভি নহীঁ সকেঙ্গে। মালপত্র সমস্তই যাবে।"—এমন সময়ে লতিফ ফিরল। সঙ্গে দুটি বছর দশ-বারোর ফুটফুটে ছেলে। একজনের মাথায় চাঁটি মেরে বললে—"এটার নাম লালা আর এইটা গোঙা এরা ঐ চায়ের দোকানের মালিকের ছেলে।" —ওর হাতের ইশারা অনুধাবন করে দেখি ছোট্ট সাদা রঙের পাকাঘর যেখানে চা বিস্কুট বিক্রি হচ্ছে বারান্দায়—ব্ল্যাকবোর্ডে আরো অনেক স্বাদু সম্ভাবনার নাম লেখা।

—"এটা এদের বাপের বাড়ি, নিজের বাড়ি, নিজের দোকান। পালাতে পারবে না। পালালে পুলিশকে বলবেন এই দোকানের মালিকের ছেলে। ওর বাবা বলেছে একে পাঁচটাকা, ওকে দু'টাকা দিবে দিতে। তাই দেবেন।"

—"সেকি, ওকে মোটে দু'টাকা কেন?"

—"ও তো গোঙা।"

গোঙা? মানে বোবা?—বোবা বলে মাল তো কিছু কম বইবে না। কিমাশ্চর্যম্! ওদের বাবা নিজেই এমন বললেন?

—"ঠিক তা নয়। দর কষে নামিয়েছি।"

—"আমরা দু'জনকেই পাঁচটাকা করে দেব।" শুনে গোঙার ম্লান মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে

BanglaBook.org

উঠল। লালাও মিষ্টি হাসল একগাল। লতিফ তাদের পিঠ চাপড়ে বলল—"ঠিকসে নিয়ে যাবি। বেইমানি করবি না।" তারপর পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তাতে ইংরেজি অক্ষরে নিজেদের নাম লিখে আমার হাতে দিল। ওদের ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের ঠিকানা। ক্লার্ক হোটেলের বিপরীতে। ট্যাক্সির নম্বরও লিখে দিল—U. P. L. 5233, আর বলল, লাল্লন সিংয়ের ট্যাক্সি বলবেন। ক্লার্ক হোটেলেও চেনে, ট্যুরিস্ট ব্যুরোতেও। বাবা দু'শো আমি একশো, ভাড়া মিটিয়ে দিলুম। তারাও খুশি, আমরাও।

একটা নোটবই এগিয়ে দিল লাল্লন। —"দিদি, আপনার ঠিকানা? যদি ফিন তার্কেস্‌সুয়েরমে যাই, এবারে কলকাতা দেখে আসব।"

ঠিকানা লিখতে লিখতে বলি—"নিশ্চয়। আমাদের বাড়িতে এসে থেকো। লতিকভাই, লাল্লনভাই, তোমাদের দিদির নেমন্তন্ন রইল!"

বেলা তিনটে বাজে। এবারে দুটি কিশোরের সঙ্গে আমরা দু'জন অনাত্মীয় পিতাপুত্রী প্রয়াগসঙ্গমের দিকে পদব্রজে রওনা হলুম। জনসমুদ্রে মিশে যাবার আগে একবার পিছন ফিরে দেখি ঐ চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে লতিফ লাল্লন হাত নাড়ছে।

—"চলি ভাই।"

—"ফির মিলেঙ্গে দিদি।"

৮

স্বর্গারোহণ পর্ব

তৃতীয় সর্গ

হাঁটছি তো হাঁটছিই।

গোড়াতেই ডানদিকে একটা পুলিশের তাঁবু দেখে আমি রাস্তা ছেড়ে নেমে গিয়ে জেনে এসেছি, যদি গবর্নরের তাঁবুর পাশে যেতে চাই তাহলে জনং ব্রীজ দিয়ে পার হতে হবে। চক্রবর্তী রাস্তার ছবি এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন গবর্নরের তাঁবুর পাশেই ট্যুরিস্ট ব্যুরো এবং প্রেস। আনন্দময়ী মায়ের তাঁবু কোথায় পুলিশ জানেন না। কিন্তু প্রেসের কাছে পৌঁছুতে পারলে আনন্দময়ী মাকে পাওয়া অসাধ্য হবে না, শুনেছি ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর ভক্ত! আনন্দময়ীর দেওয়া মালা গলায় প'রে ইন্দিরার ঢের ছবিও দেখেছি কাগজে। শার্দূল সিংয়েরও তাই অভিমত। ট্যুরিস্ট ব্যুরোকেই লক্ষ্য করে এগোতে হবে—অথবা প্রেস। কেননা এগুলো সবাই জানবে, বিশেষ একজন ধর্মগুরুর আশ্রম যদি নাওবা জানে।

মানুষ, মানুষ, মানুষ। রাস্তাটা উঁচু বাঁধের মতো। দুপাশে ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাঠ। মাঠে তাঁবু মানুষ গাছপালা। এক জায়গায় দেখি পরপর বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্যবান হাতির পায়ে শিকল পরিয়ে খোঁটায় বাঁধা রয়েছে, গাছের নিচে। এত মানুষের মধ্যে হঠাৎ কিছু হাতি দেখে কেন জানি না খুব আহ্লাদ হলো। একসঙ্গে এত হাতি! কিন্তু কেন? এ হাতিরা এখানে কি করছে? এখানে কি সার্কাস-টার্কাস...? না শোনপুরের মেলার মতো...? লালা বললে—এদের মেলায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবারে। হাতি ভেতরে নিয়ে যাওয়া বারণ। তাই যেসব সন্ন্যাসীরা হাতিতে এসেছে তাঁরা এখানে ওখানে হাতি জমা রেখে, হেঁটে গঙ্গাদ্বীপের আখড়ায় গিয়ে আছেন।

বিদ্যুচ্চমকে মনে পড়ে গেল, আগের পূর্ণকুম্ভের বিষণ্ণ-প্রসঙ্গ, যেবার নাগাসন্ন্যাসীদের হাতির তলায় পিষ্ট হয়ে স্বর্গলাভ করেছিলেন কয়েক হাজার অসহায় পুণ্যার্থী। থাক, হাতিরা ভালোই আছে—মেলার বাইরে। এখানেই তোমাদের ঢের পুণ্য হবে, সামনের বারে হাতিজন্ম হবে না।

BanglaBook.org

মাহুতজন্ম হবে। এই তো প্রার্থনা? খানিক পরে দেখি, উট! মাল বইছে উটের গাড়ি এবং উট। দলে দলে পুণ্যার্থী হেঁটে চলেছেন, তাঁদেরও হাতে, বগলে মাথায় মালের বোঝা। অনেক সাধুসন্ন্যাসীও যাচ্ছেন, লোটা কম্বল নিয়ে সুখী পুরুষ তাঁরা। লালার মাথায় আমার সুটকেস, গোঙা বাবার বেডিং ও কিটব্যাগটি রইছে। আমার ফুটানির ঝোলা, জলের বোতল, কম্বল, ব্রীফকেস, (আঁচল, শাল, কোঁচা) ইত্যাদি আমারই করস্থ আছে! কচি কচি মুখ দুখানি যেন পদ্মফুলের মতো আলো হয়ে আছে ময়লা পোশাকের ওপর। সেই পদ্মমুখে বিস্তর ধুলোময়লা, তারই মধ্যে ঝকঝকে দুটি হাসিভরা সরল চোখ। ওদের দিয়ে ভারী ভারী বোঝা বহন করিয়ে তারপর কুম্ভস্নান করলে সেটা মোটেই পুণ্যস্নান হবে না। তাই বললুম—"এবারে এসব খুচরো জিনিসগুলো লালা নাও, আমি নিচ্ছি সুটকেস।" লালা আপত্তি করলে, ওগুলো তো ভারী নয়, এইটেই ভারী। —"তা হোক, লালা তুমি আমার কথাটা শোনো।" বাবাও কিটব্যাগটি গোঙার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। দেখেই আমার শিভালরি জেগে উঠল। বাবার হাত থেকে কিটব্যাগ আমি কেড়ে নিলুম—"বাবা, মেয়ের সামনে আপনি ব্যাগ বইবেন, একি হতে পারে?" বলতে না বলতে দেখি গোঙা টানাটানি করছে আমার সুটকেসটা নিয়ে। এইরকমই চলল সারা রাস্তা বদলাবদলি। আমরা সবাই মিলে সব মাল ভাগাভাগি টানাটানি করে বইতে লাগলুম। শার্দূল সিংহও কম যেতে রাজি নন—নিদেনপক্ষে কেডেকুড়ে কম্বলটা জলপাত্রটা তো বইবেনই। তাঁর মিলিটারি ট্রেনিঙে স্ত্রীলোকের হাতে মাল দিয়ে নিজে শূন্যহাতে যাওয়া প্রাণ থাকতে দুঃসাধ্য। আর আমার কলকাতা ছেড়ে-আসা দুটো মেয়ের কচি মুখ আমি কেবলই ল্যাংটা গোঙার ধুলোময়লা মাখা মুখে দেখতে পাচ্ছি—ওদের দিয়ে সবটা ভার বওয়ানো আমার মায়ের প্রাণেও অসম্ভব। নেহাত একা সত্যই বইতে পারব না, আর ওদের মাল বওয়ার অভ্যেস আছে—তাই আমাদের দুজনের মাল আমরা চারজনে ভাগ করে বইতে লাগলুম।

ওফ্! মালের বোঝা তো নয়, এ যেন পাপের বোঝা। আসবার সময় তো মাত্র সঙ্গে তিনটে চেঞ্জ নিয়ে, তার একটা রয়েছে পরনে। যাবতীয় গরম পোশাকও সমস্তই রয়েছে পরনে। পায়ে এক জোড়া মোজা ছিল, একসময়ে খেপে আরেকজোড়াও পরে ফেললুম তার ওপরে। পায়ে শীত করছে। হায়দ্রাবাদে-তিরুপতিতে কিছু উপহারদ্রব্য কেনা হয়েছে আর পাওয়া হয়েছে প্রচুর বইপত্র। তারই ফল এই। ঐ সরস্বতীর প্রসাদটাই মাটি করেছে। (অথচ তাঁরই কল্যাণে যে আসাটা সম্ভব হলো, তা সেই কৃতঘ্ন পাপ-মনে খেয়ালই হলো না তখন!) সরস্বতীর তো আণ্ডজ্ঞান নেই, সকলেই জানে। মাঝে মাঝে উটকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা চলেছি। পথের পাশে মাঠে মাঝে মাঝে দেখছি ধুলোয় ঝুপড়ি বাঁধা, বিছানা পাতা, উনুন গড়া। রান্না হচ্ছে, খাওয়া হচ্ছে, কম্বলমুড়ি দিয়ে ধুলোয় ঘুমোচ্ছে দূরাগত, পথক্লান্ত।

গোড়ায় আমরা অনেকক্ষণ ধরে একটা বাজারের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। দুদিকের দোকানে কম্বল ঝুলছে, পুঁতিচুমকির কাজকরা বিয়ের ওড়নাও ঝুলছে। দোকানে দোকানে চা-বিস্কুট বিক্রি হচ্ছে। আমার মনে হলো ছেলেদুটোকে কিছু খাইয়ে নিলে হত। শার্দূল সিংকে বলতেই তিনি বললেন—"নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা হয়তো মেলায় পৌঁছে খাওয়াটাই ভালো, পথে কখন যে সন্ধে হয়ে যায়।" এত ভিড় যে, মানুষে মানুষে গায়ে গা ঠেকে যাচ্ছে, মালে মাল বেধে যাচ্ছে, দ্রুত যাওয়াই যায় না। অবশ্য আমরা দ্রুতগামী জীব নই, আপাতত একজনও। সকলেই ভারবাহী ধীরগতি জন্তু। পথে সন্ধে হয়ে গেলে খুঁজে পাব না অচেনা আস্তানা। তাই এখন না থামাই বাস্তবিক ভালো। তখন আমি ভাবলুম পথেই ওদের লজেন্সুস কিনে দেব—গলাটা ভিজবে। ভাবামাত্র একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। উলটোদিক থেকে নেভি ব্লু রঙের লম্বা কোট মাথায় শেঠেদের কালো টুপি আর ধুতিপরা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে লালার একটি হাতে ধরে, তাতে একমুঠো সাদা ধবধবে বড়ো বড়ো চিনির বাতাসা পুরে দিলেন। আমি অমনি

BanglaBook.org

গোঙার হয়ে তাড়াতাড়ি হাত পেতে দাঁড়ালুম—যেহেতু গোঙার দু'হাতে বেড্ডিংটা মাথায় ধরা। আমাকেও দিলেন তিনি বাতাসা। দিয়ে বাতাসার ঠোঙা নিয়ে জনসমুদ্রে মিশে গেলেন। আমি গোঙার লাজুক লাজুক হাসিমুখে আর ছিন্ন পকেটে ভরে দিলুম ধবধবে বাতাসা। ইস্—'গোঙা' কি একটা নাম হলো? —"লালা, তোমার ভায়ের আর কোনো নাম নেই? রাম, রহিম, মুন্না, পাপ্পু, কিছু না?" গোঙা বাতাসা খেতে খেতে মাথার ওপরে ভারি জিনিস সামলে, সন্তর্পণে চোখের মণি নেড়ে ইশারা করল, না নেই। লালা বলল, "গোঙাই ওর নাম। আমার যেমন লালা।" কী নির্মম আমাদের দেশ! কী উৎকট নগ্ন আমরা! এর চেয়ে সায়েবসুবোরাও যে ঢের ভদ্দর! সেখানে এইযুগে একটা বোবা শিশুর নাম কেউ 'বোবা' রাখছে, এটা কিন্তু ভাবতে পারি না। আর এমনি হাসিখুশি, বুদ্ধিমান এবং শ্রবণশীল সুস্থ ছেলে, ঠিকমতো চিকিৎসা হলে অর্থাৎ অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মালে—সে ছেলে নিশ্চয়ই কথা বলত। বোবা হওয়ার কথা ছিল না ওর। —'লাল' খুবই আদরের নাম, লালা নন্দ-দুলালা। আর তারই ছোট্ট ভাইটির নাম হবে কেন গোঙা? কেন? কেন? —এমন সময়ে শার্দূল সিং বললেন—"নবনীত, লক্ষ্য করেছ কি, কুম্ভমেলায় প্রবেশ করার আগেই ভগবান তোমার ইচ্ছা-পূরণ করতে শুরু করেছেন?" ওঁর কণ্ঠস্বর চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে

—"কেন বলুন তো?"

—"বাঃ, তুমি যেই ইচ্ছে করলে যে বাচ্চা দুটোর মুখে কিছু খাবার তুলে দেবে, অমনি ঈশ্বর স্বয়ং সেই খাবার জুটিয়ে দিয়ে গেলেন। তোমাকে আর দাঁড়াতেও হলো না, দেরিও হলো না। দেখলে না?"

শার্দূল সিংহের কথায় আমার গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিল। সত্যি তো! ঐ লোকটি কে? কেনই বা উল্টোদিক থেকে উজান বেয়ে এল, —জনতা তো এখানে একস্রোতা, সকলে একই লক্ষ্যের যাত্রী, —কেনই বা এতলোক ছেড়ে আমাদের লালা-গোঙার অঞ্জলিতেই ভরে দিল সে মিঠাই?

—"লালা, তুমলোগ উস আদমিকে পহচানতে হো?"

—"কওন আদমি?"

—"জিসনে মিঠাই দিয়া।"

—"নহী তো?"

নিশ্চয় পুণ্যলোভী কোনো তীর্থযাত্রী হবেন। শিশু-ভোলানাথকে তিনি অর্ঘ্য দিয়ে গেলেন নিজেরই মনের তৃপ্তির জন্য। এ তাঁর পুণ্য অর্জনের এক পথ! নাকি, শার্দূল সিং যা বলছেন,—তাই? স্বয়ং ঈশ্বরই আমার মনের বাঞ্ছা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন! ইচ্ছে করছে শেষের ব্যাখ্যাটাই বিশ্বাস করতে এই আকুল ভিড়ে, এই পবিত্র ধুলোয়, এই ম্লান-হয়ে-আসা সূর্যালোকে এটাই মানায়।

তিনিই এসেছিলেন। আমার জন্যে, আমার কাছে তিনিই এসেছিলেন। ভাবলে ক্ষতি কী? ভাবতে পারলে তো অনেক লাভ। শার্দূল সিংহের সেই মস্ত লাভটা হয়ে গেছে। সতের লক্ষ টাকার লটারি নিতে গেছেন তিনি, এখানে—এইমাত্র। ভাগ্যবান পুরুষ। আর তুমি একটা একশো টাকার কনসোলেশন প্রাইজও তুলতে পারলে না, নবনীতা? এতই তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির পাথর-বোঝা? না হয় চোখটা বুজে এক মুহূর্ত মেনেই নেবে—তোমার মধুসূদনদাদা এসেছিলেন, যেই তুমি চাইলে ওরা মিষ্টি খাক, অমনি ওদের মিষ্টি খাইয়ে গেলেন তিনি নিজেই। ঈশ্বরদর্শন কি অপার্থিব, অন্যরকম কিছু? না এইরকমই?

আমি তো ভজনপূজন জপতপ কিছুই জানি না। অথচ অনেকবারই আমার বিস্মিত হৃদয়ের সামনে ঈশ্বরের করুণা ফুটে উঠেছে—যা আমার কদাচ প্রাপ্য নয়, সেই অহৈতুকী কৃপা আমার জীবনেই উথলে পড়েছে বার বার। ঈশ্বর নিশ্চয়ই দেখিনি, কিন্তু মাঝে মধ্যে যুক্তির ঘরে চুরি

BanglaBook.org

করে অন্যের চোখে দেখতে দেখি কি? এই তো—পুণ্যবান শার্দূল সিংহ খুব কাছ থেকে এইমাত্র তাঁকে দেখলেন। দেখতে পেলেন।

যাতাসা খেতে খেতে বাচ্চারা পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছে। আশপাশে সকলেই যে-যার নিজের মাল বইছেন—শুধু আমাদের বেলাতেই সহায়ক আছে। হঠাৎ খেয়াল হয়—এও তো মস্ত এক ভগবদ্ কৃপাই! এ সুবিধে তো পাওয়ার কথা ছিল না আমাদের? মনে পড়ে গেল ছেড়ে আসা প্যাকিং লটে গাড়িতে-বন্দী সেই দুই দুজন বাঙালী মহিলার আফসোস। দুদিন ধরে এখানে এসেও তাঁদের সঙ্গমে স্নান হয়নি। কারণ মালপত্তর। ফেলেও যেতে পারেননি, নিয়েও যেতে পারেননি। এবং সঙ্গের একমাত্র পুরুষটি তাঁদের এই ভিড়ের মধ্যে যেতে একলা ছাড়েন নি। তিনিই একলা অগত্যা চলে গেছেন নাইতে। আমাদের লালা-গোঙার মধ্যেই ঈশ্বরের অপার করুণা এসেছে। এবার মেঘমেদুরমন্থরম্ স্টাইলে এমনই পবিত্র তীর্থরজঃ উড়ছে আকাশ ছেয়ে, নাকে রুমাল চপতে হচ্ছে শার্দূল সিংকেও। অথচ জয়পুর ধুলোরই দেশ। আমার ধুলো-ধোঁয়াতে আবার প্রবল অ্যালার্জি। এতক্ষণে উচিত ছিল হাঁচ-হাঁচো—হাঁচ্চো শুরু হয়ে যাওয়া। তারপরেই সোঁ-সোঁ করে ঝড়ের গর্জন উঠবে বক্ষপঞ্জরে। সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর করবে বারিধারা, নাসাগহ্বর দিয়ে। কৈ, সে সব নৈসর্গিক দুর্লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না? দেখা দিলে অবশ্য যাত্রা আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত হত আমার। ব্যাগ থেকে বেরুবে কর্টিজোনের ধন্বন্তরি বিষবড়ি—আর সঞ্জীবনী স্প্রে-সুধা। যতা-তথা বিশ্রাম নিয়ে ফুলো ল্যাজ গুটিয়ে কালই ঘটবে 'মুক্তমণির প্রত্যাবর্তন'। চান্স পেলে আমার হাঁপানি এতই বেড়ে ওঠে, যে কাছাকাছি উপস্থিত সুস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে সে দৃশ্য সহ্য করা —আমার শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার কষ্টের চেয়েও বেশী কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এতদ্‌সত্ত্বেও আমার যত্র-তত্র বিহারের উৎসাহে ভাটা পড়ে না। যদি অসুখ করে? তখন তো কষ্ট হবেই! অসুখ করতে পারে—এই ভাবনায় আগে থেকে কষ্ট পাই কেন? তাই আমি সবসময়ে ধরে নিই অসুখ করবে না। কখনই করবে না। অসুখ নেই। —দুঃখের বিষয়, সদাসর্বদা এই ধরে-নেওয়াটা কার্যকরী হয় না মাঝে মাঝে অসুখই আপার-হ্যাণ্ড পেয়ে যায়। তা যাক। তবু বিশ্বাস হারানো পাপ! আমি সেটাকে জীবনে ধ্রুবতারার মতো মেনে চলতে চেষ্টা করি। আমি জানি, রিপু-তাড়িত, মৃত্যুশাসিত, অমানুষিক এই মানুষই আবার পারে দেবোচিত অসাধ্য-সাধনে। ঠিক তেমনই, শরীরের বেলাতেও একটা সদুপদেশ তৈরি করে নিয়েছি আমি। —শরীরের ওপরে বিশ্বাস হারানো পাপ! যদিও শরীর মানুষের মতোই বিশ্বাসভঙ্গ করে, তবুও শরীরের নামই তো মহাশয়, যা সওয়াবে আলবাৎ তাই সইবে। এই বিশ্বাসেই আমি চোখ বুজে চলি। প্রসিদ্ধ 'গরীবী হঠাও'-এর মতো আমার স্লোগান হল 'উদ্বেগ হটাও'। যদিও জানি এই জটিল জগতে কোনোটিই সহজে হটবার নয়। —আমার মা অবশ্য আমার এই সুগভীর ফিলসফিকে 'শরীরের ওপর অকথ্য অত্যাচার' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু মায়েরা বড়ো একবগ্গা অবুঝ জাত। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি একদম ভোঁতা, অযৌক্তিক। যতই বলি—'দ্যাখো, চে গুয়েভারা অত জোর হাঁপানি নিয়ে বনে-জঙ্গলে কী যুদ্ধই না করে বেড়িয়েছেন। দ্যাখো, চারু মজুমদার ওই কার্ডিয়াক হাঁপানি এবং আরো পাঁচটা রোগসুদ্ধ দেশে কী কাণ্ডটাই বাধিয়ে গেলেন।' মা ইমপ্রেসড্ হন না মোটেই। এই ধুলোয় এই ঠাণ্ডায় এভাবে আমাকে দেখতে পেলে মা বেচারা কী করতেন আজ!

বাঁধানো পথ ছেড়ে ছেলেরা একসময়ে পাশের মাঠে নেমে পড়েছে। এমনি মাঠেই বাঁধা ছিল উটের গাড়ি। যাত্রীদের শোওয়া খাওয়া ঝোপড়ি বাঁধা হচ্ছিল। পথের মাঝে একটা মস্ত ইঁদারা পেরিয়েছি, গাছতলাতে। সেটা ঘিরে অনেক গ্রাম্য যাত্রী বিশ্রাম করছেন। এই ফুসীই নাকি পুরাকালে পুরূরবার রাজধানী ছিল। কে জানে, এই ইঁদারাই সেই 'সমুদ্রকূপ' কিনা?

দূর থেকেই দেখি পথের পাশে এক জায়গায় ধবধবে সাদা পরিষ্কার কাপড় বাঁশের ফ্রেমে

BanglaBook.org

ঘেরা অনেকখানি জায়গা, তার গায়ে হিন্দীতে সাইনবোর্ড আঁটা 'শৌচাগার'। তারই পাশ দিয়ে যেতে হবে ভেবে নাক বেচারী বেজায় ভয় পেয়ে গেল। কাছাকাছি গিয়ে নাক কিন্তু খুব অবাক—ব্লিচিং পাউডারের প্রণায়ামকারী কড়া গন্ধ আসছে। যেটা ভাবা গেছিল, সেটা নয়। রাস্তার ধারে ধারেই চোখে পড়েছে নিচু পাইপ থেকে জল ঝরছে পরিষ্কার। সেখান থেকে পাত্র ভরে নিয়ে যাচ্ছেন যাত্রীরা। যথেষ্ট জল, যথেষ্ট দীজাণুনাশক ওষুধের বন্দোবস্ত হয়েছে দেখছি। ওদিকে অনবরতই কলেরার টিকে দেওয়া হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতেই দুবার সার্টিফিকেট দেখাতে হলো, গাড়িতেও দুবার দেখানো হয়েছে। এই নিয়ে তিনবার। বাচ্চাদের 'পড়াই' নেই। দ্বিতীয় দাঁড়িতে একজন পুলিশ বললে—"আরে, দিই তোদের ইঞ্জেকশন দিয়ে।" শুনে গোঙা হেসে ফেললো, আর লালার মুখটি ভয়ে শুকিয়ে গেল। গোঙা অতঃপর টেনে এক ছুট লাগালো তার পরেই। পুলিশটি তাড়া করল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাসতে হাসতে চেঁচালো কেবল—"ধর ব্যাটাকে, ধর ব্যাটাকে, —পাকড়ো, পাকড়ো—ভাগলো, ভাগলো" —এবারে লালার ছোট্ট ধড়ে প্রাণ এল। সে একগাল ফরসা হাসি হেসে দিল।

৯

স্বর্গারোহণ পর্ব

চতুর্থ সর্গ

চার নম্বর সেতু কাকে বলে বোঝা গেল না—সেতু চোখে দেখাই যাচ্ছে না, কেবল থিকথিক ঘন পিঁপড়ের সারির মতো মানুষের রেখা নদীর বুক জুড়ে সরীসৃপের মতো পশ্চিমমুখো এগোচ্ছে। দূরে শূন্যপথে আকাশের গায়ে দুটি সেতু ঝুলে আছে, তাদের রূপোলি শরীরে শেষ-সূর্যের নরম আলো। একটি সম্পূর্ণ, অন্যটি অসম্পূর্ণ। ওটি তো রেলসেতু বোঝা গেল, অসম্পূর্ণটি কি অতীতের ভগ্নস্মৃতি, না অগঠিত ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন? লালাও সেটা বলতে পারে না। যেখান দিয়ে হেঁটে আমরা পার হচ্ছি, ঈশ্বর জানেন সেটি কোন্ নদী, হয় গঙ্গা না হয় যমুনা। (সরস্বতী নিশ্চয়ই নয়, যেহেতু যুক্তবেণীর তিনটির মধ্যে এইটি অদৃশ্য!) সেতুতে উঠতে যাবার আগে সামনের দিকে তাকালুম, ওপারে বালুচর সাদা সাদা তাঁবুতে ভর্তি। সেখান থেকে অজস্র ধোঁয়ার সাদা খজুরেখা উঠছে আকাশে, শত শত প্রার্থনার মতো। আর দক্ষিণ-পশ্চিমে আরো জল, তারও পশ্চিমে আরো বালুচর, আরো তাঁবু, আরো ধোঁয়া। আর কী মানুষ! —ধোঁয়া অত কি সবই উনুনের?

শার্দূল সিং বললেন, না, ধুনির। সাধুরা ধুনি জ্বালিয়েছেন তো, শীতও কমে আলোও হয়। সেই ধুনির ধোঁয়া এই সব। উনিও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ। একটি হাতে চোখ আড়াল করা, অস্তরবির মুখোমুখি। ওঁর চোখ দিয়ে দূরে তাকিয়ে হঠাৎ একমুহূর্তের জন্য মনে হলো, —সামনে বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্র। পশ্চিমের অস্তসূর্যের রক্তাভায় কেমন একটা ভয়াল বিষণ্ণতা আছে, এইসব তাঁবু পড়েছে যেন কোন বিদেশী সৈন্যদলের, এই যে ধোঁয়া উঠছে, যেন তাদেরই সঙ্কেতচিহ্ন—আর এই শতসহস্র চলমান মানুষ, সবাই সৈনিক সবাই প্রস্তুত, সেনাপতি শার্দূল সিং যেন তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণ করছেন, যেন এসব মানুষ এখানে আসার আগে শেষবার প্রণয়ীকে চুম্বন করে এসেছে, সন্তানকে আদর করে এসেছে, পিতামাতাকে প্রণাম করে এসেছে। এখন এদের হারজিৎ, ফেরা-না-ফেরা সবই অনিশ্চয়ের!

দূরের দিকে তাকালে মনটা ছড়িয়ে পড়ে। শুনেছি ত্রিশ মাইল জুড়ে কুম্ভমেলা বসেছে গঙ্গাদ্বীপে। মেলা কেমন কে জানে? এখন পর্যন্ত কোনও হাটবাজার দেখিনি। ঘণ্টা দু'তিন হাঁটছি, সবে তো নদী এল, এই জল পেরুতে হবে একবার নয়, বার বার—তারপর সেই কাঙ্ক্ষিত হৃদয়ভূমি,

BanglaBook.org

শার্দূল সিং তাঁর বাঁদুরে টুপির নিম্নাংশটা গুটিয়ে রেখেছিলেন, এবারে নামিয়ে দিলেন ঘেরাটোপ, জোলো হাওয়া। আমি খুব জল ভালোবাসি। জল দেখলেই আমার ভেতরে ভেতরে একটা সাড়া জাগে। হয়ত আমার খুব পূর্বের পূর্বপুরুষরা কোনো ঝর্ণার ধারে বাস করতেন, গভীর জল দেখলেই হাঁটুগেড়ে বসে ছুঁতে ইচ্ছে করে, আর অগভীর জলে নেমে পড়ি। কিন্তু এখন এমনই এক ঘোরের মধ্যে হাঁটছি—পথ থেকে সরে গিয়ে জলের কাছে নেমে যাবার কথা মনেই এল না। একসময়ে দেখি হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমরা চারজনে সেই সেতুর ওপরে শোভাযাত্রায় মিশে গেছি। যেতে যেতে যে থমকে দাঁড়াবো তার উপায় নেই। থামা চলবে না। পিছন থেকে লক্ষ মানুষের গতিময় চাপ এসে আছড়ে পড়বে। শার্দূল সিং পিছনে পড়ে গেছেন, লালা-গোঙা কোথায় এগিয়ে গিয়েছে। পিছন ফিরে ফিরে দেখতে চেষ্টা করছি, হঠাৎ কিছু দূরে একটি হাত শূন্যে উঠল—শার্দূল সিং। ঠোঁট নেড়ে বলছেন—"গো আহেড, আয়াম হিয়ার।" দূরের দিকে বাচ্চা ছেলেদের চিহ্ন দেখা গেল না। বুঝতে পারছি কেন লাল্লন-লতিফ বলেছিল কুলি নেওয়া অনুচিত। এখানে কেউ যদি পালাতে চায়, আমরা তাকে ধরতে পারব না। লালারা যদি না পালায়, সেটা হবে ওদের মহানুভবতা। আমি সেতুর বাঁপাশে—একদিকে খোলা জল আছে—সেতুর ধারে অবশ্য শক্ত লোহার বেড়া, জালটাল নানারকমের পার্থিব রক্ষণাবেক্ষণ। তার ফাঁক দিয়ে আসছে নদীর হাওয়া, নদীর রং, জলের গন্ধ, আকাশের বিস্তার—ওপাশের দৃশ্য। সাদা সাদা তাঁবু, সন্ন্যাসীদের চলাফেরা ওই ফাঁক দিয়ে সব এগিয়ে আসছে আমার কাছে। আরেকপাশে নিরবচ্ছিন্ন মানুষের দেওয়াল, ৭-৮ মানুষ ঘন। কি আরো বেশিও হতে পারে। এক সময়ে পায়ের নিচে সেতু ফুরোল, হঠাৎ মানুষের দেওয়ালটা ভেঙে গেল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। পায়ের নিচে রুপোলি সাদা মিহি বালি। আমার আবার ইয়া উঁচু গোড়ালির মেমজুতুয়া পায়ে। খুলে হাতে নিলুম। এই বালিতে হাঁটতে গেলে খালি পা-ই সবচেয়ে ভালো।

সামনেই অপেক্ষা করছে দুটি ক্ষুদ্র মনুষ্যমূর্তি, মাথায় বেডিং, সুটকেস। আবার তেড়ে গিয়ে সুটকেসটা ছিনিয়ে নিলুম। অনেকক্ষণ বয়েছে। স্প্রেটা শুরু হবার সময়ে স্পীড্ খুব কমে গিয়েছিল তো। বেডিংটা বওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, নেবার চেষ্টা করা কেবলমাত্র ন্যাকামি হবে। শার্দূল সিংও এসে পড়েছেন। এখন দিব্যি এক তাঁবুর শহরে এসে পড়েছি দেখা যাচ্ছে। এই বোধহয় গঙ্গাদ্বীপ।—কুম্ভনগর।

আমাদের একপাশে গঙ্গা। গঙ্গাই মনে হয়, জলের রং সাদা। (যমুনা তো নীলযমুনা হবার কথা!), অন্যপাশে সারি সারি তাঁবু গঙ্গার তীর থেকে ভার্টিকাল রেখায় বেরিয়ে গিয়েছে পূব থেকে পশ্চিম দিকে—তাদের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তা। দূরে একটা খুব উঁচু প্যাগোডার মতো গড়নের দর্পিত তাঁবু দেখা যাচ্ছে। এই সামনের বিনীত তাঁবুদের গায়ে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা। কোনো কোনো তাঁবুর গায়ে তাদের ধর্মীয় গুরুর ছাপা ছবির সারি সারি পোস্টার আঁটা। উপদেশের স্লোগান দেওয়া পোস্টার তো আছেই। বাঃ, এ তো বেড়ে মজা! গুরুদেবের শ্রীমুখের পোস্টার পড়েছে তাঁবুর দেওয়ালে। ধর্মের বস্ত্র অফিস নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতাও আছে মনে হচ্ছে। শিবাজীগণেশন্ আর মোক্ষমকুমারদের মধ্যে সব প্রবেশনেই যখন প্রতিযোগিতা আছে, এতেই বা থাকবে না কেন। সবকিছুতেই ভেজালও আছে; সাধুদের মধ্যে তো আছেই। যাঁর তেমন-তেমন সন্ন্যাসী, তাঁদের নিশ্চয় এমন দশা হয় না। সত্যকার সন্ন্যাসীও নিশ্চয় এই মেলায় অনেকেই এসেছেন। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ।

শার্দূল সমেত ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখে পুলিশকে জিজ্ঞেস করতে ছুটলুম—"মশাই, গবর্নরের তাঁবু/প্রেস তাঁবু এবং/অথবা টুরিস্ট অফিস এবং/অথবা আনন্দময়ীর আশ্রম—ইত্যাদির স্থান কোথায়?" তিনি আমার হাতে একটা হলদে বই দিয়ে বললেন—"ইসমে সব কুছ হ্যায়। দেখ্

লিজিয়ে।" এটাতে সব উত্তর লেখা আছে? ম্যাপ আছে বুঝি? হ্যাঁ এই তো, ভেতরে একটা আলগা ম্যাপ। শীর্ষেন্দু লিখেছেন বটে, এবারে কুম্ভ ব্যবস্থাপনা খুব ভালো। —ও হরি! এ তো এলাহাবাদের ম্যাপ। গঙ্গাদ্বীপের ম্যাপ কই? —"গঙ্গাদ্বীপকা কোঈ ম্যাপ নহীঁ।" তবে? কী করে খুঁজে পাব ট্যুরিস্ট অফিস? এইসব তাঁবুর যাঁকে সরু সরু যে রাস্তা হয়েছে, তাতে নামও লেখা আছে। কুম্ভনগর রীতিমতো টাউন প্ল্যানিং করে তৈরি, বোঝাই যাচ্ছে। অথচ ম্যাপ ছাপানো হয়নি? কিমাশ্চর্যম্! গবর্নরের তাঁবু কোথায়? হাত তুলে ওই পেল্লায় উঁচু প্যাগোডাটা দেখিয়ে দিয়ে পুলিশ বললে—"উন্নো দেখিয়ে—উধার, সিধা বড়া রাস্তাসে চলা যাইয়ে।" বাবাঃ, কায়দা তো মন্দ নয়, গবর্নরের তাঁবুই বটে, চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির। —ওপাশে, অর্থাৎ গোটাচারেক গলি পেরিয়ে গিয়ে, একটে বড়া রাস্তাভি আছে, সত্যি। সেখানে অনেক মোটরগাড়ি ও জীপ ঘোরাফেরা করছে। এইসব গাড়ি এখানে কি করে এল? —"ভি. আই. পি. গাড্ডি হ্যায়, ইম্পিসল পারমিশনসে আয়া।" গাড়িগুলোর ভেতরে কচিমুখ, পচামুখ, পাকামুখ, ভাঁসামুখ—নানা আকার-প্রকারের ভি. আই. পি.বৃন্দ অধিষ্ঠিত। শোঁশোঁ করে ধুলোর কুয়াশা তৈরি করে, পথচারীদের নাক-গলা পর্যন্ত অযাচিত ভি. আই. পি. প্রসাদে পরিপূর্ণ করে দিয়ে হুস্‌হাস তাঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন, কেউ কেউ আবার শূন্যগর্ভ শব্দসার। —আমি চারদিকে চেয়ে দেখছি ক্লান্ত, মালবাহী পদাতিক তীর্থযাত্রীরা নাকেমুখে কাপড় গুঁজে সেই দাম্ভিক তীর্থরজঃকে যথাসাধ্য বাধা দিচ্ছেন।

পুলিশের কথামতো বড়ো রাস্তা বেয়ে চলতে চলতে দেখছি, পথের দু'পাশে তাঁবুতে বড়ো সাইনবোর্ডে ধর্মীয় সংস্থাগুলির নাম ধাম পরিচয় লেখা। প্রত্যেক তাঁবুতে মাইক। ভেতর থেকে কোথাও ভেসে আসছে মাইকে রামায়ণ পাঠ, কোথাও নামসংকীর্তন, কোথাও অগ্নিগর্ভ হিন্দী বক্তৃতা, কোথাও বা শুনতে পাচ্ছি ব্যাকুল পুণ্যবিক্রির বিজ্ঞাপন—"এইবার এই তাঁবুতে অমুক বাবাজী অমুক বিষয়ে বক্তৃতা করবেন, সীট ভরে গেলে ঢুকতে পাবেন না, আসুন, আসুন, এই বেলা চলে আসুন" —পাড়াগাঁয়ে সার্কাস-পার্টি এলে কিংবা মফঃস্বলে নতুন সিনেমা খুললে যেমন মাইকে বিজ্ঞাপন ঘোষিত হয়, ঠিক তেমনি, ব্যাপারটা তো মজা মন্দ নয়।

সুউচ্চ প্যাগোডা তাঁবু এসে পড়ল, সত্যি বিরাট ব্যাপার। দেখি তোরণের মাথায় রঙিন নিওন বাতিতে দিব্যি চক্রটক্র ঘুরছে—কী এক সাধু সম্প্রদায়ের নামও শিয়রে জ্বলজ্বল করছে। —তবে? এর ভেতরেই কি গবর্নরের গুহ্যগৃহ? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! প্রভু, কে আমাকে বলিয়া দিবে সত্য কী?

অগত্যা আবার পুলিশ। —"ও পুলিশজী, গবর্নরকা তাঁবু কিধর!"

তিনি প্রথমে অদ্ভুত এক নির্বাক বিস্মিত তিরস্কারের জটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর নিঃশব্দ তর্জনী নির্দেশ করলেন প্যাগোডার বিপরীতে একটি করোগেটের টিনে ঘেরা বিস্তৃত অঞ্চলের দিকে। পিছন ফিরে দেখি সেখানে থিক্‌থিক্ করছে পুলিশ। গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, পরিচ্ছন্ন উদ্যানের ভিতরে বহু তাঁবু। সামনে ছোট্ট সাইনবোর্ডে সরকারী পরিচয়পত্র টাঙানো। হ্যাঁ, এটাই। এলুম তবে? আহ্! শার্দূল সিংয়ের শুকনো মুখে হাসি ফুটল।

—"আচ্ছা ট্যুরিস্ট ব্যুরো আর প্রেস অঞ্চলটা কোথায়?"

—ও বাবা! সে কি হেথা? পুলিশ গালে হাত দেয়। সে সব মোটে এ-তল্লাটেই নয়! অ—নেক দূরে। "কম সে-কম হে-সাত মিল তো হোগা। বাঁধকো পাস। উন্নো গঙ্গাদ্বীপ মে হি হ্যায় নহীঁ।"

—বারে বাঃ, চক্রবর্তী আমাকে ছবি এঁকে স্পষ্ট দেখিয়েছেন এই গবর্নরের তাঁবু, আর তার পাশটিতে কোলঘেঁষেই ট্যুরিস্ট অফিস এবং প্রেস। সেই ছবি আমার ঝোলায় মজুত। বললেই হলো "হ্যায় নহীঁ!"

BanglaBook.org

—ও হেঃ! পুলিশ হাসে। সে তো গবর্নরের জন্য তাঁবু। গবর্নর সাহেব ওখানেই অবশ্য এসে ওঠেন। এখানে গবর্নর নেই—অন্যান্য সরকারী লোকেরা আছেন। এটা নম্বেই গবর্নরের তাঁবু। সেই অনাখানেই ট্যুরিস্ট ব্যুরো এবং প্রেস—কিন্তু সে সব বহু দূরে। দুনম্বর, এক নম্বর, সবকটা সেতু পার হয়ে সেই বাঁধের ওপারে গেলে এই জায়গা খুঁজে পাবেন। এগিয়ে যান, সামনের পুলিশকে জিজ্ঞেস করুন। এদিকে নামে সন্ধ্যার তন্দ্রালসা, গঙ্গাদ্বীপের আকাশে ঘনিয়ে আসছে মৌনী অমাবস্যার আঁধার। শার্দূল সিং একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। তাই দেখে আমি অন্য প্রশ্ন করি—"পুলিশজী, আনন্দময়ী মাতাজীর আশ্রম কোথায় জানেন?"

—"কওন মাতাজী? ইধর তো বহোৎ সাবে মাতাজী আয়ে হেঁ!"

দূরছাই, আনন্দময়ী মায়ের নামই যে জানে না—এ অপদার্থ পুলিশকে কিছু জিজ্ঞেস করে কাজ নেই—এমনি একটা ভাব করে শার্দূল সিং গটগট করে মিলিটারি পদক্ষেপে হঠাৎ অনেকটা এগিয়ে গেলেন। এমনি সময়ে: আঃ, কাহারে হেরিলাম! একি স্বপ্ন, একি মায়া। ডানদিকে একটি চায়ের স্টল। লোকজনেরা দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। অমনি আমার বুকের মধ্যে চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকটি চা-চা-চা নেচে উঠল। পা দুটি আপনিআপনি থেমেছে, যেন শকুন্তলার বল্কলে অদৃশ্য কণ্টক বিঁধলো, নাকি শিবমুগ্ধা পার্বতী? চা-চমৎকৃতা নবনীতা ন যযৌ ন তস্থৌ! নেশা বলে কথা। এতক্ষণ চলার নেশায় চলেছি। সেই বেলা তিনটে থেকে হাঁটছি তো হাঁটছিই। এখন ছটা বেজে গেছে। চায়ের কথা মনেই পড়ে নি। এতক্ষণ কেবল মুখ দেখেছি। চারদিকে মুখের ভিড়ের মধ্যে একটিও চেনামুখ নেই। প্রত্যেকটি মুখের দিকে যত্ন করে চেয়ে দেখেছি, যদি একটিও চেনামুখ চোখে পড়ে যায়! কী না ঘটে এই বিচিত্র ভুবনে! সে এক অন্য তৃষ্ণায় পথ চলতে চলতে চায়ের তেষ্টা ভুলে ছিলুম। হঠাৎ সামনে চা দেখতে পেয়েই চাতকিনী চেনা নেশার মুখ অচেনা মুখের নেশা ভুলিয়ে দিয়েছে মুহূর্তেই।

কিন্তু হলে কি হবে? হা শার্দূল সিংহ! তিনি ওদিকে ঝলিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে টুকটুক করে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন মিলিটারি-সাধুর ডিসিপ্লিন সে বড়ো ভয়ংকর শৃঙ্খলা! তিনি চা খান না। একেই শার্দূল, তায় সিংহ, তদুপরি সাধক! কী কম্বিনেশন! সে বড়ো ভয়ানক জীব। আরও দাঁড়ালে এবারে হারিয়ে যাব। চা চুলোয় যাউক, নিম্নে উতলা ধরণীতল, ঘাস-বিচালি, ঘাস, বিচলি, ঘাস। ফরোয়ার্ড মার্চ শুরু করে দিই। বাচ্চারাও এগিয়ে গিয়েছে। চটিজুতো আর কিটব্যাগ হাতে, পায়ে ভবঘুরে মোজা, আমি খুপখুপিয়ে ঠাণ্ডা বালিতে অনেকক্ষণ হাঁটছি। পা জমে হিম বরফ। এবার চটি জোড়া ঝেড়েঝুড়ে পায়ে দিই। এদিকে রাস্তাটা খানিকটা বাঁধানো নতুন, পায়ের নিচে একটা ভারসহ কাঠিন্যের আরাম অনুভব করছি। বালির অতল নরম প্রশয় নেই। আহ্, জুতোয় ঢুকে বেচারা পাদুখানি যেন মায়ের কোলের উষ্ণ আরাম পেয়ে যায়! সত্যি, কত অল্পতেই শরীর আমাদের সুখী করে। মন কিন্তু অত অল্পে ভরে না। চা হলো না, কেবল চলাই হলো। ক্রমশ চায়ের স্টলটি পিছনে স্টিল গ্রেটোগ্রাফের অঙ্ক হয়ে গেল। তারপর মুছে গেল ভিড়ে, সন্ধ্যায় আর দূরত্বে। আবার পথের নেশায় চোখ উচাটন, পা সামনে টানছে। পথের শেষ কোথায়?

শার্দূল সিং এবার নিজেই পুলিশদের জিজ্ঞেসপাতি করছেন। অন্ধকার নেমে আসছে, দু'পাশের ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে উঠেছে। বিজলী বাতির ব্যবস্থা সুপ্রচুর। নাঃ, এত আলোয় মৌনী অমাবস্যা টেরও পাওয়া যাবে না।

গবর্নর-পরিত্যক্ত 'গবর্নরের তাঁবু'র কাছে ওই একটি সবেধন পুলিশই কিছু কিছু তবু খবর রাখত। বাকী পুলিশরা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলতে লাগল—আমরা তো এলাহাবাদের পুলিশ নই বাছা, বাইরে থেকে সদ্য এসেছি, এখানকার পথঘাট কিছুই জানি না, আমরা অন্যপাড়ার ছেলে বেপাড়ায় খেলতে এসেছি, আমরা ট্রাফিক সামলাতে পারি—রাস্তা বাতলাতে পারি না।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে মাইকের ঘোষণায় আরেক চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে, সন্ন্যাসী ঘোষণার পাশাপাশি পুলিশী ঘোষণা। মাঝে মাঝেই দোতলা উঁচু মাচা বেঁধে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, দূরদৃষ্টির সুবিধার জন্য। সেখানেও মাইক আছে। পুলিশরা প্রায়ই হেঁকে বলছেন—মুন্নিকা মা, গাঁও হর-কি-দুয়ার, জিলা দারভাংগা, বিহার। আপকো পতি জানকীলাল ইধর খড়ে হ্যায়, পুলিশ থানে পর আ জাইয়ে...নইনা দেবী, গাঁও দুধপুর বিকানের, আপকো লড়কা যোধমল সিং...এসব শব্দ কানে ঢুকেও ঢুকছে না। ঘটনাগুলো শব্দমাত্র হয়ে রয়েছে। পথে একটি খোকা-সন্ন্যাসী হঠাৎ পিছু নিল। সঙ্গে সঙ্গে এসে ভীষণ জ্বালাতে লাগল—"এক রূপাইয়া দে দো বেটি, লাকড়িকো লিয়ে"—কী, নিজের গোঁফ ওঠেনি, আমাকে কিনা 'বেটি' বলা? এই সেদিন কলকাতার রাস্তায় এক বাঙালী ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, যে যার গাড়ি থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে। ছোকরা অতি বেপরোয়া কাঁচা চালায়, আবার মুখটিও কাঁচা। আমি তাকে "মশায়ের কদ্দিনের লাইসেন্স?" বলতে, সে বলল—"পাঁচবছর। আপনার বুঝি এখনও হয়নি?" আমি প্রায় নাবালক বয়েস থেকেই লাইসেন্সড্ ড্রাইভার। সগৌরবে যেই বলেছি—"পাঁচ? আমার সতেরো" —অমনি সেই ছোকরা অট্টহাস্য করে উঠল—"সতেরো বছর? সতেরো তো আপনার বয়েসই হয়নি।" শুনে রাগে আমি বাক্যহারা কান ঝনঝনে হয়ে মেপে গেলুম, মিথ্যেবাদী বলা! আর সেই ফাঁকে হাস্যবদনে শাঁ করে বেরিয়ে গেল সে। এই খোকা-সন্ন্যাসীর 'বেটি'-ডাক শুনে সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। যত পাকা বিচ্ছু ছেলে! "লাকড়িসে ক্যা হোগা?" টাকা বের করে দিয়ে প্রশ্ন করি। একগাল হেসে খোকা বলে—কাঠ কিনবে, ধুনি জ্বালাবে। শীত করছে। খোকা-সন্ন্যাসীর এই শীতেও গা খালি।

ভীষণ ক্লান্ত পা, পিঠ যেন আর পিঠে থাকতে চাইছে না, হাতের জিনিসের ওজন ক্রমশ বেড়েই উঠেছে, অন্ধকারে তাঁবুগুলোর রং দ্রুত পালটে যাচ্ছে, এমন সময়ে অনেক গাঁদাফুলের মালায় সাজানো সিংহাসনের পালকিতে চড়ে একজন সশস্ত্রহারাজ পথ দিয়ে গেলেন—সঙ্গে বলে দলে শিষ্য, পতাকা-টতাকা উড়ছে—ভিড়ের কাছে শুধিয়ে শুনলুম উনি নাকি একজন শংকরাচার্য। বাঃ, কী পুণ্য! শংকরাচার্য দর্শন। ভিড়ের ওপরে শুয়েই—আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম কোথায় কেউ জানেন? না, কেউ না। নিজের কথা বলছি না না শার্দূল সিং, না আমি। শুধু হাঁটছি, থামছি, প্রশ্ন করছি, হাঁটছি। কেউ জানে না। কেউ জানে না। আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে, অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো, এমন সময় হঠাৎ রেরে রে রে, চলার পথ কে যেন আটকালো? চলতি মানুষেরা দাঁড়িয়ে পড়লেন, ছড়িয়ে পড়লেন। আমাদের সামনে একজন নগ্ন সাধু দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর ছড়ানো হাত ধরে দু'হাত প্রসারিত করে আরো কয়েকজন নগ্ন সাধু। কী ব্যাপার? এখন রাস্তা বন্ধ কেন? ডানদিকের তাঁবু থেকে এখুনি একদল নাগা সন্ন্যাসী শোভাযাত্রা করে বেরুবেন, স্নান এক আখড়ায় যাবার জন্য। তাঁরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমরা দাঁড়িয়েই রইলুম। নাগা সন্ন্যাসীর চিহ্ন নেই। গোণ্ডা-জলার মাথা থেকে মালপত্র নামিয়ে মাটিতে রাখলুম। যেখানটায় দাঁড়িয়েছি, ঠিক সেখানেই আবার খানিকটা জলকাদা জমে আছে। অথচ নড়বার উপায় নেই। ফুটপাথ অপেক্ষমাণ মানুষে মানুষে ঠাসা, পূর্ণ অবরুদ্ধ, যাকে বলে "জ্যাম-ধরা অবস্থা"। হঠাৎ জনস্রোতের মুখে পাথর চাপা পড়ল, অথচ স্রোত উথলে উঠলো না, কেবল ঘন থেকে ঘনতর হয়ে জমে উঠতে লাগল পরস্পর সংলগ্ন মনুষ্যশরীর। ধৈর্যের এক আশ্চর্য পরীক্ষা দেখেছি সেদিন গঙ্গাদ্বীপে। গোণ্ডাটা এরই মধ্যে কোথায় পালাল। লালা বলল ভয় নেই, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে, এখুনি আসবে। ভাগ্যিস গোণ্ডা তখনই এসে পড়ল—নইলে সে সন্ধ্যায় ওকে আর আমরা খুঁজে পেতুম কিনা কে জানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড়ের চাপ অসম্ভব বেড়ে উঠল। দাঁড়িয়ে থাকতে যেন দিচ্ছে না। অথচ একবার পড়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। যেমন করে হোক, মাটিতে পা গেঁথেও

BanglaBook.org

খাড়া থাকা চাইই। শার্দূল সিংয়ের জন্যে খুব উদ্বেগ হতে লাগল। সারাদিন অভুক্ত বৃদ্ধ এতক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত, তাঁর গন্তব্যের কোনও নির্দেশ পর্যন্ত এখনও যোগাড় হয়নি। তার ওপরে এই অমানুষিক ভিড়। চাপে দম আটকে আসছে। অত শীতের মধ্যেও ভিড়ের নিষ্পেষণে ঘাম হবার মতো অবস্থা।

সামনে দিয়ে ইতিমধ্যে নাগা সাধুদের শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে। একি, এরা তো বালক মাত্র! আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ মুণ্ডিত, সামনে ছোট্ট কৌপীন ডুমুরপাতার মতন করে পরা, হাতে ছোটো একটা লাঠি না গাছের ডাল, ঠিক ঠাহর পেলাম না, আর একটু করে কাপড়ও। বৈষ্ণব চেহারার বালক, কিশোরের দল চলেছে। চলেছে তো চলেইছে। শেষদিকে আসতে লাগল নাগাদের অন্য এক সম্প্রদায়—এটা বয়স্কদের দল—দাড়িগোঁফের ঝোপজঙ্গল, পূর্ণউলঙ্গ, হাতে ত্রিশূল—অনেকের গলায় বুকে রুদ্রাক্ষের মালার সঙ্গে গাঁদাফুলের মালাও শোভা পাচ্ছে। এই নগ্ন বৈরাগ্যেও কী একটা ভীষণ রুদ্রতা আছে—মা কালীকে মনে পড়ে যায়।

পিছনে ভিড়ের চাপ বাড়ছে। সেই চাপের বিরুদ্ধে অটল থাকার জন্য পেশির যুদ্ধে দম আটকে আসছে। এরই মধ্যে আমার একটা বাড়তি যন্ত্রণা জুটেছে। ভিড়ের সুযোগে একটি নগ্ন নির্জন হাত উপরি কিছু নগদ পুণ্যের লোভে যারপরনাই উত্যক্ত করছে। এত ভিড়, উপায় নেই যে পিছন ফিরে পুণ্যার্থীটিকে দেখব। উড়ে আসা আরশোলা গা থেকে ঝেড়ে ফেলার মতো নোংরা হাতটাকে বারকয়েক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি—কিন্তু আমার নিরুপায়, আত্মরক্ষায় অপারগ অবস্থা, এবং সম্ভবত নাগাদের নগ্নতাও তাকে ঔরুতার দুঃসাহস যোগাচ্ছে। ঐ হাতের সঙ্গে শুরু হয়েছে আমার স্নায়ুর যুদ্ধ। প্রবল রাম-চিমটি কেটেও দেখলুম ফল হলো না। কী করি? বাচ্চা দুটো প্রসেশন দেখছে একমনে, পরিশ্রান্ত শার্দূল সিং তাঁর বেডিংয়ের উপরে বসে পড়েছেন। চক্ষু নিমীলিত। আমি এবার ঝপ্ করে হাতটি চেপে ধরলুম। তারপর গলা একেবারে উঁচু না করেও স্পষ্ট শ্রোতব্যস্বরে ইংরিজি ভাষায় বললুম—"যদি এবার চেঁচিয়ে উঠি, আপনি কিন্তু খুন হয়ে যাবেন। এই ভিড় আপনাকে এখুনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।" বলে হাতটা ছেড়ে দিলুম। ইংরিজিতে বললুম, কেননা আমার কেমন মনে হলো এই কুৎসিত লোভাতুরতা নির্ঘাত আমাদের 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত' লক্ষণ। মবড্ হবার ভীতি-প্রদর্শনে দিব্যি কাজ হলো। হাতের মালিক সংবৃত হলেন। কথাটা যথাসাধ্য গলা চেপে বললেও ভিড় এত ঘন, যে এপাশ-ওপাশের দু'চারজন শুনেছেন। ওপাশে একটি মহিলা হিন্দীতে 'জানওয়ার' জাতের শব্দ করলেন। সহানুভূতি পাইয়ই হৃদয় দ্রবীভূত হইল, আমি আরো সহানুভূতির প্রত্যাশী হয়ে গদ্‌গদচিত্তে একটা বেমক্কা প্রশ্ন করে বসি—"বেহেনজী, আপ আনন্দময়ী মাতাজীকো আশ্রম জানতে হেঁ?" জানি অবশ্য উত্তরটা কী হবে। তবুও। আমার ভালোবাসার ভাষাই এখন এবম্বিধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।—"ট্যুরিস্ট ব্যুরো? /কিংবা প্রেস/অথবা আনন্দময়ী?" প্রশ্নটা শুনে শার্দূল সিং চোখ মেললেন—সে চেয়ে এখন হালছাড়া উদাস দৃষ্টি। উত্তরটা তাঁরও জানা.

বেহেনজী বললেন—"আনন্দময়ী মাতাজী? হাঁ, হাঁ, জরুর। মাঁয়ভি উধরহী জা রহীহুঁ।" —সখি! কেবা শুনাইল শ্যামনাম! শার্দূল সিংয়ের দিকে দেখলুম—উনি শুনতে পাননি। আবার চোখ বুজেছেন। —অনেক সাধায়ে অনেক কাঁদায়ে দরশ মিলালি মোরে। বঁধু আর না ছাড়িব তোরে।

—"বেহেনজী!" আমি কন্তর আর্তনাদ করি—"আপ হমলোগোঁকো ছোড়কে মত জাইয়েগা। হম তিন বজে-সে টুঁড় টুঁড় কে থক গয়ে হেঁ। আশ্রম নহীঁ মিলা।"

একমুখ হেসে বেহেনজী বললেন—"জরুর। আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন। আগে এই নাগারা দূর হয়ে যাক।"

আমি এবার চেঁচিয়ে ডাকি—"বাবা, বাবা? উঠুন। দেখুন, ইনি আশ্রম চেনেন—ইনিও

BanglaBook.org

আনন্দময়ীর কাছেই যাচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।" প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ শার্দূল। আকর্ণ-টুপি হাসি ফুটলো, মৌনী অমাবস্যার অন্ধকার তাড়িয়ে দিয়ে।

—"রিয়্যালি! হু'ড মার্ভেলাস! আই ওয়াজ জাস্ট বিগিনিং টু ডেস্‌পেয়্যার!"

—"ঈশ্বরই আপনাকে গুরুর কাছে নিয়ে যাবার জন্য পথপ্রদর্শিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, আপনি তো মহাপুণ্যবান বাবা। হোয়াই শুড য়ু ডেস্‌পেয়্যার?"

একমুহূর্তেই এই প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের অরণ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হতে দেখার পরম ক্লান্তি অপনোদিত হলো, মুছে গেল ভিড়ের চাপ, শার্দূল সিং হাতে কিটব্যাগটা তুলে নিলেন। এবং আমিও যথারীতি সেটি ছিনিয়ে নিলুম। কিছুক্ষণের মধ্যেই কপালজোরে নাগারাও অন্তর্হিত হলেন। কোনো এক বিশাল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর নিদ্রাভঙ্গের মতো স্তব্ধ ভিড় এবার নড়ে উঠলো। আমি শক্ত করে বেহেনজীর আঁচল চেপে ধরি। শার্দূল সিং চেঁচিয়ে ওঠেন—"সাবধান। এই সময়টাই সবচেয়ে ভয়ের।" লালা-গেণ্ডা যথাসাধ্য শক্ত হয়ে মাটিতে পা বিঁধিয়ে গতিশীল ভিড়ের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রমশ ভিড় ছিটকে যায় পথে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েন স্খলিত তীর্থযাত্রীরা। বেহেনজী হাঁটা শুরু করেন। দূরে হঠাৎ একটা আলোর তৈরি লেখা চোখে পড়ে অন্ধকার আকাশের গায়ে বেশ অনেকটা উঁচুতে:—"গঙ্গে তব প্রসাদাৎ মুক্তি।" মনের মধ্যে একটা বাজনা বেজে উঠল যেন। এই তো প্রয়াগধাম তীর্থরাজ। কুম্ভমেলা বিষয়ে ওখানে আরো একটা আলোয় লেখা শ্লোকাংশ জ্বলছিল—যার শেষ শব্দ 'প্রয়াগঃ' কিন্তু আমার আর এখন সেটা মনে নেই। লেখাগুলো দেখে চোখে জল এসে গেল আমার। এসেছি? এসেছি তবে? ছুটতে ছুটতে হাঁটছি বেহেনজীর পিছনে পিছনে—খুব দ্রুত পায়ে চলেন তিনি। তাই বলে ওঁকে হারিয়ে ফেললে চলবে না কিছুতেই। পায়ের ক্লান্তি কখন ঘুচে গেছে...হাতের বোঝাগুলি যেন ভারহীন —আমাদের পায়ে— এখন যে সেই বিশ্ববীণার ছন্দটি এসে গিয়েছে—'যে, বাঁশির ছন্দে বিপুল বস্তুর ভারও হালকা হয়ে যায়—' বুকের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠতে লাগল ঠিক—ভাঙা বেসুরো গলাকে আর বাধা দিতে পারলুম না—"তুমি যত ভার দিয়েছ সে-ভার করিয়া দিয়েছ সোজা"—কী আনন্দ কী আনন্দ কী আনন্দ...এখানে চলার জায়গাও বিস্তৃত, ভিড়ের চাপ নেই। এমন সময়ে একজন বাঙালী মহিলা, তাঁর সঙ্গে আরও প্রায় ৫ জন যাত্রী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন—"অচ্ছা, আনন্দময়ী মায়ের তাঁবুটা"

মনের ভেতরে মস্ত একটা হাসি আছড়ে পড়ল। হ্যাঁ, এবারে স্ট্রাক্‌চারটা সম্পূর্ণ হলো বটে। ফাঁকা ডান-হাতটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আত্মস্থ গলায় বলি—"হ্যাঁ, আমরা ওখানেই যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে আসুন আপনি...।"

১০

স্বর্গবাস পর্ব

পথ

আরো খানিক হেঁটে গিয়ে শুনতে পাই মাইকে কীর্তন গাইছে একটি মধুর ভরাট স্বর—"দেখে এলাম তারে সখি..." আমরি বাংলা ভাষা! মাত্র ক'টা দিনই তো মোটে? ক'দিন আছি আমি কলকাতার বাইরে? মোটে চারদিন। অথচ মনে হচ্ছে যেন বৎসরাধিককাল গত। বাংলা কীর্তনে মনপ্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সামনেই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। সেখানেই গানটি হচ্ছে। তার ঠিক পাশেই আনন্দময়ীর আশ্রম। পৌঁছেই শার্দূল সিং ব্যস্ত হয়ে পড়লেন স্বরূপানন্দজীর খোঁজে। ইতিমধ্যে ব্যাগ থেকে একটি ক্যাড্‌বেরী চকোলেট বার, যা হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্টে চন্দ্রশেখর

BanglaBook.org

আমাকে উপহার দিয়েছিলো, বের করে আমি দু' ভাগ করে বাচ্চা দুটোর হাতে দিলুম। তারপরে তাদের চোখেমুখে যে আশাতীত আহ্লাদটি তখন দেখেছি, তাতেই পূর্ণকুম্ভ, অমৃতকুম্ভের স্বাদ আমি পেয়ে গিয়েছি। চকোলেটের কাগজ আর রাংতাটাও তারা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলে। লজ্জায় মনটা ছোটো হয়ে গেল, এই আমার দেশ! সুখী-দুঃখীতে কতটা বিপুল ফারাক আছে বলেই না দুটো গরীব বাচ্চাকে মোটে আধখনা করে চকোলেট খাইয়ে আমি পুণ্যার্জনের দিব্য আনন্দ উপভোগ করছি! অহো, কী পুণ্যাত্মা, কী দরিদ্রদরদী ব্যক্তি!

দারিদ্র্যের সুযোগ নেওয়া এখানে পুরোদমে আইনসিদ্ধভাবে চলে বলেই না আজ আমি পৌঁছেছি গঙ্গাদ্বীপে? চাইল্ড লেবার এক্সপ্লয়েট করে? ওরা না থাকলে আমার আসা হতো?

মনে পড়ল এক বন্ধুর কথা, যিনি সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরে বম্বেতে এয়ারলাইন্সের দামী হোটেলে রাত্রিবাস করতে গিয়ে আঁতকে উঠেছিলেন এই আবিষ্কার করে যে চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের অপাপবিদ্ধ মুখের হোটেলবয়গুলি প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ। সবরকম পাপ-কাজে পারদর্শী। বে-আইনী মদ চাই? গণিকা চাই? স্মাগলার চাই? সব আছে তাদের কাছে। এই তো আমার দেশ! এর গরীবী কি সহজে হটবে! গরীবী ঢুকে পড়েছে আমাদের মজ্জার ভেতর, ঘুণ ধরিয়েছে হাড়ে।

লালা বলল, রাত অনেক হয়েছে, সাড়ে-সাতটা আটটা বাজে, খুসীতে আমরা কখন ফিরব? অনেক রাত্রি বেড়ে যাবে যে? সত্যই তো, আমি তো এখনও ট্যুরিস্ট ব্যুরোর খোঁজ পেলুম না। ঠিক আছে। ওদের তো ছেড়ে দিই। তারপর যা হবার তা হবে। দুজনের হাতে দুটো দশটাকার নোট দিতে অবাক হয়ে দুই ভাই পরস্পরের হাতের দিকে তাকালে। তারপরেই গোণ্ডা তার নোটটি আমার দিকে এগিয়ে দিল। লালা বলল—"এ দোনোই দস্ দস্ রূপাইয়াকা নোট হ্যায়। পাঁচ পাঁচ দিজিয়ে। তখন তাদের গাল টিপে দিয়ে যেই আমি বলেছি "দুটোই তোমাদের দু'জনের"—অমনি গোণ্ডা হঠাৎ খাস মিলিটারি কায়দায় পায়ে পা ঠুকে আমাকে একটা শ্যালুট ছুঁড়ে দিলে, একগাল হাসিসমেত ও বাবা, ছেলের আমার রঙ্গরসিকতার জ্ঞানও টনটনে। সেই দৃশ্য দেখে লালা গোণ্ডার পিঠে একটা তিরস্কারের থাপ্পড় চৌকস মারল, আর অতিভদ্র লৌকিক কায়দায় আমাকে একটি সভ্য-শোভন সেলাম ঠুকেই গোণ্ডার হাত ধরে ছুট লাগাল। আবার অতটা পথ—এখন ওরা কত-দূর ছুটবে!

আমি বুঝতে পারলুম না আশ্রমের ভেতরে ঢুকবো না ঢুকবো না। শার্দুল সিং ইতিমধ্যে এসে তাঁর মালপত্র নিয়ে ভেতরে গেছেন,তাঁর ঘর-খাটিয়া জুটে গেছে! জামাই-মেয়ে ব্যবস্থা করে রেখেছে তাঁর। এবার গেছেন আমার জন্য খোঁজ করতে। আমি বসে পড়লুম বাইরে, রাস্তার ধারে, একেবারে ধুলোর ওপরে। শরীরে আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। সুটকেসটাতে বসার উপায় নেই। তার তলাটা নরম তলতলে চামড়ার, ছিঁড়ে যাবে। অপেক্ষা অনেকক্ষণ হলো। শার্দুল সিং ফিরলেন না আর। ইতিমধ্যে একজন চেনা বাঙালী মন্ত্রী ভি. আই. পি. গাড়ি থেকে নেমে আশ্রমে ঢুকলেন। সঙ্গে পরমাসুন্দরী স্ত্রী। যেহেতু বহুদিনের পারিবারিক আত্মীয়তা, আমি নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠলুম—"অমুক বৌদি!" বৌদি থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইলেন, কিন্তু ধুলোয়-বসে-থাকা আমাকে দেখা গেল না; ওঁদের চারিপাশে উৎসুক জনতার ভিড় জমে উঠে দৃষ্টির আড়াল গড়ে দিল। তাঁরা ভেতরে ঢুকে গেলেন। এবার আমি সুটকেসের ওপরেই মাথা নামিয়ে একটু শোবার মতো চেষ্টা করি। কী অসীম ক্লান্তি! তীর্থস্থানের এমনই মজা, রাস্তার ওপরে শুতে কোনো অসুবিধাই হয় না, অন্তত আমার তো নয়। খানিক বাদে মাথা তুলে আশ্রমের দিকে চেয়ে শার্দুল সিংকে খুঁজছি, দেখি মন্ত্রীমশাই সস্ত্রীক বেরিয়ে আসছেন। এবার বৌদি আমাকে যাতে দেখতে পান আমি তাই উঠে দাঁড়ালুম। বৌদিও নিজেই ছুটে এগিয়ে এলেন, খুশী গলায় বললেন—"তাই বলি আমার ডাকনাম ধরে এখানে কে ডাকবে!" তারপর সেই

BanglaBook.org

অবধারিত প্রশ্নগুলি এসে পড়ল—কবে এলে, কোথায় উঠছো, কাদের সঙ্গে এসেছ? উত্তরগুলো শুনেই বৌদি আঁতকে উঠলেন।

—"সে কি? একুনি এলে? আজকের এই সাংঘাতিক ভিড়ে? ওইবার ব্যবস্থা না করেই? কী সর্বনাশ, অ্যাঁ? ছি ছি ছি, একা একা মেয়েমানুষ হয়ে কখনো কুম্ভে আসে কেউ? তুমি কি পাগল? চলো চলো দেখি ওঁকে বলে তোমার কী ব্যবস্থা করা যায়।"

ব্যস্ত হয়ে বৌদি স্বামীর কাছে ছুটলেন, আমার হাতটি নিজের হাতে শক্ত করে ধরে গাড়ির কাছে নিয়ে আমি হাত ছাড়িয়ে নিই—যুঝতেই তো পারছি এ যাত্রায় আমার ভি. আই. পি. ট্রিপ কপালে নাচছে। নইলে এই ভিড়ে এত আকুল হয়ে চেনামুখ খোঁজার ফলে হবি তো হ' মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে দেখা? আমার স্নানে-অস্থানে ভি. আই. পি. হওয়া ঠেকাবে কে?

কিন্তু বৌদির কাছে সব শুনে মন্ত্রীদাদা যে খুব আশ্বাস দিলেন তা তো মনে হচ্ছে না? বরং বৌদির ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসা করুণ মুখচ্ছবি একটা মোগলাই ধমকেরই আভাস দিচ্ছে (আনুমানিক: অ্যাঁ, বেম্ব তুমি এসব বাজে ঝামেলা জোটাতে গেছ? আমি বাপু কিছু করতে পারব না, এই বলে দিলুম'—গোছের সাফ্-ওয়ার্ডিং সম্ভবত) ব্যাপারটা আন্দাজে সমঝে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে এক মুহূর্তও লাগল না। গলা উঁচু করে, গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ঘোষণা করি—"বৌদি, আমার থাকার কোনোই ভাবনা নেই, ট্রাবিস্ট ব্যুরোকে ডি. কে. বর্মণের কাছে আর পি. বি. আইতে চতুর্বেদীর কাছে চিঠি আছে।"

বৌদির মুখে আবার আলো জ্বলে উঠলো।—"তবু, সেইখানেই তো যাচ্ছি আমরা। চলো চলো, তোমাকে প্রেসের ওখানে নামিয়ে দিই।"

দাদাও একবাক্যে এই প্রস্তাবে রাজী হন। এবারে আমিই প্রশ্ন করি—"কত দূর হবে প্রেসের অস্থানটা, সঙ্গম থেকে? রাত্রি দুটোয় লগ্ন পড়বে, তখন স্নান করতে আসা যাবে তো?

"সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর সহচর অমাত্যটি সোৎসাহে জানালেন, "সঙ্গম? বারো মাইল দূর।"

আমার মাথায় বাজ পড়ল—বা-রো—মা-ই-ল দূর! এই ক্লান্ত পায়ে অতটা আর পারব না হাঁটতে। "আর এখান থেকে সঙ্গম কতদূর?"

এবার মন্ত্রীমশাই বলেন—"মাইল দেড়েক হবে বড়ো জোর।"

সিদ্ধান্ত পাকা। "আপনারা তবে আজ আসুন ভাই বৌদি—আমি আর যাব না। আমি আজ সঙ্গমে স্নান করতে চাই, মধ্যরাত্রে।"

সুতরাং দাদা-বৌদি হাত নেড়ে ধুলো উড়িয়ে ভুশ্ করে মিলিয়ে গেলেন।

আমার এতক্ষণে মনে পড়ল—আমার ব্রীফকেস, সুটকেস, জলের ফ্লাস্ক অর্থাৎ লোটা, এবং কম্বল সবই পড়ে আছে অরক্ষিত অবস্থায় রাস্তার ধারে। গিয়ে দেখি যথার্থই আছে সব। কেউ ছোঁয়নি। যাক। পুণ্যক্ষেত্র বলে কথা! এবারে পিঠটা পেতে এই ধুলোমাটিতেই একটু শুতে হবে। কম্বলটা বিছিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা দরকার। আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে ঢুকেই একটা ছাউনি মতো আছে, সেখানে অনেক গ্রাম্য মানুষকে ধুলোয় কম্বল পেতে শুয়ে থাকতে দেখেছি। আমিও ঐখানেই চলে যাই। কিন্তু না, জায়গা নেই। ভেতরে ঢুকতে পারি না। দোরের কাছেই একটু জায়গায় মালপত্র রেখে, কম্বলটা পেতে, শুয়ে পড়ি। বড্ড ধুলো সত্যি। কিন্তু যে সে ধুলো তো নয়, তীর্থরেণু। কত সাধুসন্ত, কত পুণ্যার্থীর পদরজঃকণা। এতে নিশ্চয়ই আমার অ্যালার্জি নেই। এতই কি পাপী আমি, যে wheat dust-book dust, pollen-dust-এর মতোই তীর্থরেণুতেও অ্যালার্জি থাকবে? কক্ষনো নয়। হাঁপানি হবে না আমার। উড়ুক না যত খুশি ধুলো। সত্যিই কিন্তু শুয়ে পড়েছি এবার। আঃ জয় কুম্ভ!

জানি না কটা মুহূর্ত শুয়েছিলাম—হেনকালে তিনটি দীর্ঘ ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে পাশে এসে

BanglaBook.org

দাঁড়ায়। পরনে কালো কালো ওভারকোট, দু'জনের মুখে-মাথায় বাঁদুরে টুপি ঢাকা, একজনের মাথা-গলায় চেককাটা মাফলার জড়ানো। প্রত্যেকেরই হাত দুটি পকেটে। হাত পকেটে কেন? পকেটে কি রিভলবার আছে? কী আছে পকেটে?

১ নং—"আপনি তো বাঙালী?" —আমি চমকে উঠি।

—"কেন বলুন তো?"

২নং—"অমুকবাবু মন্ত্রীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলছিলেন, দেখলাম—আপনিই তো?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" কী সর্বনাশ! কাবা এবা? জেরা করছে কেন? আমি কি কোনো দোষ করে ফেলেছি? এরা কি গুণ্ডা? এরা কি পুলিশ? এরা কি গোয়েন্দা? এরা কারা? ভয়ে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে গেছে! কি জানি বাবা, কী অন্যায় করলুম আবার! এভাবে মন্ত্রীর সঙ্গে কি কথা কইতে নেই? নাকি এটা ট্রেস্‌পাসিং? আমি যেহেতু আনন্দময়ীর শিষ্যা নই, ওঁর ছাউনিতে ঢোকা বোধ হয় উচিত হয়নি আমার। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। এখন যাই কোথায় মালপত্তর নিয়ে? কুতঃ? কুত্র?

১নং—"আপনি ওঁদের সঙ্গে গেলেন না কেন? ওঁরা তো ডাকলেন!"

—"আমি স্নান করতে চাই। প্রেসের ওখান থেকে সঙ্গম বহুদূর, তাই যাইনি।"

২নং—"আপনি এভাবে ধুলোয় শোবেন না দিদি, উঠুন। এ্যাতো ভালো শাড়ি পোরে কেউ কুম্ভের মেলাতে আসে? একেবারে সেন্স্ হয়ে গ্যালো যে, ছি ছি!"

—(সত্যি তো—এত ভালো কাপড় আমার মাত্র দু'একটাই আছে।) —"হ্যাঃ, ঠিক আছে।"

—"আমাদের সঙ্গে চলুন।"

—"আপনারা কোথায় উঠেছেন?"

১নং—"আমরাও অবিশ্যি কোনও জায়গা পাইনি, তবে তোমারে বসার জায়গা দিতে পারি আপনাকে। তা ছাড়া মাথার উপরে ছাউনি পাবেন।"

—"ছাউনি তো আছে আমার মাথায়।"

২নং—"কোতায় আছে? আপনি নিজে তো বাইরে।"

মাথার ওপরে চেয়ে দেখি, আরে তাই তো, ছি ছি, আকাশ যে! একেবারেই ভিতরে ঢুকতে পারিনি? অথচ মালগুলো রয়েছে ছাউনির মধ্যে দিব্যি। কেবল নিজেই আমি রয়ে গিয়েছি বাইরে। এ যে ক্ষন্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির বাড়ির গল্প হলো। টাকাগুলো বাইরে রেখে যাঁরা নিজেরা থাকেন সিন্দুকে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলি—"মশাইরা, আমাকে যেখানে ছাউনির তলায় বসাবেন, সেটা কি অনেক দূরে?" তাঁরা বললেন—"মোটেই না, এই ঠিক পাশের তাঁবুতে।" তারপরে আর একজন আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"আমাদের সঙ্গে মেয়েছেলেরাও রয়েছে দিদিভাই! শুধু মুখু ভয় পাবেন না যেন। আপনি বাঙালী মেয়েছেলে হয়ে এমনি এগলাটি এই ভিড়ভাট্টার মদ্দে—তাই।—আমাদের যেন ভুল বুঝবেন না।"

—মোটেও ভুল বুঝিনি। মোটেই ভয় পাইনি। আমার ভয়টা কাকে? গেলে তো যাবে কটা কাপড়, কখানা বই। যাক না, আমার সংসার-জ্ঞান হয়েছে বৈকি। আমি তো জানি, সবই যায়। একদিন কিছুই ছিল না, একদিন কিছুই থাকবে না ভয়টা কিসের? ভয় করলে আর আমি আসি এখানে? ভয়ের দিকটাতে নজর দিই না, আমি চোখ মেলে থাকি ভালোবাসার দিকটাতে। এই তো তোমরা তিনজন হৃদয়বান বাঙালী ছেলে, মানুষের সহজ শুভার্থী তোমরা, তোমাদের কাছে এখনই আমি কৃতজ্ঞ। অজ্ঞাতকুলশীল একজন পথবাসী মানুষ, তার মাথায় শিশির না পড়ুক, কাপড়ে ধুলো না লাগুক, এটুকু যে চেয়েছ তোমরা, এজন্যেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। মানুষের জন্যে এটুকু চাইবার মতো মানুষও যে জগতে আমাদের থাকে না। তোমাদের হৃদয়ের অমৃতকুম্ভ চিরকাল পূর্ণ থাকুক, তার পুণ্যধারায় স্নান করুক আমার মতো হাজার জন

BanglaBook.org

ভাগ্যবান স্নানার্থী।

তিনজনের হাতে হাতে উঠে গেছে আমার সুটকেস, ব্রীফকেস, লোটাকম্বল, ফুটুনি-ঝোলা। চললুম পালের তাঁবুর দিকে। সেখান থেকে মাইকে সজোরে গান আসছে—দিব্যি কথকতা করে লব-কুশের গাথা গাইছেন একজন বাঙালী গায়ক। সুন্দর গলা। ঢুকে কোটপ্যান্ট মাফলার পরা গায়ককে দেখাও গেল মঞ্চে। মঞ্চের সামনে অজস্র মানুষভর্তি চেয়ার। এক জায়গায় গিয়ে সব মালপত্র নামিয়ে দিলে ছেলেরা।—"অ দাদু, দাদু, এই দেখুন আপনার আরেক নাতনী। এঁর মালপত্তরগুলো আপনি ভালো করে রাখুন। খোকন ভাই একটু উঠে দাঁড়া তো, এই দিদি খুব টায়ার্ড, আরেকটু হলেই রাস্তায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন। এঁকে আগে একটু বসতে দে।"—মুহূর্তেই যেন পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলের আবহাওয়ায় এসে পড়েছি। দাদু বললেন—"আও নাতনী আ যাও, ওলেকম টু আওয়ার হোমলেস হোম—মালপত্তর কই? আরে বেটা বৈঠ যাও। রাত দুটো পর্যন্ত বসে বসেই ঘুম মারো ঘুম—আর আমি ততক্ষণে এদের কোনো আখড়ায় ঢুকে লুকিয়ে লুকিয়ে দম্ মারো দম্ করে আসি, অ্যাঁ? হা হা হা"

ছেলেগুলি বলল—"এখন দম্ মারবেন না দাদু, মালপত্তরগুলো সামলে থাকুন। আমরা একটু চা খেতে যাচ্ছি।" বলে চলে গেল তারা। একটু পরেই আমার খেয়াল হলো—কী যেন বলল—চা? ওরা চা খেতে গেল না? অমনি আমি লাফিয়ে উঠি— "দাদু আমিও যে বিকেলে চা খাইনি—সেই বেলা তিনটে থেকে হাঁটছি।"

—"অ্যাঁ? বেলা তিনটে? সে কি রে? এখন তো ন'টা বাজে। এতক্ষণ তুই হেঁটেচিস কি-রে? কলকাতা থেকে স্টেট পায়ে হেঁটেই এলি বুঝি? যা যা, আমি বাগ্নটা দেখছি, তুই শিগ্‌গির চা খেয়ে আয়।"—আমি দুড়্দাড়্ করে উঠে পড়ি। 'তুই' সম্বোধনে বের শুকনো চোখে জল এসে যায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মস্ত সাদা পাকানো গোঁফ, আমার বাবার গোঁফের কথা মনে পড়ে যায়। স্বভাবটাও এঁর তেমনই জমজমাট।

এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বলেন—"আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

—"আপাতত হায়দ্রাবাদ থেকে"—আমি চাই না কলকাতা, 'ভালো-বাসা'-বাড়ি—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—যাবতীয় কুলুজি এখন ঘাঁটাঘাঁটি থাক। ঐ ছেলেরা তো কিছুই জানতে চায়নি। মনে হলো হঠাৎ 'হায়দ্রাবাদ' শুনলে হয়তো ইনি চুপ করে যাবেন। এবং গেলেন-ও। দাদুর কাছে মালপত্র রেখে আমি তো বেরুলুম—চায়ের খোঁজে। এমন সময়ে আরেকটি ছোকরা এসে আমাকে একটু গোপন-গোপন স্টাইলে, বেশ ঘনিষ্ঠ সুরে বললে—"অম্বিকা সোনি কি এখনও হায়দ্রাবাদে?"

—"আজ্ঞে?"

—"মানে, কদিন আগেই তো সঞ্জয় গান্ধী হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলেন, দারুণ ক্রাউড্ হয়েছিল, ওখানে ওঁর ভয়ানক ফ্রেন্ড। তাই বলছি অম্বিকা সোনি কি এখনও হায়দ্রাবাদে?"

শুনে আমি ধমকে উঠি—

"সে আমি কেমন করে জানব মশাই? আমি কি রাজনীতির লোক? আমি ওসব জানিটানি না কে কোথায় থাকে।"

—"রাজনীতির লোক নন? তবে যে ওরা বলল অমুক মন্ত্রীর সঙ্গে খুব দহরম-মহরম আছে আপনার?"

হায় রে, দহরম-মহরম! তাহলে কি সেজন্যেই আমার প্রতি এই কৃপদৃষ্টি? নির্ঘাত তাই।

—"দেখুন, দহরম-মহরম নয়, ওঁরা আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়।"

—"ওই একই হলো। তা শুনলুম আপনি নাকি অমুক মন্ত্রীর ইনভিটেশন রিফিউজ করেছেন 'আমার এই ধুলোই ভালো' বলে? সত্যই দারুণ মনের জোর আপনার—তাই ভাবলুম আপনি

BanglaBook.org

নিশ্চয় খুব কং—"

"না মশাই না। রিফিউজ করব কেন, ইনভিটেশন কোথায়? একটা লিফ্‌ট দিচ্ছিলেন ট্যুরিস্ট ব্যুরোয়। সেটা নিইনি, সঙ্গম থেকে বহু মাইল দূর হয়ে যায় বলে। এটা কোনো ব্যাপারই নয় মশাই। ওসব ছাড়ুন, তার চেয়ে বলুন দিকি চায়ের দোকানটা কোথায়?"

—"চলুন, চলুন দিদি, নিয়ে যাচ্ছি। স্যরি। কিছু যেন মনে করবেন না। ভুল হয়ে গেছিল।"

ফের অনেকখানি হেঁটে চৌমাথায় এলুম। সেখানে দোকানে দোকানে বারকোশের ওপরে মণ্ডা মিঠাই, লাড্ডু পুরির পাহাড়, পঁপর ভাজারও। ঘিয়ের গন্ধ ম-ম করছে বাতাসে। তারই পেছনে একটি টুলে বসা একটি রাগী চেহারার লোকের সামনে মাটিতে এক ঝোড়া মাটির ভাঁড় এবং উনুনে কেটলি। এবং সামনে গিজগিজ করছে শীতার্ত তৃষ্ণার্ত মানুষ, সে চা দিচ্ছে, আটআনা করে ভাঁড়। যথেষ্ট ছোটও। দু'ভাঁড় না খেলে তেষ্টা মেটে না, কিন্তু দু'ভাঁড় পাওয়া সোজা নয়। র‍্যাশনিং আছে, কিউ আছে, আর গলাগাল আছে। আট আনা পয়সা হাতে দিলে, সে খালি ভাঁড়টাই শুধু আপনাকে দেবে, তারপর ভাঁড়টা পেতে দাঁড়ালে আরেকজন সেই ভাঁড়ে চা ঢেলে দেবে। তার জন্য আর পয়সা লাগবে না। কিন্তু চা-ওলার কী মেজাজ! একটি ভদ্রলোক আট আনা টেবিলে রেখে নিচু হয়ে যেই ভাঁড়টি হাতে তুলে নিয়েছেন, অমনি সে খপ্ করে তাঁর হাতটি ধরে ভাঁড়টি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেতাই একটি গাল দিল। সে আধুলিটাকে দেখতে পায় নি। চোখে আঙুল দিয়ে জলজ্যান্ত সুগোল আধুলিটা দেখিয়ে দেবার পরে সে হাত ছাড়ল এবং ভাঁড় তুলে দিল বটে কিন্তু দুঃখ প্রকাশের ধার দিয়েও গেল না। অথচ ওর কাছেই চা খেতে হবে। কাছাকাছি সে-ই একমেবাদ্বিতীয়ম্ চা-ওলা। অন্য চা-ওলা খুঁজতে আবার এক মাইল কে হাঁটবে? বিনয়ী না হয়ে উপায় নেই। স্বার্থ দদাতি বিনয়ম্।

চা খেতে খেতে আলাপ হলো একটি 'দাদা' এবং একজন 'বৌদি'র সঙ্গে। যে-ছেলেরা আমাকে 'পথের ধূলা হইতে কুড়াইয়া' ছাউনির তলায় এনেছে, সেই ছেলেদের দলপতি এই দাদা। ছেলেরা তাঁর মত নিয়ে নিয়েছে, অবলা এই নারীটিকে তিনি দলভুক্ত করতে রাজী হয়েছেন। জনাপঞ্চাশেক মিলে দল বেঁধে এসেছেন কয়েকটি মোটরগাড়ি করে, সোজা পশ্চিমবাংলা থেকে। যাঁহা পঞ্চাশ তাঁহা একান্ন! আর আলাপ হলো একজন চক্ষু-চিকিৎসকের সঙ্গে, যিনি আমাদের এক বন্ধুর (অশোক রুদ্র) চোখের বেডিনায় অস্ত্রোপচার করেছেন। যেমন তাঁকে নামে চিনি, দেখা গেল অমলবাবুও তেমনি আমাকে লেখায় চেনেন আমাকে লেখায় চেনেন এমন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির মানুষ তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরল, তাই কোথাও একজন 'পাঠক' দেখতে পেলে ধন্য হয়ে যাই—আর তাকে ভুলি না। চা-পর্ব মিটিয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোই। এঁরা এখন যাবেন ঘুরতে। ওরে বাবা! আবার ঘোরা? আমি বলি—আমি ওই ছাউনির নিচেই কম্বল জড়িয়ে মাটিতে লম্বা হব। পিঠটা যেন ভেঙে পড়ছে: এক ঘণ্টা আমাকে শুতেই হবে। যেখানে হোক। মধ্যরাত্রে স্নান করা এখনও বাকী অমলবাবু বললেন, ভাবনা নেই, একটু শোবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দল বেঁধে বেশ কিছু দূর হেঁটে যাবার পরে, এবার একগুচ্ছ ছোটো ছোটো তাঁবুর পিছনদিকে এসে পড়লুম। নানাবিধ সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রম সেখানে, পাগলী-বাবা, কাঠিয়া-বাবা, কত নাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে একে একে বাঁশের বেড়াটি ডিঙোলেন। এটা অবশ্যই এই তাঁবু অঞ্চলের চত্বরে ঢোকার সদর রাস্তা নয়। ওপার থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছেন দেখে আমিও চট করে বাঁশের বেড়াটি ডিঙিয়ে ফেললুম—এসব তুচ্ছ বিষয়ে যে আমাকে নিয়ে ওঁদের চিন্তার কোনোই কারণ নেই, সেটা বোঝাতে। নিশ্চিত হয়ে তাঁরা এবার ডাকাডাকি শুরু করলেন একটি নাম ধরে। রাত্রি তো অমাবস্যার, শীত প্রচণ্ড, কুয়াশাও আছে, ধুনির ধোঁয়ায় সারা অঞ্চলটি ঘোর আচ্ছন্ন। হাঁকডাক শুনে এক ভদ্রলোক সেই ধূমজাল ফুঁড়ে জাদুবলে উদ্গত

BanglaBook.org

হলেন। ভদ্রলোক বাঙালী। তাঁর হাতে আমাকে সমর্পণ করে বলা হলো—"একে একঘণ্টা শুতে দাও, তোমাদের তাঁবুতে, ইনি অত্যন্ত ক্লান্ত। প্রমিস করছি উটের মতো অঘটন ঘটবে না।"

—"কিন্তু আমাদের তাঁবু যে খুবই ছোটো এবং ভর্তি।"

—"এক ঘণ্টা পরেই আমরা এসে একে তুলে নিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি, এ ব্যক্তি সারারাত জাঁকিয়ে থাকবে না তাঁবু জুড়ে। ডোন্ট ওয়ারি।"

১১

স্বর্গবাস পর্ব

তাঁবু

ভদ্রলোক অগত্যা আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁবুতে। খুব কাছাকাছি খুব ছোটোখাটো তাঁবু পাতা। তাঁবুর খোঁটায় আর দড়িতেই হাঁটার জায়গাটা কণ্টকিত। তাঁবু সত্যি খুবই ক্ষুদ্র। তাতে খড়বিচালি বিছানো। ভেতরে একটি মৃদু বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছে। অনেকজন মহিলা বসে আছেন, দু'চারটি পুরুষ। আমাকে নিয়ে গিয়ে খুবই যত্ন করে শুতে দিলেন ভদ্রলোক। কম্বল তো পেতে দিলেনই, মাথায়ও বালিশ জাতীয় একটা কিছু (গোটানো বিছানা বোধহয় কারুর) গুঁজে দিলেন। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম, আহ্ কী আরাম! তক্ষুনি মনে পড়ল দিল্লীতে ইথুর ফ্লাস্টভ্যালে গিয়ে তাঁবুতে এই খড়ের ওপরে শুয়েই আমার হাঁপানি শুরু। আবার মনে হলো, সে ছিল আলাদা ধুলো। এ ধুলো আলাদা। হুঁ হুঁ বাবা, এ হচ্ছে স্বয়ং প্রয়াগ। তানকাটোরা গার্ডেন নয়। এখানে হাঁপানি হবে না। সংস্কার মাঝে মাঝে বেশ মনের জোর দেয়। যুক্তিবাদও মাঝে মাঝে সংস্কারের মতোই আচ্ছন্ন করে ফেলে মানুষের মনকে, সেও তো দেখেছি। আমার এখন দরকার ঘোরতর মনের জোর। যেন তেন প্রকারেণ ; অসুখ করলে চলবে না।

চোখে আমার আলো একদম সয় না। আঁচলটা চোখের ওপর যেই টেনে দিলুম, টের পেলুম, সর্বনাশ হলো। একপো জরি সকলের চোখের ওপরে ঝলমল করে উঠল। এবার শুরুত্ব উপদেশ। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সমবেত গিন্নীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—

—"এমন কাপড় পরে কেউ কুম্ভমেলায় আসে গা? তোমার সুতোর কাপড় ছিল না?"

—"ছিল, বাড়িতে। বাড়ি থেকে তো আসিনি।"

—"বাড়ি থেকে আসনি? তবে কোথা থেকে এলে?"

—"হায়দ্রাবাদ।"

—"সেখানে কী করছিলে?"

—"কাজ ছিল।"

—"কাজ? কী কাজ?"

—"বক্তৃতা।"

—"কিসের বক্তৃতা?"

—"ওই, এমনি। সাহিত্যের।"

—"কাদের সঙ্গে এসেছ?"

—"একাই।"

—"একা মানে? একদম একা? তার মানে? সঙ্গে কে-উ নেই?"

—"সঙ্গে ভগবান আছেন।"

দু'মিনিট নীরবতা পালন। তারপর—

BanglaBook.org

—"এখানে থাকা হচ্ছে কোথায় ?"

—"এই তো, আপনাদের কাছেই এখন আছি।"

—"অ্যাঁ ? এখেনেই থাকবে নাকি রাত্তিরে ?"

—"না, সারারাত্তির থাকব না। শুধু এক ঘণ্টা। বড্ড পিঠ-ব্যথা করছে। তিনটে থেকে আটটা পর্যন্ত হেঁটেছি কিনা।"

—"ও বাবা—অতক্ষণ ? তা এতক্ষণ কিজন্যে হাঁটছিলে ? কোথায় গেছ্‌লে ?"

—"যাইনি কোথাও। এলুম কুম্ভনগরে।"

—"এই মাত্তর এলে ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এইমাত্র।"

—"অত হাঁটতে হলো কেন ? ইস্টিশানে গাড়িঘোড়া ছিল না ?"

—"ওদিক দিয়ে আসিনি। অন্যপথে এসেছি। ঝুঁসী থেকে।"

অভ্যাসমাফিক মাথার ওপর হাত দুটো তুলে শুয়ে আছি। খেয়াল করিনি, তাঁরা লক্ষ্য করছেন। বালা আছে, ঘড়ি আছে, কিন্তু শাঁখা কই ? লোহা কোথায় ? ওঁদের কৌতূহলের দিক্ বদ্‌ল হয়।

—"তা, হ্যাঁগো মেয়ে, তোমার বাপ-মার বিবেচনা কেমনধারা ? একা একা এই কুম্ভমেলায় আসতে ছেড়ে দিলে, এত বড়ো আইবুড়ো মেয়েটাকে ?"

—"আইবুড়ো ? ওমা সে কি কথা ! আমার বড়ো বড়ো মেয়ে রয়েছে যে দু'দুটো ?"

"মেয়ে রয়েছে ? বড়ো বড়ো ? আমাদের সঙ্গে এসব ঠাট্টা কোর না মা। তুমি হিন্দুর মেয়ে, ভক্তিমতী, তীর্থে মতি আছে, বুঝতেই পারছি। আমাদের কাছে ওসব বলতে হবে না, সত্যি কথাটা বলো।"

এবার উঠে বসি। বিশ্রাম চুলোয় যাক। এরা যে মিথ্যে বলছে ?

—"আমার সত্যিই দুটো মেয়ে আছে মাসীমা, মেয়ে মেয়ে বেলা কম হয়নি আমার।"

এবার তাঁদের চোখ পড়ে, সিঁথেয় বটে সিঁদুর রয়েছে।

—"অ, তাই বলো। তবে অঙ্গে এয়োতির লক্ষণ নেই কেন ? শাঁখা লোহা পরনি কেন ? হাত অমন ন্যাড়া কেন ?"

—"মাঝে মাঝে তো পরি। ইচ্ছে হলে।"

—"মাঝে মাঝে ? সে কি কথা ? সব সময়ে স্বামীর মঙ্গল চাও না তুমি ? মাঝে মাঝে চাও কেবল ? ইচ্ছে হলে ?"

—"সব সময়েই নিশ্চয়ই চাই। তাঁর মঙ্গল ব্যবস্থা কি আমি গয়নাগাঁটি পরে করতে পারি ?"

স্বর গম্ভীর হয় মাসীমার—"ওগুলো গয়না নয়, মঙ্গল-চিহ্ন। অঙ্গে রাখতে হয়।" তারপরে তাঁর আসল কথাটা খেয়াল হয়—

—"ত তোমার স্বামী যে সঙ্গে এলো না বড়ো ? সেই বা কেমন ? অল্পবয়সী বৌকে একা একা কুম্ভমেলায় পাঠিয়েছে ?"

—"তিনি এখানে নেই।"

—"কোথায় গেছে ?"

—"বিলেতে।"

—"অ, তাই বলো। সে বেচারী বিলেত গেছে কাজে, আর তুমি অমনি পালিয়ে এসে একা একা তীর্থ করে বেড়াচ্ছ ! তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি নেই ?"

—"শাশুড়ি আছেন।"

—"সে কিছু বলবে না ?"

BanglaBook.org

—"কেন বলবেন ? আমি তো কিছু অপকর্ম করতে আসিনি।"

—"তাকে কেন সঙ্গে আনলে না ? শাশুড়ি রাগ করবে না ?"

—"না।"

—"ধর্মেকর্মে মতি নেই বুঝি তোমার শাশুড়ির ? সে কি গো ?"

—"ধর্মে মতি থাকবে না কেন ? কিন্তু আমি তো হায়দ্রাবাদ থেকে হঠাৎ চলে এসেছি। তিনি কি করে সঙ্গে আসবেন ? তিনি তো শান্তিনিকেতনে।"

—"যত বাজে হলো, একা আসাটা ঠিক হয়নি তোমার। এটা বড্ড বুকের পাটার কাজ হয়ে গেছে।"

—"কেন, আপনারা সবাই তো কত যত্ন-আদর করছেন। একা এসে তো কোনও অসুবিধে হয়নি।"

—"তোমার নাম কি মেয়ে ?"

—"নবনীতা।"

—"ক্-কীঈ ?"

—"নবনীতা।"

এটাও নিয়ম। সর্বদা দু'বার বলতে হয়। কেন যে আমার নাম চিত্রা নয়, বা কৃষ্ণা নয়—। চিরকালের দুঃখু আমার এই বিদঘুটে নাম।

—"তুমি কী চাকরি কর !"

—"পড়াই।"

—"ইস্কুলে ?"

—"ওই রকমই বলতে পারেন। পড়াই বড়ো ছেলেমেয়েদের।"

—"থাক কোথায় ?"

—"বালিগঞ্জে ?"

—"বাড়িতে আর কে কে আছেন।"

—"মা।"

—"মানে শাশুড়ি ? শ্বশুর নেই ?"

এ তো বড়ো জ্বালা হলো ! বিশ্রাম দূরে থাক, জেরার জবাব দিতে দিতেই জেরবার। এইভাবে কখনো ক্লান্তি দূর হয় ? ঠিক করলুম উত্তর দেব না। অবেন্স ইজ দা বেস্ট ডিফেন্স—অতএব আমিই এবার অফেনসিভ টেকনিক ব্যবহার করব। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ :

—"আপনি কার সঙ্গে এসেছেন, মাসিমা ?"

—"ছেলেই নিয়ে এসেছে বলতে পারো, কিন্তু আমরা তো দল বেঁধে এসেছি।"

—"কতজন এসেছেন আপনারা ?"

—"তা তিরিশ-বত্রিশজন হবে, নয়রে খোকা ?"

—"পঁয়ত্রিশ।" খোকা জানালো।

—"কিসে এলেন আপনারা ?"

—"খানিকটা বাসে, খানিক রেলে।"

—"কবে এখানে এসেছেন ?"

—"এলাহাবাদে ? সতেরোই। কুম্ভমেলায় কালই এসেছি। সাত দিন এখানে থাকবো, কল্পবাসে, এই তাঁবুতে।"

—"তারপর কোথায় যাবেন ?"

—"হরিদ্বার, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা হয়ে ফিরবো।"

BanglaBook.org

—"ও বাবা—এ তো মস্ত ট্যারে বেরিয়েছেন।"

—"হ্যাঁ বাবা। এতদূর যখন এলুম, জগৎটাকে একটু দেখে যাই। তা তোমার কিছু খাওয়া হয়েছে বাছা?"

নেহাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রশ্নবাণটি ছুঁড়েছেন, ট্যাকটিকসের কথা ভুলে গিয়ে উত্তর দিয়ে ফেলি: —"এখনও হয়নি। এবারে হবে।"

—"ভাল কলা আছে? আমাদের কাছে চিঁড়ে, গুড়, কলা সব আছে। তোমাকে দুটি দিই? মুখখানা তো একদম শুকিয়ে গেছে। খোকা, চিঁড়ের পুটলিটা বের কর তো।"

এই মানুষের ওপর বিরক্ত হয়েছিলুম? ভেবেই লজ্জা করতে লাগলো। তাই লজ্জা ঢাকতে দ্বিগুণ রূঢ় হই—"না না, আমি এখন খাব-টাব না, আমার একদম খিদে পায়নি।"

এমন সময়ে খুব জোরে একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল তাঁবুর এককোণে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কথোপকথন স্তব্ধ। যেন শোকের আবহাওয়া নেমে এলো। আমি অবাক হয়ে উঠে বসে খুঁজি বাচ্চাটাকে। পেছন ফিরে দেখতে পাই—অরে, এরাও এতক্ষণ ছিল এইখানেই? এদের তো এতক্ষণ দেখতেই পাইনি! ক্লান্তির চোটে তাঁবুতে ঢুকেই শুয়ে পড়েছি। এরা আমার ঠিক পিছন দিকে ও কোণে বেশ পুরু, প্রায় ফুটখানেক উঁচু, গদির মত একটি সিংহাসন বানানো হয়েছে,—পর পর অনেকগুলো ভোটকম্বল ভাঁজ করে পেতে, তার ওপরে দুটি সুন্দরী মেয়ে জাপানি নাইলন শাড়িতে বিশিষ্ট হয়ে, রাণীর মত উদাস—বসে আছেন। দেখলেই দুটি বোন বলে বোঝা যায়। চিত্রতারকার মতো পরিপাটি সম্ভ্রান্তচেহারাটি কুমারীর। ইংরাজিতে যাকে বলে—প্রতিটি চুল যথাস্থানে, তাই, এই ঘরোয়া তীর্থযাত্রিণীদের মধ্যে আমার জরির শাড়ির চেয়েও যেন দৃষ্টিকটু তাঁর সযত্ন পারিপাট্য। অন্যটি বিবাহিতা। সিঁদুরটিপটা গড়িয়ে পড়েছে কপাল জুড়ে নাকে হীরের নাকছাবি এই ম্লান বাতিতেও ঝকমক করছে। সমস্ত মুখে বিরসতা।

দুজনের মাঝখানে একটি সুসজ্জিত পুং-শিশু। সে-ই পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। কিন্তু কিমাশ্চর্যম্? দুজনের কেউই তাকে ভোলাতে বা থামাতে চেষ্টা করছেন না। তাঁরা নিবাত নিষ্কম্প শিখা। ওদের বাচ্চা কি তবে নয় নাকি? যাব? ধরব? এবার উঠলেন একটি যুবক মেঝের খড় থেকে। তিনি নীরবে কান্নারিহ্বল শিশুটিকে কোলে নিলেন। তাঁবুর মধ্যে কোণের দিকে দাঁড়ানো যায় না। তাঁকে একদিকে ঘাড় বাঁকিয়ে থাকতে হলো। তিনি বাচ্চাকে ভোলানোর সামান্য চেষ্টা করতেই শিশুটি তার আধো আধো কচি গলায় উচ্চৈঃস্বরে কান্নার মধ্যেই যথাসাধ্য ক্রোধ ফুটিয়ে চীৎকার করে উঠলো—"বাবা পাজী—বাবা ছুয়তান—বাবাকে মারবো—বাবাকে টর্চ দিয়ে দিয়ে মারবো—বাবাকে খুউব মারবো"—ঐ যুবকটিই যে তার হতভাগ্য বাবা তাতে আর সন্দেহ রইলো না; কেননা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কথামতন কাজও চলতে লাগলো। কচি কচি হাতের কিল—ঘুঁষি—চড়।

বাবাটি ফিস্‌ফিস্ করে মাননীয় বাচ্চাটির কাছে কিছু বিনীত বক্তব্য রাখলেন। শিশুমহাশয় তখন আরও বেশি জোরে কান্না চড়িয়ে বলতে শুরু করলো—"মা কেন আমাকে টর্চ (টর্চ) দিয়ে মারলো—মা কেন হুদু হুদু আমাকে কেন টর্চ দিয়ে ঠাঁই ঠাঁই এমনি এমনি অতো জোরে মারলো"—এইবারে চিত্রার্পিত প্রায় জননীর চাঁচাছোলা গলা শোনা গেল এবং হাতের ভারি সোনার চুড়ির গুচ্ছ ঝিকমিকিয়ে উঠলো—"মর্ মর্—মর্ না তুই! মরিস না কেন?...যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে! এখানে কি করে থাকে মানুষ? একি মানুষ থাকার জায়গা? এ তো ঘোড়ার আস্তাবল। এখানে এনে তুলবে জানলে কখনো আসতুম? কক্ষনো না। ছি ছি—ছি ছি ছি! এই খড়ের গাদায় মানুষ থাকে? এই নোংরা তেরপলের থলির মধ্যে?...এই যদি মুরোদ, তবে এনেছিলেন কেন? আমরা কালই ফিরে যাব যেমন করে হোক—"

'বাবা' নামধারী অপরাধী যুবক ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। নিশ্চল নিশ্চুপ, পুত্রের চেঁচানি তখন বন্ধ।

BanglaBook.org

সে নিঃশব্দে বাপের কেশগুচ্ছ দুইহাতে ছিঁড়ছে মহানন্দে। অপর তরুণী এখনও চিত্রবৎ, নির্বাক। উদাসনয়না। সারা তাঁবু জুড়ে শোকপালনের নৈঃশব্দ্য ;—একটি ঝড় উঠলেও তার শব্দ হবে।

—"গরু, গরু, গরু। এখানে গরুতে থাকে। এ কি মানুষের থাকার জায়গা? ছিঃ!...একটা ঘর পর্যন্ত যোগাড় করতে পারলে না? ছি ছি ছি! কটি বাচ্চা কেন, বুড়োদেরও তো অসুখ করে যাবে এই ধুলো-কাদা ঝড়-বিষ্টির মধ্যে থাকলে! কেন আলাদা আসা কি যেত না? এইটুকুন জায়গায় মেয়েমদ্দ একদো লোকের গাদাগাদি—উশ্‌শ্‌! একটা তক্তা পর্যন্ত নেই যে বাচ্চাটা শোবে। ফ্লোরেন্স ডিবিরির দল—বাবা বার বার আসতে বারণ করেছিলেন, এই জন্যেই। এখন বুঝতে পারছি—যেন্না! যেন্না!—"

এলিজাবেথ টেলরের Who is afraid of Virginia Woolf? ছবিটা হঠাৎ মনে পড়লো। "মানুষ" শব্দটিতে উনি বার বার ঝোঁক দিচ্ছিলেন—আমার কান ঝাঁঝাঁ করতে লাগলো। ইতিমধ্যে বাচ্চাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে তার বাবা একটি ফ্লাস্ক খুলেছেন। বোধ হয় দুধ বেরুবে; কিন্তু না—যুবকটি এবার নম্র গলায় স্ত্রীকেই সবিনয় আবেদন পেশ করলেন।

—"একটু কফি খাবে? দিই একটু?"

—"চাই না কফি। ফেলে দাও গে। আবার ন্যাকামো হচ্ছে?"

এমন সময়ে একটা অন্য স্বর শোনা গেল। এদিক থেকে। বছর কুড়ি-বাইশের একটি চপল ছেলে, মুখ ফসকে বলে ফেলল—"কফি? বাঃ, আপনাদের সঙ্গে কফি আছে বুঝি?"

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ অভাবনীয় কাণ্ড। ইস্পাতকঠিন কণ্ঠে সেই বিনীত বাবাই বলে উঠলেন—"আছে, তবে ওটা আপনাদের জন্যে নয়।"

ঘরে আগের চেয়েও বেশী স্তব্ধতা নেমে এলো। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে চায়—ছোট তাঁবুটা আরো ছোট হতে হতে ক্রমশ বুঝি আমার গলা টিপে ধরছে। নাঃ, বেরিয়ে পড়তেই হবে, আর বিশ্রামে কাজ নেই। ঘুরে আসা যাক একটু। একটু খোলামেলা আকাশ বাতাস চাই। হোক বাইরে ঠাণ্ডা, এই অন্তরঙ্গ উষ্ণতায় গায়ে যে ফোস্কা পড়ছে—এ জ্বালা আমার চামড়ায় সইবে না। এখুনি পালানো দরকার! উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা বেরিয়ে পড়ি। কানের মধ্যে বাজছে—"গরু, গরু! এখানে মানুষ থাকে?"

বেরিয়েই ভয়ানক ধোঁয়া। এই ধোঁয়া আর ঝড় মিলিয়ে কেমন যেন গোঁয়াল-গোঁয়াল একটা অনুষঙ্গ সত্যিই আছে। যাই বা কোথায়? এই তাঁবুর জঙ্গলে পথ চিনে ফেরাও তো সোজা নয়। একটু বেরিয়ে এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখলুম, যেখান দিয়ে ঢুকেছি সেখান দিয়ে দ্বিতীয় তাঁবু এইটে। সেটা লক্ষ্য করে নিয়ে সোজা উল্টোমুখে হাঁটতে থাকি। মনের ভেতরে সুর কেটে গেছে, মুখ বিস্বাদ।

একা একা হাঁটতে ভালই লাগছে—হাতে মালপত্র নেই, মোটামুটি একটা জায়গায় ফিরে আসবো জানি, —আর সব চেয়ে বড় কথা এটা কুম্ভনগর। খবর নিয়েছি পথচারীদের কাছে, সঙ্গমটা নাকি খুবই কাছে। যাই দেখে আসি। কিন্তু তার আগেই দেখি পথের ধারে খোলা জায়গায় এক সাধুজীর ধুনি ঘিরে গুটিকতক মানুষ গোল হয়ে আগুন পোহাচ্ছেন। এঁরা সন্ন্যাসী নন, দেহাতী যাত্রী। একজন মাত্র চেলা সাধু রয়েছেন সাধুজীর। সেই ছোট্ট তাঁবুটা রীতিমতো গরম ছিল অতগুলি মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসে। বেরিয়ে এসেই শীতের ঝাঁকুনি খেয়েছি। আগুন পোহানোর দৃশ্যটা পরম রমণীয় লাগলো। হঠাৎ কী মনে হলো, ধুনি ঘেঁষে বসে পড়লুম। উপস্থিত যাত্রিরা মুখ তুলে চাইলেন। একটু বুঝি অবাক। হয় পাগড়ি-কম্বল, নয় গায়ে-মাথায় কম্বলমুড়ি দেওয়া দেহাতী পার্টি। গায়ে-মাথায় শালমুড়ি দেওয়া আমিও তাদের মধ্যে ঢুকে দিব্যি একপাশে উবু হয়ে বসেছি। মাটিতে কম্বল বিছানো আছে। আহ, এখানে যদি একটু পিঠটা পেতে বিশ্রাম

BanglaBook.org

করা যেত, এই আগুনের ধারে, কম্বলের ওপর! কম্বলে অবশ্য ছারপোকা থাকতে পারে কিন্তু এখানে চিৎপাত হওয়া যাবে না—ওটা ভাল দেখাবে না। পিঠ যতই ক্লান্ত হোক, সাধুর সামনে বসে থাকাই ভদ্রতা। ধুনির আগুন? কেন রে বাবা? এবারে টের পাই, গাঁজার ছিলিম হাতে-হাতে ঘুরছে। সাধুজীর প্রসাদ সবাই পাচ্ছেন। দেখে আমার মনে হলো আমাকেও একটু দেয় যদি তো দিক না, ক্ষতি কি? বাড়ি গিয়ে বুক ফুলিয়ে মেয়েদের কাছে গল্প করতে পারতুম, সাধুর আখড়ায় বসে গাঁজা খেয়েছি, জানিস? কিন্তু ওমা, এ কী? উইমেন ইয়ারের কথা সাধুরা কেউ শোনেনি? হায় হায়! ছিলিম আমার সামনে দিয়ে পাস হয়ে গেল যে!—একবার নয়, বারংবার। প্রত্যেকবার আমার ব্যাকুল মুঠোতে মোটে এলই না। সে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, মুষ্টি এড়ায়, এত কাছে এসেও ধরা দিল না পোড়া কপাল ছাড়া কী?

ধুতিপরা মধ্যবয়সী পাঞ্জাবী সাধুজী তাঁর শিষ্যকে কীসব বললেন, শিষ্য একটা ছোটো স্টেভের ডেকচি করে দুধ এনে ধুনিতে চড়ালে।

ও, গাঁজা হলো—এবারে বোধহয় আফিং-টাফিং হবে। শুনেছি আফিমের সঙ্গে লোকে খুব দুধ খায়। তা আফিমই বা মন্দ কি? দেখা যাক, আফিমটা হয়তো আমাকেও দেবে। বিলেতে কয়েকবার সায়েবদের গাঁজার আড্ডায়, অর্থাৎ মারিহুয়ানার আখড়ায়—অর্থাৎ "পট-পার্টি"তে গিয়েছি। একসময়ে ছাত্রমহলে এবং লেখকমহলে ওদেশে ব্যাপারটা বেশ চালু ছিল। গিয়েছি কৌতূহলের বশে, কিন্তু ভালো লাগেনি। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কেমন একটা নকলপনা আছে।

বন্ধ ঘরে গাঁজার ধোঁয়া জমে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, উৎকট গন্ধে দম আটকে আসে, না খেলেও নিশ্বাসে প্রবেশ করে নেশার ধোঁয়া, ঘরে জোরদমে হয় পপ-রেকর্ডের ঝিনচাক্ বাজে, নয় তো সেতার, নয় তো হরি ওম্। এদিকে ওদিকে 'হোমস্' সাহেব-মেম গেঁজেলরা বসে, শুয়ে, ধ্যানস্থ, স্তব্ধ। অনেক সময়ে অন্ধকার ঘরে দেওয়ালে সাইকিডেলিক আলোর খেলা হতে দেখেছি। অন্য সময়ে ঘরে ম্লান বাতি জ্বলে। কখনো বা শুধু মোমের আলো। যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায়। পর্দা-টর্দা ভাল করে টানা থাকে। অতো আব্রুর মূলে পুলিশ। গাঁজা বেআইনী। এধরনের ছাত্রদের আখড়ায় পুলিশভীতিটা সর্বদাই প্রবলভাবে কাজ করে—সেই নেশা সত্যি বলতে খুব সুখের নয়। সেই পরিবেশে বন্ধুকেও বন্ধু মনে হয় না। সেই পরিবেশই প্রত্যেককে ভয়ানক সঙ্গীহীন, ভয়ানক একলা করে দেয়।

হোস্টেলের সেই সব পট-পার্টিতে যে টানতো না সে-ই এলেবেলে হয়ে যেতো। তখন আমার সমস্যা ছিল অন্য—নেশাটা কীভাবে এড়ানো যায়! সিগারেটটা গাঁজাসমেত যখন হাতে আসবে, না খেয়েই অন্যের হাতে চালান করে দিতুম। যে কোনো নেশায়ই দারুণ ভয় ছিল ছাত্রবয়সে। অথচ সোজা রিফিউজ করলে সবাই খেপাবে; তাতেও ভয়! অধ্যাপক হয়ে যখন পট-পার্টিতে গেছি তখন মিষ্টি হেসে রিফিউজ করবার মতো স্বনির্ভরতা আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়ে গেছে। "তোমরা ওসব ছেলেমানুষী করছো করো—আমাদের কাছে ও আর নতুন কী!"—এমনধারা ভাবখানা করে অনেক ওপর থেকে করুণাঘন দৃষ্টিপাত করতে শিখে গেছি ততদিনে। কিন্তু আজকে, মধ্যরাত্রের প্রবল শীতে, কুম্ভমেলার পুণ্যতীর্থে আমার বড়ই লোভ হতে লাগলো।

কেননা এখানে পুরো ব্যাপারটাই আলাদা। না আছে এখানে আইনভঙ্গ করায় পুলিশভীতির অন্তরটিপুনি—না আছে রেকর্ডের ঝমঝমানি, না সাইকিডেলিক আলোর অত্যাচার। খোলা বাতাসে গাঁজার দুর্গন্ধও অতি সীমিত। এখানে স্নায়ুর ছুটি আছে। ও দেশে স্নায়ুকে ছুটি দেবার জন্যে এতই প্রবল তোড়জোড় যে তাতে স্নায়ুর অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এখানে এই জ্বলন্ত ধুনি, এই কম্বলজড়ানো দেহাতী স্নানার্থীরা, এই প্রায়-নগ্ন শ্মশ্রুগুম্ফসজ্জিত সাধুজী আর তাঁর চেলার সঙ্গে মৌনী অমাবস্যার গঙ্গাদ্বীপে চমৎকার মানিয়ে যাচ্ছে গাঁজার ছিলিমটা। একবার

BanglaBook.org

হাতে যদি আসতো, আমিও আজ প্রসাদ পেয়ে দেখতুম। কিন্তু এল না। নারী বলে স্পষ্টত আমার সঙ্গে ভিন্ন আচরণ করা হলো। ভারতীয় সংবিধানবিরোধী আচরণ একেবারে! ডিস্‌ক্রিমিনেশন!

পেতলের ডেকচিতে দুধের মধ্যে এলাচ দারুচিনি দিয়ে চা, চিনি ফোটানো হলো। এবং পেতলের গোল বাটি ভরে আমাকে চমৎকার মৌয়া-ওঠা, ঘাঢ়া গোলাপী রঙের দারুচিনি দ্বীপের স্বপ্নসুরভিত এক বাটি আনু পাণ্ডার এনে এগিয়ে দিলেন, চেলা নয়, সাধুজী স্বয়ং। "লো বেটি, জয়াসা চায় তো দী লো।" সাধুজী চা ধরে দাঁড়িয়ে আছে—ব্যাগ থেকে রুমাল বের করবার সময় নেই। গামছা দিয়েই জড়িয়ে উত্তপ্ত পেতলের বাটিটা দু'হাতে ধরে নিলুম। আহ্—গরম বাটি থেকে হাতিদের উত্তাপ এসে আমার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। গাঁজাখোরাও চা খান দেখা গেল। কিন্তু বাটি মাত্র একটি। আমাকে নিয়ে মেহমানই পঁচজন, তাছাড়া গুরু-শিষ্য। চা খেয়ে বাটি ফেরত দিলে তবে বাকিদের চা দেওয়া হবে। আমি আবার গরম গরম কিছুই খেতে পারি না। জুড়োনোর জন্যে অপেক্ষা না করে উপায় নেই। পেতলের পাত্র তো সহজে জুড়োবে না। সাধুজী বেশি কথা বলেন না। তাঁর মেহমানেরা একেবারেই না। ঐ তাঁবু থেকে চলে এসে এই সাধুর আস্তানা একটা মস্ত রিলিফ্। এখানে কোনও প্রশ্ন কিংবা অভিযোগ নেই—কোনো দাবি অভিমান কলহের ব্যাপার নেই। ঘড়িতে দেখলুম একঘণ্টা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। সর্বনাশ! আমার সবলজ্জ গার্জেনরা যদি তাঁবুতে এসে আমাকে খুঁজে না পান? মালপত্রের বোঝা চাপিয়েছি ওঁদের দলের ওপরে, সেই যে ভারত সেবাশ্রমের ছাউনির নিচে চেয়ারে গোঁফওয়ালা 'দাদু' বসে আছেন আমার মালপত্র আগলে! ছি ছি ছি!—সাধুজীকে প্রণাম করে, প্রণামী দেব কিনা বুঝতে পারলুম না, কাকেই বা দেব, কোথায়ই বা দেব! দিলে মেহমানীর অপমান হবে না তো? থাক বাবা, কাজ নেই। ভাল করতে গিয়ে মন্দ না করে ফেলি। শুধু শুধুই প্রণাম করি। সাধুজী কী যে বললেন আশীর্বচন, ঠিক বুঝতে পারি না। চেলাকেও প্রণাম করতে হয় কিনা জানি না, নমস্কার ঠুকেই পলায়ন করি। মুখের মধ্যে, বুকের মধ্যে, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়া সুরভিত দুধ-চায়ের উষ্ণ আরামেই সাধুজীর আশীর্বাদ স্থানান্তরিত।

ওঁদের তাঁবুতে গিয়ে দেখি সবাই বেরিয়ে গেছেন, মাত্র একজন আছেন পাহারাদার, আর সঙ্গে আছেন ঘুমন্ত বাচ্চা নিয়ে সেই বেচারী মা'রা,—সিংহাসনে বসে। সবাই মিলে স্নানে গেছেন, এমন কি ভোটকম্বলের রানীমায়েরাও। তাঁবু ফাঁকা, সুনসান্। প্রশ্ন করে ফেলি—"এখনই সবাই স্নানে গেলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সাড়ে নটা থেকেই তো আমাবস্যে পড়ে গেছে। আস্তে আস্তে সবাইকে নাইয়ে নিতে হবে তো।"

—"আপনারা যাবেন না?"

—"আমরা কয়েকজন পরে নাইবো। দুটোর পরে। এখন বুড়োদের পাঠিয়েছি আর মেয়েছেলেদের। এরা বেলাবেলি নেয়ে নিলেই ভাল, এই বেলা তেমন ভিড় হয়নি। এখনও পিছল হয়নি ঘাটের মাটি।"

—"দুটোর পরেই আসল মহাকুম্ভের লগ্নটা পড়ার কথা না?"

—"হ্যাঁ, তবে কি জানেন, আমাবস্যেটা পড়ে গেলেই হলো একপক্ষে। আসল পুণ্যি তো মনে মনে। বলুন ঠিক কিনা?—আসল কথা কি জানেন, এতসব বুড়োবুড়িদের সঙ্গে এনেছি, তাদের দায়িত্ব তো আমাদেরই। অত ভিড়ের মধ্যে সামাল দেওয়া শক্ত হবে। তাই আগেভাগে সেরে ফেলা আর কি!"

ভালো কথা। আগেভাগে পুণ্য সেরে ফেলা হচ্ছে। যে মহালয়ের জন্যে এত কষ্ট করে আসা, তার আগেই। অবিশ্যি পুণ্য তো সত্যিই মনে মনে। তার জন্যে এই প্রয়াগে আসারও দরকার

BanglaBook.org

নেই, কুম্ভস্নানও একেবারেই অপ্রয়োজনীয়।—কথা বলতে বলতেই বন্ধুরা এসে পড়লেন। এক আশ্রয় ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম অন্য আশ্রয়ের খোঁজে।

এসেছিলুম একলা। কিন্তু মাত্র দু'একটা মুহূর্ত ছাড়া সঙ্গীবিহীন সময় কাটেনি। তবু সবাই বলবে আমার সঙ্গে কেউ নেই? সঙ্গে ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরপ্রেরিত সঙ্গীরা। এসব সম্ভাবনা তো ভাবিনি। কিছুই ভেবেচিন্তে আসিনি—শুধু মনে করেছিলুম চলে তে যাই—যাওয়াটাই খুব জরুরী—তারপর যা হয় একটা হবে। টুরিস্ট ব্যুরোতে যেতে পারিনি, কিন্তু তার বদলে এসেছি ঢের ঢের ভালো জায়গায়। আসল জায়গায়। আমি এসেছি তীর্থে—ট্যুরে তো নয়। এই তো ভারততীর্থ,—এক কোটি লোকের সঙ্গে মিশে কবেই বা কী করতে পেরেছি আমি? এই ধুলোয় বসতে পাওয়াটুকুই আমার তীর্থবাস। গড়িয়াহাটেও তো কতো ধুলোমাটি আছে, কিন্তু ধুলোয় শুয়ে পড়তে পারি কি আমি সেখানে? ধুলো অত সস্তা নয়। ধুলোয় বসতে পাওয়াও অতো সস্তা নয়। পাগলা অজিতনারায়ণই কেবল সেটা পারে। তার জন্যে ঢের মূল্য ধরে দিয়েছে সে। এ স্বয়ং মা ধরিত্রীর কোল, অতি মহার্ঘ্য শয্যা। ইচ্ছে করলেই ধুলোয় শয্যা পাতা যায় না। আমরা পারি না। আমরা মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, বড্ডই মাঝারি মাপের। এখানে এই কুম্ভনগরের কল্যাণে কিছুটা ছড়িয়ে পড়বার ভাগ্য আমার হয়েছে, সহস্র যাত্রীর চরণধূলায় ধূসর হবার ভাগ্য। মুখ ফুটে বললে কথাটা এত বেয়াড়া রকমের ন্যাকা-ন্যাকা শোনায় যে বলা যায় না, কিন্তু বুকের ভেতর যে-কথাটা কেবলই বেজে চলেছে—সেটার গলাও তো টেপা যায় না? রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—"ওই আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রবো। তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব"—তখন দিব্যি স্বাভাবিক শোনায় যেহেতু তিনি ঋষি কবি। কিন্তু আমি ওটা নিজের ভাষায় বললেই শোনাবে বেতরো, বেসুরো, বানানো। তার চেয়ে তাঁর ভাষাতেই বলা ভালো। আমাদের মূক মুখে তিনিই তো ভাষা যুগিয়ে দিয়ে গেছেন। হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় এসে থামি।

—"এখানে কিছু খেয়ে নেওয়া হবে।" বলেন সহযাত্রীরা। পুরি তরকারি মিঠাই বিক্রি হচ্ছে দোকানে। আমার হাতে চলে এলো শালপাতার তৈরি বাটি—তাতে একগোছা পুরি, একহাতা তরকারি, দুটো অমৃতি জিলিপি। মুখে খাদ্য দিতেই মনে পড়ে গেল লতিফ আর লাল্লনের কথা। এরা এতক্ষণে সেকেণ্ড ট্রীপ নিয়ে ফিরে গেছে নিশ্চয় আবার ঝুসীতে। শার্দুল সিং রাতের খাবার পেয়েছেন তো? সকাল থেকে অভুক্ত ছিলেন একাহারী বৃদ্ধ। লালা-গোণ্ডাও ফিরে গিয়েছে এতক্ষণে তাদের সেই ছোট্ট সাদা বাড়িতে। মালপত্র হাতে নেই, দৌড়ে দৌড়ে যেতে পারবে, যদি না আবার কোনও শোভাযাত্রায় আটকে পড়ে। খিদে-টিদেও পেয়ে গিয়েছে বেচারাদের। আবার কি কেউ বাতাসা যোগাবেন, পথিমধ্যে ওই বালকদের?

—"কি ভাবছেন? বাড়ির কথা?"

—"বাড়ি? নাঃ!" সত্যি তো, বাড়ির কথা মনে পড়েনি। বাড়িতে এতক্ষণে গুরুদীপের টেলিফোন পৌঁছে যাওয়া উচিত। নইলে মা কালকে পাবেন আমার পোস্টকার্ড, যদি গুরুদীপ তা ডাকে দেয়। এবারে গুরুদীপের পাঁচটাকা আমাকে কামড়াতে শুরু করলো কোথায় পুজো দেব? পুজো কোথায় দেয় এখানে? আমি তো জানিও না এসব।

—"একজন আমাকে পাঁচটাকা দিয়েছে তার নামে পুজো দিতে, কোথায় পুজো দিই বলুন তো?"

—"কুম্ভে লোকে পুজো দেয় না। স্নান করে। মাথা কামায়। অনেকে পিণ্ড দেয়। যাঁর নামে পুজো দেবেন আপনি, তাঁর গোত্র জানেন?"

—"তা তো জানি না। কিন্তু পিণ্ড তো নয়, সে তো জীবিত ব্যক্তি।"

—"এক কাজ করুন, টাকাটা আমাদের দিয়ে দিন, আমরা একটু (গলাখাঁকারি) ওদিক

থেকে ঘুরে আসি, কী বলিস? বড্ড শীত! আর ওঁর নামে আমরা প্রত্যেকে একটা করে ডুব দেব। সেই ভালো।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই ভালো সেই ভালো—" সমবেত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। শুনে আমি—"হেঁ—হেঁ—হেঁ" করে হাসি। মা গুরুদীপের টাকা তোমাদের আমি দেব না হে ছোকরা। যদিও জানি তোমরা ভাল মানুষ। বরং ওটা ওই সাধুজীকে প্রণামী দিয়ে দিলে ভালো হতো। তখন কি ছাই মনে ছিলো?

—"উহুহুহু, কী ঠাণ্ডা! কী পড়ছে বল্ তো? বৃষ্টি নাকি? আরে বৃষ্টিই পড়ছে যে! সব্বোনাশ!" নির্ঘাত তাই। ঝিরঝির করে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিই। ছেলেরা সিগারেট ধরিয়েছে। ওদের ঢেলে দেওয়া জলে হাত ধুয়েছি। ডাস্টবিনে শালপাতাটা ফেলেছি। মা, কেউই পথে এঁটো শালপাতা ফেলেন নি। সব শালপাতা ঝুড়িতে: অন্তত এই দোকানের সামনে। তিরুপতির প্রসঙ্গটা মনে পড়ে গেল। না, কুম্ভনগরও বেশ পরিচ্ছন্ন বইকি।

তখনো বুঝিনি কয়েকঘণ্টা পরেই কথাটা ফিরিয়ে নিতে হবে মনের ভেতরে।

—"একটা পান হবে?"

—"নিশ্চয়ই।" একজনের হাতে শালপাতায় মোড়া পানের খিলি প্রস্তুত।

—"জর্দা?"

ওরে বব্বারা, জর্দা? কী সর্বনাশ! নো স্যার, নো জর্দা। "ক্যায়োড্ দ্য রেভেন, নেভার মোর।" কস্মাচ জর্দা নয়।

সহকর্মী দেবীবাবুর ভাইয়ের বিয়েতে জর্দা খেয়েছিলুম বটে। সেই যথেষ্ট। ছাদে নেমন্তন্ন খেয়ে-দেয়ে নামতে নামতে সিঁড়িতে মিঠেপানের সঙ্গে অলস আরামে একচিমটে জর্দাও তুলে নিয়েছিলুম। প্রণবেন্দুর দেখাদেখি। নিচে নেমে রাস্তায় ক'বা ফেলেছি মাত্র। তারপরই শুরু হয়ে গেল কেলেংকারি। রাজপথে আমার অনিচ্ছুক বেলেল্লাপনা। দেবীবাবুরা ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ কিন্তু বাড়ি করেছেন সিঁথিতে।

সিঁথির মোড় পর্যন্ত পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই জর্দার কল্যাণে আমার "পায়ের ভিতর পা। ফুটপাথ বদল হয় মধ্যরাতে।" ভাগ্যিস সঙ্গে আছে ভেষজবন্ধু প্রণবেন্দু, অমিয়, সুবীর। তাদেরই হলো মুশকিলের একশেষ। রাজপথে রণক্ষেত্র—একেবারেই বাগ মানানো যাচ্ছে না আমার বল্গাছাড়ানো পা-দুটোকে। মাথার ভেতরে লোহার গোলা ভরে দিয়েছে কেউ। বার ভারে ঘাড় লটকে পড়ছে বুকে। পা দুটো শোলা দিয়ে তৈরী খেলনা। আমি কি হাঁটতে পারি?—

বিয়েবাড়ির সাজগোজ করা একটি মেয়ে বড় রাস্তায় চলতে চলতে একবার এর ঘাড়ে, আরেক বার ওর পিঠে ঢলে পড়ে ধাক্কা খাচ্ছে: পথচারীদের নয়নলোভন হৃদয়হরণ এই দৃশ্য সৃষ্টি করে, (যা আমার ধাতু-বিরুদ্ধ!) জগতের পাঁচজনকে ফ্রী আনন্দ যুগিয়ে, কোনরকমে তো একটা মিনিবাসে উঠে পড়া গেল। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে চারজনে নামলুম। আমাকে নিয়ে ২-বি বাসে তুলবে বসে পাঁচ রাস্তার মোড় পেরোতে গিয়ে বন্ধুবর্গ হাল ছেড়ে দিলে। আমি তখন ঘাড় মাথা গুঁজে পা লটকে বসে পড়েছি এক দুর্দান্ত অশ্বারোহী যোদ্ধা-বুষকের পদমূলে। ওইখানেই অগত্যা আমাকে ফেলে রেখে সঙ্গীরা গেল ট্যাক্সির খোঁজে।—ট্যাক্সিতে ঢুকেই আমি লম্বা। ভীষণ বমি পাচ্ছে। বাড়িতে নামার পরে আমার মাকে ডেকে আনলো। নেহাৎ মা জানেন তাঁর অকর্মণ্য মেয়েটিকে ভালমতেই, তাই উলটোপালটা বুঝলেন না। কাজের লোকজনেরা পর্যন্ত হেসেই আকুল। ছিঃ ছিঃ, দিদিমণির জর্দা খেয়েই এই! এতটুকু সহ্য নেই শরীরে! যে মেয়েটি আমার বাচ্চাদের দেখে, সে চটপট আমার মাথা ধুইয়ে, এক গ্লাস বরফ দেওয়া লেবুর শরবত খাইয়ে দিলো। ওর বাবা মদ-তাড়ি খেয়ে বাড়ি এলে ওর মা নাকি এই অব্যর্থ প্রণালীতে তাঁর পরিচর্যা করেন। দিদি আজ জর্দা খেয়ে বাড়ি এসেছেন, অতএব ওটাই করা হোক। ওর গৃহ-চিকিৎসায় উপকারও

BanglaBook.org

হয়েছিল। কিন্তু জর্দা খাবার শখটা আমার একদিনেই সারা জন্মের মতো মিটেছে। এই সর্বনেশে বস্তুটি অন্যেরা খায় কী করে? অল্পবয়সীদের মধ্যেও আজকাল দেখি জর্দা বেশ পপুলার হয়েছে! জর্দা ছাড়া পানও ছিল ভদ্রলোকের কাছে। তিনিই, শোনা গেল, ওদের দলের "খাদ্যাধ্যক্ষ"। আমার কাছে খাবারের দাম নিলেন না কিছুতেই। হিসেব গুলিয়ে যাবে তাতে নাকি। বেশ কথা! হাঁটতে হাঁটতে ভারত সেবাশ্রমে এলুম। পরের খরচে তীর্থ করলে নাকি পুণ্য হয় না। কিন্তু 'পর' কে? আমার 'আপনা'ই বা কে? 'নিজের বলতে আমার কী আছে?'

দাদু তো দেখেই হুংকার ছাড়লেন।

"হ্যাল্লো নাতনী, হোয়াট-ইজ দিস? আমি যে তোমার কাসাবিয়াংকা হয়ে গেলুম! 'দ বয় স্টুড অন দি বার্নিং ডেক—বলি মালপত্তরের খোঁজ কি করতে নেই? এই কি তোমার চা খাওয়া? এ যে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের টিফিন টাইম—টানা তিন ঘন্টা পেরিয়ে এলে!"—

ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ি। সত্যিই তো। কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোনো কৈফিয়ত নেই। কে জানে ওঁর খাওয়া হয়েছে কিনা? আমার নিরুত্তর কাঁচুমাচু মুখ দেখে দাদু হেসে উঠলেন সশব্দে।

—"ডোন্ট ওয়ারি। শোনো, সুখবর আছে। আমরা একখানা তাঁবু পেয়ে গেছি। চলো সেখানে সব মালপত্তর নিয়ে যাই। খাওয়া-দাওয়া এইবারে হবে। সেইখানে গিয়ে।"

মালপত্র কে কোনটা নিলে কে জানে। আমার কাঁধে কেবল অহংকারের ঝুলিটাই। দলের সঙ্গে হাঁটতে লাগলুম। তাঁবুটি মস্ত বড়। এ সেই পাহাড়ী বাবার আস্তানার মতো নয়। সে তাঁবু যদি পায়রার খুপরি হয়, এ তাঁবু তাহলে চিড়িয়াখানার পাখির খাঁচা। ঢুকেই এককোণে দেখি আমার সুটকেসের ওপরে আমার লোটা-কম্বল-ব্রীফকেস গোছানো। সত্যি, এখানে ব্রীফকেসটা বড্ডই বেমানান। এ তাঁবুতে খড়ের ওপরে মাদুর পাতা, ওখানে মাদুর ছিলো না। তার মানে তাঁবুতে তাঁবুতে কৌলীন্য ভেদ আছে। গুজব শুনলাম এজন্যে দু'শো টাকায় সাতদিনের জন্য তাঁবু পাওয়া যেত, সন্ধ্যে রাত্রে ছিল আড়াইশোতে দুদিন। এখন এঁরা পেয়েছেন বুঝি তিনশোয়। তাঁবুতে বসেই সবাই লাইন দিলেন। সামনে ঝপাঝপ কলাপাতা পড়লো; তাতে সপাসপ্ পুরি, সব্জী ডাল, মিঠাই। আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আর পাত্ পেতে বসা সম্ভব নয়, যদিও পঙ্‌ক্তি ভোজনের আলাদা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু সেটা না খেয়েও ভাগ করে নেওয়া সম্ভব। সঙ্গী ছেলেরা দিব্যি দ্বিতীয়বার মহানন্দে খেতে বসে যায়, যেন কতকাল অভুক্ত রয়েছে! চমৎকার একটি তৃপ্তিকর দৃশ্য অস্পষ্ট আলোয় ফুটে উঠলো তাঁবুর মধ্যে।

এখানে আলাপ হলো সেই গায়ক ভদ্রলোকের সঙ্গে, দিব্যি কোটপ্যান্ট পরে যিনি সন্ধ্যায় মাইকে লবকুশের গান গাইছিলেন। তিনি এবারে রুমালের খুঁটি খুলে মেয়ের কিছু নোটের তাড়া ঢেলে দিলেন এবং বেশ কিছু খুচরো পয়সাও। তারপর অন্য একটি ছোকরাকে ডেকে বললেন—"ভাই একটু গুণে দাও তো। আর পারছি না। বড্ড টায়ার্ড লাগছে" টাকা গুনতেও যে কারুর টায়ার্ড লাগে, তা বোধ হয় কেবল এমনি পূর্ণকুম্ভের মেলাতেই দেখা সম্ভব! বাচ্চা ছেলেগুলোর কিন্তু মোটেই টায়ার্ড লাগলো না, মহা উৎসাহে গুনে ফেললো, ঝাঁপিয়ে এসে। খুচরোতে-নোটেতে মিলিয়ে হলো মন্দ নয়। শ'তিনেক টাকার মতো প্যাল পড়েছে ভদ্রলোকের।

ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠলো—"দাদা, ওটাকাটায় আমাদেরই খাওয়াবেন!"

দাদাও প্রফুল্ল বদনে বললেন—"বেশ, বলো কবে যাবে?"

আমি আগে কীর্তনের এদিকটা তো দেখিনি। থালাতে প্যালা ফেলেইছি মাত্র। প্যালা কুড়োনোর পরের অংশটা আজ দেখা হলো। ভালো। হিংসে করে লাভ নেই, যেহেতু আমি গাইতে একদমই পারি না! কিন্তু কবিতা পড়ে সামনে থালা বাবার আইডিয়াটা মাতায় চট করে একবার খেলে গেল। মন্দ কি? কবির যথেষ্ট আয় করতে পারবেন এই পথে—ভিলান টমাসের মত। না,

BanglaBook.org

গায়ক ভদ্রলোককে হিংসে করবো না। অনেক ক্লান্ত, বিনিদ্র মানুষকে ওঁর গান আজ শান্তি ও সঙ্গ দিয়েছে। এই টাকা গায়ক ভদ্রলোকের উচিত প্রাপ্তি।

পাশেই মা আনন্দময়ীর তাঁবু। স্বরূপানন্দজীর কাছে খবর নিয়ে এসে শার্দূল সিং বলেছিলেন, তোর পাঁচটার সময়ে তিনি মায়ের সঙ্গেই স্নানে যাবেন, তখন আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। নিজের মালপত্র রেখে দিয়ে একটু পরেই ঘুরে এসে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে পুনরায় জানিয়েছিলেন, না, তা হবে না। মা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে স্নানে নামেন না। অন্য স্বামীজীর মেয়েদের নিয়ে দিয়ে রাত দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে স্নান সমাপন করিয়ে আনবেন। মায়ের সঙ্গে কেবল পুরুষ শিবানন্দ আলাউড। অতএব এই হ্রীজাতীয় শার্দূল শাবকটি যেতে পারবেন না পিতা শার্দূলের সঙ্গে। শার্দূল সিং বলেছিলেন, "কিন্তু আমাদের আশ্রমের মেয়েদের সঙ্গে তুমি যাতে নাইতে পারো তার ব্যবস্থা আমি করে দেবো।" তারপরে তো তিনি নিজেই হাওয়া হয়ে গেলেন। নাকি আমিই? তিনি হয়তো তার খানিক পরেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন, এসে দেখলেন আমিই হাওয়া। সেও তো হতে পারে। অপরজনকে বেনিফিট অব ডাউট দেওয়া ছাড়া জগতে তৃপ্তি নেই। এঁরা অনেকে গিয়ে অনন্দময়ীকে প্রণাম করে এসেছেন। আনন্দময়ীর নামের কল্যাণেই আমি এ অঞ্চলে এসে পড়েছি, এই মানুষদের স্নেহের আঁচলে ঠাঁই পেয়েছি। একপক্ষে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ বৈকি। এতক্ষণ ওঁরই আশেপাশে ছিলুম, অথচ মনেই পড়লো না যে একবার আনন্দময়ীকে দর্শন করে আসা উচিত। এখন খুব মন-কেমন করতে লাগলো, এ-তাঁবুতে বসে বসে। আমি তীর্থযাত্রী বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তীর্থযাত্রীদের আচার-বিচার কিছুই জানি না।

অনবরত মাইকে ঘোষণা হচ্ছে—"মৌনী অমাবস্যার যোগ অনেকক্ষণ গড়ে গিয়েছে, আপনারা অযথা দেরি করবেন না, স্নানে বেরিয়ে পড়ুন। পড়ে ভিড় বাড়বে।"

দাদু বললেন—"সব মিছে কথা। যোগ এখনও পড়েনি। অমাবস্যাটা পড়েছে। কিন্তু এ-বছরে যে যোগটা আসল, গ্রহ-নক্ষত্রের সেই বিশেষ সংস্থান শুরু হবে দুটোয় শুরু, কাল সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আছে। এসব বাকা কেবল ভিড় পাতলা করবার জন্য। লোক ঠকানো কথা।"

আমরা ঠিক দুটোয় বেরুবো কথা হলো। পুরুষদের জায়গায় এখন একাগ্রজন। দাদু এসে ঘোষণা করলেন—"মস্ত সুসংবাদ। আমাদের সঙ্গে করে স্নানে নিয়ে যাবেন স্বয়ং কানাই মহারাজ। ঠিক দুটোয় বেরুবেন। সবাই তৈরি হয়ে নিয়ো। পাচুয়ালি।"

ভীষণ হাততালি পড়লো। চমৎকার ব্যবস্থা। কানাই মহারাজ শুনলুম ভারত সেবাশ্রমের সর্বভারতীয় ব্যবস্থাপনার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি স্বয়ং সঙ্গে থাকলে আর অব্যবস্থার প্রশ্নই নেই।

ইতিমধ্যে এক বয়স্ক ভদ্রলোক এসেছেন তাঁবুতে, যাঁকে আগে দেখিনি। ছেলেরা তাঁকে মেসোমশাই বলে ডাকছে। তিনি আমাকে জুটতে দেখে স্বভাবতই অবাক হলেন—"এটি কে?" আমি নাম বলতেই তিনি বললেন—"আরে তুমিই কি আগস্টে অক্সফোর্ডে গিয়েছিলে?"

এতক্ষণ যাঁরা আমাকে স্নেহভরে ঘরে জায়গা দিয়েছেন, দেখাশুনো করেছেন, তাঁদের কাছে আমার হঠাৎ একটু লজ্জাই করলো। জীবনে কখনো এর আগে 'অক্সফোর্ড' শব্দের সঙ্গে তেমন লজ্জার যোগাযোগ ঘটেনি। কিন্তু এই পরিবেশে—ইতিমধ্যে কিছু কিছু জেনেছি—এঁদের কে কী করেন। কার কতদূর পড়াশুনো। কেউ কারখানার শ্রমিক, কেউ ছোট দোকানদার, কেউ ইতি-উতি ব্যবসার চেষ্টা করেন, কেউ বা কেরানী। এঁদের মধ্যে হঠাৎ ওই সব লম্বাচওড়া বিজাতীয় শব্দের ভূতুড়ে আওয়াজ বড়ই বেখাপ্পা শোনালো। মনে হলো কেমন যেন ঠকিয়ে ঢুকে পড়েছি এঁদের হৃদয়ের সম্প্রীতির আওতায়। আমার যেন সেটা পাওনা ছিল না। যারা এরকম কথায় কথায় অক্সফোর্ড-হার্ভার্ড ঘুরছে, তাদের এ দেশের কোথাও কোনো উচ্চতা প্রাপ্য নয়। তারা বুঝি খাঁটি বাঙালীর ভেতর-বুকের বেড়া ডিঙোনোর অধিকারটা হারিয়ে ফেলেছে। এ যেন আমার ডুডুটামাক দুটোই খাওয়া! চোর-চোর মুখ করে বলি—

BanglaBook.org

—"হ্যাঁ, যেতে হয়েছিল। কিন্তু আপনি কী করে...?"

—"তুমি হাঙ্গারি না চেকোস্লোভাকিয়া কোত্থেকে যেন গিয়েছিলে অক্সফোর্ডে—ওখানে আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। সে তোমার সঙ্গেই যাদবপুরে পড়ায়।"

আরে, শোভার বাবা? চট করে একটা প্রণাম করে ফেলি। পৃথিবীটা কতটুকু? এর মধ্যে অশোকদার চোখের চিকিৎসক অমলবাবু, এরই মধ্যে শোভার বাবা মেসোমশাই। এই যে লক্ষ মুখের ভিড়ের মধ্যে আমি চেনামুখ খুঁজে খুঁজে হাঁটছিলুম সারা বিকেল, সে খোঁজা আমার মিথ্যে হয়নি তাহলে। তবুও লোকে বলবে, আমি একলা পথে বেরিয়ে ভুল করেছি? রিস্ক নিয়েছি? বড্ড বড়ো বুকের পাটা? দূর! বাড়ি থেকে দূরে আর এলুম কখন? বাড়িতেই তো আছি! একজন বাবা ছিলেন এতক্ষণ আমার পথসঙ্গী হয়ে, তিনি থেমে পড়তেই এবারে মেসোমশাইকে পেয়েছি। খুবই স্নেহপ্রবণ মানুষ। অমলবাবুর প্রশংসায় উনি দশমুখ। সত্যি অমলবাবু খুব আন্তরিক মানুষ। সত্যিই ভক্ত। মজা এই যে সাধুসঙ্গের জন্যেই ও মানুষ কুম্ভে আসে? আমার সন্ন্যাসীসঙ্গ না হোক, সাধুসঙ্গ হচ্ছে সমানেই। এতগুলি সৎ মানুষ, এতগুলি বিশ্বাসী হৃদয়, এতগুলি ভক্তপ্রাণ একসঙ্গে আমার চারিপাশে—এমন সৌভাগ্য কি আমার সহজে আবার হবে? কোনও কনফারেন্সে যখন যাই আমার তখনও মনে হয়, কতোগুলি পণ্ডিতের সঙ্গ পেলুম, কতো মহৎ চিন্তার উন্নত বুদ্ধির মানুষের সঙ্গে আজ দেখা হলো—আমার কী সৌভাগ্য! এতটা আমার মতো অভাজনের কি পাওনা ছিলো? নিশ্চয়ই না। আমি কেবলই প্রাপ্যের অতিরিক্ত পাই। সুখও যেমন, দুঃখও তেমনি। খোদা আমাকে যখন যা দেন, ছপ্পড় ফেড়কে দেন।

ইদানীং জেনেছি, কনফারেন্সে আসেন প্রধানত দু'রকমের লোক। একদল সরস্বতীর পূজারী, পণ্ডিত। আর একদল মজা লুটিয়ে র‍্যাকেটিয়ার। এছাড়াও তৃতীয় একটি অপ্রধান গুচ্ছ থাকে যারা আমার মতো শিক্ষার্থী। বাগ্দেবীর রূপমুগ্ধ, সম্মোহিত, দুর্ভাগা শূদ্র। যাদের বুকের মধ্যে ইচ্ছে আছে, কিন্তু রক্তের মধ্যে জোর নেই সরস্বতীর পদপ্রান্তে পৌঁছতে পারার।

তীর্থেও নিশ্চয় তেমনিই নানারকমের যাত্রীর সমাবেশ হয়। একদল তো সাধু-সন্ন্যাসী (একদল অসাধু সন্ন্যাসীও নিশ্চয় আসেন।) আর একদল ভক্ত। আর তৃতীয় একদল, যারা ভক্ত হতে চায়। যেমন আমি। আমার ভক্তির ইচ্ছে আছে, অথচ...এই 'অথচ'টা এখনও বুকের মধ্যে বড় প্রবল। আমার দলও নিশ্চয়ই বেশ ভারী, যাঁরা এই 'অথচ' ঘোচাতে চান। যাঁরা সন্ন্যাসী, ভক্তের কাছে তাঁদের সঙ্গ যেমন মূল্যবান,—যাঁরা ভক্ত মানুষ, তাঁদের সঙ্গও ভক্তিলোভী 'অথচ'দের কাছে তেমনি মূল্যবান। সন্ন্যাসী-সঙ্গ না পেলুম, এই যে এত ভক্তসঙ্গ পাচ্ছি, এই আমার ঢের পুণ্য।

১২

স্নান পর্ব

দুটো বাজলো। বাক্স খুলে আরও একটা জরিদার ভয়ংকর কাপড় বের করলুম, সবই হায়দ্রাবাদ লক্ষ্য করে আনা। নিজামের দেশে যা চলত, গঙ্গাদ্বীপে, কুম্ভনগরে কি তাই চলে? উপায় নেই। যা পরে আছি এইটে পরেই আমি স্নান করবো সঙ্গমে। একটা কাপড়ের চেয়ে মধ্যরাত্রের এই স্নানটা ঢের বেশী দামী। তোয়ালে নিলুম, ব্যাগ টর্চ নিলুম। মেসোমশাই মনে করিয়ে দিলেন, জলপাত্রটা নিয়ে চল, সঙ্গমের জল ভরে নেবে। পাত্রে গোটানো জল কিছু অবশিষ্ট ছিল। এতক্ষণ কুম্ভের জলটা খেতে হয়নি! ফেলে দেবো? ফোটানো জল ফেলে দিয়ে সঙ্গমে জীবাণু থিকথিকে তাবহ পুণ্যবারি ভরে নেব? ওটা তো বাওয়া যাবে না! মেসোমশাই বললেন,—"কুম্ভের এই পুণ্যালয়ের জল কলকাতায় গিয়ে ছেলেমেয়েদের মাথায় দেবে, মাকে দেবে।—" ঠিক ন্যায়। বোতল সঙ্গে চলল। ইতিমধ্যে একটা ভীষণ গোলমাল হলো—দাদা এসে বললেন সব মালপত্র

BanglaBook.org

সঙ্গে নিয়েই স্নানে যেতে হবে। কারণ সঙ্গম থেকে হয়তো তাঁবুতে ফিরতে পারবো না, পথটা ঘুরিয়ে ডিটুর করে সোজা শহরে পাঠিয়ে দিতে পারে। তখন মালের কী হবে? হায় মাল! হায় রে ভক্তের মাল! তোমাকে বইবার কথা ভগবানের। এখন যে যার মালের বোঝা মাথায় তোলো, আপনা হাত জগন্নাথ—তুলে হাঁটো সবাই স্নানের ঘাটের দিকে। প্রসঙ্গত, দাদা মনে করিয়ে দিলেন—সেই ইলশেগুঁড়ি এখন দিব্যি কুইকাৎলা হয়েছে। বৃষ্টিতে ভেজা আছে কপালে। তাঁবুর জনগণ, যাকে বলে আমজনতা, মালবহন বিষয়ে গুনগুনিয়ে প্রতিবাদ করলেও, দেখলুম দলপতির নির্দেশের বিরুদ্ধে 'সোচ্চার' হলো না, প্রায় সৈনিকসুলভ শৃঙ্খলার সঙ্গে যে-যার মাল নিয়ে উঠে পড়লো, মেসোমশাই এবং আমি ছাড়া। একটি হাসিখুশি ষোল-সতেরো বছরের হিন্দুস্থানী ছেলে কোত্থেকে এসে পড়ল, ভিখু তার নাম—মেসোমশায়ের কিটব্যাগ-কাম-বিছানা সেই ঘাড়ে নিয়ে নিলে। এবং আমার সুটকেসও। ভক্তের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ভিখুই এখন ভগবানের ভূমিকায়। ব্রীফকেসটা বুদ্ধি করে সুটকেসে ভরেছি, কাগজপত্র ভিজে যাবার ভয়ে। কিন্তু লোটা-কম্বল কাঁধে আছে, এক বগলে স্নানের পুঁটলি, অন্য বগলে অহং-থলিকা, তদুপরি কোঁচা অঁচল, শাল—তামাম দুনিয়া সঙ্গে নিয়ে আমি বেজায় জট পাকাচ্ছি। তাঁবু থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিতে কয়েক পা যেতেই দেখা গেল কেবল অহং-থলিকা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। স্নানের পুঁটলি পর্যন্ত উধাও। উদার এবং করুণাময় যাত্রীরা কেউ না কেউ স্বেচ্ছাসেবক হয়ে আমার ভারমোচন করে ওগুলো নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

তবু লোকে বলবে একা এসেছি? সঙ্গী নেই? বাইরে এসে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই গেরুয়াপরা এক মহারাজ এসে দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে মস্ত একদল যাত্রী। যাত্রীরা রাস্তা পার হয়ে চলতে লাগল। আমিও ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটি। এমন সময়ে দেখি ও-ফুটপাথ থেকে একটি ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে—"দিদি, কোথায় যাচ্ছেন? ওরা তো আমাদের গ্রুপ নয়!" সেকি! আমি লজ্জায় মাথাটি হেঁট করে ফিরে এলুম।

—"আমাদের সঙ্গে তো কানাই মহারাজ যাবেন। হাতে মস্ত ত্রিশূল থাকবে।"

ভিখু তো হেসেই কুটিপাটি।—"দিদিকা সুটকেস হামকো মিল গয়া থা।"

একটু পরেই যাত্রা শুরু হলো। উন্নতকায়, বলিষ্ঠ কান্তিবান্ কানাই মহারাজ এসে দাঁড়ালেন। হাতে বিশাল দীর্ঘ রুপোলি ঝকঝকে ত্রিশূল। পথিকৃতেরই যোগ্য মূর্তি তাঁর। সেই ত্রিশূল শূন্যে উঁচু করে ধরে তিনি বললেন—"এই ত্রিশূল লক্ষ্য করে আপনারা আসবেন। পেছিয়ে পড়বেন না যেন। যদি পড়েনও, তবে আবার ত্রিশূল খুঁজে নেবেন। আমি মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়াবো।"

জয় কুম্ভ! জয় প্রয়াগরাজ! জয় গুরু! হাঁক দিয়ে উঠলেন আমাদের যাত্রীদল। পঞ্চাশজনের জায়গায় একায়জন, স্নানযাত্রা শুরু হলো।

চলতে চলতে চলতে চলতে মনে পড়লো মন্ত্রী দাদা বলে গেছেন—মাত্র মাইল দেড়েক। মাল নিয়ে চলা বলেই দূর লাগছে।

কুম্ভনগরে এসে আগে যা দেখিনি তা এবারে চোখে পড়লো। সেই ছোট ছোট তাঁবু অঞ্চলের পিছন দিয়ে যাবার সময়ে খুবই মুশকিলে পড়লুম। ঠিক রাস্তার ওপরে সারি সারি পুণ্যার্থী মধ্যরাত্রেই প্রাতঃকৃত্য সারতে বসেছেন। পথ চলা দায়। তাঁদের অবিশ্যি লাজলজ্জা নেই, বরং মহা উৎসাহে বড় বড় চোখমেলে সরল আহ্লাদে তাঁরা আমাদের স্নানযাত্রা পর্যবেক্ষণ করছেন। স্ত্রী, পুরুষ, যুবতী, বৃদ্ধতে কোনও ফারাক নেই। রাস্তায় যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা তবু তো দৃশ্যমান! যাঁরা এখন আর বসে নেই, কিন্তু একটু আগেই ছিলেন? তাঁদের এড়িয়ে চলাই আরো বেশি মুশকিল। একেই সকলের হাতে ভারী ভারী মালপত্র, তায় দৃষ্টি দূরে ত্রিশূলের ডগায় নিবদ্ধ। পা বেচারী যে কোথায় পড়ছে—তার ঠিক নেই কিছু। একেই এ শীত, তায় সমানে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি, তবু বাঙালীর রঙ্গরসে কিছুই টান পড়েনি—শ্রীসরণের বিস্ময় নিয়ে নানান মন্তব্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে

BanglaBook.org

যাত্রীদের মধ্যে। হাসিই উঠছে বিরক্তির চেয়ে বেশি করে। সন্ধ্যাবেলা যখন মোজা পরে হাঁটছিলুম—সেই কথাটা মনে পড়লো। সে-রাস্তায় এ উপদ্রবটি ছিলো না, ভগিাস! এখন তবু খড়ম পরে আছি। একেই বলে দেবতাদের মতো ভূমি স্পর্শ না করে হাঁটা। বামুনরা কেন যে খড়ম পরতো, এতদিনে তার গোপন সূত্রটা টের পেলুম। এইজন্যে! এখন রাস্তার চেহারাই বদলে গেছে। দু'দিকে দু'রকমের স্রোত—জনস্রোত। একদল সঙ্গমের অভিমুখে ছুটেছে, অন্যদল সঙ্গম থেকে ছুটে ছুটে ফিরছে। বৃষ্টি দুই দলকেই ছুটিয়ে ছেড়েছে। এই শীতে মেয়েদের গায়ে ভিজে কাপড় জড়ানো, ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই পরনে গামছা, খালি পা। আমাদের বাঙালী দলেও অনেক পুরুষমানুষের খালি গা খালি পা। পরনে গামছা। অনেকে তার ওপরে কেবল কোটটা জড়িয়ে নিয়েছেন। মেয়েদের শাড়ি-শাল দেখে ভেতরের খবর কিছুই টের পেলুম না। আর আমি যে জামাগুলো খুলব, তার তো কোনো জায়গাই পাইনি। জলে নামার আগে, ডাঙাতে শক্ত অথর সোয়েটারগুলো খুলে রাখবো জুতো-মোজার সঙ্গে। বাকী যা পরে আছি সবসুদ্ধুই নেমে পড়বো ভেবেছি। যা হবার হবে। বৌদির খালি হাত পা। মাল নেই। তিনি আগে আগে যাচ্ছেন। আমি বৌদির সঙ্গে তাল রাখতে খুব চেষ্টা করছি। বৌদি বললেন, "শোনো মেয়ে, আমি একটা কথা বলি। এ-শাড়িটা পড়ে খুলে রেখে সায়া ব্লাউজ পরেই নেয়ে নিও, কিচ্ছু হবে না, এখানে কেউ কাউকে দেখবে না। পরে ওই ভিজে শাড়ির কী দশা হবে কতক্ষণ ওজন হবে ভেবেছ? নেবে কিসে?" সবই বুঝেছি। কিন্তু কী আর করব? বৌদি যা বলার বলুন, আমি যা পারব তাই তো করব? মাঝে মাঝে "জয় কুম্ভ" ধ্বনি ওঠে, মাঝে মাঝে ওঠে, "মহারাজ একটু দাঁড়ান"! মাঝে মাঝে ত্রিশূল দেখা যায় না। ত্রিশূল নেমে যায়। অস্থির হয়ে উঠি আমরা। ত্রিশূল কই? ত্রিশূল কই? ধ্বনি জোরালো হলেই দেখি ঠিকরে উঠেছে শূন্যে রুপোর ত্রিশূলের অভয়শীর্ষ। যেতে যেতে এক জায়গায় খুঁটি পাওয়া গেল। সবাইকে একটা বাঁশে-ঘেরা অঞ্চলের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে কানাই মহারাজ বললেন—"এইখানে মালপত্র রাখুন। সবাই একসঙ্গে যাবেন না। অর্ধেক থাকুন মাল আগলে। ওই যে ওখানে জোর ফ্লাডলাইট"—ওদিকে তাকিয়ে দেখি ফ্লাডলাইটের নিচেই লাখো লাখো পতঙ্গের মতো মানুষের ছায়ার ছন্দহীন ছুটোছুটি।—"ওইখানে সঙ্গম। আমি ওখানেই থাকবো। স্নান করে উঠে ত্রিশূলের কাছে চলে আসবেন। আর এইখানে থাকবেন আমাদের স্বামীজী—দুটো ফ্ল্যাগ হাতে।"—দুটি সবুজ রঙের পতাকা নেড়ে দেখালেন হাসিমুখে এক বৃদ্ধ স্বামীজী।—"হম্ রহেঙ্গে যাঁহাপর।" চমৎকার বন্দোবস্ত। এবারে শুরু কাপড় বদল। আমি শালটা খুলে রাখি, আঁচলটা জড়িয়ে নিই। ব্যাগটা লিলীপের হাতে তুলে দিই, সেই ছেলেটি আমাদের মালপত্রের জিম্মাদার হয়ে থাকবে এখানে। ওদিকে বৌদিরা এগিয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি করে স্নানান্তে যেগুলো পরবো, সেগুলো বগলে নিয়ে এগোই। কে যেন বলেন—"হাতে ঘড়ি কেন? ছুটে যাও, খুলে দিয়ে এস।" ঘড়ি খুলতে আবার ফেরত দৌড়োই। ঘড়িটা দিতে গিয়ে মনে পড়লো কৈশোরে যখন সাঁতার ছিলুম, তখন জলে নামার আগে কানের রিং হাতের আংটিও খুলে রাখতে হতো। স্রোত নাকি খুলে নেয় অলংকার। সেসব বস্তু খুলে ব্যাগে পুরে দিয়েই কের ছুটছুই। বৌদিদের ধরে ফেলেছি। আমাদের সঙ্গে অঞ্জনা বলে সাত-আট বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে আর তার তরুণী মাও চলেছেন। অবশ্য বাবাও আছেন। ছোট্ট অঞ্জনা ভারী মিষ্টি। ওকে দেখে কেবলই নিজের মেয়েদের কথা মনে পড়ছে। কোন্ দুঃসাহসে ওঁরা যে এতটুকু শিশুকে এই ভিড়ে কুম্ভস্নানে এনেছেন! আশ্চর্য, আমার রীতিমতো উদ্বেগই হতে থাকে ওর জন্যে।

আলের কাছে গিয়ে কোথা দিয়ে কী যেন হয়ে গেল। ভীষণ ভিড়। ওপাশ থেকে লোকেরা উঠে আসছে স্নান সেরে, এপাশ থেকে স্নান করতে যাচ্ছে, আর পশ্চিম থেকে তৃতীয় এক বিপুল স্নানার্থী দল হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো। কোথায় ছিটকে গেলেন বৌদি, কোথায় অঞ্জনা

BanglaBook.org

আর তার মা, কোথায় আমি! বগলের পুটলি আর নাকের চশমাটাকে জোরে চেপে ধরেছি। এই রেঃ, চশমাটা খুলে আসতে ভুলে গিয়েছি। সর্বনাশ! ভিড়ের ঠেলায় আপনাআপনি কোন দিকে যাচ্ছি কে জানে, এমন সময়ে দেখি সামনেই জল। ভিড়টাও এখানে আবার একটু পাতলা। কিন্তু বৌদিদের চিহ্ন দেখা গেল না। নদীজলে অনেক মানুষ। ওপারে চড়া, তার ওপারে আবার জল। আবার মানুষ। জল বেশি নয়। হাঁটু পর্যন্ত। থাক, তবু ভরসা। এখন চশমা নিয়ে কী করি? ভাবতে না ভাবতেই মনে পড়লো, পায়ে আমার দু'জোড়া মোজা, একজোড়া হিলতোলা চটি, গায়ে তিনটে মাথা গলানো সোয়েটার। কিছুই তো খোলা হয় নি? একটা একটা করে সব এবারে খুলে নিতে হবে। ভেবেছি মাত্র—হঠাৎ 'হর হর মহাদেও'—'গঙ্গা মাইকি জয়'—বলে এক সম্মিলিত চিৎকার, আর পিছনে হাজার লোকের ভিড়ের ধাক্কা। একমুহূর্ত পরেই দেখি—আমি জলে। কোমর পর্যন্ত জল। দুই পা জুতোসুদ্ধ, কাদায় প্রোথিত। বগলে কিন্তু পুটলি বাঁধা চেপ্পটি তখনও চেপে-ধরা। যদিও তা ভিজে গেছে। নাকে চশমাও আছে। একহাতে পুটলিটা ধরে অন্যহাতে সন্তর্পণে কাদা থেকে একটা একটা করে পা তুলে জুতো খুলে জলে ধুয়ে হাতে নিলুম, মোজা খোলার চেষ্টার কথা ছেড়ে দিলুম। এখন জামা খুলি কী করে?

হঠাৎ দেখি গামছা-পরা, খালি গা, হাতে দুটি দু'কিলো করে ঘৃতের টিন, এক ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমাকে বলছেন—"কী কাণ্ড, আপনি এসব জামাকাপড় পরেই নাইতে নেমেছেন? আপনি কি পাগল?" ভাল করে তাকিয়ে দেখি, সেই যাদ্যাধ্যস্ত ভদ্রলোক। ভারী আহ্লাদ হলো। বাঃ, এই তো সঙ্গী পাঠিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর! শার্দূল সিংয়ের নজর আমিও এড়িয়ে গিয়েছি এখন।

কাঁদো কাঁদো গলায় বলি—"ইচ্ছা করে কি আর? ধাক্কার চোটে জলে পড়ে গিয়েছি গরম জামা খোলবার আগেই।"

—"কী কাণ্ড! দিন আমাকে দিন জুতো আর পুটলি, চশমাটা খুলুন আগে, তারপরে সোয়েটারগুলো। নাকি, নাইবেন না? তার চেয়ে আমি বলি কি, মাথায় একটু জল ঠেকিয়ে উঠে পড়ুন, তাতেই খুব পুণ্য হবে।"

তা কেন? ডুব দেবো বলেই না আসা। দুটো টিন, দুপাটি জুতো, চশমা, পুটলি ধরে ভদ্রলোক হাঁটুজলে শান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন। পৈতেতে খোসা ছাড়ানোর অপেক্ষায়। হাতফাটার পরে হাফহাতা, হাফহাতার পরে ফুলহাতা হিঁচড়ে টেনে খোলার অপরূপ দৃশ্য নয়নভরে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বললেন—"আর কী বাকী?" আমি বললুম—"ব্যাস্, খতম।" (অতঃ হতলা?) সোয়েটারগুলোকে গুটিয়ে পুটলি করে ওঁর হাতে দিলুম। ছুতির ওপরে বড়ই ঝকমক করছে ভদ্রলোকের পৈতের গোছা। নাঃ, নিজের জুতোটা বরং নিজেই ধরি। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। জুতো জোড়াটা ফেরত নিয়ে নিই। ভিজে মোজাগুলোও খুলে কাদা ধুয়ে নিংড়ে নিই। তারপর চারখণ্ড মোজা যত্ন করে গুনে গুনে কোমরে গুঁজে রেখে, বগলে দু'পাটি জুতো নিয়ে 'জয় কৃষ্ণ' বলে একটা ডুব দিয়ে ফেলি। যা থাকে কপালে। বাহির হয়েছি স্বপ্রশয়ন করিয়া হেলা, নিশীথবেলা! দে ডুব, ডুব! উরিঃ বাপরে বাপ্! কী ঠাণ্ডা! মাথা তুলেই মনে হল গুরুদীপ? গুরুদীপের নামেও একটা ডুব দিতে হবে। তার আগে পুণ্য প্রয়াগধামে এসেছি যখন পিতৃপুরুষদের একটু জল দিয়ে নিই। বাবার মৌদ্গল্য গোত্র, শ্বশুর মশাইয়ের ধন্বন্তরী, এবং প্রিয় মামীমাও মৌদ্গল্য—এঁদের মনে মনে স্মরণ করে, আমি নিচু হয়ে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে প্রথমে—"আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং..." বলতে বলতেই দেখি গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আমারই একপাটি চটি জুতো, কিছু ভাববার আগেই খপ্ করে সেটি ধরে ফেলেছি। ধরতে ধরতে ইতিমধ্যে মুখ দিয়ে মন্ত্রটি বেরিয়ে গেল যেটা বেরুচ্ছিল, "গৃহ্নন্তু অপোগুলিম্।"

ছি ছি ছি ছি ছি, নবনীতা! তোমার হাতে জলের সঙ্গে ওটা কী? এ্যাঁ! কিন্তু হে আমার পিতৃপুরুষগণ—আমি তো ইচ্ছে করে করিনি। তোমরা তো আমার দূরপর কেউ নও, তোমরা

BanglaBook.org

তো আমারি পিতৃপুরুষ। তোমরা আমার দোষত্রুটি নিজগুণেই মার্জনা করে নেবে। তোমাদের আহ্বান করা মাত্র তোমরাই তো আমাকে দেখিয়ে দিলে যে জুতোটা ভেসে যাচ্ছে! একপক্ষে তোমরাই ওটা উদ্ধার করে দিলে। হে আমার পূজনীয় পিতৃপুরুষগণ, পরমহংস যেমন নীর বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করেন, তোমরাও তেমনি জুতোর কলঙ্কটুকু বাদ দিয়ে, হৃদয়-নিঃসৃত জলটুকুনি গ্রহণ করো।

—"ওকি হচ্ছে? জুতো হাতে করে উদকাঞ্জলি?" এক ধমক দিলেন খাদ্যাধ্যক্ষ মশাই।—"মাথাটাথা কি একেবারেই গেছে?—দিন জুতো আমাকে? নিন ডুব দিন চট করে ডুব দিন—এক, দুই—তাঁর ধমকের চোটে আর একদুই গোনার চাপে টুপটাপ করে আরো দুটো ডুব দিয়ে ফেলি। এবার অঞ্জলিতে আবার জল নিয়ে বলি:

"আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্তু অপোঞ্জলিম্।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবঃ॥"

তৃপ্ত হও হে আমার পূর্বপুরুষ সকল, হে পূজনীয় মাতৃ-পিতৃগণ! তিনভুবন জুড়ে তৃপ্ত হও তোমরা আমার ভালবাসায়।

"ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।"

তারপরে গুরুদীপ কাউরের নামে আর একটি শুদ্ধচিত্তে ডুব। ব্যস্।

—"নিন ধরুন এবার এই সবগুলো, এখন আমি জল ভরবো টিনে।" জামার পুঁটলি, জুতো, চশমা আমাকে ফেরত দিলেন তিনি।

আমি একটা চড়ায় উঠে দাঁড়িয়েছি, পায়ের মোছ ডোবানো জলে। জিনিসপত্রগুলো সামলে। চড়াতেও ভিড় বাড়ছে। খাদ্যাধ্যক্ষ যে কোথায় গেলেন, তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছি না। ভিজে কাপড়ে ভীষণ শীত করছে। সঙ্গে শালটাও নেই যে জড়াবো। মাথায় বৃষ্টি পড়ছে। পা ডুবে আছে জলে।

শীতের কাঁপুনি ভুলতে অন্যকথা ভাবি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকদের স্নান করা দেখছি আর ভাবছি এই সেই পুণ্য ত্রিবেণী—এখানে পূর্ণকুম্ভের সময়ে স্নান করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এ বড়ো পুণ্যভূমি। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। তাই এর নাম প্রয়াগ। অমৃতকুম্ভ নিয়ে পালানোর সময়ে যে চার জায়গায় ইন্দ্র কলসী নামিয়েছিলেন, যেখানে যেখানে চলকে পড়েছিলো অমৃতবারি, এই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম তার মধ্যে প্রধান। তীর্থরাজ প্রয়াগ সকল তীর্থক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ মিলনতীর্থ। এই যে ছুটে এসেছে এক কোটি মানুষ, এদের প্রত্যেকের মনে এই মুহূর্তে একটিই আশা একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা—মুক্তি। সকলের মন এখন একই তারে বাঁধা। একেও যদি পুণ্যলগ্ন না বলি তো কাকে বলব? যখন এক কোটি তন্ময় মানুষ একসঙ্গে মুক্তির প্রার্থনা করছে, একই জলে স্নান করে পূত হতে চাইছে? কোটি মানুষের মন যেখানে মিশে যায় সেই তো সঙ্গম। এই অমৃতের আকাঙ্ক্ষাই তো অমৃতের স্বাদ।

একসময়ে দেখি খাদ্যাধ্যক্ষ উঠে আসছেন, টিন হাতে। টিনগুলো আমাকে দিয়ে বললেন—"রাখুন, এইবারে আমি ডুব দিয়ে আসি। আপনার জন্য মশাই, আমার ভাল করে ডুবই দেওয়া হয়নি!—আচ্ছা, আপনার নামটা যেন কী? নামটা জেনে রাখা ভালো। যা ভিড়! সাংঘাতিক কাণ্ড। এত সুব্যবস্থা এবার, তাতেও এই। অন্যান্যবার কী হয় তাহলে ভেবে দেখুন!- আমার নাম ভট্টাচার্য।"

—"আর আমি নবনীতা।"

—"নবনীতা? বা, বা, বেশ।"

দুবার নাম বলতে হয়নি দেখে আমি খুব খুশি। ইতিমধ্যে এক ঝোঁটাতিলকধারী গামছাপরা পাণ্ডা এসে আমাদের পাকড়াও করল।—"চলুন বাবু, চলুন, খুব ভাল করে স্নান করিয়ে দেব"—

BanglaBook.org

"চাই না, চাই না" বলে ভট্‌চায্যি অস্থির হয়ে উঠলেন। পাণ্ডা কিন্তু নাছোড়। আমার মাথায় হঠাৎ দুর্বুদ্ধি এল। আমি গামছাপরা ভট্‌চায্যির নগ্নবক্ষে শোভা-পাওয়া পুরু পৈতের গুচ্ছটির দিকে আঙুল তুলে বলি—"আবে, পাণ্ডা দিয়ে এখানে কি হবে? ইনিই তো আমার পাণ্ডা! দেখছেন না, ইনিই আমাকে স্নান করাচ্ছেন!"—

পাণ্ডাজী মস্ত জীব কেটে লজ্জিত হেসে আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলেন না। আর ভট্‌চায্যি?—"যাঃ, আপনার তো দেখছি দিব্যি সাদ্ মাথা! তবে কেন খামখা জুতোজামা পরে জলে নেমেছিলেন?" বলেই চলে গেলেন জলের দিকে।

এতক্ষণে মনে পড়লো আমার জলের পাত্রটি তো ব্যাগ-সুটকেস-কম্বলের সঙ্গেই ফেলে এসেছি, পুণ্যপানি ভরে নেওয়া আর হলো না। ভট্‌চায্যি গেলেন তো গেলেনই। আর ফেরার নাম নেই। ইতিমধ্যে দলে দলে স্নানার্থী মানুষে জলের ধারটা একেবারে ঢেকে গেল। আমি কিছুতেই ভট্‌চায্যিকে আর নজর করতে পারছি না। দু'টিন পুণ্যবারি আর এতগুলো পোঁটলাপুটলি নিয়ে হাঁটতেও পারছি না—পুণ্য সঙ্গমের চরে ক্যাসাবিয়াংকার মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে—আকুল নয়নে চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ গামছাপরা খালি-গা পুণ্যার্থীর অরণ্যে দময়ন্তীর মত নিবিষ্টচিত্তে আমাদের ভট্‌চায্যির পুণ্যমূর্তিটি খুঁজছি। কিন্তু নলকে যেভাবে দময়ন্তী চিনে নিয়েছিলেন—এখানে তো সেই অনন্য যোগাযোগটি নেই। আমার মন অস্থির হয়ে উঠলো। হলো কি ভট্‌চায্যিমশায়ের?...এমন সময়ে কানে এলো:—"নবনীতা! নবনীতা! আপনি কোথায়?"

—"নবনীতা!" নিজের নামটা আমার কোনকালেই পছন্দ নয়। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে চেনা নামটি শুনতে কী ভালোই লাগলো!—"এই যে আমি-ঈ! ভট্‌চায্যি মশাই—ঈ!"

ভট্‌চায্যি খুঁজে পেলেন আমাকে। একহাতে দড়ি বাঁধা দুটো টিন ঝুলিয়ে নিয়ে—অন্য হাতে শক্ত করে আমার বাঁ-কব্জিটা পাকড়ে তিনি বললেন—"ওফ্! যা ভিড় বাড়ত্যাসে—চলেন চলেন আর দেরি না।"

চরের ভিড় ঠেলে জলে নেমে, জল পার হয়ে পাড়ে উঠতে গিয়েই মুশকিল বাধলো। ভট্‌চায্যি আগে উঠলেন, হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে জুতোজোড়াও নিয়ে নিলেন, তারপর আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন...কিন্তু দ্রুত নেমে আসা মানুষের স্রোতের চাপে তাঁর বাড়ানো হাতটি কোথায় মিলিয়ে গেল। আর তাঁকে দেখা গেল না। আমি এখনও হাঁটুজলে। এখানে পাড়টা খুবই উঁচু, বুকসমান খাড়াই। এবং অসম্ভব পিছল। আমার পক্ষে নিজের চেষ্টায় পাড়ে ওঠার প্রশ্ন নেই। অতএব পুঁটলি ও চশমা একহাতে আগলে, —অন্যহাতটা ভিক্ষে চাইবার মতন ওপর দিকে বাড়িয়ে দিই। এবং সামনেই দাঁড়ানো মাথায় পাগড়ি বাঁধা বিরাট গোঁফ ঝোলানো রাজস্থানী চাষী চেহারার লোকটিকে আপ্রাণ অকাভাকি শুরু করি—"ও ভাইসাব! মুখে জরা উঠা লিজিয়ে না? বহোৎ উঁচা হ্যায়। ম্যয় অকেলী নহীঁ সক্‌তী হুঁ!"

খুব কড়া-পড়া আর নিশ্চিত করা একটা শক্ত মুঠোর মধ্যে আমার হাতটা চলে গেল—তারপর এক হ্যাঁচকা টানে সোজা পাড়ে। 'ভাইসাব' সত্যি সত্যি ভালো লোক—হেট্ হেট্ করে চেঁচিয়ে বাকিয়ে ভিড়ের মধ্যেই একটুখানি ফাঁক তৈরি করে ঠেলেঠুলে আমাকে আরো খানিকটা ওপরদিকে জবরদস্তি তুলে দিলেন। নিশ্বাস নিয়ে, সামনে তাকিয়েই দেখি ঝলমল করে উঠেছে ভিড়ের মাথা ছাড়িয়ে একটা চমৎকার রুপোলী ত্রিশূলের চূড়ো। যেন স্বপ্নে দেখা কোন দেশের ইস্টিশান।

—"কানাই মহারাজ!" ভুলেই গিয়েছি তাঁর কথা, দলের কথা। প্রায় একই সঙ্গে একটা চীৎকার কানে এল—"নবনীতা! নবনীতা!"

—"ভট্‌চায্যি মশাই? এই যে, এই তো আমি!"

কানাই মহারাজ ঐখানেই রইলেন। আমাদের দূরে একটা বড় লাল আলোর দিকে হাত তুলে

BanglaBook.org

দেখিয়ে বললেন, এবার ওইখানে যেতে হবে, ওখানেই বাঁদিকে বেড়ার মধ্যে আরেকজন মহারাজ আছেন, দুহাতে দু'রঙের দুটো ফ্ল্যাগ দোলাচ্ছেন। সেখানে তাঁর চার্জে মালপত্র, এবং বাকি সবাইকে পাওয়া যাবে। পুঁটলিবাঁধা 'চেঞ্জ'তো ভিজে একশা। গায়েও একপো জরি ভিজে একমণ হয়েছেন। অঙ্গ যেন চলে না। ভিজে পেটিকোটে পাদুটি সপ্রেমে জড়িয়ে ধরেছে, যেন শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণলীলা—ওদিকে ভিজে ব্লাউজ বুকে হাড়-কাঁপানো চমক দিচ্ছে, যেন নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বৈদ্যুতিক শাস্তির খেলা, আর ভিজে আঁচল সর্বাঙ্গে মহাপাপের মতো লেপ্টে আছে। উপরন্তু বৃষ্টি পড়ছে প্রাচীন চীনে শাস্তির মত ছুঁচ ফুটিয়ে। রামকৃষ্ণদেবের কথাটাও মনে পড়লো, গঙ্গায় ডুব দেবার সময়ে পাপগুলো উড়ে গিয়ে গাছের ওপরে বসে থাকে, মাথা তুললেই ফের আমাদের অঙ্গে এসে ঢোকে। তা আমার পাপগুলো ওজনে দশগুণ বেশি ভারী হয়ে ফিরে এসেছে।

—"আপনি কী করেন ভট্টাচার্যিমশাই?"

—"আমি? রেঙ্গে ফেরম্যানের কাজ করি।"

একটু অবাক না হয়ে পারি না। আমার পাণ্ডাটি তো ভালো!

—"আসবেন নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িতে, আমার স্ত্রী, আপনার বৌদিদি, আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবেন। আর আমার ছেলেমেয়েরাও। রেলোয়ে কোয়ার্টার্সেই থাকি। নেমে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে।"

—"আমি ওখানে গেলে নিশ্চয়ই আসবো আপনার বাড়িতে। আপনাকে জানাতে তো আমার স্নান হলো।"

—"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

—"করুন?"

—"আপনি এরকম একা একা কোন্ সাহসে এলেন বলুন দেবি?"

হায়! আবার?

—"এই তো আপনাদেরই ভরসায়।"

—"ওটা একটা কথা?"

—"ওটাই আসল কথা।"

—"আপনি বড় অদ্ভুত মেয়ে! আপনার কী সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছে?"

—"সন্ন্যাসী হতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার দুটি মেয়ে আছে না?"

—"এ্যাঁ? মেয়ে?"

—"বয়েস হয়েছে, বিয়ে হবে, বাচ্চা হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।"

—"আপনার মিস্টার আপনাকে একা ছেড়ে দিলেন? এই ভিড়ে? আশ্চর্য! মিস্টার কি করেন?"

—"পড়ান।"

—"কলেজে?"

—"হ্যাঁ।"

—"কোন্ কলেজে?"

—"বিলেতে।"

—"ও বাবা! তা আপনিও কেন বিলেতে থাকেন না?"

—"বিলেতে থাকলে এখানে আসতুম কি করে?"

—"তা বটে। তবু মিস্টারকে ওখানে একা রেখে দেওয়াটা—তাঁকে যত্নআত্তি করারও তো একটা লোক চাই।"

BanglaBook.org

—"তাঁকে যত্নআত্তি করার লোক সেখানে আছে।"

—"এঁা?"

—"হ্যাঁ।"

এবার দুমিনিট নীরবতা পালন। তারপর:

—"ওঃ। বুঝেছি! তাই আপনার এই যৌবনে যোগিনী বেশ, এই সংসারে বিরাগ। ওঃ হোহো! তেরি তেরি সরি!"

—"কী মুশকিল, এতে আপনার কী দোষ? তাছাড়া সংসারে বিরাগ-টিরাগ আমার মোটেই নেই। খুবই সংসারী আমি। আপনি একদম ভুল বুঝেছেন ভট্টাচায্যিমশাই।"

—"বললেই তো হলো না। যেভাবে এত দামী বেনারসীটাতে আপনি জলেকাদাতে অনায়াসে মই ফললেন, —মেয়েরা কাপড়চোপড়-কে—"

—"তাতে আমিও খুবই দুঃখিত। কিন্তু এটা দক্ষিণী শাড়ি, ঘরে কেচে ফেললেই ঠিক হয়ে যাবে।"

মাত্র এই ক'ঘণ্টায় কতজনে মিলে আমাকে নিয়ে কত ধরনেই যে উদ্বিগ্ন হয়েছেন!—আরও একটা কুম্ভস্নানের সমান সমান পুণ্য তাঁরা অর্জন করে ফেলেছেন একটি অচেনা অনাত্মীয় মেয়ের শাড়ি ও স্বামী সংরক্ষণের আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষায়। জীবনে এতখানি ইম্‌পর্ট্যান্ট আর পাইনি আমি। ধরা-ধরা গলায় ভট্টাচায্যি হঠাৎ বলে ওঠেন—"দেখুন, ভগবান আছেন। একদিন আপনার দুঃখ তিনি নিশ্চয়ই ঘোচাবেন। এই পুণ্যতীর্থে দাঁড়িয়ে আমি আপনাকে বলে দিলাম। আপনি সেদিন দেখে নেবেন। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেই।"

উত্তরে চুপ করে থাকি। কি বলবো, ধন্যবাদ?

এই আমাদের দেশ। এ কেবল ভারতবর্ষেই সম্ভব। যাকে জীবনে চিনিনে তারই জন্যে বুকটা ফাটিয়ে ফেলি। যেমন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অন্যকে উত্তক্ত করতে আমাদের জুড়ি নেই, তেমনি অন্তর থেকে মধু ঢেলে অন্যের ঊষর জমিতে আবাদ করাও আমাদের চরিত্রে স্বাভাবিক। এ দুটোর কোনটাই পশ্চিমী সংস্কৃতিতে সভ্য আচরণবিধির অন্তর্গত নয়। পশ্চিম থেকে ধার করা আমাদের শহুরে সংস্কৃতিতে এগুলি গ্রাম্যতা-দোষ বলেই পরিচিত। আমার মনোবাঞ্ছা যে কী, তা ভট্টাচায্যি জানেন না, কিন্তু ধরে নিয়েছেন, জানেন। যেহেতু সেটা ওঁর মনোবাঞ্ছা। আমি মেমসায়েব নই, তবুও দেশের মানুষের অপার কৌতূহল ইদানীং আমাকে বড়ো কষ্ট দেয়। কিন্তু দেশের মানুষের আসল চেহারাও আমি চিনেছি এই প্রসঙ্গেই। ধুলোয় শোওয়া নির্বান্ধব মেয়েকে এরাই তুলে আনে দলের আশ্রয়ে, জলে-পড়ে-যাওয়া অজানা মেয়েকে এরা শক্ত হাতে জল থেকে ডাঙায় ওঠায়, পথক্লান্ত নামগোত্রহীনকে এরাই আপন কম্বল পেতে জায়গা করে দেয় একটুখানি শোবার। আবার একা একা যুবতী মেয়ে কুম্ভে যাচ্ছে শুনে, চায়ের গেলাস ঠক্ করে নামিয়ে রেখে এরাই সে-তল্লাট ছেড়ে পলায়ন করে।

খোলা মাঠ দিয়ে প্রচণ্ড কনকনে উত্তুরে বাতাস ছুটে আসছে; বৃষ্টি বাড়ছে। গরমজামাগুলো সবক'টা টপাটপ্ গায়ে দিয়ে ফেলেছি ভিজে পোশাকের ওপরেই। শীতে জমে গিয়ে ফোড়ার মত টাটিয়ে উঠেছে মোজাহীন পা ভিজে টুসটুসে জুতোর মধ্যে। কে বলবে আজ অমাবস্যা। এত আলো, যেন ইন্দ্রসভা। টর্চ ব্যাগেই রেখে এসেছি। নদীর পাড়েই শুধু নয়, জলেও অন্ধকার নেই। পুরো সঙ্গম অঞ্চলটি জোরালো ফ্লাডলাইটের আলোয় ঝলমল করছে। তার মধ্যে ভিজে জামাকাপড় বদলানোর যথেষ্টই অসুবিধা। মাঠেও আলো যথেষ্ট, দূর থেকে কুম্ভনগরের তাঁবুর আলোর মালা দেখা যাচ্ছে। এখান দিয়ে সহস্র মানুষ স্নান সেরে ফিরছেন—ছুটে ছুটে। সকলেই দাঁতে কাতর। সকলের গায়েই ভিজে কাপড়। সেদিকে তাকিয়ে নিজের শীতের কষ্ট কমছিল—তবে

আমার জলে-টইটুম্বুর তিনসেরি ওজনের শেকল-পরানো পোশাক-পরিচ্ছদের চেয়ে ভট্‌চাযির মুক্ত গা নিশ্চয় ঢের আরামের।

একসময়ে দুটি ফ্লাস্ক হাতে বৃদ্ধ স্বামীজী দিগন্তে পরিদৃশ্যমান হলেন। উল্লাসের হল্লা তুলে আমরা তাঁর দিকে ছুটে গেলুম। এবার শুকনো পোশাক পরা যাবে! কিন্তু পোশাক বদলাবো কোথায়? সর্বত্রই তো জোর আলোর খেলা। নাঃ, বাঙালী মেয়ে হয়ে জন্মানোর দু'একটা অসুবিধে সত্যি সত্যিই আছে। সবখানে ইকোয়ালিটি চলে না। সুটকেস থেকে শেষ শুকনো শাড়িটি বের করে নিলুম বটে কিন্তু লজ্জা-শরম বড় বালাই। কোনরকমে চোবকান বুজে এই ভিড়ের মধ্যেই মেয়েদের দলে লুকিয়ে টুকিয়ে শুকনো শাড়িটুকুনি ওপর-ওপর জড়ানো হলো। কিন্তু অন্তর্নিহিত ভিজে বসনগুলি যেমনকে তেমন—হৃদিস্থিত হৃষীকেশের মত, অন্তরঙ্গেই রয়ে গেলেন। অন্য স্নানার্থীরা বুদ্ধি করে কেমন প্লাস্টিকের থলে এনেছেন, আমার তো কিছুই আয়োজন ছিল না; অগত্যা ভিজে কাপড়ের রাশি তোয়ালে জড়িয়ে এক ধ্যাধ্যেড়ে পুঁটলি করে নিলুম। ওরেব্বাবা, কী দুশ্মনী ওজনই হয়েছে। ওয়ার্ল্ড হেভী-ওয়েট-কিকটিং চাম্পিয়ানশিপের মহড়া দিতে দিতে ফিরতে হবে এবার। এটিকে বহন করা অপরাধবোধ বয়ে বেড়ানোর চেয়েও দুরূহ হবে বলে মনে হচ্ছে।

সবাই এবার চিরুনি বের করে চুলটুল আঁচড়াচ্ছেন। আমিও দেখাদেখি একটুখানি আঁচড়াই। ব্যাপারটা সুবিধার নয়—এদিকে ভেতরে সবকিছুই জবজবে ভিজে, হিহি করে কেঁপে হাড়ে দুব্বো গজাচ্ছে, বাহার করে ওদিকে চুলের টেরি ফেরানো হচ্ছে! এবার এল যেখানে যা গয়নাগাঁটি পরবার, সেসব পরে নেবার পালা। অর্থাৎ হাতে হাতঘড়ি, নাকে চশমা, আঙুলে আংটি, কানে মাকড়ি—একে একে ইহজাগতিক সম্পত্তিগুলির সব দখল নিয়ে নিয়েছি। না, কোনটাই খোয়া যায়নি। কেবল শালের ওপর এতক্ষণ আরো বৃষ্টি পড়েছে, ফলে সেটিও প্রায় স্নানের কাপড়চোপড়ের মতোই ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে। এবং শীতে প্রোটেকশন দিচ্ছে না।

হঠাৎ মাটিতে কী একটা দেখতে পেয়ে অঞ্জনার মা চেঁচিয়ে ওঠেন, "ওমা, এটা কার সোনার মাকড়ি?"

দেখে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলি—"দেখুন, দেখুন—কার আবার সোনা হারালো!"

—"কার আবার সোনা হারালো?" বৌদি এক নজর তাকিয়েই দাবড়ে তেংচে ওঠেন—"এইবারে মারবো একটি গাঁট্টা! ছি ছি ছি—এই ন্যাকা মেয়ে একা একা কুম্ভে এসেছে? দ্যাখ্‌দিখি নিজের কানে হাত দিয়ে, কার সোনা হারিয়েছে?" বকুনি খেয়ে তাড়াতাড়ি কানে হাত দিই। কথায় কথায় এই যে "একা-আসার" খোঁটা খেতে হচ্ছে আমাকে, ওইটুকুই যা একা আসার অসুবিধে। নইলে 'একা' আর কোথায়? শহরেই বরং আমার অনন্ত নিঃসঙ্গতা। কানে হাত দিয়েই দেখি—ওমা, সত্যিই তো এক কান খালি? শীতে-টিতে ঠিকমত করে খিলটা আঁটা হয়নি আর কি। হেঁহেঁ করে মাকড়িটা ফেরত নিতে হাত বাড়াই। বৌদি হাতে একটা আলতো চাঁটি মারেন, নকল রাগ করে বকেন—

—"বলি ও মেয়ে, চোখে দেখেও চিনতে পারলে না যে গয়নাটা নিজের? এ মেয়ের কী হবে গো!"

আমি যে চোখে দেখেও কিছুই চিনতে পারি না তা তো বৌদি জানেন না? জীবনে অনেক কিছুই আমার এই দুটো অকর্মণ্য চোখের সামনে দিয়েই প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে, আমি যা দেখতেও পাই না, চিনতেও পারি না। জীবনে সোনা-হারানো আমার অভ্যেস হয়ে গেছে!—তেমনি সোনা কুড়োনোও তো সম্ভব? এই বৌদি আর অঞ্জনার মায়ের মতো দৈব তো জগতেই আছে? কথা ঘুরিয়ে নিতে বলি——"অঞ্জনার জলে নামতে শীতের ভয় করলো না? এই ভিড়ে অতটুকু বাচ্চা—"

BanglaBook.org

—"কোথায় ভয়? গঙ্গাউৎপাতে কতগুলো যে ডুব দিল তার ঠিক নেই।"

সত্যি, অঞ্জনাকে বুকে নিয়ে অঞ্জনার মা যে কী করে একা একা এই ভিড়ে নেয়ে এলেন, ঈশ্বর জানেন। স্নানের সময়ে সঙ্গে বৌদিও ছিলেন না। ওর বাবাও ছিলেন না। অঞ্জনার মা একগাল হেসে বললেন,—"ওমা, আমার মেয়েটা খুব শক্ত। সেই তো ভিড় ঠেলেঠুলে জায়গা করে জলে নামালে আমাকে। টেনেও ও-ই নেয়েই তুললে।"

—যাঃ বাবা! নাঃ, একেই কিরাক্ত বলে! অঞ্জনার মায়ের হাসিটি খুব মিষ্টি, প্রাণখোলা। অঞ্জনাও মায়ের মতোই মিষ্টি মেয়ে—সে যে অত শক্তপোক্ত, তাকে দেখে তা বোঝা যায় না। কত আর বয়েস, সাত-আটের বেশি নয়। এক গোছা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল এখন ভিজে মুখের চারপাশে সেঁটে আছে। মুখের হাসিটি মায়ের মতোই অনির্বাণ। আর বৌদি ঠিক যেন জগজ্জননী। মুখে সর্বদা পানদোক্তা আর হাসি ঠাসা, ঠোঁটটি হৃদয়ের রঙে টুকটুক করছে।

ইতিমধ্যে গায়ে একটা গামছা, কোমরে একটা গামছা, শীতে কাঁপতে কাঁপতে মেসোমশাই এসে উপস্থিত। "ও দিলীপ, আমাকে স্নান করিয়ে দাও। আমি তো ভিড়ে জলে নামতেই পারলাম না। দাঁড় এমন পিছল, ঈষৎ পড়ে গিয়েছি। বড্ড কোমরে লেগেছে বাবা।"

অমলবাবু বললেন—"আমি ওষুধ দিয়ে দেব মেসোমশাই—"

দিলীপ ছুটল মেসোমশাইকে নিয়ে স্নান করতে। আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম বৃষ্টির মধ্যে, মাল পাহারায়। গতবারের প্রহরীরা এখন স্নানে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই ফিরে আসেন। মালপত্তর পুনরায় ধাড়ে ওঠে—'জয় কুন্তু' হাঁক দিয়ে মিছিল-ফেরত যাত্রীরা ভয় তাঁবুর দিকে। তীর্থযাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধন আবশ্যিক। সেটা এইভাবেই হয়ে গেল। ভারী ভিজে কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে এবারে এই শীতে হাঁটতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে সকলের। তাড়াহুড়োতে সঙ্গমে আমার কী হাই জলে নামাই যে হলো। এখন ভেবে দেখলে ছবিটা রীতিমত চমকপ্রদ—(১) পরনে জরিদার ভারী একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে যাবার পোশাকী কাপড়। (২) তিনরকম সাইজের তিনটে সোয়েটার গায়ে, (৩) চোখে চশমা। (৪) কোমর থেকে জলের নিচে রয়েছে প—তাতে একজোড়া হিলতোলা জুতো, এবং (৫) দুজোড়া গরম মোজা। (৬) বগলে শুকনো কাপড়ের ভিজে পুঁটলি। পুণ্য প্রয়াগসঙ্গমে গামছা-পরা স্মার্ট স্নানার্থীদের ঠিক মাঝখানে কোমরজলে হতভম্ব দাঁড়িয়ে রয়েছি। বেমানান, কিন্তু কৃতার্থ।

এই আমার অনৈসর্গিক কুম্ভস্নানের ক্লোজ-আপ ছবি।

পরের দৃশ্যটি তো আরো রোমহর্ষক, অঞ্জলিতে একপাটি চটিজুতোসমেত তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণ করে ফেলেছি। কিন্তু অশ্রদ্ধায় অবহেলায় নয়। রীতিমত ভক্তিভরে। অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে। চটিজুতোটা নেহাতই অ্যাকসিডেন্টাল। এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ।

মা অবশ্য এ খবরটা শুনে আমাকে মারতে উঠেছিলেন। এবং পইপই করে বারণ করেছিলেন এটা লিখতে। লোকে নাকি ভুল বুঝতে পারে। মা সম্প্রতি ঠেকে শিখেছেন, সত্য কথাও সবার কাছে বলতে নেই—সত্যের শত্রু অনেক। আবার আমাদের মতো বলহীন ব্যক্তিদের জগতে একমাত্র বন্ধুও যে ওই—সত্য। একদিন না একদিন সে ঠিকই আশ্রয় দেয়, রক্ষণাবেক্ষণ করে। বলীয়ান করে তোলে।

ফেরতপথে সত্যিই রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়া হলো, মাঠের মাঝখান দিয়ে। একপক্ষে ভালই—এখন স্নানার্থীদের মিছিল আর স্নানযাত্রীদের মিছিল ভিন্ন ভিন্ন পথে চলেছে। যাতায়াতের ভিড় কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হবে এতে। যেখান দিয়ে হঠাৎ মোটা মোটা দড়ি হাতে কিছু পুলিশ এসে জোর করে আমাদের পথ বন্ধ করে দিয়ে মাঠে ঠেলে দিল, সেইখান থেকেই মেসোমশাইকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অমলবাবু ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে দুটি তরুণ পার্শ্বচর সব

BanglaBook.org

ছিল, মামু দিলীপ আর কানু দিলীপ। তারা অনবরত সান্ত্বনা দিয়ে চলল—মেসোমশাই নারী নন, অশিক্ষিত নন, নির্বোধ নন, অথর্বও নন—পরন্তু একটা জবরদস্ত অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অব বেঙ্গল ছিলেন তিনি, তদুপরি তাঁর পরনে পুরোদস্তুর কোটপ্যান্ট আছে। আর কি চাই? এতটা উদ্বেগের কি আছে? মেলায় অধিকাংশ মানুষেরই একসঙ্গে এতসব গুণাবলী নেই। বিশেষত কোটপ্যান্ট। কেননা স্নান সেরে ফেরার পথে পুরো পোশাক পরনে নেই কারুরই। ঊর্ধ্বাংশে শুকনো কোট, নিম্নাংশে ভিজে গামছা—এখানে এই ইউনিফর্মটাই বেশি প্রচলিত দেখা যাচ্ছে।

অমলবাবু তবু বলেন, "আহা, একটা চোখে যে ভালো দেখেন না! আর পড়ে গিয়ে তখন যে কোমরে একটু লেগেছিলো।"

মেসোমশাই কি আর সাধে—"অমলের মতো ছেলে কলিযুগে হয় না"—বলে প্রত্যেকের মনে গভীর হিংসে জন্মিয়ে দিচ্ছিলেন? কথাটা সত্যি।

১৩

স্নাতকোত্তর পর্ব

ছবির মত দৃশ্যটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে তীর্থযাত্রীর দল। সকলেরই কাঁধে অবশ্য মাল নেই। এটা শুধু আমাদেরই দলের বৈশিষ্ট্য। ভোরের চিহ্ন নেই, যদিও বিজলী আলোর আভায় আকাশ লালচে। আমার ভিজে কাপড়ের ভারী বাণ্ডিলটি কোন্ শুভার্থী কখন নিয়ে নিয়েছেন, আমি মুক্ত। ভিখুর মাথায় মেসোমশায়ের কিটব্যাগ এবং তার ওপরে বিরাট ভিজে কাপড়ের গন্ধমাদন পর্বত। ভিখু তবু নাচতে নাচতে যাচ্ছে, হাসতে হাসতে যাচ্ছে। ভগবান ওকে চোখের সামনে রেখেছেন—এ আমাদের মহাভাগ্য। দিলীপের পিঠে রুকস্যাক, আর মাথায় আমার সুটকেস। সে মেঠো গলায় মহানন্দে হাঁকছে—"হো—ই চুনু কো মা, তুই কাঁহা গইল রা? আরে ইধ্‌রি তো আ যা!"

বৌদি শুনে বললেন—"মরণ! কে না কে ছুটে আসবে এবারে, তখন ঠেলা বুঝবে!"

মাঠেও খুবই সন্তর্পণে হাঁটতে হচ্ছে—কাজলে পুণ্যস্নানের পবিত্রতা রক্ষা করা বেশ কঠিন—অনিবার প্রাতঃকৃত্যের উদারতায়। এক সময়ে তাঁবুপাড়া এসে পড়লো। বৃষ্টিতে ততক্ষণে আমাদের সবকিছু ভিজে জবজবে।—ঠিক দুটি ঘণ্টা লেগেছে স্নান সারতে। সকলের শরীরমনে তখন একটিই ইচ্ছে—শুকনো তাঁবুতে ঢুকে একটু পিঠ পেতে শুয়ে পড়া শুকনো উষ্ণ কম্বলমুড়ি দিয়ে। আর এক কাপ কড়া করে আদা দিয়ে চা।

কিন্তু তাঁবুর মেঝে জলে ভাসছে। পা ডুবে গেল। ভেতরে যেন বন্যা বয়ে গিয়েছে। ওরই মধ্যে যেখানটা একটু শুকনো, সেখানেই কম্বলজড়ানো মড়ার মতন মানুষ পড়ে আছে। এভাবে বহু মনুষ্যদেহ তাঁবুর যততত্র অনাদরে শয়ান। আমাদের শোবার ঠাঁই নেই। এরা কারা? দলপতি দাদা এসে এক হাঁকেই তাঁবু খালি করে দিলেন। নাঃ, ওরা কেউ নয়। ওরা বিনাভাড়ার জবরদখল পার্টি। বিনা প্রতিবাদে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল কম্বলজড়ানো কেউ-নয়-দের দল। এটা এত আশাতীত যে দেখে খুব কষ্ট হলো আমার। তারপরেই মনে হলো, ভাবনা কি—ওরা এখুনি আরেকটা খালি তাঁবুতে ঢুকে পড়তে পারবে। এখন অনেক তাঁবুই খালি। সবই স্নানে। তাঁবু তো পুকুর। মাত্র কয়েকটা শুকনো ডাঙা আছে। আমরা যে কজন মিলে পারি এক একটা শুকনো মাদুরে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি করে বসলুম কম্বলমুড়ি দিয়ে। উহুহু, কী শীত। জীবনে কখনো এত তীব্র তুহিন শীতের অনুভূতি আমার হয়নি।

তুহিন বরফের মধ্যে রহু গিয়েছি—নিশীথ রাতের সূর্যের দেশে গিয়ে মেরুজ্যোতি অবোধ

BanglaBook.org

কোরিয়ালিস দেখে এসেছি। মাইনাস উনত্রিশ ফারেনহাইটে গিয়েছি উত্তর মার্কিনে—প্রচণ্ড শীতে অসাড় নাকের ভেতরে সর্দিটাও জমে যেন আইসিক্ল হয়ে যাবার যো হয়েছে সেখানে। আর নাকটা যেন একটা আলগা ফল, মুখের ওপরে আলতো ঝুলছে—টুপ্ করে খসে পড়ে গেলেও জানতে পারবো না। কিন্তু সে শীতটা করেছে কেবল নাকেই। কেবল এটুকুই কিনা প্রকৃতির কাছে অনাবৃত। আর বাকী সমস্ত শরীর উষ্ণ। পায়ের আঙুলের ডগা থেকে কানের লতি পর্যন্ত বর্মে-চর্মে আচ্ছাদিত। শীত ঢুকতেই পারেনি কোনও ছিদ্রপথে। কিন্তু এই একটি রাত্রির চণ্ডাল শীত আমি ইহজীবনে ভুলবো না। আমার চামড়ার ঠিক নিচেয় যেন আরেকটা আমি তৈরি হয়েছিল। সেই অসহায়, অবাধ্য জড়পিণ্ডটা কেবলই কুঁকড়ে শিউরে শিউরে উঠছিল, আর অন্য যে কোন আরেকটা গরম জ্যান্ত কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়তে, উষ্ণ হতে চাইছিল। পোষা শরীরটা হঠাৎ বুনো শরীর হয়ে উঠে মনবুদ্ধিকে ঠেলে ফেলে আলাদা হয়ে যেতে চাইছিল। একটু গরম হাওয়া চাই। গরম হতেই হবে। কিন্তু না, মনবুদ্ধিকে ঠেলে আগুনে ফেলা তো অত সোজা নয়। লজ্জাকেই ঠেলা যায়নি যখন! ভিজে কাপড়ের অভিসম্পাতে রিক্ত আকিঞ্চন হৃদয়ভূমি। আর সেই প্রবল আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের কাঁপুনি ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল আমার বাইরেটাকে। দাঁতে দাঁত টিপে চোয়ালটা শক্ত করে এঁটে না রাখলে সত্যি সত্যি ঠকাঠক শব্দ হয়ে যাচ্ছে দাঁতে। আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে তার ভেতরে গরমাগরম নিশ্বাস ফেলে যে যার নিজস্ব শরীরে গরম হাওয়ার ইনসুলেশন তৈরী করছি। চায়ের প্রশ্ন নেই, দোকানপাট বন্ধ।

কিন্তু আমার শত্রু তো আমারই ভেতরে। সপসপে ভিজে বেশবাসের চেয়েও দুর্দান্ত সর্বগ্রাসী কামড়, বিবেকদংশনের চেয়েও কড়া। যতই কম্বলমুড়ি দিই, যেভাবেই গুটিসুটি হই না কেন, তার অন্তঃসলিলা আলিঙ্গনের হাত থেকে তো রক্ষে নেই। শীত যেন আমাকে লৌহচীম-চূর্ণ করে ফেলছে। প্রত্যেকটা স্নায়ুতে যন্ত্রণা। সর্বক্ষণ গভীরজলে তলিয়ে যাওয়ার মত যাতনাকীর্ণ তীক্ষ্ণ অনুভূতি। এই সময়ে কম্বল নয়, আগুন চাই —আগুন। হয় জ্বলন্ত ধুনি, নয় জ্বলন্ত শরীর। এই শীতের অন্তর্বর্তিনী দমন করতে যে উত্তাপ দরকার, তুচ্ছ কম্বলের তা দেবার শক্তি নেই। বৃষ্টিতে চারিদিকের সব ধুনি নিভে গেছে, সব কাঠ ভিজে গেছে। এখন আর বুঝে পাব না সেই সব ধুনি জ্বালানো সাধুজীদের। যেমন এই হৃদয় বুঁড়লেও ফিরে পাব না প্রথম যৌবনের উত্তাপ। এখন সিক্ত অরণির সময়। সন্ধ্যাবেলা আগুন পোহানোর স্মৃতিটা মনে আনার চেষ্টা করলুম, চেষ্টা করলুম প্রণয়ের উষ্ণতা স্মরণে আনতে। হায় রে, শীতের চোটে স্মৃতিও নড়তে চায় না। পিছু না হটে বুদ্ধি চায় কেবলই সামনে দৌড়ুতে। কখন পালাবো, কি করে পালাবো? এই বৃষ্টি তো সহজে থামবে না—এই ভিজে কাপড়ে আর কতক্ষণ থাকবো! শরীরের ওপরে যদিও বিশ্বাস হারানো পাপ, তবু এভাবে ভিজে কাপড়ে মুড়ে রাখলে শরীর আর কত সইবে। নিমোনিয়া না হোক, ব্রঙ্কাইটিস কি বাগ মানবে? শরীর তো আর সুষনি-কলমী নয়। এহেন অবস্থায় শুধু হরি হে, তুমিই ভরসা!

হরি ভরসা করবামাত্র মনে পড়লো আরো একজোড়া তো মোজা আছে! নেংরা হয়ে যায় বলে তিন জোড়া এনেছি। লাফিয়ে উঠে টর্চ জ্বেলে সুটকেস খুলে বের করলুম গরম মোজা। তাঁবুর বিজলীবাতি বৃষ্টিতে নিবে গেছে। সব তাঁবুই এখন অন্ধকার। কেবল মাঝে মাঝে দেশলাই জ্বলছে, জ্বলছে বিড়ি সিগারেটের লাল মুখ। আচ্ছা এই খড়ের গাদার মধ্যে এদের সিগারেট ধরানোটা কি ভাল হচ্ছে? একবার ভয় হলো। তারপর ঝেড়ে ফেললুম দুর্ভাবনা। জলেরও তো অভাব নেই। খড় তো ভিজে। যা হয় হোকগে। একটু আধটু আগুন লেগে গেলেও মন্দ হয় না। কে জানে, এমতাবস্থায় "কাশীর মহিষী কর্কশা"র ব্যাপারটা হয়ত অন্যভাবেও দেখা চলতে পারে! সেও মাঘমাস, এই একই অঞ্চল, নদীর ধার, হয়তো বৃষ্টিও...

পায়ে শুকনো মোজাজোড়া পরে যেন দেহে নতুন করে প্রাণ এলো, এবং বুকে বিবেক

BanglaBook.org

এলো। এলোপাতাড়ি কাঁপুনি একটু কমলো। মাতৃজঠরের মতো ওম্ হলো শরীরে। সেই সঙ্গে মনে পড়লো, একবার বহু বছর আগে, বাল্যকালে বাবা-মার সঙ্গে অস্ট্রিয়ায় বেড়াতে গিয়ে সাল্‌জবুর্গ শহরে ঢুকে এমনিই ভিজেছিলুম। সে কি শীত! কি কাঁপুনি! সেদিন হোটেলেই এক ডাক্তার দম্পতি উপস্থিত ছিলেন, কর্তা বাঙালী—তিনি আমাদের নিজের বাক্স খুলে ব্র্যাণ্ডি বের করে চামচে করে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই যত্ন, বাবা-মার স্নেহের কোল, সবকিছু জড়িয়ে নিজের নিশ্চিন্ত বালিকা-বয়সের জন্য হঠাৎ মন-কেমন করে উঠল। সেটা ঝেড়ে ফেলতে, "একটু ব্র্যাণ্ডি থাকলে খুব ভালো হতো" বলতেই অনেকগুলো সমর্থনসূচক শীতার্ত হাহুতোশ উঠলো অন্ধকার তাঁবুর ভিজে বাতাস দুলিয়ে। একটু বাদেই ঘরে কড়া ব্র্যাণ্ডির গন্ধ পাওয়া গেল। কিন্তু তার উৎপত্তিস্থলটা বহু টর্চ জেলেও কিছুতেই উন্মোচন করা গেল না। মন্তব্য অনেক ছোঁড়া হলো নিরুপায় হয়ে— "এটা সত্যি খুব কিন্তু স্বার্থপরের মতো কাজ হচ্ছে"—

—"সকলেই তো ভিজেছি!"

—"যেই হোন, মশাই, আপনার পুণ্য কিন্তু উপে গেল!" কিন্তু পঞ্চাশ-একান্ন চামচ ব্র্যাণ্ডি হয়তো সেই পাত্রে ছিল না, তাই তার মালিক ধরা দিলেন না। তাঁবুর অন্ধকার তাঁকে আড়াল করে রাখলো, যদিও তাঁর কর্মটি আড়াল করতে পারেনি।

এমন সময়ে মেসোমশাই ফিরলেন জবজবে ভিজে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে একজোড়া গরম মোজা ধার দিল কেউ, কেউ দিল মাফলার, কেউ বাঁদুরে টুপি। সদাপ্রত্যাগত বীর জওয়ানের মতো উৎসাহে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানানো হলো। মেসোমশাই হারিয়ে যাননি, তাঁকে ডিট্যুর করিয়ে আরও এক ভিন্ন অঞ্চলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। নাক ঘুরিয়ে এসেছেন তিনি। মেসোমশাইকে একটু কাত হতে দেবার জায়গা করতে গিয়ে টের পাই, তাঁবুর কিনারা দিয়ে হুহু করে জলস্রোত এসে আমার সর্বস্ব ভিজিয়ে দিয়েছে। ব্যাগ জলে ভেজা, সুটকেস বিগৎযানেক গভীর জলের মধ্যে দ্বীপের মতো ভাসছে, পটুর শাল ভিজে ন্যাতা। তোশকটাও ভিজে গেছে অনেকখানি। কি ভাগ্যি কম্বলটা ভেজেনি! দিল্লীতে মামাবাড়ির বিছানা থেকে আমি তো এই কম্বলটা স্রেফ তুলে নিয়ে চলে এসেছি।

আমার প্রাণ সেই কম্বলই রক্ষা করেছিল যাত্রায়। অভুর কম্বলটি গায়ে জড়িয়েই পরদিন সকালে রওনা হলুম অঝোর বর্ষণের মধ্যে, মালপত্র নিয়ে। শাল ততক্ষণে ভিজে কাপড়ের পুঁটলিতে চালান হয়েছে। ভিখুর হাতে দুটো দশটাকার নোট সসংকোচে গুঁজে দিয়ে আমি বললুম—"ভাই, তুমি আমার সুটকেসটা না নাও, ভিজে কাপড়টা কিন্তু নিও।"

ভিখু একগাল হেসে বলল—"তার জন্য টাকা কেন—অমনিতেই তো নিতাম দিদি!"

—"সেটা জানি বলেই তো এটা দেওয়া!" ভিখু ঐ দলের ভৃত্য। আসলে কিন্তু সেই মালিক। তারই আছে দীনদুনিয়ার মনিব হবার মতো দিল্। তার মুখের হাসি তার বুকের সুখ সকলেরই ঈর্ষার যোগ্য।

বেরুবার সময়ে সেবাশ্রমের দান-বাক্সে গুরুদীপের দেওয়া পাঁচটা টাকা রেখে এলুম। শুনলাম এঁরা গরীব তীর্থযাত্রীদের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছেন। ওতেই তোমার 'পুজো' দেওয়া হবে গুরুদীপ, ওতেই ঢের পুণ্য।

১৪

স্বর্গ থেকে ফেরা

অবরোহণ পর্ব

রওনা হয়ে পথে চলতে চলতে শুনতে পেলুম দাদুর মুখে সন্ন্যাসীদের স্নানযাত্রার বর্ণনা। ওঁদের

BanglaBook.org

স্নান সেরে ফেরার পথেই সন্ন্যাসীরা শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন—ভোর পাঁচটায়। আমরা তাঁবুর ভেতর থেকে কেউ আর নড়তে পারিনি শীতের দাপটে। মরুভূমিতে বালির মধ্যে উটের মত কম্বলের আশ্রয়ে অসাড় হয়ে পড়েছিলুম মাদুরের ওপর ওই সময়টাতে। দাদু বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন আনন্দময়ী মাকে, দেখেছেন চারজন শঙ্করাচার্যকে, আরো কত বড় বড় সাধক-সাধিকাদের। প্রথমে ছিল নাগা সন্ন্যাসীদের লাইন, একজন নাগা সাধুমহারাজ ত্রিশূল দিয়ে জল স্পর্শ করার পরেই "কর্ম্যাল ওপনিং" হলো সাধুস্নানের। শুনেছিলুম ঐ সময়ে সংসারী মানুষদের সঙ্গমের ধারেকাছে যেতে দেওয়া হবে না। সকাল ৫টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সঙ্গম রিজার্ভ করা থাকবে শুধু সাধু-সন্ন্যাসী এবং তাঁদের চেলাদের জন্যে। শুধু গঙ্গা বা শুধু যমুনায় অবশ্য যে কেউ স্নান-সাধুরা নাইতে পারেন, কিন্তু খাস সঙ্গমে মেম্যানদের স্নান তখন নট অ্যালাউড। যাতে আগের মত অসংযত ভিড়ের গোলমাল না হয় তাই এই ব্যবস্থা। আমরা যখন তাঁবু ছেড়ে বেরুলুম তখন সকাল হয়ে গেছে, প্রায় সাতটা বাজে। অথচ বৃষ্টির জন্যে মনে হচ্ছে যেন ব্রাহ্মমুহূর্ত। শীতে-ক্লান্তিতে কিছুই ভাবতে পারছিলুম না প্রথমটায়। সামনে কানের কাছে একটানা চীৎকার করে যাচ্ছে পুলিশের মাইক। অন্যান্য মাইক সব এখন বন্ধ। মাইকের ঘোষণার ভাষা সবই এক: সেই "বিবৃজুকী মা, গাঁও মতিয়াপুর, জিলা দ্বারভাংগা—আপকো রিশতেদারোঁ ইধর খড়ে হেঁ, আপ পুলিশ চৌকী পর আ যাইয়ে..." চলেছে, হঠাৎ একটা শব্দ ঝন্‌ঝনাৎ করে কানে বাজলো—"পাদ্মু গাইন, পাদ্মু গাইন, গাঁও বোরোদিঘির চৌক্, জিলা চৌব্বিস পরগনা, আপকো লিয়ে হরিহর গাইন ইধর খড়া হ্যায়। আপ পুলিশ চৌকী পর...পাদ্মু...সারি পোদমো গাইন, আপকো পতি হরিহর গাইন..."

আমার বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠলো কান্না। পদ্মা গায়েন কি হিন্দী জানে? সে কি শুনতে পাবে তার নাম? সে কি বুঝতে পারবে পুলিশের নির্দেশ? অতদীঘির শাঁখাসিঁদুর নথনোলক পরা শ্যামলা বৌটি কোথায় হারিয়ে গেল এই অমানুষিক মানুষের ভিড়ে?

ইতিমধ্যেই আবার বেজেছে—টগরবালা দাসী, টগরবালা দাসী, গাঁও বিষ্টুপুর, গাঁও বিষ্টুপুর, জিলা মেদিনীপুর...আপকো লিয়ে আপকা লড়কা... আমার কানের ভেতর এবার ঝন্‌ঝন্ করে কাচভাঙার শব্দ হয়েই চল্‌ল। বৃদ্ধা টগরবালা দাসীকে কি করে খুঁজে পাবে তার ছেলে? বাংলায় ডাকা যায় না? যার যার আত্মীয় হারিয়েছে সে কি গিয়ে ডাকতে পারে না? বাংলায় হরিহর গায়েন বলতে পারে না—"অ পদ্ম-বৌ, কাছাকাছি যে পুলিশটাকে দেখতে পাবে, তার কাছে চলে যাও গো, ভয় পেও না। আমি এক্ষুণি আসছি। ভয় নেই। আমি এখানেই আছি।" মাইকে টগরবালার ছেলে কি বলতে পারে না—"টগরবালা দাসী, গ্রাম বিষ্টুপুর, জেলা মেদিনীপুর—যাগো—আমি তোমার খোকা বলরাম মণ্ডল বলছি, যে কোন একজন পুলিশের কাছে চলে এসো মা। তোমাকে আমি এক্ষুণি খুঁজে আনছি। একটুও ভয় নেই মা। তোমার খোকা আসছে।"

একঘেয়ে সুরে ঐ যে শব্দব্রহ্মের মত ঝনঝনিয়ে হিন্দীঘোষণা বেজে চলেছে, ক'জনের তা বোধগম্য হচ্ছে কে জানে?—ওগো পদ্মা গায়েন, হাঁগো টগরবালা—কি ভয়ানক ভয়ই না পেয়েছো তোমরা—এই বিভাষী মানুষের মাথাসমুদ্রে কোথায় ডুবে গেছে তোমরা—ডাক তোমাদের কাছে পৌঁছচ্ছে তো, কান্নায় বন্ধ হয়ে যায়নি তো কণ্ঠস্বর? শুনতে পেয়েছ তো তোমাদের আপনজনদের আকুলতা?-ওঃ কি ভিড়! শহর থেকে জনস্রোত আসছে প্রবল বন্যার মতো—সারা পথ জুড়ে। আর ডানদিকে একটি ক্ষীণ ধারা—আমরা যারা মেলাপ্রাঙ্গণ ছেড়ে যাচ্ছি। আজ ফিরে যাবার লোক খুব কম। সকলেই আসছেন। আজই তো সেই বহুপ্রতীক্ষিত উনিশে জানুয়ারী, মৌনী অমাবস্যার স্নান। আজ ছাপানো সরকারী বইতেও এক কোড় স্নানার্থীর আগমন সম্ভাবিত। কার্যত হয়তো আসবে আরো বেশি। তার পরের দিন বারাণসীতে বিশ্বনাথের গলির সামনে

BanglaBook.org

একটা চায়ের দোকানে বসে চা আর জিলিপি খেতে খেতে কাশীর একটা হিন্দি খবরের কাগজে রিপোর্ট পড়েছিলুম, ঐদিন এককোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন প্রয়াগে। বারাণসীতেই রোজ ঢুকছেন চল্লিশ লক্ষ, বেরুচ্ছেন চল্লিশ লক্ষ।—সে ভিড়ও আমি অবশ্য দেখে এসেছি। সে ভিড়ও ঠিক কল্পনীয় নয়। কাশীর কুম্ভ। তবে বারাণসীতে দড়ি দিয়ে ঢোকা বেরুনোর রাস্তা ভাগ করা ছিল পথে। এখানে সব পথে সেটা ছিল না। না থাকায় যথেষ্টই অসুবিধে হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁধ বলে একটা উঁচু জায়গায় উঠে এলুম। ওপরে উঠে একবার পিছনের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েই আবার ছাঁৎ করে উঠল বুক। কালকের গোধূলিবেলায় যে দৃশ্য দেখেছিলুম—আজ এই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে, এই সকালবেলার বাদল আঁধারে—তার আরেকটি চেহারা। অবনঠাকুরদের জাপানী আর্ট শেখার পরে আঁকা ওয়াশের ছবিগুলির মতো, বৃষ্টির সাদাটে ওয়াশের চাঁদোয়া ঝুলে আছে আকাশ থেকে, তার নিচে যতদূর চোখ যায় তাঁবুর পরে তাঁবু। আজ জল আর চর আলাদা করা যাচ্ছে না—সব রেখাই অস্পষ্ট, সবটাই একটা আবছা কুয়াশার অলীক চাদর জড়ানো রহস্যলোক—সাদাটে তাঁবুগুলোকে মরুভূমির মধ্যে বসিয়ে নিয়ে দেখতেও অসুবিধে নেই কিংবা বিশাল সমুদ্রে অজস্র পালতোলা জাহাজ বলে ভাবতেও অসুবিধে নেই—কিংবা বিপুল এক দঙ্গল ব্যাঙের ছাতার সমাবেশও মনে করা যেতে পারতো, কিন্তু সেটা মনে করা যাচ্ছে না। তার কারণ যতদূর চোখ যাচ্ছে কেবল মানুষ। 'সরীসৃপ' শব্দটা মনে পড়ে যায় এই দীর্ঘ সর্পিল সচল মিছিলটার দিকে তাকিয়ে—ফুটকি ফুটকি ফুটকি ফুটকি রঙিন মানুষ—লাখো লাখো ফুটকি মানুষ, পয়েন্টিলিস্ট শিল্পীদের ফুটকি দিয়ে আঁকা ছবির মতো। কুম্ভনগরের এই এতগুলি মানুষ যাঁরা ছিলেন ওখানে, যাঁরা আছেন, যাঁরা যাচ্ছেন—সকলের সঙ্গেই আমিও আছি—এ কথাটা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল। বিগত হাজার বছর ধরে যাঁরা এসেছেন, আগামী হাজার বছরে যাঁরা আসবেন, সেই অনন্ত আলায় আমিও রইলুম একটি পুঁতি হয়ে গাঁথা। ওগো পদ্মা গায়েন, ওগো টগরবালা, বিরজুকি মা, আর চুনুবাঈ—শোনো, তোমাদের সকলের সঙ্গে আজ থেকে আমিও রইলুম, আমিও আছি। জীবনে এমন ভাগ্য আমার আর কখনো হয়নি। কম্বলটা ভালো করে আমার কাঁধে জড়ানো—ভিড় করে কুম্ভনগরে দলে দলে ওই যাঁরা আসছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই বেশভূষা তাই। দেহাতী যাত্রীমানুষের সকলের গায়েই মোটা রুক্ষ কম্বল জড়ানো, কারুর মাথায় টিনের ট্রাংক, কারুর বগলে পোঁটলা, কাঁকে শিশু।

কোন্ আকুল বিশ্বাস তোমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে? পুনর্জন্ম নিরোধ? নির্বাণ কন্ট্রোল? তোমরা প্রত্যেকেই কি ছুটে এসেছো শুধু এইজন্যে, যাতে এই শীতাতপতাড়িত দেহকে উদ্বেগে আন্দোলিত অস্থির নশ্বরতাই তোমাদের শেষবারের দুঃখসুখ হয়? আর চাও না ফিরে আসতে ধানসিরি নদীটির তীরে, অথবা চৈত্রমাসের শালবনে?

ভাগিস আমার কোট আনা হয়নি, তাই তো কম্বলটা জড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে নকল করেও মিশে যেতে পারলুম! মরা-মরা করতে করতে একদিন রামনাম কি বলে ফেলবো না?

এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ হাহাকারে কান বিদীর্ণ হয়ে গেল। ওপাশে তাকিয়ে দেখি, দুটি শীর্ণ কুঞ্চিত হাত সামনের দিকে আশ্রয়ের জন্য বাড়ানো, গা থেকে কম্বল খসে খসে পড়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে—বলিরেখাঙ্কিত মুখ বৃষ্টি ও অশ্রুতে ভিজে এবং কান্না ও ভয়ে বিকৃত, —একটি উত্তরভারতীয় বৃদ্ধা—অঝোরে আর্তনাদ করতে করতে হোঁচট খেতে খেতে পড়ি-মরি করে অন্ধের মতো ছুটে যাচ্ছেন উল্টোমুখে। তাঁর ঠেলে-বেরুনো দুই বিগতজ্যোতি চোখে, বস্তুহীন মুখব্যাদানে আমি আতঙ্ক আর অসহায়তার যে প্রবল মূর্তি দেখেছি, তা আমাকে চিরকাল তাড়া করে ফিরবে। যন্ত্রচালিতের মতো থেমে দাঁড়ালুম কিন্তু বুঝতে পারলুম না, তাঁর জন্য আমি কি করতে পারি। তিনি মুহূর্তেই গভীর ভিড়ের মধ্যে ডুবে গেলেন। সমুদ্রের ঢেউ যেমন একটি

BanglaBook.org

ছেট্ট জেলে নৌকোকে টুপ্ করে গিলে ফেলে একটুও চিহ্ন না রেখে—তৎক্ষণাৎ আবার নিজের তরঙ্গছন্দে ফিরে যায়, ঠিক তেমনি করে নতুন নতুন মানুষের ঢেউয়ে চাপবাঁধা ভিড়ের মধ্যে কৃশকায়া বৃদ্ধার চীৎকার, তাঁর প্রসারিত হাতদুটি কোথায় মিলিয়ে গেল। কেবল ওই ভয়ার্ত মুখব্যাদান—মুন্‌খ্-এর সেই ভয়াল ছবি "The Cry"-এর স্মৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে আমার মনের পর্দায় একটা জ্যান্ত ছবি হয়ে গেঁথে রইল। আমি মনে মনেই আবার শুনে নিলুম একটি নতুন ঘোষণা—"বুধন সিংকী মা, গাঁও রাজদুয়ারা, জিলা গাড়োয়াল....."

মনটা ভয়ানক ভারাক্রান্ত, এমনি সময়ে হঠাৎ সামনে বাঁদিকে একটি বড় রাস্তার চওড়া মোড়ে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। তাতে স্পষ্ট নীলে সাদায় ইংরিজী হরফে লেখা—PRESS! লেখাটা দেখেই চলন্ত পা-দুটোয় আপনাআপনি ব্রেক কষে যায়। হায়! এতদিন যে বসেছিলেন পথ চেয়ে আর...সেই মোড়ে একজন পুলিশ আপন নাসিকার গহ্বরের গভীরে নিবিড় তর্জনী সমাহারে নির্ঘাৎ আত্মার অনুসন্ধানে ধ্যানস্থ। তার নিমগ্নতা দেখে বোঝা যায়—"The Kingdom of God is within you!"—তবু তাঁকে ডিসটার্ব করে, তাঁর ধ্যান ভেঙে দিয়ে প্রশ্ন করি—"ট্যুরিস্ট ব্যুরোটা কি এদিকে?" তিনি একগাল হেসে বলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো এইখনে। ও-ই যে দেখছেন তাঁবুগুলো, ওই হচ্ছে প্রেসের পাড়া। ওটা ছাড়িয়ে গেলেই ট্যুরিস্ট অফিস, গবর্নর বাংলোকে বগলমে! সিধা চলা যাইয়ে—পাঁচ মিনিট!"

মনের মধ্যে তখন প্রবল দোলাচল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবাস, আশ্রয়, চাই কি বন্ধুবান্ধবও।

একদণ্ড স্থির হয়ে ভাবি, থেকেই যাবো নাকি আরও একটা দিন? তুষারনগরের সরকারী আরামের দিকটা তো দেখা হলো না, শুধু কৃচ্ছ্রসাধনের সাত্ত্বিক দিকটাই শুধু, পুণ্যসঞ্চয়ের দিকটাই দেখলুম। আরেকটাও আছে, বিলাসের আর বিরামের দিক—রাজসিক আর তামসিক দিক।—সাহেব ভ্রমণকারী, প্রেসরিপোর্টার আর রাজনীতির V. I. P.-দের জন্যে শুনেছি "সুইস কটেজ" বলে একপ্রকারের রাজকীয় নীড় বাঁধা হয়েছে, তাতে আলাদা বসার ঘরে টি ভি, সোফাকৌচ, হীটার; দুটো করে শোবার ঘর, তাতে খাটপালঙ্কগোদের গদি—প্লাস বিলিতি বাথরুম। ক্যাম্পিং-এ বহু গেছি বটে কিন্তু এসব স্বর্গীয় ঐশ্বর্য তো জীবনে দেখিনি। মরচক্ষু সার্থক করে আসবো না কি? তাছাড়া এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিই বা আমি ঠিক কোথায়? কি উদ্দেশ্যে? সদ্যপরিচিত দলের সঙ্গে আপাতত বেনারস। একটি গাড়িতে ওঁরা মাত্র চারজন যাত্রী এসেছেন, আমাকে তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী, এছাড়া আশ্বাস দিয়েছেন যে একদম কলকাতা পর্যন্তই দলের অঞ্চলছয়ে আগলে রাখবেন। আমাকে বেনারস থেকে ট্রেন ও প্লেনে রিজর্ভেশনের ঝামেলা পোয়াতে হবে না। কুন্ত থেকেই সোজা গাড়ি চেপে বাড়ি। এই লোভটি এতই ভয়ানক হয়েছে যে মেসোমশাই আর অমলবাবুর গাড়ির দলে আমি নির্দ্বিধায় ভিড়েছি। তাছাড়া বেনারসে আশা করছি বৃষ্টি পড়বে না। এই ভিজে কাপড়ে আর পুণ্য করা নয়। মহাপুরুষরাও মাঝে মাঝে অসৈরণ সইতে নারেন। অবশ্য ট্যুরিস্ট-বাংলোয় গেলেও এসব সমস্যা মিটে যাওয়া উচিত—ডি কে বর্মণ, করমপাল সিং দুজনে আছেন। ওদিকে প্রেস ব্যুরোর চতুর্বেদী। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই। যাবো, না থামবো?

ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে পাশে এসে পড়েছেন মেসোমশাই। বললেন—"কি গো, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? দাঁড়ালেই বেশি ভিজে যাবে, হাঁটতে থাকো হাঁটতে থাকো"—

সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুদায়িত্বটি মনে মনে মেসোমশায়ের ওপরেই চাপিয়ে, শীতার্ত শরীরের তাড়নায়, সহজলভ্য শুকনো কাপড়ের লোভে আমি এবার কুম্ভনগরের মাটি ছেড়ে এলাহাবাদের সহরে রাস্তায় উঠে এলুম। এবারে যাত্রা—বারাণসী ধাম। যেটা নাকি এই মর্তলোকের ত্রিসীমার বাইরে, বাবা বিশ্বনাথের ত্রিশূলের ওপরে বিধৃত। যেখানে পাপ-পুণ্য বলে ঐহিক কিছু নেই। শুধু শিব—শুধু পরমার্থ

১৫

শয়ন পর্ব

শিবের ত্রিশূল

শিবের ত্রিশূলের পুরো গল্প অ'রেকদিন হবে। কাশীর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে একটি দোতলার ঘর পাওয়া গেল। সেখানে জোড়া তক্তপোশে শুলুম আমরা মোট ছ'জন।

অমলবাবু, তাঁর দুই দিলীপ, সমীর (সে আমার পুত্র হয়েছে), মেসোমশাই আর তাঁর পার্শ্টিতে আমি। যার কাছে যা চাদর-টাদর ছিল, বিছিয়ে চমৎকার ঢালা ফরাস হলো ঠিক বিয়েবাড়ির মতো। কম্বল প্রত্যেকেরই আছে, এমনকি আমারও। আর যার যা গরম জামা ছিল সেগুলো গুটিয়ে পুঁটলি পাকিয়ে মাথার বালিশ হলো। আমার সুটকেস থেকে শুকনো পোশাকপত্র বেরুলো—

আহ্, এখানে সভ্যজগতের সব সুবিধাই আছে। আছে শুকনো খাট, শুকনো মেঝে, আর পুণ্যবারিতে সপসপে ভিজে পোশাক খুলে শুকনো পোশাক পরবার মতো বাঞ্ছিত আড়াল। আর আছে পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে বাথরুম। জয় বাবা বিশ্বনাথ!

এখানে এসে কয়েক ঘণ্টা আগেকার কুম্ভনগরের অভিজ্ঞতাকে স্বপ্নই মনে হতো, যদি না থাকতো ভারত সেবাশ্রমের বারান্দাতেও কুম্ভের যাত্রীর ক্লান্ত ভিড়। তাঁরা মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। তাঁদের দেখেই বুঝতে পারছি স্বপ্ন নয়, কুম্ভনগর সত্য। আমি, মেসোমশাই আর সমীর বিছানা-টিছানা করে সবার ভিজে কাপড়গুলো টানা বারান্দায় মেলে দিলুম। অমলবাবুরা তিনজনে বেরুলেন খাবার কিনতে। আমার ফ্লাস্কে কুম্ভের জল না থাকাতে ভালোই হলো, কেবলই গরম চা ভরে আনা হতে লাগলো বাইরে থেকে। বোতলটায় ছ'কাপ পানি ধরে ঘণ্টা ঠাণ্ডা-গরম থাকে। অবশ্য কুম্ভের জল আমি এনেছি সঙ্গে, ভট্চাযের টিন থেকে ভরে। নইলে বাড়ি ফিরে মুখ দেখাবো কি করে? বাতের কাপসুলগুলো ঢেলে ফেলে দিয়ে তার শিশিটাতে ভরে নিয়েছি সেই পুণ্যবারি, ১৪৪ বছরের মধ্যে আর ত্রিভুবনে ও-জল মিলবে না তো!

বাজার থেকে খাবার নিয়ে যাঁরা ফিরলেন তাঁরা খবরও নিয়ে ফিরলেন। 'সন্দেশ' শব্দটি প্রকৃত অর্থেই সেদিন ব্যবহৃত হলো (পাঁড়ার প্রসঙ্গে অবশ্য!)—জোর খবর। তবে নিশ্চিত কিনা জানা যাচ্ছে না—ওঁরা শুনে এসেছেন লোকসভা ভেঙে দিয়েছেন ইন্দিরা, ভারতবর্ষে নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে।

দিনটা ১৯শে জানুয়ারি, তখন সন্ধ্যাবেলা। মৌনী অমাবস্যার পুণ্যলগ্নে ১৪৪ বছর পরে বিশেষ যোগটিতে যে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতাও অন্তরীক্ষে একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার পূর্ণ মর্মোদ্ধার করতে বিশে মার্চ হয়ে গেল। সেই সন্ধ্যায় খবরটাকে সত্যি বলে মনে করিনি আমরা। হাতে-নাতে এতখানি পুণ্যলাভ তো চট করে বিশ্বাস করা শক্ত! খবরটা শুনে উচ্ছ্বসিত না হয়ে, আপাতত ওটাকে "গুজবে কান দিবেন না" পলিসিতে শিকেয় তুলে রেখে, অনেক রাত পর্যন্ত কুম্ভস্নানের গল্প করতে করতে একসময় ঘর সত্যিই নির্বাক হয়ে গেল। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লুম আমরা। একটা টানা বিছানায় ছয় পরিবারের ছ'জন মানুষ। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিগুণ ধারা মিলিত হলো সেই পুণ্যতীর্থের প্রীতিময় নির্ভরতায়

১৬

পুনর্মূষিক পর্ব

বাড়ি ঢুকতেই মেয়েরা এসে জড়িয়ে ধরলো।

BanglaBook.org

—"মা, তুমি কুম্ভমেলায় গিয়েছিলে বুঝি? কি মজা! পোস্টকার্ড পেয়েছি তোমার। দিম্মা এদিকে কী ভীষণ ভাবনা করছেন! তুমি নাকি রেলের অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিলে? দিম্মা কেবলই তাই ভাবছেন।"

ইতিমধ্যে একটা ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে ঐ ১৮ই জানুয়ারি তারিখেই। কুম্ভের যাত্রীদের নিয়ে মোগলসরাই থেকে ট্রেনটি এলাহাবাদের পথে যাচ্ছিল। বহু যাত্রীর প্রাণহানি হয়েছে। মা কাগজে খবরটা পড়েছেন এবং ঐদিনেই আমার পোস্টকার্ডে জেনেছেন যে ঐ তারিখেই আমি কাশীতে পৌঁছে এলাহাবাদ রওনা হচ্ছি।

—"কিছু ভেবো না মা, যেমন করে হোক, আজ ঠিক এলাহাবাদে পৌঁছে যাবো"—পড়ে মার মাথায় হয়েছে বজ্রপাত! অস্থির হয়ে উঠে নানাভাবে মা চেষ্টা করেছেন তাঁর লোপাট হয়ে যাওয়া মহার্ঘ্য কন্যারত্নের সন্ধান করতে। সফল হননি। এমতাবস্থায় হাসি-হাসি মুখে আহ্লাদে গদ্‌গদচিত্তে অক্ষত শরীরে আমাকে ফিরতে দেখেই মা তো ক্ষেপে রাঙা টুকটুকে!

—"হাঁরে, তোর কি কোনও একটা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই?"—ওপনিং সেনটেন্স শুনেই বুঝেছি কিসে পা দিলুম। আমাদের বাঁধুনী প্রফুল্ল যখনই দেশে যায়, যেদিন তার ফেরবার কথা, তার বহুদিন পরে ফেরে। তখন মা যে স্পীচটা দেন, এটা তারই আরম্ভ। বাকিটা আমার মুখস্থ। তাই আত্মরক্ষার প্রণালীটাও আমার মুখস্থ। ঠিক প্রফুল্লর মত দুঃখী-দুঃখী মুখ করে সিঁড়ির থামটাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আঙুলে নখ খুঁটতে থাকি। নির্বাক।

—"ঠিক যেটা বরণ করা হয়েছে, সেইটিই করা চাই। নিজের ছেলে আছে দুটি সন্তান, —এবার বুঝবে মজা! ওরা এইবার বড় হয়ে উঠুক না। ছি ছি—ছি ছি—"

না, এটা অন্য স্পীচ। এটা আমার না-খেয়ে কলেজের চলে যাওয়ার স্পীচটাই মনে হচ্ছে।—উঁহু, তাও না। শেষ পর্যন্ত মা একটা আনকোরা নবীন স্পীচ দেন। কুম্ভ স্পেশাল।

আমার মাথাটা নাকি একেবারেই খারাপ। 'কিছু' যে অঘটন হয়নি, সেটাই 'অঘটন'। ভয়ংকর ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাটাই নাকি স্বাভাবিক ছিল। এই দুর্ঘটনাপ্রবণ ভূভারতে সেইটেই সহজ স্বাভাবিক, উচিত ব্যাপার হতো। এই যে আমি টোটো করে একা একা 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' ঘুরে এলুম, কেবল মানুষের কাছে আদর-আহ্লাদ, যত্ন-আত্তি, স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে, সেইটে তো একেবারেই অমানুষিক অঘটন মাত্র। কোটিকে গোটিক হয়।

আমি মাকে সান্ত্বনা দিতে তখন বলি,—"মা, তুমি প্রস্তুত থেকো কুম্ভে গিয়ে আমার কিন্তু দু'জন 'বাবা' আর একটি মেসোমশাই হয়েছেন।"

অগুণতি দাদা এবং ভাইদের কাহিনীটা বাদ দিয়েই বলি। —"এবং চমৎকার একটা ছেলেও হয়েছে আমার।"

মা থমকে যান।—"কী বললি? দু'জন...কী? কার আবার ছেলে হলো?"

—"ছেলে হয়েছে আমার আর দুজন বাবা হয়েছেন, সেও আমার। তাঁরা কিন্তু আসতেও পারেন এ বাড়িতে কখনো মা। তুমি সাবধানে থেকো। একজন আবার মিলিটারি!"

—"দূর ছাই, যে অসভ্য মেয়ে হয়েছে, মুখে ইয়ার্কি ছাড়া কথা নেই। কার সঙ্গে কী বলছিস সে-জ্ঞানটা আর কবে হবে!"

—"ঠিকই বলছি। দু'জন বাবা হয়েছেন, এটা প্রথমে মাকেই তো বলার কথা!"

—"হাঁরে খুকু, তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না, অ্যাঁ!...মেলা বাজে বকিসনি! বলি বয়সটা হবে কবে?"

—"যাবার পথে একজন বাবা—নাম শার্দুল সিং, জয়পুরে থাকেন। ফেরার পথে ট্রেনে আর একজন বাবা—নাম পুরুষোত্তমলাল পেদ্দার, আমহার্স্ট স্ট্রীটে মারোয়াড়ি হাসপাতালের সেক্রেটারি। বলেছেন সবসময় যে কোনও রুগী তাঁর কাছে পাঠাতে পারি! আছে কোনও রুগী

BanglaBook.org

তোমার হাতে? দাও পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার বাবার হাসপাতালে!"

—"যাচ্ছেতাই কথা সব।—আর ছেলে না কি যে হয়েছে— কার যেন!"

—"কার আবার, বলছি তো আমার। কাশীতে আমার একটি ছেলে হয়েছে। পুত্রসন্তান। ব্রাহ্মণসন্তান অবশ্য। তবে পুত্ররত্ন দেবকুলদীপি—এই মহাশিক্ষা মহাভারতের রাণীরা সব্বাই দেখিয়ে গেছেন। আমার ছেলে বাঁকুড়ায় কলেজে পড়ে, খুব চমৎকার ছেলে মা। দুবেলা জপ করে আহ্নিক করে অথচ বাচ্চা ছেলে। তার মধ্যে কি যে গভীর সরল বিশ্বাস, আমি পুণ্যাত্মা বলতে যা বুঝি, সে ঠিক তাই। তোমার নাতির দুঃখ ঘুচলো। এবারে মা আমি আর সমীর মিলে ঠিক করেছি একটা হাসপাতাল খুলবো গরীবদের জন্যে, গঙ্গার ধারে জমি কিনে। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় খোলা হাওয়ায় সেরে উঠবে সব ধরনের রোগীরা। বেশি বেশি ওষুধে নয়, কেবল সেবায় আর ভক্তিতে। আরেকদিন বলবো তোমায় আমাদের সেসব ভবিষ্যৎ প্ল্যান।"

—"বেশ, এটা ভাল কথা। ধর্মভীরু ছেলে পাওয়া ভাল। তোদের হাসপাতাল খোলার আইডিয়াটাও খুব ভাল। যাক, আর কিছু?"

—"আরো অনে - ক কিছু! অনে ক কিছু! সবার চেয়ে বড়ো কথা, মা —," মায়ের খাটে চিংপটাং হয়ে পড়ে মার তাকিয়াটা দখল করে নিয়ে ঘোষণা করি, "আমি প্রেমে পড়েছি!"

—"এ্যাঁ?"...মার বাক্‌রোধ হয়েছে।

—"ওই নিমতলা কি ক্যাওড়াতলায় আমি কক্ষনো মরবো না। বাঁচার জন্যে কলকাতা, কিন্তু মরতে হলে কাশীতে। কাশীর গঙ্গার প্রেমে পড়েছি মা। আমি সারাটা জীবন ওখানে বসে চেয়ে থাকতে পারি গঙ্গার দিকে। মাগো—কি জিনিসই দেখলুম!"

—"তাই বল্! কাশীর গঙ্গা! এই প্রথম দেখলি কিনা। ওই দুদিন, কি চারদিন। তার পরেই আশা মিটে যাবে। কাশী তো কেবল গঙ্গাই নয় রে!"—মা বলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—"না মা, কখনো মিটবে না। ওঃ কী নদী! ওপারটাতে কিছু নেই, কেবল অন্তহীন আকাশ, ঠিক যেন মর্ত্যের শেষ সীমা। বৈতরণী বলতে যে ছবিটা মনে ভেসে উঠতো সেইটেই দেখে এলুম মা। হরিদ্বারের সেই নীলগঙ্গার চেয়েও বেশি ভালো। কী বিস্তার! মা, চলো না—আমরা কাশীতে চলে যাই? গঙ্গার ধারে থাকবো?"

এবারে মা হেসে ফেলেন—"দূর পাগল! কাশীতে তুই থাকতে পারবি না। তার চেয়ে ওই গঙ্গাটাকে বুকের মধ্যে পুরে ফ্যাল। যেখানে যাবি, সঙ্গে যাবে। একবার কাছে এসেছে যখন, আর ছেড়ে দিসনে। স্রোতটা বইতে দে—কাশীর গঙ্গা উত্তরবাহিনী জানিস তো—তোর যেমনি উল্টো স্বভাব, তারও ঠিক তেমনি। দুজনে তাই মিলেছে ভালো। গঙ্গাটাকে বুকের মধ্যে দিয়ে বইয়ে দে আর প্রয়াগসঙ্গমটাকে বুকের মধ্যিখানে ধরে রেখে দে। অমৃতকুম্ভ একবার হাতে এলে আমরা নিজেরা ছুঁড়ে না ফেললে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তুই এইটে মনে রাখবি।—কুম্ভে গেলেই তো আর অমৃতকুম্ভের যোগ সকলের মেলে না রে! ভগবানের অসীম দয়া—তোর কপালে যখন মিলেই গেছে, ওটা যেন ভেঙে ফেলিসনে।"

ইতি

মহাকুম্ভযোগকথা অমৃত সমান
দীনা নবনীতা কহে শুনে পুণ্যবান।।

BanglaBook.org

উপন্যাস

আমি, অনুপম

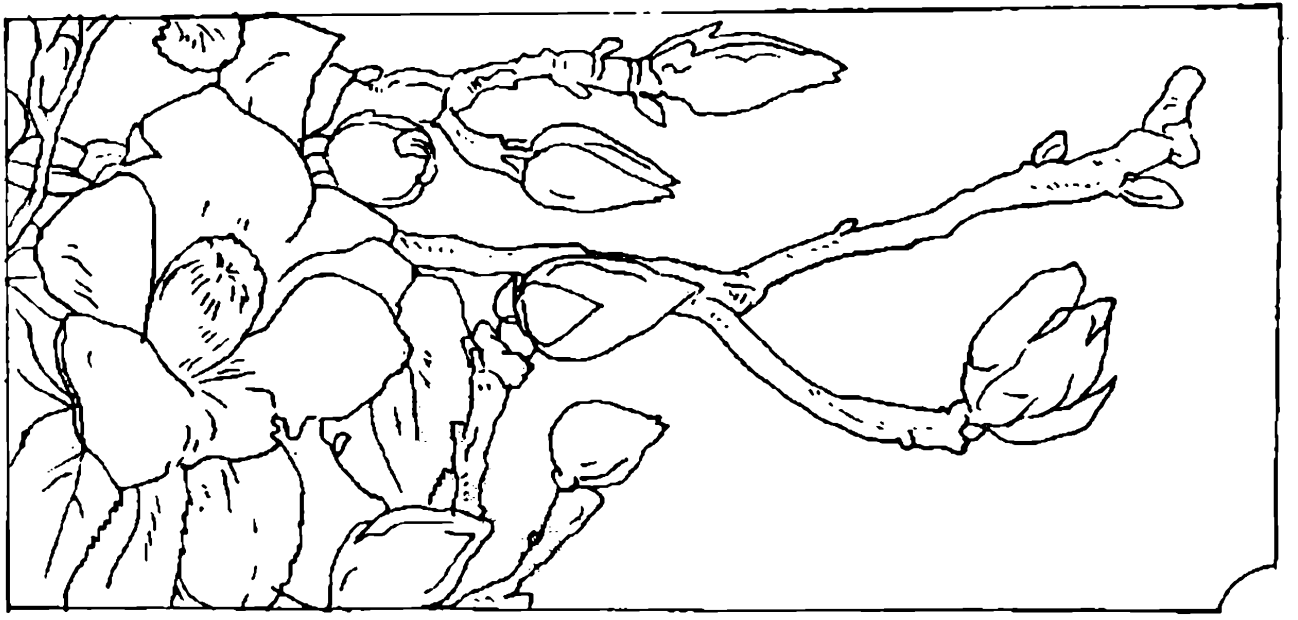

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী
ও
শ্রীযুক্ত কালিদাস গুপ্ত
শ্রীচরণেষু

না, এবারে ফিরতেই হয়।

কমলকলির এলোচুলের পিছনে পাশবদ্ধ বাঁ হাতের মণিবন্ধটি একটু উঁচু করে দেখে নিলেন তিনি—সাড়ে নটা বাজে। দশটায় অম্বরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। লীগ্যাল এইড কমিটিটার মোটামুটি খসড়া একটা আজই সম্পূর্ণ করে ফেলা দরকার।

ডানহাত স্টিয়ারিঙে আবদ্ধ, বাঁহাত কমলকলিতে। আলতো করে ঠুকরে দিলেন কমলকলির কমলা ঠোঁট, তারপরে বললেন: 'এবার ফেরা যাক, কি বলো?'

'—এখনই?'

'—দশটায় একজনের আসার কথা।'

কমলকলি ঠোঁট কোলাল, চোখে পাখি মারার ছররা ছুঁড়ল অভিমানে। কিন্তু তিনি যে পক্ষীজাতীয় জীব নন তা জানে বলেই সম্ভবত, শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে, সোজা হয়ে সরে বসল কার্যত।

—'পৃথিবীতে সকলের জন্যেই আপনার সময় আছে, কেবল আমার জন্যে ছাড়া।'

এবার হেসে ফেললেন তিনি। অল্প আদরও করে দিলেন কমলকলিকে। হাসলে তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা আকস্মিক অভাবিত বদল ঘটে যায়। তাঁর ধীর গম্ভীর স্বভাবের সঙ্গে এই ছেলেমানুষী শুভ্র হাসিটা ঠিক খাপ খায় না। ফলে আকর্ষণটা অবশ্য বেড়েই যায়। ডান কোণের দন্তটি সোনা বাঁধানো, ছেলেবেলায় পোকায় ধরেছিল। তাই সহজে বেশি হাসেন না তিনি। ওই সোনা বাঁধানো দাঁতটা তাঁর লজ্জা।

—'বাঃ, এটা কিন্তু আনফেয়ার হল। সেই আটটা থেকে সাড়ে ন'টা অব্দি বলছ, তোমাকে সময় দিই না?' তাঁর স্বরে একটা মাদকতা আছে। কমলকলির ঘোর যেন কাটতে চায় না। সে ঠোঁট ফুলিয়েই থাকে, ফোটা পুটুসফুলের মতো।

—'কেউ কোনোদিন আমাকে ভোর সাড়ে সাতটায় উঠে পদ্মের মাঠে হাওয়া খেতে দেখেছে? হেন অঘটনও ঘটল তোমার জন্যে, আর তুমিই বলছ কিনা—'

এবার কমলের ভুবনমোহিনী হাসি ভ্রূ থেকে চিবুক পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয়। তিনিও পথের দিকে মন ফেরালেন তাঁর বাঁহাতটা এখনো আলগাভাবে কমলকলির কাঁধে। এবারে সরিয়ে নিতে হবে, গীয়ার বদল করা দরকার। মুঠো করে ধরলেন স্টীভলেসের দু' সুতো আচ্ছাদনের অজুহাতের নিচে প্রস্ফুটিত কমলের গোল মাংসল কাঁধ—মুঠোটা এবার আলগা করবেন, তারপর মুঠো ফিরে আসবে গীয়ারের মাথা কঠিন দণ্ডে। এ-সব প্রণয়ের পদ্ধতি যেমন তাঁর নখদর্পণে আছে, কমলকলিরও এ পাঠ বেশ ভালোই অধিগত। এই কারণেই তিনি কমলকলির মতো মেয়েদের পছন্দ করেন। এই কমলকলিরা যতক্ষণ কাছে থাকে, শুধু ততক্ষণই কাছে থাকে। নেমে যাবার পরেও মনে মনে তাড়া করে আসে না শোবার ঘরে, স্নানের ঘরে, পড়ার ঘরে, জবরদখল নিতে চায় না মনের। সময়ের। সেই ধরনের মেয়েদের তিনি পছন্দ করেন না। তার লক্ষণ মাত্র দেখা গেলেই সচকিত হয়ে ওঠেন, এবং দ্রুত হাতে দু' আঙুলের টোকায়, কোট থেকে শ্যামাপোকার মতো, মন থেকে তাদের ঝেড়ে ফেলেন। কিছু কিছু অবশ্য ব্যতিক্রম হয়ে যায় না তা নয়। চক্রবড়ির গুঁড়োর মতো মাখামাখি হয়ে যাবার, সর্বত্র ছড়িয়ে যাবার একটা প্রবণতা কিছু মেয়ের থাকে। যেমন ছিল মারিয়া, যেমন সুধা। এদের ব্রাশ করে ফেলতে একটু সময় বেশি চলে যায়। তবে মাঝে মধ্যে নারী অবশ্য মন্দ নয়। একটু ছায়াঘন অবকাশ। একটু তাৎক্ষণিক স্নিগ্ধতা। মাত্র এই। বহু ধরনের কাজ, নানা দায়িত্ব। তাঁর সময় মহার্ঘ।

দেশসুদ্ধ লোকের মতো সে কথা কমলকলিও জানে। আর জানে বলেই, অধুনা এই বিশেষ ভাগ্যোদয়ের সম্পর্কে সে যথেষ্ট সচেতন। ইদানীং প্রায়ই এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বটির পার্শ্বচারিণী হয়ে দৃশ্যমানা হয় সে; গাড়ি চালাতে শেখাচ্ছেন তাকে আর কেউ নয়, স্বয়ং অনুপম রায়! নামটুকু টুক করে একঘর মানুষের মধ্যে ফেলে দিলেই হল, এক বালতি পেট্রোলে একটা দেশলাই

BanglaBook.org

কাঠির মতো। সেই ভারত-চীন যুদ্ধের সময় থেকে তাঁর এই দেশজোড়া প্রতিষ্ঠা। তিনটে শহর থেকে একযোগে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের যে একমাত্র ইংরিজি দৈনিক, সেই 'ডেইলি নিউজে' তিনি 'রয়জ কর্নার' নাম দিয়ে রাজনৈতিক পর্যালোচনার একটি সাপ্তাহিক কলম লেখেন। 'রয়জ কর্নার' আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা এবং দিল্লী থেকে প্রকাশিত এই কাগজটির সম্মান এবং প্রচারসংখ্যা সহসা লাফিয়ে উঠেছিল। বোম্বাই এডিশনের সূত্রপাত সেই থেকেই—বলতে গেলে, একপক্ষে তাঁরই জনপ্রিয়তার কল্যাণে, এখন তিন শহরে শিকড় ছড়িয়েছে 'ডেইলি নিউজ'। সংবাদপত্রের মহলে এই-সব গল্প এখন দেশজোড়া কিংবদন্তী। আকাশবাণীতে 'রয়জ কর্নার' সাপ্তাহিক ন্যাশন্যাল প্রোগ্রাম; অনুপম রায়ের বাঁধা ছ'মিনিট বিশ্ব-রাজনীতি-পরিক্রমা। কে না চেনে ওই ভারি, ভরাট কণ্ঠস্বর, ওই ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন ইংরিজি উচ্চারণ? বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় নিউয়র্ক টাইমসে প্রতিদিন তাঁর স্বাক্ষরিত সংবাদ সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, মার্কিন দেশের তিনটি নেট ওয়ার্ক থেকে তাঁর টি. ভি. সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে, এবং বি. বি. সি.-তেও।

কিন্তু অনুপম রায় যে রাজনীতি-বিশ্লেষক বা রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবেই একমাত্র খ্যাত, এমন ভাবলে খুব ভুল হবে। অনুপম রায় চীন-ভারত যুদ্ধের বহু আগে থেকেই শিক্ষা জগতে একটি চেনা নাম। সতেরো বছর ধরে তিনি এই পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন বিষয় গঠন করার কাজে ব্যাপৃত আছেন—তুলনামূলক রাষ্ট্রনীতি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হওয়ার একাধিক প্রস্তাব, সরকারী চাকরির পৌনঃপুনিক পীড়াপীড়ি ও বিদেশে অর্থকরী চাকরির অন্তহীন আমন্ত্রণ স্থির মনে, নিঃসংশয়ে, সমানে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি, স্বস্থানে স্বকর্মে স্থিত রয়েছেন ডঃ অনুপম রায় অযথা অর্থ বা অতিরিক্ত সমর্থ্যের পিছনে ছোটেন নি। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা মূল নীতি, একটা বেসিক প্রিন্সিপল মেনে চলেন। এই সুযোগ-সন্ধানীর জগতে শক্তিলোভে বা যশোলোভে স্বধর্মভ্রষ্ট না হওয়া যে খুবই কঠিন কর্ম, তা কমলকলিরাও বুঝতে পারে।

অনুপমের একক ও ঐকান্তিক স্বার্থহীন পরিশ্রমের ফলে বিভাগটি এখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ ছাড়া তিনি সাংবাদিকতা বিষয়েও কিছু আলাদা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস নেন। তাঁর বক্তৃতায় ভিড় করে আসে নানা বিভাগের ছাত্রেরা। শুধু লেখনীতেই তো নয়, তাঁর জিহ্বাগ্রেও যে সরস্বতী। শোনা যাচ্ছে অনুপম রায় হয়তো পদ্মবিভূষণ পাবেন সামনের ছাব্বিশে জানুয়ারি; এই বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে তাঁর সংবাদ-বিশ্লেষণ ও পরিস্থিতি-বিচারের অসাধারণতা যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল, তারই সরকারী স্বীকৃতি স্বরূপ। অনুপমের বিষয়ে অবশ্য সর্বদাই নানান গুজব শোনা যায়। কমলকলি তো কখনো তল-কূলই পায় নি ভদ্রলোকের, যে বুঝবে কোন্‌টা গুজব, আর কোন্‌টা সত্যি। নীতিকথা বোঝে না কমলকলি। শুধু বোঝে অনুপম রায় যা করেন, সেটাই ঠিক।

বাড়ি এসে গিয়েছে। চকিতে কমল শেষবারের মতো চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় কে কে দেখতে পেল, অনুপম রায়ের পাশে শোভমানা কমলকলিকে? কতজন পরিচিত ব্যক্তির উৎসুক, ঈর্ষুক নজর কেড়েছে আজ কমলকলির সৌভাগ্য-ফলক?

দশটা বাজতে সাত। দশটায় অম্বর আসবে। ঝুঁকে পড়ে কমলকলির জন্য দরজাটা খুলে দিতে দিতে অনুপম রায় বললেন—'সীইয়ু।'—'কাল ক'টার সময়ে?'—'সেয়া আটটা?'—'কাইন। ভুলে যাবেন না তো? ফোন করে মনে করিয়ে দেব?'—'ভুলে?' আবার হেসে ফেলেন অনুপম।—'নাঃ। আমি তেমন ভুলো-মাস্টারমশাই নই। আমার সব মনে থাকে। কাল সোয়া আটটায়, কেমন?'

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভুলে যাওয়া দূরে থাক্ অনুপম রায় কখনো লেট হন না কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টে, একান্ত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বিরোধিতা না ঘটলে। জীবনের কোনো গাড়িই উনি মিস করেন নি। জীবন যোগে শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। তাঁরই ঘড়ি পরা সার্থক, তাঁকেই ডায়ারি উপহার দেওয়া

মানায়। অথচ সদাশান্ত, সদাপ্রসন্ন অনুপম রায়কে দেখলে কোনো সময়েই মনে হয় না, তাঁর জগতে কোথাও কোনো তাড়া থাকতে পারে।

ল্যানের চওড়া সবুজ ফ্রেমে বাঁধানো কমলকলির আকাশে ছটফটানো হাতের দিকে চেয়ে এঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন অনুপম রায়। ও কি উড়ন্ত পাখি ধরতে-চাওয়া, না খাঁচার-পাখি উড়িয়ে-দেওয়া হাত? দশটা বাজতে পাঁচ। এখনো যথেষ্ট সময় আছে। এখান থেকে তাঁর বাড়ি তিন মিনিট।

॥ ২ ॥

কফি খেতে খেতে ব্যারিস্টার অম্বর মুখার্জীর সঙ্গে কথা হয়। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—লীগাল এইড কমিটি একটা গঠন করা দরকার। কমিটিটা আণ্ডার গ্রাউণ্ড কোনো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবে না। একটা নাগরিক সমিতি সিভিল রাইট্‌স-এর সুরক্ষার জন্য কয়েকজন আইনজীবীকে নিয়ে চাঁদা তুলে আইনসম্মতভাবে গড়া হচ্ছে। আড়াই হাজারের বেশি ছেলে হাজতে পড়ে আছে বিনা বিচারে। অকথ্য অত্যাচারের শিকার হয়ে ক্রমশ অকালবৃদ্ধ হয়ে পড়ছে। যেগুলো মরে যাচ্ছে তারা তো যাচ্ছেই, যে কজনকে এখনো বাঁচানো যায়, তার একটা বিহিত করা এখুনি দরকার। একটা সেণ্ট্রাল কমিটি আগে গড়া হোক। কোন্ কোন্ আইনজীবীর সাহায্য পাওয়া যাবে তার একটা তালিকা হয়েছে। এইবারে অর্থ সংগ্রহের দিকে জোর দিতে হবে।

কথা কইতে কইতেই ফোন আসে; আজ বিকেলে একটা মীটিং আছে, সেটা মনে করিয়ে দেওয়া। মনে করানোর দরকার ছিল না—অনুপমের এনগেজমেণ্ট ডায়রিতে লেখা আছে। রোজ সেটা দেখা তাঁর প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক অভ্যাসগুলির মতো নিশ্চিত। মীটিং আর মীটিং। রোজই কিছু-না-কিছু থাকে। আর তারই মধ্যে থাকে পার্টির পালা। অনুপমের জীবন জনাকীর্ণ—কিন্তু এই জনাকীর্ণতার মধ্যেও অনুপম একক, স্বাধীন একেবারে স্বাধীন, একেবারে একা। বহুজনের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর নির্জনতা ভঙ্গ হয় না, তাঁর স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয় না। তিনি হাঁসের পাখার মতো অস্পর্শ, ভিড় থেকে মুক্ত হতে পারেন অনায়াসে। সারাদিন নানা ভিন্নমুখী মানুষের ভিড়ে ভিন্নমুখী কাজে ব্যাপৃত হয়েও অনুপমের চিন্তা সুশৃঙ্খল থাকে, স্মৃতি দুর্বল হয় না, স্নায়ু শিথিল হয় না। প্রত্যেকের প্রতিই তিনি সৌজন্যে সুস্নিগ্ধ, প্রায়-হার্দ্য আচরণে অভ্যস্ত। আলোচনার বিষয় যতই অমনোমতো হোক, অনুপমের মুখভাবে কখনো সন্তোষের অভাব হয় না। যদিও তাঁর কলমে প্রচণ্ড রাগ, 'রয়জ কর্নারে' তা শিল্পিত হয়, কিন্তু অনুপম রায়কে ব্যক্তিগতভাবে রাগ করতে দেখা যায় না কখনো। হিটলার, স্তালিন প্রভৃতি দু-চারজনকে বাদ দিলে জগতে কেউই তাঁর ব্যক্তিগত ঘৃণার যোগ্যতা অর্জন করে নি বলে সন্দেহ হয়। কেননা তিনি জানেন মানুষ প্রাণী মাত্র, দুর্বল। মানুষের পক্ষে নীচতা-শঠতা এ-সবই ভুলভ্রান্তির মতো স্বাভাবিক।

অম্বর বসে থাকতে থাকতে তিনটি টেলিফোন এল। একটি তো ঐ সভার রিমাইণ্ডার, আরেকটি তাঁর ছোটোভাই নিরুপমের। মাকে আজ নিয়ে আসার কথা ছিল; নিরুপম শরীর ঠিক নেই, আনতে পারবে না। অনুপম যদি ইউনিভার্সিটি ফেরতা নিয়ে আসেন তো ভালো, নয়তো পরশুদিন আনবে মাকে নিরুপম। অন্যটি রিজার্ভ ব্যাংকের মোহন রাওয়ের। সন্ধ্যাবেলায় ওর বাড়িতে একটা আড্ডা বসছে। পার্থসারথি এসেছেন সিটি ব্যাংকের ডিরেক্টর্‌স মীটিংয়ে। তাঁকে মীট করতে ডিনার। একটা রেজিস্ট্রী চিঠি এল—চণ্ডীগড়ের একটা সেমিনারে নিমন্ত্রণ। একটি তার এল—বোম্বাইয়ের এক ইণ্টারভ্যু বোর্ডে বসার ডাক। আরো কয়েকটি চিঠিপত্র কেষ্ট রেখে গেছে টেবিলে—তার মধ্যে একটার অক্ষর তাঁর চেনা। সুধার চিঠি।

এ-সবের মধ্যেই অনুপম অম্বরের সঙ্গে মোটামুটি একটা খসড়া লিখে ফেললেন, লীগাল এইড কমিটির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী—সেণ্ট্রাল কমিটির সম্ভাব্য সদস্য তালিকার কিছু নামের প্রস্তাব, এবং অর্থ ভাণ্ডারের নিম্নতম অর্থসংগ্রহের মোটামুটি টার্গেট কত হবে।

BanglaBook.org

অম্বরের সঙ্গে কাজ শেষ হয়েছে, অম্বর মুখার্জী উঠে দাঁড়িয়েছেন, দরজায় তিনটে টোকা পড়ল তিনটে বিশিষ্ট শব্দের কৌটা। অল্প বিরতিতে আবার। কেষ্ট—খুব স্মার্ট, ছাপা হাওয়াই শার্ট, চোঙা প্যান্ট, বোম্বাই জুলপি-শোভিত তরুণ ভৃত্য কেষ্ট—চোখে প্রশ্ন নিয়ে এসে দাঁড়াল। অনুপম মাথা হেলিয়ে অনুমতি-সূচক ইঙ্গিত দিলেন, কেষ্ট দরজা খুলতে গেল। এবার প্রশ্ন ফুটল অম্বরের চোখে! ওপরদিকে চেয়ে দেখলেন। নাঃ, পাখা তো ঘুরছে। কারেন্ট আছে। তবে? বেল থাকতে টোকা কেন? হাসিমুখে অনুপম বললেন: 'সমীর।'

ঘরে ঢুকল এলোমেলো চুলদাড়ি রুখুশুখু চামড়া, ময়লা পাঞ্জাবি পাৎলুন, আর কালো ফ্রেমের চশমায় বছর কুড়ি-বাইশের একটি ক্লান্ত ছেলে। ঘরে ঢুকে অম্বরকে দেখেই তার চোখমুখে বিব্রত অপ্রস্তুতির চিহ্ন ফুটল। অনুপম আশ্বাস দিলেন—'ব্যারিস্টার অম্বর মুখার্জী। নামটা তোমার অচেনা নয়।'

নির্ভার মৃদু হেসে হাত জোড় করল সমীর। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল: 'কেষ্টদা, কিছু খেতে দিতে পারো?'

রান্নাঘরে কেষ্ট জবাব দিল: 'এক্ষুনি ভাত দিচ্ছি সমীরদা দাদাবাবু, আপনি স্নান করে নিন।'

ধপ্ করে বসে পড়ে পাদুটো সামনের দিকে লম্বা ছড়িয়ে দিয়ে সমীর অম্বরকে হঠাৎ পিছু ডেকে ওঠে—'আচ্ছা, জয়দীপের কেসটায় কী হল কিছু জানা গেছে? আর গোরাকে নাকি বেইলে ছেড়ে দেবে শুনছি, সেটা কি ঠিক খবর?'

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে অম্বর বলেন—'গৌরাঙ্গ মিত্রকে কালই ছেড়ে দিয়েছে। আর জয়দীপের কেসটায় কারুরই আশা দেখছি না, বাবুল ওদের ডুবিয়ে দিয়েছে। তবু চেষ্টা তো চলছে, দেখা যাক।'

অম্বরকে বিদায় দিয়ে চটপট স্নান করে এসে সমীরকে নিয়ে খাবার টেবিলে বসলেন অনুপম। অম্বরের সঙ্গে কফি খেয়েছেন—এখন একটা ঠাণ্ডা বীয়র পেলে মন্দ হত না। কিন্তু সমীর যে আবার এই-সব ছোঁয় না। একা একাই খাবেন? না, থাক।

ভাত ভেঙেই সমীর বলে উঠল: 'অনুপমদা একটা মুশকিলে পড়ে গেছি। যে টিউটোরিয়াল হোমটায় শুতাম কাল রাত্রে সেটা রেইড করেছে, ভাগ্যিস আমি রাস্তার মোড়েই খবরটা পেয়ে গেলাম। কেবল কপালজোরে বেঁচে গেছি। দীপু আর বাদলকে ধরেছে। আজ রাত্রে কি আপনার এখানে শুতে পারি?'

মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে মনে মনে হিসেব করে নিলেন অনুপম: মাকে যদি আজ এনে রাখেন তবে সমীরকে শুতে দেওয়া যাবে না। মা প্রশ্নটশ্ন করবেন। কেষ্ট সব জানে। সব বোঝে। কেষ্ট নিরাপদ। মা বুঝবেন না। কিন্তু সমীর বেচারী যাবেই বা কোথায়? ওদের পায়ে পায়ে পুলিস ঘুরছে। আজকের মতো মা বরং যেমন আছেন, দর্জিপাড়াতেই থাকুন। নিরু পরশু দিয়ে যাক যেমন কথা আছে।

—'বেশ তো। শুতে পারো বৈকি, কিন্তু পরশুদিন আমার মা আসছেন, তার আগে অন্যত্র জায়গা দেখে নিতে পারবে তো?'

—'পরশু তো? সে ঢে-র সময়।' একগাল হেসে সমীর মুসুরীর ডালে লেবু নিংড়োয়।

সমীরদের জন্যে অনুপম অনেক করেছেন। সমীর একাই নয়, বাদল, দীপু, অশোক, দেবাশিস ওদের প্রত্যেকের জন্যেই। নানাভাবে, অর্থে, সামর্থ্যে, সদুপদেশে তাদের ভরসা হয়েছেন। কিন্তু একথাও সত্য, অনুপম মূলত শান্তিবাদী, বন্দুকের নলের শান্তি তাঁর ভিতরে ভিতরে কোথাও একটা কিছু কুরে কুরে খায়। রায়বাড়ির ছেলে, খুনখারাপির রাজনীতিতে তাঁর রক্ত সায় দেয় না। অথচ বামপন্থা তাঁর বুদ্ধিতে বিপ্লবের যুক্তি যোগান দেয়। এই জগতে রক্তের সঙ্গে বুদ্ধি প্রায়ই মিশ খায় না। রক্ত আর যুক্তিতে ভাবসাব না থাকলে অবাক হবার কিছু নেই, তা অনুপম

BanglaBook.org

বোঝেন। তাই রক্তকে বিশেষ প্রশ্রয় দেন না। সভ্যতার মানেই হল রক্তকে হারিয়ে দিয়ে যুক্তির জিত।

এ দেশটা যে স্বাধীন আর গণতন্ত্র যে খোঁড়া হলেও নীরোগ, তার প্রমাণ অনুপমের মতো কলমের মুক্তকচ্ছদ। পোলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট হিসেবে অনুপম রায় ভালো করেই জানেন এই মুহূর্তে তাঁর হাতের মুঠোতে এই ছোটো মঁ ব্লাঁ কলমটি সার্থকনামা। তার আকাশভেদী ক্ষমতা। তাঁর কলমকে ভয় পায় না এমন নেতা এখন কোনো পার্টিতেই নেই। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও যেমন, তেমনটাই খাতির তাঁর বিরোধী পক্ষের নেতাদের সঙ্গে। তাই অনুপম রয়্যালবেঙ্গল ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে এসে কামাখ্যার ভেড়ার সঙ্গে লাঞ্চ করেন, গির অরণ্যের সিংহের সঙ্গে ডিনার খেয়ে, বিন্ধ্যপর্বতের নীলগাইয়ের সঙ্গে বীয়র পান করতে বসেন। কিন্তু যেহেতু নিজেকে আদর্শবাদী, নীতিবাদী পুরুষ বলে ভাবতে পছন্দ করেন, তাই তিনি এই বিপুল শক্তির বিন্দুমাত্র অপপ্রয়োগ করেন না। কলমের ধাক্কায় রাজনীতির হাওয়ার দিক-পরিবর্তন করানো যায়, অন্তত গণমানসের ওপর নানাভাবে প্রভাব ফেলা সম্ভব, এটা তিনি যেমন জানেন, তেমনি জানেন রাজনীতির কৃতবিদ্যরাও। কিন্তু অনুপম রায় সৎ এবং সাহসী। সব চেয়ে বড়ো অসুবিধা তিনি নির্লোভ। তাঁর জন্য শুকনো খ্যাতি ছাড়া আর কিছুই নৈবেদ্য নেই। করার উপায় নেই কিছুই।

শুধু রাজনীতির মহলেই কি? এই তো 'ডেইলি নিউজে'র প্রতিযোগী পত্রিকা 'ডেইলি স্টার'-এর জেনারেল ম্যানেজার রামশরণ আগরওয়ালা—তাঁর কাগজও বেরোয় বোম্বাই, দিল্লী এবং মাদ্রাজ থেকে—অনুপমকে বহুবার ফ্ল্যাট কিনে দিতে চেয়েছেন। অনুপমের যথা ইচ্ছা তথা। তাঁকে কেবল লিখতে হবে 'ডেইলি স্টার'-এ। 'ডেইলি নিউজ'-এর পরিবর্তে। অনুপম লেখেন নি। ও-কাগজের এডিটোরিয়াল পলিসির সঙ্গে তাঁর পক্ষে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

একটি ফ্ল্যাটের পরিবর্তে স্বাধীনতা বেচবার মতো বালক অনুপম রায় নন। এক সময়ে ডিরেক্টর স্যার রাঘবনের উৎসাহে রামশরণের বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল অনুপমের হাতে তাঁর কাগজের সম্পাদনার ভারটা দেন, তার জন্য যে-কোনো আর্থিক শর্তে তিনি সাগ্রহে রাজি ছিলেন। তাঁদের শর্ত মোটে তিনটি: আর কোথাও লেখা চলবে না। আর কোনো ফুলটাইম কাজ চলবে না। কলমটা যৎসামান্য মাঝামাঝি আনতে হবে। না না, মোটেই দক্ষিণে যেতে হবে না অনুপমকে, কেবল হিমালয়ের বামে না গড়িয়ে পড়লেই হল। সরকারের বামে থাকুন না তিনি যত খুশি! তবে অনুপম সহাস্যে সবিনয়ে বলেছেন, অনেকানেক ধন্যবাদ রামশরণজী, কিন্তু আমি যে আসলে মাস্টার! মাস্টারি ছাড়লে আমি ডাঙায় তোলা মাছ হয়ে যাব।

রামশরণ আগরওয়াল তার পরেও এসেছেন, এখনো আসেন শিভাস রীগ্যাল, কিংবা রেমি মারত্যার বোতল বগলে নিয়ে অনুপমের দোতলার ফ্ল্যাটে সত্যিই একটা আদর্শ সামনে রেখে চলতে চেষ্টা করেন অনুপম রায়। তাঁর আচরণে মোটামুটি সমদর্শিতা প্রকাশ পায়—ছাত্র-সহকর্মী-বেয়ারাদের সঙ্গে তিনি সমান সৌজন্যপূর্ণ। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যেমন, বাড়িতেও তেমনি—হ্যাঁ, বাড়িতেও। অন্যান্য সাধারণ যত বুদ্ধিজীবীর মতো তিনি পরিবারকে অবহেলা করেন না। পুরোনো বাড়িতে সকলে একবাক্যে বলে, অনুপমের মতো ছেলে হয় না।

যদিও তিনি বিলেত থেকে ফেরার পরে আর দর্জিপাড়ার বাড়িতে ওঠেন নি। বালিগঞ্জের ছিমছাম দোতলা ফ্ল্যাট নিয়ে একলাই আছেন। সতেরো বছর। তবে সবাই সেটা বোঝে—রন্ধনবাড়িতে মাংস-ডিম ঢোকে না। কোনোরকমে মাছটি গালু করেছিলেন জাঁদরেল কালাপাহাড় জ্যাঠামশাই। কে না জানে বিলেত ফেরত লোকদের মাংস ছাড়া রাতের খাওয়াটি হয় না, ডিম ছাড়া প্রাতের খাওয়াটি হয় না। তার ওপর অনুপমের ঘরদোরে সাহেব-সুবোর ভিড় তো লেগেই আছে। অনুপমের বাড়ি তো নয়, যেন হাটবাজার। জাত-বেজাতের বালাই নেই, সময়-অসময়ের হিসেব নেই। একদিক থেকে সেই কারণেও, দর্জিপাড়ার বাড়িতে তিনি না থাকাতে দর্জিপাড়াও বোধহয় নীরবে

BanglaBook.org

কৃতজ্ঞ।

তাই বলে অনুপম স্বার্থপর নন। তিনি মাকে, ছোটোভাই নিরুপম আর তাঁর স্ত্রী দীপ্তিকে অনেক করে অনুরোধ করেছিলেন ও-বাড়ি ছেড়ে তাঁর কাছে চলে আসতে। তাঁরাই আসেন নি। দীপ্তির বাপের বাড়ি ও পাড়ায়, সেও নড়তে চাইল না। নিরুর সান্ধ্য আড্ডা শ্যামবাজারের মোড়ে, সেও নড়তে রাজি ছিল না। আর মা বললেন—'ভিটে ছেড়ে কোথায় নড়ব বাবা! এখানেই তো 'রাধামাধব' রয়েছেন।' অবশ্য অনুপম এমনি আন্দাজ করেই টু বেডরুম ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন!

মা মাঝে মাঝে এসে দু-চারদিন ঘুরে যান। সব দিনগুলো গুনলে বছরে হয়তো দুটো মাসও হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অনুপমের যত্নে ফাঁকি নেই। সবাই বলে তাঁর মতো সুসন্তান হয় না।

মা এলে অনুপমের যে অসুবিধা হয় না, তা নয়। হুইস্কি বীয়র তো চলেই না। অনুপম সেই কদিনে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসেন, সেই কদিন বাড়িতে মাংস ডিম ঢোকে না। কঠিন কর্তব্যপালনের যে অম্লান আহ্লাদ, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের যে গভীর মনস্তুষ্টি, অনুপম তা পেয়ে যান মাকে কাছে এনে দু চারদিন বাড়িতে রাখলেই।— যেমন পাচ্ছেন এই এখন সমীরকে ভাত, পার্শে মাছের ঝোল খাইয়ে।

মিনু দত্তর বা রামশরণ আগরওয়ালের অর্থসাহায্য গ্রহণ করলে অনুপম রায়ের যতটা বাহ্যিক আরাম হত, প্রত্যাখ্যান করেই তার চেয়ে ঢের বেশি আত্মিক আরাম পেয়েছেন তিনি। এ হল স্বার্থত্যাগের আরাম। স্বার্থসিদ্ধির চেয়ে তার নেশাটা বড়ো কম নয়।

খাবার পরে, বসার ঘরে কৌচে গা এলিয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে সমীর ঘুমিয়ে পড়েছে। জটাভরা মাথাটা বাঁদিকে কাত। সোফার পিঠের ওপরে ঘাড় রেখে, ছাদের দিকে মুখ তুলে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। মৃদু নিশ্বাসের তালে তালে রোগা বুকটা উঠছে, পড়ছে, ঠোঁট দুখানা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, দাড়িগোঁফের আগাছা-জঙ্গলে উঁকি মারছে সুটি খুদে সাদা দাঁত।

দাঁত দুটো দেখে অনুপমের কী যেন মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, অথচ মনে পড়ছে না। কার যেন ঐরকম দাঁত ছিল। খুব চেনা কারুর। কার? ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি শুরু হয়। হার মানা অনুপমের স্নায়ুবিরুদ্ধ। বিস্মৃতির কাছেও হার স্বীকার করতে তিনি রাজি নন! একটা ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল, লুপ্ত স্মৃতি উদ্ধারের জন্য সমস্ত মানসিক শক্তি প্রয়োগ করলেন তিনি। বহু চেষ্টায় স্মৃতির সমস্ত নুড়ি উল্টে পাল্টে ঘেঁটে ঘুঁটে খুঁড়ে খাবলে অবশেষে যখন কুড়িয়ে পেলেন সূত্র তখন সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেলেন অনুপম রায়।

অনেক অনেক কাল আগে দর্জিপাড়ার বাড়িতে কালবোশেখি ঝড়ে একটা কাঠবেড়ালীর ছানা বাসা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল ঠাকুরবাড়ির বাগানে। নিরুপম তাকে কুড়িয়ে নিয়ে পুষেছিল। ঠিক এমনি দুটো দাঁত ছিল তার সামনে, সেই কাঠবেড়ালীর বাচ্চাটার।

অনুপম কোনোকালেই জন্তুজানোয়ার পোষা পছন্দ করেন না। বড়ো দুর্বল আর পরনির্ভর—এই গৃহপালিত পশুরা। মানুষের সবলতার পূর্ণ সুযোগ নেয় ওরা, চালায় টিরানি অফ দি উইক—দুর্বলের অত্যাচার। গৃহপালিত পশুই শুধু নয়, নারী, শিশু, বৃদ্ধ রুগ্ণ—যাবতীয় দুর্বল প্রাণীরই এই মহৎ দোষটি আছে। অনুপম রায় নরমের যম নিশ্চয়ই নন, তবে তিনি নরমের রাজত্বে অধম প্রজা হতেও রাজি নন। তিনি ভালোবাসেন সমান সমান বন্ধু—মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমর্থের সঙ্গে সমর্থের মৈত্রী। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে অবশ্য এই ব্যক্তিগত অনুভূতির সমান্তরাল রেখা খুঁজতে গেলে ভুল হবে। বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে টিরানি অফ দি উইক বলে কিছু ঘটে না—ওটা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অথচ এদিক থেকে নিরুটা ঠিক উল্টো। ওঁর মতো বিপ্লবী নয় সে, বিনা পুনর্বিবেচনায় সে বাপ-জ্যাঠার নিয়মে কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে চলেছে। কংগ্রেসী আদর্শ থেকে কংগ্রেসী সরকার

BanglaBook.org

যে কবেই বিচ্যুত, সে খেয়াল নেই। এদিকে কত বেচাল, কত অত্যাচার, তা দেখেও দেখবে না। ওদিকে জগতের তাবৎ অবোলা প্রাণীর জন্য তার বুকে গঙ্গা-যমুনা বয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের যেয়ো কুকুরছানা, ল্যাংড়া বেরালছানা, রোঁয়া ওঠা পাখির ছানা এনে বাড়ি বোঝাই করত নিরু। এবং এখনো করে। কেবল এখন বেনামীতে, অর্থাৎ "খোকন এনেছে" বলে চালায়। সত্যি, নিরুটায় বয়স বাড়ল না।

সমীরের দিকে চেয়ে অনুপম দেখলেন, ডান হাতটা অসহায়ভাবে সোফার ওপরে এলিয়ে আছে, মুঠোখোলা হাতের পাতাটা চিৎ হয়ে যেন ঊর্ধ্বলোকের করুণা ভিক্ষা করছে—বাঁহাতটা ওদ্রভাবে কোলের ওপরে গোছানো। যেন কোনোদিন হিংস্রতার সঙ্গে ওর চেনাশোনা হয় নি।

অনুপম জানেন, ওই ডানহাতটা অমন নিরীহ নয়। ওই খোলা অসহায় আঙুলগুলো যখন মুষ্টিবদ্ধ, তখন তাদাই বোমা ছুঁড়তে, পাইপগান চালাতে ওস্তাদ। অথচ দ্যাখো কেমন সরল, নিষ্পাপ, নিঃসহায় ভঙ্গি করে আকাশমুখো এলিয়ে রয়েছে।

॥ ৩ ॥

ঘড়িতে ঠিক দুটো। দিবা দ্বিপ্রহর, আক্ষরিক অর্থেই, অনুপমের মনে হল। অনুপম এসে কাজের টেবিলে বসলেন। টাইপরাইটারে কাগজ আর কার্বন লাগাতে লাগাতে ভেবে নিতে লাগলেন, আপাতকরণীয় কী কী। সপ্তাহের জন্য 'রয়জ কর্নার' লেখা তৈরি আছে, কেবল শেষবার চোখ বোলানো বাকি। আজ বাইশে। তেলের রিপোর্টটা সাতাশের মধ্যে ডাকে দিতে না পারলে তেসরা চৌঠার মধ্যে পৌঁছুবে না জেনিভায়। কনফারেন্স সাতই শুরু। অনুপম কিন্তু উপস্থিত থাকতে পারছেন না, কেননা ওইদিনেই প্রধানমন্ত্রী দিল্লীতে একটা ছোট্ট সভায় সারা দেশ থেকে হাতে গোনা কিছু বুদ্ধিজীবীকে পরামর্শ চাইতে ডেকেছেন। অনুপম মনে করেন বিদেশী সভায় থিওরেটিক্যাল বক্তৃতার চেয়ে স্বদেশে হাতে-কলমে কিছু করাটা অনেক বেশি জরুরী।

সকালে অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে, কমলকলিকে গাড়ি চালানো শেখানোটা একেবারেই অপব্যয়—ও কোনোদিনই গাড়ি চালাবে না। কাজে লেগেছে কেবল দেড় ঘণ্টার মধ্যে শেষ পঁচিশ মিনিট। না, শরীরের প্রয়োজন তাঁর বিশেষ নেই—তুচ্ছ শরীরকে তিনি বিশিষ্ট মূল্য দিয়ে অযথা জরুরী করে তুলতে রাজি নন। তাই বলে তো সাধু-সন্নিসিও নন তিনি? মাঝে-মধ্যে একটু মনের ছুটিও তো লাগে। একটু মননহীন অবকাশ। অনুপমের কর্মশৃঙ্খলিত জীবনে নারীর অনিবার্যতা নেই। যেমন মদ, যেমন সিগারেট, তেমনি নারী। অবসর বিনোদনে আরামপ্রদ, মাঝে মধ্যে হলে ভালোই, আবশ্য না হলেও দিব্যি চলে যায় দিন। কফি ছাড়া সত্যি কোনো নেশা নেই তাঁর। তাঁকে মাতাল করতে পারে নি কোনোদিন মদ কি নারী, খ্যাতি কিংবা প্রতিপত্তি। তাঁর হাতে ধরা আছে সমস্ত কটি অশ্বের রজ্জু—সর্বত্র দাঁড়ি টেনে রেখেছেন। মাতালের কোনো বর্মচর্ম নেই, সে বড়ো নিরস্ত্র, বড়ো নগ্ন বড়ো শ্রীহীন। তার বুদ্ধিশ্রী তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। যেখানে বুদ্ধির জোর খাটে না সেখানে অনুপম রায় নিজেকে ঠিক খুঁজে পান না। বুদ্ধিই বল, বুদ্ধিই মানুষ। দুর্বলে অনুপমের রুচি নেই। রূপসী কোনো বুদ্ধিহীনার চেয়ে বুদ্ধিমান পুরুষ সংসর্গ তাঁর কাছে ঢের বেশি কাম্য। তবে মেজাজটা মাঝে মাঝে নারী নারী করে উঠলে, মুখশুদ্ধির মতো খুঁজে নেন একজন কমলকলি কি নলিনী দেশপাণ্ডে, কি প্রমীলা রোহাদগীকে। তবে তাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ দেন না। না বাবা, ওদিকে অনুপম শক্ত আছেন। নিজের হৃদয় তাঁর নিজের মুঠোয়। এই যেমন নেশা-টেশায়, তেমনি হৃদয়-বিষয়ের অস্বচ্ছ এলাকাতেও। ওদিকে বড়ো ঝড়ঝাপটা, বড়ো অনিশ্চয়তা। আর ও অঞ্চলটায় বুদ্ধি বড়োই অক্ষম। অনুপম তাই সযত্নে পরিহার করে চলেন সর্ববিধ হৃদয়-জাতীয় পরিস্থিতি। ফলে তাঁর সৌজন্যে ত্রুটি হয় না, কর্তব্যে বিচ্যুতি হয় না। জগতে ভদ্রতা ব্যাপারটা কেবলমাত্র সংযম আর সহনশীলতা এই দুইয়ের রসায়নে

প্রস্তুত, দুটিই অনুপম রায়ের স্বভাবসিদ্ধ। যথেষ্ট বুদ্ধি যার আছে, তার ধৈর্যও আছে। তার সংযম থাকবে সহ্য থাকবেই। প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে তাই অভদ্র হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় মাতলামি করাও। অথবা প্রেম-পাগলা হয়ে আত্মহত্যা করা।

এই-সব বিষয়ে মনের চিন্তা ও ধারণাগুলি পরিচ্ছন্ন বলে অনুপম রায়ের মনে কোনো উদ্‌বেগ নেই। তাঁর জীবন স্বাধীন। তিনি জগতের কারুর কাছেই নিজের সমপরিমাণ বুদ্ধি-বিবেচনা আশা করেন না। রাগ দ্বেষ হতাশা ক্ষোভ এই সব চিত্তবিকার অদূরদর্শিতার ফল, সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন কোনো পরিস্থিতিই চরম নয়, সকল অবস্থারই শেষ আছে, পরিবর্তন আছে।

অনুপম আত্মরক্ষায় পটু। তা সত্ত্বেও সকালে একটু বেশি সময় গেছে কমলকলির কাছে। কাল অতক্ষণ সময় দেবেন না অনুপম।

আগে সঞ্জীবের জন্য ম্যাটারটায় চোখ বোলানো যাক। একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন, কয়েকটা প্রুফ সংশোধন করলেন, খামে ভরলেন। তারপর অন্যান্য বের করলেন, আরেকবার পড়ে বেশ তৃপ্তিবোধ করলেন বেশ কড়া, বেশ 'ঝরঝরে' হয়েছে লেখাটা। জমেছে। খামে পুরে লেখাটা সরিয়ে রেখে অন্য একটা ফাইল টেনে নিলেন। তর্জনিতে চশমাটা ঠেলে যথাস্থানে তুলে দিলেন, তারপর পোর্টেবল ইতালীয় টাইপরাইটারের সিল্ক রিবনের কালো ঘূর্ণিতে, হারিয়ে গেল রাস্তায় ফেরিওলার পুনরাবৃত্ত হাঁক, জানলার মাথায় শালিকপাখির ডাকাডাকি।

মীটিং থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠছিলেন অনুপম। সঙ্গে আছে নীলাব্জ, ললিত আর সতী। বসেই নীলাব্জ বলল—তোমার গলাটা আজ ধরাধরা লাগছে।

অনুপমও সেটাই ভাবছিলেন। গলাটা হঠাৎ ধরে গেছে আজ। বেশ কিছুদিন চল্লিশ পেরিয়েছেন। দীর্ঘদেহে কিঞ্চিৎ তুষারপাত ঘটেছে সময়ের, কিন্তু অনুপমের স্বাস্থ্য অটুট। একটু অখটু ফ্লু-শয্যা অথবা সাময়িক পৈত্তিক স্খলন ছাড়া তাঁর কোনো রোগভোগ হয় না: একমাত্র দৃষ্টিশক্তিতে ভিন্ন তাঁর কোথাও স্বীকৃত দুর্বলতা নেই। হঠাৎ গলাতে আবার কি হল?

কিন্তু শরীর নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবনা করা অনুপমের পোষায় না। বললেন: 'ঘামটাম বসেছে হয়তো। ও সেরে যাবে।'

—'বাড়ি গিয়েই একটু নুনজলে গার্গল করে ফেলো।'

—'এখন তো বাড়ি যাচ্ছি না।'

—'যাবে তো কোনো দিন, কোনো সময়ে?'

হঠাৎ পিছন থেকে সতী বলে উঠল: 'আপনার সঙ্গে ললিত একমত নয়।'

—'মানে? অনুপম কোনো সময়েই বাড়ি যায় না বলতে চাও?'

নীলাব্জ হেসে ওঠে। 'ও কথা নয় আমি আজকের মীটিঙের কথা বলছি।'

হাসিতে যোগ না দিয়ে সতী বলল, 'ললিত বলেছে হয়তো আমাদের পলিসিটাই ভুল হচ্ছে! ঠিক এই সময়ে এই ধরনের প্রচার নাকি জনমতকে বিভ্রান্ত করবে।'

শুনে মনে মনে মৃদু হাসেন অনুপম রায়। পলিসি-কোয়েশ্চেন নিয়ে ললিতের আবার মত-অমত! গলায় কিন্তু বেশ গুরুত্ব ফুটিয়ে মুখে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন: 'কী রকম? ললিত বলো তো শুনি, তোমার চিন্তাটা কোন্ ধারায় বইছে? হতেও পারে আমাদের হিসেবের কোথাও গোলমাল হচ্ছে!'

ললিতের তরুণ মুখচোখে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠল অনুপম রায় সত্যিই তার মতামত শুনতে চাইছেন। এই, এইজন্যেই তো অনুপমদা সর্বজনপ্রিয়। মহা উৎসাহে ললিত তার মতটা বুঝিয়ে বলতে শুরু করল।

শুনতে শুনতে না-শুনতে না-শুনতে অনুপম ভাবছিলেন, ওহ্ কী অসম্ভব দীর্ঘ সময় ধরে

BanglaBook.org

ওই মীটিং হয়েছে! কিন্তু এখনো সাড়ে সাতটা বাজে নি: তা হোক, সোজা মোহন রাওয়ের ওখানেই চলে যাবেন। পথে কোথাও এদের নামিয়ে দেওয়া যায়? উঃ, ললিতটা কী ভয়ানক বাজে বকতেই পারে। এবার থামানো দরকার: 'ইয়েস। আই থিংক দেয়ার মাইট বি সামথিং ইন হোয়াট য়ু সে, ললিত! যদিও বক্তব্যটা এখনো প্রমাণসাপেক্ষ। তাই নয় কি? এই বিষয়ে আমাদের আরেকদিন সিরিয়াসলি বসতে হবে। সতী, তোমরা কোন্ দিকে? নীলাভ আর আমি একটু ওল্ড বালিগঞ্জে যাচ্ছি।'

– 'না অনুপমদা', সতী অনুপমের আশানুযায়ী কথাই বলে: 'আপনি বরং আমাদের এই পূর্ণ সিনেমার কাছে নামিয়ে দিন। বাড়ি যেতে হবে।'

ওরা নেমে যেতেই নীলাভ বলল: 'সত্যি অনুপম, ললিত ছেলেটা বেশ ইন্টারেস্টিং, নানা অরিজিন্যাল জিনিস ওর মাথায় আসে!'

হুঁ, তোমার মাথা—অনুপম মনে মনে বললেন, অরিজিন্যালিটি না আরো কিছু, পশ্চাৎপক্বতা মাত্র। মুখে বললেন—'হ্যাঁ বেশ ইন্টারেস্টিং। কিন্তু পলিটিক্যালি একদম ম্যাচিওর করে নি অত ভাবালু হলে প্র্যাকটিক্যাল পলিটিকসে শাইন করা যায় না। ওকে কূল হতে হবে।'

—'তুমি তো কিছুতেই নামবে না প্র্যাকটিক্যাল পলিটিকসে। নামলে দেশের উপকার হত।'

অনুপম নিঃশব্দে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসেন।

—'উপকার? না অপকার হতো? আমি একজন অ্যাকাডেমিক মাত্র। আমি পলিটিশান নই. পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস আর পলিটিকস এক জিনিস নয়। কবিতা লেখা আর কবিতা ব্যাখ্যা করা কি এক?'

—'এটা বাজে তুলনা হল। এটা দুর্যুক্তি। একটা ক্রিয়েটিভ, অন্যটা অ্যানালিটিকাল—দুটো আলাদা।'

—'এও তাই। দুটোয় আলাদা ট্যালেন্ট লাগে।'

—'তোমার সে ট্যালেন্ট ছিল। তুমি ব্যবহার করলে না।'

'ওটি বোলো না। বাইবেলের ভগবান এলে আমাকে ঐ দোষটি দিতে পারবেন না।'

মোহন রাওয়ের বাড়ির কৃষ্ণচূড়ায় ঢাকা গলিতে ঢুকতে ঢুকতে মোড়ের লাল বাল্বটা দেখে অনুপমের হঠাৎ মনে হল সুধার একটা চিঠি এসেছিল সকালে। পড়বার সময় হয় নি, টেবিলে রেখে এসেছেন

সমীর এল রাতদুপুরে। সঙ্গে একটা ছোটো কিটব্যাগ। কেষ্টর কাছে এককাপ কফি চেয়ে খেলো। বলল, শরীর ভালো নয়, রাত্রে কিছু খাবো না। অনুপম তার মিনিট-পনেরো আগেই মাত্র ফিরেছেন মোহন রাওয়ের পার্টি থেকে। ফিরেই আবার বসে গেছেন টাইপরাইটারে। হালকা স্বপ্নাবদ্ধ যন্ত্রগুঞ্জন কানে আসছে। সমীর গিয়ে শুয়ে পড়ল, কেষ্ট তার জন্যে বিছানা পেতে রেখেছে: অনুপমকে আর ডিস্টার্ব করল না সমীর। কিটব্যাগটা পড়ে রইল খাটের নিচে।

অনুপম কাজ করতে করতেই টের পেলেন—টোকা পড়ল, দরজা খুলল, সমীর এল, শুয়ে পড়ল। সম্ভবত খেলো না।

কেবল কিটব্যাগটার কথা জানলেন না।

ভোররাত্তিরে উঠে সমীর কেষ্টকে তুলে বলল দরজা বন্ধ করে দিতে। অনুপম অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজ করে শুয়েছেন, তাঁকে ডাকল না। কেষ্টকেই বলে গেল, কিটব্যাগটা যেন অনুপম কোনো আলমারিতে তুলে রেখে দেন। সমীরের জিনিসপত্র আছে।

—'রাত্তিরে দেখা হবে কেষ্টদা', বলে সমীর পা টিপে বেরিয়ে গেল অশেষ অন্ধকারের মধ্যে।

BanglaBook.org

কমলকলির হরিণ চোখ এই মুহূর্তে ভ্রূকুটিল—কপালের সবুজ টিপটা কুঁচকে আছে। নৌকাডুবি হওয়া মানুষে যেমন ভাঙা তক্তাখানা আঁকড়ে থাকে, তেমনি ঘোর বাহুপাশে স্টিয়ারিং চক্রটি আঁকড়ানো। কলকাতার যুবকুলের ঈর্ষার পাত্র ওই ভাগ্যবান স্টিয়ারিং—কমলকলির ধ্যান-জ্ঞান। তার মনপ্রাণ এখন নিজের দুটি হাতে, দুটি চোখে এবং শ্রীচরণে কেন্দ্রীভূত।

মনের আরেকটা দিক অবশ্য সদা-সচেতন, পাশে যিনি বসে আছেন তিনি আর কেউ নন, অনুপম রায়। কিন্তু এই মুহূর্তে দুর্ভাগ্যবশত আরো জরুরী কর্তব্য হচ্ছে পথঘাট সম্পর্কে সচেতন থাকা। নইলে বিপদ।

এই এক জ্বালা হয়েছে সত্যি। কোনো রকম জটিলতাই তার ভালো লাগে না। ড্রাইভিং শিখতে, সত্যি বলতে কি, তার মোটেই ভালো লাগছে না। ভালো লাগে কেবল এই সান্নিধ্যটুকু। এই যে অনুপম রায় তাঁর মূল্যবান সময় তার জন্যে, কেবল তারই জন্যে ব্যয় করছেন, ভালো লাগছে এটা।

এমন সময়ে 'গেল-গেল' বলে একটা শব্দ উঠল—ঘ্যাঁচ করে বিশ্রী আওয়াজে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। অনুপম রায় হ্যাণ্ডব্রেক টেনে দিয়েছেন—এবং কমলকলির ডান পাও, কী আশ্চর্য দিব্যি অ্যাকসেলারেটর থেকে উঠে এসে আপনা-আপনি ব্রেকের ওপর বেদম চেপে বসেছে, নিজে থেকেই! একটা বাচ্চা, ওই উদ্বাস্তু-পল্লীরই বাসিন্দা হবে, একদম গাড়ির সামনে এসে পড়েছিল ইঞ্চি কয়েকের জন্য বেঁচে গেছে। ওর মা-জননী কোলে একটা আরো দুটোকে নিয়ে নিজে দিব্যি ফুটপাতে উঠে গিয়েছে—সেখানে দাঁড়িয়েই দেদার প্রতাপে গলা বাজিয়ে ছেলেকে ধমকাচ্ছে। ছেলেটার মুখ যেন ভয় আর কান্নায় মুচড়ে আছে। চোখ ফাঁক হয়ে আছে, কিন্তু গলায় শব্দ নেই। হেঁড়ে ইজেরটা বাঁ হাতে ধরা। রাস্তার লোকে, কি আশ্চর্য, ছেলেটাকেই গালমন্দ করছে! কলকাতা কি বদলে যাচ্ছে? কমলকলি চাপা নিশ্বাসে খুব নীচু গলায় বলল 'গুডনেস! মা বটে একখানা! ওহ!'

অনুপমের শান্ত উত্তর আসে, 'গীয়ারটা থার্ডে রয়েছে, স্টার্ট নেবে না, আগে নিউট্রাল করো। আজ বরং এই পর্যন্ত থাক্। সরো, এবার আমাকে দাও।' কমলকলি বেঁচে গেল। এ দরজা খুলে নেমে পড়ে ও ঘুরে উঠে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসল। অনুপম রায় স্টিয়ারিং ধরলেন। কলির কাঁধে আলতো হাত রেখে বললেন—'ড্রাইভিং বিষয়ে কয়েকটা কথা মনে রাখবে কলি? এক নম্বর: ইউ মাস্ট কীপ কুল। কোনো অবস্থাতেই মাথা গরম করলে চলবে না। দু নম্বর: ধরে নিতে হবে পথে ঘাটে প্রত্যেকটি লোক ড্রাইভার, পেডেস্ট্রিয়ান, সাইক্লিস্ট, প্রত্যেকেই উইদাউট একসেপশন, উন্মাদ পাগল। অন্যপক্ষের বিবেচনা, বা দায়িত্বজ্ঞানের প্রশ্ন ওঠে না—সমস্ত দায়িত্ব এবং সমস্ত বিবেচনা তোমার একার। তিন নম্বর: পথের লোকদের চোখও নেই, কানও নেই তারা হর্ন তো শোনেই না, গাড়িখানা পর্যন্ত দেখতে পায় না। তুমিই একমাত্র চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। এই কথা কটা গোড়াতেই ধরে নিলে দেখবে গাড়ি চালানোটা অনেক সোজা হয়ে যাবে।'

এতগুলো গম্ভীর কথা একসঙ্গে শোনা কমলকলির বহুদিন অভ্যেস নেই। সে অনুপমের দিকে চেয়েছিল। শ্যামলা লম্বাটে মুখে তীক্ষ্ণ বিপুল দুটি চক্ষু মোটা লেন্সের পেছনে কেমন যেন অলৌকিক উজ্জ্বল, বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। পাতলা ঠোঁটের ওপরে সরু গোঁফ। চোখটা সেখানেই কিংবা মোটা শেল-ফ্রেমের ওপরে রাখতে হয়। রেখাঙ্কিত চওড়া কপালে একগুচ্ছ চুল, ভুরুর ওপরে ঘামে জড়িয়ে পড়েছে। কমলকলির কানে সব কথাগুলো ঢুকছে না—খুব ইচ্ছে করছে চুলের গোছাটা সরিয়ে ওঁর কপালের ঘামটা নিজের সুগন্ধি লেসের রুমালে মুছে দিতে। কাঁধের ওপরে আলতো হাতের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে, এখন কেবল কাঁধ কেন,

BanglaBook.org

সর্বশরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে। এই সময় কি কেউ শুনতে পায় গাড়ি চালানো-বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা? তবু কমলকলি তো সভ্য-জগতের বাসিন্দা। সে তার ইচ্ছে মতন কিছুই করল না, বরং বেশ সপ্রতিভ স্বরে বলল: 'বারে! অন্যের প্রাণের দায় আমার কেন হবে? আমি কেবল আমার প্রাণটা বাঁচাব। ব্যাস্! সেটাই বেশ কঠিন কাজ।'

—'অন্যের প্রাণ বাঁচিয়ে চলাটাও আত্মরক্ষারই কৌশল, কলি!'

—'কিন্তু লোকেরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে চোখ বুঁজে হাঁটবে, কুকুরেরা গাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে, গোরুরা পথ জুড়ে ঘুমোবে, তিকিরিয়া গাড়িব জানালা ধরে'...

—'ছি, মানুষের সঙ্গে এক নিশ্বাসে কি জীবজন্তুর কথা বলতে আছে? কলি?'

—'বারে, জীবজন্তুরা বুঝি প্রাণী নয়?'

বাইরের চলমান সবুজের দিকে তাকিয়ে অনুপম বলেন, 'প্রাণেরও তো দামের তারতম্য আছে।'

—'আপনি যা-ই বলুন, আমার কিন্তু কুকুর খুব ভালো লাগে। অবশ্য রাস্তার কুকুব নয়, ভালো কুকুর ভালো লাগে।'

'কিন্তু ষাঁড়, কুকুর, এদের বাঁচাতে গিয়ে হরদম মানুষ মারা পড়ে। একদম রাস্তার কুকুরদের বাঁচানোর চেষ্টা করবে না, আত্মরক্ষায় ওরা যথেষ্ট নিপুণ, পথচারী মানুষের চেয়ে ঢের বেশি অ্যালার্ট হয় ওরা।'

কমলকলির মন বলল: এই তো আপনি নিজেই মানুষের সঙ্গে এক নিশ্বাসে কুকুরের কথা বললেন, আর আমি বললেই বুঝি দোষ হয়? কিন্তু তার মুখ কিছু বলল না। অনুপমের স্বরে একটা মাদকতা আছে, কেমন ঝিমঝিমানো ভালো লাগা আছে, অনুপম যাই বলেন, (এই এখন যেমন ষাঁড়-কুকুর, বোবা-কালা, এদের কথা বলছেন) তাই যেন কেমন প্রেমের কথার মতো শোনায়। কমলকলি কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারে না ওর বক্তব্যটাতে।

—'কলি?' অনুপম ওর কাঁধে চাপ দিলেন আলতো।

—'উঁ?'

—'কিছু বলো! এত যে উপদেশ দিলাম শুনলে কিছু? বুঝলে কিছু?'

—'উঁহু!'

—'তবে? কী করলে এতক্ষণ?'

—'এতক্ষণ? এই করলাম তো।'

কমলকলি তার বিদ্রোহী চিবুক সদর্পে ঊর্ধ্বে তুলে অনুপমের চোখে চোখ পাতে, অমনি তার নিচের ফুলো ঠোঁটটা একটু এগিয়ে আসে আপনা হতে, ফোটা পটুস ফুলের মতো, আর মস্ত বড়ো কারুকার্য করা তিব্বতি আংটিপরা ডান হাতের পাঁচটি লালপাপড়ি শাদা ড্রিপড্রাই খোলস পরানো পুরুষ-উরুতে নিশ্চিত অথচ মৃদু চাপ দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুইচ টেপা যন্ত্রের মতো অনুপম রায়ের বাঁ হাত পার্শ্ববর্তিনীর বন্ধু ছেড়ে দিয়ে প্রথমে গিয়ার, ও তারপরে আপন লক্ষ্য পরিবর্তন করে গাড়িও এবার গতি বদলায়, প্রভুর করতলের মতোই নির্জনতর অঞ্চলের খোঁজে যায়। এবারে অন্য শিক্ষা, অন্য শিক্ষক।

কথিত আছে যে, আইজেনহাওয়ার একবার ফোর্ডের বিষয়ে বলেছিলেন যে ফোর্ডের কো-অর্ডিনেশন এত কম, তিনি দুটো জিনিস একসঙ্গে করতে পারেন না। যেমন, রাস্তা পার হওয়া, এবং চুইং গাম চর্বণ—এই দুটি কাজ করতে হলে, তিনি একটি থামিয়ে তবে অন্যটি করে থাকেন। অনুপম রায়ের সম্পর্কে ঠিক এর উলটো কথাটা বলা যায়। তিনি একসঙ্গে একশোটা বিভিন্নমুখী কাজ বোধহয় সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করতে পারেন।

লোকালয় এসে পড়েছে। কমলকলির তুলতুলে গাল ছোট্ট করে টিপে দিয়ে হাত সাবধানে

BanglaBook.org

সরিয়ে নেন অনুপম রায়, অমনি আড় চোখে কপালের দিকে তাকিয়ে দেখেন, নাঃ, সবুজ টিপটা ঠিকই আছে।

অনুপম রাস্তায় তাকিয়ে কলির কাকলি শুনছেন, হঠাৎ একদিকে নজর পড়তেই দৃষ্টি ছুঁচোলো হয়ে ওঠে, গাড়ির গতি শামিত হয়ে আসে—অজিতনারায়ণ না? রাস্তার মাঝখানে, নোংরা শতছিন্ন ন্যাকড়াপরিহিত পাগল, পাখির বাসার মতো মাথা নেড়ে নেড়ে কী যেন বকছে। খুব কাছাকাছি গিয়ে ভুল ভাঙে, না, অজিত নয়। এর বেশ বয়স হয়ে গেছে। এত কাছে গাড়ি আসতে দেখেই পাগল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। গাড়ির গায়ে এক দলা আক্রমণাত্মক থুথু ছিটিয়ে দেয়। চমকে সরে আসেন জানালা থেকে অনুপম, সঙ্গে সঙ্গে ডান পা দ্রুত চেপে বসে অ্যাকসেলারেটরে। শিউরে উঠল কমলকলি: 'ঈশ্ কী নোংরা! যদি গায়ে লাগত? অত কাছে গিয়ে কী দেখছিলেন পাগলটার মধ্যে? কেউ করে ওরকম? ঈশ্...'

—'আমি ভেবেছিলাম ও আরেকজন কেউ। আমার চেনা কেউ।'

—'আপনার চেনা একজন পাগল আছে?'

—'আমার চেনা অনেকজন পাগল, আর একজন মাত্র পাগলি আছে।'

—'আ—হা!' কমলের অপরূপ রঙিন মুখের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজের শার্টের দিকে এক নজর তাকালেন অনুপম রায়। তখন রংটং লেগে যায় নি তো? কমলকলিকে নামিয়ে দিয়ে পথে পোস্ট অফিসটা ঘুরে বাড়ি যেতে হবে। ওখানে কয়েকটা জরুরী কাজ রয়েছে। আজ পৌনে এক ঘণ্টাতেই সেরেছেন কমলকলির পর্ব। এবারে নটার ভোঁ বাজাবে।

॥ ২ ॥

বাড়ি ফিরে খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতেই চিঠিগুলো টেবিলে এনে রাখল কেষ্ট। কফিটা বেশ ভালো হয়েছে। কেষ্ট বলল, সোমশংকর দত্তরায় ফোন করেছিলেন, অনুপমকে ফোন করতে বলেছেন। চিঠিগুলো নেড়ে চেড়ে দেখলেন একটা বড়ো খাম জেনিভার—অনাদের পাঠানো পেপারের কপি একটা দুটো করে এখন জমতে শুরু করে দিয়েছে। সপ্ত হাউস থেকে সেমিনারের নোটিস। এই সংখ্যার 'সাউথ এশিয়ান বুলেটিন'। চতুর্থ চিঠিটি জরুরী, টোকিও থেকে অনুপমের একটি প্রবন্ধের ওপর অধ্যাপক ওকুরা তাঁর বিশদ মন্তব্য পাঠিয়েছেন। ইলেকট্রিক বিলের রসিদ। আর এটা সেই গুজরাতী মেয়েটির প্রেমপত্র। ওঃ, এরা পাগল করে দিতে পারে। হপ্তায় চারখানা করে সবুজ খামে বেগুনী কালিতে ননস্টপ চলিয়ে যাচ্ছে। না বুঝেই ছিঁড়ে ফেলে দেন সবুজ চিঠি। একটা ফোটো ছিন্ন হয়, ছেঁড়া সবুজ খামের উদ্ভিন্ন বক্ষস্থল থেকে খসে পড়ে এক তরুণীর আধখানা হাসি মুখ বাজে কাগজের ঝুড়ির গর্তে।

প্রুফ এসেছে এক তাড়া। বাংলাদেশ যুদ্ধে তিনি যে নিত্য সমীক্ষা লিখেছিলেন, তাই থেকে গুছিয়ে এই বই হচ্ছে। অথচ পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তাঁর যে সমীক্ষা বেরিয়েছিল, তা নানা কারণে এখনো প্রকাশযোগ্য বলে সরকার মনে করেন না। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন সফল হয়েছে, কিন্তু তা কতদিনের? অনুপমের এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। বাংলাদেশ নিয়ে ভারতবর্ষে এই যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছে তাতে অনুপমের মনে হয় না সমীরদের 'বিপ্লব'-এর কোনো ভবিষ্যৎ আছে। নিরীহ, নিরন্ন, নিরামিষ ভারতবাসীর বুকে যে পরিমাণ হিংস্রতা, যে গভীর রক্তের নেশা আছে, তা এইসব যুদ্ধের সময়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু অনুপম জানেন, জঙ্গী মনোভাব আর বৈপ্লবিক মানসিকতা এক নয়। যেমন এক নয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর জাতীয় সংগ্রাম। সব সংঘর্ষেরই অবশ্য একপক্ষে এক ফল—মায়ের ছেলেরা মরে যায়! যুদ্ধ, বিপ্লব, দাঙ্গা, সবকিছুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ কাজ করছে। প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য আলাদা। পদ্ধতিও কিন্তু ফলাফলে একটাই

BanglaBook.org

কমন ফ্যাকটর। মৃত্যু। প্রাণহানি। জীবক্ষয়। রায়বাড়ির ছেলে অনুপম এখনো মাঝে মাঝে কথাটা মনে হলে শিউরে ওঠেন। কিন্তু না। সব মৃত্যু এক নয়। 'ময়ের ছেলে মরে যায়' বুদ্ধিমান ব্যক্তির এভাবে ভাবাই উচিত নয়। মরবে তো সবাই! কে কেমন ভাবে কী জন্য মরল, মরে সে কী পেল, কী দিল, সেটাই খতিয়ে ভাবতে হবে। অনুপম সোজা হয়ে বসেন।

সমীর একটা নাকি কিটব্যাগ রেখে গেছে। কী জিনিস? চাবি দেওয়া আছে। অনুপমের মনের মধ্যে একটা সজারু কাঁটা ফোটানো শুরু করে দেয়। কী কী থাকতে পারে সমীরের ব্যাগে?

কাজে বসার আগেই সোমশংকর দস্তরায়কে ফোনটা সেরে নিতে হবে। এই এক আশ্চর্য ব্যক্তি। প্রেসিডেন্সিতে একসঙ্গে ডিবেট করেছেন তাঁরা দুজনে, সেই থেকে চেনা। গত কত বছর হল কে জানে, এ বি সি ক্লাবে দেখা হয় টেনিস কোর্টে। হেন বিষয় নেই যা নিয়ে সোমশংকর বিদগ্ধ আলোচনা করেন না। বিশ্বসংস্কৃতির কর্ণধার তিনি। এবং কলকাতা পুলিসের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চেরও। ফোনে সোমশংকরকে পাওয়া গেল। এমন আকস্মিকতার জন্য বার বার সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনার পরে তিনি বললেন, আজই দুপুরে একটার সময়ে অনুপম কি এ বি সি ক্লাবে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ রাখতে পারবেন? একটা জরুরী পরামর্শ করতে চান। অনুপম কি তাঁকে কৃতার্থ করবেন।

অনুপমের দুপুর দুটোয় য়ুনিভার্সিটিতে ক্লাস। এখনই দশটা বাজে। একটু ভেবে নিয়ে অনুপম বললেন—একটায় তো হবে না, কিন্তু বারোটার সময়ে যেতে পারেন। সেই রকমই কথা রইল। সোমশংকর বহু ধন্যবাদ দিলেন। কিসের পরামর্শ? বোধহয় ছেলেমেয়েদের ভর্তি হওয়া নিয়ে। এ ছাড়া অনুপমের কাছে তাঁর আর পরামর্শ করার কী থাকতে পারে?

আর একটাই চিঠি খোলা বাকি। একটি ছাত্র লিখেছে টেস্টিমোনিয়াল চেয়ে। ও-হো, সুধার চিঠিটা তো কাল খোলা হয় নি? এইখানেই রেখেছিলেন কাল। একটু খুঁজলেন। পাওয়া গেল না। আরো খুঁজলেন। নাঃ। তবে কি ব্রীফকেসে? সেই তবে? গেল কোথায় চিঠিটা? মন খুঁতখুঁত করলেই অনুপম টাইপরাইটারে গিয়ে বসেন। এখনো তাই বসলেন। ঘণ্টা খানেকের মতো দিব্যি কাজ করা যাবে খেতে যাবার আগে। টেস্টিমোনিয়ালটা লিখে ফেলা যাক এক্ষুনি। আরো একটু কাজ চুকে থাকুক অন্তত।

সুধাও চেয়েছিল টেস্টিমোনিয়াল, ওর হায়দ্রাবাদের চাকরিটার জন্যে। অনুপম লিখেও রেখে ছিলেন। কিন্তু সুধা আর সেটা নিয়ে যায় নি। চাকরি তার এমনিতেই হয়ে গিয়েছে। মাস দু-তিন তো হবেই। আর বিরক্ত করে না সুধা। সত্যি, কী ঝামেলাই যে হয়ে উঠেছিল—প্রায় রূঢ় হয়েই ওকে সরাতে হল। কারো অনুপমের স্বভাববিরুদ্ধ। যে-কোনো অপ্রিয় কাজ তিনি মধুরভাবে, সৌজন্যপূর্ণভাবে উদ্ধার করতে পারেন, সেখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। সুধার বেলায় এ বৈশিষ্ট্য চুলোয় গিয়েছিল।

অবশ্য এই ব্যাপারে তিনি কমলকলির কাছে কৃতজ্ঞ। ঠিক ওই সময়ে কলির উদয় না হলে সুধাকে সরানো যেত না। যেত না? যেত নিশ্চয়ই। তবে আরো অসুবিধে। সুধা যে অন্য ধাতুতে তৈরি। অন্য পৃথিবীর জীব। অনুপম সেই ধাতু, সেই পৃথিবী ভালো চেনেন না। চিনতে চানও না—তাঁর সময় কোথায় অত? জানতে কেউ সর্বজ্ঞ হতে পারে না

সুধা কি রহস্য? ইনিগ্‌মা! না, সুধা অতি সাধারণ, যদিও সে বাঁধা ছকের মধ্যে পড়ে না। না, ওকে ঠিক আনমুজুয়াল বলতেও ইচ্ছে করল না, তবাতার ছকে না পড়লেই যে সে 'অসাধারণ' হবে, তার কোনো মানে নেই। সুধা জংলী। তাই তাকে বুঝে-ওঠা যায় নি। অনুপম সভ্য-সমাজের আইনকানুন জানেন—সেখানে মেয়েরা দু'রকমের হয়। হয় নর্মাল-ঘরোয়া: বীথি, সতী, মারিয়া জাতীয়, অথবা নর্মাল-বহির্মুখী: যেমন কমলকলি, নলিনী। নতুবা অ্যাবনর্মাল: যেমন মেনকা,

BanglaBook.org

প্রমীলা। সুধাও বোধহয় অন্য এক ধরনের অ্যাবনর্মাল প্রাণী। সুধা বুনো।

হঠাৎ খেয়াল হল, অনুপম অনেকক্ষণ ধরে টাইপরাইটারের সামনে বসে আছেন। 'To whom it may concern' এর পরে আর কিছুই লেখা হয় নি। খুব লজ্জিত হয়ে পড়লেন, ঘড়ির দিকে চোখ ঘুটল, যাক, টেস্টিমোনিয়ালটা হয়ে যাবে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর বাধ্য, বিশ্বস্ত যন্ত্র অনুপমের মনকে অক্ষরের অক্ষয় আশ্রয়ে পৌঁছে দিল।

রান্নাঘরে কেষ্ট সেই শব্দ শুনতে পেয়ে নিজেকেই বলল—'হয়েছে! এখন কাজে বসলেন! কখনই বা নাইতে যাবেন, বারোটায় আবার খেতে যাবেন।'

ছাত্রের টেস্টিমোনিয়াল ডাকে দিয়ে, ঠিক বারোটা বেজে পাঁচে এ বি সি ক্লাবে পৌঁছুলেন অনুপম রায়। দাঁতের ফাঁকে জার্মান পাইপ, পালিশ করা হাতির দাঁতের তৈরি। মাথাজোড়া টাকের তিন পাশে কাঁচাপাকা রেশমী ঝালর, চোখে লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমার পিছনে কৌতুকে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ সরু চোখ,লাল ঠোঁটের ওপরে পাকানো মিলিটারি গোঁফের সঙ্গে প্রায় জুড়ে আছে টাকের দু পাশ দিয়ে নেমে আসা ঝাঁকড়া জুলপি, মুখখানা চৌকো, ধপধপে রং, পেশীবহুল পেটা শরীর—রীতিমতো সুদর্শন। সোমশংকর দত্তরায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত এলাহি দীর্ঘতা ছড়িয়ে একটি বৃক্ষের মতো টান টান হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সন্দেহ নেই সব দরজা দিয়ে খুব সহজে প্রবেশ করতে পারেন না এই ব্যক্তি।

প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পরে দুজনে গিয়ে একটা টেবিলে বসলেন।

—'হুইস্কি তো?'

—'না, জিন অ্যানড লাইম। আজ যা গরম।'

—'আপনার গলাটা টেলিফোনে একটু ধরা ধরা লাগছিল? আমি প্রথমটা চিনতে পারি নি।'

—'হ্যাঁ,কাল থেকে দেখছি মাঝে মাঝে গলাটা বসে যাচ্ছে।'

—'যত্ন নেওয়া উচিত, যত্ন নেওয়া উচিত। আপনাদের স্বর তো জাতীয় সম্পদ—হা হা হা। রাত্রে শোবার আগে টিংচার বেনজোইনের ভেপার নিয়ে দেখেছেন? ওটা ধন্বন্তরী।'

—'আজ নিতে হবে একটা কিছু ব্যবস্থা। তারপর? আপনার খবর কি?'

—'খবর? আমাদের আর খবর! রসকষহীন জীবনে আছি আমরা। বাই দা ওয়ে, এই যে কুরোসাওয়ার ফেস্টিভালটা হয়ে গেল সেটা একটা খবর বটে! আপনি ক'টা দেখলেন?'

—'আমি যেতে পারি নি, প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম খাতাদেখা নিয়ে। আপনি সবগুলো দেখলেন নাকি? কটা ছবি হল?'

—'আই'ড্ নেভার মিস্ হিম। নট এব মাই লাইফ! কুরোসাওয়া আমাদের সমস্ত এশিয়ার গৌরব। অফ কোর্স উই হ্যাড সত্যজিৎ রে নাউ আওয়ার ওন শো-পিস! কিন্তু কুরোসাওয়ার মেটল আলাদা—এছাড়া ওর মধ্যে ফ্রুডিটিও আছে, ফ্রুয়েলটিও আছে, রে-তে যা থাকে না। ঠিক টেণ্ডার আর সাবলাইমের পাশাপাশি।'

—'গোটা জাপানী কালচারেই এই নিষ্ঠুরতার দিকটা একটা জাতীয় ঐতিহ্য বিশেষ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে তো তা নয়।'

—'তা বটে। তা বটে। তবে—'

অ্যাশট্রের মধ্যে পাইপটা ঠুকতে ঠুকতে সোমশংকর বলেন—'কুরোসাওয়াতে সেই দিকটা আমাকে অসম্ভব ইমপ্রেস করে। এবারে যে চারটি ছবি দেখলাম প্রত্যেকটিই অসামান্য। একটা নতুন ছবির শেষ দৃশ্যে হঠাৎ দেখা যায় দূরে পার্পল ধোঁয়া উঠছে—ছবিটা কিন্তু ব্ল্যাক অ্যাণ্ড

BanglaBook.org

হোয়াইট—ওই পার্পল ধোঁয়ার প্রতীকী ব্যবহারটা একেবারে তুলনাহীন।'

—'কেন, সত্যজিতের গুপি গাইন বাঘা বাইনের শেষ দৃশ্যেও তো হঠাৎ রং ব্যবহার আছে—সেও প্রতীকী।'

—'ইয়েস, বাট কুরোসাওয়াজ ফিল্ম কেম বিফোর দ্যাট।'

—'ও? আচ্ছা?'

বেয়ারা এসে জিন এবং লাইম রেখে গেল, অন্যদিকে হুইস্কি এবং সোডা। বরফের বালতি, রুপোর চিমটে আর বাদামের পাত্র রইল মধ্যে। পানীয় মেশাতে মেশাতে সোমশংকর বললেন: 'যতই গরম হোক, আমি বাবা হুইস্কি। গোলমাল বাধায় এই সোডাটা, রং যেন ঠিক হতেই চায় না। অ্যায়াম আউট টু সার্চ ফর দি ইটার্নাল অ্যান্সার! হা হা হা।' খোলা হাসিতে ঘরটা প্রতিধ্বনিত করে তুললেন সোমশংকর। হাসতে হাসতেই দেয়ালে কয়েকটি গতিময় অশ্বের সাদা-কালো চীনে রেখাচিত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন: 'ওহ! এই ঘোড়াগুলো দেখেছেন?'

—'দেখি নি আবার! দেখতে দেখতে চোখ ক্লান্ত হয়ে গেল!'

সোমশংকর হাতের পাইপটার অভ্যন্তর নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন: 'দুটি জিনিস আমাকে কখনোই ক্লান্ত করে না—হুইস্কি এবং ঘোড়া। না, রেস খেলার কথা বলছি না—কলকাতাতে আর কীই-বা রেসখেলা হয়? বেট্ ধরতে হয় তো ডার্বি, অ্যাস্কট। অবশ্য কলকাতাতে কয়েকটা দারুণ দারুণ ঘোড়া আছে ঠিকই, জগদ্‌বিখ্যাত ঘোড়া। তিনবার ডার্বি উইনার একটি ঘোড়া—মেয়ার, এই কলকাতাতেই জন্মেছিল। তার নাড়ি এখনো আমাদের ক্যালকাটা পুলিসে রয়েছে। ইটস আ বেয়ার বিউটি। দেখলেই বোঝা যায়, হোয়াই হর্স ইজ কল্ড আ নোবল অ্যানিম্যাল।'

—'আমার কিন্তু ছেলেবেলায় ওই "নোবল" বিশেষণটির এই জাতীয় প্রয়োগ খুবই অপছন্দ ছিল, এখনো পছন্দ হয় না। নোবেলটির ধারণাটা একমাত্র বিবেকবান বুদ্ধিমান জীবের প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য তাই না?'

—'হা হা হা আপনি একজন পশুপ্রেমিক যে নয় তা দেখাই যাচ্ছে। অ্যানাদার জিন অ্যাণ্ড লাইম?' ওয়েটার পুনরায় এসে দাঁড়িয়েছে, এবার খাদ্যতালিকা হাতে। সাধারণত একটার আগে লাঞ্চ শুরু হয় না ক্লাবে। সোমশংকরের পদমর্যাদার জন্য সাড়ে বারোটায় তা দেওয়া হচ্ছে।

—'স্টেক বলি? হাউ উড য়ু লাইক ইট?'

—'মিডিয়াম বলাই ভালো। এ দেশে মাংসের যে অবস্থা তাতে আনডারডান খাবার সাহস হয় না।'

—'সেসব ভাবনা করবেন না মশাই।' আবার হেসে উঠলেন সোমশংকর দত্তরায়।

—'যা প্রাণ চায় তাই অর্ডার দিন, ইটস মিয়ার্লি আ কুয়েশ্চন অব সার্ভিস দেবার সময়ে এনে দেবে কেবল ওয়েলডান, আর ডেরি ওয়েলডান।'

ঘরের অন্য প্রান্তে য়াঙ্গ গ্র্যাণ্ড পিয়ানোতে এক মহিলা কী যেন বাজাতে শুরু করেছেন নিজের মনে।

—'মহিলা নতুন শিখছেন।' সোমশংকর নিচু গলায় বললেন।

—'কী করে বুঝলেন?'

—'হাত এখনো ঠিক সেট করে নি। প্যাস্টোরালটা বাজাচ্ছেন তো, চিনতে পারছেন না? সাদামাটা সুর।'

—'তাই চেনা চেনা লাগছিল। আমি অবশ্য মিউজিক কিছুই বুঝি না। আমাকে যদি বেঠোফেনের বদলে বলতেন ওটা মোৎসার্ট, আমি তফাৎ ধরতে পারতাম না। ঠকে যেতাম।'

—'ছি ছি, ও কথা বলবেন না। তবে ঠকে যাওয়া তেমন তেমন ক্ষেত্রে হলে যে মিউজিক বিষয়ে জানে, তার পক্ষেও একেবারে অসম্ভব নয়। একবার দিল্লিতে ভিনু খাণ্ডেলওয়ালের বাড়িতে

BanglaBook.org

গিয়ে তো বেজায় বোকা বনে গিয়েছিলাম আমি।'

পকেট থেকে নানা সূক্ষ্ম অস্ত্রশস্ত্র বের করছেন সোমশংকর, মহ যত্ন-সহকারে পাইপ পরিষ্কার করছেন। গ্লাসে হুইস্কি প্রায় শেষ।

—'কী রকম?'

—'সে এক মজার গল্প। বেয়ারা? আরেকটা হুইস্কি, আরেকটা জিন।'

—'আমারটা বাদ দিন। আমার এখুনি ক্লাস আছে। দুটোর সময়ে। আর নয়।'

—'না না, একটা তো নিন—স্টেকের সঙ্গে বীয়র চলবে? এসব রেড ওয়াইন তেমন ভালো না। বেশি হেভী একটু সওয়ার।'

—'না—আর কিছু নয় কিছুই চলবে না।'

—'জিনটাই থাকুক তবে।'

প্রচণ্ড শিস্ দিতে দিতে ধূমল ঝলসানো গোমাংস-খণ্ড এসে পড়লো দুটি কাঠফলকের ওপরে। কাঁচা শাকসব্জি, পোড়া আলু আর ব্যাঙের ছাতা-সমেত। আধুনিক মানব-সভ্যতার শীর্ষচুম্বী মহার্ঘ বাদ্য Sizzler' হঠাৎ মনে হল অনুপম রায়ের, গুহামানবদের সভ্যতার শীর্ষচুম্বী বাদ্যের চেয়ে এটি কত প এগিয়েছে?

—'খাণ্ডেলওয়ালের বাড়িতে', পাইপ পরিষ্করণের সরঞ্জাম পুনরায় পকেটস্থ করে যত্ন সহকারে এক টুকরো মাংস কেটে ফ্রেঞ্চ মাস্টার্ড ও উস্টার সস মাখিয়ে, দুটি ব্যাঙের ছাতা সহ কাঁটায় গেঁথে মুখে পুরলেন সোমশংকর। বন্ধ মুখে শব্দহীন চর্বণ চলল কিছু সময়। মুখ খালি হতে বললেন, 'একটা বাজনা বাজছিল। খাণ্ডেলওয়াল বললেন, যে বলতে পারবে এটা কার বাজনা তাকে একটা স্কচ প্রেজেন্ট করা হবে। আমি তো শুনতেই পাচ্ছি স্পষ্ট বাখ্। আমি বাজি ধরলাম।'

—'তারপর?' মুখের মাংস নিঃশব্দে পিষতে পিষতে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নেন অনুপম। 'ডিড য়ু উইন?'

আমি বললাম: 'বাখ্—এনি বেট' উনি বললেন: 'যদি ভুল হয় তাহলে স্কচটা কি তুমিই খাওয়াবে? জেদের বশে রাজি হয়ে গেলাম। তারপরে—সেখানে উপস্থিত একজন বিখ্যাত রাশিয়ান অঙ্কবিদ হেসে হেসে বললেন ওটা নাকি তাঁর নিজের তৈরি করা 'ইলেকট্রনিক বাখ্'—কম্পিউটার-কম্পোজড মিউজিক। তাহলে বাখ্ তো খুবই ম্যাথমেটিক্স, ওঁর নকল করা তাই ম্যাথমেটিশিয়ানদের পক্ষে সোজা। আর লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় অঙ্কবিদরা প্রায়ই সঙ্গীতজ্ঞও হয়? আইনস্টাইন, সত্যেন বোস'

অনুপমের অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে—সোমশংকরের কাছ থেকে চলচ্চিত্র, চিত্রকলা, অশ্ব-কুলজী, পাশ্চাত্ত্য সংগীত, শিল্প-সংস্কৃতির বহু পাঠ নেওয়া হল—এই কারণেই সোমশংকরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না অনুপমের: সোমশংকর নিঃসংশয়ে প্রতিভাধর পুরুষ। তবে বড়ো বেশি প্রতিভাধর। পেশায় অধ্যাপক না হয়ে পুলিস হয়েছেন বলে উনি মনে হয় লজ্জিত।

অনুপম বললেন: 'আমার উচ্চাঙ্গ সংগীতে জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচি কিছুই নেই। আমি ভালোবাসি নাক-নিচু সংগীত। যেমন, পল রোবসন, বিলি হলিডে, লুই আর্মস্ট্রং, এলা ফিট্‌স্‌জেরাল্ড'

—'বা বা বা!! ওঁরা বুঝি নাক-নিচু হলেন? ওঁরা তো সব মহাত্মা। আমি ওঁদের খুব ভক্তি করি: শুধু ওঁরা কেন, আজকালকার বব ডিল্যান, জোন বায়েজ, পীট সীগার? এঁরা? মনে আছে আপনার, সিক্সটি-থ্রীতে পীট সীগারের পার্ক সার্কাস ময়দানে গান?'

—'মনে নেই? ভাবতে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সেই "উই শ্যাস ওভারকাম"—সেই "কীপ য়োর আইজ অন দা প্রাইজ হোল্ড অন"...সে কি ভোলবার?'

'আমি বলি কি, কিটব্যাগটা আপনি বরং থানাতে জমা দিয়ে দিন।'

অনুপমের গলার মধ্যে গোমাংসের টুকরো কি প্রস্তরীভূত হল? তাঁর হাত একমুহূর্তের জন্য

BanglaBook.org

ছুরি-কাঁটার ওপরে বিশ্রাম খুঁজল, তারপরেই পুনরায় কাজে লাগল। মুখে এসেছিল—কিসের কিটব্যাগ? কিন্তু তিনি জানেন এখানে ওসব বৃথা। অনুপম রায় কথা খুঁজলেন। শব্দ...সব শব্দ কি তাঁকে পরিত্যাগ করেছে? নিরুত্তর তিনি আরেক টুকরো মাংস কাটলেন। আস্ত একটি পোড়া আলু কাঁটায় গেঁথে নিয়ে নিজের মুখটি বন্ধ করে দিলেন কিছু মুহূর্তের মতো। কিছুক্ষণ দুজনেই সম্পূর্ণ চুপ।

সোমশংকরই আবার বললেন: 'দেখুন কিটব্যাগটাতে ইনক্রিমিনেটিং মেটিরিয়ালস থাকলে আপনাকে মুশকিলে পড়তে হবে।'

অর্ধভুক্ত সব সুস্বাদু খাবার পড়ে রইল। ছুরি কাঁটা নামিয়ে রেখে এবার জিনের গ্লাস মুখে তুললেন অনুপম রায়।

—'কী হল? বেশি শক্ত বুঝি?' বলতে বলতে যত্ন সহকারে ধীরেসুস্থে টোমাটো এবং লেটুস সমেত শেষ মাংসের খণ্ডটি মুখে পুরে সোমশংকর অনুপমের দিকে তাকিয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে বলেন: 'শক্ত হবে না?—যা বাজে কোয়ালিটির মাংস। এ দেশে তো কোয়ালিটি কন্ট্রোল বলে কিছু নেই। আপনার দুটোর সময় কিসের লেকচার—জর্নালিজমের না পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্সের?'

অনুপম রায় বললেন 'কিটব্যাগটা জমা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা আমার ছাত্র।'

একগাল হেসে ফেলে সোমশংকর অগাধ স্নেহের সঙ্গে বলেন: 'কী মুশকিল। একটু তো প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে? ওদের কাছে আপনিও কিন্তু শ্রেণীশত্রু। বুঝলেন? ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। ওটা নিজেই থানায় জমা দিয়ে দিন। আজই তা হলে সার্চ হলেও কোনো কেস হবে না। ঝামেলা চুকে যাবে।'

অনুপম রায়ের চোখে ভেসে উঠল খাবার টেবিলে সমীরের হাসি হাসি চোখ। হাতের স্ফটিকপাত্রে স্বচ্ছ শীতল পানীয়, তার মধ্যে ডুবছে ভাসছে শ্যামল সতেজ তাজা লেবুর চাকতি। ওতে কি অনুপম রায়ের ঘোলাটে চশমাপরা মুখখানাও ডুবছে ভাসছে? হাবুডুবু খাচ্ছে? কী করবে তুমি এখন অনুপম রায়? সমীরের কিটব্যাগের মধ্যে অনুপম রায়ের ভবিষ্যৎ চাবি দেওয়া আছে।

কী সব যেন বলছেন সোমশংকর।

—'আপনার মতো মানুষের কাছে দেশের কত আশা: এ-সব ছোটোখাটো বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। এসব হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা।'

আগুন নিয়ে ওরা খেলতে পারে আর তুমি খেলতে পারো না বুঝি? অনুপম?

—'আপনার 'সাউথ এশিয়ান বুলেটিন' এর লেখাটা দেখলাম। চমৎকার হয়েছে। সত্যি যু আর অ ব্রিলিয়ান্ট অ্যানালিস্ট। 'নিউ লেফট রিভিয়ু'-তে কিন্তু আমার মনে হয় আপনি একটু বেশি বেশি যেন ক্রিটিক্যাল হয়ে পড়েছেন—তাই নয় কি? বুঝলেন না, আপনাদের কলম পৌঁছয় দেশ-বিদেশে, আপনাদের কলমের যোঁচাতেই তো দেশের ইমেজের বাঁচামরা—উই ব্যাডলি নীড মোর কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম অ্যাট দিস ক্রিটিকল আওয়ার।' কী আশ্চর্য! সোমশংকর দত্তরায় অনুপমকে ডেনে এনে এত উপদেশ দেবার কে? কী জানে সে? নেহাত অ্যাকাডেমিক বলেই তাঁকে খাতির করে ডেকে এনে মদ্য মাংস সহযোগে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে—রেয়াৎ করা হচ্ছে সন্দেহ নেই। এটা সোমশংকর নিজে থেকেই করেছেন—রাজার প্রতি রাজার আচরণ। বুদ্ধিজীবীকে বুদ্ধিজীবী না রাখিলে কে রাখিবে?

—'প্লীজ ডোন্ট টেক ইট আমিস্—আমার কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি ভাবলাম আপনার সঙ্গে কথাটা বলে নেওয়াই ভালো। দে আর ফাইটিং আ লুজিং গেম, দে ক্যান নেভার উইন।'

হেরে যাওয়ার খেলা? অনুপম? তুমি জিততে পারবে না? বাদলের মুখখানা মনে করো।

BanglaBook.org

সমীরের সেই খুদে দাঁত দুটো মনে করো। কালও মীটিংয়ে কী বলে এলে মনে করো। সঞ্জীবকে যে লেখাটা দিলে সেই নিবন্ধে কী লিখেছ মনে করো। সেটা আজ কম্পোজড হবার কথা এতক্ষণে। অনুপম, তুমি কিটব্যাগ জমা দিয়ো না। ওটা বরং দর্জিপাড়ায় রেখে এসো। অবশ্য সেখানেও সার্চ হবে: এক সুধা। হ্যাঁ। সুধাই রাখবে। কিন্তু সুধা তো...আচ্ছা, কিটব্যাগটা গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেললে কী হয়? অথবা চকুরিয়া লেকে?

ওয়েটার এসে প্লেট তুলে নিয়ে, মেনু রেখে গেল। মেনু দেখতে দেখতে সোমশংকর দত্তরায় বললেন: 'একটা ট্রাইফ্ল নিন।' অনুপম মাথা নেড়ে না করলেন।

—'তবে একটা পীচ মেলবা? চকোলেট সান্ডি? বানানা ফ্রিটার্স? কিচ্ছু না!'

অনুপম না-সূচক মাথা নেড়ে যান। মেনু ফেরত দিয়ে, টেবিলে পাউচ রেখে বলকান সোব্রানি তামাক পাইপে ভরছেন সোমশংকর:

—'কফি?'

'কফি একটা বরং চটপট খেতে পারি। ব্ল্যাক।'

—'কনিয়াক দুটো, আর ব্ল্যাক কফি ডেমি-তাস দুটো। আর এক প্যাকেট ইণ্ডিয়া কিং। একসঙ্গেই বলে দিলাম, আপনার তো আবার তাড়া রয়েছে। লেকচার না এখন?'

অনুপমের হঠাৎ সোমশংকরের সাহচর্য অসহ্য লাগে। এখনো কফি খেতে হবে, এখনো কনিয়াক, লৌকিকতা আরো বাকি! ভাবতেই তাঁর দেহের মধ্যে একটা আপত্তি ঘুরপাক খেয়ে গলা দিয়ে ঠেলে উঠতে চাইল। অনুপম, তুমি এইটুকুতেই ধৈর্য হারাও? সোমশংকর তো ফ্রেণ্ড। দেখছ না কেমন ফ্রেণ্ডলি টক, কেমন ফ্রেণ্ডলি স্মাইল। ফ্রেণ্ড না হলে কি তোমাকে সতর্কবাণী দিত? বুদ্ধিজীবীকে বুদ্ধিজীবী না রাখিলে ইত্যাদি। সোমশংকর অতি যত্নে পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন, মহার্ঘ বিলিতি সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে, তাঁর কর্তব্যেরই মতো ঘরের আবহাওয়াকে শাসিত করছে।

কফি, সিগারেট ও কনিয়াক এসে পড়ল। স্বাদু খাদ্যে মুখ ডুবিয়ে গলা থেকে বুক পর্যন্ত জ্বলে যেতে লাগল অনুপম রায়ের। সোমশংকর তাঁকে ইণ্ডিয়া কিং অফার করেছেন। যত্ন করে গ্যাসলাইটার দিয়ে মুখাগ্নি করে দিয়েছেন। বিচিত্র গোত্রের তামাক বিষয়ে আলোচনা শেষ করে সোমশংকর এখন কনিয়াকের সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ আলোচনা করছেন। থ্রি স্টার ফাইভ স্টার ভি এস ও পি শ্যাম্পাইন কনিয়াক। এ সবই জানেন অনুপম। এসবই বহু-বহুবার বলেছেন অনুপম রায় নিজেই। নানান পার্টিতে। সর্বত্রই তো এই একই খেলা। চক্রবৎ কথোপকথনের মালা ঘুরে চলে পার্টি থেকে পার্টিতে—মুখ থেকে মুখান্তরে—একই বিস্ময়—একই প্রশ্ন একই রসিকতা—এক গসিপ—একই বিনয়াবনত অহমিকা—শুধু কথামালা—শুধু শব্দমালা—সময় চলে যাচ্ছে—কিটব্যাগটা কি জমা দিতেই হবে? অনুপম ছাই ঝেড়ে সোজা হয়ে বসেন: অনুপমের গলার মধ্যে কেমন একটা বোজাবোজা মজাপুকুরের মতো ভাব—কেউ যেন মুঠো করে টিপে ধরছে বুকের ভেতর থেকে তাঁর কণ্ঠনালী। গলাটা ঝেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন কয়েকবার—তারপর ধরা গলাতেই বললেন, 'ধন্যবাদ, খবরটা দিয়ে ভালো করলেন। দেখি এখন কীভাবে ছেলেটাকে সাবধান করে দিতে পারি। ওই ব্যাগ নিতে চলে এলে তো ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে সে'—(আজই, আজই তো আসবে সমীর)...স্নেহ-বিগলিত হাসিতে গোঁফ কেঁপে যায় সোমশংকরের: 'দূর মশাই, আপনারা সত্যি বড়োই ছেলেমানুষ। কাগজে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করেন এত জটিল সব পলিটিক্যাল মুড-এর, আর এটুকু ধরতে পারছেন না? যে ছেলে আপনার বাড়িতে রোজ আসছে, তাকে কি আমরা ইচ্ছে করলে ধরতে পারি না?'

—'তবে?'

—'আরে ওকে ফলো করেই তো আমরা অনেকগুলো ঘাঁটির খোঁজ পেয়েছি। বড্ডো কেয়ারলেস

BanglaBook.org

ছেলে। কিছুই টের পায় নি, মাসখানেক ধরেই ওকে আমরা টেইল করছি! বাই দ্য ওয়ে—আপনার কলামটা সত্যি অসামান্য স্টাইল, কিন্তু ওরিয়েন্টেশনটা যদি আর একটু, মানে ন্যাশনাল ফ্রন্টটাতে আরেকটু কনস্ট্রাকটিভ হওয়া আর কী—ওদের প্রতি বেশি সিমপ্যাথি না দেখানোই ভালো...সরকার খুব স্টার্ন অ্যাটিচ্যুড নিয়েছে...'

—'ধন্যবাদ। আমাকে জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এবার আমাকে উঠতেই হচ্ছে। বেয়ারা—বিল আমার একাউন্টে যাবে।'

'সার্টেনলি নট। ডোন্ট বি অ্যাবসার্ড। আপনি হলেন আমার গেস্ট—আরে মশাই এইখানে আমার গেস্ট হতে আপত্তি কিসের? আমাদের 'অন্য' গেস্ট-হাউসটিতে তো আপনাকে আতিথ্য দিচ্ছি না?...হা হা হা হা, সেইটেই যাতে না হয় সেজন্যেই তো আজ ডাকলাম—হা হা হা হা হা'

সোমশংকরের প্রাণখোলা হাসি প্রায় জনশূন্য হলঘরটির অভিজাত শান্তিকে মুহূর্তে চূর্ণ চূর্ণ করে ফেলল।

কাঁচা হাতের প্যাস্টোরাল অনেকক্ষণই থেমে গেছে—সেই হাসি অনুপমের বুকের লক্ষ্যে স্টেনগানের ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা'র মতো ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত, পুনঃধ্বনিত হতে থাকল।

উদ্‌বিগ্ন ছেলেমেয়েদের চক্রব্যূহ ভেদ করে কোনো রকমে বেরিয়ে এলেন অনুপম রায়। কিছু ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে আসছে। আজ লেকচার দিতে দিতে হঠাৎ বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। একেবারেই হঠাৎ। মধ্যপথে 'এক্সকিউজ মি' বলে বেরিয়ে এসেছেন অনুপম। ক্লাস শেষ করতে পারেন নি। ছাত্রদের সন্ধানে নিবৃত্ত করলেন গাড়িতে উঠে। স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বসে প্রথমে ভাবলেন—এখন কোথায়?

দর্জিপাড়াতেই যাওয়া যাক। একবার ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে। দর্জিপাড়ায় তাঁদের পুরোনো ডাক্তার আছেন। গলায় ঠাণ্ডাটাণ্ডা লাগল, না কী হল সেটা জানা দরকার। তারপরে? তারপরে কোথায়?

অনুপম রায় কি আইনের চেয়ে শক্তিমান হয়ে উঠতে পারেন না? সরকার স্টার্ন অ্যাটিচ্যুড নিলে অনুপম কি স্টার্নার অ্যাটিচ্যুড নিতে পারেন না? না। পারেন না। আফটার অল, তিনি ব্যক্তিমাত্র, ওনলি অ্যান ইনডিভিজুয়াল। তিনি তো একটা ইনস্টিট্যুশন নন।

কিটব্যাগটা—

দর্জিপাড়াতে পৌঁছেই অনুপম কেষ্টকে ফোন করে বলে দিলেন, সমীর এলে তাকে যেন তার কিটব্যাগটা দিয়ে দেয়। এবং সমীরকে রাত্রে অন্যত্র শুতে হবে, কেননা মা যাচ্ছেন অনুপমের সঙ্গে আজই। ওটুকু বলতেও গলায় বেশ কষ্ট হল। ডাক্তারবাবু ছিলেন না; যাক, কাল হবে। মা-কে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন অনুপম।

বাড়িতে ঢুকেই জানলেন—না, সমীর আসে নি। কিটব্যাগ খাটের তলা থেকে জুলজুল করে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে মনে আশা করছিলেন, বাড়ি ফিরে দেখবেন সমস্যা আপনা-আপনি মিটে গেছে, যার কিটব্যাগ সে এসে নিয়ে গেছে। কিন্তু এ তো অযৌক্তিক আশা, ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নের মতো। তা হলে কি এবার? এখন বরং একটু কনিয়াক কী হুইস্কি হলে মন্দ হত না। কিন্তু হবে না। মা। মনটা এবার তৈরি করে নিলেন অনুপম। সহজভাবে কিটব্যাগটি হাতে নিয়ে যথাসাধ্য স্পষ্ট গলায় বললেন: 'কেষ্ট, আমি একটু বেরুচ্ছি। সমীর-বাদলরা কেউ এলে দরজা খুলে দেবার দরকার নেই।'

কেষ্ট রান্নাঘরে ছিল। ঠিকমতো শুনতে পায় নি ভেবে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। 'কী বললেন

BanglaBook.org

দাদাবাবু? দরজা খুলে দেবার...' বলতে বলতেই কেষ্ট বেশ বুঝতে পেরে গেল, সে ঠিকই শুনেছে। অনুপম স্পষ্ট দেখলেন, কেষ্টর এক চোখে জটপাকানো অবিশ্বাস, অন্য চোখে ভৎর্সনা।

অনুপমের কোনোকালে যা হয় না, তাই হল। অসহিষ্ণু গলায় বললেন—যদিও সে গলা প্রায় বুজেই এসেছে—'হ' বলছি তাই করবে। যাকে-তাকে দরজা খুলে দিতে হবে না।'

জুতোর অধীর শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেলেন অনুপম—গাড়ির দোর বন্ধ করার 'টাল্' শব্দ হয় খুব জোরে দাপিয়ে স্টার্ট দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল অনুপম রায়ের রুদ্ধশ্বাস গাড়ি, সমীরের কিটব্যাগ সমেত। কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো, মোড়ের বাঁকে তার চিহ্ন মিলিয়ে যায়।

॥ ৬ ॥

থানা থেকে বেরিয়ে অনুপম সোজা গেলেন 'ডেইলি নিউজ'-এর অফিসে। কাল সন্ধীরের হাতে যে ম্যাটারটা দিয়েছিলেন তার খোঁজ করতে। না এখনো কম্পোজও হয় নি। প্রেস থেকে তুলে আনলেন লেখাটা। একটু অদল-বদল করতে হবে, এ্যাপ্রোচটা পালটে দেওয়া দরকার।

কাগজের অফিসে পুলকের সঙ্গে দেখা হল। দত্তরের সঙ্গেও। দত্তর ওঁকে দেখেই ডাকলেন,—'চলুন আমার সঙ্গে আজ একটা সেসন হোক, অনেকদিন বসা হয়নি।' পুলক ইংরিজি কাগজে প্রুফরীডার, আর বাংলা কাগজপত্রে গল্প লেখে। শুনেছেন বেশ নামও করেছে। অনুপম অবশ্য সে-সব পড়েননি। সময় কোথায়? কিন্তু পুলক ছেলেটাকে বেশ লাগে তাঁর। দিব্যি সিনসিয়র ধরনের। দত্তরের কাছে মার্জনা চেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন অনুপম। তারপর পুলককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওরা কী লিখছে-টিকছে কী ভাবছে-টাবছে শোনা উচিত মাঝে-মাঝে।

বুকের ভেতরটায় কেমন একটা দমবন্ধ ভাব হচ্ছে আজ। অনুপমের মনে হলো মুক্তি চাই, চাই একটু স্বাস্থ্যকর নিশ্বাস-বায়ু গ্রীন ড্রাগন এদিক থেকে ভালো। লনে বসা যায়।

আঃ! একটু খোলা হাওয়ার জন্য অনুপমের বুকে গলায় তেষ্টা। বুকের মধ্যে ঢেউ তুলে আছড়ে পড়লো একটা সুর—তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে...ছিন্ন করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি, কিন্তু অনুপম আমল দিলেন না। দূর! যতো অ্যাবসার্ড আইডিয়াজ—ডুবতে রাজি কেউ কখনো থাকে? ইচ্ছে করে কাছি ছিন্ন করে না কেউই।

বার বার মাছি তাড়ানোর মতো হটিয়ে দেন, তবু নাছোড় সেই খোলা হাওয়ার গান অনুপমের বুক গলার মধ্যে কুমোরের চাকের মতো পাকের পরে পাক দিতে থাকে। ভিতরে-ভিতরে গড়ে উঠতে থাকা পাত্রটিকে ভেঙে ফেলতে চেয়ে জোর করে অন্য কথায় যান অনুপম: 'তারপর? কী লিখছেন-টিকছেন আজকাল? নতুন কিছু?'

—'একটা উপন্যাসে হাত দিয়েছি।'

—'বাঃ, এক্সেলেন্ট! নিশ্চয় দারুণ হচ্ছে।'

—'দেখা যাক কপালে কী আছে।'

—'কপাল আবার কি? আপনি যখন লিখছেন, সে-লেখা সিদ্ধ হবেই।'

—'তার কোনো মানে নেই। আমার কাজ তো কেবল মিস্ত্রির। বাকী কাজ অন্যের হাতে।'

—'মানে? রীডারশিপের রুচির কথা বলছেন? আপনার অন্তত রীডারশিপের হাতে নিজেকে দেওয়া উচিত নয়।'

—'সিদ্ধি যাঁর হাতে তাঁর হাতে যদি নিজেকে একবার ছেড়ে দেওয়া যেতো, তাহলে তো মিটেই যেতো সব সমস্যা। সেইটেই যে পেরে উঠছি না।'

ইতিমধ্যে তাঁদের পানীয় এসেছে। বরফটা আজ বাদ দিয়েছেন গলার জন্য অনুপম রায়।

BanglaBook.org

বরফবিহীন পানীয়টি বড়োই বিস্বাদ লাগছে। সত্যিই এর চেয়ে এক কাপ গরম কফি খেলে হত। গলাটা কে যেন মুঠোয় চেপে ধরছে থেকে থেকেই। অকস্মাৎ পুলকের পিঠের ওপরে একটি সশব্দ থাবড়া—'কী মশাইরা কী হচ্ছে এখানে? গুজুর-গুজ, ফুসুর-ফুস? নুকিয়ে নুকিয়ে দুজনে মিলে রঁদেভু? খাওয়া-দাওয়া? পুলক, হেতি যক দিচ্চিস আজকাল অনুপমবাবুকে, অ্যাঁ?'

আঃ। অনুপম ঠিকপায় চোখে দেখলেন রমেনের টিপিক্যাল আবির্ভাব ঘটেছে! এই সন্ধ্যা রাত্রেই আধমত্ত।

—'কী নিয়ে কথা হচ্ছিলো, শুনতে পারি?'

—'পুলকের লেখাটেখা নিয়ে।'

—'ঠিক তা নয়। সিদ্ধিলাভ ও ঈশ্বর বিষয়ে।'

—'তাই বলুন! পুলকের ঈশ্বর। আমি বলি স্বয়ং ঈশ্বর বুঝিবা! পুলকের ঈশ্বররা তো সকলেই ঈশ্বরী।—ঈস্ত্রাণী।'

বলতে বলতে রমেন দুই হাতে শূন্যেই তাকর্ষ গড়ে। বাঁ-চোখ মেরে হাসে।

—'যোটেই না। রমেনদা, তুমি সব তাতে ও-সব বাজে ঠাট্টা কোরো না তো।'

—'তুই শালা বড্ডো লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়তে শিখেটিস্ আজকাল, বল্ ক' তাড়া প্রুফ দেখলি আজ? ছ'? ক' ফর্মা? বল্?'

অনুপম বুঝলেন এটা বেল্টের নীচে আঘাত করা হল। পুলক নিজেকে শিল্পী বলে বিশ্বাস করে। প্রুফ রীডারের প্রসঙ্গটা মনে করতেই ভালো লাগে না তার। রমেনের ওপর তাঁর মনটা আরো বিরূপ হলো। যুক্তির অভাবে এ হচ্ছে দুর্যুক্তি-প্রয়োগ। শক্তির অভাবে চলাকি। অনুপম বললেন: 'পুলক এখন একটা উপন্যাস লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছে।'

—'আই সী?'

রমেন দাঁড়ি-গোঁফের ফাঁকে দাঁত দেখিয়ে হাসে। 'দাও ঠ্যাংটা, 'আট পৃষ্ঠায় অষ্টাদশ অধ্যায়? এবার পুজোর নবতম সম্পূর্ণ উপন্যাস? গড্ ব্লেস দী চাইল্ড, অ্যাণ্ড দাই রীডার্স্ টু! ঈশ্বর! ইহারা জানে না ইহারা কী করিতেছে!'

—'রমেনদা, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

ঈষৎ আলটপ্কা প্রশ্ন করে বসে পুলক।

—'নো স্যার। আই ডু নট বিলীভ ইন এনি আনআর্থলি ক্রীচার অর ক্রিয়েটর। বুঝেচ?' বলেই রমেন পুলকের পানীয়টুকু সাবধানে নিজের গলায় ঢেলে নেয়। সেদিকে দৃক্পাত না করে পুলক বলে: —'নিশ্চয় করো। তুমি না শিল্পী? আলবৎ করো। তোমার ঈশ্বরে বিশ্বাস না-করা-টরা সব বাজে কথা। অমন ছবি তুমি কখনো আঁকতেই পারতে না বিশ্বাস না হলে।'

—'কেন রে? সে ব্যাটা তো আগে কেবল বইটই লিখতো, চারখানা বেদ, দু'খানা বাইবেল, ওহ্ গাদা সব বই লিখেছে আজকাল আবার ছবিটবিও আঁকছে নাকি? অ্যাঁ? হ্যাঃ হ্যাঃ।'

—'রমেনদা, তোমার বয়েস কতো হল? চল্লিশ নিশ্চয় পেরিয়েছো?'

—'কেন? নিকেল ফ্রেমের ক্ষুদ্র সস্তাটাকে দাড়ির জঙ্গল থেকে উদ্ধার করতে করতে রমেন বলে: 'এটাকে কি চালশের মতোন দেখাচ্ছে, নাকি চোখ দুটোকে শমার মতো?'

—'রমেনদা, একটু নিজের দিকে চাও দিকি এবার। এটা তোমার দুর্বিনয় নয়—এটা আত্ম-অশ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা এবং বিনয় এই দুটোই হচ্ছে শিল্পের আলো আর বাতাস রমেনদা।'

—'থাম্ বাবা, অত বাণী দিস্নি। কই অনুপমবাবু, তিনটে বি কে অর্ডার দিন তো দেখি?'

সত্যি, অনুপমেরও বাজে লাগছে। এরা কী সব এলেবেলে আলোচনা করছে, পুলকের সঙ্গে না এসে দপ্তরের সঙ্গে—কিংবা বাড়ি ফিরে পেপারটা লিখলে কাজে দিতো। বিকেল বেলায় বাতাসটাও দেয়নি এখনও পর্যন্ত। এক একদিন এরকম হয়। হাওয়া দেয় না।

BanglaBook.org

—'রমেনদা, প্লীজ তুমি একবার নিজের দিকে চাও। অমন নড়বড়ে মন নিয়ে কি শাশ্বত কিছু তৈরি করা যায়?'

—'আইব্বাস। এ যে হাই ফিলসফি? কে গো তুমি? মহর্ষি মহেশ যোগী? নাকি, খাস ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট?'

—'ঠাট্টা কোর না রমেনদা। ঠাট্টা করতে নেই। গীতার সেই শ্লোকটা মনে নেই, সেই যে, যেখানে বলছেন রিপুতাড়িত হয়ে মানুষ তার নিজের মধ্যে এবং অপরের মধ্যে ভগবানকে অপমান করে—আর সেই পাপীদের কী রকম ভয়ানক শাস্তি হয়...ঈশ্, আমি মনে করতে পারছি না, সেই যে...অহংকারং বলং দর্পং?'

মনে আবার নেই! হয়তো রমেন এসব না জানতে পারে; কিন্তু অনুপমের খুবই মনে আছে। অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু। জানবেন না? সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা শুনতে হয়নি বাবার গীতাপাঠ? বাবার ভাগবত পাঠ? কিন্তু অনুপম শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন না। পুলককে ধরিয়ে দিলেন না তার হারানো সূত্র। যেমন নিঃশব্দে বসেছিলেন, তেমনিই রইলেন।

—'না না ওসব গুলগাঁজা তোমার।' রমেনদার কিস্যু মনে নেই। মনে ছিলও না কোনোকালে। 'জ্বালাতন করিসনি বাপু। আমার কথাটা শোন্ ভাই তাচ্ছেয়ে, ওসব ঈস্‌স্যার-ফিস্‌স্যারের চাইতে এমনকি মেয়ে মানুষ পর্যন্ত ভালো। বুইলি?'

মেয়েমানুষ পর্যন্ত ভালো মানে? মনে মনে নির্বাক মন্তব্য করলেন অনুপম। মেয়েমানুষ তো ভালোই। অন্তত ঈশ্বরের চাইতে ঢের ভালো। কতো বাস্তব। ডাকলে আসে, রিয়্যাক্ট করে, ধরা ছোঁয়া যায়, একটা ট্যানজিবল ট্রুথ তো বটে! কোন তুলনা হয় না।

—'একটু সিরিয়াস্ হও রমেনদা, একটু নিজের দিকে তাকাও। এখনও সময় আছে, কেন নষ্ট হচ্ছো এরকমভাবে?'

—'শালা! তুই যে আমার বউকে হার মানালি। সে বেটিকে যতো বলি, —বেটি যা, দূর হয়ে যা, বাপের বাড়ি, যমের বাড়ি, যেদিকে দু' চক্ষু যায় চলে যা,—বেটি নড়ে না, আর কেবল এই একই কথা ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, কেন নষ্ট হচ্ছো—কেন নষ্ট হচ্ছো—কানের পোকা বের করে দিলে মাইরি, বেটি মরেও না, নড়েও না। কারুর সঙ্গে বেলাবেলি ভেগে গেলেও তো পারে? এখনও দিব্যি টুসটুসে—'

—'রমেনবাবু! কি হচ্ছে!'

ভেতরের অস্থিরতা, ক্রোধ, অনুপমের অনুচ্চকণ্ঠে বিন্দুমাত্রও তরঙ্গিত হয় না। তীক্ষ্ণ, ধাতব আদেশের আওয়াজে ক্ষ্যাপা হাতির মাথায় যেন চেনা মাহুতের ডাঙোশ পড়লো। এক মুহূর্ত সবাই চুপ। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এলো। ঘেরা মাঠের সাজানো ঝোপঝাড়ে ছোট ছোট রঙিন বৈদ্যুতিক জোনাকি জ্বলছে নিবছে। অন্ধকার চিরে কোথায় একটা পাখির একহারা অসময়ের কান্না শোনা গেলো—ক্রী—ব...ক্রী—ব...ক্রী—ব।

অনুপম বেয়ারাকে ডেকে বি কে অর্ডার দিলেন; না, তিনটে নয়, দুটো। আর বিলটাও চাই তার সঙ্গে।

—'আমি আর খাবো না, আমাকে আজ তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। আরেকটু থাকতে পারলে অবশ্য ভালো লাগতো। বাড়িতে মা আবার বসে থাকবেন।'

ঠোঁট ছড়িয়ে হাসির ভঙ্গি করলেন; এটা হাসি নয়। বিশুদ্ধ সৌজন্য। না, আরও থাকলে ভালো লাগতো না। ভালো লাগছে না। রমেনের খিস্তিখেউড় পুলকদের শোনা অভ্যেস আছে,

BanglaBook.org

অনুপমের নেই। সন্ধেবেলা নিরিবিলি একটু মানুষের মতো গল্পসল্প করতে আসা; একটু রিল্যাক্স করতে আসা। ঈশ্বর প্রসঙ্গ কি এখানে মানায়? এই বয়েসে? যে বয়েসের যা। প্রথম জীবনে মার্ক্সিজমের পাঠ নিতে গিয়ে নতুন করে ঈশ্বর নিয়ে ভাবতে হয়েছিলো বৈকি তাঁকেও। জগতে এমন কোনো প্রকৃত মার্ক্সিস্ট নেই যে সিরিয়াসলি একবারও ঈশ্বর নিয়ে ভাবেনি। ভেবে-চিন্তে তবেই না রিজেকশনের প্রশ্ন ওঠে? কিন্তু তাই বলে এখনও? দূর! দূর!

রমেন একেবারে চুপ মেরে গিয়েছে। কিন্তু পুলক খুব উত্তেজিত। সে বলছে: 'যে মানুষ মুখে বলে আমার ঈশ্বর চাই না, সে হয় মিথ্যেবাদী, নয় সত্যপুরুষ। এ আমি কিছুতেই মানবো না যে কোনো পরাজয়ের বা সর্বনাশের মুহূর্তে, কোনো ভয়ংকর পতনের সময়ে মানুষের ঈশ্বরের কথা মনে না হয়ে পারে। মানুষ তো পারফেকশনে পৌঁছয়নি।'

—'না ভাই, থ্যাংকিউ, একটা জীবন কাটিয়ে দেবার পক্ষে এই অভাগা একাই যথেষ্ট; তোমার সর্বশক্তিমানকে আমার কোনো দরকার নেই।' আশ্চর্য শান্ত, স্বস্থ গলায় রমেন বললো।

এমনিতে অসহনীয় হলেও রমেনের এই কথাটি অনুপমের মনে ধরে। আত্মবিশ্বাসকে তিনি শ্রদ্ধা না করে পারেন না। মানুষের আত্মবিশ্বাসের শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে এই অন্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাস। ঈশ্বর-বিশ্বাস মানেই পরনির্ভর, পরাশ্রিত, পরাধীন। আধুনিকতা মূলত ঈশ্বরের বিরুদ্ধমুখী স্রোত।

—'রমেনদা, তুমি যদি একবারও ভালো করে ভেবে দেখতে—'

—'কে বলছে তোমাকে আমি ভালো করে ভেবে দেখিনি?' টেবিলে ঘুঁষি বসিয়ে অকস্মাৎ বিকট গর্জন করে উঠলো রমেন। টেবিল কেঁপে উঠলো, কিন্তু বয়কের সঙ্গে কাচের গ্লাস গা-ঠেলাঠেলি করে হেসে উঠলো, ঠাট্টায়।

—'যে ছেলেটা ষোলো বছর বয়সে বাপ মা আর ভগবানের অথরিটি রিজেক্ট করবার কথা একবারও ভাবেনি তার বয়ঃপ্রাপ্তিই ঘটেনি। সে অ্যাডাল্ট নয়। সে ঘরে বসে তোমার মতন কবিতা লিখবে। বুঝেচ? পঁচিশ বছর বয়েসে যে পুরুষ মেয়েমানুষ আর মৃত্যু নিয়ে ভাবলো না তার যেমন যৌবনই আসেনি এও তেমনি। অ্যায়াম সরি এ ফুল, বুঝেছ ব্রাদার, আই হ্যাভ রিজেকটেড হিম লং লং এগো।'

—'ঠিক কথা! একদম ঠিক।' একটুও না-ভেবে পুলক দ্বিগুণ উৎসাহে বলে। অনুপম লক্ষ্য করেন তার সিগারেট পুড়ে গিয়ে ফিল্টার পুড়ছে, দীর্ঘ ছাই। অ্যাশট্রেটা না পোড়া পর্যন্ত পুলকের খেয়াল হবে না। একবার মনে হল বলেন, পুলক, সিগারেটা ফেলে দিন। কিন্তু পুলকের অতি উৎসাহ দেখে কেমন যেন অদ্ভুত কুঁড়েমিতে পেয়ে বসল তাঁকে। বলা আর হলো না।

—'ঠিক।' সোৎসাহে পুলক বলে। 'কিন্তু সেই রিজেকশনেই তো থেকে থাকলে হবে না, যদি সেখানেই থেমে থাকো তবে তুমি অবরুদ্ধ বয়ঃসন্ধির সমস্যায় ভুগছো বলে ধরে নিতে হবে। শিল্পের মূল লক্ষ্য তো পরিত্যাগ নয়, পুনরুজ্জীবন। তুমি নিশ্চয় মানবে যে রিজেকশন নয়, রেজারেকশনই শিল্পের উদ্দেশ্য?'

এই সময়ে মৃদু আর্তনাদ করে পুলক ছুঁড়ে ফেলে দেয় হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে। ঘাস-মাটি বিনা প্রতিবাদে এই আগুন হজম করে ফেলে। অগ্নিকণাটি নিশ্চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে যায়।

আরে দূর! কী ছাই আজেবাজে আলোচনা হচ্ছে আজ। সন্ধেটাই মাটি। জগতে কি আলোচনার বিষয়বস্তু সব ফুরিয়ে গিয়েছে? মৃত্যু-ফিত্যু, শিল্প-ফিল্প, ঈশ্বর-ফিশ্বর ভিন্ন আর কিছু নেই? কোনো জরুরি বিষয়? নাঃ, আর ইনার্শিয়া নয়। জোরে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন অনুপম রায়। কিন্তু মাঠ কোনো শব্দই হতে দিলো না। স্টিলের চেয়ারে সশস্ত্র ক্ষুরের গলাও অনায়াসে চেপে ধরলো তুচ্ছ ঘাস-মাটি।

—ন'টা বেজে গেছে? অনুপমের মাংসের ভেতরে, চামড়ার তলা দিয়ে একটি হিলহিলে

BanglaBook.org

শতপদী সরীসৃপ এঁকেবেঁকে দ্রুত সরে গেল। এসেছিলো কি? সন্তর্পণে তিনটে টোকা মেরেছে। আবার। আবার। আবার টোকা। আবার। আবার দরজা খোলেনি। চলে গেছে? কোথায় চলে গেলো সে?

কী মনে করতে করতে চলে গেলো সমীর?

॥ ৭ ॥

বাড়ি ঢুকতেই মা বললেন: 'স্বরাজের বউ ফোন করেছিল। তোর যাবার কথা ছিল?'

স্বরাজের বউ: মানে কমলকলি। ধরেই নেয় রোজই কোথাও না কোথাও দেখা হবে। আজ হয়নি।

—'আর কোনো চিঠি এসেছে কেষ্ট?'

—'না দাদাবাবু।'

—'এই চিঠিটা এসেছে বোধহয়।' মা বললেন, হাতে ধরা একটা খাম। 'খাটের তলায় পড়ে ছিলো' সুধার চিঠি। হাত বাড়িয়ে নিলেন অনুপম। নেবার সময় দেখলেন মার হাত— সাদা, রোগা, রসহীন, শিরায় শিরায় ভরা, যেন একটা শুকনো পাতা। পল্লব, করপল্লব? করপল্লবেরও জরা আসে?

—'তোর গলাটার জন্য ভাবনা হয় অনু। বাথরুমে নুনজল দিয়েছি, গারগেল করে আয় দেখি। একটু কমবে নিশ্চয়।'

গার্গল করতে করতে আয়নায় হাঁ-টা দেখা যায়। একটা গর্ত, ভেতরের দাঁতগুলো অদ্ভুত জান্তব, মাংসল জিভ নড়ছে, ওপরে নাকের ফুটোয় দুটো অন্ধকার নল। কি বিশ্রী। এই রকম কি কমলকলিকে দেখায়, সে যখন গার্গল করে? অনুপম চোখটা তুলিন করেন ছাদের দিকে।

একটা টিকটিকি। ফর্সা। চিকন গা। চোখ দুটো ভাবলেশহীন কাচের পুঁতির মতন। দূরে একটা পোকার দিকে বদ্ধদৃষ্টি। পোকাটা ছাই নড়েও না। গার্গল করা বন্ধ করে অনুপম হাত নাড়েন, হুশ্‌হাশ করেন। পোকা শুনল না। তাক থেকে কাগজের কোণ ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে ছোঁড়েন। টিকটিকিটা সরসরিয়ে সরে গেল। 'সরীসৃপ'। পোকা নড়ল না। আবার মুখ নিচু করলেন, জল নিলেন, ফের ঘাড় উঁচু করতেই দেখলেন টিকটিকির মুখের মধ্যে ঝাঁকুনি খাচ্ছে পোকাটা। ধুস্। ঠিক হয়েছে। বোকাদের যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। এতবার সাবধান করলেন পোকা যদি না শোনে! অনুপম কী করবেন।

গার্গল করেও গলা ছাড়ল না। 'মা' বলতে গিয়ে 'ম্ব' জাতীয় একটি জটিল আওয়াজ নির্গত হতেই মা বললেন, 'অনু, ডাক্তারবাবুকে ফোন কর। কালই যাও। আমার এটা ভাল ঠেকছে না বাপু।'

অনুপম এ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার চ্যাটার্জীর কাছে যাবেন কাল সকাল আটটা।

খাবার সময়েও কেষ্ট কিছু বলল না। অনুপমও প্রশ্ন করলেন না। কেউ কি এসেছিল? কেউ কি আসেনি? কেষ্ট শুধু পুতুলের মতো খেতে দিল।

কেষ্টর বকবকমটা আজ বন্ধ রয়েছে। অনুপম নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছেন। মা সামনে বসা: তখনই শোনা গেল, দরজায় টোকা পড়ছে।

অনুপমের হাত মাছের বাটিতে স্থির হয়ে গেল। কেষ্ট আসছিল, হাতে ভাতের পাত্র। হঠাৎ চুপ করে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

আবার টোকা। অনুপম প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারছেন কেষ্টর দৃষ্টি লেজার বীমের মতো তাঁর কপাল ভেদ করে হাড় মাংসের গভীরে ঢুকে মাথার ভেতরটা লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে।

আবার। আবার টোকা জোরালো হচ্ছে। যেন মাথার মধ্যে গোলাবারুদ, কামান দাগার আওয়াজ। অনুপমের ইচ্ছে করল দুহাত দুটোকে সোজা মাথার ওপরে তুলে ধরেন, চিৎকার করে বলেন, কেষ্ট তুমি ওভাবে তাকিয়ে থেকো না, আমি পারছি না। আই সারেন্ডার!

মা বললেন: 'ও কিরে, খাওয়া বন্ধ করলি যে? কেষ্ট, ভাতটা দে?' মা টোকা শুনতে পাচ্ছেন না। মা, তুমি শুনতে পাচ্ছো না? তোমার বয়েস হয়েছে। কানে কম শুনছো আজকাল। তাই বেঁচে গেছো। মা, তুমি আমার এই চিৎকারও কি শুনতে পাচ্ছো না? তুমি কেষ্টর বেয়নেট চলাকেও কি দেখতে পাচ্ছো না? মা? ছেলেবয়েস থেকেই তুমি আমার কোনো আর্তনাদ শুনতে পাওনি, মা কোনো অস্ত্রাঘাত দেখতে পাওনি। আমার সব ক্ষত, আমার সব রক্ত, তোমার চোখে অদৃশ্যই থেকে গিয়েছে। এবার টোকা আর পড়লো না। সুইচ বন্ধ করে দিলে সিনেমাতে যেমন ফিল্মার মধ্যস্থলে চিত্রায়িত হয়ে থাকে মানুষ—কের যন্ত্র চালালেই নড়ে-চড়ে ওঠে—কেষ্ট তেমনি নড়ে উঠলো। ভাতের পাত্র নিয়ে এগিয়ে এলো। অনুপম বারণসূচক হাত নাড়লেন। ভাত চাই না। মা বললেন—'কেষ্ট, তোর কী হয়েছিলো রে, আসতে আসতে হঠাৎ অমন দাঁড়িয়ে পড়লি?'

অনুপম বলতে চাইলেন: মা চুপ করো।

কেষ্ট বললো: 'হঠাৎ যেন মনে হলো উনুনে কিছু পুড়ে যাচ্ছে'...

এমন সময় নির্ভুল বেল বাজলো। এবার টোকা নয়। কেষ্ট এবার স্থির চোখে অনুপমের দিকে। অনুপমের দৃষ্টি দরজায় নিবদ্ধ। মা বললেন: 'অ কেষ্ট, দোরটা দ্যাখ তো বাবা—কে আবার এলে এত রাত্তিরে!'

অনুপম হঠাৎ শব্দ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন: 'থাক, আমি দেখছি।'

সমীর, তুমি এসো। তুমি আমার বিছানাতে শোবে এসো। আমি সারা রাত তোমাকে পাহারা দিয়ে বসে থাকবো। আমি জেগে থাকবো, সমীর। তোমার কিটব্যাগ আমি দিয়ে এসেছি, অমন ত্রুটি আর হবে না। আর হবে না, সমীর, তুমি এসো ভাই। যীশুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী "বিফোর দ্য কক্ ক্রোওজ দাও শ্যাল্ট ডিনাই মি থ্রাইস" আমি মিথ্যে করে দেবো। একবার হয়েছে, আর নয়। আমি পিটারের মতো তিনবার বলবো না—"আই নো দিস্ ম্যান নট।" আমি যে সব সময় ঠাণ্ডা মাথায় আগে পেছনে ভেবে চলি সমীর, তাই তো আমার ভুল হলো। ভাবনা করার সময় পেলেই আমি কিটব্যাগ জমা দিয়ে ফেলি। তুমি আমাকে ভাববার সময় দিও না।

দরজা খুলতে নমস্কার করলেন অল্পবয়সী ইন্সপেক্টর। 'একটা সার্চের ওয়ারেন্ট আছে। আপনাদের একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে।' ওয়ারেন্টসহ হাতটি বন্ধুর মতো এগিয়ে এল অনুপমের দিকে। 'আসুন।' পাশ ফিরে সরু হয়ে গিয়ে ওদের প্রবেশের জায়গা ছেড়ে দিলেন অনুপম। ইন্সপেক্টর, তিনজন সঙ্গী সমেত, বুটের শব্দ তুলে ঘরে ঢুকলেন।

মা হঠাৎ চমকে ঘোমটা টেনে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কেষ্টর ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে গেল ইংরাজি 'o' শব্দের মতো। অনুপম বললেন: 'কেষ্ট, এঁদের সঙ্গে একটু থাকো। তুমি ঘরে যাও মা, ভাবনার কিছু নেই। এটা একটা রুটিন চেক্ মাত্র। ভয় পেও না। ভয়ের কিছু নেই।' মৃদু অভয় হাস্যে মাকে উচিত সান্ত্বনা দিয়ে অনুপম হাল্কা পায়ে ও ঘরে গেলেন।

॥ ৮ ॥

সকালবেলায় একটা রং নাম্বারের ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙলো। বেলা হয়ে গেছে আজ। তাড়াতাড়ি

BanglaBook.org

চিঠিপত্র, কাগজ পড়া সেরে নিয়ে সকালেই টাইপরাইটারে বসবেন অনুপম। কাল খবরের কাগজের লেখাটা ফেরত এনেছেন। সেটা ফের লিখতে হবে। দাঁত মাজতে মাজতে এই সব ভাবছিলেন, হঠাৎ মনে হল, দেখি তো গলাটা আজ কেমন? 'কেষ্ট'...ডাকতে গিয়ে একটা বিকৃত আওয়াজ বেরুলো—সঙ্গে সঙ্গে চড়াৎ করে মনে পড়ে গেল, আটটার সময়ে ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল! এখনই আটটা বাজে। আজ ডায়ারিটাই দেখা হয় নি সকালে উঠে। আশ্চর্য!

ডাক্তার তখনও ছিলেন। অনুপমের জিব টেনে ধরে গলায় উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে শুনে বললেন—কিছুই তেমন না, কোনও ইনফেকশন দেখতে পাচ্ছেন না, সর্দিও হয়নি—বোধ হয় টেনশন থেকে গলা ধরেছে। কাজের চাপ থাকলে অনেক সময়ে ধরে যায় এরকম। ঘুমটুম ভাল হচ্ছে? নিয়মিত বিশ্রাম আর গার্গলটা করলেই সেরে যাবে। প্যাডের কাগজে লিখে দিলেন একটা ওষুধের নাম। একটা স্নায়ুস্নিগ্ধকর বটিকা।

অনুপম অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে ভাবলেন প্রথমে কোথায় যাবেন। কমলকলি ফোন করেছিল, একবার খবর নেবেন? স্নায়ুস্নিগ্ধকর বটিকার প্রেসক্রিপশনটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ওসবে তাঁর প্রয়োজন নেই। তাঁর মন, বুদ্ধি, আবেগ ইত্যাদির ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে, তাঁকে ওষুধের ওপর নির্ভর করতে হবে না। যার মনের ওপর এটুকু সংযম নেই, সে মানুষ অমানুষ।

কমলকলির বাড়ির সামনে গাড়িটা যেন আপনিই এসে থামলো। নেমে রিং করলেন। উর্দিপরা গাড়োয়ালী বেয়ারা সেলাম করে বৈঠকখানায় নিয়ে বসালো। গয়নার বাক্সের মতো বন্ধছন্দ ঠাণ্ডা হিমঘর। তবুও পাখাটা খুলে দিয়ে গেলো। অনুপম সদ্য গভীর গভীরে ডুবে যাচ্ছেন, এমন সময়ে কোথা থেকে কমলকলির ক্ষুদ্র পিকিনিজ কুকুর আবির্ভূত হয়ে আচমকা অনুপমের পদতলে গড়াগড়ি দিয়ে দিলো। চমকে উঠে, অনামনেই তাকে একটি মৃদু পদাঘাত করে ফেললেন অনুপম রায়। রিফ্লেক্স এ্যাকশনে। কুকুরের জীবটি কিন্তু সুবিধের নয়, তীক্ষ্ণ করুণ প্রলম্বিত অভিযোগে বাড়ি মাথায় করলে। সাধে আর পোষা জীবজন্তু পছন্দ করেন না অনুপম!

তা বলে লাথি মারাটাও কাজের কথা নয়। রাগও জান্তব, ঘৃণাও প্রাকৃতিক বেগ। সভ্যতার প্রধান অস্ত্র সংযম। এবং ধর্মও। হেন বিরুদ্ধতা নেই যাকে সংযমের সাহায্যে জয় করা যায় না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অনুপমের মনে হলো—উনি কেন কেবল অস্ত্রশস্ত্র, জয়-পরাজয়, আক্রমণ, আত্মরক্ষা, এই সবই ভাবছেন। সভ্যতা মানে কি সংগ্রাম? যুদ্ধ-বিগ্রহ? না, সভ্যতা মানে শান্তি?

তা বৈকি। অনুপম ভাবলেন। 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট' মানেই তো যুদ্ধ। যার সংযম নেই সে ফিট নয়, পূর্ণ মানবত্ব সে অর্জন করেনি।

কিন্তু ওই কুকুরটাকে। হঠাৎ। কেন? স্বয়ংক্রিয় হয়ে! তাঁর পা। ওই ক্ষুদ্র জীবটাকে। অকারণে। কেন?

কী হয়েছে তাঁর কাল থেকে? হাত থেকে কি ফস্‌কে যাচ্ছে কিছু?

কফি টেবিলের ঝকঝকে কালো কাচের ওপর থেকে সাবধানে রেনেসাঁস আর্টের ভারী এ্যালবামটা তুলে নেন। প্রথমেই চোখে পড়ে তরুণ সেইন্ট সেবস্টিয়নের তীরে তীরে ছাওয়া শরীর—শরবিদ্ধ সন্তমূর্তি।

আচ্ছা, কাল রাত্রে...সমীর কোথায়—?

BanglaBook.org

ভিজে চুলে ভিজে গায়ে কোনোরকমে বাথগাউনটা জড়িয়ে স্নান থেকে ছুটে এসেছে কমলকলি—'কী ডার্লিং, কী হয়েছে বেবি, কান্না কিসের ?'

ডার্লিং তখন কান্না থামিয়ে ঘনশ্যাম স্নিগ্ধশীতল শত্রুতা শুঁকে বেড়াচ্ছিলেন, ঝাঁপিয়ে এসে বেঁটে পা দুখানি সদ্যস্নাতা মেমসাহেবের জানুযুগলে তুলে, অধীর আকুলতায় ফেটে পড়লেন। দু হাতে ডার্লিংকে কোলে নিয়ে তার সদ্যশীতল, তাজা লাউয়ের মতো মাকটিকে একটি সরস চুম্বন দান করে কমলকলি। সেই শব্দ সহসা, অতর্কিতে অনুপমের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তন্ত্রীতে টান্ দিয়ে টংকার তোলে, সেই টংকারের সূক্ষ্ম অনুরণন ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর স্নায়ুমূল বেয়ে সর্বত্র।

চুমুটি অপব্যয় করেই কলি, অকপটে, পরম বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে পড়ে : 'এ কী আপনি! কী সৌভাগ্য! রাম সিং তো কিছু বলেনি ? আমি শাওয়ারে ছিলাম। রাম সিং—কী আশ্চর্য কথা! রাম সিং—'

—গা থেকে বিদেশী সাবানের মূল্যবান সৌরভ, চুল থেকে বিন্দু বিন্দু সুরভিত জল টুপ্‌টাপ্ কাশ্মীরে তৈরি গালচের ওপরে, প্রসাধনহীন মুখের চারপাশে ভিজে চুল লেপ্টে ছবি, গালে, কপালে, চোখের পাতায় অভ্রের কুচির মতো জলকণা, অপ্রস্তুত কমলকলিকে কিশোরীর মতো নিষ্পাপ আর অরক্ষিত দেখাচ্ছে। হাল্কা নীল রং পুরু তোয়ালের তৈরি বাথ-গাউনের নিচে ফর্সা দুটি পা ঘরোয়া চটিতে গলানো, চটির ডগা দিয়ে ছোট্টো ছোট্টো রূপোলি রত্নের মতো দামী নখের মালা ফুলে আছে।

কলি বললো, 'হোআট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ!'

ওই নীল বসনের নিচে এখন কোনো বর্ম চর্ম নেই। আছে শুধু আবরণহীন কলি।

অনুপমের ঘোর ইচ্ছে করলো ওপরের ঢাকনিটুকু সরিয়ে দিয়ে বিদেশী সাবানের গন্ধটা সবগুলি ইন্দ্রিয়ের শক্তি দিয়ে নিজের মধ্যে সবলে টেনে নেন। সহসা যন্ত্রচালিতবৎ উঠে দাঁড়িয়ে কমলের দিকে প্রার্থী দুই বাহু অধীর বাড়িয়ে দিলেন তিনি। কমলকলির দুই চোখের দর্পণে বিস্ময় উদ্ভাসিত হওয়া মাত্রই চকিতে স্নান এবং কালের জ্ঞান ফিরে এলো অনুপম রায়ের মধ্যে। ইতিমধ্যে বেয়ারাটিও কলির ডাক শুনে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

এক গাল হেসে, প্রসারিত বাহু নিয়েই পট্ পায়ে কলির দিকে এগিয়ে গেলেন অনুপম।

—'দাও, তোমার ডার্লিংকে আমার কোলে দাও তো, যা খুদে জীব, ওকে তো প্রায় মাড়িয়েই ফেলেছিলাম আজ।'

নির্ভার হাসিতে মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কলির বিভ্রান্ত চোখ। বিশেষ স্বস্তির সঙ্গে ডার্লিং-কে কোলে তুলে দিতে দিতে কমলকলি বলে :—'ও, তাই বুঝি কান্না ? দুষ্টু মেয়ে ? কেবল পায়ে পায়ে ঘোরার স্বভাব হয়েছে!'

তারপর, বেয়ারার দিকে চেয়ে দেখে, অনুপমকে : 'আপনি কি খাবেন বলুন ? আমি ততোক্ষণে চেঞ্জ করে আসি। কোল্ড কফি ? কোল্ড কফি ? হট্ চকোলেট ? কোক ? নাকি, একটু ঠাণ্ডা বীয়র দেবে ? কোন্‌টা ভালো ?'

—'ভালো ?' অনুপম রায় সেই হাসিটা হেসে ফেলেন, যেটা শুধু নারী নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই পলকে হত্যা করে থাকে।

—'ভালো তো বীয়রই সবচেয়ে, কিন্তু সকালবেলাতে বীয়র খাবো না। কফিই দাও। ব্ল্যাক।'

এটুকু কথা বলতেও তাঁর গলায় অল্পস্বল্প লাগছে। ডার্লিংকে মাটিতে ছেড়ে দিতেই সে খুরখুরিয়ে তার মনিবানীর আশেপাশে চলে গেলো।

—'আসছি এক্ষুনি। রাম সিং, কোণা কফি করো, ব্ল্যাক। আর আমাকে একটা কোক।...আপনার গলায় আজ কী হয়েছে ? ঈশ...কেমন শোনাচ্ছে...'

BanglaBook.org

রেনেসাঁস আর্টের বইটা টেবিলে খোলা পড়ে আছে। ভারী পাতাগুলো ফ্যানের বাতাসে অল্প অল্প উড়ছে।

কুকুর, বেয়ারা, মেমসাহেব—এখন সকলেই বিগত। শূন্য ঘরে হিমযন্ত্রের একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। বইটার দিকেই আবার অস্থির হাত বাড়ালেন।

এবারে খুলে যায় দা ভিঞ্চির লা-বেল্ ফেরোনিয়ের। লম্বার্ডির সেই টায়রাপরা যুবতী। এই মেয়েটির টেপা ঠোঁটের মধ্যে কোমলতার সঙ্গে একটা জেদ মেশানো—স্পষ্ট, সোজা চাহনির মধ্যে চাপা দর্প। আশ্চর্য। এই জেদী ঠোঁট, এই দর্পিত ঋজু চাউনি ওঁর খুব চেনা চেনা। অন্য কোনো ছবিতে দেখা মুখের আদল? দা ভিঞ্চির তো অনেক ছবিতেই এক মডেলের আদল থাকে। কোন্ ছবিতে? কোন্‌টায়? মনে পড়ছে না। যে অস্থিরমতি হয়ে আছেন দু দিন ধরে অনুপম, মনে পড়বে কি করে, একাগ্রতা কৈ! কোন্ ছবির মতো মুখ এই মেয়ের মনে পড়ছে না।

শীততাপনিয়ন্ত্রিত মুহূর্তগুলি বয়ে যাচ্ছে, সঙ্গহীন। প্রতীক্ষায়।

না কফি, না কলি, কেউই প্রস্তুত হয়নি। কিসের প্রতীক্ষা তাঁর?

অনুপমের হঠাৎ মনে হোলো, কেন এসেছেন তিনি এখানে? কী চান তিনি কমলকলির কাছে? নিঃসন্তান কমলকলির অপর্যাপ্ত সময় এবং সমস্ত আহ্লাদ কেবলমাত্র সমাজের মই বাওয়াতেই ব্যয়িত। এই নিঃস্ব নারীটির কাছে অনুপমের কিসের আশা? কেন আজ তিনি এখানে? এভাবে? কী চান তিনি?

কুকুর কোলে ঘরে ঢুকলো সুসজ্জিতা সুবাসিতা। কমলকলি। ঘরের শোভা মুহূর্তেই বৃদ্ধি পায়। যেন এক স্বচ্ছ টাটকা ফুল এইমাত্র সাজানো হলো সেন্টার টেবিলে। তাজা কফি থেকে সুরভি, সুরুচি এবং বাষ্প ছড়িয়ে, রাম সিংও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

অনুপম কী চেয়েছিলেন এখানে?

কিঞ্চিৎ উষ্ণতা?

কোন্ তাৎক্ষণিকতার প্রার্থী হয়ে তুমি এখানে এসেছো, অনুপম? এই সীমিত বাতানুকূলতায়?

কমলের ওখানে বেশিক্ষণ বসলেন না, কফি শেষ করে উঠে পড়লেন। প্রথমত, কুকুরের প্রতি আদরের আতিশয্য তাঁর স্নায়ুকে পীড়িত করছিল, দ্বিতীয়, গলা দিয়ে শব্দ বের করা যে এমন শ্রমসাধ্য কর্ম তা কে জানতো?

আজ কথা জমছিলো না। স্পর্শও না। গলাটা ভালো নেই। শুধু কি গলাটাই ভালো নেই?

বাড়ি ফিরে এসে নিজের পরমাশ্রয়ে গিয়ে বসলেন—টেবিলে। টাইপরাইটারের ঘোমটা তুলে। মেশিনে কাগজ বসাতে গিয়ে কাগজপত্রের তলা থেকে বেরিয়ে পড়লো।

একটি না-খোলা বাদামী খাম। মা কাল হাতে এনে দিয়েছিলেন, মেঝে থেকে কুড়িয়ে। সুধার চিঠিটা। এবং বিদ্যুৎ চমকের মতো স্মৃতির সূত্রগুলিতে যোগাযোগ ঘটে গেল—লা বেল্ ফেরোনিয়ের-এর সেই চাপা হাসি, সেই জেদী, দর্পিত চোখ—কার মতো। কেন অতো চেনা।

চিঠিটা খুলতে গিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল করতল। এবং তারপর না খুলেই খামটি ভরে রাখলেন দেরাজে।

এবার শুরু হোলো টাইপরাইটারের বিচিত্র বাজনা, নিয়মিত ছন্দোবদ্ধ অক্ষরমালার যন্ত্রসংগীত।

BanglaBook.org

॥ ৯ ॥

মা এসে বসেছিলেন ঘরের এককোণে, মার প্রিয় আরাম কেদারায়। পিছনে না তাকিয়েই অনুপম দিব্যি টের পাচ্ছেন পিঠের ওপরে একজোড়া শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি। মা কথা কন কম। ছেলের কাজে ব্যাঘাত হয় পাছে, তাই এখানে এলে আরো কম চুপচাপ বসে থাকেন, হয়ত একটা সেলাই বোনা কিংবা একটা বাংলা বই নিয়ে—কখনো বা হাত থাকে আঁচলের তলায়, জপের মালায় গাঁথা। দুটো-একটা কথা হয়তো বলেন—'অনু, তোর পায়ের নোখগুলো কদ্দিন কাটিসনি?' অথবা—'এ ঘরটাতে একবার ঝুল ঝাড়াতে হবে।' কদাচ ভৃত্য সমস্যা, পড়শী বৃত্তান্ত ইত্যাদি ঘাঁটেন না মা। মা চুপ করেই বসে আছেন পিছনে। দেখছেন ছেলের কাজ করা। আপাতত অনুপম চেষ্টা করছেন, 'রয়েজ কর্নারে'র এই কিস্তির লেখাটা ঘষামাজা করতে। এক সময়ে বললেন—'কিছু বলবে, মা?'

—'তোর গলার কথাটা। গলা তো ভালো শোনাচ্ছে না বাবা? সকালে ডাক্তারবাবুকে গেলি? কী বললেন? কী হয়েছে?'

—'কিছুই হয়নি বললেন। কাজের চাপে ঘুমটুম ভালো হয়নি, তাই। ও কিছু না। সেরে যাবে।'

—'ওষুধবিসুধ?'

—'দেননি।'

—'যাক। ভগবান! মধুসূদন! রাধামাধব!'

টকাটক টকাটক লাফিয়ে উঠতে লাগলো ফর্শাতোলা অক্ষরগুলো। কাগজের পর কাগজ ভরিয়ে ফেলতে লাগলেন। কেষ্ট খাবার দিয়ে ডাকতে এল, ফিরে গেল তিনবার—মা এসে পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়ালেন একবার, দুবার—রেডিওতে ডিস্টেশন স্পীডে খবর বলা কখন শেষ হয়ে গেছে—কেষ্ট এবার বলল—'দাদাবাবু। আমি কি তাহলে খেয়ে নেব?' হচ্ছে না। হচ্ছে না। কিছুতেই হতে চাইছে না লেখাটা। জমছে না। নাঃ, কিছুতেই সুস্থভাবে জন্ম নিচ্ছে না এ সংখ্যার 'রয়েজ কর্নার'। জেদ চেপে গেছে অনুপমের। হচ্ছে না। 'কনস্ট্রাকটিভ্ ক্রিটিসিজম্'টা কিছুতেই বেরুচ্ছে না কলম দিয়ে—অথচ, 'আপনারাই তো দেশকে পথ দেখাবেন, গাইড লাইনস দিয়ে দেশের লোকের রি-অ্যাকশনস্ ফর্ম করাবেন?' এক গ্লাস বীয়র নিয়ে বসতে পারলে ভালো হতো। আরো ভালো, একটা হুইস্কি। কিন্তু, না। মা আছেন। চললো যুদ্ধ। সদর্থক সমালোচনার জন্য যুদ্ধ। মা এবার এসে দাঁড়ালেন চেয়ারের পিঠে হাত রেখে। 'তিনটে বাজে অনু, থাকুক পড়ে তোমার লেখা। তুমি বরং এবারে খেয়ে উঠে একটু শুয়ে নাও না? ডাক্তার বলেছিল বিশ্রাম নিতে—আমিও তো বুড়ো মানুষ, কতক্ষণ টাঁড়িয়ে রাখবি বাবা?'

চমকে উঠলেন অনুপম। এ কী হয়েছে তাঁর? পদে পদেই কী যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সকালে লেট হয়েছেন ডাক্তারের এ্যাপয়েন্টমেন্টে। কমলকলির বাড়িতে কুকুরটাকে হঠাৎ—তারপরে আরো বিশ্রী, ওভাবে হঠাৎ, হাত বাড়িয়ে দিয়ে—ছি ছি ছি! অবশ্য কমলকলি বুঝতে পারেনি, কিন্তু অনুপমের তো বুঝতে বাকি থাকেনি তার প্রার্থনা কী ছিল এবং কোথা থেকে সেই চাওয়ার উৎপত্তি। এখন আরেকবার। মা যে বসে থাকেন, মা যে অনুর খাওয়া না হলে খেতে বসেন না, তা তো তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাই মা এলে কখনোই দেরি করেন না। কি দিনে, কি রাতে, খাবার সময়ে বাঁধা নিয়মে ফিরে আসেন বাড়িতে। আজ আজ? বাড়িতে বসে বসেই তিনি ভুলে গেলেন, মার খাওয়া হয়নি, মা বসে রয়েছেন! ভুরু কুঁচকে উঠেছে—মুখে নিজের প্রতি রাজ্যের বিরক্তি, অনুপম উঠে দাঁড়ালেন। পাতে ভাত দিতে দিতে মা বললেন—'রাগ

BanglaBook.org

করিস না বাবা, এখনও না খেলে তোর শরীর টিকবে কেন—আমার আজ আসলে একাদশী।'

অনুপম একবার মুখ তুলে মায়ের দিকে চাইলেন। উপবাস-ক্লান্তির ছায়া মাখা রোগা মুখে কিশোরীর দুষ্টু হাসির লজ্জা।

মা চুপ করে মোড়ায় বসে ছেলের খাওয়া দেখেন, বেশি কথা বলা তাঁর ধাতে নেই। 'তুই বিয়ে না করলে আমি মরেও শান্তি পাব না'--এই বাক্যটা কেবল মাঝে মাঝে বিশেষ করে অনুপম খেতে বসলেই মা আগে আগে বলতেন। অনুপমের ছোট মামী যখন ডানলপের অরবিন্দ ভাদুড়ীর সঙ্গে প্রস্থান করলেন, ডিভোর্সের মামলা চলবার সময়ে ছোটো মামা হঠাৎ একগাদা সোনেরিল খেয়ে মামলার রায় দিয়ে দিলেন। সেই ব্যাপারটার পর থেকে অনুপমের ছুটি হয়েছে, মা আর বিয়ে করতে পীড়াপীড়ি করেন না।

বিচিত্র নবীন বিশ্ব এসে মা'র দর্জিপাড়ার ঘোর বৈষ্ণববাড়ির ভিত নাড়িয়ে দিতে শুরু করছে। স্বল্পভাষিণী মা তাই আরো স্বল্পবাক্ হয়ে যাচ্ছেন। 'প্রতুল' শব্দটি, অনুপমের ছোটো মামার নাম, আর কোনোদিন তাঁর মুখে শোনা যায়নি।

মা, তোমার কপালে অনেক দুঃখু লেখা ছিল, জীবনের প্রথম থেকেই। ভাঙা গলায় অনুপম কথা বলার চেষ্টা করেন—'বিষ্ণুপ্রিয়ার চিঠি এসেছে?'

—'এসেছিল তো গেল সোমবার। মেয়ের ছবি পাঠিয়েছে।' অনুপম মার দিকে চাইলেন। মা নতমুখে বসে আছেন, একটু যেন অন্যমনস্ক। মাগো, তোমার যুগ ফুরিয়েছে। দর্জিপাড়ার রায় বাড়ির ছোট মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া এখন প্রিয়া অপেনহাইমার হয়ে টেক্সাসে একটা কলেজে 'ইণ্ডিয়ান সিভিলিজেশন'এর কোর্স পড়ায়। প্রতি সপ্তাহে রঙীন কার্ড পাঠায়। নীলনয়না মেয়ের ছবি পাঠায়। মেয়ের নাম রেখেছে, বেলারাণী। অনুপমের মায়ের ইংরেজ জামাই বলেছে, ওদের দেশে নাকি আদর করে ঠাকুমা দিদিমার নামে নাম রাখা নিয়ম। জ্যেঠাইমার নাম ক্ষেমদাসুন্দরী, ওটা চলবে না। বিষ্ণুপ্রিয়া তাই খুড়িমার নামে নাম রেখেছে 'বেলা।'

মা আড়ষ্ট হয়ে কল্পনায় ভাবতেন জামাই-মেয়ে মিলে সারাদিন তাঁর নাম ধরে খুব সহজভাবে ডাকাডাকি করছে,—'বেলা! বেলা!'—ভেতরের অস্বস্তিটা বুঝি একদিন ছলছল চোখে নিরুর বউ বীথির কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন—শুনে বীথি হেসে বাঁচেনি! জগতে কি কেউ কাউকে বোঝে না? কেউ কারুর দুঃখের বোঝা মাপতে পারে না—কেউ কারুর সুখের গোড়াও ছুঁতে পারে না। এই তো তুমি বসে রয়েছো আমার সামনে, নিয়মমাফিক সন্তানের খাওয়ায় সতর্ক দৃষ্টি রেখেছো, আমার প্রকৃত পুষ্টির দিকে কি কোনোদিনও তুমি নজর দিয়েছিলে, মা? আমার একটা শরীর আছে ঠিকই। কিন্তু সেটা ছাড়াও যে একটা আমি আছি, তার পুষ্টির কথা, তার স্বাস্থ্যের কথা কখনো তুমি ভেবেছিলে মা? তোমরা মেয়েরা কেবল বাইরেটাকেই যত্ন করতে শিখেছ। বাইরেটা নিয়েই আছ। মাংস তিম না খেলেই কি অহিংস হয়? জ্যেঠাইমা তো মাছও খান না। জ্যেঠাইমার জিহ্বাগ্রে যে এ্যাটম বোমা আছে, তাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আমার ছেলেবেলা। কিন্তু তোমার তো কিছুই হয়নি। তোমার ভেতরটা কী দিয়ে তৈরি মা? অথচ ভাসুরঝি-জামাই নাম ধরে ডাকছে কল্পনা করেই তোমার চোখে জল আসে। কোন্ বিচিত্র ধাতুতে তৈরি তোমার অন্তরাত্মা?

—'মাছ আরেকটা দিক তোকে?'

—'না মা, এত অবেলায়'...(আর খাওয়া উচিত নয়।)

—'তোর গলাটা একটুও কমেনি। থাক, কথা বলিস না।...কালকে কি তোর লেকচার আছে?'

—'আছে মা।'...(কী করব তাই ভাবছি।)

—'দিস না লেকচার। বিশ্রাম দে গলাটাকে।...ছুটি নেয়া যায় না?'

BanglaBook.org

—'তা যায়।' (ছুটি কি এখনই নেওয়ার দরকার আছে?)
—'তাই নে বাবা। আর গলাটা বরং গলার ডাক্তারকে দেখা।'
—'দেখি, আর ক'টা দিন দেখি?'
—'কী বললি? কিছু বুঝতে পারলাম না।'
—'বলছি, আর কটা দিন দেখি।'
—'থাক থাক—কষ্ট করে কথা বলতে হবে না বাবা, গলাটা বড্ডই খারাপ হয়েছে।'

॥ ১০

খেয়ে উঠে পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, টাইপরাইটারের সামনে অনুপম। খেতে বসে লক্ষ্য করেছেন গলাটা আরো খারাপ হয়েছে। এটা যাব, ওটা যাব না বলতেই কষ্ট হচ্ছে, ক্লান্তি আসছে, অর্ধেক বাক্য বলে বাকী বক্তব্যটা মনে মনেই সারতে হচ্ছে। টাইপ করতে করতে ঠিক করে ফেললেন এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিতে হবে, ডাক্তার ব্যানার্জির কাছে যাওয়া দরকার। মনে হয় এটা 'ই-এন-টি'-এরই ব্যাপার। ও সব নর্ড-টার্ড নয়। আজকাল ডাক্তাররা রোগ নিরূপণের কষ্ট কমাতে বলে দেন, নার্ভের ব্যাপার, নয় এ্যালার্জি। তা নাহলে আরেকটা আছে, খুব কাজে লেগে যায়, 'সাইকো সোমাটিক'। এই গলা বসে যাওয়াটাকে ওরা তিনটের কোনো একটা বলতে পারেন। অথবা ঠাণ্ডা-গরমের ব্যাপার। কিংবা ভাইরাস ইনফেকশন। মনে মনে হেসে নেন অনুপম। ক্যাটাগরাইজ করে ফেলা যায় সব কিছুই। কিন্তু গলার ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে তবু একবার। একটা চিকিৎসা দরকার। এভাবে চলে না। স্বর ফেরত চাই।

ময়লা কাগজের ঝুড়ি উপচে পড়লো বানচাল হওয়া কাগজে। আরেক যুদ্ধ চলে টাইপরাইটারের সঙ্গে। কয়েকটা ফোন এলো। দর্শনার্থীরাও এলেন বার কয়েক, ভিন্ন ভিন্ন কাজে। কিন্তু খুব বেশি সময় নষ্ট হয়নি। অনুপমের সময় অন্য লোকে নষ্ট করে দিতে পারে না। ইচ্ছেমত ফোন রেখে দিতে পারেন অনুপম। অন্যপক্ষকে বেশিক্ষণ ধরে বকবক করবার সুযোগ না দিয়ে, একটা অমোঘ অন্তিম সবিনয় স্বরে 'আ-চ্ছাঃ' বলে আলোচনা শেষ করে দেন, একটুও রূঢ় না হয়ে। প্রত্যাখ্যানের শিল্পে অনুপমের বরাবরই অসামান্য দক্ষতা। কারুর মনে আঘাত না দিয়ে, নিজেকে অসুন্দর বা অপ্রিয় না করে কীভাবে মানুষজনকে বিনীতভাবে বিমুখ করতে হয়, অনুপম অল্প বয়েস থেকেই তা রপ্ত করে ফেলেছেন। তা বলে অনুপম যে প্রত্যাখ্যান করতে ভালোবাসেন তা নয়। বরং অনুপম প্রার্থনা পূর্ণ করতেই ভালোবাসেন।

রিং বাজলো, কেষ্ট দোর খুলে দিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো।
—'দাদাবাবু?'
—.....
—'দুজন ভদ্রমহিলা এসেছেন।'
চেয়ার ঠেলে, টাইপিং বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন অনুপম।
দুজন ভদ্রমহিলা সোফায় বসে 'ফ্রন্টিয়ারে'র পাতা উলটোচ্ছেন।
—'নমস্কার!'
—'নমস্কার! আমরা আসছি অল বেঙ্গল উইমেন্স লীগ থেকে। লেডি রমেলা মিত্র আমাদের পাঠিয়েছেন।'
যতোই কাজে ব্যস্ত থাকুন না কেন, লোকজনকে সদাই সহাস্যে স্বাগত জানান অনুপম। কেননা তিনি জানেন অভ্যাগতের হাত থেকে কীভাবে অব্যাহতি নিতে হয়। সবিনয়ে, সৌন্দর্যের সঙ্গে তিনি নিজের কাজের সময়টুকু ছিনিয়ে নিতে জানেন।

BanglaBook.org

অতিথিদের তোলবার জন্য তাঁর কয়েকটি পদ্ধতি আছে। কাজ মিটে গেলেই তিনি চরমভাবাপন্ন নিশ্চিত বিদায়চিহ্নিত 'আ চ্ছাঃ' বলে হেসে উঠে দাঁড়ান এটি বেশ বিনীতও। গল্প করতে এসে না থামলে প্রথমে হুঁই, তারপর ক্রমশ অন্যমনস্কতা, তারপর শুনতে না পাওয়া এবং তারপরে জবাব না দেওয়া! তাতেও না হলে সেই অন্তিম 'আ-চ্ছাঃ' তো আছেই! এগুলো তাঁর আত্মরক্ষার উপায়।

ব্যর্থমনোরথ উইমেন্স লীগের পরে ফিরে গেল সেন্ট জেভিয়র্স কলেজ ডিবেটিং ক্লাবের ছেলেরা। সস্ত্রীক লেখাটা আজই নিতে আসতে চাইছিলো—কিন্তু কাল বিকেল পর্যন্ত সময় নিয়েছেন অনুপম। কী যে হয়েছে! কিছুতেই দাঁড়াচ্ছে না লেখাটা। কনস্ট্রাকটিভ্ ক্রিটিসিজম যে এতো দুঃসাধ্য কঠিন কর্ম, কে জানতো? নীলাব্জও ফোন করেছিলো। সৌগত চৌধুরীর বাড়িতে যে পার্টিটা আছে আজ, তার এক ঘণ্টা আগে ওখানেই একটা মীটিং ডেকেছে, পত্রিকা বিষয়ে। অর্থাৎ আবার ললিত, আবার সতী, আবার বিতর্ক—কথা বলার কথা ভাবতেই ভালো লাগছে না অনুপমের। না, পার্টিতেও যাবেন না অনুপম। লেখা এখন দুটোই শেষ করা জরুরি।

—'কেষ্ট, এক কাপ কফি।'

মা এসে দাঁড়ালেন। হাতে কালো কফির পেয়ালা।

—'কেষ্টকে একটু বাজারে পাঠিয়েছি অনু।'

—'তা' বলে তুমি নিজে কেন যা মিছি-মিছি।'

—'তাতে কি হয়েছে বাবা? আমরা বুঝি গরম জলে কফির গুঁড়ো গুলতে জানিনে?'

—'সেজন্য নয়।' চুমুক দিতে দিতে অনুপম বললেন—'কফিটা খুবই ভালো হয়েছে।'

শুনে মা প্রসন্ন হাসেন। তারপরই বলেন: 'কিন্তু তোমার গলাটার জন্যে মন ভালো লাগছে না অনু: তুমি কালই গলার ডাক্তারকে দেখিয়ে ব্যালো বাবা।'

—'দেখি। চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই। তুমি ভেবো না মা।'

চেষ্টা করতে করতে অনুপমের মনে হচ্ছিল সুনামের থাকাটা একটা অভিশাপ। সুনামের দুর্ভাগ্য এই, যে সেটা রক্ষা করবার একটা দায় থাকে। যশের চক্র অবিরাম ঘুরে যায়। সর্বক্ষণ যদি ওপরদিকে অটল থাকতে হয় তাহলে সর্বক্ষণ নিরলস পরিশ্রম করা দরকার। পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ নন অনুপম। কিন্তু এই লেখাটা দানা বাঁধছে না। বারবার পড়ছেন, যা ছিলো সেটাকেই দিব্যি ভালো মনে হচ্ছে ওঁর।

নেভিল ম্যাক্সওয়েলকে ডুবিয়ে দিয়ে তাঁর ভারত চীন সীমান্ত সমস্যা বিষয়ক প্রসিদ্ধ বইটি ছাড়াও এখন বেস্ট সেলার তাঁর ভিয়েতনাম বিষয়ক চটকদার বই 'দ্য টোয়েন্টিয়েথ ডুমেয়ার'। রুবাসী বিপ্লব বিষয়ে মার্ক্স-এর মতামতের পটভূমিতে, মার্ক্স বেঁচে থাকলে এই ভিয়েতনাম যুদ্ধের কী ব্যাখ্যা দিতেন সেই নিয়ে একটি কাল্পনিক থিওরেটিকাল রচনা। বিদেশে পেপারব্যাক হয়ে গেছে, খুব পপুলার হয়েছে বইটা। তাঁর ষষ্ঠ বই ম্যাকার্থি পিরিয়ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টি টিকে থাকার সটীক সানুপুঙ্খ ইতিহাস, একটি মূল্যবান বামপন্থী পর্যালোচনা। এইটি বেরুবার পর থেকেই ইউ. এস. আই. এস. তাঁকে আরো প্রবলভাবে খাতির করা শুরু করেছে। তিনি অবশ্য বাম-দক্ষিণ কোনো কনসুলেটের মদের পার্টিতেই যান না। যদিও নিমন্ত্রণ পান সর্বঘটেই। মার্ক্সের দেড়শত বার্ষিকীতে যেমন হোলো। দু'পক্ষ থেকেই তা উদ্‌যাপিত হোলো, অবশ্যই দুই ধরনে। অনুপম রায় কিন্তু দুই সভাতেই বক্তা ছিলেন। এতে তিনি দোষের কিছুই দেখেননি। তাঁর বিষয়, মার্ক্স ও আধুনিক বিশ্ববোধ। অথচ সুধা তা নিয়ে কথা শোনাতে ছাড়েনি সুধা বড়োই কথা শোনাতো। বড়ো দুর্বিনীত মেয়ে সে তাঁর কাছেই গবেষণা করলে কী হবে, স্বভাবে স্পর্ধার শেষ নেই। অতি দরিদ্র, উদ্বাস্তু মেয়ে। আজন্ম যুদ্ধ করে, একক প্রচেষ্টায়, অনেক বয়সে শেষ পর্যন্ত জীবনে দাঁড়াতে পেরেছে। অথচ জীবনের ওপর এতটুকু লোভ নেই, ক্ষোভও

BanglaBook.org

নেই। অদ্ভুত একটা মানুষ এই সুধা মেয়েটা।

মাত্র একটিই দিন, সেটি ছিলো ডিপার্টমেণ্টের একটা মুনলাইট পিকনিক, কেবলমাত্র একটিবারই, এবং সেও এমন কিছুই নয়, অথচ তারই জন্য সুধার—সেই অতি তুচ্ছ ঘটনায়—

...যাক। সুধা সরে গিয়েছে, অনুপম যেন মনে-প্রাণে মুক্তি পেয়েছেন।

আধখানা খাবার পরে কফিটা জুড়িয়ে গিয়েছে। লেখা এগোচ্ছে না। স্বহস্তে একটা শাণিত লেখনকে কী করে ভোঁতা করবেন অনুপম? এ যেন লেখাটার মুণ্ডচ্ছেদ করার মতো দাঁড়াচ্ছে। সারাদিন ধস্তাধস্তি একটা সামান্য খবরের কাগজের কলম লেখা নিয়ে? এই তুচ্ছ ব্যাপারে এমন দোটানা—

[—দোটানা? শুধু দোটানা কেন, তেটানা, চৌটানা—আপনি তো কতরকম টানাটানিতেই কষ্ট পান—

অনুপমের বুকের মধ্যে যেন সুধার গলাটা নিঃশব্দে কথা কয়ে উঠলো।]

—'দ্যাখো সুধা, আমি ছোটবেলাতে ভাববার সুযোগ পাইনি বড়ো হয়ে কী হবো। কেউ কোনোদিন আমাকে প্রশ্ন করেনি, অনুপম তুমি বড়ো হয়ে কী হবে? আমি তাই কখনো সিরিয়াসলি ভেবে দেখবার সুযোগ পাইনি, আমি, অনুপম রায়, কী হবো। তবে অনেকগুলো জিনিস যে একত্রে হওয়া যাবে না, যেমন হীরু হাতির মাহুত এবং হীরু হাতি—কিংবা অনুপম রায় এবং রাইটার্সের বড়বাবু—এটুকু জানা ছিল। সুধা, আমি যা হয়েছি, তা আমি অনেক চেষ্টা না করেই হয়েছি। কিন্তু এখন আমি যা হচ্ছি, তা আমাকে খুব চেষ্টা করে হতে হচ্ছে।'

—'দাদাবাবু? আলোটা জ্বালেন নি?'

হঠাৎ চমকে উঠলেন অনুপম রায়। কেষ্ট আলো জ্বেলে দিয়েছে।

—'আর কতোক্ষণ লিখবেন? একটু ঘুরে আসুন না বাইরে। চা দিই?'

কেষ্টর চোখে আজ বেয়নেট নেই, মলম আছে। মলমের জ্বালাই বেশি। অনুপমের স্বরে কাঠিন্য এসে পড়ে—'এখন উঠতে পারব না। লেখাটা জরুরি। কফি। ব্ল্যাক।'

ঘড়িতে রাত্রি সাড়ে আটটা, টেলিফোন বাজলো পুনর্বার। যেন বেঁচে গেলেন অনুপম রায়। কমলকলি নিশ্চয়। একটু বেরুবেন এখন। আর পারা যাচ্ছে না। একটা সামান্য লেখা নিয়ে এতক্ষণ...

—'হ্যালো? অনুপম? সোমশংকর বলছি।'

—'.....!'

—'থ্যাংকিউ ফর গিভিং আপ দ্য কিট ব্যাগ। জানেন, ওতে কী কী কাগজপত্তর ছিল? ছাড়া দুটো পাইপগান, কার্ট্রিজেস, আর একটি নোটবুক। অনেক সুবিধা হোলো আমাদের এই নোটবুকটা পেয়ে। আই থট ইয়ুড লাইক টু নো।'

—'.....'

—'কী হলো? হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো?'

—'হ্যাঁ, বলুন।'

—'টেলিফোনটা কি খারাপ হয়ে গেছে?'

—'না তো।'

—'কাট হিয়ার!'

—'সমীর...'

—'কি বলছেন?'

—'সমীর...'

BanglaBook.org

—'সমীর? ওঃ, দ্যাট বয়? হি ইজ আণ্ডার এ্যারেস্ট নাউ। নোটবুকটা পাবার পরে ওকে ধরাটা এসেনশিয়াল হয়ে পড়লো ডিটেলসের জন্য।'

—'ও-হু...'

—'নট টু ওয়ারি, নট টু ওয়ারি! হি উইল বি কেপ্ট এলাইভ।'

—'.....।'

—'থাক্, থ্যাংক ইয়ু ফর এ্যাকটিং ইমীডিয়েটলি।'

—'শুড আই নট থ্যাংক ইয়ু?'

—'অফ কোর্স নট। এ তো বন্ধুকৃত্য মাত্র। আরে, আমি তো জানিই, দ্যাট হ্যাড নাথিং টু ডু উইথ ইয়োর ঔন পলিটিক্স—দ্যাট ওয়াজ মিয়ার্লিং এ্যান এ্যাক্ট অফ কাইণ্ডনেস অন ইয়োর পার্ট...অবশ্যিয়াসলি...তাই নয় কি?'

—'.....!'

—'আ—চ্ছাঃ?'

সোমশংকর দত্তরায়ই ফোনটা আগে নামিয়ে রাখলেন। যে সবিনয় 'অস্তিম 'আ—চ্ছাঃ'টা বলা অনুপমেরই একচেটিয়া, আজ সেইসেই উচ্চারণ করলেন সোমশংকর।

—'মা...?' বিকৃত আওয়াজে আর্তনাদ করে উঠলেন অনুপম রায়। 'আমি একটু বেরুচ্ছি। তুমি খেয়ে নিও।'

টাইপরাইটার খোলা পড়ে রইলো কাগজ কার্বন বুকে নিয়ে। গাড়ির চাবি তুলে নিয়ে নেমে গেলেন অনুপম। না। কমলকলি নয়। নীলাম্বরদের পার্টিও নয়। প্রমীলা রোহিণীর সাত তলার ফ্ল্যাটে সাদার্ন এ্যাভিনিউতে। প্রমীলার ওখানে ভালো স্কচ থাকে।

যীশু বললেন- 'কাক ডাকবার আগেই এই তুমিই আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে, পিটার।'

॥ ১১ ॥

পথে ইচ্ছে করলো লেক দিয়ে ঘুরে যেতে। লেকের মাঝখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে রাত্রিবেলায় বেশ লাগে।

মস্ত একখানা তামার পুষ্পপাত্রের মতো লেকে চাঁদ উঠেছে। দর্জিপাড়ার বাড়িতে ইয়া ইয়া পুজোর বাসন, পুষ্পপাত্রের ছড়াছড়ি। তারই একখানা নিয়ে এসে বৈঠকখানায় টেবিল করেছেন অনুপম। সেই তামার পুষ্পপাত্রে এখন রাখা থাকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরি প্লাস্টিকের কচ্ছপ, তার খোলে জমা হয় দেশী-বিদেশী ছাই, দেশলাই কাঠির পোড়া শরীর, উচ্ছিষ্ট তামাকের টুকরো

শন্‌শন্ শব্দে হাওয়া বইছে, চলন্ত গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে এসে গতির ঝাপটায় অনুপমকে বধির করে দিচ্ছে। ওই তামার থালাটি এবার মুঠো মুঠো কালো ফুলে ঢাকা পড়ে যাবে। অসুখী হয়ে উঠেছে রাত্রির চিকন মুখ।

জ্যোৎস্না জলে ভরা হ্রদ দুটির মাঝখানে রাস্তাটা যেন আদিম নৌকা হয়ে ভাসছে। অনুপমের মনে হোলো, মিশরের প্রাচীন মৃৎপাত্রের গায়ে যেমন আঁকা থাকে, রাস্তার দুধারের কৃষ্ণসারি যেন তেমনি সারবন্দী শৃঙ্খলিত ক্রীতদাস, তাঁর নৌকোয় বৈঠা টানছে হেইও—হো, জোর বাতাসে গাছের পাতায় পাতায় দীর্ঘশ্বাস, তাঁর গাড়িটা যেন বজরার মধ্যে সিংহাসন—সব ব্যাপারটাই যেন একটা অতি চেনা পুরোনো স্মৃতি—যেন ঠিক এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগেও হয়েছে। কবে? কখন? অনেক, অনেক আগে কখনো কি? লেকের এতো কাছাকাছি বাস করেন, কিন্তু যখন-তখন লেকে এসে বসে থাকার অবকাশ অনুপমের জীবন থেকে মুছে গেছে। অথচ দর্জিপাড়ার রায়বাড়ির সেই ছেলেটা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বেরিয়ে দু'নম্বর বাসে করে চলে আসতো প্রায়ই এই এতোটা দূরে। এই লেকের জলের ধারে বসবার জন্যে। লালা, পঙ্কজ,

BanglaBook.org

সোমনাথের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বয়স তখন কতো? এই সমীর-বাদলদের মতোই..

লালা, পঙ্কজ, সোমনাথ। কোথায় এখন সেই ট্রায়াম্‌ভারেট? অনুপম সমেত ওরা ছিলো চারজন, ফোর মাস্কেটিয়ার্স।

উত্তর কলকাতার ছেলেদের পক্ষে এমিকটাই ছিলো নিরাপদ, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হবার সম্ভাবনা কম। শুধু তো ঘুরপাকই নয়, সোমনাথের আবার প্রেম-ট্রেম ছিলো কিনা। হ্যাঁ। তাও ছিলো। ওদের চারজনের মধ্যে একা সোমনাথের প্রেম ছিলো। মনীষা পড়তো ব্রাহ্ম গার্লসে, থাকতো শেয়ালদার কাছে, আর প্রেম করতো লেকে এসে। পঙ্কজ অনু আর লালা তখন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে সিগারেট টানা প্র্যাকটিস করতো। কখনো-বা কম্পিত আঙুলে লালার এনে দেওয়া ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের সওদা কোণামোড়া চটি ইংরিজি মলাটহীন বই কোলের ওপরে খুলে বসতো তিন মাথা এক করে। সোমনাথের চেয়েও ধুক্‌-ধুক্‌ দ্রুত চলতো ওদের নাড়ির গতি তখন; হয়তো বা সোমনাথের চেয়েও টানটান হয়ে থাকতো ওদের ইন্দ্রিয়গুলি অপরাধবোধের তাড়নায়, অদৃশ্য গুরুজনদের কল্পিত পদশব্দে।

সোমনাথের পরীক্ষার পরেই সোমনাথ-মনীষা বম্বে পালাবে সব ঠিক করাই ছিলো। লালাদের পার্টি আছে বম্বেতে, লালা বলেছিলো ব্যবস্থা করে দেবে ওখানে একটা চাকরি। কিন্তু মনীষার বাবা তার আগেই ট্রান্সফার নিয়ে জোরজার করে পাটনা চলে গেলেন। বধূবিবারে। সোমনাথ মনের দুঃখে ক'দিন দাড়ি রাখলো, সাইগলের রেকর্ড শুনলো, তারপরেই বি. এস-সি পরীক্ষা এসে পড়লো। ওদিকে পড়ার চাপটা পড়তেই এদিকে সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো। সোমনাথ, তোর মনীষার কথা মনে পড়ে? আমাদের চারজনেরই দাড়ি রাখা উচিত ছিলো। তোর প্রেমটা, আমাদের চারজনেরই প্রথম। রাজস্থানী ছেলে লালার অবশ্য বৌ ছিলো। ছেলেও ছিলো। কিন্তু প্রেম? সে অন্য ব্যাপার। টেক্‌সাসে কোথায় যেন চাকরি করছে সোমনাথ, মার্কিনী বৌ নিয়ে সুখেস্বর্গে আছে বলে শোনা যায়।—লালার সঙ্গে ইচ্ছে করলেই দেখা করা যেতে পারে, কিন্তু ইচ্ছে করে না। সময়ই বা কোথায়? এখন সে সিমিতি গদিতে বসে বড়বাজারে। আরো পাকা আমটির মতো দেখায় আজকাল লালাকে।

ম্যাট্রিক দেবার ঢের আগেই পুত্রের বিয়ের ঝামেলাটা চুকিয়ে দিয়েছিলেন লালার দূরদর্শী পিতৃদেব। ফলে, প্রেসিডেন্সির পোর্টিকোর নিচে গাড়ি থামলে, পাগড়ি-পরা ড্রাইভার যখন দরজা খুলে দিতো, একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে নেমে প্রথমে লালা ঢুকে আসতো প্রেসিডেন্সিতে, তারপরে লালার ছেলে বাবাকে 'টা-টা' করে মাঠ পেরিয়ে ছুটতো হিন্দু স্কুলে। গেল বছরে সেই ছেলের বিয়েতেই দেখা হোলো লালার সঙ্গে। কিন্তু পঙ্কজ সেদিন আসতে পারে নি।

সি. এ. পাশ করে পঙ্কজ চাকরি করছে দুর্গাপুরে। কিছুদিন আগেই একটা মীটিংয়ে গিয়েছিলেন অনুপম রায়, তখন পঙ্কজ এসে দেখা করেছিলো। চুল পেকে গেছে, বুড়ো মতন, রোগা, একটু কুঁজো, একটা ক্লান্ত মানুষ। যে নাকি এক সময়ে এক সঙ্গে টেনিস ব্লু আর ক্রিকেট ব্লু হয়েছিলো। ওর বউ প্রথম সন্তান প্রসবের পর থেকেই পক্ষাঘাতে অচল। শিশুটি আঁতুড়েই মারা গিয়েছে। জীবন্মৃত স্ত্রীর সেবা, আর অফিসের কাজ—এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে নিঃসন্তান পঙ্কজের ক্লান্তিকর দিন এবং রাত্রিগুলি। এতো বেশিক্ষণ ধরে, এতো ইনিয়ে বিনিয়ে তার অসুখী জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী ফেনাতে লাগলো পঙ্কজ,—যে বহুক্ষণ সমবেদনায় পর্যাপ্ত রকম গলতে থাকার পরে, অনুপম রায় শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন সুস্পষ্টভাবে কব্জি উল্টে ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করতে। তারপর একবার মাত্র হাই তুলে তিনি নীরবে, সক্রিয় ও দর্শনীয়ভাবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। হ্যাঁ, এবার পঙ্কজ উঠে দাঁড়িয়েছিলো। উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলো—'চলি অনু,

BanglaBook.org

তোরা কতো কাজের লোক, তোর দামী সময় বাজে খরচ করিয়ে দিলুম। আসলে কি জানিস, তোরা তো অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিস, আমরা সেইসব পুরোনো দিনের মধ্যেই আটকে রয়েছি। এই মফঃস্বলে আমাদের না আছে সময়ের জ্ঞান, না আছে সামঞ্জস্যের জ্ঞান। তুমি যে আমাকে চিনতে পেরেছিলে অনুপম, সেই তো যথেষ্ট। কুশল বিনিময়ের পরেও বসাটা আমার উচিত হয়নি। কি বলো?'

এতো স্মার্ট, ক্ষুরধার বাক্‌কুশলী অনুপম রায়কে নিরুত্তর রেখে খুব আস্তে হেঁটে বেরিয়ে গিয়েছিলো, কুঁজোমতন বুড়োমতন রোগা লোকটা। আরো একটু কুঁজো, আরো একটু বুড়ো হয়ে।

অনুপমের হঠাৎ কেমন গরম বোধ হোলো। অথচ দিব্যি ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, ঝোড়ো-ঝোড়ো ধুলোটে গন্ধ বাতাসে। গাড়ি থামিয়ে অনুপম নেমে পড়লেন। বিশাল শাদা আকাশে এমন কাটকেটে জ্যোৎস্নায় গদগদ চাঁদপারা মুখখানা এখনো ভাসিয়ে রেখেছে পূর্ণিমা। অথচ আর একদিকে খেলতে শুরু করেছে কালো মেঘের ঢেউয়ের পরে ঢেউ। ফর্সা কপালের চারদিকে চূর্ণকুন্তলের মতো উড়ছে এখনো—এক সময়ে ওই মেঘ সব আলো নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

কী বিপুলতা। কী অবকাশ। কতো নক্ষত্র। গ্রহতারায় পরিপূর্ণ অপার অখণ্ড নিখিল বিশ্বভুবন, এই অবিকার, অনিবার্য, অনতিক্রম্য, নিসর্গনির্দিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড বিস্ময়—চরাচরব্যাপী প্রবল চন্দ্রালোকে যেন সহসা অনুপমের শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চাইলো। তাঁকে ডুবিয়ে মারবার ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে আজকের পূর্ণচন্দ্র—পৃথিবীর ক্ষুদ্র পাত্রে যতো ধরে তার সহস্রগুণ বেশি ঢেলে দিচ্ছে তরল পারার মতো ভারী, ধাতুবৎ বিগলিত জ্যোৎস্না। অনেক কচি শিশু যেমন নিদ্রিত মাতার স্তনে চাপা পড়ে দম আটকে মরে—তেমনি এই নির্বিকার নিসর্গের চাপা থেকে নিস্তার পেতে, জলে ডোবা মানুষের মতো নাকটুকু শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে চেয়ে মুখখানাকে আবার সেই সীমাহীনতার দিকেই তুলে ধরলেন অনুপম—আবার সেই আকাশ। আবার সেই অসংখ্য নক্ষত্রের ডাকাডাকি। প্রত্যেকে এক একটি অনামা পৃথিবীর আলোকসংকেত জ্বেলেছে, কোটি কোটি যোজন দূর থেকে সদর্পে ঘোষণা করছে স্বকীয় অস্তিত্ব, সেই অহংকৃত ভুবনের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

অনুপমের চোখ বাধ্য হয়ে মৃত্তিকায় ফিরলো। পায়ের নিচে নরম জ্যোৎস্না-ধবল তৃণরাজি। চকিতে কমলকলির বাহুমূলের স্পর্শ স্মরণে মেলে গেলো, চটি থেকে মুক্ত করে নিয়ে পায়ের নগ্ন পাতা দুটি নধর ঘাসে পাতলেন অনুপম রায়। ভিজে, রোমশ, স্যাঁতসেঁতে মাটি-ঘাস-মাটি তিনি উষ্ণ পা রাখলেন। ঘাসমাটিতে কোনো রোমাঞ্চ উঠলো বলে তো মনে হলো না।

ও কি? অনুপম দেখলেন বেঁটে বামনের এক বীভৎস মূর্তি চিৎ হয়ে ওই ঘাসে শুয়ে বুকে হেঁটে সরীসৃপের মতো নড়াচড়া করছে। বিকৃত, কৃষ্ণকায়, চ্যাপ্টা, বাঁটকুল এটি কে? কোথা থেকে কখন এলো? অনুপমেরই পায়ের গোড়ালিতে বাঁধা রয়েছে তার গোড়ালি। হিঁচড়ে, টেনে, লাথি মেরেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না অনুপম। রক্ত ছলকে উঠলো, বুক বেয়ে উছলে পড়লো কানে, চোখে-মুখে। অনুপম ভালো করে চেয়ে দেখলেন ওই জমাট কদাকার অন্ধকার, ওই ঘাসে-গড়ানো বুক-পিছলে-হাঁটা ছায়ামূর্তির সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বন্দী।

তিনি আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে চাইলেন। হঠাৎ নিজেকে ছেলেবেলার মতো মেলার ভিড়ে পরিচয়হীন অতিথি বলে মনে হোলো, অস্পষ্ট ভয়ে অস্থির হয়ে চারিদিকে আশ্রয়ের সন্ধান করলেন তিনি, গ্রহগ্রহান্তরে পরিব্যাপ্ত এই এই ত্রিভুবন পরিকীর্ণ সংগতির মধ্যে শুধু তিনিই মূর্ত অসংগতি। কী দৈন্য? কী তুচ্ছতা!

জোরে ঝড় উঠলো, অনুপমের মুখে অকস্মাৎ আছড়ে পড়লো কাঁকর-মেশানো ঝোড়ো বাতাসের শীতল প্রবল চাবুক। মুহূর্তে যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে অনুপম দেখলেন আজ্ঞাবহ গাড়িটি বিশ্বস্ত

গার্হস্থ্য প্রাণীর মতো পাশেই অপেক্ষা করছে। প্রভুর জন্য প্রস্তুত। প্রায় দৌড়ে এসে ঢুকে পড়লেন তার গর্ভে। একটা আড়াল পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। অনুপমের মনে হোলো এই সবই পূর্ব-পরিকল্পিত ছিলো, কিংবা পূর্বে ঘটে যাওয়া। যেন রাতের পরে রাত ধরে পুনরাবৃত্ত কোনও দুঃস্বপ্ন। যেন সবটাই বিহার্সাল দেওয়া ছিলো। এ ধরনের অনুভূতিকেই ফরাসিতে বলে dcja-vu, দৃষ্টপূর্ব। বাংলাতে ঐ বলে? কিছুই বলে না। কিছুই বলে না? না না, আছে, এর একটা বাংলা নাম আছে। নামটি স্মরণে আসা মাত্র অনুপমের গায়ে কাঁটা দিলো। নাঃ, আর নয়। এবারে যেতে হবে। একটু রাশ টানা দরকার, অনুপম। যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছো অপ-বুদ্ধিকে আজ।

বাংলাতে এ রকম অনুভূতিকেই কি 'পূর্বজন্ম' বলে? বলে 'পূর্বজন্মের স্মৃতি?'

অনুপম রায় স্টার্ট দিলেন। ঝড় উঠলে কি হবে, জ্যোৎস্না নিবে গেলে কি হবে, লেকে তখনো যুগলবন্দীর ভিড়। হঠাৎ চমক লাগলো অনুপমের। উস্কো-খুস্কো চুলদাড়ি একটি ছেলের হাঁটার ধরনটা কী খুব চেনা? নাঃ। চোখের ভ্রান্তি। মেয়েটির কাঁধে বাহু জড়িয়ে সে ছেলে সুখী পায়ে ঝড়ের বিপরীতে হেঁটে যাচ্ছে। হতে পারে না।

'বাট্ হি উইল বি কেপ্ট এলাইভ'—সহজে মুক্তি হবে না তার। অনেক খবর চাই।

সহজে মুক্তি হবে না। অনুপম রায় উইল বি কেপ্ট এলাইভ।

অনুপম অনুভব করলেন, অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। লেক ফাঁকা হয়ে আসছে। আকাশে তাকিয়ে চাঁদটাকে খুঁজলেন। না, নেই। অথচ একটু আগেও দু'দুটো চাঁদ ছিলো, জলে একটা, আকাশে একটা। এখন একটিও নেই। নক্ষত্রগুলিও এক সঙ্গে নিবে গেছে। নক্ষত্রশূন্য নিষ্প্রভ রাত্রিকে ভয়ংকর আলোড়িত করছে কিছু উন্মাদ বাতাস। পথ দেখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে এখন অনুপমের। ঝাপসা হয়ে এসেছে সব। রাস্তার আলোগুলোও কি জ্বলছে না? হঠাৎ খেয়াল হোলো উইণ্ড স্ক্রীন ওয়াইপার দুটি চালু করা আশু প্রয়োজন, বৃষ্টি এসে গিয়েছে। কোথায় যাবার জন্য বেরিয়েছিলেন?

কাচ যখন ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে এলো, অনুপমের মনে পড়লো, প্রমীলার ফ্ল্যাটে শুধু স্কচই থাকে না, প্রমীলাও থাকে। বিলিতি ফার্মের বড়ো চাকুরে, স্বল্পবাসা, স্বল্পভাষী, কর্মতৎপরা, মুক্তপ্রাণ প্রমীলা রোহাদগী। না প্রমীলার দামী পারফিউমড শস্তা শরীর, তার নীল 'স্বপ্নিল' শয়নকক্ষ, অনুপমের রুচিতে সহ্য হয় না। আজও হবে না।

তার চেয়ে সৌগতর ওখানে নীলাঞ্জনা নিশ্চয় এখনো আছে। মীটিংয়ের ঝামেলা চুকেবুকে গেছে, এখন পার্টি। ভালোই। পার্টিতে একা থাকা যায়। জনারণ্যই শহুরে বানপ্রস্থীর পক্ষে প্রকৃষ্টতম।

বানপ্রস্থ? আশ্চর্য! প্রমীলা রোহাদগীর বিকৃত ইচ্ছাকে অসহ্য লাগলেই যে বানপ্রস্থী হওয়া হোলো, তা কেন হবে। এখনও তাঁর গার্হস্থ্যই হোলো না। অন্তহীন ব্রহ্মচর্যে জ্বলে আছেন। নীলাঞ্জনদের কাছে গেলে নিশ্চয় ভালো লাগবে। পুলক, নীলাঞ্জ, সৌগত, অম্বর। ওরা বন্ধু।

॥ ১২ ॥

তের বর্ষণের পর অনুপম সৌগতর বাড়িতে পৌঁছুলেন। সেখানে তখন হোরতর আড্ডা জমেছে। সৌগত দামী তামাকের ফার্মে কাজ করেন। প্রায়ই বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের তাঁর আলিপুরের বাড়িতে ডেকে রাম-হুইস্কির অমৃতস্পর্শে তাঁদের বুদ্ধিতে শান দিয়ে দেন। নিজেও লিখতে ভালোবাসেন। কখনো-সখনো 'ডেইলি নিউজে' ফীচার লেখেন। ইংরিজি সাহিত্য পড়েছিলেন এককালে অক্সফোর্ডে, তাই চাকরিটা যাই হোক না, নিজেকে বুদ্ধিজীবী মনে করবার মতো একটা তকমা তাঁর আছে।

BanglaBook.org

সৌগতর একটি গোলগাল মাখনের মতো গিন্নি, আর ঠিক গিন্নির মতোই পরপর তিনটি সুগোল নবনীত কন্যা আছে। পার্টি যদিও বড়োদের, ঘড়িতে যদিও দশটা বেজে গেছে, এই ছোটো ছোটো চেরাবিন্দু মুখলাবণ্যের মেয়েরা সেখানে যদৃচ্ছ বিহার করছে, হাতে বাদাম, আলু ভাজা ইত্যাদির পাত্র নিয়ে! সৌগতর এই গোল স্ত্রী ও গোল গোল মেয়েদের প্রতি অসীম দুর্বলতা। সৌগতর পত্নী অরুণিমার সঙ্গে অনুপম পাঁচ মিনিটও কথা বলতে পারেন না। যদিও বোঝেন প্রাণী হিসেবে অরুণিমা নিরীহ।

ঢোকা মাত্র সৌগতর গোল গোল মাখনের মতো তিনটে মেয়েই গড়গড়িয়ে বলের মতো তাঁর কাছে চলে এলো: 'অনুপমকাকু, এতো লেট কেন, মা, বাবা, নীলাঞ্জনকাকু, রাও কাকু ওরা সব্-বাই কখন্ থেকে তোমাকে খুঁজছে!'

অনুপমের গা জ্বলে গেল। সকলেই 'কাকু' সকলেই 'তুমি', আর গুরুজনদের বিষয়ে ত্রিপদ ব্যবহারের সময়ে শ্রদ্ধাবাচক—'ন' যোগ করা নেই! রায়বাড়ির ছেলেমেয়েরা এর চেয়ে ঢের সুশিক্ষিত—তারা ডাকতো 'কাকাবাবু', তারা বলতো 'আপনি', তারা বলতো 'বাবা মা খুঁজছেন' এদের শেখা হচ্ছে যতো বঙ্গ-ইংরিজি ইসকুলের কদাচার।

অনুপম বলতে গেলেন 'একটা কাজে দেরি হয়ে গেলে'—কিন্তু গলা দিয়ে কেবল ঘড়ঘড় ছাড়া শব্দ বেরুলো না। তিনটে মেয়েই সমস্বরে কলকলিয়ে উঠলো 'আবে, তোমার গলায় কী হোলো? নিশ্চয়ই বিষ্টিতে ভিজেছিলে!'

ইতিমধ্যে সৌগত এসে দাঁড়িয়েছে 'হ্যাল্লোও! ইয়ু আর লেট!'

অনুপম বললেন—'ঘড় ঘড় ঘড়।'

—'ও কী হলো? গলায় আবার কী হলো?'

পাকা মেয়েরা কোরাসে চিৎকার করে ঘোষণা করলো: 'হি হ্যাজ লস্ট হিজ ভয়েস!'

অমনি চারদিক থেকে অত্যুৎসাহী কলরব উঠলো: 'নন্-বরম জল করে দিক, গার্গল...'

—'গার্গল? কার আবার গলায় ব্যথা?'...

—'গলায় ব্যথা? বেনজয়েনের ভেপার নিলে...'

—'টনসিল বুঝি? পেনিসিলিন ইজ দি আনসার...'

—'না বাবা, পেনসিলিন অমন যাকে তাকে খেতে দিও না, জানো তো বেবির মাসতুতো ভাইয়ের কী ট্র্যাজিডি হয়ে...'

—'এই তো সেদিন আমাদের অফিসের...'

অনুপম গিয়ে একটা সোফায় আশ্রয় নিয়েছেন নীলাঞ্জর পাশে। নীলাঞ্জ, পুলক, ললিত, সতী, রমেন, শুভাশিস, মালবিকা রুমা—সকলেই আছে। অম্বর নেই। অনুপমের চোখ আর এক পাক ঘুরে খুঁজে এলো—না। কমলকলি নেই। বিমল, কৃষ্ণমূর্তি, মোহন রাও আর ইউনুস একটা জায়গায় গোল হয়ে বসেছে। চারজনেই গেলাস হাতে প্রবল তর্ক জুড়েছে ব্রিটেনের কমন মার্কেটে ঢোকার প্রসঙ্গ নিয়ে ওকে দেখেই কৃষ্ণমূর্তি উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তর্জনী নির্দেশ করে বললো 'হিয়ার ইজ আ ম্যান অফ মেচিওর পোলিটিক্যাল আনডার-স্ট্যাণ্ডিং, ওকেই জিজ্ঞেস করো সাধারণ মানুষের কাছে এটার মানে কী দাঁড়াচ্ছে'—

ইউনুস চারমিনারের তামাকের টুকরো শব্দ করে জিবের ডগা থেকে ঝেড়ে ফেলে হাস্যবদনে বললো, 'আরে ধুর্, অগো জিগাইয়া লাভ নাই, জার্নালিস্টে জানেই বা কী, বুঝেই বা কী তাদিগের যা কওনের তা প্যাপার-এই কইয়া ফেলায়। তাও হইতা কথাডা কয় না।'

অনুপম জানেন, বাংলাদেশের মুক্তি বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত শেষতম বিশ্লেষণ ইউনুসের পছন্দ হয় নি। অনুপম মনে করেন বাংলাদেশে ঠিকমতো স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর না গেঁথেই উচ্চ ইমারত তোলা হয়েছে। মুজিবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রচুর খেটেছে ইউনুস, সে তাঁর কথা মানবে কেন।

BanglaBook.org

বিমল প্রসঙ্গ বদলাতে বললো, 'তোমার গেলাশ ?'

অনুপম আশ্বাসের ভঙ্গিতে অভয় হস্ত উত্তোলন করেন, 'হবে, হবে।'

সৌগত এসে দাঁড়ায় : 'রাম্ ? হুইস্কি ?'

—'ষড় ষড় ষড়।'

—'রাম্ ?'

অনুপম মাথা হেলিয়ে সম্মতিজ্ঞাপন করেন, যদিও তিনি রাম্ চান না। তবু, এই প্রশ্নোত্তরের একটা আশু সমাপ্তি দরকার।

ভুরু কুঁচকে নীলাব্জ বলে : 'এত দেরি করলে যে ?' অনুপম হাসলেন। তারপরেই ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলেন। ঘাড় ফিরিয়ে ওদিকে তাকাতেই চোখাচোখি হোলো রুমার সঙ্গে। চোখে চোখে হাসছে রুমা। ওর ঠোঁট সব সময়েই ভেজা, চিক্‌চিক্ করে, যেন এইমাত্র লেহন করা হয়েছে—বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না, সাপের গায়ের স্পর্শটা মনে পড়ে যায়।

রুমার হাসিতে কমলকলিকে মনে পড়লো আবার। সকালের স্নান জলে ধোওয়া ভেজা শরীরের কলি।

গোল গোল মেয়েগুলো বাদামের প্লেট নিয়ে এসে পড়েছে। প্রায় কোলের ওপরে এলিয়ে পড়ে একটা বললো : 'কী নেবে কাকু ? কাজু ? চিপ্‌স ?'

ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে আরেকটা বললো : 'সসেজ ? ডালমুট ? বলো না, কী নেবে ?'

ওহ্! বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো কলির পিকিনিজ ডার্লিংয়ের কথা। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে পড়েন অনুপম রায়। মাধাময়, স্নেহালু হাস্যে তিনি সসেজ তুলে নেন এক হাতে, অন্য হাতে আরেক জনের প্লেট থেকে কাজু। সবচেয়ে ছোটটার তুলো গালটা টিপে দিয়ে বলেন—'থ্যাংকিউ'।

সে অবাক হয়ে বলে—'তুমি তো আমার কাছ থেকে কিছু নিলেই না!'

—'এই যে! ঠিক হয়েছে কিনা দেখুন তো'—হেসে গৃহকর্তা গেলাশ বাড়িয়ে দেন—'আর বরফ লাগবে ?'

—'বরফ! বাপিয়া কি পাগল হলে ?' গায়েনের গলায় ধমকে ওঠে বছর দশেকের মেয়েটা। 'কাকুর গলার তো ডেঞ্জারাস অবস্থা! শুনছো না ? কথাগুলো কিছু বোঝা-ই যাচ্ছে না!'

—'ক্রীক্ কাণ্ড। এত খারাপ ?' লজ্জা পেয়ে সৌগত বলেন—'বলুন তো শুনি কিছু ? কতটা খারাপ হয়েছে দেখা যাক ?'

অনুপমের হঠাৎ একটা আজব পরিহাসস্পৃহা জেগে উঠলো। তিনি সুর করে গাইতে লাগলেন—'ড্রিংক টু মি ওনলি উইথ দাইন আইজ'—সৌগত শিউরে উঠলেন ঘড় ঘড় শব্দের একটানা কাংরানি শুনে। বললেন, —'থাক থাক, বেটার গিভ ইট আ রেস্ট, স্ট্রেইন করে কাজ নেই।'

এ কোণে তর্ক জমেছে বাংলা উপন্যাস নিয়ে। মেতে উঠেছে পুলক, ললিত, সতী, নীলাব্জ, রমেন। মালবিকা আর শুভাশিস চুপচাপ শুনছে। শুভাশিস নিজে একজন স্বনামখ্যাত ঔপন্যাসিক, কথা তার স্ত্রী। মালবিকা নীলাব্জর ভারতীয় পত্নী, সে বাংলা বলতে কইতে শিখে গেছে, কিন্তু সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিতে পারে না। রুমা এমনিতেই কথা কয় কম কম। তার কথা সবই চোখে। রমেনের বৌ শুভাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চার জন্য সে প্রায়ই এসব পার্টিতে আসতে পারে না।

সর্বাধুনিকদের নিয়ে জোর বিতর্ক হচ্ছে—কে কে ভালো লিখছে, কে কে উঠতির মুখে, কারা এখন পড়তি। কার কী শিল্পকৌশল আয়ত্তে এসেছে, কার কী নেই, কার কী থাকলে

ভালো হতো, কোন্ গুণটা দেশজ কোন্টা বিদেশী আমদানি, কে খাঁটি, কে ভেজাল! আলোচকবৃন্দ প্রত্যেকেই বিদগ্ধ, সর্বজ্ঞ, এবং উচ্চদরের সাহিত্যরসিক! বিশ্লেষণ-চাটুত্বে কেউ কারো চেয়ে কম নন, আত্মশ্রদ্ধাতেও না।

অনুপম সাধারণত শিল্প-সাহিত্য নিয়ে দু'চারটি বুদ্ধিমানের মতো মন্তব্য করা ছাড়া এরকম বিশদ আলোচনায় যাতেন না। তিনি মনে করেন এটা তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে

কৈ, মডার্ন আর্ট নিয়ে তো লোকে এমন অবাধে অশিক্ষিতপটুত্ব প্রদর্শন করে না, আধুনিক সাহিত্য নিয়ে যেমন? নিজের সীমা অনুপম রায় জানেন, এদের মতো তা নির্বিবাদে লঙ্ঘন করাটা পছন্দ করেন না। সাহিত্যটা সত্যিই অন্‌প্রোটেক্টেড এরিয়া,—নাকি নিবারেটেড এরিয়া? মুক্তাঞ্চল?

তর্ক চলছে নতুন যুগের নায়কদের মূল কোথায়, তাই নিয়ে। তারা কি বিজাতীয় আমদানি, তারা কি বাংলা সংস্কৃতির জারজ সন্তান, নাকি তারা এদেশেরই স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ ফলস্বরূপ? পুলক তার নীলাক্ত খুব জোর দিয়ে বলছে মোটেই ওরা কাফ্‌কা-কাম্‌-সার্ত্রের নকল নয়। এসব ছেলেরা কলকাতার পথেঘাটে সর্বত্র ঈশ্বস্ত – চরম ফ্রাস্ট্রেশন থেকে যেমন একদিকে বিপ্লবের জন্ম হচ্ছে, তেমনি অন্য দিকে এলিয়েনেশনেরও জন্ম হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ললিত, সতী এবং সৌগতর বৌ বলছে ওরা মোটে ভারতীয় চরিত্রই নয়, নকল মাল, ওদের শেকড়-বাকড় নেই, ভারতীয় সমাজে এমন এলিয়েনেশন হয় না, হতেই পারে না। দু পক্ষেই অনন্ত যুক্তি। যেসব বই, যেসব লেখকের নাম উল্লিখিত হচ্ছে, তাদের কোনোটিই অনুপমের পরিচিত নয়। তারাশংকরের পরে, তাঁর কখন যেন বাংলা উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় ছিন্ন হয়েছে। ললিত-সতী আদর্শবাদের বাপ বুলে যুদ্ধে নেমেছে। মহা উত্তেজিত তারা। নীলাক্ত এবং পুলকেরও উত্তেজনা কম নয়, নায়কদের দেশজ উৎপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে তারা বদ্ধপরিকর। রমেন ভক্তিভরে, নিরপেক্ষভাবে, দুপক্ষেরই বিরোধিতা করে যাচ্ছে। মত্ত কণ্ঠে একের পরে এক তাচ্ছিল্যের চীনে পটকা ছুঁড়ে দিচ্ছে সাহিত্যের উদ্দেশে

অনুপমের অভিমত কেউ চাইছে না, তাঁর যে বাংলা সাহিত্যে চলাচল নেই, তা সবাই জানে। কিন্তু ওদের দু পক্ষের কথা শুনতে শুনতে অনুপমের রুদ্ধ গলার মধ্যে কথার শব্দহীন ঢেউ উঠতে লাগলো। অনুপম ভেতরে ভেতরে বলতে চাইলেন: 'অরিজিন্যাল হোক, না হোক, যদিও আমি ওদের পড়িনি, তবু আমি জানি ওরা সত্য। ওরা এই ভারতবর্ষেরই মাটির ছেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যদিচ ওরা বাস্তব, যদিচ ওরা জীবন্ত, যদিচ ওরা দেশজ, তবুও আমরা ওদের দেখতে চাই না। নিছক ফ্রাস্ট্রেশনের মজ্জা-কাঁপানো এক্সরে চিত্র আমরা চাই না, অমন সত্য ভাষণে আমাদের কাজ নেই ফ্রাস্ট্রেশন লীডস টু মোর ফ্রাস্ট্রেশন। এবার চাই আত্মশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস। আত্মবিবমিষা, আত্মগ্লানি ঢের হয়েছে। আর না। এবারে সদর্থক সাহিত্য চাই, আশার, ভরসার ছবি চাই, চাই জনসাধারণের মনোবল গঠনের মতো পুষ্টিকর খাদ্য। অস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না হলে সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজচেতনা গড়ার কাজটা হয় না—শিল্পে সেলফ ক্রিটিসিজম ভালো, কিন্তু সেটা হওয়া উচিত কনস্ট্রাকটিভ্—

অতর্কিতে বুকের মধ্যে সপাৎ সপাৎ করে আছড়ে পড়লো সোমশংকর দত্তরায়ের স্বর: 'উই নীড্ ইয়োর কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম।'

মুখে তো চুপ করেই ছিলেন ভিতরে ভিতরেও এবারে একেবারে চুপ করে গেলেন অনুপম রায়। একটা অপরিচিত ভয় তাঁকে ছেয়ে ফেলতে চাইলো, তিনি মন শক্ত করে বাধা দিলেন। ঘোর বামপন্থী অনুপম রায়ের সাহিত্যিক রচনা বিষয়ক অভিমতের সঙ্গে ঘোর দক্ষিণপন্থী সোমশংকর

BanglaBook.org

কন্তরায়ের রাজনৈতিক রচনা বিষয়ক অভিমতের এ কী মহা অস্বস্তিজনক, প্রায় একাত্মক মিল!...অথচ, তা কী করে সম্ভব?

—'তুমি কিছুই বলছো না যে?' নীলাভ একটা হাল্কা হাতের থাবা বসালো অনুপমের পিঠে।

—'আমার গলা...' বিকৃতকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন অনুপম।

—'আরে? সেদিন থেকেই ধরে আছে?'

—'এ তো অনেক, বেশি খারাপ হয়ে গেছে দেখছি...'

এখুনি উঠে যেতে ইচ্ছে করলো অনুপমের। সকলেই যেমন সাহিত্যবোদ্ধা, সকলেই তেমনি ডাক্তার। এখানে ঠিক হোমিওপ্যাথি ওষুধ সাজেস্ট করবে কেউ না কেউ। হাঁপানির দৈব, আর গলাবসার হোমিও—এর সংবাদ আপামর রাষ্ট্রগুরু, নারী-পুরুষ-নপুংসক—প্রত্যেকেই বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকেন।

—'সঙ্গে সঙ্গেই ব্রায়োনিয়া থার্টি খেয়ে নেওয়া উচিত ছিলো।'

—'তার চেয়ে ভিটামিন সি ফাইভ হান্ড্রেডটা বেশি কাজে দেয়'—

অনুপম মনে মনে অনেক দূরে চলে গেছেন। শুষে নেওয়া গেলাশের স্বচ্ছ তলাটার মধ্য দিয়ে আবার রুমার টিকটিকে মৌটা দেখার চেষ্টা করলেন। সব কিছুই খুব বর্ধিত দেখাচ্ছে, ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের মতো। রুমার বড় বড় চোখ এখন অনেক বেশি বড় হয়ে মোহন রাওকে যেন গিলে ফেলতে চাইছে।

—'ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়'—অনুপম চমকে উঠলেন। কী বলতে যাচ্ছিলেন তিনি? ওই অর্থহীন, মূলাহীন, কথাচালাচালির মধ্যে কী বলতে চান অনুপম রায়? বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন: 'ইনাফ অফ ইট। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। খোড়বড়িখাড়া তো বের হোলো। এবারে বরং কিছু জরুরি কথা বলুন। লেডিজ এ্যাণ্ড জেন্টলমেন, টাইম ইজ মানি।'

—'কাকু? তুমি কিছু বলবে? এই নাও খাতা পেন্সিল, তুমি লিখে দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' অনুপম চেয়ে দেখলেন সৌগতর মেয়েটা একটা স্কুলের খাতা আর লাল রঙের পেন্সিল এগিয়ে দিচ্ছে, সত্যি সত্যি ওর হাত এগিয়ে গেলো, থাবড়ে দিলো ওর লাল ফিতে বাঁধা ঝাঁকড়া ছোটো মাথাটা। খুশি-গলায় বাচ্চাটা বলে—'লিখে লিখে কথা বলো তুমি, কেমন?' খাতাটা টেনে নিলেন। পেন্সিলটা হাতে। খুব জরুরি কী যেন বলবার ছিলো তাঁর। খুব জরুরি একটা কথা আছে। খাতা খুলে, পেন্সিল হাতে নিয়ে বসেই রইলেন অনুপম রায়।

কৃষ্ণমূর্তিদের দিকে মন দিলেন। এখনো চলছে তুমুল তর্ক। রুমন মার্কেট। একটু শুনেই বুঝলেন ওদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের গোড়াতেই একটা বিরাট গলদ রয়ে গিয়েছে, এতো বড়ো গ্লোবাল পয়েন্টটা ওরা মিস্ করে যাচ্ছে বলেই তর্কটা এতোক্ষণ চলছে। অনুপম এটা বুঝে ব্যস্ত হয়ে ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন: (লুক হিয়ার, দ্য পয়েন্ট ইজ সিম্পল) 'ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়।'

'ও অনুপমকাকু, তুমি অমন করছো কেন? এই তো খাতা রয়েছে, লিখে দাও না?' পাঁচ মেয়েটা অস্থির হয়ে পড়েছে।

অনুপম একবার খাতা-পেন্সিলটা নিয়ে খস্ খস্ করে লিখতে লাগলেন, পয়েন্টটা লিখে ফেলাই ভালো। আশ্চর্য! এই অবভিয়াস জিনিসটা প্রায় দু পাতা ভর্তি লেখার পরে পাতা থেকে মুখ তুলে দেখলেন আট ন' বছরের ছোট্টো একটা মানুষ, ফাঁপানো চুলের আড়ালে দুই চোখে রাজ্যের মমতা, সহানুভূতি বোঝাই করে নিয়ে তাঁর হাঁটু ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চুপটি করে অপেক্ষা করছে পাতলা গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে সদ্য ওঠা দুটো নতুন দাঁত উঁচু হয়ে ফুটে আছে। ঠিক নিরুর কাঁধেড়ালির মতন।

চোখাচোখি হতেই এক গাল হেসে দিয়ে বললো : 'এবার নিয়ে যাই ?' ফিসফিস করে বললো : 'কার কাছে ? বিমলকাকু ? রাওকাকু ? বলো না, কাকে দেবো ?' ছোটো হাতটা রাখলো অনুপমের কাঁধের ওপর, পরম স্নেহে।

হঠাৎ শরীরের ভেতরে সব কিছু কেমন গুলিয়ে উঠলো অনুপমের, উনি খাতা ফেলে রেখে ঘড় ঘড় ঘড় শব্দে 'এক্সকিউজ মি' বলতে বলতে বাথরুমের দিকে উঠে গেলেন।

বাথরুমে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে বমির চেষ্টা করলেন অনুপম রায়।

ভীষণভাবে গা গুলিয়ে আসছে—যেন একটা ভূমিকম্প চলেছে জঠরের গভীরে—কয়েকবার ওয়াক্-ওয়াক্ শব্দ হলো— মাথার মধ্যে প্রবল অস্বস্তি বুকফাটা চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো—'ধর্মাবতার, আমি নির্দোষ। আমি নয়, আমি করিনি—ইট ওয়াজন্ট মি...'

বমির চেষ্টা করতে গিয়ে বেসিনে দুই হাতের ভর দিয়ে হা-হা করে কেঁদে ফেললেন অনুপম রায়।

॥ ১৩ ।

রাত অনেক হলো। বেডসুইচ টিপে এক ঝলক হলদে আলোর মধ্যে চোখমুখ কুঁচকে উঠে বসলেন অনুপম। সৌগতর ওখান থেকে ফিরেই শুয়ে পড়েছেন। মার অনুরোধ রাখতেও খেতে বসেন নি।

কাজ করতেও বসেন নি। নাঃ কিছু ভালো লাগছে না।

কিছু নিয়েই ভাবতে ভালো লাগছে না। অয়েল কমিশন সাবকমিটির পলিসি রিপোর্ট প্রায় তৈরি—ওটা আর দেরি না করে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

সেটাও ধরতে ভালো লাগছে না। কিছু ভালো লাগছে না ?

অপরিসীম ক্লান্তিতে অপর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করল তাঁকে। অথচ চোখে ঘুম নেই।

অনুপম উঠে গিয়ে টেবিলের কাছে চুপ করে দাঁড়ালেন। কাগজপত্র, বইপত্রের ওপরে চোখটা অলসভাবে বিহার করে এলো এক চক্কর। দেয়াল চাপা পড়ে গেছে বইয়ে-বইয়ে। কোন্‌টা ? কোন্‌টা ? কোন্‌টা ? একটা বইয়ে চোখটা একটু থামলো। ছেলেবয়সের অতি প্রিয় বই তাঁর। রেজারেকশন। হাত বাড়িয়েও ফিরিয়ে আনলেন। না, থাক্। এখন যদি আর সে রকম না লাগে ? চোখ অন্যদিকে চালান করলেন। এশিয়ান ড্রামার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এসেছে, নতুন। নেড়ে চেড়ে দেখবেন ? নাঃ, থাকগে।

অনুপম ড্রয়ার খুলে লম্বা বাদামী খামটা বার করলেন। লোকে এরকম খামে ব্যক্তিগত চিঠি লেখে না। অ্যাপ্লিকেশন লেখে। বিল পাঠায়। ঘুম-না-হওয়া ক্লান্ত ঈষৎ অব্যবস্থিত আঙুলে খামটি খুললেন—লেটার ওপনার ছাড়াই। তারপরে আরাম কেদারায় গিয়ে বসলেন। অনেকগুলো কাগজ। একগোছা রুলটানা ফুলস্ক্যাপ।

কালো কালিতে বাংলায় পরিচ্ছন্ন লেখা। বাম কোণায় তারিখ। আর অনেকখানি শূন্যতা ওপরে-নিচে বাঁদিকে চাপ বেঁধে আছে। সম্বোধন নেই। উলটে-পালটে দেখলেন। এক-একটা কাগজে এক-একটা তারিখ দেওয়া। কোথাও কোনো স্বাক্ষর নেই।

দিনলিপির মতো স্বগতোক্তি।

এর আগেও সুধা এই রকম চিঠি লিখেছে। একবার গবেষণার কাজে ক'মাস মেদিনীপুরে গিয়ে থাকতে হয়েছিল ওকে। তখন। সুধার মুখের কথায় আর চিঠিতে আশমান-জমিন তফাত। কথাবার্তা যেমন কাঠখোট্টা, উদ্ধত, বেমক্কা, চিঠি ঠিক তার উলটো। সুধার কথাবার্তা তাঁর ভালো লাগে না। বড়ো বুনো, বড়ো স্পর্ধিত। চিঠি আরোই ভালো লাগে না। সে আরো বন্য। সেখানে প্রাকৃতিক আলো-আঁধারি, আদিম প্রাণের জোয়ার-ভাঁটা। এমন একটা অঞ্চলের দিকে

BanglaBook.org

সোজাসুজি পা বাড়ায় সুধার চিঠি, সেখানে ট্রেসপাসারদের বিধিমতো প্রসিকিউট করেন অনুপম রায়।

তাই তিন দিন ধরে ফেলে রেখেছেন। ও চিঠি খুলতে তাঁর হাত ওঠে নি।

সুধা মেদিনীপুর থেকে ফেরার পরে সুপরিকল্পিতভাবে এমনই আচরণ করেছেন অনুপম, শেষ পর্যন্ত জংলী সুধাও আর পারেনি। সরে গেছে। দক্ষিণ ভারতে চলে গেছে একটা কাজ নিয়ে।

—'নতুন প্রজেক্টে কাজ করতে ভালই লাগবে তোমার। প্রফেসর রামলিঙ্গম খুব চমৎকার লোক।' বলেছিলেন অনুপম—'তা ছাড়া ওসমানিয়ার ক্যাম্পাসটাও দারুন। অ্যাপ্লাই করে দাও। চটপট।'

—'কিন্তু আমার রিসার্চ?' আর্তনাদ করেছিল সুধা।

—'রামলিঙ্গমের আছেই কনটিনিউ করতে পারবে ইচ্ছে করলে।'

—'আপনি সত্যি চাইছেন আমাকে তাড়িয়ে দিতে!'

—'কী আশ্চর্য! তাড়াবার এতে কী দেখলে? শোন সুধা, তোমার অ্যাকাডেমিক টেম্পারমেন্ট নেই। এরকম অ্যাপ্লায়েড কাজই তোমার পক্ষে ভালো হবে। মাথাটা ঠাণ্ডা করে অ্যাপ্লাই করে দাও। আমি বরং একটা রেকমেণ্ডেশন লেটার লিখে দেবো।'

—'ঠিক আছে। রেকমেণ্ডেশনটা কবে দেবেন?'

—'কালকে হবে না, একটু ব্যস্ত আছি কমলকলির ওখানে, বরং তুমি পরশু দিন এসো। কিংবা ভাইটাই কাউকে পাঠিয়েও দিতে পারো।'

কয়েকটা নোটিসে সই করতে করতে কথাগুলো বলছিলেন অনুপম রায়। মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন সুধা ঘরে নেই।

সুধা আর আসে নি।

রেকমেণ্ডেশন লেটার লিখে রেখেছিলেন অনুপম। সুধা সেটা সংগ্রহ করে নেয়নি। লোকমুখে শুনেছেন সে হায়দ্রাবাদে চলে গেছে।

দেখা অবশ্য হয়েছিল, ইণ্টারভিউ বোর্ডে। টেবিলের ওপারে সুধা, এপারে ছিলেন সাবারওয়াল আর মঙ্গেশকরের সঙ্গে অনুপম রায়ও। সুধার বেলাতে তিনি কোনো প্রশ্ন করেন নি, তাঁরই ছাত্রী এই সুবাদে। সুধা সবগুলো উত্তর তাঁর দিকে চেয়ে চেয়েই দিয়েছিলো। বেশ স্পষ্ট চোখেই তাকিয়ে ছিলো—ঋজু দর্পিত দৃষ্টি। সেই শেষ। আর দেখা হয়নি।

অনুপম রায়ের রেকমেণ্ডেশন ছাড়াই তার চাকরি হয়ে গেছে।

এই প্রথম চিঠি। প্রায় তিন মাস পরে। টেবিল ল্যাম্পটা জেলে কাগজের গোছাটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

(সুধার চিঠি)

২৪/৪

মন কেমন করছে। সোনা, তোমার জন্যে মন কেমন করছে। এই তো, ট্রেন চলছে যেন কোন্ অন্তহীন নদীর সেতু পেরিয়ে ঘন অন্ধকার কাঁপিয়ে, পায়ের নিচের গভীর নিরালম্ব শূন্যতা গম্‌গম্ করে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দশদিকে, কখনো বা বাজছে কুটুমকাটুম-মৌরিবাটুম, মাটি জমির ঘরকন্নার সাংসারিক নূপুর, চোখে বিদ্ধ হচ্ছে ছুটন্ত প্লাটফর্মের চকিত আলোর বর্শাফলক। সব কিছুতে, সব সময়ে, বুকের মধ্যে একটাই সাপুড়িয়ার বাঁশির শব্দ, একই যন্ত্র ঘুরছে, চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে স্মৃতি ও বিস্মরণ, উত্থিত হচ্ছে কল্পনার ফণা, তার মাথায় ঝলসে উঠছে গোপন ইচ্ছের মণিক...

BanglaBook.org

সোনা, আমি চলে যাচ্ছি।

শুনতে পাচ্ছো, আমি চলে যাচ্ছি?

২৫/৪

বাংকের ওপরে এটা যেন বেশ আরেকটা ছোট্ট ঘর, এখানে কেবল তুমি আর আমি। অনেক, অনেক নিচে কাঁপতে কাঁপতে মেঝেটা দৌড়ুচ্ছে, বাংকের সঙ্গে পারবে কেন? আমার বাংক যে পারস্যের গালচে—ফুসমন্তরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে আমাকে তোমার কাছে। এখন কেবল তুমি আর আমি। তুমি: তুমি আরাম কেদারায় বসে কালকের লেকচার ভাবছো কিংবা টাইপরাইটারে বসে তৈরি করছো 'রয়জ কর্নার'-এর পরবর্তী কিস্তি, আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার পিঠের কাছে, তোমার চেয়ারের দুই হাতলে দুই হাত রেখে ঝুঁকে আছি—আমার বুকের ঠিক মাঝখানে তোমার মূল্যবান মস্তিষ্ক ইত্যাদি—আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি অল্পস্বল্প পাক ধরেছে তোমার চুলে—হ্যাঁ সোনা, তোমারও বড়ো কড়া পাওনাদার এই শরীর—চল্লিশ তোমাকেও রেহাই দেয়নি। নাকি, পঁয়তাল্লিশ? নাকি, একেবারে পঁয়তাল্লিশ? সোনা, তোমার বয়স যতো বাড়বে, আমার বাড়বে তার চাইতে একটুখানি বেশি করে। কেননা আমি যে সত্যকে ছুঁয়ে রয়েছি। আর তুমি বড্ডো ভীরু। তুমি সত্যকে শিশুর মতো ভয় করো। নকল দাড়ি নকল গোঁফ সেঁটে তুমি চাও খোকোস সেজে থাকতে, আসলে তুমি কিনা, খোকনমণি, একা থাকলে নিজের হাত-পাকেও বুকের কাছাকাছি আসতে দাও না। পাছে তারা শুনতে পেয়ে যায় তোমার বুকের গোপন দ্বন্দ্ব? তুমি যাই বলো আর যাই করো, সুধা কিন্তু সব জেনে ফেলেছে। সুধা শুনতে পেয়েছে তোমার গোপন মৃদঙ্গের ধ্বনি।

২৬/৪

ট্রেন চলছে কি চলছে না, রাত কাটছে কি কাটছে না, ঘণ্টা সরছে কি সরছে না, কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এই পথ—এ তো কোনো দিন ফুরোবার নয়। আমি তো কেবলই চলে যাবো, চলে যেতে থাকবো দূরে, যে দূরের কোনো শেষ নেই।

সোনা, আমার সোনা কেউ-না, আমার সমস্ত সর্বস্বধন, আমার দূর-পর-মহাশত্রু চোখের মণি—এত রাত্রি, এত শব্দ, এই নৈঃশব্দ্য, এই নিশ্ছিদ্র নির্জন নৈঃসঙ্গ, এই বন্ধুতা, এই মুক্তি, এই শুদ্ধতা, এই সুপ্তি, এক থালা আকাশভরা নিবে-আসা তারাফুল সমেত আমি তোমাকে উৎসর্গ করলাম। তুমি নাও, বা না নাও, এখন সব তোমার। এই গতি, এই অগত্যা বিষাদ সব তোমার। এই আমি, এই সৌরমণ্ডলের একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ—সব তোমার হলো।

প্রেমপত্র লিখতে নিশপিশ করছে হাতের আঙুল, জিভের ডগা, স্তনের বোঁটা—ওরা সকলেই প্রেমপত্র রচনায় নিপুণ—কিন্তু সোনা, তুমি কি সে চিঠি পড়তে পারবে? তুমি সে চিঠি পড়তে জানো না। এখুনি সকাল হয়ে যাবে। এইবারে থেমে যেতে হবে, এবারে নেমে যেতে হবে। ইচ্ছে করছে ভয়ানক একটা চিৎকার করে উঠি, ভয়ংকর একটা লাফ দিয়ে পড়ি বাইরে, এই নিষ্ঠুর লোহার গাড়ির সব ক'খানা নির্মম চাকায় পিষে দলে চটকে যাক এই শরীর যেখানে এখনো লজ্জা, এখনো লোভ। সেই চক্ষুহীন, রসনাহীন, মূক বধির স্পর্শসর্বস্ব ১৫৩ সেন্টিমিটার, ১১০ পাউণ্ড মাংস হাড় মেদ মিটুলির অশ্লীল পুটলিটা যা তোমাকেও বিভ্রান্ত করেছিলো, যা তোমাকে হারিয়ে ফেলেছে—যাক, যাক, তা ধ্বংস হয়ে যাক।

এই ট্রেন কোথায় চলেছে? যেদিকেই যাক সেটা তোমার দিকে যাওয়া। কারণ সব দিকগুলোই তোমার দিক, কারণ আমি তো কেবলই তোমার দিকে...

২০/৫

এখানে এসে বেশ হয়েছে। তুমি আর পালাতে পারছো না। ঐ তো মোষের গাড়িতে ছপাট

BanglaBook.org

হাতে সবুজ মেরজাই পরে বসে রয়েছো তুমি, আর সোনার মতো কলসী নিয়ে লাল ঘাঘরা পরে আমি কুয়ো থেকে জল তুলছি।

২/৬

কেবলই মনে হয় গিয়ে দেখবো একটা চিঠি এসেছে। অফিসে মনে হয়, আজকে বাড়িতে গিয়ে দেখবো চিঠি! আর বাড়িতে মনে হয়, আজ অফিসে গেলেই দেখবো চিঠি! অথচ জানি, তুমি আমার ঠিকানাই জানো না মোটে। নামটাই জানো কিনা সন্দেহ।

এখানে কোনো চেনা মুখ নেই, চেনা গাছের ছায়া নেই, চেনা রাস্তার মোড় নেই, এখানে শুধু কাজ কাজ কাজ। আর যখনই কাজ নেই—শুধু তুমি তুমি তুমি।

৮/৬

বুকের মধ্যে সব সময়ে একটা ভরা ভরা ভাব, একটা স্রোত বয়ে বয়ে যাবার মতন ভাব—যেন বুকে দুধ আসছে—বুকে দুধ এলে কি এই রকম লাগে? যেন একটা কিছু অর্জন হয়েছে, যেন উদ্‌ঘাটন ঘটেছে কোনো। এখনে সময় কাটছে যেন স্টীম লঞ্চ চলে যাচ্ছে শান্ত হ্রদের জল কেটে—ঢেউগুলি বহুক্ষণ ধরে চপল রাখছে হ্রদের বুক—আরো অনেকক্ষণ পরেও ঝণ তুলে আছড়ে পড়ছে পাড়ে। এই জন্য কি তোমাকে ধনাবাদ দেবো?

১২/৬

চোখ বুঁজলেই সেই অলৌকিক মাঠ। সেই নক্ষত্রের চন্দ্রাতপ। সেই চন্দ্রতপ্ত মুহূর্তগুলি ধমনী বিদীর্ণ করে বয়ে যায়। সেই আকাশ-গঙ্গা, মুঠোর মধ্যে চাঁদ, কোলের মধ্যে চাঁদ, গেঞ্জির ভেতর চাঁদের পাউডার, ব্লাউজের ভেতরে চাঁদের দুধ, আকাশে বাতাসে অশ্রুর রোদন, এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে ইহার মধুরী বড়াও হে—সেই কি ভালোবাসা? সোনা বিশ্বাস করো সেই ভালোবাসা। মাত্র একটি সন্ধ্যা—শুধু ওই সন্ধ্যা টিকেই তোমার জীবনের একমাত্র ধ্রুব মুহূর্ত—বিশ্বাস করো তুমি, ওই তোমার সত্য, তোমার বিজয়। ওই তোমার ভালোবাসা।

তুমি নিজেকে মস্ত জ্ঞানী ভাবো কিন্তু তুমি কিছু জানো না। তুমি জীবনের ব্যাপারে কিছুই শেখোনি। সেই সন্ধ্যা, যেটাকে তুমি মনে করো তোমার পরাজয়ের মুহূর্ত, যার গ্লানি মুছে ফেলবার জন্যে সুধার সঙ্গে তোমার এই যুদ্ধ, সেই ছিলো তোমার এক পলকের বেঁচে-ওঠা।

ইন্টারভিউয়ের দিনে তোমার নিবাত নিষ্কম্প মুখ, সাদা কাগজের মতো ধোবা চোখ, সেই তোমার নকল দাড়ি গোঁফ— আমি ঠিক ধরে ফেলতে পেরেছি। তাই তো আমার জিৎ। সোনা, ওই তোমার দুঃখ; ওই তো তোমার ভালোবাসা।

এত পর্যন্ত পড়া হলে অনুপম চশমাটা খুলে পাশে নামিয়ে রাখলেন। পড়া কাগজগুলোও নামিয়ে রেখে একটা বই চাপা দিলেন। দেখলেন আরো দুখানা কাগজ বাকি। এইবারে সবগুলো কাগজ ফের তুলে নিয়ে ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরলেন, না-পড়া কাগজ দুটি শুদ্ধ। আলগোছে দু'হাতের ছটি আঙুলে খামটা ধরে যত্নসহকারে কুটি কুটি করতে লাগলেন সুধার চিঠিগুলি অনুপম রায়। শেষ অংশটা না পড়েই শতছিন্ন হয়ে গেলো। তারপরে অনেকক্ষণ ধরে দলা পাকিয়ে ওটাকে ক্রমশ একটা কামানের গোলার মতো কঠিন কন্দুকে পরিণত করলেন।

এবারে ওটি টেবিলে রেখে হাত বাড়িয়ে সরপোষ ঢাকা দেওয়া জলভরা গ্লাসটি টেনে নিলেন। সরপোষের ওপরে নাম লেখা আছে, 'অনু'। এই জলপাত্র তাঁর আকৈশোরের অভ্যস্ত বাসন, উপনয়নের দানসামগ্রীর অংশ। গ্লাসটা যে রূপোর তৈরি,তা কোনো দিনই অনুপম রায়ের খেয়াল হয়নি। আজও হলো না। পৈতেটি ছিন্ন করেছেন বিলেতগামী জাহাজে উঠেই। কিন্তু উপনয়নের দানগুলি সব হারিয়ে ফেলতে পারেন নি।

BanglaBook.org

গ্লাসভর্তি জল তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে উপুড় করলেন অনুপম রায়, এক নিঃশ্বাসে গ্লাস শূন্য করে নামিয়ে রেখে তুলে নিলেন ছেঁড়া চিঠির বলটা—লক্ষ্য স্থির করে ছুঁড়লেন ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে, ঘরের ঠিক কোণাকুনি। ঠিক পাখির মতো উড়ে গেলো ওই পাখির ডিমের মতো বলটা—ভদ্র, মৃদু, অভঙ্গুর একটি শব্দ করে পড়লো শূন্য ঝুড়িটার ঠিক মধ্যিখানে।

স্বহস্তের অব্যর্থ সন্ধানে পরিতুষ্ট হয়ে অনুপম উঠে গেলেন বিছানায়। এক মুহূর্তেই—সঘন, শব্দহীন সঙ্গহারা চরাচরব্যাপী অন্ধকারকে ঘরে ডেকে আনলো, তারপর শীলমোহর করে সংরক্ষিত করে দিলো—অনুপমের হাতের মুঠোয় ছোট সুইচটার খুট্ শব্দ।

॥ ১৪ ॥

ডাক্তার ব্যানার্জীর চেম্বারে ভীষণ ভীড়। যদিও পূর্বাহ্নে সাক্ষাৎলগ্ন স্থির করেই এসেছেন, তবুও প্রায় পঁচিশ মিনিট হলো অনুপম রায় স্লিপ জমা দিয়ে বসে আছেন। ডাক আসেনি। টেবিলে বাখ শংকরস্ উইকলি, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, ফিল্মফেয়ার পর্যন্ত দেখা শেষ। এবার কেবল বাংলা সাপ্তাহিকগুলো বাকি উপায় না দেখে বাংলা সাপ্তাহিকই তুলে নিলেন।

অন্যমনে পাতা ওলটাতে ওলটাতে সম্পাদকীয় পাতাটা পড়লেন। বাঃ, মন্দ তো নয়। বেশ সেন্সিব্‌ল। সংযত, ঝরঝরে। সারও আছে, ধারও আছে। কবিতাগুলোয় চোখ বোলাতে গিয়ে চোখ তুলে নিলেন। এখনও এই সব নদী-নারী-নিমপাতা নিয়ে বার্লিগোলা কবিতা লেখা হচ্ছে? ছাপাও হচ্ছে? যখন দেশে এই রকম একটা উথালপাথাল সময় যাচ্ছে! গল্পটা, ছবি দেখে তো মনে হয় প্রেমের। মিঠে-কড়া প্রেমপনার আহ্লাদে গপ্‌পে আজকাল আর পড়তে পারেন না অনুপম। সাহিত্য-সমালোচনার পাতাগুলোয় চোখ ঘুরে এলো। মনে মনে ইংরিজি কাগজের সঙ্গে স্ট্যাণ্ডার্ড মাপছেন, সর্বাঙ্গীণ তুলনা করছেন—কখনো মনে মনে নাকটা তুলছেন, কখনো বা ভুরুটা। হঠাৎ একটা পৃষ্ঠায় অনুপম রায়ের কুঞ্চিত ভ্রূ আটকে গেল। অনুপম রায় স্তব্ধ হয়ে পড়লেন। জায়গাটা কিছুই নয়, একটা ধারাবাহিক উপন্যাসের অংশ। পিতা তাঁর পুত্রকে দিয়ে একটি প্রার্থনা মুখস্থ করাচ্ছেন। প্রার্থনাটি শিখিয়ে দিয়ে ছেলেকে বলছেন—'সকালে উঠে বলবে, সারা দিন বলবে, বলতে বলতে এর একটা পলি পড়ে যাবে মনের ওপরে।'

ঝন্‌ঝন্ শব্দে রায়বাড়ির কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠলো অনুপম রায়ের বুকের গভীরে। বাবার পৈতে পরা ফরসা বুকে গঙ্গাস্নানের পর চন্দনের ছাপ—বাবা ঠাকুরবাড়িতেই সারা সকাল, সারা সন্ধ্যে—অনু-নিরুরা যখন দল বেঁধে উঠোনে খেলতো বাবা তখনও সকাল, সন্ধ্যে, সারা বেলা, সারা দিন—শুনতে শুনতে মনের ওপর একটা পলি পড়ে যাবার কথা? পলি কি পড়েছিলো?

অনুপম ছাপার হরফের প্রার্থনাটি আরেকবার পড়তে চেষ্টা করলেন: 'আমি অক্রোধী, আমি অমানী, আমি নিরলস, আমি কামলোভজিৎ বশী'...যেন জন্মের ওপার থেকে ভেসে এলো কৃষ্ণচৈতন্য রায়ের গভীর, আত্মমগ্ন কণ্ঠস্বর: 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ নির্মমো নিরহংকারো সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।'—সাপ্তাহিক কোলে পড়ে রইল, অনুপম রায় আর পড়লেন না। তাঁর কানে বেজেই চললো রায়বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ ঠাকুরদালানে কৃষ্ণচৈতন্য রায়ের গীতাপাঠ। 'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ'—ওঃ! কী আশ্চর্য লোক! 'এই সব সোনার পিতলমূর্তি...।' সারাটা বেলা কাটতো ঠাকুরবাড়িতে, অথচ ভেতরে ভেতরে উনি যে কী চীজটি ছিলেন তা তো বাড়িশুদ্ধ কারুরই জানতে বাকি ছিল না। শোনেন নি জ্যাঠাইমার গালিগালাজ? অনুপম কি শুনতে পাননি বিনুঝির সঙ্গে জ্যাঠতুতো দিদির ননদের সেই ভয়ংকর কথা-বলা? কে না জানতো লোকটার ভক্তি-উন্মাদনা প্রকৃতপক্ষে ব্রা-য়ে ঢেকে রাখা অন্তর্দৌর্বল্যের মতো এক প্রতারক প্রচ্ছদমাত্র। 'হিপক্রিসি, দাই নেম ইজ রিলিজিয়ন!' এবং ততক্ষণে শাঁখের অন্তরের বিধৃত দূর সমুদ্রের নিহিত কল্লোলের মতো, অনুপমের শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হলো পুনরায় সেই

BanglaBook.org

ভণ্ড লোকটার গম্ভীর স্বর : 'ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ' ভক্তিমান না হলে প্রিয়ত্ব অর্জন করা যায় না অনু, ঈশ্বরের প্রিয় হতে হলে নিস্পৃহ হতে হয়, নিন্দাপ্রশংসায় অবিচল, শোকে-সন্তাপে, লজ্জা-তিরস্কারে ব্যথাহীন হতে হয়—'অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ— অনু, বাবা, জীবনে সবই অভ্যাসসাপেক্ষ।'

সেই ঠগ, সেই ভণ্ড, সেই অভিনয়পটু বেড়ালতপস্বীর কণ্ঠ বজ্রমুষ্টিতে টিপে ধরতে প্রবল বাসনা হলো অনুপম রায়ের—ভেতরে অস্থির হয়ে উঠে তিনি শান্তভাবে হাতের পত্রিকায় ভাসমান অক্ষরের স্রোতে পুনরায় চোখ ডোবাতে চেষ্টা করলেন।

'ডক্টর অনুপম রায় ?' উর্দিপরা ঘোষক দোরের কাছে এসে ডাকলো।

—'ভক্তি অভ্যাস করো অনু, বিনয় অভ্যাস করো, তরুর চেয়ে সহিষ্ণু হও, তৃণের চেয়েও নিচু—মানদ হও বাবা, অমানী হও, তবেই তাঁর কৃপা পাবে।'

—'আমি মনে করি তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হওয়া যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে সহজেই সাধ্য—কিন্তু তৃণের চেয়েও নিচু হওয়াটা মানুষের পক্ষে হীনকর। মানদ হওয়া, অর্থাৎ অপরের প্রাপ্য মান অপরকে দেওয়া প্রত্যেক সভ্য মানুষেরই কর্তব্য, কিন্তু অমানী হওয়া ? তা কি সত্যই সম্ভবপর ? কেবল সন্তের পক্ষে ছাড়া ?'

অনুপম নিজের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন। সংসারে বাস করে গতব্যথ হওয়া অসম্ভব। তুমি নিরলস বটে। তুমি অদ্বেষী, তুমি দৃঢ়নিশ্চয়— কিন্তু অনুপম, তুমি কি শুচি ? যার পিতা কৃষ্ণচৈতন্য রায়, সে কি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করলেই বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হয়ে যেতে পারে ? রক্ত ? রক্ত তার কাজ করবে না ? ক্রোমোজোম্‌স্ ? হিপক্রিসি যার পিতৃধন, সে কি কোনোদিন শুচি হতে পারে ?

—'অনুপম রায় কে আছেন এখানে ? ডক্টর অনুপম রায় ?'

—'আমি। আমি অনুপম রায়।'

—'আপনার ডাক এসেছে। উঠে আসুন '

পত্রিকাটি নামিয়ে রেখে ব্রীফকেসটি বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অনুপম। ঘড়ি দেখলেন। ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি করিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার।

চেম্বারে ঢুকে, হেসে নমস্কার করলেন। ডান হাতটা কপালে ছুঁইয়ে কেজো গলায় ডাক্তার ব্যানার্জী বললেন : 'বসুন। বলুন শুনি আপনার কী কমপ্লেইন, কী কী অসুবিধে বোধ করছেন ? কোথায় কষ্ট হচ্ছে আপনার ?'

ঠোঁটে জোর করে হাসি টেনে এনে ডাক্তার বললেন : 'নট টু ওয়ারি ! ডোন্ট বি সো ডিপ্রেস্‌ড। ফেটাল তো কিছু হয়নি আপনার ? হ্যাঁ, আপনার প্রোফেশনটার একটু যা অসুবিধে হতে পারে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি গাইয়ে নন !' ডাক্তার একটু হেসে হাতটা হঠাৎ বাড়িয়ে দিলেন। 'ইন এনি কেস'—টেবিলের ওপরে অনুপম রায়ের টরেটক্কাবাদনরত কিঞ্চিৎ স্নায়ুতাড়িত হাতটিতে স্বল্প, উষ্ণ চাপ দিয়ে ডাক্তার বললেন—'আপনার যেটা আসল কাজ অর্থাৎ লেখা, তার তো কোনো ক্ষতি হবে না।'

শিহরিত হয়ে হাতটা সরিয়ে নিলেন অনুপম রায়। পুরুষ মানুষের স্নেহের স্পর্শ অনুপমের সহ্য হয় না কোনোকালে। প্রণাম করে উঠলেই বাবা অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলিয়ে দিতেন পিঠে মাথায়, বিড়বিড় করে আশীর্বচন উচ্চারণের ভান করতেন জেঠামশায়ের এসব বাতিক ছিল না।

একটু অবাক হয়ে ডাক্তার বললেন—'ভয় কিসের ? ভিয়েনাতে এর চেয়ে ভালো চিকিৎসার, মানে অপারেশনের ব্যবস্থা আছে। আপনাদের তো দেশ-বিদেশে যাতায়াত আছেই—ভিয়েনা থেকে বরং অপারেশনটা করিয়ে ফেলুন।'

BanglaBook.org

—'ডক্টর, আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি চিরকালের মতন আমার কণ্ঠস্বর হারাবো?'

—'ওয়েল...ইন্ আ ওয়ে...শেষ পর্যন্ত, ম্ ম্ ম্...আই অ্যাম অ্যাফ্রেইড'...তারপরেই সহজ, তরলকণ্ঠে বললেন—'আজকাল তো ভয়েস বক্সটা রিপ্লেস করা কিছুই না। ইট উইল নট বি ইয়োর নর্মাল ভয়েস, কিন্তু কাজ চলে যাবে। সব কথাই বলতে পারবেন—উইথ এ সিম্পল এ্যাণ্ড সায়াণ্টিফিক ফলস ভয়েস।' ডাক্তারবাবু অন্যমনস্কভাবে ফীজ এর খামটা তুলে দেরাজে তরলেন।

—'মনে রাখবেন, স্মোকিং ইজ ডেডলি ফর ইউ। একটা কর্ড আপনার একেবারেই গেছে—এ্যাণ্ড দি আদার ইজ অলমোস্ট গন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ফুসফুসের বারোটা বাজিয়ে দ্যান আপনারা। একেই তো কলকাতার বাতাস ইনহেল করা মানেই—দা ড্যামেজ ইজ ইকোয়াল টু স্মোকিং টোয়েন্টি সিগারেটস্ আ ডে!'

অনুপমের চকিত দৃষ্টি ডাক্তারের হাতের কাছে রাখা লাইটার আর 'ভার্জিনিয়া'-প্যাকেটটার ওপর একবার ঘুরে আসে। তিনি মুখে হাসি মেখে বলেন: 'ডাক্তারবাবু, আমি আর কতদিন পর্যন্ত কথা কইতে পারবো না?'

—'বলবেন না। একদম বলবেন না। গান্ধীজির সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পালন করার কথাটা মনে আছে তো? আপনিও একজ্যাক্টলী অমনি করুন। কেবল সপ্তাহে সাতটা দিন। এখন তিন হপ্তা ঘরে বসে থাকুন চুপচাপ। গলাকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে।'

—'তাহলে কথাটথা আর বলতে পারবো না বলছেন। ওটা গেল। এ্যা? আ পার্মানেন্ট লস?'

—'কি মুশকিল। আরে! আমি কি তাই বলছি? এখন কেবল তিন সপ্তাহ বলবেন না। অপারেশনটা মনে হয় করিয়েই নিতে হবে তবে, হোয়াই ওয়ারি? যান, এই ম্যাক্রোবিন আর ভিটামিন ইঞ্জেকশন দুটো তিন সপ্তাহ এবং এই স্টেরয়েড আর এই অ্যাণ্টিবায়োটিকটা দশদিন ঠিক যেভাবে যেটা লিখে দিয়েছি, সেই ভাবেই চালিয়ে যান। এ্যাণ্ড গিভ্ ইয়োর ভয়েস এ কমপ্লীট রেস্ট্। কেমন? সী মি আফ্টার থ্রী উইক্স'...হুঁ—কেমন? আচ্ছা?' প্রায় সেন্টেন্সের মতো অমোঘ অন্তিম উচ্চারণে 'আ—চ্ছা' বলেই টেবিলের ওপর রাখা ঘণ্টিটা সবিনয়ে এগিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। মুখের কাজ ফুরোবার আগে হাসি।

—'থ্যাংকিউ ডক্টর!'

—'ওয়েলকাম! নেক্স্ট?'

ডাক্তার ব্যানার্জীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে অনুপম রায় ঘড়িটা দেখলেন—পার্ক স্ট্রীটেই আছেন—কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। কমলকলি ফ্লুরিতে আসবে সাড়ে চারটের সময়ে। ঢের দেরি। এখন লাঞ্চ আওয়ার—যেখানেই যাবেন, ভিড়। লেকচার দিতে যাবার প্রশ্ন নেই। কথা বলা পর্যন্ত নিষেধ। এখন বরং এই সামনের দোকানটাতে ঢুকে পড়া যাক্।

কফি আর স্যাণ্ডুইচ অর্ডার দিয়ে অনুপম ভাবলেন কাগজের অফিসেই ঘুরে আসবেন একবার। সন্ধীব সকালে এসেছিলো। লেখাটা দিতে পারেন নি। ছ'বছরের মধ্যে এই প্রথম বিচ্যুতি—এ সপ্তাহের 'রয়জ কর্নার' যাচ্ছে না।

অবশ্য এই দু' ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে লিখেও ফেলা যায়। এই টেবিলে বসেই খাদা এখনও আসেনি। এলেও অসুবিধে নেই। ব্রীফকেস খুলে প্যাড আর কলমটা বের করলেন অনুপম। ওঃ, হো, মাকে একটা ফোন আগে করে দেওয়া দরকার। মা তো না খেয়ে বসে থাকবেন!

ওইটুকু কথাও ফোনে বলতে বেশ কষ্ট। মা ভালো কানে শোনেন না। অনুপমের স্বরও আজকাল শ্রুতিসাবলীল নয়।

BanglaBook.org

কফিটা গলায় আরাম দিল। আঃ, কী সুখের এই মুহূর্ত। ঘরটার শীতলতা বাহ্য শরীরকে স্নিগ্ধ করছে, পানীয়ের উষ্ণতা অভ্যন্তরকে উষ্ণ করছে। আঃ! এই তো ইন্দ্রিয়সুখ!

কলম খুলে বসলেন। দেখা যাক। হতে পারে পঙ্গুকে যিনি গিরি লঙ্ঘন করান, মত্ত করীকে তিনিই পঙ্কে কর্দমে বদ্ধ করে ফেলেন। কিন্তু 'যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ'—সে নিশ্চয়ই পঙ্ক-কর্দম থেকে উদ্ধার পেতে সক্ষম।

কিছুক্ষণের চেষ্টায় মোটামুটি একটা দাঁড়িয়ে গেলো। না, এবারে স্বদেশ নয়—ওই অয়েল ক্রাইসিসের রিপোর্টের ভাবনা থেকেই কিছুটা ধার নিয়ে, দিব্যি দু' কলম ভর্তি করার মতো ম্যাটার হয়েছে। হঠাৎ পরিশ্রান্ত নিঃশেষিত বোধ করলেন অনুপম রায়।

বিল মিটিয়ে দিয়ে আবার পথে বেরোলেন—আর কফি নয়। একটু ব্র্যাণ্ডি খেতে হবে এবার কোথাও ঢুকে। গলায় বড্ড কষ্ট হচ্ছে। তারপরে লেখাটা জমা দিতে হবে, যদিও টাইপ করা হয়নি কমলকলি আসুক আগে, তার পরে লেখাটা জমা দিলেই চলবে।

বার-এ ঢুকেই প্রথমে দেখতে পেলেন রমেনকে। রমেন, মাহিন্দর, শুভাশিস এবং আরো কিছু উস্কোখুস্কো মদ্যপ। শিল্পী-টিল্পি হবে আর কি, আঁকে-টাকে কিংবা লেখে-টেখে বোধহয়। আজ ওদের কাছে যেতে ইচ্ছে করলো না। মনটা ঠিক নেই। অনুপম অন্য একটা টেবিলের দিকে এগোলেন।

কিন্তু তিনি যেতে না চাইলেও, তাঁর দিকে দুই হাত বাড়িয়ে রমেন জড়িত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—'আরে, আরে, বড়দা, যে! বড়দা, এসো ভাই, এসো। তোমার জন্যেই বসে আছি। দুটো ফ্রী জ্ঞানের কথা বলে যাও। দুটো নীতিকথা শুনিয়ে যাও বড়দা। লিস্টি'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন অনুপম রায়। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অদৃশ্য অ্যান্টেনা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি রমেনের মেজাজের একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করলেন। কান দুটো দিয়ে অগ্নিস্ফরণ হচ্ছে। রমেন তো তাঁকে 'তুমি' বলে না, যতোই মাতাল হোক, তাঁর সামনে এভাবে বেচাল হয় না রমেন তাঁকে নাম ধরে 'বাবু' যোগ করে সম্বোধন করে। 'বড়দা' বলে না।

—'এস্‌সো বড়দা, বোস্‌সো বড়দা, এবার বলো দিকি তোমার মাও-বাবা আর কী কী ফুসমন্তর কানে দিয়েছে? কী? বলবে না? কেন বলবে? রাগ হয়েচে বুঝি? এ্যাঁ? আমিই বলি তাহলে? বলি? স্‌সোনো: মাও-বাবা বলেছে দিনের বেলা কেবল গাড়ি করে করে বাবএ বাবএ ঘুরবে। আর সাঁঝের বেলা মেয়েছেলে সঙ্গে রং চড়াবে। আর যদি তারি ফাঁকে সুযোগ পাও তবে লম্বা চওড়া বাতেল দিয়ে কচি কচি ছেলেগুলোকে স্‌সোওজ টর্চার চেম্বারে হাওয়া খেতে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজেরা লেজ তুলে লম্বা দেবে। এ্যাঁ? ঠিক বলিচি না? বল্ শ্যালা, ঠিক বলিচি কিনা? আর শ্যালার ব্যাটা তোদের আঁতেল্‌গিরি বের করে দিচ্ছি, তোদের বিপ্লবীপনার শখ ঘুচিয়ে দিচ্ছি আয়—মিথ্যেবাদী, জালিয়াৎ, জোচ্চোর, বিদেশী টাকাগেলা, ভাঙৎ মার্ডারার, হিপক্রিট—'

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াতে গিয়ে রমেনের মাথাটা হঠাৎ নেতিয়ে পড়লো। শুভাশিস, মাহিন্দর এবং আরো দু' চারটে জটাজুটধারী জীব রমেনকে চেপে ধরেছে। বেয়ারারাও ছুটে গেছে তার দিকে। ইতিমধ্যেই হাতের তরল পদার্থ-ভরা গেলাসটা রমেন অনুপমের উদ্দেশে ছুঁড়েছিলো। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা দেওয়ালে লেগে ঝনঝনিয়ে গুঁড়ো হয়ে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়লো। ঘরের বাতাস রাম-এর কড়া গন্ধে হঠাৎ ভারী হয়ে গেল।

রমেন এখন টেবিলে মাথা রেখে নিশ্চল। তার সেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশী রুদ্রদৃষ্টি এখন জামার হাতায় গোঁজা।

শুভাশিস সংকোচ-জড়ানো পায়ে এগিয়ে এসে স্থাণু, নির্বাক অনুপমের শ্রবণহীন কানে অজ্ঞাত কোন্ ভাষায় কী সব কথা বলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

অনুপমের পা যেন শত শত বৎসরের বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো মাটিতে গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু তিনি তো পাদপ নন। তিনি পা দিয়ে মাটি থেকে প্রাণরস পান করবেন কী করে! অনুপম বুদ্ধির হাতলটা চেপে ধরতে চেষ্টা করলেন—চলন্ত ট্রেনের দরজার মতো সেটা কেবল যেন সামনে দিয়ে পিছনে পার হয়েই যাচ্ছে। বদ্ধবধির গুহার অভ্যন্তরে কেবল গেলাস ভাঙার ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ হাজার বছর ধরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো...

তারই মধ্যে এক সময়ে অনুপম রায়ের কেমন আবছা মনে হলো, অনেক দূর থেকে, অতি অস্পষ্ট লাইনে, অর্ধস্ফুট আওয়াজে, যেন ক্রস কনেকশন হয়ে কোনো টেপ্-করা মেসেজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—

—'কিছু মনে করবেন না অনুপমদা, রমেনের আজ মাথা-টাথার ঠিক নেই—আজই ভোরবেলায় সোমেনের বডিটা গঙ্গার ধারে পাওয়া গেছে। এটা ওদেরই পার্টির ভেতরের কাজ বলে মনে হয়।'

॥ ১৫ ॥

ফুরিতে কমলকলির সঙ্গে টীয়ের এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন অনুপম রায়, তবে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো। এবং গিয়েও একেবারেই কথা বলতে পারেননি। কাগজের অফিসে গিয়ে লেখাটা জমা দেওয়ার কথাও তাঁর মনে হয়েছিল। প্রথম লেখাটা না-ই তৈরি হোলো, নতুন করে একটা যখন লিখে ফেলেইছেন—জমা না দেবার কোনো মানে হয় না না হয় কিছুদিন বহির্বিশ্ব নিয়েই লিখলেন। কিন্তু তাঁর হাত পা বেঁধে দিলো তাঁরই ভেতর থেকে কোনো বিরুদ্ধশক্তি। তৈরি থাকা সত্ত্বেও 'রয়জ কর্নার' এবার প্রেসে গেল না। এই প্রথম।

রমেনের গ্লাস ভাঙবার পরে কখনো ফের নড়ে উঠেছিলো অনুপমের পা দুটো, বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি ওই ঘর ছেড়ে, সোজা চলে গিয়েছিলেন গঙ্গার ধারে।

রমেনের ছোটো ভাইটির নিরুদ্দেশ হবার খবর মাস দুতিন ধরেই শুনছেন—আজ তাহলে তার উদ্দেশ মিলেছে।

অনুপম রায় গঙ্গার ধারের ছোটো দোকানে এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক কিনলেন, আর একটা দেশলাই। একবারও মনে পড়লো না—মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই ডাক্তার ব্যানার্জী কী উপদেশ দিয়েছেন। ধূমপান তিনি বড়ো একটা করেন না, চা-কফি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো নেশাই নেই অনুপম রায়ের। নেশার চাকর না হওয়াটাই তাঁর মস্ত এক নেশা।

অথচ আজ, নিঃসঙ্গ এই নদীকূলে, রৌদ্রছায়ায় ভরা বয়স্ক পিপুলগাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে পিঠে হেলান দিয়ে বসে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে চললেন অনুপম রায়। অশেষ ধূম্রকুণ্ডলী ঝুঁকেই রইলো তাঁর নাক, মুখ, চোখের সামনে। যেন শরীরের গভীরে একটা অনির্বাপিত অগ্নিকাণ্ড চলেছে।

অনুপম রায় শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, মনটাকে ফাঁকা রাখতে খুব চেষ্টা করলেন—ফাঁকা কি রাখা যায়? কী করি, কোনদিকে তাকাই, কী ভাবনা ভাবলে সব ভাবনা এড়ানো যায়? 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ'—আহ্! রায়বাড়ির হাত থেকে কি অব্যাহতি নেই? স্মৃতির কি বিনাশ নেই? 'স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশঃ' কথাটা ঠিক নয়—কখনো কখনো স্মৃতিকে বিনাশ না করলেই বরং বুদ্ধির সমূলে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা। এবং 'বুদ্ধিনাশাদ্ প্রণশ্যতি' একথা ধ্রুবসত্য।

অনুপমের চোখ চেষ্টা করে তাঁর মন ভোলাতে। নদীর ওপর দিয়ে এই ভরা দুপুরেও কতো নৌকো যায়। পালতোলা। বৈঠাটানা। ছইওয়ালা। ছইবিহীন। এপার-ওপার ফেরীর স্টীমার। মোহনার দিকে চলে যাওয়া স্টীমার। উজান বাওয়া স্টীমার। একহারা। দোহারা। বোঝাই। শূন্য। একটা

BanglaBook.org

ছোটোখাটো বিদেশী জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। সুদূর এক মহাদেশের নামে তার নাম। কী করছে ওই ভিনদেশী মহাদেশ আমাদের এই হুগলী নদীর গেরুয়া জলে? কোনোকালেই নাড়ির যোগ নেই এর সঙ্গে ওর—অথচ দ্যাখো কেমন সুন্দর গা ভাসিয়েছে একজন আরেকজনের বুকে!

অনুপম জল থেকে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুললেন—পড়ন্ত পশ্চিমের রোদে চোখ মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। আড়াল গড়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করলেন সেই তেজ থেকে, হাত চাপা দিলেন চোখে। গোল গোল কমলা-রেশমী আলোর বৃত্তহীন ফুলের পর ফুল ফুটলো নিঃসীম কালোর সমুদ্রে। ক্রমশ সেই কমলা পাকা থেকে কাঁচা ফল হয়ে যেতে লাগলো, পরিণত হলো সবুজ জ্যোতির ফুলকিতে—তারপর সারি সারি নীলকান্ত মণি। চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অনুপম দেখলেন জলন্ত শূন্যে এক ফোঁটা এক জেদী চিল, কী এক দুরন্ত আশ্বাসের বশে ঘুরছেই...ঘুরছেই...। শূন্যকেই কেন্দ্র করে, শূন্যের মধ্যে বৃত্তের পরে বৃত্ত রচনা করে চলেছে, চক্রাকার জেদের অস্থির ব্যূহের মধ্যে বন্দী চিল।

থিওরি অফ রেলেটিভিটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন, বান্ধবী আসার পূর্ববর্তী এক ঘণ্টার দৈর্ঘ্য হোল প্রস্তুহীন [যেন দ্রৌপদীর শাড়ি]—অথচ বান্ধবী এসে পড়ার পরের তিন ঘণ্টা কতো বেশি সংক্ষিপ্ত [যেন আ-ঢাকা কর্পূর]!

সেদিন অনুপমের অভিজ্ঞতা কিন্তু তা ছিল না।

যখন পৌঁছুলেন তখন বেশ একটু দেরি হয়ে গেছে, কলি আগে থেকে এসে ঠোঁট ফুলিয়ে বসে আছে। খুব সেজেছে আজ। আগুন রঙের হালকা শিফন শাড়ি আর রঙেরই একচিলতে বক্ষোবাসের সঙ্গে মানিয়েছে সুন্দর, ঘন কালো ফাঁপানো চুলের গুচ্ছ যেন পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার মতোই লতিয়ে ঝেঁপে আছে ঘাড়ে। কপালে। কাঁধে। বুকের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে এও খেয়াল হলো অনুপমের, যে উপমাটা তাঁর নিজের নয়। অশোকপুষ্প ও ভ্রমরপুঞ্জের সেই ক্লাসিক উপমাটি স্বয়ং উপমা-বিশারদের তৈরি। অবশ্য যাঁরা লিখেছিলেন উপমা কালিদাসস্য—তাঁরা তো আর অলটাইম উপমা-ওস্তাদ উইলি শেক্সপীয়রকে চিনতেন না!

হঠাৎ ঘৃণায় জর্জর বোধ করলেন অনুপম রায়। ঘেরসও? এখনও তোমার মার্জিত-বুদ্ধি নন্দনতত্ত্বের সোরাকারবারে মত্ত, অনুপম?

টেবিলের ওপরে ঝকঝকে বাদাম আর টকটকে চেরি-বসানো সুইস পেস্ট্রির পাশে এলিয়ে থাকা কমলকলির মাখনের মতো নরম হাতটি হীরের আংটিতে, রক্তিম নোখে পেস্ট্রির মতই মচমচে, স্বাদু—অথচ ছুঁতেই ইচ্ছে করলো না আজ। কলির শাড়ি যথারীতি স্থানচ্যুত হলো বার বার, কিন্তু অনুপমের চোখ পিছলে ফিরে এলো চায়ের কাপে।

গলা দিয়ে একেবারেই স্বর নিষ্কাশিত হচ্ছে না। প্যাকেটে আর মোটে দুটো সিগারেট বাকী। অনুপমের সংসর্গে যাদৃশী ঝলমলে, চিত্রকর্ষক, জড়োয়া বাকালাপে কমলকলি অভ্যস্ত, আজ তা না পেয়ে সেও কেমন বোরড হয়ে রইল।

দুজনের মাঝখানে একটা অদৃশ্য কাচের দেওয়াল—সেখান থেকে ওপারের সব দেখা যায়, কিন্তু কিছুই শোনা যায় না। ঢং ঢং করে বুকের ভেতরে একটা ঘণ্টা পড়ছে: জমছে না! জমছে না!

—'বা রে ব আমাকে ডেকে নিয়ে এসে একটাও বুঝি কথা বলতে হয় না?'

—'ঘড়ঘড়...' (আমি সত্যিই খুবই দুঃখিত যে...)

—'থাক থাক, গলায় এতো কষ্ট? থাক, কথা কইতে হবে না। বরং আমিই বলি। আপনি শুনুন। এখন কথা হচ্ছে; কী বলব?'

কোনমতে অর্ডার দেওয়া হলো খাদ্য-পানীয়। কমলকলি সহানুভূতিতে দ্রব হয়ে গালে হাত

BanglaBook.org

দিয়ে বসে রইলো, তাঁর দিকে চোখ মেলে। এই করুণা-দৃষ্টিটা মন্দ লাগছিলো না, একটা মজা পাচ্ছিলেন অনুপম। ইতিমধ্যেই কলি বলার কথা খুঁজে পেয়ে গেলো: 'আজ আমাদের উইমেনস কো-অপ্ কমিটির মিটিং ছিল এই পাশেই, পার্ক হোটেলে। একটা চ্যারিটি লাঞ্চের প্রোগ্রাম ঠিক হয়েছে, মাদার টেরেসার জন্য। দুশো সীট থাকবে, মাত্র পঁচিশ টাকা করে সিংগল টিকিট। ডাবলস পঞ্চাশ। আপনি একটা ডাবল কিনবেন। বুঝলেন?

বশংবদ সম্মতিতে মাথা হেলিয়ে ওষ্ঠাধরে মোলায়েম অমায়িকতা টেনে এনে সামাজিক কর্তব্য পালন করলেন অনুপম। ঠোঁট নেড়ে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' এই আশ্বাসে ভুবনের কোথাও কোনো শব্দ হলো না।

—'থ্যাংকিউ। এখনই না অবশ্য। দেরী আছে। ও-মাসের সেকেণ্ড স্যাটারডে-তে। আজকাল তো সানডে-তে রেস হয়, তাই রবিবারটায় করা মুশকিল।'

গভীর বোদ্ধার মতো সহানুভূতিসূচক মাথা নাড়লেন এবারে অনুপম।

[অনপেক্ষ শুচির্দিক উদাসীনো গতব্যথঃ। আমি কি শুচি? শুচি কে? সোমেন? সমীর? অনপেক্ষ হওয়া মানে কি 'ব্যক্তিগত' ফলের অপেক্ষা না রেখে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া? সেটাই তো সন্তদের পুণ্যকর্ম। কাজের ফল তো একটা থাকবেই—সেটার ভোক্তা নিজে না হলেই হোলো।]

—'জানেন, 'অ্যাডাম এ্যাণ্ড ঈভ' পত্রিকার জন্যে আমি মাদার টেরেসার একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি নেক্সট উইকে। শিরিন ডালমুটওয়ালা আর আমি—দুজনে মিলে লিখছি ফীচারটা।

[ওহ্! নিজে সেধেই এই মৃত্যু-যন্ত্রণা বুকে তুলে নিয়েছি। এখন কী উপায়ে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কমলকলির কলকাকলি থেকে? টীপটের চা ফুরিয়ে গেছে, এই রক্ষে। ফুরোলে আরো না নিয়ে, এবার উঠে পড়লেই হবে।]

—'বলুন না? মাদার টেরেসাকে কী কী প্রশ্ন করা যায়? থাক, এখন কথা বলবেন না—বরং বাড়িতে ফিরে ভেবে-চিন্তে একটা কোয়েশ্চেনেয়ার তৈরি করে দেবেন, কেমন? মাদার টেরেসা ইজ, আফটার অল, আ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি সেইন্ট! তাঁর ইন্টারভিউটা ভাল হওয়া দরকার।'

[আ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি সেইন্ট। ইদানীং কথাটা খুব চালু হয়েছে। কিন্তু সন্তদের আবার শতক ভাগ হয় নাকি? সন্তরা তো মৃত্যুহীন। কিন্তু গতব্যথঃ নন। গতব্যথঃ হলে আর সন্ত হওয়া সম্ভব নয়। সন্তের গুণই তো ব্যথা পাওয়া। সন্তের হৃদয়ে অনন্ত বেদনাবোধ। এবং তারই সঙ্গে অনন্ত সহন। আমি তো সন্ত নই, আমি আর পারছি না।]

গাড়িতে বসে কলি বললো—'চলুন গঙ্গার ধারে, সানসেটটা দেখে যাই।' গাড়িতে কি তালভঙ্গ হোলো অনুপমের? কলির কান ঘেঁষে নেমে এসে বুকের ঠিক মাঝখান পর্যন্ত গেঁথে রয়েছে গনগনে লাল একটা তীক্ষ্ণ আলোর ফলা। অস্তসূর্যের শেষ মার। রোস্ট-করা-হচ্ছে এমন মুণ্ডহীন মুরগীর শিকবিদ্ধ ধড়টার কথা হঠাৎ মনে পড়লো। চোখটা সরে গেলো—আরেকটু ছায়াময়তায়। সেখানে, শেয়ালদার বাজারে ফলের টুকরির ঢাকনি ফাঁক করে যেমন উঁকি মারে অবাধ্য কমলালেবুরা, তেমনি ব্লাউজের ঢাকনি অগ্রাহ্য করে উঁকি মারছে ঝুড়িভর্তি পাকা ফল। অনুপমের স্টিয়ারিং আপনা-আপনি গঙ্গার দিকে চলা ঠিক করলো।

কিন্তু পার্ক স্ট্রীটের মোড়েই মস্ত এক লাঠি হাতে একটা রোগা পাতলা পাথুরে শরীর দু' মানুষ উঁচু বেদীর ওপরে খাড়া দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে পা বাড়িয়ে আছে।

হঠাৎ এই নগ্নপ্রায় প্রহরীমূর্তির সামনে পড়ে গিয়েই, কী করে যেন অনুপমের হাতে স্টীয়ারিংটা অন্যমুখে ঘুরে গেলো।

BanglaBook.org

—'কই, গঙ্গার ধারে যাবেন না?'

ডান হাতে আঙুল দিয়ে নিজের গলাটা অল্পতো করে ঠেলে ধরলেন অনুপম রায়। চোখে কষ্টের চেহারা ফোটালেন। মাথাটা নিরুপায়ভাবে ডাইনে-বাঁয়ে হেলালেন বারকয়েক। কতোটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে এই আত্মসংযমের নির্দয় পন্থা বাধ্য হয়ে নিতেই হচ্ছে তাঁকে, কেবল গলার কষ্টটার জন্যেই—সে বিষয়ে কমলকলির সরল হৃদয়ে কোনো সংশয় রইলো না।

—'পুরোয় দিং!' সহানুভূতিতে লাল টুকটুকে চেরীফলের মতো গোল হয়ে গেলো ঠোঁট দু'খানি—ফলের মাঝখানটা অল্প কেটে গেল। সেই ফোকর দিয়ে দেখা গেল ধবধবে দাঁতের পিছনে গোলাপী জিব ঠেকিয়ে বাব্‌ল্ গাম-এর মতো গোলালো চুকচুক্ শব্দের বুদ্বুদ তৈরি করছে কলি। পুরুষ অনুপমের ক্লান্ত শরীরে সেই দৃশ্য, সেই শব্দের একটা অমোঘ সতেজ ক্রিয়া শুরু হলো।

এমন সময়ে তাঁর মনে পড়লো: পিকিনিজ কুকুর ডার্লিংকে আহ্বান জানাতেও কলি একই শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

আপনিই গাড়ির গতি কখন দ্রুত হয়ে উঠেছিলো নাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেয়াল হতেই অনুপম আবার নিজের সঙ্গে কথা বললেন। আস্তে চালাও অনুপম, তোমার তো সত্যি কোনো গন্তব্য নেই। তাড়াটা কিসের? আস্তে, অনুপম, ধীরে। এবারে স্পীডটা কমিয়ে ফ্যালো একটু দেরি হলে কী ক্ষতি? একটু পেছনে পড়লে কী ক্ষতি? শান্ত হও অনুপম, স্থির হও

॥ ১৬ ॥

কমলকলিকে নিরুৎসব বিদায় দিয়ে বাড়িতে ফিরে 'কেষ্ট' বলে ডাকতেই যে স্বরটি বেরুলো তাতে অনুপম রায় এবং কেষ্ট উভয়কেই যুগপৎ যারপরনাই বিচলিত দেখালো।

—'দাদাবাবু, বড় ডাক্তারবাবু কী বললেন? গলা তো আরো খারাপ দেখছি।'

—'আবার দেখাতে হবে।'

– 'ছোড়দা এসে মাকে নিয়ে গেলেন। মা আপনার জলখাবার গুছিয়ে রেখে গেলেন। এনে দিই?'

মাথা দুলিয়ে খাদ্যে অসম্মতি জানিয়ে অনুপম কাবিনেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বার করলেন সম্প্রতি ভুটান থেকে আনা কমলেনের হুইস্কির বোতল, ফ্রিজ থেকে নিলেন ঠাণ্ডা সোডা। বরফ? না থাক। একটা সুদৃশ্য গ্লাস বেছে নিলেন।

ওঃ, কীভাবে অপচয় হলো দিনটা। পুরো একটা ওয়ার্কিং ডে অপব্যয়। একটা লেখা যদি বা তৈরি করলেন, সেটুকু সময়ই যা সদ্ব্যবহার করা গেছে—সেও তো জমা দিলেন না। তক্ষুণি উঠে গিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করতে লাগলেন। 'ডেইলি নিউজ' উত্তর দিতেই তিনি মুখার্জীকে চাইলেন। কিন্তু অপরপক্ষ কেবলই বধিরের মতো 'হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো?' বলে গেলো। 'কাকে চাই? আপনার কাকে চাই? বলুন আপনি কাকে খুঁজছেন?' অনুপম বললেন, তাঁর কাকে চাই। তবুও 'ডেইলি নিউজ' কিছু শুনলো না। কানেকশন কেটে দিলো।

কেষ্ট পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। অনুপম ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছেন আরাম কেদারায়।

—'ফোনটা করা গেল না?' কেষ্ট বললো। 'ফোনটা করবেন? আমি করে দিলে হবে?'

অনুপম এক মুহূর্ত ভাবলেন, 'হ্যাঁ'। কেষ্ট বাংলাতেই ফোন করে মুখার্জীকে খবর দিতে পারবে। পিওন পাঠিয়ে ওরা নিয়ে যাক লেখাটা। তারপর মনে হলো—কেষ্টই যাক না—পৌঁছে দিয়ে আসুক। ঘণ্টাখানেকের মতো একা থাকার সম্ভাবনায় মনটা উৎসুক হলো।

ইঙ্গিতে ব্রীফ-কেসটা চাইলেন। কেষ্ট ব্রীফ-কেস এনে দিলো।

লেখাটা বের করে, একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন। চলবে। খামে ভরে ওপরে ঠিকানা লিখে

BanglaBook.org

কেষ্টর হাতে দিলেন। কেষ্ট ঠিকানাটা দেখে নিয়ে বললো : 'এইজন্যেই ফোন করাইলেন ? আমার রান্না তো সকালবেলাই শেষ। আমি গিয়ে দিয়ে আসছি।'

'রয়েজ কর্নার' বন্ধ হবে না। এ সপ্তাহেও বেরুবে। অনুপমের মনে আরাম হলো। সত্যি, কী করে যে ওটা আটকে দিচ্ছিলেন। এটা বন্ধ করার সঙ্গে সোমেনের মৃত্যুর কী যোগ ? কোনো যোগ থাকতেই পারে না।

মনটাকে জোর করে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন—না, ও কথা নয়। সমীর নয়। অন্য কথা ভাবো। কেষ্ট দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাড়ি এখন শূন্য। এখন কার কথা ভাববো! কলি নয়! নলিনী দেশপাণ্ডে ? শোভনা দাশগুপ্ত ? রুমা—শুভাশিসের স্ত্রী ? একটা সাররাত জাগা নিউইয়ার্স ঈভ পার্টির ভোররাত্রের দিকে হঠাৎ রুমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিলো। সেই থেকে তিনি সন্তর্পণে রুমাকে এড়িয়ে চলেন। রুমার ভেজা চকচকে ঠোঁট, তার টলটলে, অবান্তব কথায় ভরা চোখকে তিনি ভয় করেন। আর ভয় করেন সুধাকেও। সুধার শ্যামাটা তাঁতের শাড়িকে, তার ক্ষয়ে যাওয়া কোলাপুরী চপ্পলকে, তার সোজাসুজি ছোরা বসানোর মতো চাউনি, তার চাবুকের মতো বিনুনীটাকেও। সেটা বুকের ওপরে টেনে নিয়ে, আঙুলে জড়াতে জড়াতে সুধা তাঁর ভূত-ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখে নেবার ভান করে। সুধাকে সব সময়ে কেমন গুলি-ভরা বন্দুকের মতো খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়—এমনকি সুধা-বিষয়ক ভাবনাটাকে পর্যন্ত।

গুলি। বন্দুক। সমীর কি জেল হাজতে ? তিনি সমীরের জন্য ল' ইয়ার লাগাবেন। সমীর নিজের হাতে কোনো প্রাণহানি করেনি নিশ্চয়। নিশ্চয়ই না। সমীর খুনী না। অবশ্য এ-সব ছেলেরা যে সব সময়েই নির্ভুল তা নয়। প্রায়ই ভুল করে। হিংসার অন্ধ, আফটার অল, প্রায়ই ভ্রান্তিময়।

(সুধা বললো : 'প্রায়ই' কেন ? আপনি কি ইচ্ছে করেই ভেগ্ হয়ে যাচ্ছেন ? ভেতরের কুনো অনুপমটা টিপ্পনী কাটলো : নাকি ওটা অ্যাকাডেমিক হেজিটেশন ? ভুল পথই যদি হবে তবে ওদের সাহায্য করবো কেন ? সে কি শুধুই মানবিক দয়ালুতার দুষ্কৃতকরণ ?)

অনুপম ভাবলেন—ঠিক তা নয়। রাজনৈতিক সহানুভূতি তাঁর ছিল বৈকি ওদের দিকে। তিনি মূল লক্ষ্যের দিকে চেয়ে পন্থাটা মেনে নিতে পারেন নি। বিপ্লবে কেন, জীবনেও total non-violence বলে তো কিছু সম্ভব নয়। Necessary violence আর unnecessary violence এই দুটো দু' জাতীয় ব্যাপার। না, শুধুই মমত্ব নয়, নৈতিক বিশ্বাসও তাঁর নিশ্চয়ই ছিলো।

(সুধা বললো : ছিলো ? এখন আর নেই ? তা সেদিন যদি ছিলোই তবে কেন চুপ করে রইলেন, সোমশঙ্কর দত্তরায় যখন বললেন : আমরা তো ইহা নিশ্চিতই অবগত আছি যে ইহা ভবদীয় রাজনৈতিক বিশ্বাস নহে, হতভাগা ছাত্রদিগের প্রতি উদার করুণা মাত্র ? তখন কেন রুখে দাঁড়ান নি ? অমনি কুনো অনুপম জুড়ে দিলো : সত্য কথা বলার সাহসের নাম সৎসাহস। তুমি সেটাকেই ভেবেছিলে দুঃসাহস। তাই বলো নি। না ? অনুপম, মনে আছে, পিটার...ইত্যাদি ? সুধা বললো : আপনি আসলে শক্তের ভক্ত !)

আঃ সুধা, তুমি চুপ করো তো। তুমি বড্ডো বকবক করো। তোমার বড্ডো দুঃসাহস। তোমার মুখ, বুক কোথাও কিছু আড়াল নেই। এই আড়ালটারই নাম সভ্যতা, সুধা। সবটাই যদি বুক-পেট খুলে দেখিয়ে দিলুম, তবে আমরা পোশাক পরি কেন ? দেহে যেমন, যাকোও তেমনি,—এমন কি মনের মধ্যেও ঠিক তেমনিই আড়াল দরকার আমাদের।

শূন্য গ্লাসটি হাতে নিয়ে আবার পুনঃপূর্তির ইচ্ছায় টেবিলের দিকে গেলেন অনুপম। টাইপরাইটারের পাশে পড়ে রয়েছে ইউ এন অয়েল সাব-কমিটির জন্য রিপোর্ট। আজ ওটা শেষ করে ফেলতেই হবে। গ্লাস ভরে নিয়ে টাইপরাইটারেই বসে পড়লেন অনুপম। যতো আজেবাজে

BanglaBook.org

চিন্তায় মাথাটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে—তার চেয়ে মনটাকে একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলিত চিন্তার ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া ঢের ভালো।

বসবা মাত্র ফোন এলো। ফের ওঠো। কি ভাগ্যি আজ কোনো অতিথি আসেন নি এখনও। ফোন করে কয়েকবার 'হ্যালো' বললেন। বৃথা যাওয়া। ওদিক থেকে স্পষ্ট শুনলেন নিরু বলছে—'দাদা? দাদা?' এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অনুপম বললেন—'নিরু?' নিরু শুনলো না। হয়তো বিরক্ত হয়ে ফোনটা শব্দ করে নামিয়ে রেখে দিলেন অনুপম রায়। রাখা মাত্রই আবার বাজতে লাগলো। এবার রিসিভারটা তুলে পাশে নামিয়ে রাখলেন। যাক—এবার সব ডাকা-ডাকি বন্ধ।

ডাক্তার রায়চৌধুরীর সঙ্গে আজই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা উচিত। ওঁর লম্বা ওয়েটিং-লিস্ট থাকে। যদি সেকেণ্ড ওপিনিয়ন একটা নিতেই হয়, তবে দেরি না করাই ভালো। অযথা শরীর নিয়ে এতো ভাবতেও ভালো লাগে না। দূর। অসুখ-বিসুখ তো মানুষের করেই থাকে। ভাগ্যগুণে অনুপমের স্বাস্থ্য এতদিন ছিলো নিটোল, এবার একটু আধটু টোল যে পড়বে, আশ্চর্য কি! মধ্যচল্লিশ তো হলো।

আচমকা বিস্মিত হলেন অনুপম রায়। মধ্যচল্লিশ? মানে—? পঁয়তাল্লিশ? এত? মারা যাবার সময়ে বাবার বয়স হয়েছিলো পঁয়তাল্লিশ বছর। কিন্তু বাবা, অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্য রায় তো তাঁর মতো এমন যুবক ছিলেন না? তিনি তো সিক্সটি কালই ছিলেন গতযৌবন, ধর্মসর্বস্ব এক বৃদ্ধ। যদিচ তাঁর যৌবন-পগড়ার পরিচয় কিশোর বয়সেই অনুপম অবগত হয়েছিলেন। তাই যেদিন বাঁধা বয়ানের টেলিগ্রামে দুদিনের বাসি হয়ে গিয়ে সংবাদটি লণ্ডনে পৌঁছুলো, প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেও অনুপম একটা বিচিত্র মুক্তির উল্লাস এবং ইহজগতে পাপীর উচিত শাস্তি বলে একটা ব্যাপার যে সত্যিই আছে, এটা ভেবে প্রগাঢ় তৃপ্তিবোধ করেছিলেন। ঠিক হয়েছে।

কিন্তু মা? ঠাকুমা? কোন্ পাপে তাঁদের পতিহারা পুত্রহারা হতে হলো? কোন্ কর্মফলে? হ্যাঁ। তাঁদেরও পাপ ছিলো বই কি। লণ্ডনের সেই বৃষ্টি-সাঁতসেঁতে, ঝিম্-ধরানো অন্ধকার দ্বিপ্রহরে খুব ঠাণ্ডা মাথায় অনুপম প্রত্যেককে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। শব্দগুলো পাপ-পুণ্য ইত্যাদি হলেও অনুপমের মধ্যে কাজ করেছিলো সনাতন ধর্মবিশ্বাস নয়, মৌলিক ধর্ম-অধর্মজ্ঞান। মানবতাবোধের মাপকাঠি দিয়েই তিনি তাঁর গুরুজনদের দোষগুণ বিচার করেছিলেন। হ্যাঁ। মায়ের অপরাধ ছিলো। অপরাধ ঠাকুমারও ছিলো। অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধ। তার জন্যও কোর্টে শাস্তি পেতে হয়। বেলাবাণী আর চারুহাসিনীর অমোঘ পাওনা ছিলো সেই শোক। মহাপাপের দণ্ড, মহাশোক।

কৃষ্ণচৈতন্যের বয়স যখন বাইশ, তখন অনুপম রায়ের জন্ম হয়। অনুপমের বয়স যখন তেইশ, কৃষ্ণচৈতন্যের তখন মৃত্যু হয়। কৃষ্ণচৈতন্যের বিষয়ে কেবল একটিই মাত্র বিস্ময় আছে অনুপমের মনে—একটিই মাত্র রহস্য। যে বাড়িতে প্রতিটি সন্তানের নাম গৃহদেবতার নাম দিয়ে শুরু—সেখানে কৃষ্ণচৈতন্য ঐতিহ্য ভেঙে তাঁর প্রথম সন্তানের নাম রাখলেন—অনুপম। অবশ্য, কৃষ্ণের স্পর্শ-বঞ্চিত করে নয়। অনুপমকৃষ্ণ। তারই সঙ্গে মিলিয়ে নিরুর নাম হয়েছিলো—নিরুপমকৃষ্ণ। কলেজে ঢুকেই অনুপম কৃষ্ণকে কেটে বাদ দিলেন। নথিপত্রে কেবল একটি বিদেশী অক্ষর 'কে' তার অন্তর্নিহিত কৃষ্ণনামের সংকেত বহন করে চলেছে—একটি গহন আদিম প্রাথমিক প্রশ্নের মতো, অনুপম কে. রায়।

কৃষ্ণচৈতন্য তো ঠাকুরঘরেই মত্ত থাকতেন—নিত্য-নামকীর্তন, নিত্য-গীতাপাঠ, তার ওপরে ঠাকুমার ব্রতের পরে ব্রত—আজ চাতুর্মাস্য, কাল ঝুলন, পরশু গুরুপূর্ণিমা—লেগেই আছে। জ্যাঠামশাই কৃষ্ণগোবিন্দ তখন প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে প্র্যাকটিস করছেন—তাঁর তুল্য ক্রিমিনাল ল'ইয়ার বেশি ছিলো না কলকাতাতে। রায়বাড়ির বৈষ্ণব রক্তে এতো দাপট কোত্থেকে এসেছিলো কে জানে। যার কল্যাণে জ্যাঠামশায়ের অফিস-ঘরে, রায়বাড়ির নিরামিষ ডিটেয় দুর্দান্ত খুনে-গুণ্ডাদের

পদধূলি অযুরন্ত ছিলো। সেই যুগেই জ্যাঠামশায়ের ফী ছিলো হাজার টাকা, আর তিনটি ছেলের নাম তিনি রেখেছিলেন গোবিন্দবিজয়, মাধববিজয়, কেশববিজয়। জ্যাঠামশায়ের রোজগার ছিলো দু'হাতে আর ওড়ানো ছিলো চার হাতে। তাঁকে ভুলেও কেউ আদর্শ বৈষ্ণব বলে ভাবে নি। একমাত্র ঠাকুমার কোনো ব্রত উদ্‌যাপনের দিনে ছাড়া ঠাকুর-দালানে তাঁকে দেখা যেতো না।

ঠিক তাঁর উলটো জ্যাঠাইমা। আচার-বিচারের শেষ নেই তাঁর। এখন বৈধব্যের ফলে শুচিবায়ু আরও বেড়েছে, আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে রোগ। এবং ক্রোধ। কী দুর্মুখ, কী দুঃসহ রসনার জ্বালা। আর তাঁর সমস্ত বিদ্বেষের লক্ষ্যস্থল মাত্র একটাই—জ্যাঠাইমার ভালোমানুষ স্বামীটির ওপর স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার চাপিয়ে দিয়ে সেই নিষ্কর্মা দিন-রাত্তির পুজোর নাম করে ঠাকুরবাড়িতে শুয়ে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছেন; তাও যদি সত্যিসত্যি ঠাকুরঘরেই মনটা তাঁর থাকতো। তার মন যে কোথায়, তা তো কাক-চিলটাও জানে। আর অনুপমের মা? তাঁরও দোষের শেষ নেই। একেই তো ভণ্ড, অলস দুশ্চরিত্র স্বামীর স্ত্রী, তা ছাড়া তিনি সেই স্বামীকেই প্রশ্রয় দেন এবং নিরলস পরিশ্রমী পরোপকারী অন্নদাতা ভাসুরঠাকুরের প্রতি তাঁর চিত্তে যথোচিত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত নেই! জোর করে সেই কৃতজ্ঞতা আদায় করে নেওয়ার জন্যই জ্যাঠাইমার প্রাত্যহিক উদ্দাম সংগ্রাম।

অথচ অনুপম পরে জেনেছেন যে গৃহে অনুপমের পিতৃমাতা অবাঞ্ছিত আশ্রিতের মতো অসম্মানে বাস করেছেন, সে গৃহের তাঁরা ছিলেন সমান অংশীদার—যে অন্নে অনুপম ও নিরুপম মানুষ, সেই অন্নে তাঁদের ছিল সহজাত অধিকার। দেবত্র সম্পত্তি ভোগ করেছেন দুই ভাই, সংসার চলেছে সেই উপার্জনে। জ্যাঠামশায়ের রোজগার কিছু উড়ে গেছে বহির্বিশ্বে, কিছু জমা পড়েছে ব্যাংকে, আর জ্যাঠাইমার হাতে-গলায়, বাকিটা তাঁর তিন ছেলে আর তিন মেয়ের শিক্ষা ও বিবাহ বাবদে। অথচ সব জেনেও মা-বাবা কোনোদিন জ্যাঠাইমার অপমান বা অত্যাচারের বিরোধিতা করেন নি। বাবা না হয় মেরুদণ্ডহীন মুখোশপরা ভণ্ড ছিলেন—কিন্তু মা? আজও মা কেন বিদ্রোহ করেন না? এ কেমন প্রশ্নহীন আনুগত্য? এ যে কুকুরের প্রভুভক্তিকেও লজ্জা পাইয়ে দেয়!

অনুপমের সন্দেহ নেই মায়ের এই শান্তিহীন সংসার-জীবনের জন্য দায়ী সেই ভণ্ড বৈষ্ণব কৃষ্ণচৈতন্য রায়। তাঁরই দোষে বেলারাণী চিরটা কাল ক্ষেমদাসুন্দরীর কাছে চোর হয়ে রইলেন।

মোটামুটি লোকচরিত্রে তাঁর জ্ঞান আছে অশেষ—এ নিয়ে মনে মনে যে একটু গর্বও নেই তা নয়। এই মূলধনের ওপরে নির্ভর করেই অনুপম রায়ের জীবনটা তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। খুব একটা ঠকতে হয়নি কখনও। যেটা ঠিক যেমন ভাবে ঘটাতে তিনি চেয়েছেন, অনুপম রায়ের জীবনে সেটা ঠিক সেই ভাবেই ঘটে এসেছে চিরদিন। মারিয়ার সরে দাঁড়ানো থেকে সুধার হায়দ্রাবাদ চলে যাওয়া পর্যন্ত।

কেবল এই সমীরের ব্যাপারটাতেই যা অন্যরকম হয়ে গেল। আর অন্যরকম ঘটতে চলেছিলো সুধার বেলায়, কিন্তু সময়মতো সামলে গিয়েছেন। ভাগ্যে বুদ্ধিটা ছিলো।

বুদ্ধিমান লোকের ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। অনুপম মনে করেন, কৃষ্ণচৈতন্য যদি কৃষ্ণগোবিন্দের মতো তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি হতেন, তবে তাঁরও ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকতো না। হ্যাঁ, জ্যাঠামশাইকে অনুপম শ্রদ্ধা করেন। তিনিও ছিলেন বুদ্ধিনির্ভর জীবনকুশলী। স্বভাবতই জয়ী ব্যক্তি ছিলেন তিনি, তাই বার্ধক্য কী জরাও তাঁর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করতে পারেনি। বয়সের কারণে আদালতে বুদ্ধির খেলা যখন ফুরিয়ে গেলো, তখনও জ্যাঠামশাই ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে পুজোর খেলায় মাতেন নি।

অথচ কৃষ্ণচৈতন্য? জ্ঞান হয়ে ইস্তক, যতোদূর পর্যন্ত স্মৃতির দূরবীণ দিয়ে দৃষ্টি পৌঁছয়—অনুপম দেখেন, চন্দনলেপ ঢাওড়া কপাল...

BanglaBook.org

সেই গলা-গলা বরফ মেশানো ঝুপঝুপে বৃষ্টিতে শনশন শত্রুতার বাতাস তখন চামড়ায় হাজার হাজার ছুঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছিলো, আর সেই ছুঁচগুলো যেন করাত হয়ে দেহের হাড়-মাংস কালা কালা করে ফেলছিলো। হাটের ভিড়েও যে বাতাস শ্মশানের মতো নিঃসঙ্গ করে দেয় মানুষকে, সেই বাতাসের মুখে ঝাপসা লণ্ডনের জানুয়ারির ধূসর ধোঁয়াটে অন্ধকার-দুপুরে, পিতার মৃত্যুর সংবাদ টেলিগ্রামে পেয়ে অনুপম রায় তাঁর বন্ধুদের খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, নোংরা বরফ-গলা কালা প্যাচপেচে রাস্তা মাড়িয়ে, দামী জুতোটা বাঁচাতে বুটের ওপরে গলোশ চড়িয়ে। পথগুলি তখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। ছ'টার আগে খুলবে না। বন্ধুদের নিয়ে বোতল ঘিরে বসেছিলেন জো এপ্পান্টার্সের আট-বাই-বারো ফুট ঘরে, তাঁরা চারজনে। সেলিব্রেশন? কিসের? জিজ্ঞেস করেছিলেন, জো, কেনেথ, জেফরি। অনুপম বলেছিলেন—একটা সুখবর এসেছে বাড়ি থেকে। আমার একটা শক্ত মামলায় জিতে গেছে। সেলিব্রেশন চলেছিলো গভীর রাত্রি অবধি। সন্ধ্যে ছ'টার পরে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সোহো স্কোয়ারের দিকে পাবক্রালিং-এ। একটার পরে একটা পাবে ঘুরেছিলেন, এগারোটায় পাবগুলো বন্ধ হয়ে যাবার পরে আলো ঝলমলে নাইট ক্লাবগুলোর শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে নগ্ন নারীদেহের ফোটোতেই গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে প্রাণ ভরে হাসি-ঠাট্টা করেছিলেন চার বন্ধুতে।

॥ ১৭ ॥

'রয়'কে নিয়ে সেই রাত্রে মারিয়া খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। দু'বছর কেটে গেছে, মারিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে। তখনই অনুপমের মনের মধ্যে উদ্বেগ হয়ে নিয়ত বিদ্ধ হচ্ছে মারিয়ার যত্ন। মারিয়ার 'রয়'। মারিয়া বলতো, 'অ্যানুপ্যাম, তোমার নামটা যেভাবেই ছোট করি না কেন মেয়েদের নাম হয়ে যায়, এ্যান, নয়তো প্যাম। তার চেয়ে 'রয়' ঢের ভালো। পুরুষমানুষের নাম।'

মদে-মাংসে পিতৃবিয়োগ উদ্‌যাপন করে এসে, রাত্রি যখন গভীরতর, নিঃসঙ্গতা যখন গাঢ়তর, মারিয়ার ভারী নরম উষ্ণ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিলেন সেদিন অনুপম না, কৃষ্ণচৈতন্যের জন্য নয়, ফুলকাকীকে মনে পড়ে গিয়েছিল। মারিয়ার বুকে কেমন একটা গন্ধ ছিলো সেদিন, মারিয়ার আঙুলে কিসের একটা স্পর্শ ছিলো সেদিন— সেই টেলিগ্রামটা পড়বার পর থেকেই মারিয়া যেন ফুলকাকী হয়ে গিয়েছিলো। সেই ফুলকাকীর বুকে, ছোট্টো অনু হয়ে ফুলকাকীরই জন্যে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে ইহুদীকন্যা মারিয়া এপ্সটাইনের শয্যায় নোংরা ঘুমে লুটিয়ে পড়েছিলো সদা স্বর্গত কৃষ্ণচৈতন্য রায়ের অশৌচাক্রান্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুপমকৃষ্ণ রায়।

পঁয়তাল্লিশ বছর—এই একটা কথা থেকে কতো কথা ভেসে এলো। না, টাইপরাইটারের সামনে নয়, এসব কথা এখানে নয়। মন ফেরাও, অনুপম।

'ফুলকাকী'। শব্দটি শ্রবণে উত্থাপিত হলেই স্নায়ুতন্ত্রীর মূলে সজোরে ঘা পড়ে, গভীর গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে ভরে যায় অভ্যন্তর।

পরন্তু, মারিয়া।

'মারিয়া' এই নাম অনুপমের অস্তিত্বের মধ্যে একটা যান্ত্রিক অস্বস্তি, একটা স্নায়বিক আলোড়ন আরম্ভ করে দেয়।

BanglaBook.org

কিন্তু, অনুপম। শান্ত হও।

টাইপরাইটারের যোমটা সরিয়ে ফেলেছেন অনেকক্ষণ—সাদা কাগজের কুমারী শূন্যতার দিকে চেয়ে অনুপম মনের রাশ টেনে ধরলেন। আরেকবার হিসেব করলেন আর দু-তিনদিনের মধ্যে ডাকে না দিলে লেখাটা স্টেন্‌সিল করিয়ে বিলি করার সময় হবে না কনফারেন্স আরম্ভের আগে।

দিল্লিতে যে মীটিং আছে ও মাসের প্রথম সপ্তাহে—গলার অবস্থা এই রকম থাকলে সেখানেও যাওয়াটা বৃথা হবে। অথচ ওই মীটিংয়ের জন্যই তিনি জেনিভায় যাচ্ছেন না। সাগরপারের হাওয়া খাওয়ার মোহ অনেককালই কেটে গেছে অনুপম রায়ের। বরং বেশ বিরক্তই লাগে নিত্য নিত্য এই 'নি' ফর্ম-পাসপোর্ট ভিসা কাস্টমসের কালক্ষয়ী জটিল সূত্রে পা দিতে। অথচ পা তাঁকে দিতেই হয়। কাজের ফাঁদে ধরা একবার পড়লে আর তো মুক্তি নেই। অনুপমের মনে পড়লো, মার্কিন দেশে এর নাম র‍্যাটরেস, ধড়ি ইঁদুরের দৌড়। তাঁর একটুও ভাবতে ভালো লাগলো না যে, তিনি এই বিশ্বজোড়া ইঁদুরদৌড়ের একটি ছুটন্ত ধেড়ে ইঁদুর। ফাঁদে পা দিয়েছেন, এখন তো না দৌড়ে তাঁর ছুটি নেই 'পাবলিশ্ অর পেরিশ'—এই স্লোগান মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কড়া চাবুক হাঁকড়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় লাইব্রেরিতে-লেবরেটরিতে-আর্কাইভ্‌সে-বনে-বাদাড়ে ফীল্ড-ওয়র্ক করায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নিস্তরঙ্গ, বুজে আসা বিদ্যাধরী অধ্যাপকদের রেখেছে কর্মহীন অবশ্য অবসরে, অনুচ্চ আকাঙ্ক্ষার নিরুদ্বেগ বিশ্রামে। মুখে পানজর্দা ও রাজাউজির, নাকে নস্যি এবং উন্নাসিকতা, আর দৃষ্টিতে পরশ্রীকাতরতা—এই নিয়ে তাঁদের নির্ভার দিনযাপন। এরই মধ্যে কখনো-সখনো পুরস্কারের লোভ বা অর্থলোভ কারুর কারুর ঘাড় ধরে বইটই লিখিয়ে নেয়।

কিন্তু অনুপম জানেন, অনুপমের সমস্যাটা আলাদা। তাঁর সহজে মুক্তি নেই। তাঁর তাগিদ উঠে আসে তাঁর নিজেরই ভেতর থেকে না লিখে শান্তি নেই তাঁর। অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে নয়, এই প্রতিযোগিতা তাঁর নিজেরই অতীতের সঙ্গে তাঁর নিজের ভবিষ্যতের। চির-মধ্যদিনের ঊর্ণজালে বেঁধে রাখতে হবে খ্যাতির সূর্যকে। অস্তে নামতে দেওয়া অসম্ভব। স্বধর্মে স্থিত থাকতে চাইলে ধর্মযুদ্ধে অংশ নিতেই হবে।

নাঃ, এভাবে পারা যায় না। আজ হবে না, এক লাইন লিখতে পারেননি এখনও পর্যন্ত। টাইপরাইটার থেকে উঠে ফের আরামকেদারায় গিয়ে বসলেন অনুপম রায়। আজ কাজ এগোবে না। বিস্মৃত হুইস্কির গ্লাস টেবিলেই পড়ে রইলো, আধে-ভরা। গলায় হাত দিয়ে অনুপম স্বরযন্ত্রের অবস্থিতি অনুভব করতে চেষ্টা করছেন। স্বরনালীর নড়াচড়। না। ওসব কথা নয়। ওদের কথা নয়। অন্য কথা ভাবো। নিজের কথা। য়ু কাণ্ট অ্যাফোর্ড টু লুজ য়োর ভয়েস। প্রকৃতির মৌল ঐশ্বর্যগুলির মধ্যে বাক্‌যন্ত্রটিই বোধ হয় সবচেয়ে জরুরি 'বাচমেব প্রথমা'। সপ্তর্ষির পাশে—'বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদনা'—শব্দ ব্রহ্ম উচ্চারণকারিণী বাক্‌ই অষ্টমী ঋষি। সেই বাক্‌শক্তি রহিত হতে চলেছে। তুমি, অনুপম। একবার কি ভেবে দেখেছো, ব্যাপারটা ঠিক কী জাতের সমস্যা?

—'দাদাবাবু?'

—'ফিরে এলি?' নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই আরো একবার ধক্কা খেলেন অনুপম।

—'দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়। এ সপ্তাহে হয়তো বেরুবে না। দিল্লি বোম্বাইতে এখন আর পাঠানোর সময় নেই, না কী সব যেন বলাবলি করছিলেন। আমি অবশ্য ঠিক বুঝতে পারলাম না সবটা—কফি করে দিই?'

অনুপম ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালেন। গ্লাসের হুইস্কির কথা মনে পড়ে না।

—'দাদাবাবু, একবার ছোড়দাকে টেলিফোন করলে হতো না? আপনার শরীরটা কিন্তু একদম ভালো নেই।'

—'ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়।'

BanglaBook.org

—'ওরে বাবা, আপনি তো ফোন করতে পারবেনই না: আপনি মানা করবেন না দাদাবাবু, একটু কিন্তু ছোড়দাকে ডাকছি আমি। আজকেই ছোড়দা বরং ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন।'

—'আহ্।' ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দেন তিনি। নীরবে। আসুক নিরু। চিকিৎসক আসুক। কেষ্ট, তোর ভালো হোক।

—'গ্লাসে একটু ঘোলতাত থাবেন তো? মা গলা ভাতের ব্যবস্থা করে গেছেন। গিলতে কষ্ট হবে না। একটু নুন জল এনেছি। পারবেন, উঠে গার্গেল করতে? জ্বরটর হয়নি তো?'

হ্যাঁ, পারবেন। ঘাড় নেড়ে জানালেন অনুপম। জ্বর হয়নি।

—'উঠুন তবে। জুড়িয়ে যাবে জলটা।' অনুপম সোজা হয়ে বসেন। নুন জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে কেষ্ট বলে: 'দাদাবাবু? এই বলছিলাম কি, মানে ওই সমীরদা তো আর এলেন না। শোনো খবর...'

মুহূর্তেই মুখের ভেতরে উষ্ণ শুশ্রূষার স্বাদ তিক্ত-শীতল হয়ে যায়।

জলটা প্রথমে থু করে বেসিনে ফেলে দিলেন। তারপর পরিশীলিত মৃদু হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত হলো অভিজাত ঘাড় আশ্বাসের ভঙ্গিতে দোলালেন। নুন-জলের গ্লাসশুদ্ধ দক্ষিণ হস্তটি অভয়মুদ্রার নকলে একটু ঊর্ধ্বে উঠে স্থগিত রইলো। বাঁ হাতে বেসিনের কিনারা খামচে ধরে ঘড়ঘড়ে গলায় প্রাণপণ চেষ্টায় একটিই শব্দ উচ্চারণ করলেন 'ভালো...'

তারপরেই ঠা-শ্ এই শব্দ করে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল—কেষ্টর মুখের ওপরে।

॥ ১৮ ॥

সকাল আটটার মধ্যেই নিরুপম তার ঝড়ঝড়ে মরিস এইটে চড়ে এসে পড়লো। মাকে শুদ্ধ নিয়ে। কেষ্ট কাগজ পেন্সিল যুগিয়ে দিয়েছে হাতে হাতে। ডাক্তার রায়চৌধুরীর সঙ্গে ইমার্জেন্সি এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হলো আজই।

ডাক্তার রায়চৌধুরী তাই-ই বললেন, ঠিক যা যা ডাঃ ব্যানার্জী বলেছিলেন। কেবল তিনি আরো বললেন, ভিয়েনা গিয়ে অপারেশনটা করানো অত্যাবশ্যক। গেলেও হয়, না গেলেও হয়, এমন নয়।

নিরু ডাক্তারকে বললো—'নিশ্চয়ই যাবে।' একমুখ হেসে দাদাকে বললো—'কিছু ভেবো না দাদা, ভিয়েনা গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সারা রাত্রি বিশ্রামের পর আজ অনুপমের আবার স্বর ফুটেছে। আজ মনে পড়েছে ডাঃ ব্যানার্জীর নিষেধ ভুলে গিয়ে কালকে কুড়িটা সিগারেট...পুরোপুরি কণ্ঠরোধের কারণটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ধূমপান আর নয়। না। কদাচ নয়। পৃথিবীর যমেনরা যাই বলুক। যাই বলুক। 'সম্মোহঃ স্মৃতিবিভ্রমঃ স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশঃ'—কাল এক অতি সম্মোহিত দুঃসময় অতিবাহিত হয়েছে তোমার, অনুপম। সবগুলি অশ্বের রজ্জু নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নাও। রথ যেন পথভ্রষ্ট আর না হয়।

মাকে নিরুর সঙ্গে আজ দর্জিপাড়ায় চলে যেতেই হলো, নিরুর ছেলের পরীক্ষা চলছে। আজকাল পরীক্ষা দেওয়াটা, শেষ দিন পর্যন্ত পরীক্ষায় বসতে পারাই একটা আলাদা পরীক্ষা। প্যাকেটভর্তি ওষুধপত্র, ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল, ক্যাপসুলের শিশি—সব সমেত নিরু দাদাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল—পথে মোড়ের ডিস্‌পেনসরি থেকে কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে নিয়মিত ইঞ্জেকশন দিয়ে আসার কথাটাও বলে নিল। নিরুও অনুপমের মতোই গোছালো, তবে ওদের জগৎসংসারটা আলাদা। যাবার আগে মা বারবার কেষ্টকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন—'একটা ভাল শেলেট পেনসিল সঙ্গে সঙ্গে রাখো বাবা, অনু যেন কারুর সঙ্গে একটাও কথা না বলে। ফোনে বরদার ডেকে

BanglaBook.org

দিও না ওকে। আমি এসে থাকবো শুক্রবার থেকে, খোকার এগ্‌জামিনটা শেষ হোক। ততদিন, দেখিস বাছা কেষ্ট, আমার অনু যেন একটাও কথা বলে না।'

অনুপম এমনিতেই স্বল্পভাষী। কথা না-বলাটা তাঁর কোনো সমস্যা হওয়া উচিত নয়। বাড়িতে ফিরেই টেবিলে চিঠির গোছা।

বুক ফেয়ারের উদ্বোধন। ছাত্রীর বিবাহ। মার্কিন লোকসংগীতের আসর। ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রবীণ ইংরেজ লেখকের বক্তৃতা। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামনের বছরে একটি বক্তৃতামালা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ। ওসমানিয়া? হায়দ্রাবাদ! না, ওখানে নয়। সুধার দিকে নয়। শ্রীনগরে পুজোর ছুটিতে জার্নালিজমের ছাত্রছাত্রীদের যে পক্ষকালব্যাপী সর্বভারতীয় ট্রেনিং ক্যাম্প হচ্ছে তাতে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ।

বক্তৃতা? কেবলই বক্তৃতার ডাক!

বক্তৃতা দেবেন যে, গলা? বাঁ হাত আপনি উঠে এলো গলায়, আলতো মুঠোর আদরে আত্মসমর্পণ করলো গলা। বক্তৃতার নিমন্ত্রণগুলোর কি হবে এবার?

সবুজ খামটা খুললেন না। মেনকার চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ঝুড়িতে। বাদামী রঙের রঙীন খাম এখন আর আসবে না। হয়তো ছ'মাস বাদে। আবার যখন তার খেয়াল হবে, খুশি হবে—ছ'পাতা পুরোনো দিনপঞ্জির টুকরো পাঠিয়ে দেবে। কিংবা হয়তো—ভাবতে গিয়ে কি অনুপম রায়ের চোখের পল্লব সামান্য কেঁপে গেল, কে জানে, হয়তো আর ইচ্ছেই করবে না সে মেয়ের। যা খেয়ালী।

আপাতত ভাবনা চিঠি-চাপাটি নিয়ে নয়। এখন ভাবনা: শব্দ। শব্দ পুনরুদ্ধার। যদি আর কণ্ঠস্বর নিঃসৃত না হয়? যদি?

এই যে এতশত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, এত আদর, এত আপ্যায়ন, জগতজুড়ে লোক-লৌকিকতা, জীবনজুড়ে প্রেম-প্রণয়ের বন্যা—এর কতটুকু টিকবে যদি তার স্বর লুপ্ত হয়ে যায়?

নিয়মিত রেডিওতে তাঁর স্বরটি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে আছে দেশবাসীর কান—সপ্তাহের সবচেয়ে জরুরী বিশ্বরাজনীতির ঘটনা নিয়ে পরিশীলিত টিপ্পনী ন্যাশনাল প্রোগ্রাম হিসেবে 'রয়জ কর্নার' প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এটা নতুন বছর দুয়েক চালু হয়েছে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।

এই সব বাঙ্গালোর-মাইসোর-চণ্ডীগড়-চিতোরগড়ের খেল্ খতম হবে।

প্রাহায় যবো, না, জকার্তায়—এই জাতীয় যতো 'কঠিন' সমস্যা, সব জন্মের মতো মিটে যাবে। মন্দ কি?

বাকি চিঠিগুলো একধারে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অনুপম হঠাৎই উঠে পড়লেন। বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকানি দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। ভালো করে দেখতে চাইলেন আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট নিজের মুখ। দেখা কি যায়? এই দিনের বেলাতেও এ ঘরে জমে আছে সন্ধ্যার নির্জন আঁধার। নির্জনতাটা কাম্য, কিন্তু অন্ধকার কাম্য নয় কোনো অবস্থাতেই।

আলোটা জ্বাললেন। তবুও আরশি যেন নাগালের। শুকনো তোয়ালের কোণ দিয়ে যত্ন করে ঘষে ঘষে মুছলেন। চুম্বনের ভঙ্গিতে ঠোঁট ফাঁক করে স্বীয় প্রতিবিম্বের দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন, মুখনিঃসৃত বাষ্প ছড়িয়ে দিলেন আরশির কাচে, স্বসৃষ্ট কুয়াশায় মুহূর্তে ঢেকে গেলো অনুপম রায়ের মুখের ছায়া। আবার মুছলেন। অতি যত্নে। তোয়ালের অন্য কোণ দিয়ে। যেন মসলিনের রুমালে মুছিয়ে নিচ্ছেন কোনো বাদশাজাদীর প্রণয়ক্লান্তি। একবারে বেশ স্পষ্ট ফুটেছে। অন্তত, এর চেয়ে বেশি আর হবে না।

বেসিনে দুই হাতের ভর দিয়ে জিমন্যাস্টিকের ধাঁচে আরশির যথাসম্ভব নিকটবর্তী হলেন। কাচের গায়ে ফুটলো একটি মধ্যবয়স্ক, পরিশ্রান্ত, উদ্বিগ্ন মুখ। কপালে দুশ্চিন্তার ত্রিবলিচিহ্ন।

BanglaBook.org

মোটা শেল্ ফ্রেমের বাঁধানো দুটি পুরু কাচের চোখ, যেন অক্টোপাসের চক্ষুর মতো অতিকায়, অত্যুজ্জ্বল। সাপের মতো তীব্র। ভুরু দুটো অসমান। অনুপমের তো সুপুরুষ বলে খ্যাতি আছে। সুপুরুষ? কিসের সুবাদে? চশমাটা খুলে হাতে নিলেন। চোখ দুটো সুদূরে উধাও হলো, আরশিতে প্রতিবিম্বও ফেরারী।

পকেট থেকে রুমাল বের করে এবার চশমার কাচ দুটি ঘষলেন। মুছে আবার চোখে দিলেন। আবার সেই গিলে খেতে আসা দৃষ্টির সামনাসামনি।

সুপুরুষ? কিসের সুবাদে? রং? শ্যামলা। কষ্টির দিকেই বরং বলা যায়। গড়ন? মাঝারি। লম্বাটে গড়ন বটে, কিন্তু তিনি কিছু শালপ্রাংশু নন। বরং এই সুপুরি গাছটাছের মতো। আসলে লম্বাসাটাই সব। যেমন তাঁর স্বভাবে, তেমনি তাঁর শরীরেও একটা সুভগ সামঞ্জস্য আছে। অর্থাৎ শরীরের ঊর্ধ্বভাগের তুলনায় তাঁর নিম্নভাগটি অনেকটা বেশি লম্বা, তাই প্রকৃত দৈর্ঘ্যের তুলনায় তাঁকে দীর্ঘতর দেখায়। স্বভাবের ব্যাপারটাও কি অনেকটা সেই রকমই? দৈর্ঘ্যের চেয়ে দীর্ঘতর দেখায় কি অনুপম রায়কে? ভাবতে ভাবতেই শার্টটা খুলে ফেললেন। বাথরুমের চৌকো আয়নায় কেবল বুকের আধখানা পর্যন্ত ধরা পড়ে, সবটা নয়। হাতকাটা গেঞ্জির নিচে লোমশ বুকের ইঙ্গিত, ফুটে আছে অহংকারী কাঁধ, সমর্থ বাহু। সরকারী হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের ছাপমারা, অ্যাপ্রুভড, স্বাস্থ্যকর মাংস। না, লোভনীয়তার কিছুমাত্র অভাব নেই। মননের কোনোই ছাপ নেই গলার নিম্নবর্তী এই পুষ্টো গেঞ্জিতে প্রস্ফুটিত জৈবতায়। ক্লান্তি অথবা উদ্বেগ নেই। শুধু দ্বন্দ্বহীন সামর্থ্য।

এবার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মুখটাকে নিরীক্ষণে মন দিলেন। লম্বাটে মুখ। চিবুক ছুঁচলো। নাকটি মোটা, ত্রিকোণ, চওড়া, মাংসল। যেন একটি সিঙাড়া বসানো আছে মুখের মাঝখানে। নাকের দু পাশ থেকে ভাঁজ নেমে এসেছে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত। বেঁকে নাচিয়ে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসির ভঙ্গি করলেন, ভাঁজ গভীর হলো। দাঁতে দাঁত টিপে—মাজনের বিজ্ঞাপনের ঢঙে—দাঁতগুলি খুঁটিয়ে দেখলেন, ঠোঁটের পর্দা যথাসাধ্য সরিয়ে দিয়ে। ঝলদেটে, অসমান। বাঁ দিকের স্বদন্তটি চেদ্দ বছর বয়সে সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়েছিলো। সেই থেকে ওঁর সহজ হাসি বন্ধ। হাঁ করে দেখলেন। দাঁতের পিছনে বাদামী নিকোটিনের ছোপ। জিভটা উলটে দেখলেন। বাক্‌স্বরূপ। বাগযন্ত্র। জিভের তলার রং নীল। শিরা ওঠাওঠা। গরুর জিভ এরকম নীল হয়। রায়বাড়ির পিছনের উঠোনে গোয়াল ছিলো—সেখানে অনেকটা সময় কাটাতো নিরু, গরুদের ঘাস-পাতা খাইয়ে। অনু বলে একটা ছেলেও সেখানে পেয়ারাগাছে চড়ে চেয়ে থাকতো।

গাল দুটি বসা, কড়া দাড়ির সবুজে ছায়ার মধ্যে বেশ কিছু সাদার ফোঁট ছিটিয়ে আছে। আশ্চর্য! আজ সকালে ডাক্তার দেখানোর তাড়ায় কি তবে দাড়িটাই কামানো হয় নি? অনুপম। তোমার দৈনন্দিন কাজগুলিতে ভুল শুরু হলো? তুচ্ছ একটা কারণে? চোখ সরু করে চামড়া লক্ষ্য করলেন। চশমার নিচে চোখের কোলে কালি। ব্রণর দাগে, ছোপ-ছোপ মেছেতায় মুখের চামড়ায় ক্লান্তি মাখানো। মাথার দিকে চাইলেন—যদিও ভুরুর ওপরে একগুচ্ছ চুল ঝুঁকে আছে, যদিও আয়নায় দেখা যাচ্ছে না, তবু, উনি জানেন, এবার পাৎলা হয়ে আসছে। ব্রাশে বোজ চুল ওঠে। বেশ কিছু তার রুপোলি।

না, বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। ওই অতিকায়, গিলে-খেতে-আসা তীক্ষ্ণ চোখ ছাড়। ওই চোখ তো কাছে টানে না, কেবলই দূরে ঠেলে দেয়।

কী ভেবে চিবুকের তলার চামড়াটা তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের মধ্যে টেনে ধরবার চেষ্টা করলেন। না, ধরা দিলো না, পিছলে গেল। অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। যাক। 'সূর্য অস্ত যায়নি এখনো।'

এবার কিন্তু বিরোধীপক্ষে অস্ত্র ধরেছেন স্বয়ং প্রকৃতি। অনুপমের জীবনে শান্তি বা শৃঙ্খলা উৎপীড়িত হয় নি কখনো। এতদিন দেখা গেছে—যে কোনো বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকেই বুদ্ধির অস্ত্রে

BanglaBook.org

জয় করা যায়। তবে, এও কি সম্ভব নয়? প্রকৃতিকে পরাজিত করাই তো অনুপমের আকৈশোর কর্মসূচি!

এর আগে আগে ছিলো সম্ভোগের প্রশ্ন; কিন্তু এবারে প্রশ্নটা অন্য। বড়ো বেশি প্রাথমিক, বড়ো স্থূল—সোজাসুজি।

একটা ইন্দ্রিয় থাকা-না-থাকার প্রশ্ন এটা।

অনুপম, অগ্রাহ্য করো, তুচ্ছ শরীরকে এতটা সময়, এতটা প্রশ্রয় দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। অথচ উপায়ই বা কি? নিজেকে হঠাৎ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের বিপুল মুষ্টিতে ধৃত ক্ষুদে গালিভারের মতো অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। এতকাল এই ষড়রিপুশাসিত জীবনকে পায়ের তলায় রেখে অনুপম রায়ই ছিলেন প্রভুর ভূমিকায়। অকস্মাৎ জৈব-প্রকৃতি বিপুল আকার নিয়ে চারিধার ঢেকে দাঁড়াতে চাইছে। প্রথমেই সে দাবি করেছে তীরন্দাজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, বাগ্মী অনুপম রায়ের কণ্ঠসম্পদ। অনুপমের মনে হলো: এখানে বুদ্ধির বর্ম কোনো বর্ম নয়। বুদ্ধির অস্ত্র কোনো অস্ত্র নয়। কেন নয়? চেষ্টা করো! ধরো যদি তোমার বাক্‌রোধ ঘটে গেলো, অনুপম, জীবন তো সেখানেই শেষ নয়?

কিন্তু, মানুষের সভ্যতার স্তর বিচার হয় তার ভদ্র ব্যবহারের উৎকর্ষে। মার্জিত অন্তরের দেখা পাওয়া যায় শব্দনৈপুণ্যের খোলা বারান্দায়।

তুমি তো মন্দিরগাত্রের অক্ষয় ভাস্কর্য নও অনুপম, নও চক্ষুলোভিনী রমা, তুমি তো মাংসপিণ্ডের সুসমঞ্জস সমষ্টিস্বরূপ কোনো মস্তিষ্কহীন চিত্রার্পিত নক্ষত্র নও।

ওই পরিশ্রান্ত, ধূর্ত, নির্বিশেষ প্রৌঢ়ের কী এমন জাদু আছে? ওই বয়স্ক, বিচক্ষণ মুখ যদি ভাষাহীন হয়ে যায়।...

দরিদ্র, অসুন্দর ডক্টর জনসনের কথকতায় মুগ্ধ-বিমোহিত ছিলেন তাঁর সমকালীন ইংলণ্ডের তা-বড় তা-বড় অভিজাত সুন্দরীর গুচ্ছ! অনুপম, কোথায় থাকবে তোমার রমা-নলিনী-মেনকা-কমলকলি সকল? এইভাবেই কি চলবেন তখনও সাব রেযিস্ট্রার, কৃষ্ণমূর্তি, মোহনরাওবৃন্দ তোমার কুলুঙ্গিতে, দেদীপ্যমান? অনুপম, কোথায় পাবে ওই প্রিয়মান ছাত্রের দল, যারা প্রতি বছর পাশ করে বেরিয়ে তোমার ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে সমাজে? আর সেই অদেখা অনুরাগীরা, শুধু আকাশবাণী মারফৎ তোমার স্বরের গুণেই যারা তোমার বশংবদ? কী দেখেছো তুমি ওই নির্বাক মুখের মধ্যে? কোন্ ইন্দ্রজাল? কী আছে উহার মাঝে, ওর মাঝে?

অনুপম আলোটা নিবিয়ে দিলেন। অর্গলবদ্ধ ঘরের দ্বিপ্রহর কোথায় লুকিয়ে পড়লো। স্থির হয়ে রইলো কেবল অন্ধকার। চুলের মধ্যে দীর্ঘ আঙুল, স্থাণু অনুপম ভাবলেন: নির্বাক জগৎ এই আলোনেবানো ঘরের মতো হবে কি? বাক্ একটি অগ্নিময় দীপস্বরূপ, মনের ঐশ্বর্যসমূহ লোকসমক্ষে সে-ই প্রস্ফুটিত করে। যেমন এই আলো। আলো ছিলো, আয়নায় তাই চলছিলো সঘন, চঞ্চল ম্যাজিক। আলো নেই, আয়নায় ম্যাজিকও ঘুচে গেছে। মুছে গেছে নীল টালি, শাদা বেসিন। অনুপম রায়ের প্রতিচ্ছবি।

বাক্ লোপ যদি হয়, অনুপম রায়ের জীবন ও ব্যক্তিত্বের কতো ভাগ সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাবে? লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাবে?

এই সময়ে, তাঁর চোখের সামনে, গলা পর্যন্ত বালিতে প্রোথিত, জিভ কাটা একটি মানুষের জীবিত মুণ্ড, অসীম রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরের মহাশূন্যতায় দৃশ্যমান হোলো। শুধু দুটি অসহায় অক্ষিগোলক মৃত্তিকাবন্দী মুণ্ডের মধ্যে ছট্ ফট্ করছে। প্রাণের শেষ চিহ্নস্বরূপ।

অন্ধকার বদ্ধ বাথরুম থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এসে, প্রকাশ্য দিবালোকে অনুপমের চোখ যেন ঝলসে পুড়ে গেল। অনুপম ভাবলেন:

BanglaBook.org

বাক্—এক অত্যাশ্চর্য সুখ, সম্ভোগ—

বাক্—একটি ইন্দ্রজালবিশেষ—

বাক্—একটি বিশিষ্ট ঐশ্বর্যস্বরূপ—

অথচ—শুধুমাত্র অনায়াসলব্ধ, অনর্জিত বলেই কি এদিকে আমার নজর পড়েনি এতদিন? নাকি—হারাবার ভয় ছিলো না বলেই একে ঐশ্বর্য বলে চিনতে পারিনি এতদিন?

এবং—'বুদ্ধি' ছাড়াও কিছু সহজাত সম্পদ তাহলে আমাদের আছে, প্রকৃতি যার অধিকার ফিরিয়ে নিতে এলে তবেই আমাদের টনক নড়ে?

অনুপম রায় একবার ভাবলেন—এই সম্পদের জন্য কি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার কথা ছিলো? কোথাও কি কিছু ভুল হয়ে গিয়েছে? তারপরেই মনে হোলো? ভুল? কিসের ভুল? কিসের কৃতজ্ঞতা? কৃতজ্ঞতা শব্দটাই বরং এখানে ভুল। কথাটা আসলে হোলো: শিক্ষা অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ নেওয়া। একটা নতুন শিক্ষা হোলো মাত্র—এই জীবন বৈচিত্র্যময়।

মাথা ঠাণ্ডা করে অনুপম রায় অয়েল পলিসি সাব-কমিটির কাগজপত্র নিয়ে গুছিয়ে বসলেন। আর সম্মোহ নয়—আর বুদ্ধিনাশ হবে না। এবার কাজ হবে।

॥ ১৯ ॥

নিরু বলেছিলো: 'ভিয়েনা নিয়ে তুমি কিছু ভেবোনা দাদা। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একবার বড়মাকে বললেই—'

—'খবরদার নিরু, জ্যাঠাইমাকে বলবে না', বিকৃত কণ্ঠে চাপা গর্জন করে উঠেছিলেন অনুপম। নিজেই চমকে গিয়েছিলেন নিজের আচরণে। অবাক হলেও ঘাবড়ায় নি নিরু।

—'আমি ধার চাইবার কথা ভাবছিলুম দাদা, বড়মা তো কতো লোককেই টাকা ধার দেন, সুদে। থাকগে বাপু, বলবো না ছাই। আমার আরো ঢের রোজগার আছে।'

ডাঃ রায়চৌধুরী বলছেন, সামনের মাসেই অপারেশনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এই অবস্থায় এমন কনস্ট্যান্ট ইরিটেশন নিয়ে বেশি দিন থাকাটাও নাকি ভাল নয়। অন্য ধরনের সমস্যার উদয় হতে পারে। কিন্তু এখুনি অতটা টাকা কোত্থেকে পাওয়া যাবে? ডাঃ ব্যানার্জী এবং ডাঃ রায়চৌধুরী যোগাযোগ শুরু করতে চান ভিয়েনার ডাক্তারদের সঙ্গে, ডিটেলস খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্য।

অনুপম রায় দরিদ্র নন। নিয়মিত বেতনাদি ছাড়া, বই থেকেও তাঁর আয় মন্দ হয় না। কিন্তু সম্প্রতি একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন ক্যামাক স্ট্রীটে—সেখানেই আটকা পড়েছে যাবতীয় ক্যাশ—ফ্ল্যাট প্রায় তৈরি শেষ হয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে তাই হাতে জমা টাকা নেই।

সেই দর্জিপাড়ার রয়েবাড়ি থেকে ক্যামাক স্ট্রীটের এই 'ক্যামিলিয়া এ্যাপার্টমেণ্টস'! অনুপম কে (কে ফর কৃষ্ণ) রয় যেন পেরিয়ে এলেন অন্তবিহীন পথ।

দর্জিপাড়ার মধ্যবিত্ত মূল্যবোধগুলি পরাজিত হয়ে সরে গিয়ে সসম্ভ্রমে ঠাঁই ছেড়ে দিয়েছে উচ্চবিত্ত মানসিকতাকে। এখন রেস্তরাঁয় ঢুকলে আর মেনুর ডানদিকে তাকিয়ে খাদ্য অর্ডার দিতে হয় না। অনেক সময়ে হয়তো খাদ্য অর্ডার দেবার আগে ডানদিকে চাইতে ভুলও হয়ে যায়। এখন ট্যাক্সি মানেই রুদ্ধশ্বাস তাড়া নয়। এখন ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে বন্ধুপত্নীকে চা করতে বলা যায়। কিন্তু একটা অঙ্ক মিলছে না। যতোই উচ্চগ্রামে উঠছে জীবনযাত্রার মান, ততোই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে তাঁর মার্ক্সিস্ট আদর্শবাদের মানদণ্ড। এটা খুব লজিকাল নয়। অনুপম কিন্তু প্রকৃতই মনেপ্রাণে সাম্যে বিশ্বাসী। কেবল লোক দেখানো বিতণ্ডায় নয়, কেবল কালিকলমের বাগবিস্তারে নয়।

...আলোচনার পরদিনই সন্ধ্যেবেলা হাস্যবদনে কপাটবক্ষ শালপ্রাংশু দিগ্বিজয়ীর উপযুক্ত

BanglaBook.org

পদক্ষেপে নিরুপমের প্রবেশ ঘটলো অনুপমের ফ্ল্যাটে। ঢুকেই হাঁক দিলো : 'কেষ্ট! আনো দিকি বেশ ভালো করে এক কাপ কফি তৈরি করে। নাকি দাদা অন্য কিছু দিয়ে সেলিব্রেট করবে? মা তো আজ নেই এ বাড়িতে।...যাক।... হয়ে গেল সব ব্যবস্থা। এবারে কেবল প্যাকেজ বুক করা বাকি। আর রিজার্ভ ব্যাংকের পারমিশনটা।'

—'হয়ে গেল সব? কী করে করলি? কে দিল? কোথায় ধার নিলি? ব্যাংকে?'

—'তুমি অতো কথা বলো না। স্রেটটা গেল কোথায়? কেষ্ট? দেবে আবার কে? ছিলই তো আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডটা তোলার জন্য অ্যাপ্লাই করে দিলাম, আর বীথির ইউনিট ট্রাস্ট দুটো বেচবারও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অল কমপ্লিট! কেবল ফাইনালাইজ করা বাকি। নো বড়মা নট কিচ্ছু। অল স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, অফিশিয়ালি ডান! কেষ্ট কফি থাক। সোডাই লাগাও। বরফ আনো। কই, দাদা বের করো? হয়ে যাক।'

—'নিরু'—এবার অনুপমের আর্তনাদটা উঠে এলো গলা থেকে নয়, পাঁজরের জালি-ঢাকনার তলায় লুকনো গভীর রক্তাক্ত ইদারার ভেতর থেকে।

—'কী করেছিস তুই? নিরু?'

নিরুপমের হাতটা দুই হাতে চেপে ধরেছেন বুঝতে পারা মাত্রই হাতটা ছেড়ে দিলেন অনুপম রুক্ষস্বরে বললেন—'তুই কি ক্ষেপেছিস?'

—'আ' দাদা' একটাও কথা নয়। স্রেটে লেখো তো'। নট আ ওয়র্ড। মনে নেই?

—'তুই কি ক্ষেপেছিস নিরু? বীথির টাকা!'

—'তুমিই তো ক্ষেপেছো দেখছি। আপদ-বিপদের জন্যেই তো মানুষ টাকা তুলে রাখে—বীথির টাকা কি তোমার নয়?'

—'ধর, তোদের যদি হঠাৎ কোন...'

হা হা হাসিতে ছোটো ফ্ল্যাট বিদীর্ণ করে দিয়ে রায়বাহাদুর নিরু বলে ওঠে —'খনা কি সাধে বলেছে যে প্রফেসরদের বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে না। আরে আমার কিছু হলে তো তুমিই রয়েছো দাদা!'

—'শোন নিরু, টাকা আছে।'

অনুপম শুনতে পেলেন যার যেন একটা অচেনা কাতর কণ্ঠ—'ওসব টাকায় খবর্দার হাত দিবি না নিরু! টাকা আছে।'

এবার নিরুর অবাক হবার পালা। 'আছে? টাকা আছে তোমার? কোথায় আছে টাকা?'

সেই বিকৃত স্বর জানায়—'আছে মানে, ইচ্ছে করলেই হতে পারে। পাঁচ বছর ধরে ওদের অফার আমি রিকিউজ করছি। এবার নিয়ে নিলেই হোলো।'

—'নিলেই হোলো, তো নাওনি কেন এ্যাদ্দিন? কাদের অফার? কিসের অফার?'

—'নিইনি, সে কারণগুলো সব আজেবাজে। অফারটা—ডেইলি স্টারের এডিটরশিপ।'

তারপর যেন নিরুকেই সান্ত্বনা দিতে অনুপম রায় বললেন—'পড়ানো আমাকে ছাড়তেই হবে এবার,' বলতে বলতে গলায় হাতটা সন্তর্পণে ছোঁয়ালেন, 'প্রোফেশানটা বদলাতে হোতোই

এবার নিরুই সংকুচিত। টাকার ব্যবস্থা মানে চাকরি বদল? দাদা কি সবটা ভেবে দেখেছেন ভালো করে? হাঁ, অনুপম জানান খুব ভালো করে। দাদার মতামত সর্বদাই সুচিন্তিত এবং শেষ পর্যন্ত ধীরোদাত্ত। নিরু মেনে নেয়।

মোটামুটি একটা প্ল্যান খাড়া করে রেখে, নিরুপম চলে যাবার পরে অনুপমের মনে হোলো নিরুটা ছেলে হিসেবে কী দুর্দান্তই ছিলো। সারাক্ষণ পাড়ার গুণ্ডা ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে আসতো, রান্নাঘরে নিরামিষ আহার তাকে বিন্দুমাত্রও অহিংস করেনি। ওদিকে গাছ থেকে পাখির বাসা পড়ে গেলে সেই ভাঙা ডিম দেখে হাপুস নয়নে কাঁদতে বসতো এই নিরুই। অনুপম

BanglaBook.org

জীবনে যেমন মারামারি করেন নি, তেমনি নিরুর মতো রাস্তা থেকে নোংরা বেড়ালছানা, ঘেন্নো কুকুরছানা কুড়িয়ে এনে বাড়িতে জড়োও করেন নি। নিরুটা চিরকালের পাগল। 'ক্রেজী বয়'। নিজের মনেই হাসলেন। সস্নেহে। এবার কি রামশরণ আগরওয়ালকে একটা ফোন করবেন দিল্লীতে? নাকি, মাঙ্গেশকরের গু দিয়ে...না, 'গু' দিয়ে যাবার প্রশ্ন নেই, কারণ তাঁর পদমর্যাদাটা হবে মাঙ্গেশকরের মাথার অনেকটা ওপরে। বলতে হলে রামশরণজীকেই, নইলে একদম সোজাসুজি, আরো ওপরের, স্যার রাঘবনকে বলা উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো কালও রাঘবন কলকাতায় ছিলেন। মাঙ্গেশকরকে একটা ফোন করে জেনে নেবেন, রাঘবন এখন কোনখানে?

থাক। এম্নিই থাক।

জানলায় আকাশের একটা অংশ। পর্দার মাথায় এক চিলতে সরু আকাশ। তাতে কেবল তিনটে ঝকঝকে তারা। পাশাপাশি। বিনু ঝি বলেছিলো, রামলক্ষ্মণসীতা। কিন্তু বাবা চিনিয়ে দিয়েছিলেন—ওটা কালপুরুষের কোমরবন্ধ—এখন অনুপমের জানলায় বাঁধা। হাঃ

গ্রীষ্মকালে ছাদে মাদুর পেতে যখন শুতেন, বাড়ির বাচ্চাদের ডেকে নিয়ে বাবা যত্ন করে আকাশের তারা চেনাতেন। বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে বাবা যেন নিবিড় ব্যক্তিগত পরিচয় করিয়ে দিতেন শ্লোক বলে। গল্প বলে। নক্ষত্রমণ্ডলীর নাম, গ্রহান্তরের ঠিকানা— ওদের বাবাই চিনিয়েছিলেন প্রথম। চিৎ হয়ে শুয়ে লক্ষ কোটি তারার দিকে তাকালে এখন কেমন অস্বস্তি হয়—একটা বিশাল সুদূর অপরিচিত রহস্যলোক। অথচ ছেলেবেলায় মনে হতো প্রত্যেকটি তারাই যেন প্রতিবেশীর খোলা জানালার চেনা আলো।

সেই যুগে কৃষ্ণচৈতন্য রায় লোকটাকে ভালোই লাগতো বেশ ঘুড়ি-লাটাই না ঘুলকাকী...

অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে এলানো মনটাকে একাগ্র করলেন অনুপম—মাঙ্গেশকরকে ফোন করা দরকার, স্যার রাঘবনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলা চাই. অনুপম, ঘড়ির দিকে চাও। ভদ্র সময়ের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা উচিত নয়।

কিন্তু হাত যেন চলে না। না, এখন প্রায় এগারোটা, আর ফোন করা চলে না। কাল? কাল সকালে ডেকো। দিল্লীতে, বোম্বাইতে যেখানেই থাকুন, স্যার রাঘবনকে ফোনে ধরা শক্ত হবে না। সমস্যা একটাই। এডিটোরিয়াল পলিসি নিয়ে। ডেইলি স্টার-গ্রুপেরই ওভার-অল জেনারেল গাইড-লাইন আছে, দিব্যি বোঝা যায়, যেটা অনুপমের আদর্শের সঙ্গে মেলে না। 'ডেইলি স্টারে'র ক্ষেত্রে ঐ কাগজের এডিটোরিয়েল পলিসিটা পুরোপুরি যদি অনুপমের হাতে ছেড়ে দেওয়া না হয়, তাহলে ওঁর পক্ষে কাজটা নেওয়া সম্ভব নয়। স্যার রাঘবন কি রাজী হবেন? তাঁর নিজস্ব মতামত তাঁরই নিজের কাগজে চলবে না—এটা কেউ সহ্য করবে না, তা ছাড়া এদের একটা যখন প্রোনাউন্স এডিটোরিয়ল পলিসি চালু রয়েছে। এ তোমার পশীসাহেব দস্তুর নয়, এ ঝাঁটি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, তায় আবার নাইটহুডপ্রাপ্ত এর গোঁ তোমার গোঁয়ের চেয়ে কম হবে না অনুপম। তাছাড়া এটা তোমার ফ্রী-হ্যান্ড লেখা নয়, এটা চাকরি।

টু, হি হ্যাজ আ লট অফ রেসপেক্ট ফর য়ু, মেট, অনুপম, পারবে কি? তুমি কি পারবে?

অনুপম দেরাজ খুলে খুঁজতে লাগলেন পরিত্যক্ত কোনো পাইপ, কোনো পুরনো তামাকের কৌটো যদি মিলে যায়—খুঁজতে খুঁজতেই মনে পড়লো—নিষেধ আছে। দেরাজ বন্ধ করে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। টুনটুন করে একটা রিক্শা যাচ্ছে। একপাল কুকুর সতর্জনে তাড়া করেছে তাকে। রিকশায় এলিয়ে আছেন একজন সুরাশ্রান্ত মধ্যবয়স্ক পুরুষ। অনুপম সেই মানুষকে বললেন, তুমি বেশ আছ। বীতরাগভয়ক্রোধ তুমিই মুক্ত পুরুষ। তোমার দুঃখও নেই, সুখও নেই।

অনুপম দূরে দৃষ্টিপাত করলেন। ওই বস্তুতল অট্টালিকার মাথায় লাল আলোটা রাত্রিভোর দপদপ করে আকাশের কাছে মর্তের সীমানা বিজ্ঞাপিত করছে। গগনবিদারী যন্ত্রের গতিময়তাকে

সীমানা নির্দেশ করছে স্থির, অবিচল মাটি। বলছে, দেখো বাপু, বেশি নিচু যেন হোয়ো না, নিজেই বিনষ্ট হবে। আরো উঁচু দিয়ে, আরো ওপর দিয়ে উড়ে যাও এখানে তোমার পথ বন্ধ, কারণ আকাশ এখানেই সমাপ্ত।

অনুপম আরো ওপরে চাইলেন। এবারে কেবলমাত্র কোমরবন্ধটুকু নয়—খোলা অন্ধকারে ঝলসে উঠলেন কালপুরুষ। আকাশচারীদের তিনি আরেকরকম নির্দেশ দেন। অন্য এক দিগন্তের সীমা বেঁধে দেন। এতো ঊর্ধ্বে উঠো না বৎস, এ যে মহাশূন্য—এখানে মহাকাশ—তুমি গগনবিহারী যন্ত্রযান, এখানে তোমার পথ নেই। এ হলো আকাশের ওপারে আকাশ—এই আলো গ্রহান্তরী আলো, এই অগ্নিময় জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে তোমার অধিকার নেই।

ক'টা বাজলো ?

কাল সকালেই প্রথম কাজ মাস্টারমশাইকে ফোন করা। কনডিশান দুটো থাকবে—এডিটোরিয়ল পলিসি বিষয়ে সার রাঘবন বা রামশরণজীর নাক গলানো চলবে না—এবং অন্যত্র লেখার পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। নইলে দস্তুরকে কী বলবেন তিনি ?

অবশ্য, এসব না করে হাজার তিরিশেক টাকা ধার নিলেই হয়—দস্তুরকে বলবেন এ্যাডভান্স করতে ? সেরে উঠে আস্তে আস্তে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করে দেবেন। যদি প্রত্যাখ্যান করে ? প্রত্যাখ্যাত হওয়ার চাইতে প্রত্যাখ্যান করাটাই ভালো। যদি ওঁর কনভিশনে সার রাঘবন রাজী হন—যদি রাজী না হন ? সেটার সম্ভাবনাই বেশি। তাহলে ? থিংক অফ এ্যান অলটারনেটিভ।—কী আবার ? ব্যাংক থেকে ধার নেবেন। অসুবিধা এত কী ? What ails thou, Faustus ? তার চেয়ে বরং অয়েল সাব-কমিটির কাজটা শেষ হয়েছে, এবারের ফাইন্যাল করে ফেলা যাক। ঘুম যখন আসবেই না।

—'এত রাত্তিরে লিখতে বসবেন ?' টাইপরাইটারে হাত দিতেই চমকে উঠলেন।

—'তুই শুসনি, কেষ্ট ?'—শুধু ঠোঁট নড়লো।

—'আপনি তো খেতেই বসলেন না আজ।'

—'খাইনি ? খিদে নেই একেবারে। তুইও খাসনি নাকি ? সর্বনাশ।'

—'আমি ? কখ...ন খেয়ে নিয়েছি। এবারে শুয়ে পড়ুন দাদাবাবু। আপনার শরীর ভালো নেই।'

—'একটু লিখে নিই ?'

—'এই রাত্তির দুটোয় ?'

—'দুটো কোথায় ?'

—'ওই হোলো। দেড়টা।'

—'জরুরী লেখা আছে।'

—'তা হোক, শুয়ে পড়ুন। আজ ইপ্রেকশন নিয়েছেন, আর টাইপ করবেন না।'

—'(তুমি জ্বালিও না তো কেষ্ট)।'

—'তুমি শুয়ে পড় কেষ্ট।'

—'আপনি শোবেন না ?'

—'একটু পরে।'

কেষ্ট চলে গেল।

তুমি তো জানো না কেষ্ট, আমার ঘুম আসছে না। কাজটার জন্যে জেগে নেই আমি, জাগ্রত বলেই কাজে বসেছি আমি জানি তুমি আমার শুভাশুভের সঙ্গী। তবুও তোমাকে বলা যাবে না কেন আমার ঘুম আসছে না।

একসময়ে মাথাটা ভারী হয়ে এলো, কয়েকটা সীসে-ভরা বল কেউ গড়িয়ে দিল খুলির ভিতরে,

BanglaBook.org

রথচূড়া ফুটে উঠেছে পূর্বদিগন্তে।

লেখাটা কি ভালো হলো? আর কিছুই ভাবতে পারা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। মাথার মধ্যে করতাল বাজছে, চোখে, মনে ক্লান্তির পাতা পর্দা নেমে আসছে। সকাল হয়ে আসছে। এবার ফোন করতে হবে।

অবশ্য এক্ষুনি নয়। এখন মোটে সাড়ে চারটে। আটটার আগে কাউকে ফোন করা যায় না।

বিছানার দিকে ক্লান্ত পা টেনে নিয়ে এলেন। রাত্রে উচিত ছিলো একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নেওয়া। কি আশ্চর্য, রাত্রে একবারও মনে পড়লো না? এখন আর সম্ভব নয়। এই সময়ে ঘুমোলে কোনটোন সব গোলমাল হয়ে যাবে। এখন শুতে হবে না। বরং একটু হেঁটে আসা যেতে পারে। কিন্তু শরীর...মাথার মধ্যে সেই মালটি-স্টেরিড বিলডিং-এর রক্ত চক্ষু দপ দপ করে জ্বলছে, রগের শিরা যেন ছিঁড়ে পড়বে।

বিছানা থেকে ফিরে এসে অনুপম স্নানের ঘরে ঢুকলেন। নিরাবরণ হয়ে ঝর্ণার নিচে দাঁড়াতেই সহস্র শীতল আঙুল বুলিয়ে জল অনুপমের সর্বাঙ্গে, স্নায়ুমূলে নিবিড় করুণা সিঞ্চন শুরু করলে।

বাবার একটা বই ছিলো, প্রাকৃতিক চিকিৎসা। তাতে প্রায় সব রোগেরই চিকিৎসা ছিলো 'দুই বেলা স্রোতস্বিনী নদীর জলে অবগাহন স্নান।' বাত? অবগাহন। অজীর্ণ? অবগাহন। সর্দি-কাশি? অবগাহন। অনিদ্রাতেও নিশ্চয় অবগাহন।

এ অবশ্য অবগাহন নয়। এ হলো ধারাস্নান। এও আরেক রকমের প্রাকৃতিক চিকিৎসা। এতেও স্নায়ু শীতল হয়। রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়। পশ্চিমি পদ্ধতিতেও সরল স্নায়ুচিকিৎসার প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক ধারা—এই ধারা-পাত। ধারাপাত? ছেলেবেলায় বাবাকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন অনুপম—নামতার বইয়ের এমন কাব্যিক নিসর্গঘেঁষা নাম কেন?

ধারাপাত? বাবা বলেছিলেন, সেকালে ভারতের ঋষিরাই ছিলেন বিজ্ঞানী, আবার ঋষিরাই ছিলেন কবি। তাই এরকম মনোভঙ্গি ভারতের ঐতিহ্য। দ্যাখো না, 'অলকাবেট' এই খটখটে কাজচালানো নামের চাইতে 'বর্ণমালা' কথাটি কতো সুন্দর, কতো ব্যঞ্জনাময়। ওতে কেমন রং আছে, সূত্র আছে। আর সেই মূল শব্দ? অ-ক্ষর? আহ্! বাবা কথায় কথায় কোথায় যেন চলে যেতেন। বাবার পৃথিবীটাই অন্য ছিল। অথচ সেটাই তো বাবার একমাত্র সুখ ছিলো না। সেটা ছিল ছেলেদের দেখাবার জন্য মুখোশ। যেমন বাবার নিত্য গঙ্গাস্নান। আর অবগাহনস্নান মানেই বাবা বুঝতেন গঙ্গাস্নান। বহুতাস্রোত হওয়া চাই। বাড়িতে স্নান করলেও বাবা মুখে গঙ্গাস্তোত্র বলতেন। কিন্তু হে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা, তুমি কি সত্যিই ত্রিভুবনকে তারণ করতে জানো? তোমার তরল তরঙ্গে যে কোনো তপ্ত তাপিত নিশ্বাস কি তুমি জুড়িয়ে দিতে পারো? কোনো খণ্ডিত অন্তর্লোককে তুমি কি স্নেহ দিয়ে পুনর্নব করে দিতে পারবে?

একসময়ে মনে হল জলমর্মরকে বিদীর্ণ করে কোথাও একটা ঘণ্টি বাজলো। দি আর্লি মর্নিং কল? না—আমার দরজায় নয়। নিশ্চয় পাশের ফ্ল্যাটে। আবার তীব্র হলো সেই ঘণ্টি। এখন ভোর পাঁচটা। কে হতে পারে? কী হতে পারে? টেলিগ্রাম? নিশ্চয় পাশের বাড়িতে। এবার অনুপম কল বন্ধ করে দিলেন। সমগ্র ইন্দ্রিয় একাগ্র করে কান পাতলেন। মনে হলো কেউ দরজা খুলছে। তবে তো আমার বাড়িতেই। তোয়ালে টেনে নিতে গিয়ে সোপকেসটা পড়ে গেলো—সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়লো পিছল সাবানটা, যেন জ্যান্ত একটা ব্যাঙ। সবটা জেনেও, বুঝেও, কেমন একটা আত্মরক্ষার রিফ্লেক্স এ্যাকশনে অনুপম স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুই পা পিছিয়ে গেলেন। একমুহূর্ত শুধু, তার পরেই নিচু হয়ে সাবানটি তুলে কলের নীচে ধুয়ে সোপকেসে রাখলেন। কেসটা তুলে রাখলেন।

BanglaBook.org

সব কিছু যেমন-কে-তেমনি রয়ে গেছে। কেবল ভিজে সাবানটা পড়ে গিয়ে একপাশে তুবড়ে বেঁকে গেলো। উনি সেটা খেয়াল করলেন না।

ঘণ্টি কারা বাজালো?

ওদের কিটব্যাগটা উনি জমা দিয়েছেন এই ক্রোধেই কি...সোমেনের বডিটা গঙ্গার ধারে পিছমোড়া মাত্র পরশু সকালেই.....

হঠাৎ অনুপমের মনে হলো জীবনের চরভাগের আড়াই ভাগই এখনো জানা বাকী। কী লাভ হয়েছে এতো কাজ করে? কী পাওয়া গেছে? কোন্‌টা সত্য? কোন্‌দিক থেকে ভাবলে সত্যকে ছোঁওয়া যায়? কোন্‌ দিকটায় জীবনের সত্যমুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা ঢাকা রয়েছে? এই অনুপমের দিকে, না, সেই সুধর দিকে?

যা হয় হোক আর তিনি পারছেন না। ছেলেরা আসে আসুক। তিনি শোবেন। বলবেন—কী হয়েছে, ব্যাপার কি? এতো ভোরে?

কোমরে বড়ো তোয়ালেটা জড়িয়ে, ভিজে গায়ে শার্ট চড়িয়ে, পায়ে চটি, চোখে চশমা, ছোট তোয়ালেতে মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন অনুপম। যত ভোরেই হোক, যত গ্রীষ্মই হোক, খালি গায়ে, খালি পায়ে নগ্ন চোখে অনুপম জনসমক্ষে উপস্থিত হন না।

—'কী হয়েছে কেষ্ট? ব্যাপার কি? এত ভোরে?' কিন্তু কথাগুলো সবই গলার মধ্যে জট পাকিয়ে জড়িয়ে গেল। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি আবার তাঁর কণ্ঠরোধ করেছে।

—'মা এসেছেন দাদাবাবু।'

যুদ্ধক্ষেত্রে শরবৃষ্টির পরিবর্তে এ যেন পুষ্পবৃষ্টি হলো—কিন্তু মা এত ভোরে কেন? নিরুদের কিছু...

—'এতো ভোরে নাইসিস যে? রাতে ঘুমোস নি বুঝি?'

মার স্বাভাবিক স্বর শুনে নির্ভার হলেন অনুপম। কিন্তু কৌতূহল দ্বিগুণ হলো।

—'কেষ্ট, দাদা ছোড়দার জন্যে ভালো চা করো তো বাবা? নিরুটাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে এনিচি—অনু, বাবা, তোর গলাটা আজ কেমন আছে?'

এই জন্যে? এই ভোরবেলায়? ফোনেই তো খবর নেওয়া যেতো। মুখে অনুপম অবশ্য কিছুই বলবেন না ঘড়ঘড়ঘড় ছাড়া।

—'সর্বোনাশ। এই অবস্থা? চল, ঘরে চল বলচি, একটা কথা বলতে এলুম।'

এবার নিরুপম বললো, 'মা তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করবেন দাদা, কিন্তু তুমি আগে তোয়ালেটা ছেড়ে দয়া করে পাজামা পরে এসো। তারপরে কথা হবে।'

মা বললেন, 'অনু, বাবা, তুমি কি অন্য কাগজের লোকেদের জানিয়ে ফেলেচো?'

—'মানে?'

—'নিরুর মুখে শুনলুম, তুমি নাকি অনেক দিন আগেই কোন্‌খানে একটা বড় চাকরির প্রস্তাব পেয়েছিলে, কিন্তু চার পাঁচ বছর ধরে ওটা নাওনি?'

—'হুঁ।'

—'তবে ওটা এখনও নিও না বাবা।'

—'মা?'

—'হাঁ বাবা। আমি তোমার মা, আমি বলছি ও চাকরি তুমি নিও না। আজ তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও তাই বলতেন।'

—'মা।'

—'আমি ভেবে চিন্তেই বলচি অনু। এইটে বলবো বলেই ভোর রাত্তিরে নিরুকে টেনে

BanglaBook.org

তুলে ছুটে এসেচি বাবা। এসব কথা কি টেলিফোনে বলা যায়? প্রাণ যাতে সাড়া দেয় না, তেমন কাজ করতে নেই বাবা?'

—'কিন্তু...'

—'কোনো কিন্তু নয় অনু। ও চাকরিতে তোমার মন নেই। ও তুমি নিও না।'

—'কিন্তু মা (কেন তুমি বারণ করছো?)...'

—'বাবা, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—আমি কেমন করে বুঝবো কোন্ চাকরিটা ভালো, কোন্‌টে মন্দ। কিন্তু তোমরা তো বিদ্বান, ভালো-মন্দ তোমরা সবই বুঝতে পারো। আমি সেই জন্যেই বারণ করছি। তোমার নিজের মনই যখন চার পাঁচ বছর ধরে কু গেয়েছে, তখন নিশ্চয় এতে কোনো মন্দ আছে অনু, কোনো ত্রুটি আছে। না, তুমি ও কাজটা নিও না।'

—'কিন্তু এখন তো...'

—'বিপদে পড়লে মুনিঋষিরও মতিভ্রম হয় বাবা। তোমার উপযুক্ত ভাই রয়েছে, তোমার মা বেঁচে আছে—কেন তুমি মন যা চায় না তেমন কাজ করতে যাবে বাছা? তোমার কিসের অভাব?'

—'দাদা, রাঘবনকে কি ফোন করেছিলে?'

—'কাল করা হয় নি।'

—'ঠাকুর রক্ষে করেছেন। রাধামাধব রক্ষে করেছেন। ফোনটোন তুই করিসনি অনু। টাকার জন্যে তুই ভাবিস নি। তোমার বউয়ের নামে আমার গয়না গড়ানো নেই। ফ্ল্যাটে বেঁধে রেখে বেশ কিছুটা এমনি তোলা যাবে—বাকিটা নিরু যেমন করে পারে দিক।'

—'বাঁধা রেখে?' বিদ্যুৎঝলকের মতো অনুপমের খেয়াল হয় ফ্ল্যাটটাই তো বাঁধা রাখা যায়। এমন কি ফ্ল্যাটটা না কিনলেও হয়। ওই টাকাটা সবটাই এমনি ফেরত পাওয়া যাবে; ক্যামাক স্ট্রীটের সাহেবী ফ্ল্যাটের জন্য এ দরিদ্র দেশে ক্রেতার অভাব হবে না।

কী দরকার ছিলো এতো উদ্বেগের, যখন ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিলেই সবটা মিটে যাচ্ছে। তাহলে কি...প্রকৃতপক্ষে তুমি কি তাহলে....সম্পত্তিলোলুপ অনুপম, বিষয়সম্পত্তির আকর্ষণ তোমার এতই বেশি—যে 'ভেইলি স্টার'এ যোগ দিতেও তোমার বাধছিল না? তুমি যে নিজেকে নির্লোভ, অসম্পৃক্ত, দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নচিত্ত সুখেষু বিগতস্পৃহ—স্থিতধী ব্যক্তি বলে মনে করতে ভালোবাসো, সেসব তাহলে বাজে কথা?

নইলে, কেন একবারও তোমার মনে হোলো না, যে তোমারও প্রতিভেণ্ড ফাণ্ড ছিলো?

নিরুর চেয়ে তোমার উপার্জন ঢের বেশি। কিন্তু নিরুই বেশি ধনী।

নিরুর অপার ঐশ্বর্য।

সংসারী নিরু, হাল্‌কা, আড্ডাবাজ নিরু, ছোটো সুখ, ছোট দুঃখে ন্যাতাজোবড়া নিরু এক কথায় সারা জীবনের সর্বস্ব সঞ্চয় অন্যের জন্যে খরচ করতে পারে।

—'মা আমি ফ্ল্যাটটাই বেচে ফেলবো। তাতে ঘোক টাকা উঠে আসবে। সব টাকা ঐতেই আটকে রয়েছে। নিরু, তুই ভাবিস নারে।'

অনুপমের গলা দিয়ে একটা আর্ত স্বর নিঃসৃত হয়। কথাটা বলতে বলতেই অনুপমের মাথার মধ্যে বহুতল অট্টালিকার রক্তচক্ষু বাতিটি টুপ করে নিবে গেল। কানের মধ্যে একটা মেসিন চলার মতো গুম্‌গুম্ আওয়াজও যেন আপনা হতে বন্ধ হয়ে গেল।

ক্রমশ এই ভোরবেলার শান্তি, এই প্রাক্-সূর্যোদয় স্পষ্টতা, পাখি-জাগার সময়ের স্তব্ধতা—অনুপমের ভেতরে ভেতরে বিছিয়ে গেল।

চা-বিস্কুট খাবার পরে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিরু বললো 'যাক বাবা! এবার নিশ্চিন্তি হয়ে অফিসে যাওয়া যাবে। আর দাদা, সত্যি! ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেবার কথা, তোমার-আমার

কারুরই আগে খেয়াল হলো না?'

মা বললেন—'সে কথা থাকগে। তবু যে মনে পড়েছে শেষ পর্যন্ত সেই ভাগ্যি। নিরু, আমি বৌমাকে বলে এসেছি ঠাকুরকে তুলবে। আমি আজ অনুর কাছে থাকবো।'

॥ ২০ ॥

নিচে নিরুর গাড়ি রওনার শব্দ শুনতে শুনতেই অনুপমের দু চোখ জড়িয়ে এলো। হঠাৎ যেন সারা শরীরে রাত্রি জাগরণের অবসাদ বারো ফুট উঁচু ঢেউ ভাঙলো। মাকে জানালেন, এখনই প্রাতরাশ নয়, একটু শোবেন এখন অনুপম।

বিছানায় শুয়েই প্রথমে মনে হোলো—'যাক!' মাথার মধ্যে এই পাখি-ডাকা, আলো-ফোটা পরিচ্ছন্ন ভোরবেলা। মাঙ্গেশকরকে আর ফোন করা নয়, বরং সুকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। ফ্ল্যাটটার ব্যাপারে। যাক, একটা জিৎ, একটা ফয়সালা শেষ। কিন্তু ফ্ল্যাট ফেরত দেবার সময়ে সুকুমার চক্রবর্তীর মুখের ভাবটা কল্পনা করেই অনুপমের মাথার মধ্যে ফের হাজারকতক আলপিন ফুটলো। 'অনেকেই ফেরত দিয়ে দেয়, সবাই তো শেষরক্ষা করতে পারে না' চক্রবর্তীর মুখে এ কথাটা লেগেই আছে। অনুপম রায়ও সেই দলেই পড়লেন। সেই শেষরক্ষায় অপারগ অনেকের দলে।

এমন সময় চুলের মধ্যে বিলি কাটলো কার হালকা সরু আঙুল, 'ফুলকাকী?' মনে হতেই আবার সেই কষ্ট। সেই শ্বাসকষ্ট। এই অসহ্য শব্দে বুঝি এ্যালার্জি আছে অনুপমের। অনুর ফুলকাকী। ফুলকাকীর অনু। এমনি করেই চুলের ভিতরে বিলি কেটে রোজ রাতে অনুকে ঘুম পাড়িয়ে দিতো ফুলকাকীর সরু, নরম আঙুলগুলো। অনু নামের ওই ছেলেটাই ছিলো নিঃসন্তান শিশুবিধবা ফুলকাকীর দিন এবং রাত্রিগুলির কেন্দ্রবিন্দু।

...দূর, যত বাজে ভাবনা। ফুলকাকী কী করে হবে। ফুলকাকী তো কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

'কিছু বললি অনু?' মায়ের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন অনুপম রায়।

—'কই, না তো'

—'মনে হলো যেন কিছু বললি। তোর কোথায় কষ্ট হচ্ছে? মাথাটা টিপে দেবো?'

—'না মা। ঘুম পাচ্ছে।'

—'ঘুমো বাবা। ঘুমো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

—'মা?' একটুক্ষণ ছটফট করার পরে অনুপম ডেকে ফেললেন। মায়ের সেবা পাওয়া তাঁর অভ্যেস নেই। একান্নবর্তী সংসারে মা কোনোকালেই নিজের সন্তানদের আলাদা করে যত্ন করতেন না, জ্বরজ্বাড়ি না হলে। সেও ফুলকাকী মারা যাবার পর থেকে।

আজ এই এতো বয়সে হঠাৎ অঙ্গে মায়ের অপরিচিত স্পর্শ পেয়ে আরামের চেয়ে অস্বস্তিই বেড়েছে অনুপমের। মা, হাতটা সরিয়ে নাও। মা, তোমার আদর আমার সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু এসব কথা তো বলা যাবে না।

—'মা?'

—'কি রে?'

—'বাবাকে তোমরা অতো প্রশ্রয় দিতে কেন মা? তুমি আর ঠাকুমা? কী করে পারতে তোমরা?'

চুলের মধ্যে সঞ্চরমাণ আঙুলগুলি হঠাৎ প্রস্তরীভূত হয়ে পড়লো। কেউ যেন মাকে 'স্ট্যাচু' খেলায় ডেকে নিয়েছে।

—'কার কথা বলছিস তুই, অনু?'

মার গলা চিরে ফেলে একটা আর্ত শব্দ।

BanglaBook.org

—'বাবার কথা।' অনুপমের স্বরে ক্লান্তি থাকলেও ভারসাম্যের অভাব নেই।

—'বলছি ও লোকটাকে এত প্রশ্রয় দিতে কেন তোমরা?'

—'প্রশ্রয়!'

—'তোমরা মেয়েরা বড় নিষ্ঠুর। মেয়েদের জন্য তোমাদের কোনো মমতা নেই। যে লোকটার জন্যে ফুলকাকীমাকে ঐভাবে মরতে হলো, তাকে তোমরা সহ্য করতে কেন?'

—'কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে তার কী যোগ? তোমার বাবার জন্যে তো ফুলকাকীকে মরতে হয় নি।'

মার শান্ত জবাবটি যেন একগাড়ি অন্যমনস্ক ট্রেনযাত্রীকে বেদম চমকে দিয়ে হু হু করে হুইসিল বাজিয়ে ঝনঝনিয়ে পার হয়ে গেল।

—'মা...!!'

অনুপমের স্বভাবসংযত কণ্ঠ এখন রোগের প্রকোপে আরো নিচু হয়েছে। সেই কণ্ঠ থেকেই যে এই তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দ নির্গত হলো এ যেন বিশ্বাস হয় না। মা ভয়ানক চমকে উঠলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

—'মা?' নিচু গলায় প্রশ্নের সুরে পুনরায় বিনীত মাতৃ সম্বোধন করলেন অনুপম।

—'কি বাবা?'

ত্রিশ বছরের ওপার থেকে সেই যে ছেলেটা একদিন ঘুম থেকে উঠে উঠোনে একটা বিকৃত পুড়ে-যাওয়া শরীর দেখেছিলো, সে বললো—

—'তুমি ঠিক জানো মা?'

—'এতে ভুল জানার কী আছে বাবা?'

—'তবে জ্যাঠাইমা কেন বাবাকে...'

—'জ্যাঠাইমার কথা বাদ দাও।'

—'মানে? বাদ দেব কেন?'

—'তোমার জ্যাঠাইমা কিছুই জানতেন না বাবা।'

—'সে কী? তোমরা প্রতিবাদ করলে না কেন মা? এখনও তো প্রত্যেকদিন জ্যাঠাইমা তোমাকে...'

—'দিদি কিছুই জানেন না বাবা।'

—'কেন? কেন জানেন না? কেন, জানিয়ে দাওনি তোমরা ওঁকে, আমার বাবা দোষী নন, দুশ্চরিত্র, খুনে, উনি যা যা বলতেন বাবা তার কোনটাই হয়তো...'

—'হয়তো কেন বাবা। উনি দেবতার মতো মানুষ ছিলেন।' মার হাত দুটি আপনি জোড় হয়ে কপাল ছোঁয়।

—'চুপ করো, মা...'

—'মানুষটা তোমাকে কত ভালবাসতেন, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারো নি অনু?'

—'মা, কেন তোমরা আমাকে বলোনি তখন?'

—'কী বলবো?'

—'কেন বলোনি যে জ্যাঠাইমা মিথ্যা বলেছেন, জ্যাঠাইমা ভুল বলেছেন—'

—'কী করে বলবো। তোমার বাবাই যে বলতে দেন নি।'

—'বলতে দেন নি? কেন? কেন?' (কাকে বাঁচাতে, কার দোষ ঢাকতে চাইছিলেন বাবা?)

—'অনু, তুমি বড্ড কথা কইছো বাবা। তোমার একেবারে কথা বলা উচিত নয়।'

—'আমাকে বলতে দাও। কেন বলতে দেন নি? কার দোষ ঢাকছিলেন তিনি?'

—'তোকে আর দোষ দেবো কি, তোর ঠাকুরমারও অসহ্য হয়েছিলো। তোর বাবা তাঁকেও

BanglaBook.org

দিব্যি দিয়ে বারণ করে রাখলেন।'

—(বিনুঝিকে দিদির ননদ বলল—একথা কি সত্যি, যে তোমাদের বাড়ির ছোট বৌটাকে বৌদিদির কাকা মেরে ফেলেছে? বিনুঝি বলল—পাগল নাকি? সে তো নিজে পুড়ে মইরেচে...দিদির ননদ বলল—হ্যাঁ, কিন্তু পেটে তার বাচ্চাটি ছিল যে বৌদিদির কাকার...বিনুঝি বলল—বড়মা তাই বলে বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না—নিচ্চয় আর কেউ! ছোটবাবু দ্যাবতা!—দ্যাবতাই, তবে অপদ্যাবতা! ভণ্ড! খুনে! লম্পট! ওকে তো ফাঁসীতে ঝোলানো উচিত!)

—'দিব্যি দিয়ে? বারণ? কেন মা?' বালকের অবোধ প্রশ্নকে প্রবোধ দিতেই যেন মায়ের স্বর গাঢ় হলো, মৃদু হলো, আবার কখন আঙুলগুলি প্রাণ পেয়ে ঝিরঝির করে খেলতে শুরু করেছে অনুপমের চুলে, স্বপ্নে কথা বলার মতো অন্য মনে মা স্বগত বলে গেলেন—'উনিই বলতে দিলেন না। কেবলই বলতে লাগলেন, কী হবে বলে? ফুলবৌ তো ফিরে আসবে না। যে গেছে সে গেছে, ঠাকুর তাকে দেখবেন। যে আছে, তোমরা তাকে আরাম দাও। বৌদির এটা না জানাই ভালো।

'আমারও খুব অস্থির লেগেছিলো। এই তোমার মতনই। উনি বললেন, মানুষের চক্ষুলজ্জাটুকু ওভাবে ভেঙে দিতে হয় না। দাদা যখন বৌদিকে ভয় পেয়ে একথা বলেছেন, তখন বৌদি ওটাই বরং জানুন। তোমার ঠাকুমাকে গিয়ে বললেন, মা, তুমিও জানো আমার দোষ নেই, অনুর মাও জানে আমার দোষ নেই, আর দাদা তো জানেনই। ব্যস, হয়ে গেলো! আর তো কারুর কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে না। একমাত্র বৌদিদি না হয় নাইবা জানলেন। এটুকু ঢাকা থাক না মা! ওদের মধ্যে শান্তি থাক।

'তোমার বাবার জন্যেই তো আমরা কোনোদিন একটা কথা কইতে পারি নি। বাড়ির ঝি-চাকরেরা পর্যন্ত সব জানতো। তোমার বাবাই ওদের জনে জনে ডেকে, আদর করে বলে বুঝিয়ে মুঠো ভর্তি টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করিয়ে রেখেছিলেন। দাদার তো মেয়ে ছিলো, মেটে দুজনের তখন বিয়ে হয়েছে। কথাটা ছড়িয়ে পড়াও মুশকিলের হতো।'

—'কী আশ্চর্য! কী ভীষণ! কিন্তু তুমি আমাকে কেন বল নি মা? কেন কোনো দিনও বললে না? কেন বললে না মা? কেন? কেন? কেন?'

গোঙানি আর গর্জন মিশিয়ে একটা চাপা অমানুষিক আর্তনাদ বেরুলো। অনুপমের সিকালই উপুড় হয়ে শোওয়া অভ্যেস। এখন বালিশের মাংসে বসে যাচ্ছে ওর নোখ, ওর দাঁত।

—'কী বলবো বাবা? তুমি তো কোনো দিন জিজ্ঞেস করোনি? আজ জিজ্ঞেস করলে, তাই বললুম।'

—'নিরু? নিরু জানে?'

—'হ্যাঁ, নিরু তো কবে থেকেই জানে। নিরুকে উনিই বলে গেছেন।'

আর্তনাদের উত্তরে মৃদু ধীর স্বর এল—'নিজে বলে গেছেন?'

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে নিরু বাবাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো, 'বাবা, ফুলকাকীর কথা বড়মা যা যা বলেন সব কি সত্যি? আমি সত্য কথা জানতে চাই।'

বাবা তখন ওকে ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে রাধামাধবের সামনে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে বড়মাকে এ নিয়ে কোনোদিন কিছু জানাবে না, তারপর খুলে বলেছিলেন সব কথা। রাধামাধবকে সাক্ষী রেখে।

—'তুমি তো কখনো প্রশ্ন করো নি বাবা। আমি ভেবেছি তুমি হয়তো সব জানো। তুমি তো আরেকটু বড়ো ছিলে।'

অনুপমের শ্রবণে তখন একত্রে ধ্বনিতে হচ্ছে গ্রহ-নক্ষত্রের অব্যক্ত প্রবল সংগীত 'মিউজিক

BanglaBook.org

অফ দ্য স্ফিয়রস'। সৌরমণ্ডলে গ্রহাবর্তনের গতিময়তার সেই অপ্রমেয় মহাগুঞ্জন, যা মাত্র দেবদূতেরই শ্রুতিগোচর, নশ্বর ইন্দ্রিয়ের সহনাতীত সেই পরম ধ্বনিতে অনুপম রায়ের অন্তর্লোক তখন অনুরণিত।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র।

তারপরেই। মনে পড়লো এক বৃষ্টিধূসর শীতজর্জর তীক্ষ্ণ বাতাসে ছিন্নভিন্ন জানুয়ারির অন্ধকার দুপুর—লণ্ডনের তুহিনকর্দমাক্ত অনাত্মীয় রাস্তা—বালিশের মধ্যে আরো গভীরে মুখখানা গুঁজে ফেললেন অনুপম, যেন ওইভাবে দম বন্ধ করে মেরে ফেলা যাবে স্মৃতিকে... ভ্রান্তিকে...পাপকে...হ্যাঁ, পাপকে।

দাঁতে-দাঁত অনুপমের ওঠাধর জোর করে দুবার ফাঁক করিয়ে, খুব ছোট্টো, খুব চাপা, সম্পূর্ণ শব্দহীন একটি গহন, বিজন, দীন সম্বোধন যেন আপন শক্তিতে আপনি নির্গত হয়ে এলো: 'বা...বা!'

॥ ২১ ॥

চোখ বুজে আছি, কিন্তু মন বোজেনি।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্—মনকে ফিরিয়ে আনো, বশে আনো অনুপম, মনকে সংযত করো। তুমি পারো নি। স্বীকার করো অনুপম, তুমি পারো নি। তুমি বিভ্রান্ত, তুমি অহংকারী অনুপম, তুমি লোভী, তুমি কামুক, তুমি ক্রোধী। তুমি ক্ষমাহীন, অনুপম স্বীকার করো। অনুপম, তুমি অশুচি। তোমার অশৌচ অন্তহীন। তোমার কালাশৌচের শেষ হবে না। অনুপম, তোমার সুখও নেই, তোমার শান্তিও হবে না।

অস্থিমজ্জা-বিদীর্ণ-করা উদ্দাম শীতল সেই প্রবাসী বাতাসে তোমার শ্রদ্ধার অধিকার তুমি হারিয়ে ফেলেছো। স্মরণ করো অনুপম, স্মরণ করো—স্মৃতিকে অস্বীকার কোরো না, স্মৃতিতেই সত্য। সত্যেই মুক্তি।

পিতৃপ্রয়াণের সংবাদ পেয়ে সেই উন্মত্ত ফূর্তির পরে সবল মারিয়ার বুকে মুখ গুঁজে ফুলকাকীর জন্য তোমার শোক স্মরণ করো। সে কী শোক, নাকি, সে কামনা? সেই প্রচণ্ড সেলিব্রেশনের পরে আরো সেলিব্রেশন, আরো পাপ, আরো পাপ। মারিয়াকে, তোমার শয্যা-সঙ্গিনীকে, সারারাত্রি তুমি ফুলকাকী—ফুলকাকী—ফুলকাকী বলে ডেকেছিলে—তোমার পাপের সীমা নেই। মার্জনা নেই। শোনো মারিয়া, আমি মহাপাপী। পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ

—'বাবা, শুনুন, আমার পাপের শেষ নেই।'

আজ মারিয়ার কথা প্রবলভাবে উত্থিত হয়ে জোরে জোরে নাড়া দিতে লাগলো অনুপমের স্মৃতিকাণ্ডকে। ঝরে ঝরে পড়লো তীব্র বিষফুল। যার গন্ধ পর্যন্ত অনুপমের কাছে অসহ। সেই ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল অনুপমের বর্তমানের সবটুকু জমি।

প্রথম বিলেতে পৌঁছে জাহাজ থেকে নেমে মনে হয় নি কোনো অসুবিধে হবে। জুটে গেল মারিয়ার বাড়িতে একটা ঘর—তখনও বাড়িউলিরা ছিল বিশেষ বর্ণ-বিলাসিনী, কালো-বাদামী-সফেদ নিয়ে ভাগাভাগি, রাগারাগির শেষ ছিল না। মারিয়া সফেদ, কিন্তু সেন্ট্রাল য়ুরোপীয়ান ওইশ—ইংলণ্ডে সেও বিদেশী। তাই হয়তো বাদামী মানুষদের যত্ন করে ঠাঁই দিয়েছিলো নিজের বাড়িতে। অনুপমের সেই প্রথম যৌবন সদ্যজাগ্রত, আর মারিয়ার যৌবন তখন মধ্য গগনে। মারিয়া অসুন্দরী নয়, অবস্থাও ভালো, টুপি-তৈরির ব্যবসা আছে। বিয়ে একটা হয়েছিলো, বিচ্ছেদও হয়ে গেছে বহু দিন গৃহবাসী প্রবাসী ছাত্রদের যথাসাধ্য স্নেহযত্ন করে সে। এই মারিয়ার শরণ নিলেন অনুপম।

BanglaBook.org

দেশে থাকতে কখনো যা কল্পনা করেন নি, জাহাজে অনন্ত নীল জলরাশি আর কিনারাহীন আকাশের মাঝখানে ভাসমান অবস্থাতেও যা কদাচ অনুভব করেন নি, সেই প্রবল প্রখর, নিরাকার ও নিবৃত্তিহীন, অবশ্য শূন্যতা তাঁকে আক্রমণ করলো এই জনবহুল, কর্মব্যস্ত লণ্ডন শহরে।

প্রথম প্রবাসের উত্তেজনা, রায়বাড়ির পরিবেশ থেকে মুক্তির প্রথম পাবামেলা দিবস-রজনীগুলি কেটে যাবার পরে, তাঁর চোখ কেবলই খুঁজতো বাংলা ভাষা, বাঙালী মুখ। কিন্তু অভিজ্ঞতা অচিরেই তাঁকে ভিতর থেকে অন্য পরামর্শ দিলো একগুচ্ছ বৃন্তহারা হৃদয় নিয়ে তোড়া বাঁধলেই নিজের বৃন্ত গঠন হয় না।

একাকিত্ব মোচাতে হলে অধিকারবোধ জন্মানো দরকার। কোনো পুরুষের ওপরে সেভাবে অধিকারবোধ জন্মানোর কথা ভাবতেই পারেন না অনুপম। সেই প্রথম তিনি নারীর প্রয়োজন, নারীব অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করলেন হৃদয়ে। জীবনে। এবং তারপরে শরীরে, বুদ্ধিতে। শুরুতে যেটা ছিলো নিরুপায় আশ্রয় গ্রহণ, ক্রমশ সেটাই হয়ে দাঁড়ালো সচেতন শোষণে। শুরুতে যা ছিলো কাতর প্রণয় প্রার্থনা, ক্রমে তা-ই হয়ে উঠলো পেক্ত প্রণয়ীর ভূমিকাভিনয়।

মারিয়ার দৌলতে শুধু ওয়াইনিং-ডাইনিং আর সিনেমা-থিয়েটারই নয়, টাই-রুমাল থেকে শুরু করে ক্রমশ জুতো, শার্ট সবই আসতে লাগলো। আর্থিক, সাংসারিক কোনো উদ্বেগই থাকতে দেয় নি মারিয়া।

তার বুকের ওমের মধ্যে নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক সমতা ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম পড়াশুনেরও প্রচুর সময় পেলেন। গড়ে উঠলো ঘরের বাইরে ঘর, স্বদেশের বাইরে স্বদেশ। মারিয়ার মধ্যে।

ক্রমে দুজনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত বিন্দুতে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বোধের সূক্ষ্ম কাঁটা, এই যুগ্ম জীবনযাত্রার একটা স্বাভাবিক সামাজিক ফলশ্রুতির ধারণা দু জনেরই মনে উঁকি দিয়ে এক তীরে আলো, আর অন্য তীরে আঁধার বিছিয়ে যাচ্ছিলো। এক জায়গায় আশা, অন্যত্র উদ্বেগ।

সদ্য যুবা অনুপম দু বছরে পূর্ণ যুবক হয়ে উঠেছেন, আর মারিয়ার মধ্য-যৌবন ক্রমেই ঢলছে পশ্চিমে। ইতিমধ্যে তাঁর থীসিস টাইপ করতে শুরু করেছে মারিয়া। এটা তার সন্ধ্যাবেলার উপরি উপার্জনের পথ ছিলো। অবশ্যই অনুপমের জন্য অন্য ব্যবস্থা। কেবলই দিয়ে, দিয়ে, তাঁকে আরো, আরো জড়িয়ে ফেলেছে মারিয়া। এবং সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ার কৃপার জালে পাশবদ্ধ জানোয়ারটি মুক্তির জন্য কেবলই ছটফট করেছে অনুপমের মধ্যে।

অনুপম বুঝেছিলেন রায়বাড়ির দেবশাসিত নিরিমিষ হেঁশেলে এই মধ্যবয়সিনী স্বাস্থ্যবতী ইহুদী কন্যার স্টিলেটো হীলের জুতো ঢুকবে না। কিন্তু কোনো জাদুমন্ত্রে তাও যদি বা মানিয়ে যায়, সবচেয়ে বেশি করে যেখানে সে মানাবার নয়, তা হলো অনুপম রায়ের জীবনে। তাঁর জীবনে অন্য এক ইচ্ছার শাসন অসম্ভব। মারিয়া, তোমার করুণার কেনা দাস হয়ে আমি বাঁচতে পারবো না।

এত বেশি উপকার করেছো মারিয়া, যে আমি তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না। আমাব দুর্বলতম মুহূর্তগুলির সাক্ষী তোমার বুক। তোমার ওই বুক আমি সঙ্গে সঙ্গে রাখতে পারবো না।

হঠাৎই মুক্তির অভাবিত সুযোগ এসে গেলো। দুম্ করে প্রেম করে পাড়ার মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে, নিরু একটা ক্ষমাপ্রার্থী চিঠি লিখলো দাদাকে—বাবার মৃত্যুর বছর দুয়েক পরেই। পাশ করে চাকরি একটা পাবামাত্র, সঙ্গে পাঠালো সালঙ্কারা নববধূর ছবি। ঠোঁটে তাব সলজ্জ প্রেমের মুক্তোর নোলকটি ছুঁয়ে রয়েছে, চোখে সৌভাগ্যের সাতনরী সুখ ঝলমল করছে। বীথির ছবি। ছবিটা দেখেই চমৎকার একটি বিদ্যুৎ খেলে গেলো অনুপমের মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থে।

BanglaBook.org

এই তো মুক্তির পরওয়ানা। চার বছর কেটে গেছে। ফেরার দিন বেশি দূরে নেই। থীসিস টাইপিংয়ের প্রথম ড্রাফট শেষ। ফাইনাল অর্শন অনাত্র টাইপ করাতে হবেই।

অনুপম ভাবলেন যা থাকে কপালে, দেখি একটা শেষ চেষ্টা করে।

প্রতিদিন টেবিল গুছিয়ে রাখে মারিয়া। বাংলা চিঠিপত্রগুলি যত্ন করে সাজিয়ে রাখে একধারে।

অনুপম একটা চিঠি আরম্ভ করলেন এয়ার মেল প্যাডের ওপরে, যে চিঠির কোনো দিন শেষ হবে না—

কেবল তার কোণে তারিখ আর ঠিকানা, এবং বাঁ দিকে একটি পাঠমাত্র: 'Darling', সেই ঔজের মধ্যে রাখলেন থীসিস দুখিটি, আর প্যাড গুঁজে রাখলেন কিছু এলোমেলো বই-খাতার তলায় আলতো যত্নে, অতি-মনস্ক অনাদরে, নিশ্চিত দ্রষ্টব্য হিসেবে লুকিয়ে।

তারপর সারা দিনের জন্য তিনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে চলে গেলেন, কাজ করতে।

ঠিক যেটি ভেবেছিলেন সেইটি হলো। রাত্রে বাড়িতে ফিরে দেখলেন কেঁদে কেঁদে মারিয়ার চোখমুখ ভিজে, মৌচাকের মতো ফুলো, লাল—অনুপমকে তার ঘরে পদার্পণই করতে দিলো না মারিয়া। একটা একটা করে ছুঁড়ে বাইরের দালানে ফেলতে লাগলো সে অনুপমের বই, খাতা, জুতো, শার্ট—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে ফোঁপাতে লাগলো, চাঁচাতে লাগলো—'আই শুড্ হ্যাভ নোওন ইট...অল্ ইণ্ডিয়ান্স আর চীটস্...লায়ার্স...'

অপরাধীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করলেন সেদিন অনুপম। মানভঞ্জনের পথে এগোলেন না। কী জানি, যদি ক্ষমাটমা করে বসে? যা পাগলের মতো প্রেমে পড়েছে মেয়েটা। সামনে হাঁটু মুড়ে বসে, যখন ওঁর কাঁধ দুই হাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছে আত্মহারা মারিয়া– 'কেন বলোনি, দেশে তোমার বউ ছিলো? কেন বলোনি? কেন? কেন? বলো, কেন বলোনি, আমাকে?' তখন কেবলই মেঝেয় ছত্রাকার ছড়ানো শার্ট, প্যাণ্ট, জুতো, খাতা, বইগুলো ঝেড়ে বেছে ভক্ত করে গুছিয়ে সুটকেসে তুলছেন অনুপম 'রয়', অবশ সংযত, শান্ত, ভদ্র গলায় পুনঃ পুনঃ বলছেন—'আহাঃ! হে মধুহৃদয়া, আমার প্রতি কর্ণপাত করো। প্রেয়সী, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। লেট মি এক্সপ্লেইন, ডার্লিং লিসন টু মি, সুইটহার্ট!'

কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। একবারও খণ্ডন করলেন না মারিয়ার উন্মাদ অভিযোগের রাশি। বরং, 'ঠিক আছে, যখন তুমি শুনবেই না, তাহলে আমার আর বলেও কাজ নেই। এই আমি বিদায় হলুম, মারিয়া, ডার্লিং, আর কোনোদিনও তোমাকে বিরক্ত করবো না। অনেক ধন্যবাদ, এ্যাণ্ড লুক আফটার য়োরসেল্ফ' এই বিদায় শুভেচ্ছাবাণীর সঙ্গে ক্ষুব্ধ আহত, প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের কুঞ্জবন পরিত্যাগের করুণ দৃশ্যে যবনিকাপতন হলো। তল্পিতল্পা নিয়ে 'তপ্তহৃদয়' 'রয়' জেফের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সকলেই শুনলো, অকারণে ঝগড়া করে মারিয়া 'রয়'-কে তাড়িয়ে দিয়েছে থীসিস সমাপ্তির সংকট-মুহূর্তে। অনুপমের বন্ধুদের মধ্যে সহানুভূতির বান ডাকলো—কী ইংরেজ, কী ভারতীয় প্রত্যেকেই বললো এই ইহুদী জাতটাই কত পাজী, কত অসার। মহামতি হিটলারের 'প্রণালী'টা কিঞ্চিৎ ভ্রান্ত হলেও মূলত তিনি যে 'ভুল' করেন নি, এই বিষয়েও আলোচনা কম হলো না। অনুপম দেখেছেন, একটা সূত্র পেলেই হলো, অমনি কী শাদা কী বাদামী কী কালো সব চামড়ার নিচ থেকেই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে ইহুদী-বিদ্বেষের উইয়ে-খাওয়া মাটি। সেই উই-মাটিতে ঢেকে গেল মারিয়া এপস্টাইন।

না, এজন্য তিনি নিজেকে দোষী করেন নি। ওঁর কোনো বিবেক-যাতনা ছিলো না। মারিয়া কেনই-বা অতোটা প্রেডিকটেবল হবে? অতো ভাবাবেগ-প্রবণ ছকে-বাঁধা নির্বুদ্ধিদের কে বাঁচাবে ধ্বংসের হাত থেকে?

মারিয়া, বোকা মেয়ে, এও বোঝেনি যে এতে তোমারই ভাল করা হলো। তোমার সমাজে তোমার মুখটা রইলো। তোমাকে প্রত্যাখ্যাতা রমণীর ভূমিকা না দিয়ে, তেজস্বিনী প্রত্যাখ্যানকারিণীর

BanglaBook.org

ভূমিকায় রাখলাম। একে কি কনসিডারেশন বলবে না?

কনসিডারেশন বই কি! ধরা যাক নলিনী দেশপাণ্ডের কথাই। যে যখন বোম্বাইয়ের বহুতল হোটেলের খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে বলছে—'অনুপম, আমি কিন্তু এক্ষুনি ঝাঁপ দেবো'—সামনে কালো সমুদ্রের বুকে আলেয়ার মতো অলৌকিক চকমকির দিকে তাকিয়ে অনুপমের মন বলেছিলো—'তাই দাও।' কিন্তু মুখ? নলিনীর সামনে নতজানু অনুপম বললেন—'শোনো, নলিনী, শোনো, আমি তোমার যোগ্য নই। তোমরা শিশু দুটির কথা ভাবো। পাপ্পু-গুড্ডির সঙ্গে দাঁড়িপাল্লায় আমাকে রেখে দ্যাখো আমি কতো হাল্কা, কতো তুচ্ছ। তোমার জীবন অনেক দামী। নলিনী, তোমার ছেলেমেয়েদের মুখ মনে করো। কতো অনুপম আসবে যাবে তোমার জীবনে, আমি কি এতই মূল্যবান?' উন্মাদিনী, উগ্রচণ্ডা, অশ্রুরক্তাক্ত নলিনী তখন কাঁপা হাতে একটা দুর্বল চড় কষিয়েছিলো অনুপম রায়ের মহার্ঘ কপোলদেশে। ফস্ করে বুকের মধ্যে জ্বলে উঠেছিলো প্রচণ্ড ক্রোধ—কিন্তু আরো শান্ত, আরো মধুর স্বরে অনুপম বলেছিলেন—'মারো যত খুশি আমাকে তুমি মারো নলিনী, বাট্ জাস্ট থিংক অফ পাপ্পু এ্যাণ্ড গুড্ডি!'—মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল নলিনী। উঠে দাঁড়িয়ে ডিক্যান্টার থেকে এক পেগ ব্র্যাণ্ডি গড়িয়ে এনে ঠোঁটের কাছে ধরেছিলেন অনুপম—'খেয়ে নাও তো লক্ষ্মী মেয়ে, ইউ নীড ইট্ নলিনী!'

এক ঘণ্টা পরে মুখ ধুয়ে, মুখে চুনকাম রং তুলির কাজ মেরামত করে নিয়ে নলিনী দেশপাণ্ডে একাই ফিরে গিয়েছিলো নীড় পথ—ম্যাবিন ড্রাইভ থেকে পালি হিলস। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে অনুপম রায় তখন কাগজপত্তর খুলে বসেছিলেন। পরের দিন সকাল নটায় তাঁর বক্তৃতা ছিলো।

অনেক বছর পর সুরেশ্বর বলেছিলো মারিয়ার টুপির ব্যবসা উঠে গেছে। মারিয়াকে মাঝে মাঝেই নাকি একটা মেন্টাল হোমে কিছু সময় কাটিয়ে আসতে হয়—সেই নার্ভাস ব্রেকডাউনটা ঠিক সামলে উঠতে পারে নি আর মারিয়া।

তুমি আত্মরক্ষার কৌশলাবলি শেখোনি কেন মারিয়া? বট ওয়জ মোর লাইক আগেইনস্ট মাইন, মারিয়া। কলকাতায় তোমাকে নিয়ে এলে আজ আমার জীবন কেমন হতো? তুমি হয়তো ভেসে উঠতে, কিন্তু আমি তো ডুবে যেতুম। জীবন বড়ো কঠোর মারিয়া, তুমি তো ডারউইন সাহেবের তত্ত্ব জানো। সে-ই টিকে থাকে যে সব চেয়ে বেশি যুঝতে পারে! আর যুদ্ধ মানেই কারুর বিরুদ্ধে লড়াই—সত্যি তো যুদ্ধক্ষেত্রে 'নির্বৈর' আমরা হতে পারি না, বরং বৈরী বানিয়ে নিই, জেতার প্রয়োজনে।

যুদ্ধ এড়াতে হলে বনবাসে যেতে হবে মারিয়া, সমাজ মানেই যুদ্ধক্ষেত্র। দু পক্ষই তো জয়ী হয় না, একপক্ষ হেরে যায়। কেউ জন্মায় খাদ্য হয়ে, কেউবা বা খাদক। জগতে কেবল খাদকরাই বাঁচে। অথচ তোমরা তো লড়িয়ে জাত, টিকে থাকার বিদ্যে পৃথিবীতে ইহুদীদের সবচেয়ে বেশি জানা। সেই শিল্প তুমি কেন শেখোনি মারিয়া? তুমি দুর্বল। তাই তুমিই দোষী।

॥ ২২ ॥

ঘুম পাচ্ছে। এবারে হয়তো সত্যি ঘুমিয়ে পড়বো। রণক্লান্ত? আমার যুদ্ধ কিসের সঙ্গে? আমি যোদ্ধা, সন্দেহ নেই। নানা জটিল যুদ্ধপ্রণালী ব্যবহার করি জীবনে, সত্য। নিরু যা করে না। নিরুকে তো আত্মরক্ষা করতে হয় না, সে তো ক্ষত্রিয় নয়। আমাকেই সর্বক্ষণ বর্মচর্ম পরে থাকতে হয়। দিগ্বিজয়ে বেরোনোর দাম অতন্দ্র প্রহরায় থাকা। নিরু তো দিগ্বিজয়ে বেরোয় নি, নিরুদ্বিগ্ন গার্হস্থ্যে শান্ত আছে। কিন্তু আমার যুদ্ধ কার সঙ্গে? লা-মাঞ্চার সেই মোহন পাগল আমি নই। আমার যুদ্ধ ঘাস, ভেড়া, উইন্‌ডমিলের বিরুদ্ধে নয়। মানুষের যুদ্ধ মানুষের সঙ্গে।

ভেবেই ভীষণ লজ্জিত হলেন অনুপম রায়ের শান্তিবাদী অন্তরাত্মা। আমার অভিযোগ তো সিস্টেমের বিরুদ্ধে। মানুষের বিরুদ্ধে নয়। তবে, কেন, কেন আমার এই অন্তহীন শত্রু? এ

BanglaBook.org

তো সিস্টেম বদলানোর সংগ্রাম নয়, এই অবিচ্ছেদ্য যোদ্ধবেশ, এ তো ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার প্রণালী। আমি কি তবে কাউকে ভয় পাচ্ছি? কাকে?

অনুপমের হাত-ঠোঁট দারুণ নিশপিশিয়ে উঠলো সিগারেটের আগ্রহ চেয়ে—কিন্তু চুলের মধ্যে মায়ের জাগ্রত হাত হঠাৎ মনে পড়িয়ে দিলো ডাক্তারী বারণ।

এই তো এইবার শুরু হয়ে গেছে পাঞ্জার লড়াই। অনুপম, মুঠো এবার শক্ত করবে, না, মুঠো আলগা করবে?

যদিও এ খেলা তোমাকে খেলতে হচ্ছে নিয়তিরই পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মে তবু একবার বিনীত চেষ্টা করে দ্যাখো। এবার বরং নীতি বদল করো। মানুষী যুদ্ধের নীতি এখানে চলবে না। কেননা শত্রু এখানে ভিন্ন গোত্রের। এখানে দর্প নয়। অনুপম, এখানে হয়তো বিনয়ই প্রকৃষ্টতর অস্ত্র। অনুপম, তোমার বিখ্যাত বুদ্ধিবৃত্তি কোথায় গেল? 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'—বুদ্ধি খাটিয়েই এবারে বরং বুদ্ধিটাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখো গোঁয়ারের মতো একই অস্ত্রে বারতীয় শত্রুকে পরাস্ত করতে যেও না। দেবতাদের তুষ্ট করে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র, পাখি মারার ছররা দিয়ে যেমন বাঘ শিকার করা যায় না, এও তেমনি। এ নতুন যুদ্ধে তোমার চাই নতুন অস্ত্র। অনুপম, মাথা ঠাণ্ডা করো। বুকের ভেতর হাত চালিয়ে দাও অনুপম, দ্যাখো তো খুঁজে, কী কী তোলা আছে সেখানে? কী কী অস্ত্র? কী কী ঐশ্বর্য? চলো অনুপম, দ্যাখো তো কোথায় আছে তোমার ছেলেবেলার শমীবৃক্ষ?

মাগো, তুমি কেতাবিবিদ্যেয় অশিক্ষিত, ঘরের কোণেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে জ্যাঠাইমার বিপুল বিক্রমের তলায়। অথচ কতো সহজেই বলতে পারলে, 'যাতে মন সাড়া দেয় না সে কাজ করতে নেই অনু', কতো সোজা করে বললে—'প্রাণ বাঁচানোর জন্যেও নিজের কাছে নিজের মুখ ছোট করতে হয় না'—মা, তুমি কার কাছে এসব বিদ্যে শিখলে? আমি বললুম—'জ্যাঠাইমাকে তুমি সহ্য করো কী করে?' তুমি কতো অনায়াসেই বলে দিলে—'আহা, ও বেচারা দুঃখী মানুষ, সারাটা জীবনই ঠকে এলো, বুঝতেও পারলে না যে বটঠাকুর ওকে ঠকালেন। ওকে কখনো আরো দুঃখ দিতে আছে?' আমার বুদ্ধির বড়াই বৃথা। মা, আমি তো বুঝিনি এতোদিন যে জ্যাঠাইমার কৃপার পাত্রী তুমি নও। কোথায় পেলে তুমি ক্ষমা, করুণা, ধৈর্যের এই সব চোখা-চোখা তীরের গোছা? মা! যা যা করতে নেই, তোমার অনু যে ঠিক তাই-ই করেছে। তোমার অনু যে তুচ্ছ প্রাণটা বাঁচাবার জন্যে একবার নয়, বারবার বারবার নিজের মুখ নিজের কাছে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। মাগো, আমার ভ্রান্তির শেষ নেই, আমার ভীরুতার শেষ নেই।

সমীর, সোমেন, দীপু, শাদল, আশিস্—আমাকে কৃপা করো তোমরা। আমি তোমাদের ঘৃণারও যোগ্য নেই। মারিয়া, নলিনী, কমলকলি, মেনকা, আমাকে ক্ষমা করো তোমরা। আমি দুর্বল। আমি স্বার্থপর।

বাবা, আমার একমাত্র মুক্তির পথ: আমি তো আপনারই সন্তান! রক্ত? রক্ত কি তার কাজ করবে না? ক্রোমোজমস? অপি, চে সুদুরাচারো...বাবা, মনে পড়ে, আপনি যে বলতেন, ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি? বাবা, এই পাপী আপনারই সন্তান, এই হতভাগা কি বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে না?

এবারে ঠিক এই নোংরা পোশাকটা খুলে ফেলে আমি আপনার মতো পট্টবস্ত্রে অবগাহন স্নানে যাবো বাবা, আমার সব অশুচিতা আপনার পবিত্রতায় ধুয়ে কি যাবে না?

মদীয় পিতৃদেব ঈশ্বর কৃষ্ণচৈতন্য ভট্টশর্মণ, শুনুন—আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, এবার আমি নতুন করে শুরু করবো, আপনার চেনানো নক্ষত্রের আকাশ এখনও আমার অপরিচিত হয় নি, আপনার শেখানো গায়ত্রী আমি পৈতে ছিঁড়েও ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছি কৈ?

BanglaBook.org

বিকেলে ফোন করে আমি ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা বেচে দেবো। বাবা আমি ও পাড়ায় আর যাবো না।

অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

কিন্তু নিরু তোর সেই সবুজ ঘুড়িটা, যেটা কেটে দিয়েছিলুম বলে তুই অমন অঝোরে কেঁদেছিলি, সেটা তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না রে!

—'আপনার ফোন এসেছে, দাদাবাবু।' হাঁং করে ঘুমটা ভেঙে গেল অনুপমের। ঘুমোচ্ছিলেন? হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছিলেন। মাথার কাছে তো মা নেই। মা কি ছিলেন? মা এসেছিলেন কি আজ—? 'কত করে মা বারণ করলেন ডাকতে, কিন্তু ওরা বলছে ভীষণ আর্জেন্ট কল। কাগজের অফিস থেকে মিস্টার দত্তর।'

ঘুমে ভারী পা থেকে মাথা পর্যন্ত টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ফোন ধরলেন। আর্জেন্ট? আবার কী হলো?

—'হ্যালো! মিঃ দত্তর? রয় স্পীকিং। ইয়েস্?'

ফোন নামিয়ে রেখে অনুপম শুনতে পেলেন মার উদ্বিগ্ন স্বর। —'কি বাবা, কিসের অতো জরুরি ফোন বল তো? থাক, থাক, কথা বলিসনি, এই শেলেটে লিখে দে।'

অনুপম লিখলেন: 'নিরুকে একটা ফোন করো।'

—'কেন বাবা? খারাপ কিছু?' মা শ্লেট এগিয়ে দিলেন। অনুপম লিখলেন—'আমি নাকি একটা প্রাইজ পেয়েছি। ম্যাগসেসে পুরস্কার। দশ হাজার ডলার। প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা।'

—'হরে কৃষ্ণ হরে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। জয় রাধামাধব! ঠাকুর! তোমার দয়া!' শ্লেট চুলোয় গেল, ভাঙা গলায় ধমকে উঠলেন অনুপম রায়—'এটা ঠাকুর দেবতার ব্যাপার নয়, কূটনীতির ব্যাপার। ভারতবর্ষকে একটা প্রাইজ দিতে হবে, দাও লাগিয়ে! মাত্র এই। আমার কোনই ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নেই এতে।'

—'সবই ঠাকুরের দয়া, বাবা। ভারতবর্ষে তো আরো অনেক মানুষ ছিলো, আমার রোগাভোগা ছেলেটাকেই তারা বেছে নিলে কেন? অন্তর্যামী মনে তোমার বাবাকে প্রণাম করো বাবা, জয় রাধামাধব...'

অনুপমের মনে হলো এখন নিচু হয়ে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণাম করা কর্তব্য। দর্জিপাড়ার ঝুলকালিমাখা কড়িকাঠের নিচে, নোনাধরা দেওয়ালের মধ্যে, কিংবা চকমেলানো উঠোনের ওপরে সেইটাই স্বাভাবিক হতো। অনুপম খুব ইচ্ছে করলেন, আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই প্লাস্টিক পেইন্টের ডিমের খোসা-রং গারদে, কার্পেটে পিছমোড়া মেঝেয় দাঁড়িয়ে তাঁর কটি এবং জানু শৃঙ্খলিত, শিলীভূত। দুর্লঙ্ঘ্য ললাট কিছুতেই ভূমিস্পর্শে রাজী হতে চায় না। অনুপম ভাবলেন আজ যদি তোমার জন্মদিন, কিংবা বিজয়াদশমী, কি নববর্ষ হতো, তাহলে তো তুমি প্রণাম করতে পারতে? বৈষ্ণববাড়ির সন্তান, তোমার বিনয়ে এতো লজ্জা? প্রণামে এতো সংকোচ? তুমি না বলেছিলে, অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু? মনে করে নাও আজই বিজয়াদশমী, অনুপম, মনে করো, আজ তোমার জন্মদিনও—অনুপম, আজ কেন নববর্ষ নয়?

অনুপম ডাকলেন—'মা?'

চলে যেতে যেতে দরজা ধরে ঘুরে দাঁড়ালেন বেলারাণী, পায়ের কাছে নিচু হয়েছে—ও কে? আমার অনু? অনুপম?

॥ ২৩ ॥

'দিউস্ এক্স মাখিনা'। কপিযন্ত্রে চড়ে স্বর্গলোক থেকে দেবদেবীরা রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে আবির্ভূত

BanglaBook.org

হন বরদান কিংবা শাপদানের উদ্দেশে। অথবা নায়ক-নায়িকাকে পরীক্ষা করার জন্য। অনুপম রায় এটা মনে করে মৃদু হাসলেন। আসন্ন সংকট থেকে নায়কের মুক্তি পাবার উপায় প্রায়শই এই দিব্য যন্ত্র। আবাল্য তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়ে আসছে। শেষরক্ষাটা হয়ে যায় ঠিকই। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্তরাল থেকে সেই কপিকলের দড়িটা টানতে হয়েছে সদাসতর্ক অনুপমকেই স্বয়ং। ম্যাগসেসে তাঁর জীবনের বৃহত্তম দৈবযন্ত্র হয়ে মঞ্চে নেমেছে, তবে এর বেলায় তফাত দুটো। প্রথম তফাত এই: এবারে দড়িটানাটানির নেপথ্য দায়টা একেবারেই তাঁর নিজের ছিলো না। অন্তরালে আছেন আর কেউ। মা বলবেন, রায়বাড়ির সর্বেসর্বা সেই মূককে-বাচাল-করা ম্যাজিশিয়ান রাধামাধবজীউ দাঁড়িয়ে আছেন উইংসের আড়ালে দড়ি হাতে, ব্যাঘ্র গদদঘর্ম, গলদকরুণ। কিন্তু অনুপম জানেন ব্যাপার আসলে কাক এবং তালের। র‍্যানডম ফোর্সের ব্যাপার। কিছু লোক যেমন দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়, কিছু তেমনি আছে সৌভাগ্যপ্রবণ। যারা জুয়ায় জেতে, প্রেমেও জেতে। যাদের উপকার করতে আকুল দেবতারা হামেশাই, অন্তত কপিযন্ত্র ধার করেও, ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। অনুপম জানেন, তিনি এই ভাগ্যবানদের একজন। আজন্মই জীবন তাঁকে কুর্নিশ করে গেছে। জীবনের কাছে একটা স্পেশাল ট্রীটমেন্ট পেতে তিনি অভ্যস্ত। অতএব উদ্বেগের মুহূর্তে এই ম্যাগসেসের মোহরের থলি কুড়িয়ে পাওয়াটা তাঁর বিশেষ বিস্ময়কর লাগলো না।

তবে এবারটা সবই আলাদা। এটা ঠিক ভাগ্য না দুর্ভাগ্য বোঝা যাচ্ছে না। মজা একটা অবশ্যই আছে। এক্ষেত্রে আয়রনি এই, যে পুরস্কারটা যে-সে নয়, খোদ ম্যাগসেসের নামে। যে ভদ্রলোকের উগ্র দক্ষিণপন্থা বিশ্ববিদিত। কম্যুনিস্ট নিধনযজ্ঞ নিয়ে এককালে অনুপম নিজেই কি কম লেখালিখি করেছেন। অনুপমের সব মনে পড়লো। সেই ম্যাগসেসে। ফিলিপাইনসের টাকা মানেই...আপন মনেই একটু হাসলেন মার্কসবাদী রাজনৈতিক বিশ্লেষক অনুপম রায়। ভাল! বা! বেশ! মজা মন্দ নয়। হা অনুপম! এবারের খেলা সত্যিই আলাদা!

কিন্তু এর তো প্রয়োজন ছিলো না।

দ্বিতীয় তফাত এটাই। টাকার ব্যবস্থা তো হয়েই গিয়েছে ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাট থেকে। সমস্যা চুকে যাবার পরে কেন এই দেবতাদিগের মতো আগমন? কী এর উদ্দেশ্য? অবশ্য এর ফলে, ধ্বক করে খেয়াল হলো অনুপমের, ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা আর না বেচলেও সম্ভবে। তাহলে এটাই বোধহয় উদ্দেশ্য? সুকুমার চক্রবর্তীর সেই বক্রহাসি তাঁকে ধরতে ছুঁতে পারলো না—সাধের ফ্ল্যাট আর বেচতে হলো না! মন্ত্র এই? এতোই সরল? নিশ্চয় কোনো গভীরতর ষড়যন্ত্র আছে—এটা বরদান, না শাপদান? না কি পরীক্ষা?

কী আশ্চর্য! এটাও খেয়াল হয়নি? অনুপমের চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠে গেলো। সুকুমার চক্রবর্তীর বক্রহাসির ভয় এখন, এই ম্যাগসেসে প্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশ হয়ে যাবার পরে, আর তো থাকা উচিত নয়? এখন উনি ফ্ল্যাটটা যদি নাও কেনেন তবু তাতে তাঁর অক্ষমতা বোঝাবে না। তাঁর সামর্থ্য তো 'পাবলিক নলেজ' হয়ে যাবে অচিরেই।

তবে আর কি? মুক্তি! 'ক্যামেলিয়া এ্যাপার্টমেন্টসে' আর, আর যাবেন না শ্রীঅনুপমকৃষ্ণ ভট্টশর্মণ। অবশ্য রায়বাড়িতে আর ফিরবেন না। এই সহজ বাঙালি মধ্যবিত্ত পাড়ায় যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। কে জানে, আস্তে আস্তে আবার হয়তো একদিন তাঁর 'ট্যাক্সি' শুনলেই মনে হবে—'ইস্টিশান? না হাসপাতাল? ইমার্জেন্সি!'

ম্যাগসেসের টাকাটা সবটাই দিয়ে দেবেন। ফ্ল্যাটের টাকাতেই বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা খুব ভালভাবে হয়ে যাবে।

পঁচাত্তর হাজার। প্রথমে খবর নিতে হবে ওটা ট্যাক্স ফ্রী নাকি। যদ্দূর মনে হয় তাই হবে, তবু আয়করের পাওনা যদি কিছু থাকে, হিসেব করে সেটা আগে সরিয়ে রেখে বাকিটা থেকে মারিয়া, তোমার মতো মেয়েদের জন্যে সরকার-পুলে একটা বেড—তাতে পনেরো, অম্বরের

BanglaBook.org

নীখাল এইডে জেল হাজতের তরুণ রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে পনেরো, মাদার টেরেসাকে অবৈধ মাতৃত্বের শিকারদের জন্যে পনেরো, আর মূকবধিরদের ইশকুলে পনেরো --এই দিয়ে আমার ছুটি যদি আরো কিছু বাঁচে, দিয়ে দিলেই হবে অন্ধদের ইশকুলে।

ইন্দ্রিয়-সংযম এক দুর্লভ দৈব—আর ইন্দ্রিয়শূন্যতা এক দুর্দৈব। জন্তুজানোয়ারেরও ইন্দ্রিয়াদি থাকে। চক্ষু-কর্ণ-বাক সেই প্রাথমিক জৈব দাবী। প্রাণীমাত্রের মৌল দাবী। 'বেসিক নীড্স'। আর অভাব ভয়াবহ দুর্বিপাক।

বেসিক নীড। আচ্ছা, অজিতনারায়ণ কোথায় গেল। অজিতনারায়ণের 'বেসিক নীড'টা পূরণ করার সুযোগ আর হয় নি।

গড়িয়াহাটের মোড়ে ছিন্নভিন্ন ন্যাকড়াপরা, ধুলোকাদায় বিবর্ণ দেহ, ফুটো, কেডস্ জুতো পায়ে যুবকটি একদিন এগিয়ে এসে পিচুটিভরা চক্ষু পাকিয়ে অনুপম রায়কে স-তর্জন প্রশ্ন করেছিলো: 'কিরে? অনুপম রায় না? চিনতে পাচ্চিস?'

পরমাশ্চর্য অনুপম বলেছিলেন: 'কিন্তু আপনি?'

—'তুই আমাকে চিনবি না। আমি তোর ঢের লেকচর অ্যাটেনড্ করেছি। কিন্তু তুই ব্যাটা আমার একটাও লেকচার অ্যাটেনড্ করিস নি। আ'য়াম অজিতনারায়ণ চাউড্রি।'

'আপনি কোথায়, মানে, লেকচারটা কোন্‌খানে দ্যান?'

—'এইখানে এই রামকৃষ্ণ মিশনে, আবার কোথায়? এত ভালো হল কি আর ওয়ার্ল্ডে আছে? আমি কি বিবেকানন্দ দ্যাট দে উইল্ সেন্ড মি টু শিকাগো? নাকি, আমি সি আই-এর পয়সায় ট্রাভেল করবো? নো! নট্ মি! সেটি পাবে না।' নিজের দীর্ণ বুকে টোকা মেরে চোখের কোণ দিয়ে প্রায় সাততলা উঁচু থেকে অনুপমের দিকে কৃপানেত্রে তাকিয়ে অজিত বলেছিলো—'আই অ্যাম আ সলিড পার্সন, টোটালি অনেস্ট। তোকে আমার প্রবন্ধগুলো দেখাবো। রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রাজিল, নিউগিনি, জাপান, কোরিয়া—কোথায় না ছাপা হয় আমার প্রবন্ধ? সেইসব পড়েই তোরা যতো বই লিখিস। অথচ ' এখানে অজিতের ঠোঁটে অভিমান উথলোয় 'অথচ একটা অ্যাক্‌নলেজমেন্ট তো কোথাও দেখলাম না!' চোখে জল আসে-আসে দেখে ব্যস্ত হয়ে অনুপম বললেন: 'তা আপনার প্রবন্ধগুলো কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে?'

—'কেন, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে? তাও জানো না? লাকা। তাছাড়া আমার রেসিডেনসেও আসতে পারো। মোস্ট ওয়েলকাম।'— সামনের উঁচু বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অজিত বললে—'ঐ যে আমার রেসিডেনস প্রত্যেক ঘরেই এয়ারকন্ডিশন লাগানো। অথচ কী আর বলবো ভাই অনুপম, বাথরুমের বড্ডো অসুবিধা!'—ঘনিষ্ঠ সুরে গোপন কথা বলার মতো বললো অজিত: 'এই আনসিভিলাইজড্ বর্বরদের মতো বাথরুমে যেতে বড্ডো কষ্ট হয়! একটা ফ্লাশিং সিস্টেমওলা বাথরুমের বন্দোবস্ত করে দিতে পারো? একটা দরজা, হিটকিনি, আর ফ্লাশিং সিস্টেম চাই। বলো দিকি, প্রিভেসি, আর স্যানিটারী প্রিভি—এগুলো সভ্য মানুষের বেসিক নীড কিনা? আমার সেটাই নেই!'

অনুপমের হঠাৎ লজ্জা করলো—রাস্তার লোকেরা কী ভাবছে, একটা বদ্ধ পাগলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন অনুপম রায়। উনি 'আ—চ্ছা:' বলে যেই রওনা দিয়েছেন, অজিত ছুটে এসে তাঁর জামা টেনে ধরে বললো: 'শোনো, আমার প্রেজেন্ট পি-একে আমি ওয়ান থাউজ্যানড দিই, তোমাকে থ্রি থাউজ্যানড দেবো। আমার নেকস্ট পি-এ অ্যাপয়েনটেড হলে তুমি। অদ্য হইতে অনুপম, ইয়ুল্ লুক আফটার মাই বেসিক নীড্স। ও কে?'

'বেশ তো, বেশ তো', বলতে বলতে তাড়াতাড়ি জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে পলায়ন করেছিলেন অনুপম।

তারপর থেকে গড়িয়াহাটে গেলেই অজিতের সঙ্গে দেখা হতো। অজিত বলতো, —'দ্যাখো

BanglaBook.org

তো পি-এ, কী কষ্টে আছি। তুমি তোমার কর্তব্য করছো না। মোটেই তুমি আমার বেসিক নীড্‌সগুলোর খবরদারি করছো না।'

একদিন বললো—'পি-এ, হাজার দশেক টাকা দাও দিকিনি? আমাকে একটু কন্টিনেন্টে যেতে হবে। রাসল আর সার্ত্রের সঙ্গে কথা বলতে হবে, আর অমনি ব্রেনটাও ইনশিওর করিয়ে আসবো—মার্লিন ডিট্রিশের যেমন ঠ্যাং দুখানা ইনশিওর্ড ছিলো মিলিয়ন ডলারে। সঙ্গে আমার পি-এ অর্থাৎ তুমিও যাবে। কই, ছাড়ো?'

অনুপম বলেছিলেন—'কিন্তু অজিতবাবু, বিশ্বাস করুন, দশ হাজার কেন, একটা টাকাও নেই আজকে আমার কাছে।'

—'ও কে, গিভ্ মি টু রূপীজ ফর দ্য টাইম বিয়িং!'

উত্তরে অনুপম তাঁর শার্টের পকেট উলটে দেখিয়েছিলেন। সেই প্রকট শূন্যতা দেখে অজিতের চোখে-মুখে আশ্চর্য মমতা ফুটলো।

—'আহারে, অনুপম রায়, তোরও এই অবস্থা? দীজ্ আর হার্ড টাইমস। দাঁড়াও, আই শ্যাল হেল্‌প য়ু। তারপরেই শতছিন্ন ন্যাকড়ার ফালির পরে ফালি সরিয়ে কোমরে বাঁধা একটা পট্টি থেকে বের করেছিলো এক টাকার একটি ময়লা নোট এবং কিছু খুচরো। খুচরো দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ এক ঠোঙা মশলা-মুড়ি কিনলো—আর সারাক্ষণ অনুপমের টেরিলিন জামার কোণটা টেনে রাখলো—'পালাসনি, দুটি খেয়ে যা—না খেলে ব্রেনটা ওয়র্ক করবে কেন?' নিজে এক মুঠো তুলে নিয়ে পুরো ঠোঙাটাই এগিয়ে দিলো অনুপমের দিকে। তারপরেই সেই ঘামে-ভেজা দুর্গন্ধময় নোটটা খপ্ করে অনুপমের বিচলিত, সঙ্কুচিত ঘর্মাক্ত মুঠোয় জোর করে গুঁজে দিয়ে বলল—'কীপ দিস্, টিল য়ু সী বেটার ডে-জ্।'

হলদে দাঁতের ছাংলা দেখিয়ে খুব সহানুভূতির হাসি হেসেছিলেন অজিতনারায়ণ চাউড্রি। রাজ্যের নীল বিষ নোংরা জমা লম্বা নোখে ভর্তি ময়লা হাতে বাড়িয়ে-ধরা ঝাল-মুড়ির ঠোঙা থেকে কিছুতেই মুড়ি তুলতে সক্ষম হন নি অনুপম রায়। বিনীত অনুনয় করেছেন—'আমার পেটটা ঠিক নেই অজিতবাবু। ওটা বরং আপনিই খান।'

—'ওঃ হো! এত অল্প বয়সে এই হজমশক্তি? এই আমাকে দ্যাখো দিকি?' হঠাৎ ফুটপাতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে দুই হাতে মুঠো মুঠো মুড়ি এতোল বেতোল মুখে পুরতে শুরু করেছিলো অজিত, কষ্ বেয়ে শাদা মুড়ি ছিটকে-ছটকে উপচে গড়িয়ে পড়তে লাগলো, যেন উপড়ে আসা দাঁতের মতো—মুড়ি বোঝাই মুখে বোঃ বোঃ করে হেসে উঠে অবজ্ঞায় হাত ঝেঁকে ঝেঁকে অজিত বলেছিলো: 'য়ু মে গো নাউ। য়োর সার্ভিসেস আর নো লংগার নীডেড। তুমি পারলে না। ইয়ু হ্যাভ ফেইলড।' কম্পিত চরণে এগিয়ে এসেছিলেন অনুপম রায়, ঘর্মাক্ত অঙ্গুলিতে অজিতের নোটটি সচন্দন বিল্বপত্রের মতো ধরা—'এই টাকাটা আপনিই রাখুন বরং, বাড়িতে আমার টাকা আছে।'

'সো? বাড়িতে টাকা রেখে আপিসে কেন শুধু হাতে আসো? টু বেগ, টু বরো, এ্যাণ্ড টু স্টীল? ও টাকা আমি নিচ্ছি না বাবা,—দিয়ে ফেরত নিলে কলীঘাটের কুকুর হয় জানো না? আমি আয়েশি মানুষ—আই ক্যানট অপট ফর আ ডগস লাইফ!'

হৈ-হৈ করে হেসে উঠে বাকি মুড়িটা গড়িয়াহাটের মোড়ে অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছিলো অজিত—একদল শাদা পাখিকে মুক্তি দেবার মতো, স্বচ্ছ আনন্দে। অগুন্তি শুভ্র অন্নকণিকায় ভরে গেল গড়িয়াহাটের ক্ষুধার্ত আকাশ-বাতাস। আর ঐ মুড়ি...শিলাবৃষ্টির প্রচণ্ডতায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে অনুপমের বোধশক্তিকে বিকল করে দিয়েছিলো। টাকাটা অজিতকে কিছুতেই ফেরত নেওয়ানো যায়নি

দরিদ্র বিধবার ছেলে, ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়তে পড়তে হঠাৎ পাগল হয়ে যায়,

BanglaBook.org

ওর মা ওকে ঘরে ধরে রাখতে পারেন নি। বাজারের দোকানীদের কৃপায় অজিতনারায়ণ ক্রমে হয়েছিলো গড়িয়াহাটের একচ্ছত্র অধিপতি।

ঐদিনের পরেই ত্রস্ত হয়ে এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে কথা কয়ে লুম্বিনীতে অজিতের ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলেন অনুপম রায়। যাতে ওর 'বেসিক নীড্'-গুলোর অসুবিধা অন্তত না হয়—'প্রিভেসি, এ্যাণ্ড স্যানিটারি প্রিভি'। কিন্তু তারপরেই গড়িয়াহাট থেকে উধাও হলো অজিত। অনুপম রায়কে একটি টাকা দিয়ে অনন্ত ঋণী করে রেখে। সেই বোধহয় তাঁর প্রথম পরাজয়।

তারপর থেকেই উনি রাস্তায় পাগল দেখলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। খোঁজেন। অজিত নয় তো? তাঁর উত্তমর্ণ নয় তো? সে কি বলছে: 'ইট্স আ ডগ্স্ লাইফ! আই হ্যাভ সাম বেসিক নীড্স!'

মুখে কথা বলা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু মনে মনে কথা বলা তো বন্ধ হচ্ছে না। বরং ঢের বেড়ে গিয়েছে। টাকা জুটছিলো না, সে ছিলো এক জ্বালা। এখন টাকা বেশি হয়েছে। এ আরো যন্ত্রণা। কাগজে রেডিওতে খবরটা প্রকাশ হবার পরেই জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে—জনগণের শুভেচ্ছাবাণীর বোঝা চাপবে কাঁধে। ঠিক এই সময়েই। ওঁর যখন কথা-কওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ! ফলে অপমানিত, ক্ষুব্ধ—শেষ পর্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ফিরে যাবে আজকের প্রীয়মান জনতা যাক, যে সমস্যার সমাধান তোমার হাতে নয়—সে নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করা বৃথা। হাতেই বা নয় কেন? উপায় আছে বৈকি! কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই হবে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ব্যাখ্যাপূর্বক। ওতেই সামলে যাবে।

একটা কর্ম-তালিকা প্রস্তুত করা যাক। এইবারে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তিন সপ্তাহ এখন কথা বলা বন্ধ। তারপরেই যাওয়া। কী কী বন্দোবস্ত করতে হবে? মন একাগ্র করো অনুপম, মনের শৃঙ্খলা কই তোমার? বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ। স্থির হও, চুলোয় যাক অন্য চিন্তা। কাজ করো! কাজের চিন্তা করো। কী কী তোমার করণীয় আপাতত?

॥ ২৪ ॥

দিবা, সম্পন্ন অন্ধকার। বেলা যদিও দ্বিপ্রহর, পর্দাটানা ঘরে মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা আর বিজন নৈঃসঙ্গ্য।

কেষ্টকে নিষেধ করা আছে, কেউ এলে যেন ডাকে না। খাতা পেন্সিল টুকে রাখছে নাম ঠিকানা, অভিনন্দনের উত্তরে চিঠি দেবেন পরে অনুপম রায়। কিন্তু একটিও কথা নয়। প্রত্যেক বাক্য, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে স্বরযন্ত্রের আয়ু নিঃশেষিত হচ্ছে। ডাঃ রায়চৌধুরীর কড়া বারণ। পরিপূর্ণ বাগবিশ্রাম ভিন্ন চিকিৎসা নিরর্থক।

হাতলের ওপর স্থাণু ডান হাতে, চোখের ওপরে বাম বাহু ভাঁজ করা, অনুপম শুয়ে আছেন তাঁর মায়ের প্রিয় আরাম কেদারায়। মনে মনে কর্মতালিকা প্রস্তুতি শেষ। উঠে নোটবইতে লিখবেন: ১। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২। এয়ার ইণ্ডিয়া ৩ ভিসার ফর্ম ৪। মেডিকেল সার্টিফিকেট ৫। ছুটির আবেদন ৬। নো-অবজেকশন লেটারের আবেদন ৭। রেডিওতে জানতে হবে 'রয়জ কর্ণার' আপাতত বন্ধ থাকবে অনির্দিষ্টকাল। যতদিন গলা না সুস্থ হয়।

অনির্দিষ্টকাল? যদি গলা আর সুস্থ না হয়? যদি গলা না ফেরে?...ধ্যেৎ, যদি আরো কিছু না ফিরলো?

এমন তো হতেই পারে, অপারেশনের সময় আরো কিছু বেরুলো? যা ভাবা যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি কিছু। তাছাড়া অপারেশন যে নির্বিঘ্ন, সরল এবং সফল হবেই তার কোনো গ্যারাণ্টি নেই। অন্তত ২০% রিস্ক যে কোনো অপারেশনেই থাকে। কেউ কেউ অ্যানাস্থেশিয়া থেকে আর জ্ঞান ফেরত পায় না, কারুর বা রক্তচাপ আকস্মিক অধঃপাতে চলে যায়। আর ফেরে না।

BanglaBook.org

ধরো, যদি একটা অবাধ্য রক্তের ডেলা তোমার ধমনিতে উজান বেয়ে হৃৎপিণ্ডের দিকে ছুটতে শুরু করে, সেই তৃতীয় যাত্রা রোধ করা প্রায়ই ডাক্তারির অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধরো যদি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে? ম্যালিগনেন্সির জন্য তোমার পরীক্ষা করা হয় নি।

কে জানে কোথায় কোথায় কোন্ বিস্ময়, কোন্ শত্রুতা, কোন্ আকস্মিকতা ওঁৎ পেতে আছে। অনুপম, এ হলো প্রকৃতির ব্যাপার—এ নন-হিউম্যান ফোর্সের সঙ্গে যুদ্ধ। বুদ্ধি এখানে কোনো অস্ত্রই নয়। একটি পুরনো চলচ্চিত্রের দৃশ্য হঠাৎ ভেসে উঠলো চোখে। মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলতে বসেছেন রাজা। এ খেলা তোমার শেখা নেই অনুপম।

ধরো যদি অনুপম রায়ের এই মাঝবয়সী ক্লান্ত দেহটাই কেবল ও. টি থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে? আপাদশীর্ষ দুধেল চাদরে মোড়া একটি বাতিল শরীর? কে ভার নেবে সেই নিরবলম্ব, দাবীহীন প্রবাসী দেহের?

একঘর অনাত্মীয় পরবেষ্টিত কোনো অজীবযোগ্য দ্বীপ-ফ্রীজের দেরাজে অনিশ্চিত কালক্ষেপ করবেন ভবিষ্যৎহীন ও বর্তমান খোয়ানো একদার অনুপম কে. রায়। যতদিন না মাননীয় ভারতীয় দূতাবাস নিজ দায়িত্বে একটা কিছু বিলি-ব্যবস্থা করছেন। নৈর্ব্যক্তিক, আইনসঙ্গত।

একটা ধবধবে থমথমে শাদা অট্টালিকার বিপুল অভ্যন্তর চোখে ভেসে উঠলো। করিডরের পরে করিডর...চারিদিকে ঝকঝকে শাদা ঝিনুকের খোলের মতো ছাদ, দেওয়াল, মেঝে—যাতে ছায়া পর্যন্ত পিছলে যায়, লগ্ন থাকে না কিছুই। দরজা নেই। সেখানে মোড়ের পরে মোড়, বাঁকের পর বাঁক ঘুরছে নগ্ন, একক, শুভ্র সাদর জড়ানো কোন মনুষ্য-শরীর ও সেই চরাচরব্যাপী রূপোলী করিডরের ঝকঝকে রূপোলী নৈঃশব্দ। স্তব্ধ-আয়ু জন-শূন্যতায় বিষম ভারী, বাতাসে এ্যানটিসেপটিক ওষধির তীব্র ওজন বাড়তে বাড়তে সমস্ত অস্তিত্বের নিঃশেষ, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, আর তখনই জেগে উঠলো সেই ধাবমান পায়ের শব্দ। ক্রমধাবমান, প্রতিধ্বনিত, কৌটোর মতো বদ্ধ বাতাসে সেই পলাতক পদশব্দের বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ বধির করে দিচ্ছে—দুই হাতে দু'কান চেপে ধরেছেন অনুপম—মুখব্যাদান করেছেন আর্তনাদের জন্য—হাতের পাতার স্বেদাক্ত জলজ স্পর্শ তাঁর অতীব উত্তপ্ত কানে শীতল ছ্যাঁকা লাগালো। অনুপম রায় জাগ্রত হলেন।

ওঃ কী গরম। বুলির মধ্যে যেন অগ্নিকাণ্ড চলেছে...ঈশ্, কী অস্বস্তিকর দিবাস্বপ্ন! কি মরবিড চিন্তা করছো অনুপম? সামান্য একটা অপারেশন হবে, মৃত্যুর প্রশ্ন ওঠে কেন? ভয় পচ্ছো? উদ্বেগ? ক্ষয়? ক্ষতি? যন্ত্রণা? কূর্ম যেমন সর্ব অঙ্গ সংহরণ করে তেমনি তুমি সকল প্রকার আবেগ সংবরণ করো। অনুপম, নিবাত দীপের শিখা যেমন কম্পিত হয় না, তুমিও তেমনি স্থির হও—বায়ুতাড়িত হয়ো না। মনে রেখো বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য...

তাই বলে একা একাই ঢুকে যেতে হবে অপারেশন থিয়েটারে? দরজার বাইরে অস্থির পদচারণা করবে না কেউ?

মা পড়ে থাকবেন দর্জিপাড়ায় রাধামাধবের পা ধরে। নিরু? ও বাবা! বীথির সন্তান জন্মের সময়ে নিরুর সে কী অবস্থা! প্রসববেদনা যে কার উঠেছিলো, পিতার, না, মাতার—তাতে তো সংশয়ই জন্মে গিয়েছিলো ডাক্তারের! না, সংকট-মুহূর্তের সঙ্গী নয় নিরু। তাহলে? তবে কি কেউই থাকবে না, দূর প্রবাসে, তাঁর আরোগ্যশয্যার পাশে? আর ধরো যদি সেটা 'আরোগ্যশয্যা' নাই হয়?...বলা তো যায় না, প্রত্যেকটা মেজর অপারেশনেই একটা এলিমেণ্ট অফ রিস্ক থাকে।

দূর! কী যে হয়েছে ইদানীং অনুপম, তোমার। আস্তাকুঁড়ে যেমন ভিড় জমায় ঘেয়ো কুকুর, রুগ্ন শরীরে তেমনি ভিড় করে রুগ্ন মনন। মরবিড চিন্তা দূর করার একমাত্র উপায় ইচ্ছাশক্তির বলপ্রয়োগ। চেষ্টা করো অনুপম, সর্বত্রারণি সংযমা মনোহৃদি নিরুধ্য চ, সুস্থ চিন্তা করো। এ ক্ষমতা তোমার আছে। থিংক অফ মোর ইউজফুল থিংস, নিজেকে অযথা প্রশ্রয় দিও না।

[খুনো অনুপম এই সময়ে খেঁক খুক-খুক করে হাসলো। মৃত্যুভাবনা মরবিড, সন্দেহ নেই,

কিন্তু মৃত্যুকে সামনে দেখেও না চিনতে পারাটা? সেটা বুঝি স্বাভাবিক? সুস্থ চিন্তা? সুধা বললো: সব রকম সত্যের জন্যই তৈরি থাকা উচিত। ঐসব আসলে আপনার সত্যকে এড়িয়ে চলবার কারচুপি। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু, এটা তো সায়েন্টিফিক ট্রুথ?]

থিসিয়ুসের গল্পটা মনে পড়ছে। আমারও অমনি একটা সুতোর গুলি চাই: মুঠোর মধ্যে সুতোর গুলিটা না নিয়ে আমি ভিয়েনায় ওই লাবিরিনথে ঢুকতে পারবো না, ঢোকাটা বুদ্ধির কাজ হবে না। বাবা, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমি ভীরু, আমি অধীর, আমি ঘরপোকাতক্কী, আমি পারিনি। আমি ছোটো থেকে জ্যাঠামশাইকেই জেনেছিলাম বুদ্ধি-নির্ভর আদর্শ মানুষ। কিন্তু ও সুতোর গুলিটা এখন ফুরিয়ে গিয়েছে বাবা।

এখন আমার আর একটা সুতোর গুলি চাই। মিনোটরের মুখোমুখি হবার মতো অস্ত্রবল আমার আছে, কিন্তু তারপর? বাড়ি ফেরার রাস্তা কে আমাকে বলে দেবে? আপনিই বলুন, উত্তরণের সূত্র না রেখে গোলকধাঁধায় প্রবিষ্ট হওয়াটা কি সমীচীন? জানি, আপনি নিজে তা পারতেন। আপনার উপবীতেই যে ছিলো নিশ্চিত উত্তরণের সূত্র।

কিন্তু আপনার তুলে দেওয়া সেই সুতোর গুলিটা ছোটবেলাতেই যে আমি ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। এখন সে আমার মুঠোতে ফিরবে কি? উত্তরণের উপায় আমাকে আজ নতুন করে অধীত হতে হবে। আমার সত্যকার উপনয়ন এতদিনে সমাগত। বাবা, এবারে আমি উপনীত হবো।

॥ ২৫ ॥

অনুপম রায়ের সজ্জিত, পরিচ্ছন্ন, রুদ্ধদ্বার ঘরে, দামী পর্দার ভারী ঘেরে পূর্ণ অর্ধদিবসও মধ্যরাত্রির মতো অসহায়।

পা দুটো সামনে মোড়াটায় তুলে দিয়ে, আরো একটু পিছন হেলে শুলেন অনুপম। তামাটে, রোমশ সুঠাম বাহুর খিল তোলা বইলো চোখের পাতায় ঢাকা খোলাটি তেমনিই হাতলে ঘুমন্ত।

...মনে মনে উঠে গিয়ে রাইটিং ব্যুরোর দেরাজ টেনে এনে নোটারের প্যাডটা বের করলেন...মনে মনেই বুলে ফেললেন পর্দেরের নামে যার নাম সেই প্রিয় কলমের টুপি...চোখের পাতা খুললো না, হাতও নড়লো না, শরীর স্থির হয়ে রইলো খাট-পালংক আদি অন্যান্য আসবাবের মতো, নিশ্চল।

কেবল ওষ্ঠাধর। সরু গোঁফের পুরুষালি ছায়ায় পাতলা দুটো ঠোঁটের পাতায় প্রাণবায়ু কাঁপতে লাগলো, থিরথির, খুব অল্প, খুব আস্তে, ইষ্টমন্ত্র জপের মতো গভীর নিবিষ্ট আত্মসমর্পণে, যেন কেউ না দেখে ফেলে, যেন কেউ না জানে...বিনা কলমে, বিনা কাগজে, বহু যত্নে অনুপম চিঠির খসড়ায় ডুব দিলেন, মনে মনে—

সুধা,

উত্তর দিচ্ছি ভেবে অবাক হয়ো না। তুমি কেমন আছো সুধা? আমি ভালো নেই।

সামনের মাসে ভিয়েনাতে আমার একটা অস্ত্রোপচার হচ্ছে। সামান্য ব্যাপার। তারপরে আমার স্বরশক্তি ফিরতে পারে, নাও ফিরতে পারে। আমি এখনই আর কথা কইতে পারি না, সুধা। কোনোদিনই কি পারতাম? হয়তো পরে পারবো। কিংবা হয়তো তার প্রয়োজনই হবে না। ধরো যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার সৃষ্টি হয়, আর যদি আমি না ফিরতে পারি, কেউ তো অবশিষ্ট আমিটাকে ফিরিয়ে আনবে?

সুধা, ধরো, যদি আমি নিজে আর পথ চিনতে না পারি, তুমি আমাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনবে না? 'না' বোলো না সুধা, বড়ো নিঃসঙ্গ, বড়ো নিঃস্বপ্ন, বড়ো নিঃস্ব এই আমি, অনুপম।

সুধা, শুনছো, যদি পথ হারিয়ে যায়, তবুও আমাকে ফিরতেই হবে। তুমি আমার সঙ্গে

BanglaBook.org

সঙ্গে থেকো, আমাকে পরিত্যাগ কোরো না, সুধা, আমাকে চিনছো? আমি...অনুপম।

সুধা, এটা কিন্তু তোমার উত্তর নয়। এটা আমার চিঠি। দূর, এরকম চিঠি কেউ লেখে? এরকম চিঠি কখনো লেখা যায়? না, যায়না। আমি পারব না যাব', আমাকে অন্য একটা সুতোর গুলির সন্ধান দিন। সুধা নয়। [ভুলো অনুপম বললো—কেউ নেই। অন্য কেউ নেই। আর কোনো বিকল্প পথ নেই তোমার। সুধা একমাত্র।]

ও কী...ও কে?...কে ওখানে?

ভয়ানক চমকে উঠলেন অনুপম রায়। এই নিঃসময়-তরঙ্গিত শব্দহীনতা ভেদ করে দরজায় কি টোকা পড়লো এইমাত্র?

রুদ্ধশ্বাস, শ্রবণসর্বস্ব অনুপম শুনছেন, হ্যাঁ। টোকা পড়ছে।

একবার। দুবার। তিনবার।

তিনটে টোকা। কিছু সময় চুপ। অনুপম গুণছেন। আবার তিনবার। ভিতরে কানায় কানায় ভরা উদগ্র নিঃসঙ্গতা হুলকে পড়লো বাইরে—

—'কে?'...প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠলেন রুদ্ধবাক, ভগ্নকণ্ঠ অনুপম রায়।

—'আমি, চা এনেছি।' বিস্মিত উত্তর এলো কেষ্টর। 'ভেতরে আসবো?'

—'ওহ্।' যেন কোন যুগান্তব্যাপৃত মোহনিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে অনুপম আস্তে আস্তে ডাকলেন: 'ভেজানো আছে। ভেতরে আয়।' ট্রে নামাতে নামাতে কেষ্ট বললো: 'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি?'

—'না তো।'

—'তবে? কাজ করছিলেন?'

—'নাঃ। কেন?'

—'কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছি। সাড়া-শব্দ কিছুই নেই।'

অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন অনুপম—'খেয়াল করিনি রে কেষ্ট।'

লজ্জা পেয়ে গিয়ে কেষ্ট বললো: 'না না, কথা কইবেন না, আমি ভাবছি কী হলো আবার...'

তারপরে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চেয়ে কেষ্ট আকস্মিক উদ্যমে সড়সড় করে টেনে ভারী পর্দাগুলো একপাশে সরিয়ে দেয়, খড়খড়ির ছিটকিনি খুলতে লেগে যায়।

—'জানলাগুলো খুলে দিচ্ছি, রোদ কখন পড়ে গিয়েছে। বিকেলবেলার বাতাস দিচ্ছে বাইরে।'

মুহূর্তেই আকাশ এসে ঘরের পূর্ণ অধিকার নিয়ে নেয়। এক ঝলক শেষ বেলার রোদ্দুরে হঠাৎ ঝলসে যান অনুপম রায়। সেই অলৌকিক অগ্নিকণ্ডে কেষ্টর চোখ ভয়ানক ধাঁধিয়ে যায়। পড়ন্ত সূর্য অনুপমের চুলে, কপালে, চোয়ালে, নাসার সুস্পষ্ট রেখায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জ্বলন্ত ব্রোঞ্জের সদ্য-গড়া ভাস্কর্যের মতো ধাতব অগ্নিময় সেই দৈব মূর্তিতে অনাত্মীয় বিভা...।

সেই তপ্ত প্রখর দৃশ্য কেষ্টর স্নায়ুজালের মধ্যে জট পাকিয়ে দিলো, চোখে ঝিঁ ঝিঁ ধরালো, ঘর ছেড়ে পালাবার জন্য পাশ ফিরতেই কেষ্টর নজর পড়লো অনুপমের মুখের ঘষোয়া দিকে। ছায়াময় নিদাঘক্লান্ত চামড়ায় যেখানে ফুটে আছে ইতস্তত দানা দানা ঘাম...

জোর করে টিপে রাখা চোখের কোণে বয়সের কাটাকুটি খেলা, কুঁচকে থাকা ভুরুর ওপারে সৈকতের মতো কপালে কাঁকড়ার শব্দহীন চলে-বেড়ানোর সূক্ষ্ম, সহস্র রেখায় রেখায় ভরা, গালে বৈকালিক দাড়ির ধূসর চন্দনের ফোঁটা, নাকের পাশ দিয়ে ক্ষতচিহ্নের মতো গভীর অবসাদের ভাঁজ নেমেছে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত...ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপছে...যেন স্বপ্নে দেয়ালা করছে শিশু...বিষণ্ণ? নাকি তৃপ্ত?...

কেষ্ট নিচু হয়ে অতি সাবধানে, দুর্মূল্য কাচের বাসন নাড়াচাড়া করার মতো সন্তর্পণে, খুব আস্তে ডাকলো—'দাদাবাবু?' কোনো সাড়া এলো না। কিছু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে, শব্দ না করে ঘর ছেড়ে গেল সে।

BanglaBook.org

খালি ঘরে, খোলা জানলায় প্রবেশ পেয়ে বিকেল বেলার বাতাস অনুপমের অস্থিমজ্জায় চিরকালের নিয়মে স্বচ্ছন্দ বিহারে মাতলো।

BanglaBook.org

প্রবাসে দৈবের বশে

উৎসর্গ

কাকাবাবু শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

কাকীমা শ্রীমতী প্রতিমা মিত্র

শ্রীচরণেষু

বিশাল কারুকার্য করা ভারী কাঠের দরজা ঠেলে নুড়ি বিছানো বাগানের রাস্তায় নেমে এল বিপাশা। ডাইনে মস্ত এক ফোয়ারা, যথারীতি নগ্ন পরীটরী সমেত, এবং যথারীতি শুকনো, নির্জলা। বিপাশার বেশ ভালো লাগলো। বাঃ! ঠিক দেশের মতন। পশ্চিম ইওরোপে ওর অভ্যেস হয়ে গেছে জল-ছলছল চালু ফোয়ারা দেখা। এই শুকনো ফোয়ারাটি বড্ডই মনে ধরল। শুকনো ফোয়ারা মানেই অভাব। বুদ্‌যেবিৎসে প্রাসাদের রাজকীয়তার কাল যে বিগত, তাতে আর কোনদিকেই সন্দেহ নেই! ডাইনোসরের কঙ্কালের মত কেবল পড়ে আছে বিপুল কাঠামোটা।

লাল কাঁকরের পথটা একটা নূপুরের মত প্রাসাদের শাদা পাথুরে পায়ে জড়ানো—তা থেকে বাচ্চাদের আঁকা সূর্যের ছটার মত নানান শাখা বেরিয়েছে, সবুজ বাগানকে টুকরো টুকরো কেকের মত কেটে চলে গিয়েছে দিগ্বিদিকে। একটা গেছে বাঁ দিকের ওই দোতলা বাড়িতে—ওটা আউট হাউস বোধ হয়। একটা গেছে ওই আপেলকুঞ্জে। যদিও আপেলমঞ্জরী এখনও ধরেনি, তবু অর্চার্ডটি বেশ দেখতে। ওখানে একটা ময়ূর চরে বেড়ায়। গোটাতিনেক টার্কী পাখির দলে। ময়ূরটা বাগানের ঘাসে কাল পেখম মেলেছিল। সেই দৃশ্য জানলা দিয়ে চোখে পড়ায় মিনিট দশেকের মত কনফারেন্স 'রিসেস' হয়ে গিয়েছিল। সকলে জানলায় দাঁড়াতে চাইছিলেন। বিপাশা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ময়ূরটাকে খুঁজলো। নেই। ময়ূরটাকে ওর খুব আপন লাগে, ওর নিজের লোক। দেশের লোক। টার্কী পাখির দলে, ময়ূরটাকে ঠিক যেন এই সাহেবদের মধ্যে বিপাশার মত, আলাদা দেখায়।

আরেকটা লাল রাস্তা গেছে দক্ষিণ পশ্চিমে সোজা বনটার মধ্যে ঢুকে। আজই এই লেখকদের সম্মেলন শেষ। আজ রাত্রেই তার চলে যাবার কথা একটা মফঃস্বল শহরে। সেখানে আরেকটা সভা আছে, বিভিন্ন স্কুলকলেজে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করবেন বিদেশী নবীন লেখকরা।

এই চিঠিটা তার আগেই ডাকে দেওয়া দরকার। যে রাস্তাটা সোজা পুবদিকে গিয়ে বিশাল লোহার গেটটায় মিশেছে, বিপাশা সেটাই বেছে নেয়। ওক গাছের ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে একটা চৌকিদারের ঘর। সেখানে বন্দুক হাতে একজন। আর গেটের দুদিকে দুজন দাঁড়িয়ে। সশস্ত্র প্রহরী। বিপাশা চিঠিটাকেই শক্ত করে ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়—বাব্বাঃ, কী বিরাট তালা—গেট দুটো মোটা শিকলি জড়িয়ে বাঁধা। মস্ত গেট, প্রায় আড়াই মানুষ উঁচু! বিপাশা ছোট্টখাট্টো, পুরো একমানুষও নয় সে। এইটুতেই বেশি বড়সড় জিনিসপত্র দেখলে ওর বুকের মধ্যে একটা উদ্বেগ, একটা অস্বস্তি হতে থাকে।

চিঠিটা কিন্তু ডাকে দিতেই হবে। পাঁচ-ছ দিন ধরে চেকোস্লোভাকিয়াতে আছে—বাড়িতে চিঠি দেয়নি সে। তার আগেও দিন কয়েক খুব ব্যস্ত ছিল, আসবার আগে—ইংলণ্ড থেকেও চিঠি দেয়া হয়নি। বাবা ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে যাবেন। বাবার আবার ভাবনা করা স্বভাব। বিপাশাকে পোস্ট অফিসে যেতেই হবে আজ।

তালাবন্ধ গেটটার সামনে এসে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে পড়ে, এদিক ওদিক তাকায়। এই বিশাল ফটক, এত প্রকাণ্ড তালা, মোটা শেকল, বন্দুক ঘাড়ে প্রহরী—এসব দেখেশুনে ওর হঠাৎ একঝলক মনে হয় যেন জেলখানার ভেতরকার বাগানে বেড়াচ্ছে। যেন গেট খোলানোর চেষ্টাটা হবে অবৈধ। সমীরের অবশ্য বেড়ানোর সুযোগ নেই। সে থাকে একলা কুঠুরিতে, অন্যভাবে। গেটের বাইরে দীর্ঘ বাঁধানো সড়ক চলে গেছে।

পুবদিকে—বিপাশা তাকিয়ে দেখে—দুদিকে গাছের সারি—মেপ্‌লা গাছের দুপাশে ছড়ানো রয়েছে মাঠ—বিপাশার চোখ খুব ভাল নয়—সে দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করে তুলে দেখবার চেষ্টা করে—মাঠ? না ক্ষেত? বন্ধ গেটের ভেতর দিক থেকে অনাবাদী মাঠের আর বড়স্ত ক্ষেতের চেহারা যেন একই রকম দেখালো।

জনশূন্য, দীর্ঘ রাস্তার শেষ প্রান্তে, একটা গনগনে লাল যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত সশস্ত্র সূর্য উদিত

BanglaBook.org

হচ্ছেন। কোন অবস্থাতেই স্বাভাবিক হতে অসুবিধা হয় না বিপাশার, আর সামনে যখন অতবড় একজন চেনাশুনো আপনজন—সূর্য। পাঁচদিন পরে এই প্রথম দেখা। দেখেই ফুর্তি ফিরে এল, বিপাশা সহজ পায়ে এগিয়ে গিয়ে চৌকিদারদের হাসিমুখে অভিবাদন জানিয়ে ইংরিজিতে অনুরোধ করে—"দরজাটা একটু খুলে দিন দয়া করে।"

ভাষাটা ইংরেজি হলেও বিপাশা পুলিসকে সর্বদা মনে মনে আপনি-আজ্ঞে করে। পুলিসরা সমস্বরে বলে ওঠেন—"সুপ্রভাত।"—"গুটেনমরগেন।"

দরজা খোলার কোন লক্ষণই কিন্তু দেখান না। বিপাশার জর্মনটা তত সুবিধের নয়। সে ফরাসীতে অনুরোধ করে—"দরজাটা মশাইরা একটু খুলে দেন যদি অনুগ্রহ করে।"

প্রহরীরা মোলায়েম হেসে বললেন—"হ্যাঁ, চমৎকার দিন।"

এবারে বিপাশা হেসে ফেলে। হাসলে তার ডান গালে একটা টোল পড়ে। প্রহরীরাও হাসেন বিপাশা একটু সাহস পায়। এগিয়ে গিয়ে, তালাটা নেড়েচেড়ে খাস বাংলায় বলে—"কি মশাই, তালাটা খুলে দিন না একটু—" চিঠিটা তুলে ধরে, রাস্তা দেখিয়ে বলে—"ডাকঘরে যেতে হবে "

এবার প্রহরীরা বোবেন—মাথা নেড়েচেড়ে জর্মনে বললেন—"দুঃখিত মহাশয়। হবে না পারমিশান চাই।" তারপরেই হঠাৎ নিসর্গশোভায় গভীর মনোনিবেশ ঘটে যায় তাদের। বিপাশা বুঝল—গেট খুলবে না।

তার এখন যা বয়েস, তাতে কুক্কুরীও সুন্দরী হয়, আর বিপাশার মুখখানা তো রীতিমত সুন্দর। কিন্তু ও তপস্বী-পুলিসের কাছে সুন্দর মুখেরও ঘোর পরাজয়।

বিপাশার মেজাজ খারাপ হল। দূর ছাই। ফিরেই যাবে তাহলে। পিছন ফিরেই চোখে ঝলমলিয়ে উঠল বিরাট একটা পাথুরে প্রাসাদ—ছেলেবেলায় বিদেশী 'ফেয়ারি টেল্‌স' এর বইতে যেমন দেখেছে ঠিক যেন তাই। পিঠের কাছে শেকলবাঁধা বিশাল লোহার ফটক, সামনে বিপুল প্রাসাদ। বুদমেরিংসে।—ব্রাটিস্লাভা থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে এই উনিশশতকী প্রাসাদ। এখন হয়েছে চেকোভাক রাষ্ট্রের সরকারী লেখক নিবাস, "রাইটার্স হোম"। এদেশের লেখক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীরা যে যাই লিখুন, সে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা নাটক-নভেল যাই হোক না, এখানে এসে তিন মাস ফ্রী থাকা খাওয়া এবং শান্তি পাবেন। যানবাহন বলতে বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি কিছুই নেই—কেবলমাত্র সরকার বাহাদুরের দাক্ষিণ্যেই সম্ভব এখানে আসা, এবং এখান থেকে যাওয়া বিপাশা ভাবল—"এই প্রাসাদ, এই বন্ধ তোরণ, এই সাজানো বাগান, এই ফোয়ার, ময়ূর, প্রহরীর দল— আর বন্দিনী রাজকন্যা, এখানে সবাই আছে, এখানে সবই আছে এখানে কেবল একজন রাজপুত্তুর চাই।"

ভেবে নিজেই হাসল। রাজপুত্তুর। দূর দূর। এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা দেশবিদেশের নবীন লেখক। লিখিয়েরা বাস্তবজীবনে কক্ষনো সাহসী হয় না। ওই কলমের ডগাতেই যা দুঃসাহস।

কিন্তু প্রাসাদে কেন এত রকম সুরক্ষাকৌশল? কী হবে এ দিয়ে? সমাগত বিদেশীদের কারুর হাতেই তো টাকাকড়ি নেই তেমন। সব হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে তবে ঢুকতে হয়েছে এই রাজ্যের সীমানায়। সরকারের দেওয়া জলপানি পকেটে নিয়ে। এখান থেকে কেউ কোথাও পালাতে পারবে না এক পায়ে-হেঁটে ছাড়া। তাছাড়া কেউ কি কাউকে কোনোদিন শিকলি পরিয়ে বাঁধতে পেরেছে? সমীর তো জেলে আছে। সমীর কি বাঁধা পড়েছে? মনে তো হয় না। যে পারে সে আপনি পারে, পরে শেকল ভাঙতে।

ভাবতে ভাবতে বিপাশা প্রাসাদের পিছনদিকে এসে উপস্থিত হয়। একটা চৌকো, বিশাল নীল মোজেইক করা চৌবাচ্চা। তাতে খুব নিচে অল্প জল রয়েছে। আর জলে ডজনখানেক

BanglaBook.org

লাল মাছ। বিপাশা ঝুঁকে পড়ে। —'হ্যাঁরে, এত ঠাণ্ডাতেও তোরা জমে মরিসনি? জল যতদিন না বরফ হচ্ছে, তোদের বুঝি ততদিন যমের ভয় করে না?'

—'এটা আসলে মাছেদের চৌবাচ্চা নয় মোটেই।' চমকে ফিরে তাকায় বিপাশা। সে মনের সুখে বাংলায় কথা কইছিল মাছেদের সঙ্গে, কেউ বুঝি দেখে ফেলেছে।

যোহান বলল দেড় মাথা উঁচু থেকে তার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে—'এটা একটা সুইমিং পুল ছিল। প্রাসাদবাসীদের জন্যে। এখন আর ব্যবহার হয় না।'

—'কে বললে ব্যবহার হয় না? এই তো দিব্যি ব্যবহার হচ্ছে। সুইমিং পুলই তো রয়েছে এটা। এতগুলো লালমাছ তবে কী করছে এখানে, এই জলের মধ্যে?'

জলের তলায় মাছেরা শব্দ শুনতে পায় কি? মাছেদের পিলে থাকে কি? থাকলেও তা চমকায় কি? পিলে-চমকানো হাসি হেসে উঠে যোহান বলল, —'বা, বেড়ে বলেছো তো? মাছেদের সুইমিং পুল। আশ্চর্য কথা! খুবই ডেকাডেন্ট ইমাজিনেশন বাপু তোমার। না বলেই পারছি না।'

শুনেই মাছেরা কুলকুলিয়ে ওদিকে সরে গেল। বিপাশাও চেষ্টা করলো খানিকটা সরতে। যোহানের মুখ থেকে বিয়রের গন্ধ বেরুচ্ছে ভুরভুর করে। বিখ্যাত চেক্ বিয়র। পিলস্নার। ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এমন 'আহা-মরি' করবার মতো আশ্চর্য কিছু কথা সে বলেছে বলে মনে হলো না বিপাশার।

যোহান বলল—'ওহ্! কী অপরূপ সকাল বেলা! এমন সূর্যস্নান সকাল বুদমেরিংসে খুব বেশি দেখে না।'

এই রে—হয়ে গেছে! বিপাশা এবারে ঠিক জানে, যোহান আর কী-কী বলবে। বলবে—'তুমিই এই সূর্যের প্রসাদ বয়ে এনেছো, এ তোমারি কবোষ্ণ সুষমার অসংগত বিচ্ছুরণ। এ তোমার স্বদেশ থেকে বয়ে আনা উত্তপ্ত বন্ধুতার দীপ্তি'—এই লাইন-গুলো গত পাঁচ বছরে শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে বিপাশার। মনুষ্য-জীবনের ট্র্যাজিডি এটাই। তোমার স্বকৃত সুকর্মের জন্য জীবনে খুব কম সময়েই কেউ তোমাকে প্রাপ্য সম্মান দেবে। আর যে-কৃতিত্ব তোমার নয়, সেজন্য তোমাকে প্রায়ই ফাঁকা ঢনঢনে প্রশংসা-বাক্য শুনতে হবে। যা গ্রহণ করার সুযোগ নেই, না বুদ্ধিতে, না হৃদয়ে। 'তুমিই এই সোনালি সকাল'...ইত্যাদি শোনা হয়ে যাবার পরে বিপাশা হাতের চিঠিটা দেখিয়ে বলে—'যোহান, তোমাদের পোস্ট অফিসটা—?'

—'কেন? চিঠি পাঠাবে? আমাকে দাও।' চিঠিটা নিয়ে নিজের ওভারকোটের পকেটে পেস্ট করে দেয় যোহান। বিপাশা সুন্দরী, মাপসই, কিন্তু খুব ছোট্টখাট্টো। বাঙালী হিসেবেও রীতিমতো খুদে-আকার মেয়ে সে, ফরাসীতে যাদের আদর করে বলে, 'পেতিত'। আর যোহান খুব বড়োসড়ো, মস্ত লম্বা, একটু কুঁজো। তার বুকপকেটটাও বিপাশার মাথার চেয়ে উঁচুতে।

মুখটি তুলে সেদিকে তাকিয়ে বিপাশা বলে—'স্ট্যাম্প্ মারা হয়নি।'

—'মেরে দেবো। হাওয়াই ডাকে যাবে তো? কোথায়—ইণ্ডিয়া?'

—'হুঁ। কিন্তু যোহান, তোমাদের ডাকঘরটা কোথায়?'

—'ওই তো। বেরিয়ে, ডানদিকে মাইল দেড়েক হবে, গ্রামটার মধ্যে।'

—'ওখানে তুমি যাবে কখন? লেখ মিটিং তো পনেরো মিনিটের মধ্যেই শুরু হচ্ছে।'

—'আমি যাবো না, সুইটহার্ট, আমি বেচ্কাকে দিয়ে দেব। বেচ্কা স্ট্যাম্প মেরে মেলব্যাগে ভরে দেবে। দুপুরবেলা লাঞ্চের পরেই চলে যাবে তোমার চিঠি।'

—'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! বাঁচা গেল।' বিপাশা সত্যিই হাঁপ ছাড়ে একটা।

—'এত কাতরতা কেন? কাকে চিঠি? নিশ্চয়ই তোমার প্রেমিককে?'

—'দূর, আমার আবার প্রেমিক কোথায়?' বলতে বলতে বিপাশার মনে পড়ে যায় সমীরের

BanglaBook.org

মুখখানা—পাঁচ বছর আগেকার ফটোতে। সমীরকে কি এখনও বিপাশার প্রেমিক বলা যায়? অন্যমনস্ক সুরে বিপাশা ডাকে—'য়োহান?' উদ্দেশ্য কথা ঘোরানো।

কিন্তু তার জবাবে বিশাল য়োহান হঠাৎ নুয়ে পড়ল বিপাশার মুখের কাছে—'কী, মা-শেরি? বলো, বলো, তোমার কথা আমার কানে দেবদূতের গানের মতো শোনায়।'

যদিও পাঁচ-ছ' বছর পশ্চিম দেশে রয়েছে, তবু এদেশে মুখের ওপরে এই ফ্লার্ট করাটা (নারীজাতির প্রতি এই ঐকান্তিক সম্মানজ্ঞাপন!) বিপাশার এখনও সহজে হজম হয় না। মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। কী বলতে চেয়েছিল, ভুলে যায়। দূর ছাই।

এই য়োহানটা ভারী জ্বালায়। খুব নামডাক আছে এখানে, ব্রাটিস্লাভায় মস্ত অধ্যাপনা করে—মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে সাতটা সমালোচনার বই লিখে ফেলেছে—এই কনফারেন্সের সে-ই হর্তাকর্তা বিধাতা। অথচ হাবভাবে খাপছাড়া, একটা পাগলা দস্তুর মতন লাগে মাঝে মাঝে ওকে বিপাশার। এবং বিপাশার প্রতি তার অখণ্ড মনোযোগ। বিপাশার এই 'হোট্রাট্রো' হওয়াটাই ছ'ফুট চার ইঞ্চি য়োহানের কাছে দারুণ মূল্যবান মনে হয়। বিপাশার সেটা খুব একটা মজার লাগে না কিন্তু। বিপাশাকে এদের মেয়েদের পাশে একদম বেমানান লাগে। বেচ্‌কার পাশে ওকে কেমন পুতুল-পুতুল দেখায়। কেবল তার শাড়ি-ব্লাউজ আর কোমর পর্যন্ত লম্বা কালো বিনুনির জন্যেই নয়—তার দুধ বেশি দেওয়া চায়ের মতো রংয়ের জন্যেও নয়,—বিপাশার কালো চোখ-দুটোর মধ্যে একটা সুদূর অন্য জগতের ভাব আছে। অনেক ভেবে একটা কথা বের করে বিপাশা।

—'বেচ্‌কা কি আমাদের সঙ্গে আজ যাবে, নীত্রায়?'

—'নিশ্চয়ই যাবে—তোমার দোভাষী তোমারই ছায়া। যাবে না মানে? আমারই অবশ্য বেচ্‌কার বদলে তোমার দোভাষী হতে খুব ইচ্ছে—কিন্তু আজ যে এখানে আমার একটা কাজ বাকী আছে। সেটা মিটিয়ে কালকেই চলে আসবো নীত্রা। ততক্ষণ বেচ্‌কাই তোমার সঙ্গ পাবে। লাকি গার্ল বেচ্‌ক।' বলতে বলতে যোহান ওর ভারী, গরম হাতটা দিয়ে বিপাশার কাঁধে একটা থাবড়া বসায়। তারপর মাথাটা নামিয়ে আনে কানের কাছে—'আমি একবার নীত্রায় গিয়ে পড়লে আর বেচ্‌কাকে কিন্তু ঘেঁষতে দেব না কাছে—।'

বিপাশা নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখে। এই সকালেই য়োহানের নিঃশ্বাস মধু-গন্ধে ভরা। য়োহানের পরনে ছেঁড়া-ছেঁড়া ব্লু-জীন্‌স, গায়ে একটা খুব ভারী খটো কালো ফার-কোট। তার ভেতরের দিকে ফার বসানো। পিঠের ওপর হুডটা উল্টে পড়ে আছে। দু'চোখের কোণে চামড়া কুঁচকে আছে, কথায় কথায় হাসে—চওড়া কপালে অনেকগুলো খাঁজ খাঁজ লাইন টানা—চওড়া চোয়াল, খাড়া নাক মুখখানা একেবারে গোল, আর হাসিটা বিপাশার ভীষণ চেনা-চেনা। কেন যে এমন চেনা-চেনা—যেন আগে কতই দেখেছে—তা ঠাহর করে উঠতে পারে না বিপাশা। য়োহানের বয়সের তুলনায় মাথার চুল পাৎলা, কিন্তু খুব সোনালী—পিছনদিকে একটু টাকও পড়েছে, রোদে পোড়া তামাটে রংয়ের চামড়া, হাসি-ভরা সেব দুটোর রং জলের মতো। য়োহান এই ক'দিন সবাইকে খুব যত্নআত্তি করেছে। দেশবিদেশের লেখকদের হ্যাপা সামলানো তো সোজা নয়। মেজাজী মানুষ প্রত্যেকে। তবে এই কনফারেন্সের বেড-টী ব্যাপারটি বড় বিশেষত্বপূর্ণ—তারই গুণে লেখকদের মেজাজ ঘুম ভেঙেই প্রফুল্ল হয়ে যায়।

এদেশের যত্নআত্তির তুলনা হয় না। বিপাশাই এটার নাম দিয়েছে বেড-টী। যদিও ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ঘরে চা আসে না কারুর। মুখ-টুক ধুয়ে প্রত্যেককে খাবার-ঘরে যেতে হয় সাড়ে সাতটা নাগাদ। সেখানে বসলেই সামনে চলে আসে একপাত্র কালো কফি, আর একপাত্র কনিয়াক আর নুন মাখানো কাঠি-কাঠি রুটি এক চুপড়ি। ঘুম ভেঙে উঠেই এই যে বিশুদ্ধ কনিয়াক-সেবন, এইটেই সমাগত লেখকদের চিত্তশুদ্ধি ঘটাচ্ছে, বিপাশার সন্দেহ নেই।

'ইংরিজি ভাষায় ভারতীয় লেখিকা কবি' বিপাশা চৌধুরীর এখন যথেষ্ট প্রতিপত্তি ইংরিজিভাষী

BanglaBook.org

পাঠকমহলে, তবুও এই পাঁচবছরের প্রবাসের পরেও কিছু কিছু বাঙালপনা রয়ে গিয়েছে বিপাশার মধ্যে। রাত্রে পেট ভরে ডিনার খাবার পরে সুগন্ধি এক কৌটা কনিয়াক যদিও বা চলে, কিন্তু ভোরে উঠেই বাসিমুখে চতুর্দিকে এই আকণ্ঠ মধুপান—এই দৃশ্যটা পর্যন্ত সহ্য করতে কষ্ট হয় বিপাশার।

আর তেমনি মন কেমন করে কলকাতার জন্যে। আহা বাবা, দাদা, ছোড়দারা এই ব্রেকফাস্ট পেলে কী আহ্লাদিতই হত! আহাহা, দেশের লেখকদের 'প্রডাক্‌শন'-লেভেলেই কত উচ্চে উঠে যেত এমন আশমেটানো প্রাতরাশটি পেলে! তারা না এসে এল কিনা বিপাশা। একেই বলে অদৃষ্টের মার। কনিয়াকের গুণে সকাল থেকেই কনফারেন্সে প্রত্যেকের ঝলমলে মেজাজ। সূর্য উঠুক না উঠুক, সভা রৌদ্রকরোজ্জ্বল। অত্যন্ত মসৃণভাবেই কনফারেন্স হয়ে যাচ্ছে। বিপাশা লক্ষ্য করেছে, কবিরা ঔপন্যাসিকদের চেয়ে একটু বেশী ফাঁকিবাজ—পারলেই মীটিং-এ না এসে বনের দিকে হাঁটতে চলে যায়।

—'একটু হেঁটে আসবে নাকি?' য়োহান বলে। 'চল না, বনের দিকে?' ভালা-শেকলের দিকে কেউই বেড়াতে যায় না। ও প্রসঙ্গটাও কাউকেই তুলতে শোনেনি বিপাশা। সবাই যখন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বাইরে হেঁটে বেড়ায়, বেশির ভাগই বনের দিকে যায়। বিপাশাও কালকে ওদিকে গিয়েছিল। হান্সের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে।

লাল কাঁকরের রাস্তাটা শাদা প্রাসাদ ছেড়ে সবুজ বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে দুদিকে ক্রমশ বেড়েওঠা শুকনো ডালপালার ঝোপঝাড় পেরিয়ে আস্তে আস্তে ঘন কালো বনের অন্ধকারে ঢুকে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে হান্স ঝোপগুলোর নীচে হঠাৎ মাটিতে একটা জায়গায় আঙুল দেখিয়ে, বিপাশার কনুই ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সেখানে শুকনো পাতার স্তূপের ওপর ঢেউ খেলে যাচ্ছিল—ঢেউয়ের উৎস পাতার নিচে। কোনো প্রাণীর গুপ্ত চলাচলের ছবি ফুটে উঠছে পাতার কাঁপনে।

বিপাশা বলল—'সাপ!'

হান্স বলল—'ধ্যাৎ! এখনও শীত যায়নি, এখন সাপ কোথায়? বেজি টেজি হবে।'

যে প্রাণীই থাক, সে সোজাসুজি চলছিল না—সরীসৃপের মতই ছিল তার গতি। হান্সের অন্য বাহু ওর কাঁধ অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ছিল প্রতিরক্ষাবাহিনীর সৈন্য সাজানোর ঢঙে। বনের ঠিক সামনে ওরা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল—পথের মাঝখানে।

একটু পরে শুকনো পাতার কাঁপন আপনা থেকে থেমে গিয়েছিল। হান্স ওর কনুই ছেড়ে দিয়ে বলেছিল—'চল, যাই।'

আর তক্ষুনি ঘড়ির দিকে চোখ নামিয়েছিল বিপাশা। ঘড়িতে সময় হয়ে গেছে মীটিঙে ফেরার।

হান্স বলল—'দূর। ঘড়ি দেখতে হবে না। বনে তো যাওয়াই হল না।' কিন্তু বিপাশা যায়নি। হান্সের দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে যে দুটি বাদামী চোখ ঝলমল করে তারা ওকে অনুনয় করেছিল—'চল, বনে চল', আর বিপাশার শিরা-ধমনীর মধ্যে যে চেতনাটি ঝলঝল করে, সে ওকে বারণ করেছিল, 'যেও না, হান্সের সঙ্গে বনে যেতে নেই।'

বিপাশা পারেনি। হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে উঠে বলেছিল—'এই যাঃ, একটা কাজ করতে হবে যে আমাকে মীটিঙে যাবার আগেই! দেখেছ—সব কেমন ভুলে গেছি'—বলে প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই ফিরে গিয়েছিল সভা-বাড়ির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। হান্সের চোখের থেকে দূরে। কে জানে কী ছিল শুকনো পাতার নিচে। হান্স যাই দেখুক, বিপাশা তো দেখেছিল অদৃশ্য সরীসৃপের স্নান।

য়োহান পিঠে আরেক থাবড়া বসিয়ে বলে—'চল চল সুন্দরী, বনটা ঘুরে দেখে আসবে। খুব সুন্দর বন এটা, দেখবার মতো।'

BanglaBook.org

যোহানের স্পষ্ট প্লানটেশানের মধ্যে একটা নিশ্চিন্তি আছে। বনে নিয়ে গিয়ে কিছু সুযোগ নেবে না যোহান—যে কুকুর বেশি চেঁচায় সে কামড়ায় না। বিপাশার মন সায় দেয়। মাছেদের ছেড়ে ওরা বনমুখো হাঁটে।

উল্টো দিক থেকে ভীষণ কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। বিপাশা বলে—'কুকুর ডাকছে কোথায় এত? দেখছি না তো একটাও?'

যোহান বলে—'আছে—আছে, দেখতে চাও? বল কুকুরটাই আগে দেখিয়ে আনি।'

একটু গিয়েই আউট হাউস। সেখানে বিপাশা দেখল একটা বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে প্রবল গর্জন হচ্ছে, পশমবন্ধ জানোয়ারের। দেখে মনে হয় ঘরটা ছিল আস্তাবল। ঘোড়া এখন নেই। ঘোড়াশালে কুকুর থাকে। আর তারই দোতলার বারান্দায় কিছু ময়লা জামাকাপড় ঝুলছে, কিছু ব্যবহৃত বাসনকোসন ছড়িয়ে আছে। মনে হয় কুকুরশালে এখন মানুষ থাকে।

—'কাদের কুকুর এগুলো? কারা থাকে এই দোতলার ঘরে?' বিপাশা আকুল স্বরে প্রশ্ন করে।

যোহানকে বিব্রত দেখায়।—'আমিও ঠিক জানি না'—সে বলে, সম্ভবত এই প্রাসাদের কর্মচারীরা কেউ হবে কুকুরও হয়তো তাঁদেরই।'

বিপাশা বোঝে যোহান অস্বস্তি বোধ করছে। এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে দেখে যোহান তাকে প্রশ্ন করে, লোকটিও দেশী ভাষায় উত্তর দেয়। যোহান বিপাশাকে বলে—'ওরা এই প্রাসাদেরই কুকুর।'

বিপাশা উত্তরটা বুঝতে পারে না। প্রাসাদ আবার কুকুর পুষবে কী? প্রাসাদ তো নিজেই রাষ্ট্রের সম্পত্তি। কুকুরেরও নিশ্চয় তবে সেই একই প্রভু! পশমবন্ধ জানোয়ারের গর্জন বড়োই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে সদ্য সূর্য-ওঠা ভোরবেলার প্রশান্তি। বনের দিকে গেলে হয় এবার। বিপাশা বনের রাস্তা ধরে। যোহানেরও হঠাৎ কথা ফুরিয়ে গেছে। কান-ভর্তি কুকুরের চীৎকার নিয়ে ওরা ক্রমশ বনের মধ্যে প্রবেশ করে যায়।

বনের গোড়া থেকেই বিশাল বিরাট সব বৃক্ষ জড়াজড়ি গলাগলি করে তারা অন্ধকার করে রেখেছে, শীতল করে রেখেছে বনের বদ্ধ বাতাস, বৃক্ষগুলির বাকলে কতো বছরের প্রাচীন শৈবালের সবুজ স্তর, কিন্তু ডালে ডালে ভর্তি পাতার উঁকিঝুঁকি, অচেনা সব ঝিরঝিরে লতা ঝুলছে ডালপালা থেকে, তাতে ছোট ছোট দু'একটি ফুলও ফুটতে শুরু করেছে, অলক্ষিতে পাখি-পাখালির ডাক অরণ্যের স্তব্ধ বাতাসকে দুলিয়ে দিচ্ছে বসন্তের বার্তা দিয়ে...অথচ সব চেয়ে আশ্চর্য, বিপাশা অবাক হয়ে দেখে, মাটি দেখাই যায় না, কেবল বরফ, শাদা বরফ জমে আছে বন-ভর্তি। তার ওপর দিয়ে সরু একটি পথ তৈরি হয়েছে পথচলতি লোকেদের জুতোর তলায় কাদা-মাটি-বরফ-মাখা পথ।

কী আশ্চর্য, এত বরফ? এখন ক্যালেনডারে বসন্ত ঋতু, সূর্য কম উঠছেন বটে, শীতটাও প্রবল বটে, তবু বরফ তো পড়েনি, অন্তত এই ক'দিনে? বুদমেরিংসে প্রাসাদের মাঠে, বাগানে, রাস্তায়, দালানে, বারান্দায়, ছাদে কোথাও বরফের চিহ্নমাত্র চোখে পড়েনি—সব বরফ জমিয়ে রাখার দায় কি একা এই অরণ্যের? বনের বাইরেই মাঠভর্তি সবুজ বাসন্তী রোদ, অথচ বনের মধ্যে দু'পা ঢুকে পড়লেই গভীর গহন শাদা-কালো শীতকালের রাজত্ব। ক্যালেনডার যাই বলুক, অরণ্যে এখন শীত।

বিপাশা নিচু হয়ে দস্তানাপরা মুঠোয় একদলা বরফ তুলে নেয়। যোহান শিস্ দিয়ে একটা অচেনা সুর ভাঁজছে, আর কোত্থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়ে ছড়ি বানিয়ে ঝুলন্ত লতাপাতাগুলো ছিঁড়ছে।—'যোহান!' বিপাশা বলে—'লতাগুলো নষ্ট কোর না, কী সুন্দর!'

যোহান হেসে ওঠে।—'নষ্ট? কালই আবার গজিয়ে যাবে। তুমি সত্যি বড্ড সেন্টিমেন্টাল।

BanglaBook.org

একটা জ্যান্ত, বাড়ন্ত জিনিস অত সহজে কেউ নষ্ট করতে পারে নাকি? এ কি শিল্প? এ হল নিসর্গ!' হাতের ডালটা গুঁজে দেয় বরফের মধ্যে। একটা কালো সরু স্তম্ভের মতন সেটা দাঁড়িয়ে থাকে। মাথায় খানিকটা ছেঁড়া কচি সবুজ লতাপাতা নিয়ে।

য়োহান বলে—'এটা ধরা যাক একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ো, তোমাদের মহান হিমালয়েরই একটা নতুন চূড়ো—আজ আমরা দুজনে প্রথম জয় করেছি এটাকে—কেমন?'

বলে য়োহান নরম করে তাকায়, আলগা করে ওর হাতটা ধরে বলে—'এসো, আমরা বিজয় পতাকা পুঁতে রেখে যাই—এই লতাপাতাই বেশ আমাদের অভিযাত্রী দলের পতাকা,—কী বলো? ভালো হলো না?' বলে হঠাৎ বিপাশার কাঁধে ভারী হাতটা রেখে আলতো একটানে কাছে টেনে নেয়।

এক মুহূর্তেই বিপাশার মনে পড়ে যায়, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে, মীটিং ভেঙে যাবার পর সমীর সেই প্রথমবার—সঙ্গে সঙ্গে এত জোরে হেসে ওঠে য়োহান, তাতে বিপাশার বদ্ধ স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ অরণ্যের জমাট জরাও বেশ খানিকটা চমকে ওঠে, খানিকটা বিরক্ত হয়। বিপাশাও হাসে, নিঃশব্দে।—'সমীর, দেখে যাও এ কোন্ অরণ্যে আমি।' তারপর বলে—'চলো য়োহান—শেষ মীটিঙে তুমি আমি দেরি করে ঢুকব কিন্তু।'

য়োহান বলে—'এইবার অভিযাত্রীদ্বয়ের পর্বতচূড়া হইতে অধঃপতন—'

তারপরে কয়েকটা মুহূর্ত আশ্চর্য একটা স্তব্ধতা এসে বনটা ভরে দেয়—য়োহান আর বিপাশার মধ্যে একটা ক্ষীরের মত গাঢ় নিস্তব্ধতা ঢেউ তুলে যায়, কয়েকটা মুহূর্ত বিপাশার মনে হয় এক্ষুনি একটা কিছু বলা দরকার, একটা কোনো শব্দ হওয়া খুব দরকার—তারপরেই হাঁটা শুরু হয় বাইরের দিকে।

সবুজ মাঠে বেরিয়ে এসে বিপাশা দেখল ময়ূরটা চরছে তার তিনজন টার্কী সহচরের সঙ্গে। অপেলকুঞ্জের সামনের মাঠটায় খেলা করছে নীলপালক ঘনিয়ে—প্রবাসী ময়ূর। একলা ময়ূর!

—'আচ্ছা, তোর শীত করে না? এই শীতে এই বরফে তুই আছিস কেমন করে?' বিপাশা ময়ূরকে বলে—'তোর মন-কেমন করে না? হ্যাঁরে, তুই বুঝতে পারিস না, এরা সবাই টার্কী? এরা কেউ তোর নিজের জাত নয়—এখানে আর একটিও ময়ূর নেই—'

মনে মনে ময়ূরের সঙ্গে কথা বলছে, এমন সময়ে য়োহান তর্জনী তুলে দেখায়—'ওই দ্যাখো, বিপাশা, তোমার স্বজন, এ্যানাদার বিউটিফুল বার্ড ফ্রম ইনডিয়া!'

•
• •

—'এভিচকা! দ্যাখো, দ্যাখো, বিপাশা কেমন ভয়ংকর লঙ্কা চিবুচ্ছে!' য়োহান চেঁচিয়ে ওঠে—'খবর্দার। খবর্দার! অত ঝাল খেও না বিপাশা, আপনি জানেন না আপনি কী খাইতেছেন, সর্বনাশ হবে তোমার, ইউ'ল টেস্ট ইট টোয়াইস, এখন একবার, এ্যাণ্ড টুমরো মরনিং ওয়ান্স মোর—' বলে দুষ্টু ছেলের মত হাসতে থাকে য়োহান।

—'য়ো-হা-ন!' এভা এবং এলিজাবেথ একত্রে বেদম ধমকে ওঠে য়োহানকে—'কী অসভ্যতা হচ্ছে, মেয়েদের সামনে?'

—'য়োহানের আবার সভ্যতা-অসভ্যতা! য়োহান তো একটি বর্বর। ওর পোশাকটাই দ্যাখো না। কী নোংরা প্যান্ট!'

—'এই রেস্তরাঁয় তোমার পোশাকটাই সবচেয়ে খারাপ, য়োহান।'

—'কিন্তু বিপাশার পোশাকটি আমার সব কিছু ত্রুটি পরিপূরণ করে দিচ্ছে, তাই না বিপাশা?' অলুথালু ব্লু জীন্স পরা য়োহান কৃত্রিম ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে তাকায় বিপাশার দিকে।

BanglaBook.org

এই যে সন্ধ্যায় বিপাশাকে সামাজিকভাবে ফেয়ারওয়েল পার্টি দিচ্ছে এরা, একজনও স্ত্রীকে সঙ্গে আনেনি। অথচ পশ্চিম ইওরোপে সাধারণত এসব সামাজিক পার্টিতে যুগলে আসাই কানুন। এভার স্বামী অবশ্য এখন শহরে নেই। দু'মাসের জন্য প্রাহাতে গেছেন। আর এলিজাবেথ স্বামী খুঁজছে—ওর উদ্ধত কৌমার্য যেন জগতের তাবৎ পৌরুষের প্রতি একটা উচ্চণ্ড চ্যালেঞ্জের মতো মুখিয়ে আছে। অথচ স্বভাবে সে মৃদু, রীতিমত লাজুক, কথায় কথায় লাল হয়ে ওঠে।

একমাত্র মোহান ছাড়া এরা কেউ ফ্লার্ট করে না। বিপাশা লক্ষ্য করল, ফ্লার্ট না করলেও দেনিশের মুগ্ধ দৃষ্টি তাকে আপন নারীত্ব বিষয়ে সচেতন করিয়ে দিচ্ছে।

গেয়র্গ—বিপাশার সন্দেহ হয়—সে নারীত্বে মোটে উৎসাহিতই নয়। মোহানই গেয়র্গের আরাধ্য—তার দৃষ্টিতে রীতিমত পুজোর ধূপধূনোর ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে বিপাশা। অবশ্য মোহানের সে নিয়ে মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে একসঙ্গে এভা, এলিজাবেথ, বিপাশা—তিনজনেরই মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।

বিপাশা দেখলো এভা, এলিজাবেথ এতে খুশি-খুশি লজ্জা পাচ্ছে, মোহানের সকৌতুক প্রণয়-খেলার মধ্যে একটা লাম্পট্যহীন সহজ পৌরুষ, বেশ একটা মিষ্টি-দুষ্টু-সরল ছেলেমানুষি সৌন্দর্য আছে।

মোহানের ওই সর্বপ্লাবী ব্যক্তিত্বের জন্যই কিনা কে জানে গেয়র্গ এবং দেনিশ ছায়া-ছায়া অস্তিত্বে পর্যবসিত। অথচ আজই দেনিশ সারাদিন ঘুরেছে বিপাশাকে নিয়ে। সে এখন সংস্কৃত পড়ছে। একটা সংস্কৃত পকেটগীতা চেয়েছে দেনিশ বিপাশার কাছে। বুকপকেট থেকে বের করে ওকে দেখিয়েছে একটা ছোট্ট ইংরিজি পকেট গীতা,- দেনিশের মুখে ইংরিজি, ফরাসী, জর্মন, রুশ—প্রত্যেকটি ভাষাই নিখুঁত। এবং সংস্কৃতও।

বুদমেরিংসে প্রাসাদের বাগানে মোহানের হিসেবে ভুল হয়েছিল একটা। বেচ্কা নয়, নীত্রায় অসার পর থেকে দেনিশই বিপাশার দোভাষী হয়েছে। কিন্তু আজ বিকেলে ছাত্রসভায় বিপাশার বক্তৃতার সময়ে ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত হল মোহান। হলের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া থেকেই টের পেল বিপাশা।

মোহান এখানে একজন কেউকেটা। তার আসার পর থেকেই দেনিশ দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে। এই দু'দিনে কিন্তু অনেক গল্প করেছিল দু'জনে, দেনিশের বাচ্চাদের ছবি দেখতে চেয়েছিল বিপাশা। পশ্চিম ইওরোপ বা মার্কিন দেশের বাপ হলে তক্ষুনি পার্স খুলে দেখিয়ে দিত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ছবি। দেনিশ পারেনি।—'ছবি? ছবি এখানে কোথায় পাবো? ছবিটবি তো সব বাড়িতে।'—উত্তরটা শুনে আরেকবার আরাম পেয়েছিল বিপাশা। যাক্, স্ত্রী-পুত্রের ছবি এরা হৃদয়েই ভরে রাখে তাহলে, মানিব্যাগে রাখে না। ভারতবর্ষের মতই।

পূর্ব ইওরোপের অনেক কিছুই বিপাশার কেবলই 'দেশের মত' লাগছে—এই পাঁচ-ছ' বছর পাশ্চাত্যবাসের পরে সে যেন হঠাৎ স্বদেশের কাছাকাছি এসে পড়েছে অথচ মিলটা যে ঠিক কোনখানে তাও টের পাচ্ছে না। লোকগুলোও শাদা, ভাষাটাও পরদেশী, আর রাজনীতিটও ভূমিমাল, সোশ্যালিস্ট ইম্পিরিয়ালিজমের। তবে? দিশিয়ানাটা ঠিক কোনখানে? বিপাশা ধরতে পারছে না, অথচ যেন ছুঁতে পারছে। মিলটা কোনখানে? অনেকগুলো প্রশ্নই স্পষ্ট হয়নি।

এই সোশ্যাল-ইম্পিরিয়ালিজম ব্যাপারটাই বিপাশার কাছে কেমন যেন অস্পষ্ট। পার্টিও কিছু ভাল করে শেখায় নি যেন এই ব্যাপারে। বিপাশা অবাক হয়ে দেখেছে হাঙ্গারি-চেকোস্লোভাকিয়ার বেলায় পার্টির এক রকম মত,—আর তিব্বতের বেলায় আরেক। একটা 'অকুপেশন'—কিন্তু অন্যটা 'লিবরেশন'। কেন? কেননা এক জায়গায় সোসালিজম ছিলই—অন্যত্র ছিল না' তাই কি? পার্টি তার অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি, কেবল ইওরোপের কম্যুনিজম বিষয়ে বেশ কিছু

BanglaBook.org

বিষবাষ্প শ্বাস-প্রশ্বাসে ঢেলে দিয়েছে। অ্যালবেনিয়াকে কিন্তু পূর্ব ইওরোপের অংশ হিসাবে তখন ধরা হয়নি। যেহেতু সে দেশ পিকিংপন্থী।

বিপাশা এই পাঁচ বছরে মনে করেছে অনেক কিছুই, পার্টি ভুল শিখিয়েছিল, অনেক একদেশদর্শী, অসম্পূর্ণ ধারণার সৃষ্টি করে দিয়েছিল তার মনে। নিশ্চয়ই পূর্ব ইওরোপ সত্যি সত্যিই সেরকম নয়, তার থেকে অনেক ভাল।

বিপাশার এই প্রথম কোনো নন্-ক্যাপিটালিস্ট দেশে আসা। নিশ্চয়ই যতটা তার ধারণা, অতটা খারাপ নয়! প্রকৃতপক্ষে তার রাজনীতিজ্ঞান খুব গভীর নয়, সমীরের কাছাকাছি থাকলে যতটা সব বুঝতে পারে সে, একলা একলা অতটা বুঝতে পারে না। গত পাঁচ-ছ' বছর ধরে শিক্ষা দিয়েছে তাকে ইওরোপের একক জীবন—নিজে নিজে কিছুটা ভাবতে শিখেছে, দেখতে শিখেছে সমীরের চেয়ে আলাদা করে। তাতে আগের চেয়ে একটু ভালো করেই হয়তো নিজের দেশের সমস্যাটা দেখতে শিখেছে বিপাশা,—বুঝেছে পার্টির ভুল কোথায় ছিল। দেশে থাকলে এ-চোখ তার খুলত কি? কে জানে!

—'দেনিশ, চল, এবার অফিসেই যাওয়া যাক।' ক্যারামেল কাস্টার্ডটা এগিয়ে দিয়ে য়োহান চেঁচায়।

বিপাশা দুঃখিত হয়ে ভাবে, হায়, এখানেও সেই ক্যারামেল কাস্টার্ড? তারপরে খেয়াল হয়—অফিস? অফিসে কেন?—'অফিসে যাওয়া যাক মানে? এত রাত্রে তোমরা অফিসে গিয়ে কাজ করবে?'

বিপাশার চমকে ওঠা দেখে হো হো করে হেসে ওঠে য়োহান। উত্তরটা দেনিশই দেয়—'হুঁ, কাজ করবো। ভীষণ কাজ। প্রচণ্ড জরুরী। তোমরাও যাবে কাজ করতে। এত খাওয়া দাওয়া কি অমনি অমনি নাকি? পরিশ্রম করবে না এবার?'

বিপাশা ধাঁধায় পড়েছে দেখে এভা, এলিজাবেথ, এমন কি গেয়র্গও হাসে!

গেয়র্গ বলে 'য়োহান, আমি কিন্তু যাচ্ছি না. আমার সর্দি হয়েছে। আর রাত করতে চাই না। আজ আবার বৃষ্টি-বৃষ্টি আছে!'

য়োহান এক থাবড়া বসায় গেয়র্গের বদলে এভিচ্কার পিঠেই, যেহেতু সেটাই ওর হাতের কাছে, এবং ধমক লাগায় গেয়র্গকে।

—'গেয়র্গ, ভিজে কম্বলের মতো যাচ্ছেতাই হেয়ো না বাপু—একদম ঘা-তা হয়ে যাচ্ছো তুমি আজকাল, এটাকে কি বৃষ্টি বলে? ইল্‌শেগুঁড়ি না হলে কি বসন্ত আসে? ভাল কড়া টোকাই মদ দেব—দেখো সব সর্দিফর্দি শুকিয়ে মাথার মধ্যে আগুন ধরে যাবে। সব্বাই যাবে এখন আমার অফিসে। কোয়াড, এ্যাটেনশন্!' বলেই সটান্ লাফিয়ে উঠে এ্যাটেনশনে দাঁড়ায় য়োহান।

রেস্তরাঁর অন্যান্য মানুষরা হাসিমুখে চেয়ে থাকে এই য়োহন পাগলটির দিকে।

দেনিশ হেসে বিপাশাকে বলে—'য়োহানের অফিসে একটা আস্ত মদের আড়ৎ আছে—ওটাকে ওর পাবলিক রিলেশন্স অফিসই বলতে পারো! সেখানেই যাওয়া হচ্ছে।'

পথে বেরিয়ে এসে ওরা হাঁটতে থাকে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। পথে ট্রামবাস নেই।—'ট্যাক্সি নেবো একটা? তুমি হাঁটতে পারছো তো?' দেনিশ প্রশ্ন করে।

—'এভিচ্কাকে প্রশ্নটা করো বরং।' বিপাশা বলে—'ওরই হয় তো—'

—'মোটেই না—খুব হাঁটতে পারছি আমি। ডাক্তার আমাকে হাঁটতেই বলেছে।' এভা আপত্তি জানায়।

যে রাস্তায় ওরা ঢোকে, সে-রাস্তায় অন্ধকার। দুদিকে মস্ত মস্ত অট্টালিকা। ম্লান বিদ্যুৎস্তম্ভগুলি দীন আলোকসম্পাত করছে ভিজে ভিজে গোল গোল পাথর বসানো পুরোনো রাস্তার ওপরে।

BanglaBook.org

এইরকম নুড়ি বসানো রাস্তা 'কবল্‌ড রোড' বিপাশার খুব ভাল লাগে। রাস্তার দুধারে কেবলই বিশাল সব অন্ধকার বাড়ি। দু'একটা ঘরে বাতি জ্বলছে। সবই ইউনিভার্সিটির বাড়ি। এখন বন্ধ। তাই পাড়াটা এত অন্ধকার।

পথে লোকজন নেই। একটা প্রাসাদোপম বাড়ির বিশাল বন্ধ ফটকের সামনে তাদের ক্ষুদ্র শোভাযাত্রাটা থমকে দাঁড়ালো। দেয়ালে 'মিউজিক স্কুল' লেখা বড় বড় হরফে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়ায় মোহান। কোটেরই প্রায় দশটা পকেট—ভেতরে বাইরে আশেপাশে। নোটবই বেরুচ্ছে, পাইপ বেরুচ্ছে, লাইটার বেরুচ্ছে, দেশলাইও বেরুচ্ছে গাদা গাদা, রুমাল বেরুলো, গল্পের বইও বেরুলো, কলম, পেন্সিল এবং একাধিক চাবির গোছা। কোনোটা বাড়ির, কোনোটা তার ব্রাঞ্চিব্রাঞ্চের অফিসের, কোনোটা পার্টি অফিসের। মোহান কম্যুনিস্ট পার্টির লোকাল চ্যাপ্টারের ফার্স্ট সেক্রেটারি। শেষ পর্যন্ত প্যান্টের পকেট থেকে বেরুলো এই অফিসের চাবি!

•
• •

মিউজিক স্কুলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো বিপাশারা ক'জন। দরজার কাছে গেয়র্গ আরেকবার চলে যাবার চেষ্টা করেছিল—দেনিশ বাধা দিল আর মোহান ধমক দিল—গেয়র্গ থেকেই গেল দলে।

মস্ত সিঁড়ি। দেয়াল ভরা নানান বিজ্ঞাপন পোস্টারে পোস্টারে হাওয়া। নানান সাংস্কৃতিক উৎসব হয় এখানে—পিয়ানোবাদন, ধ্রুপদী অপেরা এবং থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ছাড়াও লোকনৃত্য-লোকগীতির বিজ্ঞাপন প্রচুর। দেয়াল দেখতে দেখতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে বিপাশা। শ্বেতপাথরের তৈরি সিঁড়ি উঠেছে দোতলা পর্যন্ত। মাথা ঘুরিয়ে ছাদের দিকে তাকালো বিপাশা। গম্বুজের ভেতর গম্বুজ; মস্ত মস্ত থাম মাথায় করে ধরে আছে ছাদের গম্বুজগুলো। ছ'জনের দল দোতলায় উঠে এলো। অন্ধকার দীর্ঘ নির্জন করিডর উত্তরে-দক্ষিণে দু'দিকে দু'মুঠে গহন রহস্যের মধ্যে সেতু হয়ে জেগে উঠলো পায়ের নিচে। সামনে একটা বিরাট ব্ল্যাকবোর্ড, তাতে চকখড়ি দিয়ে নানান নির্দেশ লেখা, বিধাতার লিপিলিপির মতোই তা দুর্বোধ্য বিপাশার কাছে।

ওপরে এসে মোহান চলল বাঁদিকে। দলসুদ্ধু তাকে ফলো করে। অন্ধকার করিডরের গায়ে রাস্তার আলো এসে পড়েছে মাঝে মাঝে—মেঝেতে বিপুল থামের ছায়া সৃষ্টি করে।

হঠাৎ একটা আপত্তির স্বর 'না' ছিটকে উঠে এল অন্ধকার থেকে। একটি মেয়ের গলা।—'নি-য়ে!' তারপর একটি পুরুষের অনুনয়ের কণ্ঠ—বাদে কিছু বললো। স্ত্রীকণ্ঠ আবার বলল 'নি য়ে! নি য়ে! নি-য়ে!'

ছ'জোড়ার মধ্যে তিনজোড়া পা এবারে থমকে গেল। বিপাশার সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়েছে এভা, এলিজাবেথ। সবাই চুপ। জুতোর শব্দ তুলে কেবল এগিয়ে যাচ্ছে মোহান। গেয়র্গ, দেনিশের পায়ে কিছুটা অনিশ্চয়তার ছাপ।

হঠাৎ দেওয়ালের আড়াল থেকে ছুটে এল একটি মেয়ে। দুই হাতে মুখ ঢেকে। চুল উড়ছে। স্কার্ফ উড়ছে। কোটের নিচেটা উড়ছে। করিডরে বেরিয়ে এসেই থেমে দাঁড়ালো, মুখ থেকে হাত সরিয়ে এদের দেখলো।

মোহান বলল—'এই যে, য়ানা! কি ব্যাপার?'

য়ানা অন্ধকারে তর্জনী নির্দেশ করে কী যেন অভিযোগ জানায়।

সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে একটি পুরুষ—তার হাতে কী যেন ঝিকিয়ে ওঠে—তারপরেই এক ঝলক আলো খেলে যায়—করিডরের পরবর্তী অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে দিয়ে। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠে—'নিয়ে! কার্ল!'

BanglaBook.org

হা-হা হাসিতে করিডর প্রতিধ্বনিত করে কার্ল বলে—'ধন্যবাদ, য়ানা।' তার হাতে একটি ফ্লাশবালব লাগানো বাচ্চাদের ক্যামেরা।

হায়, এই ব্যাপার! এভা ও বেচ্কা একসঙ্গে হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে—'কার্ল, য়ানার ছবি তো কতই তুলতে পারবে, আজ বিপাশার একটা তোলো বরং'—এভা বলে।

কার্লও ক্যামেরা-হস্তে সুবোধ বালকের মতো অগ্রসর হয়—'নিশ্চয়, একশো বার—যদি উনি আপত্তি না করেন। বাবাঃ, য়ানার চীৎকার শুনলে লোকে তো ভাববে ওকে নির্জন বাড়িতে পেয়ে আমি বোধ হয় বলাৎকার করছি।'

—'আমরা ঠিক তাই ভেবেছিলাম।' এভা বলে।

বেচ্কা লজ্জা-লজ্জা হেসে ওঠে—'কী বোকাই আমরা!'

কার্ল খুবই সুদর্শন। এগিয়ে এসে নতশির অভিবাদন জানিয়ে বলে—'মে আই?'

য়োহান কোত্থেকে দৌড়ে এসে দাঁড়ায়—'আমরা এই দু'জনেই থাকবো কিন্তু ছবিতে—য়ানা সুদ্দু'—বলে য়ানাকেও টেনে নেয়।

কার্ল গ্রুপ-ছবি তোলে। তারপরে বলে—'এবার এঁর একার একটা শাড়িপরা ছবি।'

বিপাশার খুব লজ্জা করতে থাকে। এই প্রাসাদের বদলে—মিউজিক স্কুলের বিপুল, বিস্তৃত, নির্জন, নিরালোক করিডরে—এত রাত্রে এই প্রেমিক যুগলের একান্ত সময়টুকু ধ্বংস করে দিয়ে নিজেদের ছবি তোলার পুরো ব্যাপারটাই তার বিশ্রী লাগল। কী যে হয় ছবি নিয়ে! ছবি কি মানুষটাকে ধরে রাখতে পারে? না মনকে?

থামের গায়ে হেলান দিয়ে বিপাশাকে দাঁড় করালো কার্ল—কোঁচা খুলে নেবার ইচ্ছেও প্রকাশ করল—কিন্তু খোলা বারান্দায় কনকনে বাতাসে বিপাশা মোটেই রাজী হলো না শাড়ির বিজ্ঞাপন দিতে।

ছবি তোলার পরেই কার্ল ঠিকানা চাইল।

য়োহান এক ধমক লাগায়—'ঠিকানা আবার কি? আমাকে দেবে। আমিই পাঠিয়ে দেব। য়ানার ঠিকানাটাই মনে রাখো, ওতেই হবে।'

সবাই হেসে ওঠে।

বার বার বিদায় জানিয়ে কার্ল আর য়ানা পাশাপাশি হেঁটে করিডোরের অন্য প্রান্তের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। পাশাপাশি—কিন্তু জড়াজড়ি করে নয়।

কী করছে ওরা এই বন্ধ বাড়িতে? এত রাত্রে? বেচ্কা বলে—কার্ল মিউজিক স্কুলে পড়াচ্ছে—য়ানা ওখানে গ্রাজুয়েট ছাত্রী। বোধহয় কোনো রিহার্সাল চলছে বিশাল বাড়ির অন্যপ্রান্তে।

বিপাশা প্রথমে ভাবলো—ওরা তো হাতও ধরল না পরস্পরের? কেবল পাশাপাশি হেঁটে চলে গেল যদিও স্পষ্টতই ওরা প্রণয়ী!

এ যেন ঠিক আমাদের দেশের মতো—পশ্চিম ইওরোপের প্রণয়ীদের চালচলন এর উল্টো! তার পরেই মনে হল—না, দেশের মতো নয়। দেশে হাত না ধরার কারণ রক্ষণশীলতা। আর এখানে কারণটা হল প্রগতি। যৌনতার নগ্ন প্রদর্শনী চোখে পড়ে না এখানে, তার কারণ দেশে এখনও মুক্তির মুহূর্ত এসে পৌঁছয়নি, আর এরা সেই মুহূর্ত পেরিয়ে চলে গেছে। যত যাই হোক, কম্যুনিস্ট ডিসিপ্লিনটাই আসলে আলাদা। যতটা খারাপ কথা শিখেছিল তারা পার্টির কাছে এই পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে—তার কতটা সত্য কে জানে? বিভিশানিজমের সঙ্গে তার জগৎটাও খুব স্পষ্ট না। কিন্তু এটাও সত্যি যে এখানে যুবক-যুবতীদের মধ্যে একটা সংযম আছে—একটা আদর্শ আছে সামনে—সেটা যেমনই হোক, পশ্চিম ইয়োরোপের পুঁজিবাদী ধনিক মানসিকতার চেয়ে তো ভাল।

দেশে কম্যুনিজম বলতে বিপাশা শিখেছিল মাওয়ের বাণী। কিন্তু এই পাঁচ বছর বিলেতে

BanglaBook.org

বসে বসে বাপের অন্নধ্বংস করছে সে। আর ইংরিজি ভাষাতে অন্নতীয় লেখক হচ্ছে—যার ফলশ্রুতিতে এই কনফারেন্সে আসা।

বিলেতে বসে বসে অনেক বদল হয়েছে বিপাশার। এখন সে ইতালী কি ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট পার্টিকে কিছুটা বুঝতে পারে। দেশে থাকতে এদের প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর এই তার প্রথম লৌহ যবনিকার অন্তরে প্রবেশ। কিন্তু কি আশ্চর্য, এদের এখানে কিছুই যেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটা আলো-আঁধারি, একটা গোপনীয়তা (যা কিনা বহির্বিশ্বে সর্বজনবিদিত সাধারণ জ্ঞান)—সত্যিই কুয়াশার মত বাতাস ভারী করে ঝুলে রয়েছে। মোটামুটি যে ইম্প্রেশনটা হয় সেটা কিন্তু নিঃসংশয় স্বস্তি দেয় না। সকলের সব কিছু থাকার যে অমূল্য তৃপ্তি, শ্রেণীহীন সমাজের বাসিন্দা হওয়ার যে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্তি—তার বদলে কী একটা অদ্ভুত টেনশন প্রত্যেককে গেঁথে রেখেছে।

বিপাশা ভাবে—আমার বদলে যদি সমীর আসতো, পরিস্থিতিটা সে ঢের বেশী বুঝতে পারতো। আমি তো সত্যিই ভাল করে সবটা বুঝি না—আমার মনে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে—তবে চেকোস্লোভাকিয়াতে আসতোই না সমীর এই যা।

এই হলো তাদের পার্টির একটা দোষ। এই মানসিক প্রতিবন্ধক গড়ে তোলা। মনটা খোলা রাখতে না দেওয়া। যেমন দেশকে বুর্জোয়া ইনফিলট্রেশন থেকে বাঁচাতে পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সীমানা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে—তেমনি মনকে বুর্জোয়া ইনফিলট্রেশন থেকে বাঁচাতে পার্টিও কিন্তু কর্মীদের মনের সীমানাগুলো বড্ড ছোট করে দিয়েছে। কে জানে সেটাই ঠিক কিনা। গাছ বাড়বার সময়ে যেমন বেড়া দেওয়াটাই কর্তব্য।

বিপাশার আজকাল মনটা বড্ড বেশি খোলা হয়ে গিয়েছে—কোথাও যেন কোনো শেকড় খুঁজে পায় না। সবচেয়ে মনে হয়—'এও হয়, আবার ও-ও হয়'—এতটা উদারতা কি ভালো? এটাকে কি উদারতা বলে, না দুর্বলতা বলে? না বিশ্বাসের অভাব বলে? কমিটমেন্টের অভাবকে 'উদারতা' আখ্যা দেওয়ার মধ্যে নতুনত্ব আছে কী? সমীর কি তবে অনুদার? সমীর বুঝি তার অনুদারতার জন্যই পাঁচ বছর ধরে বিনা বিচারে জেলে রয়েছে? সমীর হলেও কক্ষনো তার হাত ধরত না এত লোকের সামনে।

—'বিপাশা, কি ব্যাপার? তুমি যে রাত্রির দৃশ্য দেখতে দেখতে ধ্যানস্থ হয়ে গেলে? কীই-বা আছে দেখবার এখানে?'—এগিয়ে এসে দেনিশ ওর পাশে দাঁড়ায়, রেলিঙে দুটো অস্থিধবল হস্ত রাখে। বিপাশার খেয়াল হয়—বারান্দার রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে, মস্ত থামটার ছায়ায়—সামনে ম্লান বিদ্যুতের আলোয় একটা ঝাঁকড়া গাছের মাথা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজছে। বাতাসে তার চুল উড়ে মুখময় হয়েছে।

—'ওদিকে মোহানের পার্টি অর্ধেক গড়িয়ে গেল—'

—'মোটেই না।' এভিচ্কা বলে ওঠে—'মোহান এতক্ষণে দরজার তালা খুলে আলো জ্বেলেছে মাত্র।' ওরা এগিয়ে যায়।

মোহানের বৈঠকখানা ঘরে চমৎকার হলুদ আর গাঢ়নীল সোফা কোচ, ভেলভেট মোড়া—পুরোনো ফ্যাশনের। বসলেই অনেকখানি দেবে যায় স্প্রিং। চারদিকে পুরোনো ধরনের মেহগনির আসবাবপত্র। ভারী গোল টেবিল, ভারী তাকে বই—ঘরের কোণে রাখা মোটা কাচের তৈরি টবে সবুজ লতাপাতা বেড়ে উঠছে। পায়ের নিচে দামী গালচে পাতা।

বিপাশা মাঝের খোলা দরজা দিয়ে দেখল পাশের ঘরেও আলো জ্বলছে—মোহান সেই ঘরে। সেটা স্পষ্টতই অফিস ঘর। সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর বইয়ের তাকগুলো দেখা যাচ্ছে—ওঘরে সব আখরোট-পালিশ মডার্ন আসবাবপত্র। মোহান একটা ক্যাবিনেট খুলছে। একটু পরেই একরাশ

BanglaBook.org

চমৎকার কাটগ্লাসের গেলাসের টুংঠাং বাজনা বেজে উঠলো এ ঘরের টেবিলে। নানান মাপের নানা গড়নের বোতলও হাজির করলো মোহান। এক মিনিট বিপাশা ভাবলো—এটা যে-কোনো বুর্জোয়া মদের পার্টির চেয়ে আলাদা কি? দূরছাই, এই বোকা-বোকা তুলনাগুলো কেন যে আসে!

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তো পাশ্চাত্যের ক্রিশ্চান সামাজিক লৌকিকতার তুলনা চলবে না। তাছাড়া অতিথি সৎকারের কানুন সর্বত্রই বিশেষ। বিপাশা নিজেকে খেয়াল করিয়ে দেয় অকারণ প্রেজুডিস থেকেই এসব ভাবছে সে। কেন, পিকিংয়ে যখন বিদেশী অতিথিরা যান, তখন কি বিপুল ব্যাংকোয়েট দেওয়া হয় না? এমন কি নিমন্ত্রনের বেলাতেও?

গেলাসগুলো ভরতে শুরু করেছে মোহান এবং দেনিশ, গেয়র্গ চুপচাপ বইয়ের তাকের কাছে দাঁড়িয়ে এটার-ওটার পাতা ওলটাচ্ছে, বেচ্কা আর এভিচ্কা বাথরুমে গেছে, বিপাশাকেও ডেকেছিল, সে যায়নি। এভিচ্কাকে একটু ঘন ঘন বাথরুমে যেতে হয় আর বেচ্কাকে ঘন ঘন ঠোঁটের রং পুনর্লেপ করতে হয়।

বিপাশা রং মাখে না। তারও ইচ্ছে বই উল্টে দেখা—কিন্তু বই তো সব চেক কিংবা স্লোভাক ভাষায় লেখা। উল্টে কী হবে? তা ছাড়া গেয়র্গের কাছে যেতেও ওর রুচি নেই। গেয়র্গের পুরো ব্যক্তিত্বের মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন নারী-বিরাগ ভিতরে ভিতরে বিপাশাকে অপমান করছে। বিপাশা চুপ করে বসে দেনিশ আর মোহানের মদ ঢালার কারকর্ম দেখছে।

—'বরফ নেই?"

মোহান বলে—'এত রাত্রে বরফ কোথায় পাব বল?'

—'কেন, এখানে কোনো আইস-মেশিন নেই? কিংবা রেফ্রিজারেটর?'

—'রেফ্রিজারেটর? আইস-মেশিন? হা-হা অট্টহেসে উঠল মোহান।

দেনিশ বলল—'তুমি কি ভেবেছ এটা নিউইয়র্ক? না শিকাগো?'

লজ্জিত হয়ে বিপাশা বলে—'তা কেন, কিন্তু—'

—'ওসব কিন্তু টিন্তু নেই।' মোহান বলে—'ওসব ক্যাপিট্যালিস্ট কাণ্ট্রির আরশোলা মাদাম—এখানে যে মদগুলো আছে এই ঢের।'

কথাটার সুরে আদর্শবাদের টংকার শুনতে পেল না বিপাশা, বরং একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাস কি?

এমন সময়ে বিনা টোকাতে ধড়াস করে মস্ত কাঠের কারুকার্য করা দরজাটা খুলে যায়—ঘরে ঢুকে আসে একটি বৃষস্কন্ধ কিন্তু শালপ্রাংশু নয় এমন মূর্তি। এই শীতে তার পরনে শুধু একটা গরম পুলোভার—কোনো কোট নেই। দুই হাতে সে বুকের কাছে জড়ো করে আছে একটি লাল মাটির টব। হাতে দস্তানা নেই. টবে কয়েকটি ঋজু সবুজ পাতার মধ্যে চারটি টুকটুকে লাল টিউলিপের কুঁড়ি।

বিপাশা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। দু'হাতে তো টবটা ধরা, ও দরজার হাতল ঘোরাল কোন্ উপায়ে?

মূর্তিমান বসন্তের মতো ছেলেটি ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে—'য়ো-হ্-ন!'

দরজার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। দরজা খুলে ধরেছিল বেচ্কা এবং এভা। তারাও ঘরে এসে যে যার আসন নেয়।

ছেলেটি ইতিমধ্যে স্থানীয় ভাষায় খুব হট্টগোল জুড়ে দিয়েছে। মোহানকেও চুপ করিয়ে দিতে পারে এ-ছেলে।

এভা বলে—'মিরকো। মাডুনিচ্কি মিরকো। খুব নামকরা প্লেয়াইট। এখনকার প্রফেশনাল

BanglaBook.org

থিয়েটারে ওর নাটক হয়। নানান ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করে ও নাটকে, যেমন নাচগান ব্যবহার করে, পুরনো ফোকলোর ব্যবহার করে- -'

—'মাডুনিচ্‌কি মিরকো।'

বিপাশা চমকে ওঠে। ছেলেটি হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে ওর পায়ের সামনে। দু'হাতে ফুলে ভরা টিউলিপের টব। বসন্তের ফুল টিউলিপ সাধারণত এপ্রিলেই ফোটে। গাছটি তাকেই নিবেদন করা হচ্ছে।

'.....' অজানা ভাষায় অনেক কিছু বলে যায় মিরকো, চোখ দুটো ঝলমল করে ওঠে কৌতুকে।

'মিরকো ইংরিজি জানে না, মিরকো বলছে-- সে আজ তোমাকে খ্রিস্ট কুইন আখ্যা দিচ্ছে, আমাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে রূপসী—তুমি যদি দয়া করে এই টিউলিপ ফুল গ্রহণ করো, মিরকো কৃতকৃতার্থ হবে—'

বিপাশার মনে হল, যেন তার লজ্জা-পাওয়াটা ঘরসুদ্ধু সকলেই বেশ উপভোগ করেছে। বারবার অন্য মেয়েদের সামনে তাকে এভাবে আলাদা করে বেছে নিয়ে রূপসী বলাটা তার মোটে ভাল লাগছিল না।

পশ্চিম ইউরোপের আদবকায়দা আরো সূক্ষ্ম, অনেক বেশি পরিশীলিত—অন্যদের কথা সবাই সর্বদা মনে রাখে।

এভার কিছুই মনে না হতে পারে—তার শুক-জামার নিচে তার হৃৎপিণ্ড ধ্বজা উড়ছে। কিন্তু বেচ্‌কা? সে পরমাসুন্দরী হলেও এখনও তার কোনো প্রণয়ী নেই।

বেচ্‌কা বিপাশাকে বলেছে, সে বুচরো প্রণয়ী চায় না, —পতি পরম গুরু চায়। মনের মতো পাত্র পাচ্ছে না।

দোভাষীর কথা ফুরোবার আগেই বিপাশা মিরকোর হাত থেকে ফুলের টবটা নিয়ে নিয়েছিল। এবার টবটা কোথাও রাখতে হবে। একটা পছন্দসই জায়গা খুঁজতে বিপাশা উঠে দাঁড়ায়।

আর সঙ্গে সঙ্গেই মিরকোর সবিস্ময় শ্বাস টানার শব্দে ঘর সচকিত হয়। মিরকোর দু'হাত সামনে বাড়ানো, কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত পিছনে হেলানো, মুখ 'O' হরফের মত হাঁ-করা। এই নাটকীয় ভঙ্গিতেই সে কিছু কক্ষশ্বাস বাক্য বলে।

দরময় সকলের হাসির মধ্যে দোভাষি অনুবাদ করে দেয়—

--'হে বসন্ত-সম্রাজ্ঞী, তুমি উঠে না দাঁড়ালে আমি বুঝতেও পারতুম না তুমি কত বেশি সুন্দর, ঠিক যেন একটি বাসন্তী পরী, যেন একটি সবুজ ঘাস-ফড়িং।'

বলতে বলতেই বিপাশা উপলব্ধি করে, সে শূন্যে পা ছুঁড়ছে। মিরকোর শক্ত রুক্ষ দুটি হাত ফুলের টবের বদলে এখন বিপাশাকেই তুলে নিয়েছে, শূন্যে একপাক ঘুরে যাচ্ছে বিপাশা—তার নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো দামই নেই এখন।

মিরকো একটা গান গাইছে, খুব মোটা গলাতে—বিপাশা সুর-তালের ধরন থেকেই আন্দাজ করতে পারে—লোকসঙ্গীত হবে কোনো।

হঠাৎ একটা লাইনে ঘরসুদ্ধু সবাই গলা মেলায়।

বিপাশা গানের কথাগুলো কিছুই বোঝে না—দু'হাতে স্ফুটনোন্মুখ টিউলিপের টবটিকে বুকে আঁকড়ে শূন্যে ঝুলে থাকে সে—ঘন বাদামী চুলগুলো চোখের সামনে। হাতে ফুলের টবটা না থাকলে সে চুল টেনে ঠিক ছিঁড়ে দিত বিপাশা। কী দামাল ছেলে রে বাবা! নিজের হালকা পাতলা চেহারাটার ওপরই বিপাশার ভীষণ রাগ হতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কোথায় একটা ময়লা পর্দা ঝুলছিল, যেটা ছিঁড়েখুঁড়ে পরিষ্কার যৌবনের আলো এসে পড়লো ঘরটায়—তিন-চার পাক ঘোরার পরে...মিরকোর গানের কলি শেষ হল, বিপাশাকে নামিয়ে

BanglaBook.org

দিয়ে সে তার হাত থেকে ফুলের টবটি নিয়ে টেবিলে রেখে দিল এবং টবমুক্ত দুটি হাতের পাতাতেই দু'টি সশব্দ উষ্ণ চুম্বন রাখলো।

বিপাশার মাথায় ঘূর্ণি লেগেছে। এতটা নাটক তার ধাতে সয় না। সামনের সোফাটায় এলিয়ে পড়ে বিপাশা। মাথা ঘুরছে। সমীর, তুই যা রোগা, তুই কোনোদিনও পারতিস না এরকম দস্যির মতো ঘুরপাক খাওয়াতে আমাকে! পারতিস? সমীর, সমীর—

—'বাব্বাঃ! মিরকো, হচ্ছেটা কি? দেখছো একেই ওইরকম পাখির মতো চেহারা, অমন অত্যাচার করতে হয়?'—য়োহান ধমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এক গ্লাস পানীয় এগিয়ে দেয়।

কী পানীয় জিজ্ঞেস না করেই বিপাশা গ্লাসটা নিতে যাচ্ছিল—কিন্তু তার আগেই মিরকো কেড়ে নেয় গ্লাস এবং তুলে ধরে বিপাশার ঠোঁটের কাছে—সঙ্গে সঙ্গে তার দুর্বোধ্য ভাষায় গদগদকণ্ঠে কোনো কবিতার লাইন আবৃত্তি করে। আবার ঘরসুদ্ধু হেসে ওঠে।

রাগ করেও রেগে উঠতে পারে না বিপাশা। এত বড় প্রকাণ্ড দেহটাকে মিরকোর হাসিমুখখানা বড় বেমানান। ওর ঘাড়টা যেন ঘাড় নয়, গর্দান। দেখলেই বৃষ কি মহিষের কথা মনে পড়ে। অথচ মুখটি ঢলঢল করছে কৈশোরের লাবণ্যে। বছর পঁচিশেকের বেশি কক্ষনো হবে না—বিপাশারই সমবয়সী হবে মিরকো।

ভাবতে না ভাবতে সে চুমুক দিয়ে ফেলেছে গ্লাসে আর গলার ভেতরটা জ্বলে গেছে কড়া ভদ্‌কার আগুনে। মিরকো তাকে নতি জানিয়ে 'বাও' করে, সবিনয়ে গ্লাসটি হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজে চুমুক দেয়।

এবারে বেচ্‌কা, এভা, দেনিশ সকলে মিলে ধমক দেয় মিরকোকে—'ও বেচারীর ড্রিংকটা তুমি কেন খেয়ে নিচ্ছো? তোমার নিজের গ্লাস তো আছে!'

—'নিজেরটা খেলে যত নেশা হবে, এ গ্লাসটায় যে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি—এটা তো বন্ধুত্বের সন্ধি—' এক চোখ টিপে মিরকো দুষ্টু হেসে বলে শুদ্ধ ফরাসীতে।

—'বা রে, ফরাসী জানো তুমি? অথচ এতক্ষণ বলোনি না!'

বিপাশা আশ্চর্য হয়ে যায়।

—'আরো অনেক ভাষা জানে ও। হাঙ্গেরিয়ান তো আমরা সবাই জানি—এই স্লোভাকিয়াতে প্রত্যেকেই হয় মা, নয় দিদিমা, নয় বাবা কেউ না কেউ হাঙ্গারির লোক—তাছাড়া জর্মনটাও সবাই জানি—আর যারা সাহিত্য ভালবাসে তারা ফরাসীটা শেখেই—' দেনিশ বলছিল।

বিপাশার হঠাৎ কি মনে পড়ে যায়। দেনিশের কথার মাঝখানে সে বলে ওঠে—'আর রুশভাষা, সেটাও তো সব্বাই জানে। তাই না?' এবার দেনিশ কেমনতর একটু হাসে।

মিরকো বলে—'রুস্কী? নিয়েৎ! নিয়েৎ!' তারপর ফরাসীতে—'আমরা কেউ রুশভাষা জানি না। জানি কি? য়োহান? দেনিশ? এভিচকা? গেয়র্গ? জানি কি আমরা রুশভাষা?'

য়োহান হঠাৎ গম্ভীর গলায় কী যেন বলে চেক্ ভাষাতে মিরকোকে। অমনি দুজনে তর্ক বেধে যায়। জোরালো, সিরিয়াস তর্ক—গেয়র্গও তাতে মুখ খোলে। দেনিশ, এভা, এলিজাবেথ চুপ করে শোনে। এভা বিপাশাকে জানায়—'রাজনীতি নিয়ে তর্ক বেধেছে। মিরকো খোলাখুলি এমন সব কথা বলে, যা ঠিক বলাটা উচিত নয়। য়োহান ওকে সতর্ক করে দিচ্ছে। সেই নিয়েই তর্ক।'

দেনিশ বলে—'সত্যি, য়োহান ঠিকই বলছে। মিরকো বড্ড হেলেমানুষি করে।'

এলিজাবেথ বলল—'মিরকো তো শিল্পী, ও ঠিক বাস্তব দিকটা টের পায় না, আপন মনে থাকে।'

—'আহাহা।' এভা আপত্তি করে—'শিল্পী তো গেয়র্গও! তার তো বেশ বাস্তবজ্ঞান অতি টনটনে।'

BanglaBook.org

দেনিশ বলে—'এটা ব্যক্তিগত চরিত্রের ব্যাপার, শিল্পী-অশিল্পীর ব্যাপার নয়। তাছাড়া শিল্পীদের খেয়ালিপনাটা সম্পূর্ণ বানিয়ে তোলা বুর্জোয়া ভণ্ডামি মাত্র। একটা সামাজিক লাইসেন্স নিয়ে নেওয়া আর কি, যা খুশি তাই করবার জন্য। একজন এঞ্জিনীয়র কি একজন কবির চেয়ে কম সৃজনশীল? নাকি সমাজের পক্ষে সে কিছু কম জরুরী? কৈ, তার বেলায় তো কেউ 'আহা শিল্পীর খেয়াল', বলে সব ত্রুটি মার্জনা করে দেয় না?'

বিপাশার মনে হল সে সমীরের গলা শুনতে পাচ্ছে। ঠিক এই রকম তর্ক হত তাদের—কবি-শিল্পীরা সমাজে বেশী জরুরী, না ডাক্তার-এঞ্জিনিয়াররা? এক থালা ভাত বেশি জরুরী, না এক পাতা কবিতা? ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরটা খুব স্পষ্ট ছিল তাদের কাছে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে সব কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছে বিপাশার।

বাবা যখন জোরজুলুম করে বম্বেতে ধরে নিয়ে গেলেন, জবরদস্তি বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন, সমীর তক্ষুনি জেলে গেছে। তারপর থেকেই সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বিপাশার। সমীর, তুমি বুঝবে না, তুমি বিশ্বাস করবে না আমি পালিয়ে আসিনি। আমার সেদিন সত্যি কোনো দোষ ছিল না। আমার ক্ষমতা ছিল না। জোরালো বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারিনি। ফলে, তারই ফলে, আজ—দেখে যাও সমীর আমার দেহ, আমার মন, কী রকম খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো খুলে খুলে যাচ্ছে। কণ্টকিত, কণ্টকিত, সমীর! সমীর, তুমি কি জানো, বিপাশা এখন কে ও কী? সেই বিপাশা—তোমার বিপাশা? সে লণ্ডনে বসে ইংরিজিতে কবিতা লেখে এখন—এর চেয়ে অবক্ষয়ী আর কী বা থাকতে পারে! সমীর, সমীর, তুমি আমাকে ঘেন্না করো—আমি জানি আমি জানি আমি জানি—

•
• •

—'রুশভাষাটা আসলে আমরা সকলেই জানি।' এভা বলে—'ওটা আমাদের স্কুলেই শেখায়।' বলে একটু হাসে।—'যেমন তোমরা সকলেই ইংরিজি জানো। তেমনি আর কি।'

একটা ধাক্কা খেয়ে আবার ঘরটার মধ্যে ফিরে আসে বিপাশা। আবার একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে দেনিশ। যোহান এখনও তর্কে মত্ত। এভার মৃদু বাক্যগুলি খুব স্পষ্ট করে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। মিরকোর—'রুশী? নিয়েৎ।' স্পষ্ট হয়ে গেল। সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ব্যাপারটার ভাসা-ভাসা চেহারাটা হঠাৎ একটি মূর্তি পেল। ভাষা। তাই তো- সাম্রাজ্যবাদীর অন্যতম প্রধান অস্ত্রই তো তাই। ভাষার মাধ্যমে ভিন্ন সংস্কৃতি ভিন্ন চিন্তাধারা চাপিয়ে দেওয়া। মগজ ধোলাই হবে কিসে? ও, এবার বুঝছে বিপাশা তর্কটা কেন, তর্ক কিসের।

যোহান এখানকার স্থানীয় চ্যাপ্টারের ফার্স্ট সেক্রেটারি—তার এ ব্যাপারে অফিসিয়াল দায়িত্ব আছে। এরকম দায়িত্বহীন উক্তিকে বাধা সে দিতেই পারে। তবে যোহানই এস্টাব্লিশমেন্ট? অথচ ওর পোশাক-পরিচ্ছদে তো তার চিহ্ন নেই? ঠিক বিপরীত চালেই চলে সে। বাকী সকলের গলায় টাই আছে। মিরকোরই পরনে ঘ টার্টল নেক পুলোভার—আর যোহানের তো ভারি কোটটা খোলবার পরে সবুজ শার্টের খোলা কলার, এবং অনেকগুলো খোলা বোতামের ফাঁকে—বুকের সোনালি চুলগুলো কৌতূহলে ঘন হয়ে উঁকি দিচ্ছে বিপাশার দিকে। ব্লু জীন্‌সের নিচেটা ছিন্নভিন্ন, উলিঝুলি, কাদামাখা।

ঘরটি বেশ গরম সেনট্রাল হীটিং আছে নিশ্চয়ই। পুরুষরা প্রত্যেকেই জ্যাকেট খুলে রেখে কেবল শার্ট পরে আছে। দেনিশ তো অনুমতি চাইল টাইটাও খুলে রাখার।

গেয়র্গ আপনমনে পান করে যাচ্ছে। প্রায় নিঃশব্দ এই লোকটিই এখানে বিপাশার জগতের লোক। দ্বিতীয় কবি। ভাবতেই বিশ্রী লাগে বিপাশার। এখানে এসে অবধি তার কাছে এই ইংরিজি

BanglaBook.org

ভাষাতে ভারতীয় কবি হওয়ার ব্যাপারটির মৌলিক এ্যাবসারডিটি যেন খুব প্রকট হয়ে উঠেছে। ওর মনে হচ্ছে—এরা তাকে নিয়ে মনে মনে হাসছে।—"আহা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার—মাতৃভাষা না জেনে অত্যাচারীর ভাষায় নকল শিল্পসৃষ্টি করছে" কথাটা কেউ খুলে বলছে না বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবছে। এই গেয়র্গও।

যদি আমি আজ বাংলায় কবিতা লিখতাম, গেয়র্গ, তাহলে তুমি আমাকে নিশ্চয় এত অবহেলা করতে না। মনে মনে বলল বিপাশা। আসলে তোমরা আমাকে এলেবেলে করে রেখেছ আমি কোথায় আন্তর্জাতিক লেখক বলে বেশি সম্মান পাব—তোমরা আমার লেখা পড়তে পারছো, বুঝতে পারছো, সেটা কতখানি আনন্দের এবং সৌভাগ্যের কথা—তা নয়, তোমরা ভাবছো আমি সূর্য নই, চঁদ। আমার নিজের জ্যোতি নেই, ধার-করা জ্যোতি নিয়ে আমি ভাষা-শিল্পী হচ্ছি। তোমরা আমাকে করুণা করছো, বুঝেছি। এইখনে আরেকবার আমার দেশের লোকের সঙ্গে তোমাদের মিল। আরেকবার পাশ্চাত্যের সঙ্গে তোমাদের ফারাক্।

ইংরিজিতে লিখি বলেই না আমি আজ 'লেখক' হয়ে উঠেছি? আমি কি জানি না আমার চেয়ে ঢের ঢের ভাল কবিতা যারা বাংলায় লিখছে, পশ্চিমে কেউ তাদের নাম জানবে না কোনোদিন? অক্সফোর্ড বুক অব ভার্সে তারা থাকবে না। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভারতীয় সাহিত্য' কোর্সে কেউ তাদের মুখ দেখবে না, নাম শুনবে না। কিন্তু আমি থাকব। বিপাশা চৌধুরী, আমি থাকব। 'My Vindhya Nods' লিখেছি বলে আমি থেকে যাব। 'The Circe-Song' লিখেছি বলে আমি থেকে যাব। কিন্তু সমীর, জগতের কেউ তোমাকে চিনবে না, কেউ জানবে না তুমি জেলে বসে বসে কী কবিতা লিখলে। কিছু লিখলে কিনা। গেয়র্গ অবশ্য তোমার সঙ্গে কথা বলতো। গেয়র্গকে দেখলেই আমার ঘেন্না করছে।

মিরকোর মুড-মেজাজ সব নষ্ট। সমানে তর্ক করে চলেছে মোহান। বেচ্কা হঠাৎ উঠে গিয়ে দুজনের মাঝখানে দাঁড়ায়, কী যেন বলে। মোহান সচকিত হয়ে ঘড়ি দ্যাখে, বলে, 'সত্যি, ঠিকই বলেছো।'

মিরকোও হাঁপ ছাড়ে। বলে ওঠে- সুন্দর স্বচ্ছ ফরাসীতে -'আমার কিয়াসে অপেক্ষা করছে পাহাড়ের চূড়োয়, আমি তাকে আনতে যাব এবার, বার-টা বন্ধ হয়ে যাবার আগেই পৌঁছুতে চাই।'

—'তোমার কিয়াসে পাহাড়চূড়োর বারে বসে কী করছে?'

—'আমার পথ চেয়ে কান্নাকাটি করছে। আবার কি করবে?' মিরকো বলে।—'কিন্তু সে তোমার মতো এত সুন্দরী নয়, তোমাকে দেখলে তার খুবই হিংসে হবে।'

—'দূর!' মোহন বলে—'বিপাশাকে সে দেখবেই না তো—কাল ভোরেই ও চলে যাচ্ছে ভিয়েনা।'

—'তার আগে রাংকার সঙ্গে দেখা হচ্ছে বিপাশার।' স্থির গলায় মিরকো বলে।

—'আমি বিপাশাকে নিয়ে যাবো এখন পাহাড়ের চূড়োয়। তোমরাও আসতে পারো, একজন কেউ। আমার গাড়িকে তো চেনো। চারজন বসতে পারে খুব অতিরিক্ত ঠেসাঠেসি করলে।'

হাসতে হাসতে মোহন বলে ওঠে—'বাঃ মিরকো, বাঃ। আমার অতিথিকে তুমি নিয়ে যাবার কে বলো তো? চলো, আমিও সঙ্গে যাব পাহারা দিতে। এটা লুম্পেনদের রাষ্ট্র নয় মশাই। দুটি নারী নিয়ে ফুর্তি করা এ দেশে চলে না। সে তুমি যতই বড় নাট্যকার হও!'

—'নাট্যকার? আমি?' কৃত্রিম বিস্ময়ের চোখে তাকায় মিরকো।—'আমি তো মিস্ত্রি! আমি গাড়ির কারখানায় কাজ করি। বিপাশা, তুমি বুঝি আমাকে নাট্যকার ভাবছিলে সখি?' অত্যন্ত দুঃখিত। এই ইন্টেলেকচুয়াল কম্যুনিস্টগুলো ভীষণ মিথ্যা কথা বলে। আমি একজন খেটে খাওয়া লোক—খাঁটি শ্রমিক। এঁরা সব ইন্টেলেকচুয়াল—বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজকর্ম করেন—গেয়র্গ আবার

BanglaBook.org

মহাকবি। আমি বাপু কারখানার মজদুর—আসল প্রলেতারিয়েৎ। আসল চেকোস্লোভাকিয়া। অথবা বলতে পারো, আসল স্লোভাকিয়া। এই স্লোভাকিয়া সাদার্ন কান্ট্রিটা হচ্ছে গরীব কম্যুনিস্টদের দেশ—আর চেকদের রাজ্য, নদার্ন কান্ট্রি, যেখানে আলোকনগরী প্রাহা—সেইটে হচ্ছে বড়লোক কম্যুনিস্টদের অঞ্চল।'

—'মিরকো!' আবার একটা বিরাট ধমক খায় মিরকো—ধরসুদ্ধ সবার কাছে।—'বিপাশাকে তুমি একেবারে গোলকধাঁধায় ফেলে দিচ্ছো। ও কী ভাবছে বল তো এদেশটার সম্পর্কে?'

—'যা ভাবা উচিত তাই যাতে ভাবে, সেটাই বলছি তো'—মিরকো মুচকি হেসে বিপাশার খোলা কোমরে হাত রেখে।—'চল গো সুন্দরী, তোমায় পাহাড়ের চূড়োয় নিয়ে যাই। পথে যদি চাও তো আমার কারখানাও দেখিয়ে দিতে পারি। এই দানব, এই হিংসুটে, এই বজ্জাত মোহানটা যদিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসবেই। কী আর করব? উপায় নেই। এই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে তো সমাজের জন্য ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বলি দেওয়াটা অবশ্যকর্তব্য! সয়ে নিতেই হবে আমাদের মোহানের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি।'

•
• •

ঘোরানো পাহাড়ী পথ বেয়ে মিরকো তার ছোট্টো, নতুন প্লাস্টিকের বডিওয়ালা শাদা গাড়িটি সাবধানে চালিয়ে বিপাশাকে পাহাড়চূড়োয় নিয়ে চলল। রাস্তায় বেশি গাড়িটাড়ি নেই। যা আছে তার অধিকাংশই শোনা গেল রুশদেশে তৈরি।

পাহাড়ে উঠে মিরকো বলে—'ওই দাখো পদতলে পড়ে আছে স্লোভাকিয়া এণ্ড ইটস পীপল। এই যে ওপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখা, এটাই তো তোমাদের গলদওলা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির শিক্ষা। তাই না? বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকেরা সবসময় রাজনীতি-নিরপেক্ষ হয়ে সর্বত্রই এই নজরটা ধার করে নিয়ে ব্যবহার করে। তাই না, মোহান?'

মোহান উত্তর দেয় না। সে বোধহয় ঠিক করেছে আর ঝগড়া করবে না। ঝগড়া করতে করতেও তারা মদ্যপান খুব কম করেনি।

গাড়িতেই কোট রেখে যে নামবে, তার উপায় নেই। গাড়ি থেমে নামবামাত্র হাড়ের ভেতর কাঁপুনি ধরছে। এত ঠাণ্ডা। নিচে শত সহস্র রঙিন আলোর বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে স্লোভাকিয়া।

মিরকো বলল, 'দাঁড়াও, য়াংকার খবর নিয়ে আসি। কখন তার ছুটি হবে কে জানে।'

বিপাশা আর মোহান গাড়িতে উঠে বসে আবার একটা বাগানের মধ্যে গাড়ি থেমে আছে সামনেই একটা শাদা একতলা বাড়ি। হোটেল রেস্তরাঁ। ভেতর থেকে গানবাজনার ঝিনচাক ঝিনচাক শোনা যাচ্ছে। বেশ আধুনিক বাজনা। এবং বেশ অভিজাত দুশোর হোটেল।

একটু পরেই মিরকো ফেরে। সঙ্গে একটি অদ্ভুত দেখতে মেয়ে। তার সব চুল রূপোলি হঠাৎ দেখলে মনে হয় অশীতিপরা বৃদ্ধা। তারপরে চোখ যায়, এটা তার রং, করা কেশবিন্যাস-প্লাটিনাম-ব্লন্ড্ যাকে বলে, তাই সেজেছে য়াংকা। হাতের নখগুলিও খুব দীর্ঘ এবং রূপোলি ঠোঁটের রঙও রূপোলি। পরনে খুব মিনি-মিনি গোলাপী স্কার্ট আর শাদা ব্লাউজ, কোমরে শাদা লেসের এপ্রন। মাথায় শাদা লেসের টুপি। পা দুটি দীর্ঘ, সুগঠিত, কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ দুটি কোটরে ঢোকা, বুক অবশ্য তার ঠিক বিপরীত। য়াংকার বয়স ছাব্বিশ থেকে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত যা খুশি হতে পারে।

য়াংকা ওকে দেখে খুব খুশি হল। শাদা দাঁত বের করে রোগা মুখে ভাঁজ ফেলে হাসল। তারপর ওদের কোটগুলি খুলে নিয়ে ওদের ভিতরের ঘরে বসাল।

BanglaBook.org

বিপাশার তো ঘরে ঢুকেই চক্ষুস্থির। এই ক'দিনে ওর ধারণা হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার জীবনযাত্রা খুব ম্লান, নিষ্প্রাণ, নিরালোক এবং নিরানন্দ। ও জিজ্ঞেস করে জেনেছে—দেনিশ দুটি শিশু ও স্ত্রী সমেত একটি দু'ঘরের হোস্টেলে থাকে। এভিচ্কা থাকে স্বামীসমেত ওমনিই একটা একলা ঘরে। কারুরই কিচ্ছু নেই। কমন বাথরুম। সবাই বাইরে খেয়ে নেয়। এ আবার একটা জীবন নাকি? পথেঘাটে আলো কম, বাররেস্তরাঁগুলো বাইরে থেকে দেখে চেনা যায় না। খোলা না বন্ধ উঁকি মেরে তবে বুঝে নিতে হয়। এই প্রথম বাইরে থেকে ঝিনচাক শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গলাও। ঘরের মধ্যে এককোণে কঞ্চি পুঁতে আর পুঁতির ঝুরি ঝুরি মালা টাঙিয়ে একটি আলাদা ভাগ। সেখানেই নিয়ে বসালো ওদের য়াংকা।

যুক্ত অংশটিই দ্রষ্টব্য। সেখানে একদল অল্পবয়সী ছেলে—'স্টুডেন্টস' বলল যোহান—টেবিলের ওপরে চড়ে নাচছে এবং গীটার জাতীয় একটি তারযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছে। টেবিলে কিছু মেয়েও বসে আছে, দর্শক হয়েই, তারা ওই উদ্দাম নাচ-গানে অংশ নিচ্ছে না। যে ছেলেরা উদ্দামভাবে নাচ গান চালাচ্ছে তাদের কাছে গিয়ে বার বার কী যেন অনুরোধ করছে য়াংকার মতো গোলাপী স্কার্ট পরা অন্য একটি ওয়েট্রেস মেয়ে। তবু কান দিচ্ছে না।

এবার এগিয়ে গেল একটি পুরুষ ওয়েটার—প্রচণ্ড একটা ধমক শোনা গেল—গানের শব্দ ছাপিয়ে। কিন্তু গান থামল না। য়াংকা ইতিমধ্যে একটি কারাফে করে লাল মদ এনে সামনে রেখেছে তিনটি গ্লাস সমেত। নিজে কিছুই খেলো না য়াংকা। 'না, ডিউটির সময়ে আমাদের খেতে নেই।' যোহানই অনুবাদ করে দেয়।

সে এতক্ষণে বিপাশার দোভাষী হয়েছে। গেয়র্গ, দেনিশ, এভিচ্কার কাছে বিদায় নিয়ে এসেছে বিপাশা। কেবল বেচ্কার কাছে নয়। কাল ভোর পাঁচটার সময়ে বেচ্কা আসবে বিপাশার হোস্টেলে—তাকে শহরে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। দেনিশ, এভিচ্কা তাকে দুই গালে দুটো করে চুমু খেয়ে বিদায় জানিয়েছে। গেয়র্গের হাতঝাঁকুনি ছিল শীতল, অহিসর্বস্ব। ভাল লাগেনি। থেকে থেকে দেনিশের কথা মনে পড়ছে, এভার কথাও। আর কোনোদিনও ওদের সম্ভবত দেখবে না বিপাশা। না-দেখাই স্বাভাবিক। অল্প অল্প মন-কেমন করছে কি? মিরকো য়াংকার সঙ্গে গল্প করছে—বিপাশারই গল্প—বিপাশা বুঝতে পারছে ওদের চাহনি থেকে। যোহান বিপাশার চেয়ারের পিঠে হাত রেখে বসে আছে. মদের আর ঘামের একটা মিশ্র গন্ধ আসছে যোহানের গা থেকে

যোহান বলল—'বার বন্ধ করার সময় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ছেলেরা মাতাল হয়ে আছে, বন্ধ করতে দিচ্ছে না। ওরা একটার পর একটা লোকসঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছে। বেশ ভালই গাইছে কিন্তু।'

য়াংকা একটানা বসতে পারছে না বলে য়াংকাকে খুব ব্যাকুল দেখায়। সে ঘুরে ঘুরে তার টেবিলগুলিতে অতিথিদের প্রতি মনোনিবেশ করছে আর মাঝে মাঝে এসে বসছে।

পাশের টেবিলে এক মাঝবয়সী মোটাসোটা দম্পতি বসে আছেন। ভদ্রমহিলার ফাঁপানো চুল কালো রং করা, ঠোঁট লাল রং করা, চোখের পাতা নীল রং করা, ফুলকো গাল গোলাপী রং করা, ইত্যাদি। পরনে ফর্ম্যাল কালো গাউন, উদ্বৃত্ত বুকে একটি তাজা গোলাপ। ভদ্রলোকও কালো সুটে, শাদা টাকে ফর্ম্যালি সজ্জিত।

ওদিকের এক টেবিলের ধারে একজন বাগু বেহালাবাদক 'সেরানেড' করছেন এক তরুণ দম্পতিকে। দুজনকেই খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে।

ওখানে বাজানো শেষ হতেই পাশের টেবিলের ভদ্রলোক ডাকলেন বেহালাবাদককে। তিনি এসে, তাঁদের টেবিল ঘেঁষে একগাল হেসে, ছড় টানলেন মোক্ষম ধৈবতে-পঞ্চম—ভদ্রমহিলার কান পর্যন্ত টোল পড়লো রোমাঞ্চ-উদ্বেল হাসিতে।

BanglaBook.org

মিরকোকে ইঙ্গিত করে য়াংকা—বিপাশার জন্য ওকে ডাকবে নাকি? বিপাশা ভাষা না বুঝলেও বক্তব্য বুঝতে পেরে প্রবল আপত্তি করে। মোহান ওকে বাঁচায়।

—'মিরকো, এক্ষুনি এই বার বন্ধ হয়ে যাবে আর ঝামেলা বাড়িও না বাপু।'

এ যুক্তিটা য়াংকাও ফেলতে পারে না। ইতিমধ্যে ঐ টেবিলের নাচ এবং গান থেমেছে। পরম বিরক্তির গুঞ্জন সমেত সেই ছাত্ররা এখন বিল মেটাচ্ছে। মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়েছে।

পাশের টেবিলের বেহালা খুব রোম্যান্টিক মীড় তুলে মোটা মহিলার কানের কাছে বাজছে। য়াংকা আরেকবার ঘুরে এল—এবারে উঠতে হবে সকলকেই। পশ্চিমী রেস্তরাঁর নিয়মেই, ঘরের আলোগুলি হঠাৎ মলিন হয়ে গেল—শেষে মাত্র একটিই জ্বলতে লাগল মিটমিট করে—চেয়ার টেবিলের ফাঁকে পথনির্দেশ দেবার উদ্দেশ্যে।

বেরিয়ে এসে আবার গাড়িতে চড়ল সবাই। বিপাশা এবার পিছনে, মোহানের কাছে, মিরকোর পাশে বসলো য়াংকা। গোলাপী স্কার্ট, শাদা এপ্রন, শাদা টুপি সব ছেড়ে, চুলটা ফিতে দিয়ে টেনে বেঁধে ছাপা ফুল-ফুল ড্রেসের ওপরে টুকটুকে লাল একটি ওভারকোট পরে এসেছে য়াংকা। আরেকটু ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। ত্রিশের এদিকেই আছে মনে হয়, তবু মিরকোর সঙ্গে মানায় না। মিরকোর স্বপ্নগুলি এ মেয়েটির চোখে ধরা দেবে না। এ মেয়ে স্বপ্ন দেখতে জানে না। অথচ ওই রেস্তরাঁয় বসে নোটবইতে নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছে মিরকো—সে য়াংকাকে বিয়ে করবে এই গ্রীষ্মে। বিপাশাকে নেমন্তন্ন জানাবে তখন।

য়াংকার মধ্যে একটা কাঠিন্য আছে। খেটে-খাওয়া মেয়ে বলে বোঝা যায়। য়াংকা আগে একটা কারখানায় কাজ করতো, ওর মা বাবা দুজনেই কারখানার শ্রমিক। আজকাল ও বার-মেইডের কাজ করে। য়াংক নিজেও থাকে একটা চাকুরে মেয়েদের হস্টেলে।

উইক-এণ্ডের ছুটি সে মিরকোর কাছে এসে কাটিয়ে যাবে। শুনতে শুনতে বিপাশার অবাক লাগে।

একমাত্র চাষীর মেয়ে বেস্কাই থাকে বাড়িতে, খামার খামারবাড়িতে। সেইখানেই ফিরে গেল সে সেজন্য মোহানের অফিস থেকে। রাতে তাকে বাড়িতে যেতেই হবে। মা বাবা জেগে বসে থাকবেন মেয়ের জন্য।

ইতিমত পার্থক্য দেখতে পায় বিপাশা য়াংকা আর বেস্কার মধ্যে। য়াংকা শহুরে মেয়ে, য়াংকা শ্রমিক। য়াংকার শক্তপোক্ত পোড়-খাওয়া মুখে কারখানার চিমনির ধুলো-ধোঁওয়া-মাখা পারিবারিক ইতিহাস লেখা আছে। আর বেস্কার রূপলাবণ্যে, তার স্বাস্থ্যে, তার লাজুকতায় দিব্যি গ্রামগঞ্জের খোলা বাতাস, খামার বাড়ির তাজা সব্জীর গন্ধ। তফাৎও নেই খুব একটা দুজনের বয়সে, পঁচিশের এদিক-ওদিক দু'এক বছরের ছোট-বড় হবে। শহরে এবং গ্রামে, শ্রমিকে এবং কৃষকে এখনও যথেষ্ট ফারাক্। এই তথাকথিত তফাৎটা এতদিনে একটা রোমান্টিক, থিওরেটিকাল তফাৎ হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। এখনও যে এরকম বাস্তব একটা ফারাক্ সত্যিসত্যি বজায় আছে চাষী আর কারখানা শ্রমিকের দুটি স্টেরিওটাইপের মধ্যে, সেটা আশাই করতে পারেনি বিপাশা অবশ্য ভারতবর্ষে আছে, এবং মার্কিন দেশেও। দুটি চরম অর্থনীতির পরিস্থিতিতে। এমন কি এখানেও? এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও?

কিন্তু কী আশ্চর্য, এরা কেউই কি 'বাসা'তে থাকে না? যাদের সঙ্গে পরিচয় হল, তারা কেউ ফ্যামিলি কোয়ার্টার্সের বাসিন্দা নয়। একটিও স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে চিনল না বিপাশা। একটিও শিশু দেখল না। কর্ম অক্ষম বৃদ্ধ দেখল না। রান্নাঘর কি শোবারঘর দেখল না। একে কি একটা দেশ-দেখা বলে? কেবলই কিছু বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর, প্রদর্শনী আর রেস্তরাঁ? এ কেমন সরকারী যত্ন?

BanglaBook.org

—'দূর ছাই, তোমাদের দেশটা আমার দেখাই হোলো না।' বলেই ফেললো বিপাশা।

—'সে কি কথা?' শিউরে ওঠে য়োহান! ছোট্ট একটুখানি জায়গার মধ্যে এমনিতেই ভয়ানক ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে দুজনে। য়োহানের হাঁটু দুটো দুখানি স্তম্ভের মতো তার প্রায় চিবুকের কাছাকাছি উঁচু হয়ে আছে। বিপাশা ছোট্টখাট্টো বলে তবু বাঁচোয়া। য়োহান একটি দীর্ঘ হাত বিপাশার পিঠের ওপরে ফেলে রেখেছে। ক্রমশ পিঠটায় বামনের পায়ের মতো সর্বব্যাপী গুরুভার হয়ে উঠছে য়োহানের উষ্ণ সতৃষ্ণ হাতটা।

—'সে কি কথা?' য়োহানের সেই শিউরে ওঠা বিপাশার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। নেহাৎ বাধ্যকরী শারীরিক নৈকট্যের কারণে।

—'আমার দেশটা তোমার দেখাই হয়নি?' বলে য়োহান একটা ব্রাদারলি চাপ দেয় বিপাশার কাঁধে।—'কী সর্বনাশ! বলো, কী কী দেখতে চাও? এখনও ঘণ্টা-পঁচেক সময় হাতে আছে।'

—'কালই তোমার যাবার কী দরকার? দু'দিন থেকে যাও না।' মির্‌কো বলে।

ফরাসী য়াংকার আসে না, সে তক্ষুনি অনুবাদ দাবী করল। বিপাশা লক্ষ্য করেছে—য়োহান যখন ফরাসী বলে, বা ইংরিজি, য়াংকা তার মানে জানতে চায় না! কিন্তু মির্‌কো প্রতিটি শব্দের অর্থ তার জানা চাই। মির্‌কোও বেশ ধৈর্য ধরে আদর করে য়াংকাকে সব বুঝিয়ে দেয়। মির্‌কো বলে —'য়াংকাও বলছে বিপাশার কক্ষনো আজ যাওয়া উচিত নয়। এই তো উইক-এন্‌ডের শুরু।'

য়োহান কিন্তু খুব গম্ভীর—'কী হলো বলো তো বিপাশা? হঠাৎ কেন ও কথাটা বললে তুমি?'

বিপাশা এখন একটু বিব্রত বোধ করছে, তবু বলে—'আমি একটাও ফ্যামিলি দেখলাম না তোমাদের এখানে এসে। এ কেমন দেশ? তোমরা সবাই হস্টেলে থাকো কেন? হ্যাঁ, হতো যদি কমিউন, আমি বুঝতাম। এমন কি কিবুৎসও আমি বুঝি, কিন্তু এ তো তাও নয়। এ কেমন বাঁচা তোমাদের?'

হৈ-হৈ করে হেসে উঠে মির্‌কো জবাব দেয়—'একেবারে কাকতলীয় হয়ে গেছে ওটা। যার যার ফ্যামিলিতেই তো থাকে সকলে। সামান্য সংখ্যক ছাত্র-টাত্রই কেবল বিবাহিত হয়েও হস্টেলে বাস করে—আর্থিক অসুবিধের কারণে। যেই আর্থিক স্বাচ্ছল্য পায়, যে-যার বাসায় উঠে যায়। এভা দেনিশ এখনও ছাত্র। আমি একটা উড়নচণ্ডে। কিন্তু গেয়র্গ তো বাসাতেই থাকে,—যদিও সে একক। সেখানে তোমাকে আমি পাঠাবো না বাপু। এলিজাবেথ থাকে শহরের বাইরে। তুমি আজ ওর সঙ্গে ওর বাড়িতে চলে গেলে পারতে, দিব্যি খামার-বাড়িটাড়ি দেখে আসতে।'

—'ও ডাকলে তো যাব? কৈ, ডাকলো না তো বেচ্‌কা?'

—'ডাকবে কী করে? য়োহানের ভয়ে কারুর কিছু নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করবার যো আছে? নেহাৎ আমি একটা জন্তুবিশেষ, তাই তোমাকে ধরে এনেছি। য়োহান কি তাতে রাগ করেনি ভেবেছো?'

—'নিশ্চয়ই করেছি। গরিলাই বটে তুমি একটি।' য়োহান গোঁ গোঁ করে।

মির্‌কো হঠাৎ বলে ওঠে—'এই তো তোমার সমাধান সামনেই। ওই দেখা যচ্ছে য়োহানের একটি বাড়ি। য়োহানের তিনটে ফ্ল্যাট আছে—ব্রাটিস্লাভাতে একটা, এখানে একটা, আর ঐ যেটা দেখলে, অফিসে, ওই একটা। ওখানে ওর শোবারও বন্দোবস্ত আছে, বড় ডিভানটার মধ্যে বিছানাপত্তর সব রাখা আছে। কটা সংসার দেখবে তুমি? দ্যাখো গে যাও। ওর বউও আছে, বাচ্চাও আছে, মা-ও আছে—বিরাট সংসারী ব্যক্তি আমাদের অধ্যাপক মহাশয়। ওর বাড়িটা দেখলেই তোমার চেকোস্লোভাকিয়ার বড়লোকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সব জানা হয়ে

BanglaBook.org

যাবে।'

বলতে বলতেই মিরকোর গাড়ি ঢুকে পড়ে একটা আঙিনায়। সেখানে পাশাপাশি দুটো উঁচু উঁচু অট্টালিকা। কাচের টানা জানলার ফাঁক দিয়ে দীর্ঘ, আলোঝলা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে দশ-বারোতলা পর্যন্ত। এদিক-সেদিক কয়েকটি মাত্র জানলা চৌকো আলোয় জ্বলছে বিনিদ্র বাসিন্দার সাক্ষ্য হয়ে। আশ্চর্যের কথা, রাত এখনও একটা বাজেনি—ভয়ানক নিঝুমপুরী হয়ে গিয়েছে অঞ্চলটা।

—'কী? নামবে নাকি? দেখে আসবে অধ্যাপকদের বাসাবাড়ি কেমন হয়? তাদের জীবনযাত্রার মান কী রকম? এখন থেকে তোমার মেয়েদের হস্টেল দশ বারো মিনিটের পায়ে হাঁটা পথ।'

বিপাশা যোহানের দিকে তাকায়। চোখে প্রশ্ন। যোহান গাড়ির জানলা দিয়ে অন্যমনে বাইরে বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে।

মিরকে বলে—'যোহান, তুমি বাড়ি-ঘরদোর ওকে দেখিয়ে দু'পা হেঁটে ওকে পৌঁছে দিতে পারবে না? নাকি আমরা সবাই ওপরে যাব? এত রাত্রে এতজন ঢুকলে অত্যাচার হবে না ঘুমন্ত মানুষগুলোর প্রতি?'

'ঘুমন্ত মানুষগুলোর প্রতি অত্যাচার তো একজন লোক গেলেও হবে!' বিপাশা বলল।

মিরকে বাধা দেয়—'মোটেই না। যোহানের বউ ভারী ফাশনেবল আর অহংকারী, হাঙ্গেরিয়ান কাউন্টেস কিনা সে! আমাদের মতো প্রোলেতারিয়েতদের মানুষই মনে করে না। কিন্তু তোমাকে দেখলেই স্বজাতি বলে চিনবে তোমার সর্বাঙ্গে যা সোনাদানা!'—

সোনাদানা? বিপাশার এই প্রথম খেয়াল হোলো। তার হাতে একগাছি সোনার বালা, কানে সোনার পাশা, গলায় সোনার হার। বাঙালি মধ্যবিত্ত মেয়েদের যা সাধারণ সাজ। এবং শাড়ি ভর্তি সোনার জরির ফুল। আঙুলেও একটা সোনার আংটি আছে। সর্বাঙ্গেই সোনাদানা। সত্যিই তো। সমীর, তুই এসব খুলিয়েছিলি, আমি আবার পরে নিয়েছি। সমীর, আমি সব ফেলে দেওয়া জিনিস আবার তুলে নিয়েছি রে। স-ব।

হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ে যোহান। বিপাশার দিকে ডানহাতটা বাড়িয়ে দেয়—'ঠিক আছে, চলে এসো, একটা দেড়টার মধ্যেই তোমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসব। কাল আবার তোমার ভেবে বেরনো।'

—'এই তো চাই।' মিরকো সাবাস দেয়। যাংকা যখন গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে বিদায় নিতে এল, সস্তা প্রসাধনের কড়া গন্ধ নাকে আক্রমণ করে বিপাশার।

মিরকে বলল—'যাংকাই কেবল চুমু খাবে কেন? আমিও খাব।' সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাঙ্গে লৌহভীম-জড়ীয় এক মিলিটারি আলিঙ্গন, এবং দু'গালে সশব্দ সপ্রাণ ঠোক্কর-চুমু এসে পড়লো বিপাশার।

চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে মুখ বাড়িয়ে মিরকো বলল 'চিঠি দিও কিন্তু! চিঠি দিও নিশ্চয় বিপাশা, মিরকোকে ভুলে যেও না যেন, হোয়েন সবুজ ঘাসকড়িং আমাদের। আর টিউলিপটা সঙ্গে নিয়ে যাও। সারাটা বসন্তকাল ধরে মিরকোকে মনে পড়িয়ে দেবে ওরা। তোমাকে আমি ভুলব না ঘাসকড়িং, কোনোদিনও না—'

—jamais je ne t'oublirais'—মিরকোর গলার গানের একটা কলি সমেত ছোট্টো শাদা প্লাস্টিকের গাড়িটা বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার আলোর সঙ্গে মিশে হারিয়ে গেল।

বুকে টিউলিপের টব-আঁকড়ানো বিপাশাকে একহাতে আগলে নিয়ে যোহান দৌড়ে পোর্টিকোর নিচে এসে দাঁড়লো। এই পোর্টিকো মানে সেই গাড়িবারান্দা নয়, একটুখানি দাঁড়াবার মত ছাদ-ছাওয়া

BanglaBook.org

আশ্রয় মাত্র, ঠিক গেটে ঢোকবার মুখে। পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে প্রথমে বড় দরজা খুলল মোহান, বাড়ির ভিতরে ঠেলে দিল বিপাশাকে। বিপাশা লিফ্‌টের সামনে এসে দাঁড়ায়। মোহান অতি সাবধানে দরজা ভেজিয়ে বন্ধ করে এসে ফিসফিস করে বলল—'একদম কথা নয়। রাত অনেক হয়েছে তো।'

বোতাম টিপে টিপে হয়রান হয়ে গিয়ে মোহান একটা দিব্যি দিয়ে বলল,—'ব্যাটারা কোল্যাপ্সিবল গেটটা নির্ঘাৎ খুলে রেখেছে কেউ। যত সব!'—

বিপাশার হাসি পেয়ে যায়। এও আবার এক দেশোয়ালি স্বভাব। পাশ্চাত্যদেশের মানুষজন প্রায় কখনোই এই ভুলটা করে না। পুঁজিবাদীরা পুঁজিবাদীদের সুবিধে না দেখলে কে দেখবে। অথচ এই সমাজতান্ত্রিক দেশে...এমনও ভুল হয়? বিপাশা কোনোদিনই ভালো বিপ্লবী তৈরি হতে পারেনি, সমীরের জন্যেই সে বিপ্লবী হয়েছিল, বিপ্লবের মাধ্যমে সমীরকে পায়নি। এইখানে একটা বিরাট তফাৎ থেকে যাচ্ছে প্রকৃত বিপ্লবী আর বিপাশার মধ্যে। বিপাশা আপ্রাণ ইচ্ছেয় বিপ্লবী হয়েও হতে পারল না—শেষ জিৎ হল তার বাবা-দাদারই। শেষ পর্যন্ত সে বাবার জোরজুলুমের কাছে নতি স্বীকার করে বিলেতে পালাতে বাধ্য হয়েছে—এবং পাঁচ বছর ধরে আর ফিরে যেতে সাহস করেনি।

একদিকে পার্টি, অন্যদিকে পুলিস, আর ওদিকে জেলের মধ্যে সমীর স্বয়ং—কাকে ফেস করবে বিপাশা? বিপাশা বুঝে গেছে, সে দুর্বল। মধ্যবিত্ত সমাজে, ভারতীয় স্ত্রীলোকের যা যা দুর্বলতা থাকে, যার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ—সে সমস্তের কাছেই হার মেনেছে বিপাশা নিজে।

পার্ক স্ট্রীটে ওদের ফ্ল্যাট বাড়িতে লিফ্‌টটা কক্ষনো ব্যবহার করতো না সমীর—চারতলা হেঁটেই উঠতো। এসব অধুনিক দশ বারোতলা ফ্ল্যাট বাড়ি তো নয়, ওদের ফ্ল্যাটগুলো সাহেবি দিনের লাকশারি ফ্ল্যাট, পাঁচতলা, বড়জোর ছ'তলা। সমীর, কি করবে তুমি বিশ্বাস করবে জানি না, বাবা আমাকে জুলুম করে বম্বে নিয়ে গিয়েছিলেন—আমি ইচ্ছে করে তোমাকে ছেড়ে যাইনি, সমীর।

লিফ্‌ট নামলো না।

—'তুমি দাঁড়াও, আমি ওপরে গিয়ে লিফ্‌ট নিয়ে আসছি। ফুলটা আমাকে দাও—' বলেই টিউলিপের টবটা কেড়ে নিয়ে মোহান দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।

বিপাশাও পিছন পিছন উঠতে শুরু করে।

মোহান পিছন ফিরে তাকায়। ইশারায় দেখায়—'কথা নয়। পা টিপে টিপে!'

বিপাশা বেশ মজা পায় এতে। এত বড় একজন অধ্যাপক, সাহিত্য সমালোচক হিসেবে দেশে যিনি এখন শ্রেষ্ঠ নামগুলির অন্যতম, তিনি এত সন্তর্পণে চলেন প্রতিবেশীদের ডিস্টার্ব করবার আশংকায়। কতটা অন্যের প্রতি সচেতন ভাবনা থাকলে এটা হয়। যেমন কেউ কেউ লিফটের দরজা বন্ধ করে না, তেমনি কেউ কেউ আবার মোহানের মতও তো হয়।

ক'পাক উঠলো সিঁড়ি বেয়ে, বিপাশা গোনে নি। তার সামনে ভারী কালো কোট, ময়লা ব্লু জীন্সের প্যান্ট, বগলে একটা ব্রীফ কেস, দুই হাতে ফুলন্ত টিউলিপের টব জড়ানো—দু'তিন সিঁড়ি বাদ দিয়ে দিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠছে মোহান, কিন্তু টেনিস শু-তে শব্দ হচ্ছে না।

সেই দীর্ঘ মূর্তির পিছু পিছু ক্ষুদ্র বিপাশা উঠছে, তবে লাফিয়ে নয়। সরু স্টিলেটো হীলের উঁচু জুতো তার, খুট খুট শব্দ হবেই—তাই জুতো খুলে হাতে নিয়েছে সে, নাইলনের মোজা পরা পায়ে আস্তে আস্তে উঠছে।

ডানদিকের একটা ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়ালো মোহান। দাঁড়িয়েই টবটা কাঁখে নিয়ে পিছন ফিরে ঠোঁটে হাত ছোঁওয়ালো—'চুপ!'

জুতো খুলে বিপাশাকে হয়তো আরো ছোট্ট দেখাচ্ছে মনে হতে বিপাশার নিজের একটু

BanglaBook.org

লজ্জা করলো। কখন যে ঘরে ঢুকে পড়ে জুতো দুটো পায়ে গলাবে! এগিয়ে গিয়ে টিউলিপের টবটা নিয়ে নিল মোহানের হাত থেকে বিপাশা।

পকেট থেকে চাবি বের করে আবার খুঁজছে মোহান। একটা এই অফিসের একটা সেই অফিসের, শেষ পর্যন্ত ঠিক ঠিক চাবি বেরুলো, নিঃশব্দে দরজা খুলে ধরলো সে—বিপাশা ঢুকে গেল অন্ধকার একটা সরু গলির মত দালানে।

সিঁড়ির বাঁ দিকেও এমনিই একটা দরজা ছিল—তার কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওদের দালানে আলো জ্বলছে। অথচ এটা আঁধার। ভিতরে এসে অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে চেপে দরজাটা বন্ধ করে দেয় মোহান। পুরু কাচের দরজা

পেতলের গা-চাবি। এবার আরেক প্রস্থ চাবি অনুসন্ধান। ভেতরে আবার একটা দরজা আছে। এই অন্ধকার দালানের আবার দু মুখে দুটো দরজা

একটি দরজা খোলবার চেষ্টা করছে মোহান। ওর আনাড়িপনা দেখে অবাক লাগে বিপাশার। এই কি মানুষের নিজের বাড়িতে ঢোকার ধরনধারণ? এ যেন অন্য কারুর ফ্ল্যাটে চুরি করে ঢোকা হচ্ছে। কাচের দরজা দিয়ে সিঁড়ির আলো আসছে, তার মধ্যেই চাবিটি খুঁজছে মোহান, চাবি খোঁজার সময়ে খুব সাবধানে চাবির থলোটা চেপে ধরে থাকছে যাতে ঝঙ্কার না ওঠে—মহামান্য প্রতিবেশীর মূল্যবান নিদ্রায় যেন ব্যাঘাত না হয়। সেই উদ্দেশে আরো একবার ঠোঁটে তর্জনী দিয়ে বিপাশার বাক্‌স্ফূর্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিঃশব্দে ঠোঁট টিপে হেসে যাচ্ছে বিপাশা মোহানের কাণ্ডকারখানা দেখে। বাব্‌বাঃ। এ যেন নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চোরা-অভিসারে আসা হচ্ছে।—এক বিবাহিত ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীগৃহে এক বিদেশী অতিথিকে নিয়ে আসছেন, চেকোস্লোভাকিয়া দেশের ঘরসংসার কেমন হয় দেখাতে—এর মধ্যে এত লুকোচুরি—হাশ্‌-হাশ্‌-চুপিচুপি কিসের? ষড়যন্ত্রকারীর মত ভাব করবার কী আছে?

মোহানের সবই অদ্ভুত। যখন লোকজন থাকে, তখন তো প্রেমের ঠেলায় প্রাণান্ত। আর এখন? এই নির্জনে—সে নিজেই ভয়ের ঠেলায় নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। এত ভয়টা কিসের? না-হয় ঘুমই ভাঙবে একটু প্রতিবেশীর। তাই বা কেন ভাঙবে? এতগুলো কাচের দরজা ভেদ করে শব্দের পক্ষে ঘরে ঘরে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য অভিযান হবে।

বিপাশার কেমন যেন মনে হয়, এই সব ইওরোপীয় দেশে এখনও কিছুটা স্তালিনরাজের সময়কার ষড়যন্ত্রী আবহাওয়ার চাপ রয়ে গেছে—অকারণেই ভয় পায় এরা। সেই বন্ধ-জানলা, নিঃশ্বাসে-উষ্ণ ছোট্ট গাড়িটার ভিতরের বাধ্যকরী শারীরিক নৈকট্য ওদের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ আমেজ গড়ে দিয়েছিল, তা মোহানের এই ভয়-ভয় আচরণে কেমন যেন ছিন্ন হয়ে গেল। বিপাশার মনে কোথায়, একটু বেসুর বাজতে থাকে। অন্ধকার করিডর ফুটে ওঠে। বিপাশাকে ভেতরে টেনে নিয়ে একহাতে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দেয় মোহান। শব্দ হয় না.

এ কেমন অন্ধকার?

একবুক নিঃশ্বাসের সঙ্গে একরাত্রি তরল অন্ধকার টেনে নেয় বিপাশা। অদৃশ্য নতুন রংয়ের তাজা তীব্র গন্ধ ফুসফুসে প্রবেশ করে।

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোনো শব্দও নেই।

আশা-উদ্বেগের মাঝামাঝি একটা নাম-না-জানা অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলে বিপাশার স্নায়ু।

•
• •

কী আশ্চর্য! মোহান কোথায়? আলোটা কেন জ্বলছে না? সারা ফ্ল্যাটে একটিও আলো

BanglaBook.org

জ্বলে না কেন, বাড়ির কর্তা বাইরে যখন? ফুলের টব একহাতে জড়িয়ে বিপাশাই আন্দাজে হাত বাড়ায়। দরজার ঠিক পাশেই সাধারণত আলোর সুইচ থাকার কথা। হাতে ঠেকেও সুইচ। আঃ—হাতের ডগায় নিশ্চিন্দিপুর। সব স্পষ্ট হয়ে যাবে এইবার। বিপাশা কাঁপা হাতে সুইচ টেপে।

আলো জ্বলে না।

—'মোহান!' অন্ধকারে ওর খুব চাপা স্বরটাও চীৎকারের মত শোনায়।

—'ইয়েস, ডারলিং।' খুব কাছেই উত্তর আসে।

—'আলো? আলো কোথায়? আলো কি জ্বলবে না?'

তৃপ্তি মিত্রের অভিনীত রাণী সুদর্শনার মত মরীয়া সুরে কাতরে ওঠে বিপাশা।

—'নো, ডারলিং।' বলতে বলতে একহাতে লাইটার জ্বালায় মোহান। তখন দেখা যায় তার অন্য হাতে একটা চায়ের পিরিচে গলে-যাওয়া আধখানা খুব মোটা মোমবাতি।

মোমবাতিটা জ্বালিয়ে মোহান হাসে। আগের চেয়ে অনেকটা আলগা হয়ে এসেছে তার মুখের কঠিন হয়ে ওঠা রেখাগুলি। হেসে মোহান বাতিটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে বিপাশার হাত থেকে টিউলিপের টবটা তুলে নিয়ে মেঝেয় রাখে। তারপরে বিপাশার ওভারকোটটি সবিনয়ে খুলে নিতে থাকে।

—'ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয়নি বলে লাইন কেটে দিয়েছে!' বলে নিচু গলায় হেসে ওঠে মোহান। বিপাশার কোটটা নিয়ে দরজা খুলে ওয়ার্ডরোবে ঝুলিয়ে রাখে। নিজের কোটটাও খোলে।

সবুজ শার্টের তলার দিকে কেবল দুটো বোতাম লাগানো। মোমের আলোয় সেই খোলা বুকের ভেতর থেকে উঁকি দেওয়া লালচে চুলগুলো কিরকম যেন ভাতের দেখায়। গা শিরশির করে ওঠে বিপাশার।

সেটা চেপে দিয়ে নিজেকেই ধমকে ওঠে বিপাশা:

—তুমি কি একটা জন্তু? অন্ধকার, আর খোলা বুকের লোম দেখেই জেগে উঠলো?

মুখে বলে: 'সে কি? ইলেকট্রিক বিল দাওনি বলে সত্যি সত্যি লাইন কেটে দিয়েছে? কেন, ওয়ার্নিং দেয় না তোমাদের?'

—'দিয়েছিল। আমি এখানে ছিলাম না তো, তাই দেওয়া হয়নি।'

—'বাবে বা, তোমার স্ত্রী তো আছেন? তিনিও এই অন্ধকারের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন? বাচ্চাকাচ্চা সমেত?'

উত্তর না দিয়ে একটু হেসে ওয়ার্ডরোবটা বন্ধ করে দিয়ে জুতোমোজা খুলে, এক জোড়া নরম পশমের জুতো পায়ে দেয় মোহান। আরেক জোড়া ছোটো লাল পশমের জুতো এগিয়ে দিয়ে বলে—'এগুলো পরে নাও, আরাম পাবে।'

বিপাশার ইচ্ছে করে না অপরের জুতোয় পা গলাতে। সে বলে—'না, আমার খালি পায়ে বেশ লাগে।'

—'বেশ লাগবে না—ঘরে তো হিটার জ্বলবে না।'

—'কিন্তু ঠাণ্ডা তো নয়। সারা বাড়ি সেন্ট্রালি হীটেড, হয়ত সেই গরম আসছে।'

—'না, সম্ভবতই আসছে না।'

—'তবে কেন শীত করছে না?'

—'সেটা তোমার যৌবনের গুণ। অথবা আমারও হ'তে পারে।'—বলে এমন করে তাকায় মোহান, বিপাশার সমস্ত শরীর সত্যি শুধু সেই দৃষ্টিপাতেই গরম হয়ে ওঠে।

আবার নিজেকে ধমক দেয় বিপাশা। কী হচ্ছে বিপাশা? হলো কী, তোমার?

মুখে বলে,—ফিসফিস করেই—'তোমার চেয়ে তোমার বউয়ের গুণ হওয়াই বেশি স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

এখন তো তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

পিছন ফিরে আলোটা তুলে ধরে মোহান।

—'চল ঘরে যাই।' বিপাশার হাত একহাতের মুঠোয় ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে। মোহানের হাত ধরে পিছু পিছু যেতে যেতে হঠাৎ বিপাশার ইচ্ছে করলো পদক্ষেপ গুনতে—মনটা কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে।

—'পাঁচ, ছয়, সাত, আট—

—'এইটে আমাদের বসবার ঘর।'

মোহানের হাতের আলোয় বিপাশা তাকিয়ে দেখলো মাঝারি মাপের ঘর, সম্পূর্ণ ফাঁকা। এককোণে একটি ছোটো টী-পয়ে একটা এঁটো গেলাস আর একটি দেওয়ালের বেশ খানিকটা জুড়ে একটা কিছু পশমী কেমন জিনিস টাঙানো কোনো জন্তুর ছাল। অন্য একটা দেওয়াল জোড়া ব্রাউন পেপারের মত ক্যানভাসের পর্দা ঢাকা একটা বিরাট জানলা। সমস্ত ঘরে আর কিছু নেই। মেঝেয় অবশ্য সতরঞ্চি জাতীয় সস্তা কার্পেট। এই ঘর? এই বসবার ঘর? লোকে বসে কোথায়? আসন কই? চেয়ার-টেবিল? সোফা-কৌচ?

—'দ্যাখো, এই ওয়াল-হ্যাঙিঙটা ভালো না?' সেই লোমশ ছালের দিকে আঙুল তুলে দেখায় মোহান।—'আমার পছন্দ। যুগোস্লাভিয়া থেকে নিয়ে এসেছি।'

বিপাশার ভয়ানক আশ্চর্য লাগতে থাকে মোহানের এই সহজ ভাবটা। এইটেই যেন স্বাভাবিক—এই আসবাবহীন শূন্য ঘরের দেওয়াল সজ্জা সেই বিখ্যাত ছবি 'অলিম্পিয়া' মনে পড়ে যায় যেখানে পায়ের হীলতোলা জুতো দুটো নগ্না নারীর লাম্পট্য নগ্নতাকে করে তুলেছে প্রকটতর।

বিপাশা না বলে পারে না—'ওয়াল-হ্যাঙিঙ না করে ওটা মেঝেয় পাতলে লোকে বসতে পারতো।'

—'যাঃ সে কি, অত ভাল জিনিসে কেউ বসে? বসুক না যার যেখানে খুশি।'

—'কোথায়?'

বিপাশা ইওরোপের এই জন্তুর ছাল-প্রীতিটাকে মানতে পারে না কিছুতেই। কেমন যেন একটা বর্বরতা আছে এর মধ্যে, গুহা-মানুষজাতীয় আদিম পাশবিক রুচির ছাপ। ঘরের মেঝেয়, খাটের ওপরে যত্রতত্র এই লোমশ জন্তুর ছাল পেতে রাখাটা পশ্চিমে সুরুচির লক্ষণ!—পূর্ব ইওরোপে অবশ্য দেয়ালে টাঙানোটাই ফ্যাশন দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের ঘাড়ে-গলায় শেয়ালের ল্যাজ কিংবা মিংকের ছাল চামড়া জড়ানো—আর গায়ে চিতা বাঘের চামড়ার কোট চড়ানো—সবই খুব অমার্জিত, শ্রীহীন লাগে বিপাশার। কীরকম একটা কুরুচি আছে, একটা নিষ্ঠুরতা আছে, সভ্যতার পরিপন্থী কী-একটা ইঙ্গিত আছে ওই জানোয়ারের ছাল গায়ে দেওয়ার মধ্যে।

ভস্মমাখা, জটাজূটধারী, পশুপতি ভোলানাথের কোমরে যেটা খুব মানায়, ম্যানিকিওর্ড নোখ আর রংকরা মুখের নারীদের অঙ্গে সেইটে কখনো মানানসই হতে পারে? পশুর চামড়া জয় করার মধ্যে যে-জোরের পরিচয় মেলে—সেটা অবক্ষয়ী সভ্যতার ভুক্তাবশেষ।

নয়া সোসালিস্ট স্টেটে আর এসব থাকা উচিত নয়। ভাবতে ভাবতে বিপাশা অন্য কথা বলে—'কই, তোমার স্ত্রীকে বলবে না যে আমি এসেছি? বাচ্চাদের ঘুম ভেঙে যাবে, নইলে ওদেরও দেখতাম।'

এই কাঁপা কাঁপা মোমবাতির আলোয় দেওয়ালের বড় বড় ছায়াতেই রিক্ত ঘর ভরে গেছে—এই নিঃস্ব, শূন্য-আসবাব ঘরের একমাত্র সজ্জা এই মৃত পশুর চামড়া।

সত্যি খুব বিশ্রী লাগে বিপাশার। মনে হয় এটা যেন একটা গুহা ভূতের ভয়ে যেমন লোকে রামনাম বলে, তাড়াতাড়ি সে তেমনি শিশুদের প্রসঙ্গ তোলে—যা জগতের সবচেয়ে সুন্দর,

BanglaBook.org

সবচেয়ে পবিত্র বিষয়! যেন তা এই পশু প্রসঙ্গের নিষ্ঠুরতা ঢেকে দেবে।

—'বাচ্চাদের, না হলে বুড়ো মানুষদের ভাল করে না দেখলে একটা দেশকে ঠিক চেনাই হয়না।'

উত্তর না দিয়ে য়োহান মোমবাতি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পিছু পিছু বিপাশাও।

অন্য একটি ঘরে ঢুকে আলোটা উঁচু করে ধরে সে। দেওয়ালে একটি লাল-নীল-হলুদ, খুব চড়ারঙের মস্ত পোস্টার। সৈনিকদের মার্চ করে চলা, মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে আছে—লেখাগুলি বোধগম্য হল না, কেবল চেকোস্লোভাকিয়াটুকু বুঝল বিপাশা। ছোট ঘর। একটা দেয়ালে ঐ পোস্টার অন্য দেয়ালে দুটি সিংগল খাট—বাংক বেড। নিচে-ওপরে। একটি সিঁড়িও আছে। সৈনিকদের মতই ব্যবস্থা। খাটে গদি আছে, চাদর নেই।

—'এটা আমার বাচ্চাদের ঘর।'

—'কোথায় তারা? খাট তো খালি!'

—'তারা এখানে নেই।'

—'উইক-এন্‌ডে বেড়াতে গেছে বুঝি?' বিপাশা খাটের দিকে তাকায়, বেডকভার, বালিশ, চাদর, কম্বল—কিছুই নেই। নগ্ন গদি। মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাবার পরে খাট যেমন দেখায়।

—'না। উইক এন্‌ডে নয়। মামাবাড়িতে গেছে। হাঙ্গারিতে।'

—'সে কি? একা একাই?'

—'না। তাদের মায়ের সঙ্গে।'

—'মায়ের সঙ্গে মানে? তোমার স্ত্রী বাড়িতে নেই?'

—'আমার স্ত্রী চেকোস্লোভাকিয়াতে থাকতে ভালবাসে না, বিপাশা!'

—'হাঙ্গারি বুঝি চেকোস্লোভাকিয়ার চেয়ে ভাল জায়গা? এখন? ১৯৫৬ সালের পরেও?'

—'চুপ চুপ—বিপাশা, তুমি বড্ড এলোমেলো কথা কও। ওসব কথা এখানে তুলো না। কে কোথায় কি শুনতে পাবে—! আসল কথা হাঙ্গারিতে বুদাপেস্টটা আছে তো। সেটা তো একটা বড় শহর। আমার স্ত্রী সেই বড় শহরের মেয়ে। সেখানে ওর একটা সাংস্কৃতিক জীবন আছে। এই ছোট্ট শহর নীত্রাতে সে হাঁপ ফেলতে পারে না।'

—'ব্রাটিস্লাভাতে থাকো না কেন তোমরা?'

—'সেও এমন কিছু জায়গা নয়। হ্যাঁ, বড় শহর প্রাহা। কিন্তু আমার কাজ তো প্রাহাতে নয়।'

—'স্ত্রী নেই, আমাকে সেকথা তুমি বললে না কেন য়োহান? আসার আগে?'

—'বলবার কি সুযোগ দিল মিরকো?'

—'মিরকো তোমার স্ত্রীকে পছন্দ করে বলে মনে হলো না। কাউন্টেস বলে খোঁটা দিল।'

—'কথাটা খুব ভুল বলেনি মিরকো। ও তো পাগলা আছে, পটাপট সত্যি কথা বলে দেয়। সেটাই তো মুশকিল মিরকোকে নিয়ে।'

—'ওকে তুমি বললে না কেন, যে তোমার স্ত্রী হাঙ্গারিতে? তার অসুবিধেটা কী ছিল?'

—'বিপাশা, তুমি নিজেই ভেবে দ্যাখো তো, কেন বলিনি?'

—'আমি ভাবতে পারছি না।'

—'চল আগে অন্য ঘরগুলো দেখিয়ে আনি।' য়োহান বেরিয়ে আসে। আবার বিপাশার হাত নিজের হাতে তুলে নেয়। কিন্তু এবারে যেন সব কিছু পালটে গেছে। বিপাশার হাতটা ভিজে ভিজে হয়ে ওঠে। ওর ইচ্ছে করে হাত ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু নেয় না। অন্য একটা টানে হাতটা যেন আপনা আপনি আটকে থাকে।

BanglaBook.org

—'য়োহান।'

—'বলো, ডারলিং?

—'তোমার মা-ও তো এখানেই থাকেন। তাই না?'

—'তা থাকেন। এটা মারই ঘর। যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

একটা দরজা খুলে দেয় য়োহান। এ ঘরে একটি খাট। খাটে লাল, ভারী ওজনের ক্যাণ্ডলস্টিক-চাদর বিছোনো। বালিশটালিশ অবশ্য দেখা যায় না, চেকোস্লোভাকিয়ার খাটের ধারেই লুকোনো দেরাজ থাকে, তাতে ভরা থাকে বালিস, কম্বল! খাট সর্বদাই ডিভানের মতো পরিপাটি। ফাঁকা শাদা দেয়ালে কোনো ছবি নেই। একটি টেবিল একটা চেয়ার আছে এঘরে। টেবিলে অনেক কাগজপত্র রাখা ট্রে-তে। এ-ঘরে যে জ্যান্ত মানুষ বাস করে, তা মনে হয়। কিন্তু এ-ঘরেও আপাতত কোনো বাসিন্দা নেই।

—'মা কোথায়?'

—'প্রাহা গেছেন। মাকে মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরি করতে হয়। শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন।'

—'কে-উ নেই বাড়িতে?' বিপাশার গলায় একটা ভয়-ভয় ছায়া-ছায়া হু হু করা স্বর ফোটে,—যেন রাত্রির প্রান্তরের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়।

—'তাতে কি তোমার ভয় করছে, বিপাশা?' য়োহান হাতটি ঘিরে আনে বিপাশার কাঁধের ওপর দিয়ে।

বিপাশার শরীরে একটা চাপা কাঁপুনি স্রোতের মত বয়ে যায়, পায়ের আঙুলের ডগায় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

বিপাশা বলে, 'আমি তো একটা পূর্ণ সংসার দেখতে চেয়েছিলাম, এমনি একটা শূন্য বাসা, দেখতে চাইনি।'

—'আমি তো সেই জন্যেই তোমাকে ডেকে আনিনি বিপাশা। আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি। পরিস্থিতি শেষটা এমনই হোলো যে আমাদের সেটা থেকে বেরুনোর উপায় ছিল না।'

—'কেন? কেন ছিল না পথ? তুমি বললেই পারতে মিরকোকে—এখন তোমার স্ত্রী পুত্র, মা কেউই শহরে নেই। আমাকে ওরা নামিয়ে দিত হোস্টেলেই সোজাসুজি। এখন আবার এই বৃষ্টির মধ্যে তোমাকে বেরুতে হবে মিছিমিছি।'

—'সেটা কিছুই নয়। তুমি যে দয়া করে এসেছো বিপাশা, আমার এই শূন্যবাড়ি যে কয়েক মুহূর্তের জন্যেও তোমার পায়ের ছোঁওয়ায় তোমার গায়ের সৌরভে ভরে উঠেছে, সেটা কি আমার কাছে একটা প্রাপ্তি নয়? বরং তুমি বলতে পারো, এই বৃষ্টির মধ্যে এই খালি বাড়িতে তোমাকে টেনে আনটা আমার স্বার্থপরতা হয়েছে। তোমাকে বৃষ্টিতে হাঁটতে হবে। কাল অনেকদূর যাবে তুমি। হ্যাঁ, আমারই ওপরে বরং তুমি রাগ করতে পারো।'

—বলতে বলতে বিপাশার ছোট্ট হালকা শরীরটাকে নিজের মধ্যে নেয় একটুক্ষণের জন্যে য়োহান, ওই একহাতেই—অন্য হাতে সে মোমবাতির পিরিচটা ধরে আছে।

ওরা যে ঘরটায় এসে ঢুকল এবারে, সে ঘরের মেঝে ভর্তি সংসারের হরেকরকম জিনিসপত্র ছড়ানো—বড়বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স, সব মাল বোঝাই—এখনো আনপ্যাকড্ হয়নি। কিছু কিছু খোলা এলোমেলো পড়ে আছে।

—'ওই দেখো, ওই যে আমার সংসার!' কার্ডবোর্ডের বাক্স উপচে মাটিয়ে পড়ছে পোশাক, জুতো, বই, রান্নার বাসন—এক আশ্চর্য মানুষ বটে য়োহান।

—'এইটা আমাদের মাস্টার-বেডরুম। বুঝেছ? আমার এবং আমার কাউন্টেস-পত্নীর শয়নকক্ষ।'

ঘরটাতে কিছুই নেই। শুদোম ঘর। এক দেওয়াল ভর্তি টানা ক্যানভাসের পর্দা ঝুলছে। বোঝা

BanglaBook.org

গেল ওটা একটা বিশাল জানলা, পিকচার উইনডো। বসবার ঘরেও একটা দেয়ালভর্তি এই রকম চওড়া পর্দা ছিল।

—'কিন্তু এসবই তো সাময়িক বন্দোবস্ত। এই সব পর্দা তো থাকবে না? না?'

—'কেন থাকবে না?' য়োহান অবাক হয়ে বলে।

ব্রাউন পেপারের মত দেখতে ক্যান্‌ভাসের পর্দার দিকে আরো আরো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বিপাশা। ওর মনে পড়ে রেস্তরাঁয় দেখা দামী ভারী পর্দা, মনে পড়ে একটু আগেই দেখা য়োহানের অফিসে ভারী স্যাটিন ধরনের ট্যাপেস্ট্রী কাপড়ের পর্দা।

য়োহান বুঝতে পেরে বলে—'এগুলোও থাকবে, আবার ভেতর দিকে ভালো পর্দাও লাগানো হবে। এসব মায়ের ডিপার্টমেন্ট। ওসব আমি দেখি না।'

—'মায়ের? তোমার স্ত্রী দেখেন না?'

—'স্ত্রী তো ব্রাটিস্লাভার ফ্ল্যাটটা সাজিয়েছে। সেটা দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। ভীষণ লজ্জা করে আমার। আমার স্ত্রী কিছুতেই বোঝে না।—একদম বুর্জোয়া স্টাইলে—বুর্জোয়া কি, ফিউডাল স্টাইলেই বলব—সাজানো সেই ফ্ল্যাট। তার অনেক নিজস্ব সম্পত্তি নিয়ে এসে সেইখানে লাগিয়েছে সে। এটা আমার মায়েরই ফ্ল্যাট। মা তো কাউন্টেস নন, স্কুলটীচার। এটা প্রলেটারিয়েট ফ্ল্যাট।'

—'তোমার মায়ের একটা ফোটো দেখাবে?'

—'ফোটো? হঠাৎ?'

—'এমনিই।—তোমার স্ত্রীপুত্রদের ফোটো নেই?'

'থাকবে না কেন। এ্যালবামে নিশ্চয় আছে। কিন্তু এ্যালবামটা এখন কোন বাক্সোতে আছে—'

বিপাশা সামনে তাকিয়ে দ্যাখে অন্তহীন বাক্সো। কিছু বড়, কিছু আধখোলা। যেন একটা ইস্টিশানের প্লাটফর্মে মালগাড়ি খালাস হচ্ছে। মুখটা ঘুরিয়ে উপর দিকে তুলে য়োহানের মুখের দিকে তাকায় সে।

য়োহান বলে—'দাঁড়াও! ওইখানে দু'একটা ফোটো থাকতেও পারে।' বলেই একটা ছোটো বক্সফাইল জাতীয় বাক্স ঘাঁটতে লেগে যায় এক হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়ে।

বেরোয়ও।

একটি নয়, তিন-চারটি ছবি। রঙিন। একটি অহংকারী, বছর পঁয়ত্রিশের রূপসী, কোলের কাছে দুটি অত্যন্ত অহংকারী চেহারার শিশুপুত্র—ঠোঁট টিপে হাসছে তারা—মিলিটারি কায়দায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। একটি শাদা চুল বৃদ্ধা, আরো কয়েকটি মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসছেন

য়োহান তর্জনী দেখালো—'আমার মা, তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে।'

বৃদ্ধাকে বেশ ভালো লাগলো বিপাশার। আরেকটি ছবি—ওই অহংকারী নারীটির সঙ্গে দুটি নারীপুরুষ—তিনজনেই খুব রিল্যাক্সড, খুব হাসছে। পিছনে পটভূমিতে ওটা কি? আকাশে নোতরদাম গির্জের পদ্ম-জানলা না? বিপাশা বলে ওঠে—

—'একি, এটা ঠিক নোতরদামের মতো যে—চেকোস্লোভাকিয়াতে কোনো নকল আছে নাকি?'

—'ওটা নোতরদামই।'

—'বাঃ তোমার স্ত্রী বুঝি প্যারিসে গিয়েছিলেন?'

—'গিয়েছেন। এখন তিনি সেইখানেই। এ ছবি অবশ্য গতবছরের। ওর কোন ভগ্নীপতির সঙ্গে তোলা। প্যারিসেই থাকে।'

—'প্যারিসে? তবে যে বললে ওঁরা হাঙ্গারিতে গেছেন?

—'বিপাশা, প্রশ্ন কোরো না, প্লীজ প্রশ্ন কোরো না। আমি তোমার কাছে সব সত্যি কথা

BanglaBook.org

বলছি। স-ব। তুমি কিন্তু বেচ্‌কাকে এসব ঘুণাক্ষরেও বলবে না, কাল যখন দেখা হবে। এগুলো ভীষণ গোপন কথা। ভয়ংকর দামী গোপনীয়তা আমার।'

—'কেন, প্যারিসে যাওয়া বুঝি নিষিদ্ধ?'

—'ঠিক বুঝবে না তুমি। নিষিদ্ধ বলে কিছু নেই—অথচ নিষিদ্ধ অনেক কিছুই। আমার স্ত্রী তো প্যারিসে যায়নি গেছে হাঙ্গারি। সেখান থেকে প্যারিসে পালিয়েছে।'

—'পালিয়েছে? তার মানে?'

—'সব বলব তোমাকে, সব বলব বিপাশা, আমার লক্ষ্মীমেয়ে, সোনামেয়ে, ছোট্ট মেয়ে মিরকো ঠিকই নাম দিয়েছে তোমার—সবুজ ঘাস ফড়িং। এখন থাক, কেমন? একটু পরে হবে ওসব কথা।'

বিপাশা কেমন ভয় পেয়ে যায়। যোহান ওকে হঠাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে। মোমবাতিটা রেখে দিয়েছিল মেঝেতে ছবি খোঁজবার সময়েই। দুজনে মাটিতে আধোবসা হয়ে ছবি দেখছিল। যোহান ওকে জড়িয়ে ধরে আচমকা মেঝেয় শুইয়ে ফেলেছে। যোহানের শার্ট খোলা। ওর শরীরের খুব কাছে যোহানের লোমভরা বুকের চামড়ার গন্ধ।

বিপাশার সমস্ত দেহে হঠাৎ প্রস্তুতির সাড়া পড়ে যায়। কেউ কোথাও একটা জরুরি সিগন্যাল বাজিয়ে দিয়েছে। এবার ট্রেন আসবে—মেল ট্রেন। দূরের গুমটিতে ঘন্টি বাজছে, ঘন্টি বাজছে, লাইনে কান পাতলেই শোনা যাবে ট্রেনের চাপা ঝমঝম শব্দ—

সমীর দেখে যাও। তোমার সম্পত্তির কী হাল!

সমীর বলত—"একটা বিষয়ে আমি বাবা পুঁজিবাদী। তোমার ব্যাপারে তুমি আমার সম্পত্তি। আমার প্রাইভেট প্রপার্টি।"

ঘন হয়ে আদর করতে করতে সমীর বলত—"এই মেয়েটার জন্যে আমার আর পুরোপুরি কম্যুনিস্ট হওয়া হল না।"

সমীর, আমি তোর যোগ্য ছিলাম না রে। আমি একটা ফুরফুরে ফড়িং। একটা ঘাসফড়িং। মিরকো যেমন বলেছে। এই দ্যাখ আমার নেমকহারামী। এই দ্যাখ আমার নেমকহারাম শরীরে কেমন কাঁটা দিয়েছে—কেমন নেচে উঠেছে শিরার ভেতরে গরম গরম রক্ত—ঠিক যেমনটি হত তোর ছোঁওয়া পেলে। দ্যাখ রে সমীর—শরীরটা একটা বুনো জানোয়ার—পোষ মানে না—যখন যে-বনের তখন সেই বনেরই।

একটা মখমলের মত স্নেহের নরম গদির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে নিজেকে জোর করে টেনে তোলে বিপাশা। দুই হাতে জোরে ঠেলে দেয় যোহানের বুক—যোহানের ঠোঁট খুব বেশি কাছে চলে এসেছিল—এবারে সরে যাক, দূরে সরে যাক—

—'আমার তেষ্টা পেয়েছে, যোহান। উঃ কি গরম এখানে।'

বিপাশাকে মুক্তি দিয়ে যোহান উঠে পড়ে। ডান হাতটি বাড়িয়ে দেয়, বিপাশাকে তুলবে বলে। বিপাশা উঠে দাঁড়ায়।

•

• •

নিচু হয়ে মোমবাতিটা তুলে নিতে গেল বিপাশা—হঠাৎ আঁচলের ঝাপটাতেই বোধহয়, মোমবাতিটা নিবে গেল। আবার গভীর নিরালোকে সহসা নিক্ষিপ্ত হল সময়—বিপাশা—যোহানকে বুকে নিয়ে।

বিপাশা ভয়ার্ত, চেঁচিয়ে ওঠে—'যোহান?'

—'এই তো, ডারলিং।' ফস্ করে লাইটারটা জ্বলে ওঠে।

BanglaBook.org

—'দেখি, বাড়িটা দাও।'

মোম নিয়ে এগিয়ে যায় যোহান, আপন মনে বলে—'কি জানি কী পানীয় আছে ঘরে—কিছু আছে কিনা! এটা তো কোনো সংসার নয়!'

—'শুধু একটু জল পেলেই হবে। জল নেই?' বিপাশা ভয়ে ভয়ে বলে।

—'জ-ল আছে। বাঃ, জল থাকবে না কেন? বাথরুম-রান্নাঘর নেই?'

—'কি জানি! ভাবলাম যদি কনেকশন কেটে দিয়ে থাকে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার। সোস্যালিস্ট স্টেটের।'

—'ধুর পাগলি। ইলেকট্রিক বিল না দিলে ক্যাপিটালিস্ট দেশেরও কনেকশন কেটে দেয়। তোমাদের দেয় না?'

—'দেবার কথা অবশ্য। দেয় কিনা আমি জানি না।'

—'তুমি জানবে কি করে। তুমি তো বড়লোকের মেয়ে।'

—'কেমন করে বুঝলে? শাড়ি দেখে? ও থেকে কিছুই বোঝা যায় না।'

—'এইটে আমাদের রান্নাঘর।'

লম্বাতে ঘরটা খুব ছোট নয়। এক দেয়ালের গায়ে একটি ছোট চৌকো টেবিলের দুদিকে দুটি চেয়ার পাতা। টেবিলে নুন মরিচের পাত্রের সঙ্গে একটি ছোট সরুগলা কাচের ফুলদানি—তাতে প্লাস্টিকের পুষ্প-পত্র। বিপাশার মনটা একটু ধাক্কা খায়। তারপরেই খেয়াল হয়—'এটা কোন সংসারই নয়।' অন্য দেয়ালের গায়ে জোড়া-কলওলা সিংগল সিংক, মাঝারি ফ্রিজ, উনুন। কল খুলে হাত পাতে দেয় বিপাশা। ঠাণ্ডা জল। আঃ।

—'এই যে।' যোহান একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে। বিপাশা জলপান করে তৃপ্তি পায় অন্য কলটা খুলে হাত পাতে—একটু পরেই গরম হয়ে ওঠে জল।

—'তবে যে বললে বিদ্যুৎ কনেকশন নেই?'

—'এটা অন্য লাইন। বাথরুমেও গরম জল আছে। আমি তো স্নান করে নেব এখন। তুমি স্নান করবে?'

—'স্নান! স্নান কেন করব?'

—'না, এমনিই বলছিলাম। যদি চাও, বাথরুমটা ঠিক ওপাশটায়। এই ঘরেরই আধখানা।' বলে আঙুল দেখায় যোহান।

উৎসাহভরে সেদিকে যায় বিপাশা। একটি ছোট ল্যাভেটরি। তার দরজা বন্ধ করা যায়। আর একটি ছোট স্নানঘর—তাতে অদ্ভুত একটা বড় গোল গামলার মত বেসিন জাতীয় দ্রব্য—ওটাই বাথটব বলে সন্দেহ হয় বিপাশার। তার গায়ে দুটো কল, আর একটা শাওয়ারের নল ঝুলছে। চারপাশে পর্দা টেনে দেওয়া যায়। প্লাস্টিকের ভারী পর্দা রয়েছে। আর রয়েছে বাথ-সোপ—মস্ত বড় শাদা একটা সাবান। বিরাট এক তোয়ালে নিচে পাতা বাথ-ম্যাটও।

—'বাথরুম সন্দর্শন হল?' যোহান প্রশ্ন করে, 'স্নান করে দেখবে নাকি?'

—'না না; অন্যের বাড়িতে স্নান করব কি?'

যোহান হঠাৎ হেসে ওঠে—'কে রে? অন্যের বাড়িতে বাথরুমে যায় না লোকে? ল্যাভেটরি ব্যবহার করে না? তাতে দোষ নেই, আর স্নান করলেই দোষ?' হেসেই খুন করে যায় যোহান। 'ইশ্, বড্ড জোরে হাসা হয়ে গেল। তুমি যা জ্বালাও আমাকে! না হেসে পারি না।

—'জোরে হেসেছ তো কী হয়েছে? পড়শীরাও নিশ্চয় হাসে? এতে দোষটা কোথায়? এই হাশ্-হাশ্ চুপ-চুপ ব্যাপারটা একদম ভাল লাগছে না আমার।'

এ বাড়িতে ঢুকে অবধি এই বিপাশার চলেছে। স্টিলেটো হীল বলে জুতো খোলা দিয়ে যার শুরু। তারপর ফ্ল্যাটে আসা ইস্তক বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে ভেবে চিন্তাগ্রস্ত করেছে বিপাশা। কিন্তু এখন

BanglaBook.org

মা?'

—'কার ছেইলা? আমি জানি না'—বৃদ্ধার গলা আবার অন্ধকারকে দীর্ণ করেছিল।

—'কেডা? আমি কেডা?'

—'আপনি ব্রজসুন্দরী।'

—'ব্রজসুন্দরিটা আবার কেডা? কাদের বউ?'

—'ভগবান শ্রীহরি। ভগবান শ্রীহরি। পরম শত্রুরও যেন এমন দশা না হয়, ঠাকুর।' হঠাৎ দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সমীরের মাসীমা কান্নাধরা গলায় বিড়বিড় করেছিলেন।

বিপাশার সমস্ত শরীর দিয়ে ঢেউ খেলে গিয়েছিল একটা বিজাতীয় ভয়

সেদিনই বেহালায় একটা পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে গোটা তিনেক ছেলে খুন হয়েছে, বিপাশা এনেছিল কিছু রসদ,—ওই মাসীমা নিভীক ভাবে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ছেলেদের, সমীর বাদল দেবুদের জন্যে ওঁর দরজা সব সময়েই খোলা ছিল।

চোখের সামনেই একমাত্র সন্তানটি খুন হয়ে গেছে, তারই বিধবা বউ আর দুটি শিশু নিয়ে মাসিমা একা একা যুদ্ধ করে চলেছেন।

সেই মাসিমার হৃদয়ে অদ্ভুত একটা ভয়ের পদক্ষেপ শুনেছিল সেদিন বিপাশা। বৃদ্ধার সেই আকুল—'আমি কেডা?' শুনলে সত্যিই ভয়ে বুকের অন্তস্থল পর্যন্ত কেঁপে ওঠে—এই কি মানুষের শেষ পরিণতি?—আমি কেডা?

—'তুমি মজ্ বিপাশা চৌধুরী, বয়স পঁচিশ, ইন্দো-এ্যাংলিয়ান প্রোডাক্ট। ব্যারিস্টার সুবর্ণ চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে, আই পি এস অফিসার সুকান্ত চৌধুরী আর চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট সুজয় চৌধুরীর একমাত্র ছোট বোন—

সমীর চট্টোপাধ্যায়ের—বাজবন্দী সমীর চট্টোপাধ্যায়ের...কে? কে তুমি? তুমি কেডা? সমীরের তুমি কেডা?

BanglaBook.org

বাথরুম থেকে শাওয়ারের শব্দ আসছে দুটো ঘরের মধ্যে পার্টিশন দেওয়ালটার গাঁথনি ছাদ পর্যন্ত উঁচু নয়। ওপর দিকে বেশ খানিকটা শুধু কাচের। ওঘর থেকে গুনগুন গানের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

—'যোহা—ন!' হঠাৎ ডেকে ওঠে বিপাশা। চাপা-গলাতেই। এই বাড়িতে ঢুকে অবধি গলার স্বর আপনা আপনি চাপা হয়ে গেছে

—'কা—মিং ডিয়ার।' বুক ভরা আওয়াজে উত্তর আসে

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হয় যোহান। কোমরে কেবল একটা তোয়ালে। সেই শাদা হলুদ কাজ করা মস্তবড় তোয়ালেটা। তলা দিয়ে পেশিবহুল দুটি দীর্ঘ পা বেরিয়ে আছে।

—'স্যরি ডারলিং। আমার বর্বরতা মাপ করো।'

যোহানের গা থেকে শাদাটে স্বাস্থ্যকর একটা তাজা গন্ধ আসছে—বেশ স্যানিটারি এ্যান্টিসেপটিক টাইপের নীরোগ নির্দোষ গন্ধ। ব্লিচিং পাউডার ঢালা মেঝের মতন।

বিপাশার মনে হয় এর আগে ঘাম-ধাম-মদ-মদ জ্যান্ত ক্লান্ত গন্ধটাই বেশি মানাচ্ছিল যোহানকে। বাইরের এলো-মেলো যোহানের কিছু ছিটেফোঁটাও আর বাকী নেই এই ধোয়া-মোছা শ্বেতপাথরের যোহানের মধ্যে।

—'উনুনটা যে জ্বলছে না—ইলেকট্রিক তো নেই, নইলে তোমাকে কফি বানিয়ে দিতাম।'

—'কেন, কলেই তো গরম জল আছে।'

—'দূর! সে কি কফি নাকি? সে তো নেসকেফ্! নেস্‌কেফ আমরা খাই না।'

—'নেসকেফ্ না, নেসকাফে—'

যোহান হেসে ওঠে, —'জানি, আমি ইচ্ছে করে ঐরকম বলি।' বলে মিটিমিটি হাসতে হাসতে যোহান সামনের চেয়ারে এসে বসে।

—'তুমি তোয়ালেটা বদলে পেন্টুলুন পরে এসো তো—'

—'বাপ্‌রে! তুমি সত্যি সত্যি আমার বুনোপনা সহ্য করবে না?'

—'না। আমার জংলীদের ভাল লাগে না'

—'সত্যি? আমি তো ভাবতাম, মেয়েরা একটু আধটু জংলীপনা ভালই বাসে।'

—'আমি বাসি না।'

—'পেন্টুলুন পরে ভদ্রস্থ হও যোহান—পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।'

—'এক কাজ করবে বলো, তাহলে এক্ষুণি পেন্টুলুন পরে আসবো।' আহ্লাদে গলায় যোহান বলে।

—'কী কাজ? আচ্ছা ঝামেলা তো?'

'এই দীর্ঘ কাপড়টা তুমি কিভাবে গায়ে জড়িয়েছো সেই কায়দাটা আজ আমাকে দেখাতে হবে। পিওরলি সায়েন্টিফিক ইন্টারেস্ট! সেলাই না-করা পোশাক পরার ব্যাপারটা আমাকে চিরকাল মুগ্ধ করে। সেই গ্রীকদের যুগ থেকেই।'

—'তারই উদাহরণ বুঝি এই তোয়ালে পরা? এটা বোধহয় গ্রীক সভ্যতা? সেলাই-না-করা পোশাক!'

—'খানিকটা তাই, খানিকটা আলস্য, আর, খানিকটা—' মিটির মিটির হাসতে থাকে যোহান।

—'কী।'

—'বদমাইশি, বলতে পারো।' বলতে বলতে টেবিলের তলায় পা বাড়িয়ে, চটি খুলে বিপাশার পায়ে চাপ দেয় যোহান।

বিপাশার শিউরে ওঠাটা হয়তো বুঝতেও পারে সে। তাই কুঁ দিয়ে ক্যান্ডলটা নিবিয়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে রাখা বিপাশার হাতটা নিজের থাবার মধ্যে তুলে নেয়।

—'সত্যি বলতে কি, ইলেকট্রিক সাপ্লাই বিভাগের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কী সুন্দর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে আমাকে।'

যোহানের কথার উত্তরে বিপাশা কিছুই ভেবে পায় না। যোহানও কয়েক মুহূর্ত চুপ করেই থাকে এবারে। তারপরে বলে—

—'ওঠো, উঠবে? চল ও ঘরে যাই—।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে দাঁড়ায় বিপাশা।

যোহান ওকে হাত ধরে কে জানে কোন ঘরে নিয়ে যায়। আরও অন্ধকারে। কবিতরে যখন যোহান জড়িয়ে ধরে, বিপাশার হাত পা যথেষ্ট আপত্তি করে অভ্যস্ত নিয়মে। কিন্তু বুক কি অতটাই আপত্তি করে? বিশ্বাসঘাতক শরীর সহযোগী হতে চায় না?

বিপাশা কিছু ভাবতে পারে না—একটা গরম ভিজে চাপ থেকে ঠোঁট দুটো খুলে নিতে নিতেই বুঝতে পারে, ওরা কোনো একটা ঘরে ঢুকেছে।

—'পর্দাটা তুলে দাও যোহান, আলো আসুক।'

এই বাড়িতে ঢুকে অবধি আলোর জন্যে বিপাশার সমস্ত ইন্দ্রিয়ে মরুভূমির তেষ্টা—অথচ আলোর চেয়ে অন্ধকারই সাধারণত বেশি পছন্দ করে বিপাশা। কিন্তু এ বাড়ির অন্ধকারটা কেমন যেন জাল পাতছে। এই অন্ধকারের সঙ্গে যোহানের জীবনের নানান অন্ধকার যেন মিশে যাচ্ছে।

বিপাশার সমস্ত শরীরে যেন জড়িয়ে যাচ্ছে এই অন্ধকার। জলের তলায় যেমন দাম। একবার লেকে সাঁতার কাটবার সময়ে দুই পায়ে দাম জড়িয়ে গিয়েছিল বিপাশার। এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত চৈতন্যে অন্ধকার নেমে এসেছিল। কিন্তু মাত্র এক মুহূর্তই। তারপরেই দাম ছিঁড়ে পা

BanglaBook.org

মুক্ত করে নিতে পেরেছিল সে।

কিন্তু এ অন্ধকার যেন পা ছুঁড়ে হাত ছুঁড়ে একটুও ছেঁড়া যাচ্ছে না। নিচের গহনতর আঁধারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিপাশাকে। সমস্ত শরীরে ঝুরি ঝুরি দামের মত পেঁচিয়ে ধরছে অন্ধকার—দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—'যোহা—ন, পর্দাটা তুলে দাও, প্লীজ।'

যোহান পর্দা তুলে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃষ্টি ভেজা একটুকরো নির্জন মধ্য-রাত্রের পথ। একটা ল্যাম্পপোস্ট একটু দূর থেকে বিপাশাকে আলো দিচ্ছে। আলোকস্তম্ভটিকে বিপাশার হঠাৎ মনে হলো লাইটহাউস। যেন গভীর গহন পথহারা সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ দেখা গেছে আলোর ইশারা।

বৃষ্টিতে আলোটা কেমন আবছা জ্যোতির মত উদ্ভাসিত করে রেখেছে রাত্রির নির্জন পথ। একটা আধা তৈরি বাড়ির সামনে সিমেন্ট মাখার বিপুল যন্ত্রটা দাঁড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক দানবের মতো - অনেক ইঁট সাজানো একদিকে ভাল দেখা যাচ্ছে না --কেমন ইঁট। পথটার কালো, ঘুমন্ত সাপের মত চক্‌চকে পিঠে হিল্‌হিলে আলো পিছলে পড়ছে, বৃষ্টিতে।

মন্ত্রমুগ্ধ বিপাশা গিয়ে জানলায় দাঁড়ায়। যেন গভীর নিঃশ্বাস নিতে। জানলার পুরু কাচে ঘর একেবারে বন্ধছন্দ।

পর্দা তুলতে কেবল অদম্য আলোই এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘরে, আর এনেছে অনিবার্য কিছু আলুথালু ছায়া। কিন্তু বৃষ্টি, কি টাটকা বাতাস, কি শীত—এরা কেউই ঘরে ঢোকার ছাড়পত্র পায়নি।

বিপাশা জানলার কাচে নিজের নাকটা চেপে ধরে—মিষ্টির দোকানের সামনে ভিখিরির বাচ্চার মতন।

ওখানে আলো-বাতাস, ওখানে পথ, ওখানে বৃষ্টিভেজা রাত্রি, ওখানে জীবনের বয়ে যাওয়া স্রোত। একটিও মানুষ নেই পথে—আর আধো তৈরি গাছে তো থাকবেই না কেউ।

হঠাৎ দূর থেকে দুটি মানুষের ছায়া পথে আবির্ভূত হয়। বিপাশার সমস্ত মন নেচে ওঠে আকাশে মেঘের সমাগমে যেমন ময়ূরের খেয়াল। জেগে আছো? তোমরাও জেগে আছো?

হঠাৎ হাতে একটা আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে টাল সামলাতে পারে না বিপাশা—হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় মেঝেতে যোহানের শরীরের ওপরে। যোহান তাকে একরকম লুফেই নেয়।

—'উঃ!' ব্যথা চাপবার শব্দ বেরোয় বিপাশার মুখ থেকে।

যোহান তখনও শক্ত করে ধরে আছে ওর ডান হাতটা। দুঃখ প্রকাশের ধার দিয়েও যায় না সে—বরং এক ধমক লাগায়।

—'খবর্দার উঠবে না এখন স্টুপিড মেয়ে। জানলায় দাঁড়াতে আছে অমন করে, এই মাঝরাত্রে, লোকে কী ভাববে?'

বিপাশা স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

লোক কোথায়? কে ভাববে? এই ঘন অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাকে দেখাই বা যাবে কেমন করে? ওইটুকু পথের আলোয়? কতটুকুই বা সেই আলো? এ কেমনধারা ভয়ে সারাক্ষণ রেগে কুঁকড়ে আছে এই মানুষটি।

•

• •

সমীরদের পাশিয়ে বেড়ানোর দিনগুলো মনে পড়ে হঠাৎ শরীরটা কেঁপে গেল। না এর চেয়েও

BanglaBook.org

ঢের বেশি ভয়ের চেহারা তার দেখা আছে। যে-ভয়ে মানুষ রেগে উঠে মানুষকে খুনও করে ফেলে। প্রচণ্ড রাগের মধ্যেই পুরুষমানুষের ভয়ের চরম প্রকাশ হয়।

বিপাশা জেনে গেছে। যে টিউটোরিয়াল হোমটায় ওরা রাত কাটাতো, সেইখানে ঠিক এমনি করে সমীর ওকে টেনে নিয়েছিল একদিন—সময়টা ছিল সন্ধে সন্ধে—সমীরের খুব জ্বর হয়েছিল—সেদিন রবিবার। টিউটোরিয়াল হোম বন্ধ। বিপাশাকে ওখানে আসতে নিষেধ করেছিল সমীর, তবুও ছুটে গিয়েছিল বিপাশা—সমীরের জন্য কিছু কোসাম্ভিল নিয়ে।

দরজা খুলেই ঠিক এমনি করে ভিতরে টেনে নিয়েছিল ওকে সমীর, আর সঙ্গে সঙ্গেই গালে একটা বিরাট থাপ্পড়। কান মাথা ভোঁ করে উঠেছিল—অপমানে, অভিমানে, বিস্ময়ে বিপাশা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক এমনই কাঁদতে পারেনি। সমীর দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল—'স্টুপিড, ইডিয়ট, ন্যাকা কোথাকার। বারণ করলে কথা শোনে না। ওরা ঠিকই বলে—তুই-ই আমাদের ঝোলাবি বিপাশা—তুই আর তোর শুয়োরের বাচ্চা দাদাটা।'

একটু দূরেই নাকি পুলিস ছিল। সমীর বলেছিল বিপাশা যেন আর কোনোদিনও না আসে—যেন আর কখনো দেখা না করে সমীরের সঙ্গে। দাদা নাকি বিপাশার পিছনে স্পাই লাগিয়েছে।

সমীর চাপা গর্জন করে উঠেছিল—'খবর্দার। খবর্দার, আমার নির্দেশ না পাওয়া অবধি আর কোথাও যেন তোমায় আসতে না দেখি, সব সেলটারগুলো এভাবে এক্সপোজ করে দিবি তুই এই ন্যাকামি করতে করতে।—ভাবতেও দুঃখু হয়। এদেশে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে রেভোলিউশন করবার সময় এখনও বোধহয় আসেনি। ছি, ছি, তোর একটা মিনিমাম সিরিয়াসনেস নেই? এতবার নিষেধ করলাম! জীবনমরণের প্রশ্নটা পর্যন্ত বুঝিস না? এত বাজে, এত হালকা তুই?'

বিপাশা শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছিল।

কিন্তু সমীর আদর করে কান্না থামায় নি। গোঁজ হয়ে বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারপরে বলেছিল—'আমারি ভুল। বড়লোক, হতচ্ছাড়া বুর্জোয়ার বাচ্চা, তোদের মাথায় রেভোলিউশন ঢুকবে কেন। সুবর্ণ রায়চৌধুরীটা একটা চোর। মন্ত্রী—বিড়লার হয়ে কেস লড়ে, যার একটা ছেলে খুনে পুলিস—অন্য ছেলেটা জালিয়াৎ—সি. এ., তার মেয়েটাই বা কী হবে? কত আলাদা হবে? কত আলাদা হবে! আমারি ভুল।'

শুনে চড়াৎ করে মাথার মধ্যে কী যেন হয়ে গিয়েছিল বিপাশার। কী বিষম, কী বিপুল সেই রাগ! অশুরীক্ষে কোন গ্রহসংস্থান হয়েছিল কে জানে, বিপাশা বলল 'বেশ তাই হবে। তোমরা আমাকে যা ভাবছো ঠিক তাই হবো আমি। দেব ঝুলিয়ে সবকটাকে। এক্ষুনি। আজই গিয়ে বলে দিচ্ছি দাদাকে। আমাকে তুই যা বলছিস, আমি ঠিক তাই হবো।'

তখন আর কেউ ছিল না টিউটোরিয়াল হোমে। বিপাশার শরীর ছুঁয়ে মান ভঞ্জন করেছিল সমীর। শেষ পর্যন্ত সেই জ্বরতপ্ত উদ্বেগে টান টান শরীরে মিশিয়ে দিয়েছিল বিপাশা নিজেকে।

ভয়ে কান্নায় ভালোবাসায় ক্লান্ত সমীর হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল একটু। শুয়েছিল, চোখে হাত রেখে।

বিপাশা উঠে পা টিপে বেরিয়ে গিয়েছিল, বাদলকে দরজা খুলে দিয়ে।

সেই শেষ।

সেদিনই ঘটলো সেই অসীম সর্বনাশ। ঈশ্বর জানেন বিপাশা বলেনি। বিপাশা বোকা হতে পারে, বিপাশা প্রেম চেয়েছিল বিপ্লবের চেয়ে বেশি করে। তাই বলে বিপাশা ট্রেটর নয়।

সমীর, বিশ্বাস করো, আমি কিছুই জানতাম না। সেই রাত্রেই পুলিস গিয়েছিল টিউটোরিয়াল হোমে—ধরা পড়ল বাদল আর দেবু। সমীর তখন ওখানে ছিল না।

BanglaBook.org

তারপর কী দ্রুতই ঘটে গেল ঘটনাগুলো সব। নির্বাকযুগের কমিক ছবির মত—দাদা ছুটে এসে বাবাকে খবর দিল ওর বস্ সোমশংকর দত্ত রায়ের কাছে, সমীরের কিটব্যাগ জমা দিয়ে গেছেন প্রফেসর অনুপম রায়। তাতে বোমা পাইপগান মাও-পুস্তিকার সঙ্গে সঙ্গে সমীরের নোটবইটাও আছে। আছে বিপাশার প্রেমপত্রও।

সেই রাত্রেই বাবা উড়ে গেলেন বিপাশাকে নিয়ে বোম্বাই। সেখান থেকেই পাসপোর্ট হলো। দশদিনের মধ্যে লণ্ডন। বোম্বাইতে বসেই খবর পেল, সমীর ধরা পড়েছে।

—'বিপাশা?' কে যেন অনেকদূর থেকে ডাকে।

—'উঁ?' বিপাশা সাড়া দেয়।

—'আয়্যাম সরি। অমন করে বলা আমার উচিত হয়নি। তুমি কিছু মনে কোর না, প্লীজ, অমন চুপ করে থেকো না বিপাশা, কিছু বলো। বকো আমাকে।'

—'কিছুই মনে করিনি' বলতে বলতে উঠে বসতে গিয়ে পারে না বিপাশা।

য়োহান চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার বুকে, দুহাতের বেড়িতে বিপাশা বন্দী।

এতক্ষণ কী হয়েছিলো বিপাশার? বুদ্ধিভ্রংশ? ও যে একটি পুরুষের বুকের ওপর পড়ে আছে—সেটাও খেয়াল ছিল না?

সমীর যে, সমীর—দেখে যা—পেটি বুর্জোয়ার বাচ্চাটার হালটা দেখে যা—জোর করে হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করে বিধ্বস্ত গলায় বিপাশা বলে —'ছেড়ে দাও, প্লীজ ছেড়ে দাও, য়োহান, ভাল্লাগছে না বলছি। একটুও—'

য়োহান ছাড়বার কোনও লক্ষণ দেখায় না।

খুব অস্বস্তি হচ্ছে সত্যিই—'এইবারে কিন্তু চেঁচাব য়োহান'—কান্না গলায় বিপাশা বলে কেটে কেটে।

ওর হিসেবে ভুল হয়নি। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো য়োহান ওকে ছেড়ে দেয়।

বিপাশা উঠে বসে। কাপড় গুছিয়ে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে বুকের কাছে পা গুটিয়ে।

য়োহানও উঠে বসে।

—'ওরা সিকিউরিটির লোক ওরা সব দিকে নজর রাখে। ওরা জানে আমার স্ত্রী এখানে নেই। এই বাড়িতে সবাই জানে স্ত্রী হাঙ্গরিতে গিয়েছে। যদি জানতো তোমাকে দেখতে পেতো?'

—'তো কী হতো? লোকের বাড়িতে লোকে আসে না? তোমাদের দেশে বাড়িতে মেয়েরা আসে না কারুর স্ত্রী না থাকলে?'

—'আমি যে একটা দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত বিপাশা—এই চ্যান্সেরে পার্টির প্রধান সেক্রেটারি আমি। আমার আচার-আচরণ সবাই লক্ষ্য করে। আমার কোনো প্রিভেসি নেই বিপাশা—আমার কোনো প্রাইভেট লাইফ নেই- ইট মাস্ট বি অ্যান ওপন বুক,—দেখছোই তো নিত্রা একটা ছোট্ট মফঃস্বল শহর। ছোট্টো সমাজ আমাদের, প্রায় গ্রাম নীচতা এখানকার লোকগুলোর মনে, মিরকোর মতো সবাই নয়। এখানকার সামাজিক আদবকায়দা খুব গোঁড়া, খুব আঁটোসাঁটো—বিপাশা: ছোটো জায়গা, হলেই যা হয়।'

-'একদিন বাড়িতে একজন মেয়ে এলেই

—'না না—', ঠোঁটে জিবে চুকচুক্ করে একটা অধৈর্যের শব্দ করে ওঠে য়োহান—'অত সোজা নয়—এ তোমার পশ্চিম ইওরোপের পারমিসিভ সোসাইটি নয়। এটা একটা সোশালিস্ট স্টেট, এখানে ম্যারালিটির দিকটা খুব বড়ো। ১৯৬৮ র পর থেকে তো আরোই বেড়েছে—বুর্জোয়া ইনফিলট্রেশন আটকানোর নামে, কাউন্টার রেভোলুশনের নামে এখানে যা কড়াকড়ি শুরু হয়েছে ছাত্রাবস্থায় আমরা তা দেখিনি। বিপাশা, তুমি ঠিক বুঝবে না। তোমরা ইংরিজিতে-কবিতা লেখা-ভারতীয়রা এসব বুঝবে না।'

BanglaBook.org

আবার মাথার মধ্যে চড়াৎ করে ওঠে বিপাশার। রাগ হয়। বিপুল রাগ। ভয়ে, অসহায়তায় পুরুষমানুষ কেবল এটুই পারে। হাতের মধ্যে যে আছে, যে দুর্বল, তাকে অপমান করতে।—রাগটাকে পোষ মানিয়ে নাও বিপাশা—বিপাশা নিজেকে বলে। সর্বনাশা রাগ আর নয়। চুপ করে থাকো। একেবারে চুপ। অন্য কথা বলো বিপাশা।

—'তোমার মা কি জানেন, তোমার স্ত্রী হাঙ্গারিতে নেই?'

—'না। মাকে বলিনি।'

—'কেন বলনি মাকে?'

—'মার বয়স হয়েছে, মা মনেপ্রাণে কম্যুনিস্ট, মা এখনও অনেক স্বপ্ন দ্যাখেন। মা এত পরিশ্রম করেন, নাতিদের জন্যে একটা আইডিয়াল সোশ্যালিস্ট স্টেট গড়ে দিয়ে যেতে চন বলে।'

—'তার সঙ্গে এর কী যোগ?'

আলতো ভাবে হাত তুলে নেয় বিপাশার হাত—তারপর য়োহান জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে—'ওরা যে আর ফিরবে না, বিপাশা।'

—'মানে?'

'মানে?' য়োহান দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে

একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে তার ভিতর দিকে—বিপাশা টের পায়। করতলে-ধরা য়োহানের হাত দুটিকে এবার সে নিজেও গ্রহণ করে, একটু চাপ দেয়—যেন সাহস দিচ্ছে। একজন আহত সৈনিককে যেমন আরেকজন সৈনিক।

য়োহান মুখ খোলে—'আমার স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ করেছে, বিপাশা। আমাকে ঠিক বলব না, আমার স্বদেশ, আমার পার্টি—তার দুচক্ষের বিষ; যে আমার পার্টিকে ঘেন্না করে, যে আমার চেকোস্লোভাকিয়াকে ঘেন্না ক'রে, একলা আমাকে আলাদা করে ভালোবাসা তার পক্ষে কি সম্ভব? আমি তো ভাবতেই পারি না !

'বলো, আমি কী করে মিরকোকে বলবো, কাত্রিনা চলে গিয়েছে? কী করে বলবো আমি—মিরকো, দেখে যাও, আমার স্বদেশের আমার স্বপ্নকে লাথি মেরে আমার স্ত্রী চলে গিয়েছে?

'আমি হেরে গিয়েছি, বিপাশা। মানুষ হিসেবে এটা আমার সবচেয়ে বড় হার। নিজের বৌকেই যে কনভিন্স করাতে পারেনি, সে কী করে দেশের জনগণের মধ্যে আশ্বাস সঞ্চার করবে বলতে পারো? আমার সারা জীবনের কাজের সার্থকতা কোথায় বলতে পারো বিপাশা?'

বিপাশা কি বলবে বুঝতে পারে না। কথা খুঁজে না পেয়ে কেবল য়োহানের হাতদুটোকে জড়ো করে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নেয়।

—'আমার ছেলেরা আর ফিরবে না। কাত্রিনা লিখেছে—"ওদের আমি মুক্ত জীবনে নিয়ে এসেছি!" হাঃ—বোকা মেয়েটা, জীবনে এতো ঘা খেয়েও চিনল না মুক্তি কোথায়। মুক্তি কি পারিসে? ক্যাপিটালিজমে কখনো মুক্তি থাকতে পারে?

'কাত্রিনা জানে না আমার ছেলেদের কতোবড় একটা ক্ষতির মধ্যে নিয়ে ফেললে, —কত বড় একটা বন্ধন, একটা দাসত্বের বোঝা ওদের জীবনে চাপিয়ে দিলো। এটা কি মুক্তি? তুমি বলো, বিপাশা? আমি, আমার মা সারা জীবন যে-বিষের বিরুদ্ধে লেটে মরলাম, আমার ছেলেদের মধ্যে ঠিক সেই বিষই সঞ্চারিত করে দিল কাত্রিনা।

'আমার মার পঁয়ষট্টি বছর বয়স—আমি তাঁকে একথা বলতে পারিনি বিপাশা। তিনি নাতিদের জন্যে জোড়া-খাট কিনলেন, —দেয়ালে কত যত্ন করে রঙিন পোস্টার সাঁটলেন—ঘর সাজাচ্ছেন নাতিদের জন্যে। আমি প্রাণে ধরে মাকে বলতে পারছি না—তোমার নাতিরা ও-খাটে কোনোদিনই

BanglaBook.org

শুতে আসবে না মা—আর কোনোদিনই হয়তো তুমি ওদের দেখবে না।'

বিপাশার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে—'কেন প্যারিসে গিয়ে দেখে আসা যাবে না?'

—'হয়তো যাবে, হয়তো যাবে না—কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।'

—'আমার মনে হয় বাচ্চারা নিজেরাই ফিরে আসবে য়োহান—বড় হলেই ফিরে আসবে নিজের দেশে—'

—'বলা যায় না বিপাশা, কিছুই বলা যায় না। ক্যাপিটালিজমের বিষ বড় ভয়ংকর বিষ, সমস্ত প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে দেয়—ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খেয়ে নেয় নৈতিকতার শেকড়—মাটিটা পর্যন্ত পচিয়ে দেয়। আয়াম বড় সংক্রমক বিষ, বড় ভয়ংকর—কাত্রিনাকে দেখেই আমি, মজ্জায় মজ্জায় টের পেয়েছি সব—'

•

• •

যেন স্বপ্নের মধ্যে অন্যমনে কথা বলে যাচ্ছে য়োহান—বিপাশার দিকে তার চোখ নেই, কিন্তু বিপাশা অনুভব করে য়োহানের হাত দুটো আরেকটু আশ্রয় খুঁজছে বিপাশার কাছে। হাঁটু দুখানি বুকের কাছে গুটিয়ে বসে আছে বিপাশা, বুকের কাছে, হাঁটুর ওপরে য়োহানের মস্ত হাতদুটো ধরে আছে নিজের ছোট ছোট মুঠোতে—য়োহানের হাত তাতে যথেষ্ট শান্তি পাচ্ছে না—সে আরেকটু নিরাপত্তা খুঁজছে, আরো একটু উষ্ণতা...হে ঈশ্বর, বিপাশার এখন কী করা উচিত—?

অস্থির উদ্বেগে বিপাশা বলে ওঠে—'কটা বাজলো, য়োহান? আমাকে এবারে উঠতেই হবে।'

—'এখনই নয়। বিপাশা, আরেকটু থাকো লক্ষ্মীটি। আমি বড্ড একা এখানে, আমার কথা বলবার মানুষ নেই। আজ বলে নয়, বড় হয়ে যাবার পর থেকে আর কোনোদিনই ছিল না—কাত্রিনা আমার কথা শুনতে চায়নি কোনোদিনই, আমার মাকেও আমি সবকথা বলতে পারি না। আমি যুবক, আমি পুরুষ, আমি তাঁকে সব আঘাত থেকে আড়াল করে চলতে চাই, কিন্তু আপনাকে আড়াল করবে কে? বলো? বলো?'

বিপাশার কি জিব কেউ কেড়ে নিয়েছে? সে কথা বলছে না কেন? সেকি বুঝতে পারছে না য়োহান কী চাইছে? পাঁচটা বছর সে একা কাটিয়েছে লণ্ডন শহরে লেখক-শিল্পীদের আল্‌গানীতির পারমিসিভ পাড়ায়।

সমীরের বিপাশা হয়তো কিছুই বুঝতে পারত না। কিন্তু এ বিপাশা তো সে নয়। 'আমি আর পারছি না। বিপাশা, আমাকে তুমি দয়া করো। আমার সমস্ত শরীর সমস্ত হৃদয় সমস্ত জীবন পিপাসিত, তুমি আমাকে দয়া করো। বিপাশা, বিশ্বাস করো এতে কোনো পাপ নেই। এটা তুমি দীনজনে দাক্ষিণ্য করার পর্যায়ে ফেলে দাও না কেন? তোমার কত আছে—তুমি মহৎ হবে না কেন? আমার মত শুষ্ক দু'চারজন তৃষ্ণার্তকে জল দিলে তোমার তো কোনো ক্ষতি হবে না?'

বিপাশার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফেলেছে য়োহান। কখন শক্ত দুটো বাহু দিয়ে পুতুলের মতো ঘিরে ধরেছে বিপাশার উপবিষ্ট ছোট্ট শরীর।

বিপাশার কানে যেন কিছুই ঢুকছে না। কেবল নাকে তাজা তীব্র নতুন রংয়ের চড়া গন্ধ যেন একটা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। বিপাশা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত য়োহানের মাথায় একটা হাত রাখে। সেই হাতটা হঠাৎ মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে অস্থির চুমুতে চুমুতে ভরে দ্যায় য়োহান।

—'আমার সোনা, আমার মণি, আমার ছোট্ট ঘাসফড়িং—আমার সাগরপারের স্বপ্ন'—

বিপাশা প্রস্তরমূর্তির মতো স্থাণু। শিশুর মতো বুকের মধ্যে মুখটা জোর করে গুঁজে দিয়ে

BanglaBook.org

রোহান জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত অস্থির গলায় বলে চলে—'তুমি কী সুন্দর, বিপাশা, তুমি কি সুন্দর। তুমি কি স্বপ্ন বিপাশা, তুমি কি স্বপ্ন? বলো, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?'

এই সমর্পিত মুহূর্তকে কীভাবে সম্মানিত করবে ভেবে পায় না বিপাশা—তার দুটি হাত শুধু রোহানের আকুল মাথাটাকে বুকের মধ্যে আরো টেনে নেয়—ভয় পাওয়া শিশুকে যেমন আশ্রয় দেন জননী। কিছু ভাবার অবসর নেই—এমন মুহূর্তে মানুষের শরীর নিজেই নিজের গতিবিধি স্থির করে নেয়—সিদ্ধান্ত যা নেবার তা নিয়ে ফালে।

এইসব প্রাথমিক প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়াগুলো জান্তব এবং সেই কারণেই নির্ভুল হয়ে থাকে—এই সব নিশ্চিত মুহূর্তে বুদ্ধির ছুটি মিলে যায়—সত্যতার আদবকায়দা, অতীত ভবিষ্যতের হিসেব-নিকেশ ভাল মন্দের নকল নিয়মাবলি মিলিয়ে নেবার সময় থাকে না মানুষের—সময় থাকে না পাঁচিল ডোলায়, ফলে, যা সৎ, যা অভ্রান্ত, যা অনিবার্য, প্রকৃতি তাই ঘটিয়ে দেয়—যেমন কাপাসফল পাকলেই আপনি ফেটে যাওয়া অবধারিত। যেমন হঠাৎ কেউ সামনে ছুরি তুললে হাত আপনা হতেই উঠে আসে সে ছুরি আটকাতে, কিংবা যেমন হাঁটুতে একটা বিন্দুতে হাতুড়ি মারলে আপনিই ঠুক্ করে এগিয়ে যায় পায়ের হাড় সামনের দিকে—তেমনিই অনিবার্যতায় চোখ দুটি বুজে ফেলে বিপাশা।

সমীর তুমি সেদিন এমনিভাবে—তুমি আমাকে সেদিন এমনিভাবেই—আমরা তখন ছোটো ছিলাম, না সমীর? কিছুই জানতাম না তেমন—তুমি খুব সাবধানী ছেলে, —কিন্তু তবু সেদিন ঠিক এমনিভাবেই না সমীর? সেই সেদিন তোমার গা ঘরে যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল—যখন ঠিক আমরা, না সমীর? অথচ দ্যাখো এখন তুমি প্রেসিডেন্সি জেলে না পুরুলিয়া জেলে, তাও আমি জানি না—আরেকটু, কাছে এসো সমীর, আরেকটু আদর করো আমাকে, আর রাগ কোরো না আমার ওপরে, সত্যি, শোনো, আমার কোনো দোষ ছিল না—আমি দাদাকে বলে দিইনি সমীর—তুমি যে কিটব্যাগ প্রফেসর রায়ের কাছে জমা রেখেছিলে সেকথা তো আমি জানতামই না, আশ্চর্য, —ওঁর মতো মানুষও এত নিচে নামতে পারেন—ভয় যে বড় সাংঘাতিক—কেউটে সাপের বিষ সমীর—ভয় মানুষকে দিয়ে করাতে পারে না এমন কাজ নেই, ভয়ই পারে প্রফেসর রায়কে দিয়েও অমন কাজ করাতে, ভয়, যে ভয় তোমার মুখ দিয়েও বিপাশাকে অমন কথা বলিয়েছিল, যে ভয়ে আমি আজও লণ্ডনে পড়ে আছি, যে ভয় আমাকে দিয়ে—যে ভয় রোহানকে দিয়ে—

রোহান আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি যাব রোহান, আমাকে বাড়ি যেতেই হবে, —আমাকে ছেড়ে দাও—আমার ভয় করছে—আমার খুব, খুব ভয় করছে—ওঃ রোহান—

কী গহন, কী সবুজ, কী ঘনঘোর অন্ধকার এই অরণ্য, গভীর, দীর্ঘ শ্যাওলাধরা বৃক্ষগুলি মাথায় মাথায় ঠেকে গিয়েছে, তোরণের পরে তোরণ, তোরণের পরে তোরণ গড়ে চলেছে, যেন নমস্কারের যুগ্মকর, যেন গথিক চার্চের আর্চের গড়ন, গাছে গাছে কচি সবুজ পাতা ধরছে, লতায় লতায় ফুলের কুঁড়ি জাগছে, আড়ালে আড়ালে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে—অথচ কী আশ্চর্য, বনের মেঝেয় কতো বরফ, কতো বরফ, ah the snows of yester-year!—যত পা ফেলা যায় ততই পা ডুবে যায় আরো গভীরে, —এই অরণ্যে কি রোদ বাতাস আসবে না কোনোদিনও? এমন সময়ে চোখের সামনেই বরফ ফাটিয়ে হঠাৎই, যেন জাদুমন্ত্রে, একটি দর্পিত নীল ক্রোকাসফুল ফুটে উঠল বসন্তের জয়ধ্বনি দিয়ে। কে যেন বলল রোদ-বাতাসের গলায়—

—'আমরা এই শিখরটা দুজনে জয় করলাম—এই ক্রোকাসফুল আমাদের জয়পতাকা।'

BanglaBook.org

চোখ মেলেই বিপাশা দেখল সামনে বিস্তৃত জানলার কাচ ভর্তি বৃষ্টির জলবিন্দু—দেয়াল জুড়ে বসন্তের গুটির মত তারই ছায়া ছিটিয়ে পড়ছে—জলেরও এমন ছায়া হয়? বিপাশা এই প্রথম খেয়াল করল। কী আশ্চর্য এই পৃথিবী

—'বিপাশা?'

—'বল।'

'আমি জানি না তুমি আমাকে কী ভাবলে—শুধু বলতে চাই তুমি আজ আমাকে যা দিয়ে গেলে—তা আমার একচল্লিশ বছরের জীবনের মহার্ঘতম ঐশ্বর্য।'

—'তুমি যে পুঁজিবাদীর মত কথা বলছো।'

'হ্যাঁ, স্মৃতির ব্যাপারে আমি পুঁজিবাদী।'

সমীরও বলেছিলো—'তোমার বিষয়ে কিন্তু নেহাৎই পেটি বুর্জোয়ার মনোবৃত্তি আমার, —তুমি আমার প্রাইভেট প্রপার্টি।'

অলসভাবে শুয়ে থাকে বিপাশা। নিরুত্তর। বিপাশার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। হাত উল্টে ঘড়িটা একবার দেখেই ঝট করে উঠে বসলো সে।

তার বসার ধরনটা দেখে যোহানও উঠে পড়ে। লাইটার জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখে।

—'একটু আসছি।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গিয়ে আবার ফিরে আসে। 'চল, তুমিও যাবে?'

বিপাশা উঠে দাঁড়ায়। ঝেড়েঝুড়ে কাপড়টা গুছিয়ে পরে।

যোহান তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি যে দেখতে চাই কেমন করে জড়াও তোমরা অতখানি কাপড়—'

বিপাশা কান দেয় না।—'একটু জল খাব।'

—'নিশ্চয়ই—চলো দিচ্ছি।'—তারপর পিছু হতে রেখে প্রথম প্রশ্ন করে যোহান, 'ভালো লেগেছে?'

প্রতীক্ষায় দু' একটি মুহূর্ত কাঁপতে থাকে, রক্তের ওপরকার শিরার মতো দপদপ করে অন্ধকার।

বিপাশা এলোমেলো কোনো এক দিকে ঘাড়টা হেলিয়ে দেয়। পুরুষের এই অনাবশ্যক প্রশ্নের চিরদিন উত্তর কেবল একটিই। বিপাশার চোখের মধ্যে বৃষ্টিবিন্দুর ছায়াগুলি অস্পষ্ট হতে হতে পরস্পর মিশে গিয়ে বিশাল আবছা এক কালো মেঘের আকৃতি নেয়। হাতের উল্টো পিঠে ঝাপসা চোখটা মুছে নিল বিপাশা। জলবিন্দুগুলি আবার আলাদা আলাদা হয়ে বসন্তের গুটির মতো ছড়িয়ে পড়ে দেয়ালে

নিজের মনে বিপাশা একটু হাসে। হায়। বৃষ্টির বিন্দুগুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে যদি একটা গোটা মেঘ পাওয়া যেতো!

শার্টটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে যোহান বলে—'আমার একটা অনুরোধ রাখবে, বিপাশা?'

—'সর্বনাশ! আবার একটা অনুরোধ?'

বিপাশার কথায় যোহান হেসে ফ্যালে।

—'সত্যি! কী যে দুষ্টু মেয়ে তুমি! তোমার জন্যে আমার খুব মন কেমন করবে কিন্তু! কাল এমন সময়ে তুমি কোথায়! কত দূরে! এতক্ষণে আমাকে হয়তো ভুলেই গেছ তুমি।'

বিপাশা উত্তর দেয় না। শুধু বলে—'কই, কী অনুরোধ, বলে ফ্যালো চটপট। সম্ভব হলে রাখবো।'

BanglaBook.org

—'দুটো চিঠি দেবো, লণ্ডন থেকে স্ট্যাম্প মেরে ডাকে দিয়ে দেবে একটু? প্লীজ?'

মাথার মধ্যে পোঁ করে একটা ডেন্‌জার সিগন্যাল বেজে ওঠে বিপাশার। মুখ কঠিন হয়ে যায়।

—'কিসের চিঠি? আমি বিষয়বস্তু না জেনে চিঠি-টিঠি ডাকে দিতে পারব না।—এ দেশের অতিথি আমি, এ দেশের কোনো ক্ষতি করতে রাজী নই, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে।'

হঠাৎ বিপাশার গলার কঠিন স্বর, রূঢ় সুর শুনে হকচকিয়ে গেলেও, পরমুহূর্তেই ওকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ধরে বিপুল শব্দ করে একটা চুমু খায় মোহান।

—'Sagesse d'un po'ete, je t'envie; বিপাশা তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর কমিউনিস্ট হতে পারতে—যা নীতিবোধ আর নিষ্ঠা তোমার। আমার কাত্রিনা যদি এমনি হোতো!'

এবার অবাক হবার পালা বিপাশার। কিন্তু ওর কানের মধ্যে আচ্ছন্ন ধরিয়ে দিয়েছে একটি অমোঘ বাক্য—'তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর কমিউনিস্ট হতে পারতে'...ট্রেনের চাকায় যেমন কথার শেকল ঘুরতে থাকে ছন্দে ছন্দে—তেমনি বাক্যটি ঘুরতে লাগলো বিপাশার চৈতন্যকে আগুন করে—বিপাশা, তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর...ও সমীর, শোনো, শুনেছ, এরা কী বলছে? বলছে, বিপাশা তুমি একটি...

'চিঠি দুটো কিছুই নয়, একটা প্রফেশনল নেহাৎ এ্যাকাডেমিক, অন্যটা আমার স্ত্রীকে লেখা।—দাঁড়াও দেখাচ্ছি।'

ব্রীফকেসটা এনে রান্নাঘরের টেবিলের ওপরে রাখে। দুটি খাম বের করে মোহান। একটার ওপরে আধখানা ঠিকানা লেখা—এক প্রফেসরের নাম, রাস্তার নাম, নম্বর—শহর আর দেশের নাম নেই। খাম খুলে বের করে একটা রি-প্রিন্ট, আর একটি ফর্মাল চিঠি।

—'এটা ডাকে দিচ্ছ না কেন? এতে কী অসুবিধা?'

—'তুমি লণ্ডনে গিয়ে এতে লিখবে সিউল, সাউথ কোরিয়া। বুঝলে? আমাদের এখান থেকে সিউলে চিঠি যায় না—নিষিদ্ধ অঞ্চল। এই প্রফেসর আমার বিষয় নিয়েই কাজ করেন, ওঁকে আমি পড়াতে চাই আমার এই লেখাটা—এটা তো ইংরিজিতে অনূদিত হয়েছে, তাই।'

—'কী আশ্চর্য। আর অন্যটা?'

—'এই যে। এইখানে একটা ঠিকানা লেখা আছে, কে পাচ্ছে লেখা নেই। তুমি বসিয়ে দিও। আমার পদবী তো জানই—আর কাত্রিনাটা তার আগে।—চিঠিটা ফ্রেঞ্চে লেখা, তুমিও পড়তে পারো।'

—'সে কি? নিজের বৌকে তুমি নিজের অযথা চিঠি লেখো না?'

—'নিজের ভাষা আছে নাকি আমাদের? ও তো হাঙ্গেরিয়ান আর আমি স্লোভাক—অবশ্য দুজনেই দুজনের ভাষা খুব ভালই জানি। তবু চিঠিপত্রের ভাষাটা আমাদের ফরাসি—এর জন্যে কাত্রিনাই দায়ী। কাত্রিনা আর তার মিডল ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড। ওরা ছোট থেকে শিখেছে চিঠিপত্র জর্মনে কিংবা ফরাসিতে লিখতে হয়। যেহেতু জর্মনটাই চলু বেশি—ফরাসিটা তাই আরো একটু নাকউঁচু ব্যাপার হোলো—কাত্রিনা তো সর্বদাই বেশি উঁচু নাকের দিকে।'

—'তাহলে আমার ইংরিজি কবিতা লেখায় কী দোষ? সেটাকে কেন ঔপনিবেশিক দাসত্বসুলভ মনোবৃত্তি বলবে তোমরা?'

—'এটাও তাই। আমি কি বলছি এটা তা নয়? অন্য কিছু? বিপাশা—সোশ্যালিজম এখনও পাকা হয় নি আমাদের মধ্যে, এখনও বহু দ্বন্দ্ব, বহু বিচ্যুতি, বহু ত্রুটি কনট্রাডিকশনের সীমা নেই—আর সেই কনট্রাডিকশন জগতের কাছ থেকে লুকোনার জন্যে আমাদের সাবধানতারও সীমা নেই। কিন্তু এখন যতই ত্রুটি থাকুক, যতই ভুলভ্রান্তি অপূর্ণতা থাকুক, এই তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি বিপাশা—একদিন এদেশে সত্যিকার সোশ্যালিজম আসবেই—আসবেই। না এসেই

BanglaBook.org

পারে না। এত দিনের এত মানুষের সাধনা মিথ্যে হতে পারে না। এই লুকোচুরি, এই অনর্থক ষড়যন্ত্রের আবহাওয়া সেই যে স্টালিনের যুগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে—এখনও ঘোচেনি। কিন্তু এটা চিরস্থায়ী হতে পারে না। এ নিশ্চয় বদলাবে। দেখো, এমন দিন আসবে যখন নীত্রা থেকেই সিউলে চিঠি যাবে—যখন কারুর ধনী বৌ প্যারিসে পালালে তার স্বামীর লোকলজ্জা করবার কিছু থাকবে না'—

বলতে বলতে খুব সহজভাবে হাসে য়োহন।

অবাক হয়ে বিপাশা ভাবে, মাত্র একটু আগেই এই রাত্রেই এই বিষয়টি কতদূর ভারাক্রান্ত রেখেছিল এই মানুষটিকে। এইটুকু সময়ের মধ্যে, মাত্র এইটুকু পাওয়া মানুষকে এতটা বদলে দিতে পারে? এতটা?

হঠাৎ বিপাশাকে আকাশে একবার ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেয় য়োহন—'ঘাসকড়িং, তুমি ঠিক একটা খুদে পুতুল, তোমার কোনো ওজন নেই।—আহা, আমার পড়শীরা যদি তোমার সঙ্গে আমাকে দেখতে পেতো! আজ আমার পরম সৌভাগ্যটা জগতে কেউই জানতে পারবে না, এই যা দুঃখু।'

চিঠি দুখানা ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়ে বিপাশা বাতিটা হাতে তুলে নেয়। 'আর এক মিনিটও নয়। দাবো য়োহান, তিনটে পঁয়ত্রিশ বেজে গেছে। আমার কাছে বেচ্‌কা গাড়ি নিয়ে আসবে ঠিক পাঁচটার সময়ে।'

—'ওঃ হো! শোনো, বেচ্‌কাকে যেন বোলো না এতক্ষণ এখানে ছিলে! যদি জিজ্ঞেস করে ক'টায় ফিরলে, —করবেই জিজ্ঞেস মনে হয়, বেচ্‌কা তো আর এভিচ্‌কা কি য়াঙ্কা নয়, ও চাষীর মেয়ে, অতশত বুঝবে না—ওকে বোলো, একটার সময়ে ফিরেছো। নইলে কিন্তু কাল এক্কেবারে—'

—'জানি, জানি, বুঝেছি।' বলতে বলতে কোট রাখার কাবার্ডের দিকে এগিয়ে যায় বিপাশা। কাবার্ডের পাশেই, মাটিতে জুতোর পাশে চোখে পড়ে একটি ফুলের টব। তাতে তিনটি টুকটুকে লাল টিউলিপ ফুল। মিব্‌কোর টিউলিপ। এ-বাড়ির অন্ধকারটা তার এখন খুব চেনা হয়ে গেছে।

এই নতুন রংয়ের গন্ধটাও তার বুকের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছে। মনে হচ্ছে এই বাড়িটা তার কতকালের বাসা। দু'হাত বাড়িয়ে টিউলিপের টবটা বুকে তুলে নেয় বিপাশা।

•
• •

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে পথে বেরিয়ে এল দুজনে। রাস্তাঘাট শূন্য। একটিও গাড়ি নেই।—'দেখি যদি একটা ট্যাক্সি পাই। তুমি তো ভিজে যাচ্ছ। আমার না হয় হুড আছে'—কোটের হুডটা নিজের মাথায় তুলে দিয়ে য়োহান বলে।

—'আমারও হুড আছে—কোটে নই বা থাকল—' ঘোমটা দিতে দিতে বিপাশা বলে।

রাস্তায় ইঁটের পাঁজা, অর্ধসমাপ্ত বাড়ি, পার্ক করা গাড়ির সারি আর ল্যাম্পপোস্টেরা সবাই বিপাশা আর য়োহানকে দেখে খুশি হয়। রাস্তার একধারে উঁচু বহুদ্রষ্টা বৃদ্ধ বৃক্ষের সারি মাথায় অন্ধকার নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভিজছে। হালকা পায়ে হেঁটে যেতে যেতে য়োহান এ-টিলে ও-টিলে লাথি মারে ফুটবল খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে। একহাতে সে কাঁধে ধরে আছে টিউলিপের টবটা, আর এক হাতে আগলে আছে বিপাশার কোমর।

—'এখন ভয় করছে না? কেউ যদি দ্যাখে?' বিপাশা বিস্মিত হয়ে বলে।

—'উঁহু, করছে না। এখন সিকিউরিটি গার্ডদের অপসর টাইম নয়।'

ফুটপাত দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা মত্ত সঙ্গীতের শব্দ কানে আসে—কোরাস গান।

BanglaBook.org

রাস্তাটা এখানে মোড় ঘুরেছে। ওপাশ থেকে একটা দল এগিয়ে আসছে মনে হয়। দু'একটি টুপিপরা মানুষকে এদিকে আসতে দেখেই যোহান সহসা ফুলের টবটা বিপাশার হাতে গছিয়ে দেয়। দিয়েই কিছুমাত্র ভাববার সময় না দিয়ে বিনা ভূমিকায় বিপাশাকে বুকে জাপটে ধরে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চাপিয়ে দেয় সে। বিপাশার দম আটকে আছে। হঠাৎ খুব ভয় করতে থাকে—'এ তো চুম্বন নয়, এ যেন অন্য কিছু! কী এ?'

গানের শব্দ এখনও পাশ দিয়ে যাচ্ছে। কে যেন শিস দিল। কিছু মন্তব্য করল কেউ। অন্যরা হাসল।

বন্দী নিষ্পিষ্ট বিপাশা নিজেকে ছাড়িয়ে দম নিতে চাইল, কিন্তু দুহাতে ফুলের টব থাকায় সেটা সোজা হল না।

টের পেয়ে আরো জোরে আঁকড়ে ধরলো তাকে যোহান। যতক্ষণ না গানের শব্দ মিলিয়ে গেল—তাদের যুগলবন্দী মূর্তি ফুটপাতে একটা আবছা, থ্যাবড়া ছায়া ফেলে স্থাণু হয়ে রইল। তারই একদিকে দোল খেতে লাগলো কয়েকটি টিউলিপের জ্যান্ত ছায়া, বৃষ্টিভেজা পথের ওপরে।

বিপাশার ঠোঁটের ওপরে বৃষ্টির জল। জল বিপাশার চোখেও।

বিপাশাকে মুক্তি দিয়ে যোহান বলল—'সরি, বিপাশা, ওরা সব মাতাল, শ্রমিকের দল, ফিরছে। আমারই চ্যাপ্টারের লোক মনে হল। অমন না করলে আমাকে দেখে ওরা চিনতে পারতো। এইভাবে মুখটাকে লুকিয়ে ফেলা গেল, দেহের গড়নটাও বদলে গেল—বুঝলে না? তা ছাড়া ওরা তো মাতাল ছিল, হঠাৎ তোমাকে অন্যরকম পোশাক-টোশাকে দেখে কী করত কে জানে! মাতালের তো আর কম্যুনিস্ট-ক্যাপিটালিস্ট নেই। এইভাবে তুমিও সুরক্ষিত রইলে। ভাল বুদ্ধি করিনি?'

এই আজব ব্যাখ্যা শ্রবণে হতভম্ব হয়ে যাওয়া বিপাশা অবাক প্রশ্ন করে, 'সোশ্যালিস্ট স্টেটেও মাতাল আছে?' হেসে ফেলে যোহান।

—'আমার বলা উচিত অবশ্য নেই! কিন্তু তুমি কী বলো?'

মেয়েদের হস্টেলের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যোহান ওকে দুই গালে দুটি বিদায় চুম্বন দেয়—কেননা গেটের খুপরি কামরায় পুষ্টকায়া দরওয়াননী চেড়ীর মতো উপবিষ্টা।

তারপরে গলা নামিয়ে বলে, 'আবার দেখা হবে, বিপাশা—দেখা হবেই আমাদের—পৃথিবী খুব ছোট্ট জায়গা, জীবন অনেক বড়ো—এই তো সবে শুরু! এটা কখনো আমাদের শেষ দেখা নয় বিপাশা, আমি তোমাকে নিশ্চিত বললাম, দেখে নিও, —এই আমাদের প্রথম দর্শন!'

বিপাশা চুপ করে থাকে। তারপর যন্ত্রবৎ ডান হাত নেড়ে বিদায় জানায়। বাঁহাতে বুকে জড়ানো আছে ফুলের টব। ফুলা দরওয়াননী কিছু বলে।

যোহান উত্তর দেয়, বিপাশা বোঝে না।

যোহান বলে—'যাও বিপাশা, ওপরে চলে যাও! এখানে দাঁড়ানোটা ইনি পছন্দ করছেন না। আবার দেখা হবে—তবে, Partir, c'est un peu de mourir, প্রতিটি বিদায় মানেই একটুখানি মৃত্যু—বিপাশা, ছোট্ট সবুজ ঘাসফড়িং আমার—'

যোহানকে গেটের সামনে বিদায় দিয়ে ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ ছুটে গেটের দিকে ফিরে গেল বিপাশা।

—'যোহান!'

গেতে যেতে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ায় যোহান। তার পরে ফিরে আসে।

BanglaBook.org

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও প্রবল হয়ে উঠেছে।

বেচ্‌কা একটার পর একটা আপেল খেয়ে যাচ্ছে, আর কোটের পকেটে বীচি ফেলছে। বিপাশার সেই একটা আপেলই শেষ হয়নি।

গাড়ি ছুটছে খুব জোরে।

—'কী গাড়ি এটা? মার্সিডিজ বেন্‌জ মনে হচ্ছে?'

—'না, এটা মার্সিডিজ ঠিক নয়, তবে অবশ্য তারই রুশী সংস্করণ। খুব ভাল গাড়ি।'

—'সে তো টেরই পাচ্ছি—একটু আওয়াজ নেই, একটু ঝাঁকুনি নেই, খুবই আরামের।'

দু'পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটে যাচ্ছে পতিত জমি, খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে কলকারখানা—ছোট ছোট গ্রাম—মফঃস্বলী শহর—

বৃষ্টি তো বাড়ছেই, বাড়ছেই—বাতাসও বাড়ছে—রাস্তায় মোটেই গাছপালা নেই, তাই হাওয়ার গতিটা বোঝা যাচ্ছে না—কিন্তু ঝোড়ো বাতাসে জানলা-তোলা এয়ারটাইট গাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, যেন উলটে যাবে—বৃষ্টি-বাদল আকাশ আঁধার করে আছে—সকাল হবার নাম নেই।

'ভিজিবিলিটি এত লো, যে জোরে চালানো যাচ্ছে না—', বেচ্‌কা বলে।

গাড়ি চালাচ্ছেন খাকী উর্দি পরা সরকারী সারথি।

'তাছাড়া এত জোর বাতাসেও তো স্পীড দেওয়া যায় না—', বিপাশা যোগ করে দেয়।

—'তোমার বাসের কিন্তু বেশি দেরি নেই, বিপাশা।'

—'আমরা তো ঠিক করা সময়েই বেরিয়েছি।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হাতে আরও সময় নিয়ে বেরনো উচিত ছিল। এত ঝড়বৃষ্টি বেড়ে যাবে বুঝিনি।'

উদ্বিগ্ন হয়ে বেচ্‌কা কথা বলছে, বিপাশাও কথার পিঠে কথা চালান দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিপাশা যেন বেচ্‌কার উদ্বেগটার ভাগ নিতে পারছে না কিছুতেই। অথচ বেচ্‌কার উদ্বেগ তো বিপাশার জন্যেই। মনে মনে এই অসম্পৃক্ততার জন্য অপরাধ বোধ করে বিপাশা। কিন্তু কেন যেন ও কিছুতেই কিছু নিয়ে খুব একটা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে না ইদানীং।

দেরি হয়, তো ভিয়েনার বাসটা পাবে না। বাস না পায়, তো লণ্ডনের প্লেনটা পাবে না। এই তো? ঠিক আছে। পরের প্লেনের জন্য পরের বাস আছে। এটা তো শেষ নয়। একমাত্র নয়। এত কি আছে উদ্বেগের? জীবনে কিছুতেই কোথাও সম্পৃক্ত হবার মত গুরুত্ব নেই, বিপাশা ভাবে। প্লেন ধরা এমন কী একটা জীবনমরণ যজ্ঞ? বিপাশা, তোমার কি কোনো জীবনমরণ যজ্ঞ আছে?

বিপাশা, ওই প্লেনটা ধরতে পারলে তুমি কোথায় যাবে? সেটা কি তোমার ঘর? তুমি কোথায় যাচ্ছ? কিসের প্লেন ধরছ তুমি এত তাড়াহুড়ো করে? এই বর্ষাচ্ছন্ন, মেঘমেদুর, ঝোড়ো হাওয়ার সকালে? তুমি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছ? একে কি ফিরে-যাওয়া বলে? নীত্রা থেকে লণ্ডন, শূন্য থেকে শূন্যে। এ অঙ্ক তোমার মিলবে কেমন করে? নিঃশব্দ বিপাশা নিজের সঙ্গে কথা বলে চলে—

বেচ্‌কা দুবার প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে চুপ করে যায়।

বিপাশার মনের মধ্যে কোত্থেকে তেড়ে আসছে হাজার হাজার কথা, হাজার তীক্ষ্ণমুখ প্রশ্নে ঠিক বাইরের ওই বৃষ্টির ছিটে যেমন ঝোড়োবাতাসের ঘোড়ায় চড়ে বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে—বিপাশা অসহায়।

BanglaBook.org

বেচ্‌কার গলা তার কানে পৌঁছয় না।

কোথায় যাচ্ছি আমি? মুক্ত বিশ্বে?

বিপাশা, তুমি বাড়ি যাবে না? তুমি তো লণ্ডনে বসে ইংরিজিতে কবিতা লিখতে চলেছ ইংরিজিতে তোমাকে চিঠি লিখতুম বলে তুমি আমাকে ন্যাপাতে সমীর, মাতৃভাষাটা যে আমাদের শেখাই হয়নি স্কুলে, সমীর, শোনো, আমি আর ইংরিজিতে চিঠি লিখব না—আই প্রমিস, আই সোয়্যার—অসম্পূর্ণ স্বপ্নের যন্ত্রণায়, অকারণ উদ্বেগে ছিন্নভিন্ন য়োহানও আমার চেয়ে বেশি মুক্ত সমীর!—জেলের ভেতরেও তুমি নিশ্চয়ই যেমন অনিরুদ্ধ। এই অসম্পূর্ণ অদর্শের কৃষ্ণছায়ার আবহাওয়াতে য়োহান দিব্যি স্বাধীন, অনিরুদ্ধ—তোমাদের যে পায়ের তলায় মুক্ত মাটি রয়েছে, রয়েছে মাতৃভাষা, মাতৃভূমি, তোমাদের মাটিতে পূর্ণ বসন্তের আশ্বাস—সমীর রে, এ কোন্ অরণ্যে আমি একা—আমি বাড়ি যেতে চাই, এবারে আমি বাড়ি ফিরে যাবো, —দেখিস সমীর আমি ঠিক তোকে খুঁজে বের করবো!

এই য়োহান কেমন তার নিজের বাড়িতেই আছে—যতই দুঃখ হোক, সে সুখী কাত্রিন কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে? আমি কাত্রিনার মতো হারিয়ে যেতে চাই না সমীর, আমিও বাড়ি যেতে চাই—য়োহান তো কমুনিস্ট হয়েও কেমন বলল—পৃথিবীটা হোট্ট, জীবন খুব বড়, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবেই—এটা শেষ দেখা নয়। এই প্রথম দর্শন অথচ আমি তো জানি চেকোস্লোভাকিয়ার এই অখ্যাত মফঃস্বল শহরে আর কখনো ফিরে আসার দরকার হবে না আমার—সেও তা নিশ্চয়ই জানে—তবু তো বলতে পারল—শোন সমীর, আমিও বলছি আমি ঠিক তোর কাছে আসতে পারবো, আর আমি ভয়ের ভেতরে লুকিয়ে থাকবো না। আমি আমার বাড়ির রাস্তাটা এতদিনে চিনে গেলাম রে—এবার আমি বাড়ি ফিরে যাবো, তুই দেখিস—যতো বৃষ্টি, যতো ঝঞ্ঝা হোক, সবুজ ডালে আমরা ঠিক ফুল ফোটাতে পারবো—সমস্ত ঋতুই হবে বসন্তের দিন...

—'বিপাশা?' বেচ্‌কা আস্তে আস্তে ওর হাত ধরে টানল।—'আমাদের নামতে হবে এবার। ব্রাটিস্লাভায় এসে গিয়েছি। ওই যে তোমার বাসস্ট্যাণ্ড, আমরা মিনিট পাঁচেক লেট, কিন্তু বাস এখনও ছাড়েনি। চলো, দৌড়ে গেলে এখনও ধরতে পারবো।'

—'বাসটা আছে?' হঠাৎ আর্তনাদ করে জেগে ওঠে বিপাশা।

—'আছে, আছে, অসম্ভব লাকি আমরা।'

—'চলো দৌড়োই—' বিপাশার সুটকেস হতে বেচ্‌কা বৃষ্টির মধ্যে দৌড়োতে শুরু করে—একহাতে শাড়ির কোঁচা তুলে বিপাশাও ঝুট্ ঝুট্ করে ছুট্ লাগায়।

অঝোর বৃষ্টি ধারার পর্দার ফাঁক দিয়ে সামনের কর্মব্যস্ত পাঁচ মাথার মোড়টাকে দেখায় ঠিক যেন বৃষ্টিভেজা চৌরঙ্গী-ধর্মতলার মোড়।

BanglaBook.org

প্রবন্ধ

প্রবাসী জন্মান্তর

১৯১২'র হেমন্তকালে এজরা পাউণ্ড ইয়েটসের ঘরে ঢুকে তাঁকে বিশেষ উত্তেজিত অবস্থায় দেখতে পেলেন—একজন মহৎ কবির আবির্ভাব ঘটেছে, 'যিনি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো কবি'।[১] রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী রূপান্তরের সেই শুরু। তিপ্পান্ন বছর আগের ঘটনা সেটা। এখন পশ্চিমের সব কবির চেয়ে বড়ো হওয়া দূরে থাক, তাঁকে তৎকালীন বড়ো কবিদের অন্যতম বলেও ধরা হয় না সে দেশে। আজ সেখানে শুনতে পাই, যদিও 'বাংলায় তিনি আজও বেঁচে আছেন ঠিক পঞ্চাশ বছর আগের মতোই...অধিকাংশ অভারতীয় পাঠকদের কাছে কিন্তু তিনি আজ জীবিত নেই, একটি বিচ্ছিন্ন মূর্তি মাত্র। আমাদের কাছে তিনি কোনও জীবন্ত সাহিত্যধারার অঙ্গ নন আর।'[২]

এই আশ্চর্য পার্থক্য ঘটলো কেন? স্বদেশে তাঁর পুজোর বেদী এখনও অক্ষুণ্ণ, শ্রদ্ধানিবেদনে পরিপূর্ণ, অথচ বিদেশে তাঁর নাম কেন ক্রমশ মুছে গেল, সেটা আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তো নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর জন্যই সৃষ্টি হয়, টলস্টয়, শেক্সপীয়র বা গ্যয়টে আজ স্বদেশে যেমন পূজিত, বিদেশেও তেমনিই মাননীয়। তবে আমাদেরই কবির অদৃষ্টে এমন অবিশ্বাস্য, তুলনাহীন দুর্ঘটনা ঘটে যায় কেমন করে? কেন এমন হলো? তিনি কি কোনও অংশেই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের সভায় বেমানান?

এর উত্তরে বরং উলটে প্রশ্ন করা চলে—জগৎসভাকে উজ্জ্বলতর করতে এখন একটি জ্যোতির্ময় নক্ষত্র কি আর উদিত হবেন বিশ্বসাহিত্যের আকাশে? তবে কেন বিশ্বসাহিত্যের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে তাঁর আসন সেভাবে স্থায়ী হলো না? কেন তিনি সত্যকার "বিশ্বকবি" না হয়ে ভারতের বাইরে শুধুই একজন 'ভারতীয় কবি' হয়ে রয়ে গেলেন? যে আন্তর্জাতিক নাগরিকতার সম্মান আজ দান্তে পান, পেত্রার্ক পান, শেক্সপীয়র, ভলতেয়ার এমন কি বোদলেয়ার, এলিয়ট পান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সে সাহিত্যিক যোগ্যতা পরিপূর্ণভাবেই অধিকৃত ছিল। দান্তের সঙ্গে তুলনাও এজরা পাউণ্ড স্বয়ং করে গেছেন।[৩] অত উৎসাহ ভরে পাউণ্ড ও ইয়েটস যে কবিকে গ্রহণ এবং উপস্থাপিত করলেন পশ্চিমের রসিক মহলে, তাঁরাই আবার তাঁকে বর্জন করলেন কেন?

পশ্চিমী চিত্তজগতের তৎকালীন আবহাওয়ার বদল হওয়া নিশ্চয়ই একটি কারণ। কিন্তু সাহিত্যের সত্তা আরো গভীরে শিকড় পাঠায়। সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গেই যা শাশ্বত শিল্প, তার স্বাদ পরিবর্তিত হয় না।

তাহলে কি এটাই মনে হয় না, যে আমাদের সামনে যে-রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল সত্তার নিয়ে সদাবিরাজিত, সেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পশ্চিমের পাঠকমহলের হয়তো পরিচয়ই ঘটেনি? তাঁরা যে-কবিটিকে চিনেছেন, সম্ভবত তিনি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, রবীন্দ্রনাথের একটি দিক মাত্র। রবীন্দ্রনাথের বাংলা শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তাঁর ইংরিজি শিল্পমূর্তির প্রচুর প্রভেদ আছে। তাঁর অসামান্য ভাষা-প্রয়োগের সূক্ষ্ম শিল্পকারুর অভাবই কেবলমাত্র নয়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যহীনতাও রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি রচনা-সম্ভারকে দুর্বল ও রক্তশূন্য করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম দিগন্তে অস্তে নামার কাহিনী বুঝতে হলে আমাদের তাঁর অনুবাদ-প্রসঙ্গে যেমন যেতে হবে, তেমনি যেতে হবে তাঁর রচনা চয়নের প্রশ্নেও।

'ঘরে বাইরে'র সমালোচনা করতে গিয়ে ই. এম. ফরস্টার রবীন্দ্রানুবাদ বিষয়ে খানিকটা ভেবেছিলেন "যখন রবীন্দ্রনাথের মতো এক অসামান্য মেধা এইরকম একটি বাক্যরচনা করেন—'Passion is beautiful and pure—pure as the lily that comes out of the slimy soil; it rises superior to its defilement, and needs no Pear's soap to wash it clean' তখন

কয়েকটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি চিত্তাকর্ষক নয়—একটি 'বাবু'জনোচিত বাক্য—অথচ রবীন্দ্রনাথ তো এমনিতে এত চিত্তাকর্ষক—এর দ্বারা কী তিনি বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি নাটকীয় হচ্ছেন, তাঁর উপন্যাসের একজন বাবু-চরিত্রকে তার যথোপযোগী ইংরিজি ভাষা যুগিয়ে দিচ্ছেন, নাকি তিনি বিদ্রূপ করছেন, অথবা হয়তো এই বাক্যে কোনো বোকোকো মাধুর্য ছিল, যা অনুবাদে হারিয়ে গিয়েছে, কিংবা কোনো পরীক্ষামূলক প্রয়াস এটা, যা ঠিক সার্থক হয়নি? সম্ভবত এটি একটি পরীক্ষামূলক রচনাই, কারণ পুরো বইটিতে কেবল কুরুচির ওপরে কুরুচির প্রয়োগ যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। অথচ মূল থীমটা কত সুন্দর...।"[৪]

মূলের রূপলাবণ্য বজায় রেখে কোনো ইয়োরোপীয় ভাষায় বাংলা সাহিত্য অনুবাদ করা যে কত কঠিন তা বলে দেবার দরকার নেই, কিন্তু কাজটি কবিতার ক্ষেত্রে যেমন দুরূহ, গদ্যের বেলায় তে তত্টা নয়। ছন্দ-মিলের বৈচিত্র্য ও জটিলত সঙ্গীতময়তা, এবং শব্দব্যবহারের সচেতন জাদু, যা কবিতার প্রাণ, তা প্রায়ই অনুবাদে বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় এসব দিকে মোটে নজরই দেওয়া হয়নি অনুবাদের সময়ে। অন্তত পড়তে গিয়ে বারবার সেটাই মনে হয়। ইংরিজি অনুবাদগুলিতে কবিতার একেবারে অন্য একটি মুখচ্ছবি, অন্য একটি শিল্পচরিত্র ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই রটেনস্টাইনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন অনুবাদে তাঁর 'Foreign Re-incarnation'[৫] বিদেশী জন্মান্তর হয়েছে। তাঁর শব্দ ব্যবহারে ভুল হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বৈদেশিক জন্মান্তরটি ঠিক তাঁর বাঙালি সাহিত্যজীবনের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

এই প্রবাসী জন্মে তিনি অন্য এক ব্যক্তি, অন্য এক কবি। ইংরিজি ভাষায় তাঁর আত্মবিশ্বাস কোনোও দিনই ছিল না। রটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন : 'আমি এত নির্বোধ নই যে আমার ইংরিজি ভাষা, যা বেশী বয়সে আমাকে ধার করে সংগ্রহ করতে হয়েছে, তার জন্য চড়া দাম চেয়ে বসব। তোমার নিশ্চয় মনে আছে কত বাধোবাধো ভাবে, কত অনিশ্চয়তার সঙ্গে তোমার হাতে আমার "গীতাঞ্জলির" পাণ্ডুলিপি তুলে দিয়েছিলেম, আমার ইংরিজি বড়ই অদ্ভুত, যার বিন্যাসের জন্য ইস্কুলের ছেলেটা পর্যন্ত বকুনি খেতে পারে।'[৬]

ওঁর এই 'অদ্ভুত বাক্য বিন্যাস'ই ('amorphous syntax') পশ্চিমের নজর কেড়ে নিয়েছিল। তাঁর ছন্দ ঋংকৃত গদ্য সব পত্রিকাতেই উচ্চপ্রশংসা পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২তে এজরা পাউণ্ডের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন : 'এ সব কবিতায় তোমরা কী দেখতে পাও (অনুবাদে)? আমি জানতেম না যে এরা কখনও ইয়োরোপবাসীর উৎসাহ জাগাতে পারবে।'[৭] পাউণ্ডের বুঝতে অসুবিধে হয়নি রবীন্দ্রনাথের বিস্ময় কী জন্যে—তিনি জানতেন 'গীতাঞ্জলি' আসলে একগুচ্ছ গান। অনুবাদে কেবল যে তার 'মূলের কাঠামোগত সৌন্দর্যেরই হানি' হয়েছে তা নয়, 'সুর, ছন্দ, মিলের সবকিছু ইন্দ্রজালই' নষ্ট, গানে তো 'সুর এবং শব্দ পরস্পর সন্নিবদ্ধ যুক্তবেণী।'[৮]

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে ১৯১৩তে 'ফোর্টনাইটলি রিভিউ'-এর এই প্রবন্ধে পাউণ্ড বাংলা ভাষার বাক্‌শক্তি নিয়ে যে কথাগুলি বলেছেন, একজন বাংলা না-জানা মানুষের পক্ষে সেই পরিচ্ছন্ন, নির্ভুল ভাবনা এবং শিল্প-সহানুভূতি আজও আমাদের যথেষ্টই অবাক করে। আমাদের আরো অবাক করে দিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন, —'এতসব হাঁটকাটের পরেও আমরা অনুবাদে কী পাই, ভাবতে গেলে আমি কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের 'প্রসঙ্গ' অথবা 'বিষয়বস্তু'র কথা আগে তুলব না। আগে তুলব তাঁর বাগ্‌ভঙ্গি, ও শিল্পশৈলীর দিকটা।'[৯] তার পরে সেইদিক নিয়ে তিনি তিনটি মূল প্রশ্ন আলোচনা করেন—প্রথমত, বাংলা ভাষায় বিভক্তি ব্যবহারের ফলে বাক্যের বিন্যাসে প্রচুর স্বাধীনতা আছে, যে কোনও শব্দ এদিক-সেদিক করা যায়। তাতে অর্থের বিপর্যয় ঘটে না। ইংরিজিতে সেটা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, বিভক্তিযুক্ত ধাতুরূপ শব্দরূপ দিয়ে মিল দেওয়া অনেক সোজা। অন্তত শ্রুতিমধুরতা আনা ঢের বেশি সহজ। তৃতীয়ত, বাংলায় সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি

BanglaBook.org

করা চলে, —তার ফলে শিল্পসৃষ্টিতে অনেকখানি স্বাধীনতা আছে শব্দ-সংকোচনের, অর্থ ঘনীভূত করার। এ সব কথা বেশ বুঝিয়ে বলে, পাউণ্ড চলে আসেন সুরের দিকটাতে। ভারতীয় রাগ-রাগিণী সুরের ইঙ্গিতেই কবিতার মূলভাব, অর্থাৎ এখন কোন্ ঋতু, দিনের কোন্ সময়, ইত্যাদির নির্দেশ দিয়ে কবিতাটি বোঝার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক প্রাসঙ্গিক আবহাওয়া তৈরি করে ফেলতে পারে যেমন গ্রীক মোড; শিল্পের এইসব ঐশ্বর্যই অনুবাদে অবলুপ্ত একথাও তিনি উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইংরিজি অনুবাদে দারিদ্র্যের শেষ নেই কেননা তা সুরহারা, মিলহারা, ছন্দহারা, শব্দের জাদু হারানো একটা শুষ্ক পুনর্বিন্যাস মাত্র—এটা পাউণ্ড নিজেই ভালো করে বুঝিয়ে দেন। এতসব হারিয়ে শেষ অবধি কী থাকে, সেটা আমরা অবাক হয়ে ভাবি। একটি ইয়োরোপীয় ভাষা থেকে আরেক ইয়োরোপীয় ভাষাতে (যেমন ইতালীয় থেকে ইংরিজিতে বা ফরাসী থেকে জর্মনে) অনুবাদ করলেও কবিতার যথেষ্ট রসহানি ঘটে। সুতরাং ভারতীয় ভাষা থেকে ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করলে যে আরো বেশি ক্ষতি হবে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী সমালোচকরা কিন্তু সে বিষয়ে গোড়া থেকেই সচেতন ছিলেন।

'ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেটে' বলা হলো, 'আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা কেবল অনুবাদই পেয়েছি মাত্র, এবং তাও কবিতার অনুবাদ গদ্যে! যা হারিয়ে গিয়েছে, যেমন আবহাওয়া বা ছন্দের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা তার মূল্য অবশ্যই অপরিমেয়।'[১০] চার মাস পরে 'নিউ স্টেটসম্যান' লিখেছিল, 'গীতাঞ্জলি যদিও অনুবাদ সাহিত্য, তবু তা শিল্প হয়ে উঠেছে। অনুবাদের কিম্ভূত পোশাকে আবির্ভূত হলেও, শিল্পের প্রকৃত চরিত্রটি নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই বিশিষ্টরূপে কাব্যগ্রন্থটিকে তিনি নিজেই অতি নিপুণ এবং ছন্দোময় ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন, এর শিল্পশৈলীই প্রধানত লক্ষণীয় বিষয়...এখানে কোন আবছা রেখা নেই।'[১১] 'টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট'ও ঐ এক কথাই শুনি—'সহজ এবং আধোছন্দোবদ্ধ ইংরিজি গদ্য, অর্থ যেখানে ভাষার কারণে কোথাও ঢাকা পড়েনি।'[১২] বছরখানেক পরে চিত্রাঙ্গদার অনুবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে 'নেশন' পত্রিকাও স্বীকার করে যে অনুবাদে যদিও প্রকাশভঙ্গির বেশ কিছু অসুবিধা ঘটেছে নিশ্চয়ই, 'তবু স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই বইয়ের লেখক সর্বপ্রথমে একজন মহৎ কবি, কবিকল্পনায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার; আর তাঁর শিল্পশক্তি সত্যকার মহৎ শিল্পের সৃজনীশক্তি, তিনি সুন্দরের আরাধনা জানেন। একজন দার্শনিক, নীতিবাগীশ, বা ধর্মপ্রচারক যে তাঁর মূল বক্তব্য এখানে পদ্যে জাহির করছেন না এটা স্পষ্ট।'[১৩] পরের বছরে 'এথেনিয়াম' পত্রিকায় 'ওয়ান হানড্রেড পোয়েমস অফ কবীর'কে 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির' সঙ্গে প্রতিতুলনা করা হলো এই বলে, যে তাঁর স্বকীয় কাব্যে 'কবিতা, শুদ্ধ কবিতার জন্যই' জন্ম নেয়, কবীরের মতো ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হয় না।'[১৪]

সুতরাং বেশ দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চিনতে ভুল হয়নি পশ্চিমের। এমন কি পরের দিকেও, ধরা যাক বছর দশেক বাদে, পশ্চিমদিগন্তে রবি যখন পাটে নামতে শুরু করেছেন, তখনও লেনার্ড উল্‌ফ লিখেছেন, 'আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনা আমাকে শীতল দূরত্বে ফেলে রেখেছে। মূলভাষায় তাঁর কবিতা হয়তো মহৎ কাব্য হতে পারে; কিন্তু ইংরিজিতে তাদের মধ্যে এমন একটা ক্ষীণজীবী অক্ষমতা আছে যা ভাষান্তরণের সময়ে ঘটে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যা একবার ঘটে গেলে আর শিল্পের রক্ষা থাকে না।'[১৫] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা নষ্ট হবার কারণ কেবল এটাই ছিল না। যেখানে লেনার্ড উল্‌ফ রবীন্দ্রনাথের ইংরিজিতে প্রাণশক্তির অভাব দেখেছেন, সেখানেই তো পাউণ্ড বলেছেন, 'গীতাঞ্জলিকে অতি অপরূপ ইংরিজি গদ্যে অনুবাদ করেছেন কবি স্বয়ং ছন্দের সুনিপুণ দক্ষতায়।'[১৬] রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হ্যারিয়েট মনরোকে তিনি লিখেছেন, ১৯১৩'র এপ্রিল মাসে, 'যতদিন তিনি কবিতা নিয়েই থাকবেন, ততদিন তাঁকে কেবল রচনাশৈলীর খাতিরেই নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত করা চলবে

BanglaBook.org

তাঁদের মতের বিরুদ্ধে, যাঁরা তাঁর বিষয়বস্তু পছন্দ করেন না।'[১১] এই থেকে বুঝতে পারি যে নোবেল পুরস্কার পাবার সময় দিয়েও (১৯১৩তেও) কিছু কিছু পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়বস্তু পছন্দ করতেন না। অনুবাদে তো বিষয়বস্তুর তেমন কোন অদলবদল ঘটে না, কাজেই সেখানে খুব একটা ভুল বোঝাবুঝির কিছু নেই।

অনুবাদে প্রথমদিকে ইয়েটস এবং পাউণ্ড তাঁকে সাহায্য করেছিলেন (in their perilous adventure of a foreign reincarnation)[১৮] কিন্তু পরের দিকে কবি নিজেই কাজটির সম্পূর্ণ ভার নিয়ে নিলেন, ('unaided by any friendly help') অন্যের সাহায্য ছাড়াই প্রচুর পরিমাণে গদ্য-পদ্য ইংরিজি ভাষাতে লিখতে ও ছাপতে শুরু করে দিলেন। ওঁর নিজের মতে, এই ভাবে কাজ করার উদ্দেশ্য ছিল কেবল নিজের মতামত এবং মনোভাব প্রকাশ করা ; যে ভাষা 'কোনোদিনও আমার নিজস্ব হবে না, এমন একটি ভাষাতে দখল দেখিয়ে লোকের প্রশংসা অর্জন করা নয়।'[১৯] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের খেয়াল হয়নি যে এইসব স্বয়ংকৃত, অন্যের সাহায্য ব্যতীতই শেষ করা দ্রুত অনুবাদের রাশি তাঁকে প্রশংসা এনে দেওয়া দূরে থাক, তাঁর মনের ভাব প্রকাশেও অসহযোগিতা করবে, এবং জন্মের মতো অপূরণীয় ক্ষতি করে দেবে তাঁর সুনামের। রটেনস্টাইন দুঃখ করে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ কেবলই কবিতা ঢেলেই চলতে লাগলেন, কিছু কিছু অনুবাদ করে আমাকে মাঝে মাঝে পাঠাতেন, কিন্তু তিনি ইংরিজিতেও লিখতেন। ইয়েটস এবং স্টার্জ মোর এগুলোর বিরুদ্ধে ছিলেন। একজন কবিকে তাঁর মাতৃভাষাতেই লিখতে হবে। অন্যের ভাষায় কখনই শব্দের যথাযথ অর্থ ঠিকমত ধরা দেয় না। তিনি এমন সব শব্দ, বা বাক্যবন্ধ ব্যবহার করেন, যা অতি ব্যবহারের দোষে তাদের চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে।'[২০]

কেবল ইয়েটস, স্টার্জ মোর আর রটেনস্টাইন যে রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি রচনার অবারিত স্রোতের বিপক্ষে ছিলেন তা নয়। এজরা পাউণ্ড হ্যারিয়েট মনরোকে একথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে, "বাংলা মূল রচনায় তাঁর ছন্দ মিলের নানা নতুনত্ব আছে এবং প্রকাশভঙ্গিরও, কিন্তু গদ্য অনুবাদে ব্যাপারটা শুধুই 'আরো খানিক আধ্যাত্মিকতা' মাত্র। অবশ্য উনি যদি চান যে আমি আমার করা কবীরের অনুবাদে যে শিল্পমান নির্ধারণের চেষ্টা করছি, তার চেয়ে নিচু মানের শিল্পসৃষ্টি করবেন, তাহলে আমি আর কী করতে পারি'[২১] ওখানেই পাউণ্ড লিখেছেন 'লণ্ডনে তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে যুঝতে পারা খুব শক্ত হবে, যদি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ব্যতীত আর কিছু প্রকাশ করেন।'[২২] পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বন্ধুদের উপদেশ যে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এমন বলা যায় না। এককালে যাঁদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং ঈর্ষা কুড়িয়েছেন, অসংস্কৃত, এবং অসংহত অতিশয়োক্তির ফলে সেই বন্ধুদেরই বিরক্তিভাজন হতে হয়েছিল তাঁকে, এ বড়ো কম দুঃখের কথা নয়। একটি রচনার শৈল্পিক সার্থকতা যেমন সংযম এবং সঙ্গতিনির্ভর, একটি লেখকের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা হয়তো তেমনিভাবেই কলম থামানোর সংযম ও সঙ্গতির ওপরে ভর করে থাকে। গতি হলেই তো হলো না, যতিও চাই ; তবেই না ছন্দোবদ্ধতা আসবে, না হলে ছন্দপতন ঘটে যায়। পশ্চিমের রবীন্দ্রচেতনার ভাগ্যেও তাই হয়েছিল ছন্দপতন। যতির অভাবে। বিদেশী মানসের গতিপ্রকৃতি, সামাজিক পারিপার্শ্বিক ও সংশ্লিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে নির্ভুল আন্দাজও কবির মধ্যে ছিল না। যখন ইয়েটসকে ১৯৩৭-এ চীৎকার করে উঠতে শুনি 'Let Tagore cast off English'[২৩], তখনই আমাদের মনে পড়ে যায় পঁচিশ বছর আগে এই ইয়েটসই গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন দিনের পর দিন। ট্রেনে, বাসে, রেস্তোরাঁয় বসে বসে পড়েছেন। পড়ে পড়ে তাঁর আশ মেটেনি, মাঝে মাঝে বইটা বন্ধ করে ফেলতে হয়েছে পাছে কোনো আগন্তুক দেখে বুঝতে পারে, ঐ ছোট বইটি তাঁকে 'কতদূর দোলা দিচ্ছে।'[২৪] প্রথমত, খুব ভালো জিনিসেরও খুব বেশি বাড়াবাড়ি বেশিদিন ভালো লাগে না। দ্বিতীয় কথা, রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাহেবরা যতটা মাতামাতি করেছিলেন,

BanglaBook.org

তাঁর ভাষাটা সত্যিই ততটা আকর্ষণীয় ছিল কিনা, বৈচিত্র্য মানেই তো বৈশিষ্ট্য নয় তাঁর বিদেশী হাতের ইংরিজিতে একটা অচেনা পরদেশী ছাপ ছিল, কিন্তু সেটা গুণ না দোষ সেটাও বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই দেখি না বুঝে বহুব্যবহৃত, অকেজো কোনো বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে ফেলেছেন কবিতার অনুবাদে, অথচ বাংলা ভাষাতে একাজের ঠিক বিপরীতটাই করা ছিল তাঁর ভূমিকা। তিনিই তো আমাদের কলমের মুখে আমাদের নতুন বাংলা, এই আধুনিক, রুচিশীল, ভাবোপযোগী ভাষাটি তুলে দিয়েছেন তাঁর দুঃসাহসিক, রোমহর্ষক ভাষা অভিযানের ফলশ্রুতিতে।

যে নবীন প্রাণশক্তি তিনি তাঁর মাতৃভাষার ধমনীতে ঢেলে দিয়ে গেলেন, তাঁর ইংরিজিতে ঠিক সেই নবীন প্রাণেরই অভাব ছিল। যেমন ধরা যাক ইংরিজি গীতাঞ্জলির ২৪ নম্বর কবিতাটি। 'স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে/যেমন করে ঢেকেছো ধরণীরে' রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে কী হয়েছে? 'Even as thou wrapt the earth with the coverlet of sleep' যেমন স্থূল তেমনি প্রকাব্যিক। অথচ নিতান্ত সোজাসুজি ভাষান্তরিত করলে এটা দাঁড়ায় 'Just as you have secretly and slowly covered the earth with dreams', এখানে 'গোপনে' ও 'ধীরে ধীরে' এই দুটি মূল ক্রিয়া-বিশেষণই অনুবাদে বাদ পড়েছে। এবং 'লেপ' (coverlet) এই শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে। ইংরিজিতে অনুপ্রাস , মিল এসব বাদ পড়বে জানি, তা বলে জরুরী শব্দও বাদ পড়বে এবং মন্দ শব্দ ঢুকে যাবে কেন? তাতে যে অর্থেরও বদল হয়, যাকভঙ্গিরই শুধু নয়। এর পরের অংশে, ইংরিজি কবিতাটি বাংলার ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে/ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে/বসন যার মলিন হলো ধূলায় অপমানে' সিধে ভাষান্তরিত করলে হতো এইরকম:

Whose provisions end in the middle of the road / on whom signs of loss are evident/whose clothes are dirty with dust and humiliation

আর কবির অনুবাদে যা ছাপা হয়েছে তা এই:

From the traveller whose sack of provisions is empty before the voyage is ended, whose garment is torn and dust-laden. সব চেয়ে জরুরী সবচেয়ে কবিত্বময় পঙ্‌ক্তিটি (ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে) বাদ দেওয়া হয়েছে। সব চেয়ে জরুরী শব্দটিও (অপমানে) বাদ দিয়েছেন, এবং অকারণে 'থলে' ইত্যাদি অকাব্যিক শব্দ, 'ভ্রমণকারী' ইত্যাদি ব্যাখ্যামূলক বিশেষ্য যোগ করেছেন তার পরের ধাপটি আরো ক্ষতিকর। অনুবাদ তো নয়, একটা খুব সংক্ষিপ্ত 'মর্মকথা', যাতে মর্মের কথাটাই বাদ পড়ে গেছে। অথচ মূলে এই অংশটি গাঢ় মর্মবেদনায় ব্যাকুল।

ঢাকিয়া নিক তাহার ক্ষতব্যথা / করুণাঘন গভীর গোপনতা / ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন ঊষা পানে / জুড়ায়ে তারে আঁধার সুধাজালে।' আমার নিতান্ত যান্ত্রিক, শব্দনির্ভর ভাষান্তরণে এটি হবে:

Let a kind and deep privacy / conceal his wounds and pains / effacing shame make him blossom out towards the new dawn / soothing him in the life-giving waters of the dark.

রবীন্দ্রনাথের হাতে এটি হয়েছে:

Remove shame and poverty, renew life like a flower under the cover of thy kindly light.

এ যেন 'গরীবী হঠাও' জাতীয় স্লোগান দিয়ে শুরু আর 'lead, kindly light' জাতীয় ধর্মালাপ দিয়ে সারা। মাঝখানে হঠাৎ একটু ঘাসফুলের ছবি আঁকা, দুটো আলাদা পোস্টার যেন। একি ভালো হয়েছে? এখানে মূল কবিতাটা গেল কোথায়?

BanglaBook.org

এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে আত্মহত্যার একটি পন্থা। প্রবাসী জন্মান্তর কি সহজ? তার আগে মূল জন্মের একটা মৃত্যু তো ঘটা দরকার?

প্রায়ই দেখতে পাই কবি অনুবাদের নামে তাঁর কোনোও কবিতার চরিত্রও পালটে দিচ্ছেন, খোল-নলচে তো বটেই। আর বর্ণ-গন্ধ তো এমনিতেই থাকে না অনুবাদে। আমি এমন অসংখ্য অনুবাদ তুলে দিতে পারি, যেখানে অপূর্ব বাংলা রূপক, বা চিত্রকল্প, কল্পনা-বিরহিত এলোপাথাড়ি অনুবাদের কবলে প্রাণ হারিয়েছে। যেমন, 'পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে / মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে/ নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন / সে কথা যে ভুলে যাই।'

আমার নেহাত যান্ত্রিক আক্ষরিক অনুবাদে

When I leave this old house, / I wonder what would happen/that you are the old amidst the new /I forget.

রবীন্দ্রনাথ :

I am uneasy at heart when I leave my accustomed shelter, I forget that there abides the old in the new and there also thou abidest. (ইংরিজি গীতাঞ্জলির ৬৩ নং কবিতা)

হায়, একে কি কবিতা বলব? আরো ভালো কবিতাকে কবি আবার আরো বেশি নষ্ট করেছেন কোথাও কোথাও। যেমন :

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার / পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।' (ইংরিজি গীতাঞ্জলি ২২ নং কবিতা) আক্ষরিক অনুবাদে দাঁড়ালো' 'To night, this stormy night, is your rendezvous,/my sweetheart,my friend!' রবীন্দ্রানুবাদে : 'Art thou abroad, on this stormy night on the journey of love, my friend?' এ বাক্যে হঠাৎ ওই প্রশ্নটি—(যেন চৌকিদারির কর্মনিষ্ঠার প্রমাণ দাবী) উঠে এল কোথা থেকে? মূল গানে অভিসার বিষয়ে তো কোনও প্রশ্ন নেই, তা সংশয়াতীত! তাছাড়া এ গানের মূল সম্ভাষণ 'পরাণসখা' শব্দটা কেন যে উপে গেল!

শুধু কি এই? কতগুলো আবার কবিতার অনুবাদ না হয়ে ব্যাখ্যা, টীকা, আলোচনা সব কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন এইটা—(Lover's gift and Crossing'—১৮ নং কবিতা) 'জীবনে যত পূজা হল না সারা / জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' আক্ষরিক অনুবাদে 'All the worships that remain incomplete in this life/I know are not lost.' কিন্তু কবির স্বহস্তের খোঁচায় তার অবস্থা হয়েছে 'I know, this life, missing its ripeness in love, is altogether lost.'

আবার কখনও বা কবি তাঁর কোনও প্রসিদ্ধ কবিতার বিষয়বস্তুটি নিয়ে সেই থীমে নতুন করে একটি ইংরিজি কবিতা লিখেছেন। ফলাফল সাধারণত হয়েছে মারাত্মক। যেমন 'বলাকা'র 'একথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান' কবিতা যা রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভালো কবিতাগুলিরও অন্যতম (এবং সবচেয়ে দীর্ঘ কবিতাগুলিরও অন্যতম বটে!) তার একটি বাইশ লাইনের ভাবানুবাদ করেছেন 'Lovers Gift'-এর প্রথম কবিতায়। ইংরিজি কবিতাটিতে শব্দগুলি এতই অতিব্যবহৃত, যৎসাধারণ যে মোটে কবিতাই হয়নি ব্যাপারটা। 'কবিত্বময় ইংরিজি' বলে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা ভাষার চেহারা ছিল, সেই অবাস্তব ভাষাতে মূল কবিতার সমস্ত চিত্রকল্প সত্তার কুচিকাটা করে কেটে বাদ দিয়ে, আবছাভাবে একটা সংক্ষিপ্ত সমাচার লিখে ছেপে দিয়েছেন তিনি। পড়লে যে কোনো কবিতাপ্রিয় বাঙালীর চোখ দিয়ে জল না বেরিয়ে পারে না। এবং সে জল আনন্দাশ্রু নয়।

রবীন্দ্রনাথের অনাদৃত অনুবাদে ইংরিজি লেখাগুলি যে কেবল মূলের চেয়ে দুর্বল, অক্ষম

BanglaBook.org

হয়ে পড়তো তাই নয়, তারা হতো বিকৃত, এবং উপদ্রুত। যেন সম্পূর্ণ অন্য এক জাতের শিল্পক্ষমতার পরিচয় মেলে তাতে। শুধু কবিতাতেই নয়, এভাবে নাটকেও তিনি এটা-ওটা অদলবদল করতেন। উদাহরণ স্বরূপ যেমন 'রাজা' নাটকের ইংরিজি 'The King of the Dark Chamber.'-এ তিনি যে বাধ্য হয়ে কেবল ভালো ভালো গানই বাদ দিয়েছেন তা নয়, নাটকের কাঠামোটি পালটে তার বনেদের ভারসাম্য, ব্যঞ্জনা, সব কিছু নষ্ট করেছেন। মূলে প্রথম দৃশ্য, শেষ দৃশ্য এবং অষ্টম দৃশ্যটির (যা নাকি প্রায় মাঝামাঝি) স্থান—'অন্ধকার ঘর' কিন্তু ইংরিজিতে হঠাৎ কবি শেক্সপীয়রের ভঙ্গিতে প্রথম দৃশ্যে পথ, ও পথচলতি মানুষদের এনে Exposition করবার প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে বাংলায় যেখানে 'রাজা'র প্রথম শব্দই হচ্ছে 'আলো, আলো কই' বলে রাণী সুদর্শনার কাতর আকুতি, ইংরিজিতে সেখানে দেখছি প্রহরী ও পথিকের আলাপ, 'Ho Sir!' এবং উত্তরে 'What do you want?' নাটকের মূল মর্মে ঘা দিয়ে বুকের ভেতর ঘণ্টা বাজিয়ে শুরু হয়েছে বাংলা নাটক, আর ইংরিজিতে আরম্ভর মুহূর্তটি কত দূরে সরে গেছে নাটকের মর্ম থেকে। বাংলায় ১৪ নং দৃশ্যে রাণী সুদর্শনার হৃদয়ের পরিবর্তন দেখছি, তিনি ছোরা বের করে আত্মহত্যা করতে চাইছেন—এবং নাটকে এই দৃশ্যেই তাঁর একটি মাত্র সঙ্গীত আছে। সেই সুদর্শনার আত্মিক উত্তরণের চরম মুহূর্তে। সুরের মাধ্যমেই এই নাটকে হৃদয়ের সত্তা ভাষা, উত্তরণের ভাষা যুগিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রাজা, সুরঙ্গমা, ঠাকুর্দা, এরা সবাই গান গেয়ে কথা বলে। ইংরিজিতে সুদর্শনার ওই একটিমাত্র গান অনুবাদ করা হয়নি। (এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে / ওহে অন্ধকারের স্বামী / ...) অথচ গানেরই মধ্যে স্পষ্টত পুরাতন সত্তাটিকে নষ্ট করে ফেলার প্রার্থনা রয়েছে—'ওগো মরুক না' এই আমি।' এবং রয়েছে পুনর্জন্মের ইঙ্গিত। অথচ ইংরিজিতে এর সবটাই বাদ!

অতএব রবীন্দ্রনাথের মুশকিল যে কেবল ইংরিজির অক্ষমতাতেই আবদ্ধ ছিল, তা নয়। কেবল অনুবাদের দোষেই তিনি পশ্চিমদিগন্তে অস্তাচলে গেলেন বলতে গেলে তাও বলা হয় না। তাঁর জনপ্রিয়তা নষ্ট হবার মূলে কেবলমাত্র কিন্তু অনুবাদ নয় অনুবাদে তাঁর সৃজনী প্রতিভার সম্পূর্ণ ব্যবহার হয়েছে। টার্গেট ভাষা অর্থাৎ যে ভাষাতে অনুবাদটি করা হবে সেটি যাঁর মাতৃভাষা, এমন লোকের দ্বারা অনুবাদ না হলে সে লেখা কখনো প্রাণবান্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি যদি ইওরোপের উৎসাহ স্থায়ী হতো তবে রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদ করার জন্যে কোনও গারনেট যুগল উপস্থিত হতেন, যাঁরা বাংলা শিখে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্বভাষাতে অনুবাদ করতেন। এ পর্যন্ত যতো সার্থক সাহিত্য অনুবাদের কথা আমরা ভাবতে পারি, তার কোথাওই কি দেখেছি, যে মূলভাষা থেকে যিনি আরেক ভাষাতে সাহিত্য ভাষান্তরিত করছেন, তিনি নিজেই টার্গেট ভাষাটা ভালো জানেন না? সাধারণত এই রকমই হয়, যেমন ফরাসিতে অন্য সাহিত্য অনুবাদ করেন যিনি, ফরাসিই হয় তাঁর মাতৃভাষা। হের্ডর যে শেক্সপীয়রকে জর্মনে অনুবাদ করেছেন, সেটা তিনি ইংরিজি শিখে নিয়ে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে কিন্তু এটি ঘটেনি। ঘটেছে এর বিপরীত। রবীন্দ্রসাহিত্য ইংরিজিতে অনুবাদ করেছেন কবি নিজে এবং তাঁর বাঙালী শিষ্য-ভক্তরা। মার্জারি সাইকস ছাড়া আর তো ইংরিজিতে রবীন্দ্র অনুবাদক বিশেষ কাউকেই দেখি না যিনি একত্রে ঐকান্তিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এডওয়ার্ড টমসন, পিয়ার্সন সাহেব, বা ভগিনী নিবেদিতাও অবশ্য টুকরো টুকরো অনুবাদ করেছেন এদিক ওদিক কিন্তু কেবল পশ্চিমে 'রবীন্দ্রনাথের অনুবাদক' হবার উদ্দেশ্যেই নিজেকে তৈরি করে নিয়ে কোমর বেঁধে কাজে নামেননি এঁরা কেউ। (*Tagore Centenary Volume*-এ রবীন্দ্রনাথের বিদেশী অনুবাদকদের মোটামুটি তালিকাটি দেখলেই এটা বেশ বোঝা যায়) সার্থক কবিতা হিসেবে আঁদ্রে জিদের ফরাসি গীতাঞ্জলির প্রশংসা আছে (যদিও তাও ইংরিজির থেকে অনুবাদ) আমার মনে হয় এর কারণ ফরাসিকে জিদ্ সৃজনীমূলক ভাবে ব্যবহার করতে জানতেন। অ্যারনসনের বইতে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপীয় অনুবাদকদের একটি নামের তালিকা

BanglaBook.org

পাওয়া যায় কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ইংরিজি থেকে অনুবাদ করেছেন, বাংলা শিখে নয়। সেইখানেই ট্রাজিডি। ইংরিজিভাষার কলমে, বাংলা ভালো করে না শিখেই ঝটিতি-করা অনুবাদের ক্ষেত্রে আবার কখনো কখনো ভয়াবহ সব উলটো-ভুল হয়ে যায়। 'জলচৌকি' কোথাও কোথাও water হয়ে গেছে, তাও তো ছাপার হরফে পড়েছি তথাকথিত 'নির্ভরযোগ্য' অনুবাদে! তাই উচিত হচ্ছে ইংরিজিই যাঁর মাতৃভাষা, কিন্তু ভালো করে যত্ন নিয়ে বাংলা শিখেছেন, এমন একজনের সঙ্গে—ভালো ইংরিজি জানেন, কিন্তু মাতৃভাষাতে যাঁর পূর্ণ দখল আছে, এমন এক ব্যক্তির হাত মিলিয়ে অনুবাদের কাজে বসা।

একেবারে গোড়ার দিকের অনুবাদে সেই মহামিলনের সৌভাগ্য ঘটেছিল, যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটস পাণ্ডিত্যের জ্যোতির্ময় কলমও যোগ দিয়েছিল তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র জন্মান্তর ঘটানোর কাজে।

অনুবাদ তো সত্যিই পুনঃসৃষ্টি বটে। যে ভাষাতে সেই পুনঃসৃষ্টি ঘটবে, সেই ভাষাকে শিল্পসম্মত স্বকীয় ভঙ্গিতে, সৃষ্টিমূলক ভাবে ব্যবহার করার বিশেষ ক্ষমতাটি অনুবাদকের থাকা চাই, তাঁকে মূলভাষাটিতে যেমন সব ইশারা-ইঙ্গিত বুঝে নিতে হবে, তেমনিই তাঁকে লক্ষ্যভাষাতে সেই সব ইশারা-ইঙ্গিত প্রকাশ করতেও জানতে হবে। এই শেষের ক্ষমতাটি মাতৃভাষাতে যত সহজে সম্ভব, শেখা ভাষাতেও ঠিক সেভাবে পারা যায় না। বুঝে-নেওয়া, স্বাদগ্রহণের শক্তি একজাতের ক্ষমতা, কিন্তু রস প্রকাশ করা, বা সৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ আরেক জাতের জাদুর খেল্। তৃপ্তি করে খাওয়া আর ভালো রান্না করা তো এক কাজ নয়। অনুবাদ করতে বসলে সেই শেষোক্ত ইন্দ্রজালটি জানা চাই, সে আত্মবিশ্বাস দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের অথবা তাঁর বাঙালি অনুবাদকদের ইংরিজি ভাষাজ্ঞানে উপস্থিত ছিল না। তাঁরা অন্যের সৃষ্ট ইংরিজিটা খুবই ভালো বুঝতেন, কিন্তু নিজেরা সৃষ্টিমূলকভাবে সেই ভাষাটিকে ব্যবহার করার অমূল্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। এর ফল হয়েছে ইংরিজিতে রবীন্দ্ররচনার ক্রমাগত পদস্খলন; অনুবাদে তাঁর পতনের যেন সীমা নেই। অনুবাদে কবিতা পড়তে তো আমরা বেশ অভ্যস্ত। পরের ভাষা ইংরিজির কল্যাণেই তো প্রধানত আমরা পেয়েছি এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপের সমগ্র সাহিত্যের স্বাদ।

তাতে কি লু-সুন কি হো-চি-মিন, মনতাজের কি আখমাতভস্কি, নেরুদা কি আচেবে, রিলকে কিংবা লরকার শিল্পচরিত্র বুঝতে তেমন কোনও অসুবিধা হয়েছে? ইদানীং পরভাষাচর্চা যতটা এদেশে চালু হয়েছে, আগে সে সুযোগ ছিল না, তা বলে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না তা তো নয়। অনেকে ইদানীং মূলের স্বাদ পেতে শিখেছি বটে, কিন্তু সন্দেহ নেই অনেক বছর ধরেই আমরা অনুবাদেই বিদেশের যথেষ্ট সাহিত্যরস উপভোগ করেছি। ক'জন আর গ্রীক শিখে প্লেটো আরিস্টটল পড়ি, লাতিন শিখে ভার্জিল, রুশ শিখে ডস্টয়েভস্কি? যাঁরা আমাদের ইংরাজিতে এই গঙ্গা আনয়ন করে দিয়েছেন সেই ভগীরথ ব্যক্তিরা মূলত ইংরিজিভাষী, কিন্তু তাঁরা বিদেশী ভাষাগুলিতে যত্ন করে, শ্রদ্ধাভরে পুঙ্খানুপুঙ্খ দক্ষতা অর্জন করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুঃখ না করে পারি না, যে যে-বিদেশীরা আজকাল একটু-আধটু বাংলা থেকে অনুবাদে হাত দেন, তাঁরা কিন্তু বাংলাটা যথেষ্ট শ্রদ্ধাভরে শেখেন না। অথচ রুশ, গ্রীক, বা ইস্পানী অনুবাদ করতে গেলে, সেই সব ভাষায় পরিপূর্ণ নিপুণতা অর্জন না করে তাঁরা অনুবাদ কর্মে হাত দিতেই সাহস পেতেন না। এর মর্মোদ্ধার করতে গেলে ঔপনিবেশিক মানসিকতার দুষ্ট শিকড়ে টান লাগবে। বাংলা ভালো করে কেন, একেবারেই না শিখলেও পশ্চিম ভূখণ্ডের কিছু এসে যাবে না। বাংলা ভাষাটা তো কোনো 'জরুরী ভাষা' নয়—পশ্চিমের কাছে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দ্বিভাষী লেখক হতেই হয়েছিল জগৎসভায় উপস্থিত হবার জন্য, যে প্রয়োজন টলস্টয় শেক্সপীয়র বা গ্যয়টের ছিল না। বাংলাভাষা পশ্চিমী জাতিপুঞ্জের শেখার কোনও প্রয়োজন নেই। তাদের কাছে পরিচিত হবার জন্য নিরবধিকাল অপেক্ষা করতে হতো রবীন্দ্রনাথকে, যদি না

BanglaBook.org

তিনি তাদেরই ভাষায় নিজেকে প্রস্ফুটিত করতেন। তাঁকে 'আবিষ্কার' করবার কোনও দায় ঔপনিবেশিক প্রতীচ্য সভ্যতার ছিল না। হয়তো এই প্রাথমিক শ্রদ্ধার অভাবই রবীন্দ্রনাথের ভুলপথে পরিচালিত হবার মুখ্য কারণ। এ সব প্রসঙ্গ অপ্রিয় জ্ঞানেই বর্জন করা হয়েছে এতকাল। আমাদের দেশে কজন আর এ. কে. রামানুজন আছেন যিনি ইংরিজিকে সৃষ্টিমূলকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম, আবার মাতৃভাষাটাও ভালো জানেন। যাঁরা আছেন, তাঁরা অন্যের রচনার অনুবাদকর্মকে সন্তর্পণে হেয় জ্ঞান করবেন।

রবীন্দ্রনাথকে এই পঁয়ষট্টি বছরেও ঠিকমতো অনুবাদ করা হয়নি। প্রধানত যাঁরা করেছেন, তাঁদের প্রকৃতপক্ষে অনুবাদের অধিকারই ছিল না। তাঁরা ইংরিজি ভাষার অন্তর্লোকে কখনও সেইভাবে প্রবিষ্ট হননি, যতটা গভীরে গেলে তবে ভাষাকে প্রেমিকার মতো স্ববশে আনা যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো কেবল কবিতাই লেখেননি, আরো অনেক কিছুই লিখেছেন। অনুবাদ-কবিতাতে যতই রসহানি ঘটুক, তাঁর গদ্যও তো অন্তত যথাযথভাবে বিদেশী পাঠকদের সামনে যেতে পারত? কবির গদ্য রচনার সংখ্যা তাঁর কাব্যগ্রন্থের তুলনায় অর্ধেকের চেয়েও বেশি। কেবল মূলেই নয়, অনুবাদেও। তাই মনে হয়, কেবলমাত্র কবিতা অনুবাদের দুর্বলতা, আর ব্যবহারের অপটুতাই পশ্চিমে তাঁর জনপ্রিয়তা ধ্বংস হয়ে যাবার অনন্য কারণ নয়।

আরও কারণ খুঁজতে হলে আমাদের দেখতে হবে, তিনি কী ধরনের বিষয়বস্তু, কী ধীমের রচনা প্রধানত পশ্চিমের পাতে দিয়েছিলেন, এবং তা তাদের পক্ষে স্বাদু, বা সুপাচ্য ছিল কিনা।

১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে 'পারী সোয়ার' লিখল, 'Un poete mystique et passionne' ওখানেই আরেকটি নিউজ হেডিং 'Le mystique realiste'—মোটামুটি এখানে ঝোঁকটা দেখা যাচ্ছে 'মিস্টিক' এই বিশেষণের ওপরে। দুঃখের বিষয় পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় শুধু এই মরমী কবি হিসেবে। ভক্তির কবি, ধ্যানের ঋষি রবীন্দ্রনাথের রচনায় মানুষ ও জগৎ নিসর্গের, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীবাত্মার যে গভীর মৌল সম্পর্কের প্রকাশ তাতে তাঁর কবিতা ও গানের একটি প্রধান অংশকে তো 'মিস্টিক' কবিতা বলাই উচিত। কিন্তু ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ তো রহস্য-রোমাঞ্চের শিল্প জানেন না। কেবলমাত্র মিস্টিসিজমই নয় বেশ কিছুটা 'মিস্ট্রী'ও ছিল তাঁর পাশ্চাত্য অভিনন্দনের পিছনে। ১৯২১-এ তিনি যখন প্যারিসে গেলেন, 'লে'ক্লেয়ার'-এ লেখা হলো তাঁর প্রতীচ্যে অপ্রতিজ্ঞাত রহস্য গভীর নয়নের বর্ণনা—'des yeux inconnus en occident, plcins dc mystere!'[২৫] এমন-কি 'চতুরঙ্গ' অনুবাদের ভূমিকায় রোমাঁ রোলাঁর মতো মনীষীও বলে বসেন—'কবি-ভবিষ্যৎদ্রষ্টার রহস্য-গভীর মুখচ্ছবি'র কথা।[২৬] 'মিস্টিক' মরমী কবি হবার জন্য 'মিস্ট্রী' বা রহস্যময়তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী পুনর্জন্মে দুটোরই অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটেছিল। তাঁর রূপের প্রশান্ত মহিমা, শ্মশ্রুগুম্ফ, জ্যোতির্ময় দৃষ্টি, এবং আলখাল্লাটিও সেই ভাবমূর্তি তৈরিতে যথেষ্ট রসদ যুগিয়েছে। বাইবেলবর্ণিত মেসায়াহ্‌দের এবং খ্রীস্টিয় সন্তদের প্রাচীন চিত্রে ঐ রকমই দেখায়। ১৯২২-এ 'লা গোলোয়া'-তে লেখা হয়েছিল তাঁর মুক্তিময় রহস্যভরা দৃষ্টির বিষয়ে—যেন বাইবেলের কোনো চরিত্র ('caractere biblique')।[২৭]

দুর্ভাগ্যবশত এই অতীন্দ্রিয় (তথা রহস্যময়) ভাবমূর্তির গোড়ায় অনিচ্ছাকৃত রসসঞ্চার করেছেন স্বয়ং পাউণ্ড, 'ফোর্টনাইটলি রিভিউ'-এর সেই তুলনাহীন বিশ্লেষণী প্রবন্ধেরই এক অংশে। তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি কবিতায় আছে বাইবেলের ছন্দগুণ, এবং নববিধানের সাম-গানের সহজ কাণ্ডজ্ঞান। এই সৌম্য দিব্য আত্মিক প্রভাটি দান্তেরও স্বর্গপর্যায়ের কাব্যচরিত্রে উজ্জ্বল।[২৮] হয়তো সেই থেকেই এসে গিয়েছে অপ্রতিরোধ্য ধর্মীয় অনুষঙ্গ, এবং রবীন্দ্রনাথের গায়ে ক্রমশ চড়েছে 'Hindu preacher'-এর অদৃশ্য গৈরিক। ১৯২১-এ যখন কবি ফ্রান্সে যান, 'লে'ক্লেয়ারে প্রেস এলিসন লিখলেন 'যীশুখৃস্টের মুখ সম্বলিত মানুষটি' যিনি—'যে দেশে তাঁর জন্ম সেই

BanglaBook.org

দেশের সমস্ত নিয়তিবাদ এবং রহস্যময়তার প্রতিমূর্তি।'[২৯]

'সানডে টাইমসে' সেই বছরেই 'পলাতকা'র অনুবাদ (*The Fugitive*) -এর সমালোচনায় শিরোনাম হলো 'একটি অতীন্দ্রিয় জগৎ'...'সর্বত্রই পঠক একটি অতীন্দ্রিয় লোকের সান্নিধ্যে আছেন, শাশ্বতকাল যার কেন্দ্রস্থলে, একটা ছায়াময় জগৎ, যার মোড়ে মোড়ে হঠাৎ বাস্তবতার উদ্ভাস মিলতে পারে, যার জন্য প্রাচ্যের দ্রষ্টারা চিরপিপাসিত...একেই বলে বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয়তার লক্ষণ।'[৩০]

'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে'ও সেই মিস্টিসিজম, অতীন্দ্রিয়তা। 'মরমীকবি' রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা যে খুব ভালোবেসেছিলেন তা অবশ্য নয়। তাঁর বক্তব্য ভালো লাগেনি, কিন্তু 'সঙ্গীতময় ধূপগন্ধে আমোদিত গদ্য ছন্দটিকে তাঁরা অন্তত 'গীতাঞ্জলি'র বেলায় শিল্প সুষমার চূড়ান্ত প্রমাণ' বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু 'পলাতকা'র বেলায়—'সে ধূপের গন্ধটি আমরা যত চিনে যাই, তত যেন কম ভালো লাগে। যেন কবিতার অন্তর-আত্মা এখানে রুদ্ধশ্বাস, ঘেমটা-ঢাকা' বলে মনে হয়, 'একটা থেকে আরেকটা থীম যেন আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় না।'[৩১]

প্রাচ্য রহস্যময়তার সঙ্গে ঋষিকবির ধ্যানমগ্নতা মিশে গেছে—এবং এই জগাখিচুড়ি আবেদনের ফলটা আর যাই হোক, শিল্পরসনির্ভর সাহিত্য সমঝদারি হয়নি। ইয়েটস ঐ সময়টাতে রহস্য নিয়ে মশগুল ছিলেন, তাঁর তখন মাদাম ব্লাভাট্স্কিকে নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনের পালা চলছে। প্রাচ্য মানেই 'আরো রহস্য, আরো কুয়াশা, আরো উত্তেজিত অনুসন্ধান'।[৩২] রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই একটা অস্থায়ী উৎসাহের জোয়ারের মুখে ভেসে এলেন—আবার ভাঁটার টানে কোন্ দূরে সরে মিলিয়ে গেলেন ইয়েটস-এর মনোজগৎ থেকে। সাময়িক উত্তেজনার খোরাক যোগানো আর শাশ্বত শিল্পের স্বাদ দেওয়ার মধ্যে তুলনা কোথায়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগ্য কাজ কি ছিল একগুচ্ছ শিকড়সন্ধানী উত্তরোল, অস্থির মানুষের হৃদয়বৃত্তিতে আধ্যাত্মিকতার মলম বোলানো? নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু দশচক্রে ভগবান যেমন ভূত হয়ে যান, তেমনি কয়েকটি কারণে রবীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে তেমনি হয়ে দাঁড়ালেন ভারতাত্মা তথা এশিয়ার আত্মা। বুদ্ধিজীবী জীবনবাদী, মননশীল, কৌতুকদীপ্ত, পরিহাসপ্রিয়, সমাজচেতনকবি বিশ্বটি ইংরিজিতে ঠিক স্বমূর্তিতে প্রতিভাত হলেন না, শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে উঠলেন না কোনোদিনই।

রটেনস্টাইন ১৯১৪তেই দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন এই নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী সমালোচকরা তাঁকে কেবলই 'মিস্টিক' কবি বলে থাকেন অথচ 'রটেনস্টাইন' তাঁর মধ্যে আরো অনেক কিছুই দেখতে পান।[৩৩] দুর্ভাগ্যবশত রটেনস্টাইনের মতো প্রেমিকদৃষ্টি সব পাঠকের ছিল না। এডওয়ার্ড টমসনও লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে এই নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, পাশ্চাত্ত্যের একজন মহিলা-সমালোচকের প্রসঙ্গে: 'আমি যাই লিখি না কেন তার মধ্যে তিনি জবরদস্তি মিস্টিসিজম খুঁজে পান!'[৩৪] কখনো তাঁর পরিচয় দেওয়া হলো: 'উনি গড়পড়তা স্বামীজীদের চেয়ে অনেক আলাদা'[৩৫] বলে, কখনও বা 'তিনি সেই হিন্দু কবি এবং ধর্মপ্রচারক যিনি সম্প্রতি নোবেল পুরস্কার পেলেন।'[৩৬] রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু স্বামীজী এবং ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে একাকার করে দেখবার এই হতভাগ্য ঝোঁক সাধারণভাবেই এতদূর বিভ্রান্তিকর হয়েছিলো যে, শ্রীনরেশ গুহ দেখিয়েছেন, 'ক্ষুধিত পাষাণ এবং অন্যান্য গল্প' সমালোচনা করতে গিয়েও 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র মতো অভিজাত পত্রিকায় লেখা হয়—'আশ্চর্য সুন্দর, বিচিত্র সব কাহিনীর সমাহার তাদের যোগসূত্রটি হল...কবির দার্শনিক অতীন্দ্রিয়বাদ'[৩৭], শুধু কি তাই? 'গোরা'র মতন উপন্যাসেরও কী দুরবস্থা হয়, তা কল্পনার অতীত। দ্য নিউ লীডার অম্লানবদনে 'গোরা'র সমালোচনা করতে গিয়ে লেখে: 'ভারতীয় আত্মার কল্পচিত্র...কোনোও ফ্লেমিশ ছবির কৃশ সন্তের মতো যেন বইটি প্রার্থনায় নতজানু...যদি টমাস এ কেম্পিস কোনও উপন্যাস রচনা করতেন, তা হয়তো এই রকমই কিছু হতো।'[৩৮] হায় রবীন্দ্রনাথ! অথচ যে লেনার্ড উল্‌ফ খোলাখুলি স্বীকার করেছেন যে 'মরমী' রবীন্দ্রনাথকে

BanglaBook.org

তাঁর বিশেষ পছন্দ হয় না, সেই ভদ্রলোকই কিন্তু 'গোরা'র মোদ্দা কথাটা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, উপন্যাসটি—'কলকাতা শহরে আজকের শিক্ষিত বাঙালিকে যে সব সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়', সেই নিয়ে লেখা।[৯]

গোড়ার দিকে, 'গীতাঞ্জলি' যখন গোটা ইয়োরোপকে রোমাঞ্চিত করে তুলছে তখন যদিও একাধিক সচেতন সমালোচক বারবার খেয়াল করে বলেছেন যে 'গীতাঞ্জলি'র একমুঠোই রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বস্ব নয়, তবু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সতর্কবাণীতে কোনও ফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ রূপ পশ্চিমী পাঠক গ্রহণ করেনি।

পাশ্চাত্ত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রতিক্রিয়ার ধারাটি দেখছি প্রধানত তিন রকমের দাঁড়াচ্ছে। সমালোচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, তিন ধরনের মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে ফিরে গেছেন পশ্চিমী পাঠককুল।

প্রথম ধারাটি, গতানুগতিক প্রতিক্রিয়া; অর্থাৎ প্রাচ্য প্রস্তাব প্রতি পশ্চিমের চিরকালীন আবেগহীনতা। অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অপরিচিতির রহস্য, এবং রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বগত মোহিনী মায়া মিশে গিয়ে, পাওয়া হচ্ছে অজানার জয়গান। এত বেশি অচেনা বলেই বুঝি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণও এত বেশি। পশ্চিমে এঁরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান দল। জর্মানীতে এঁরাই প্রায় একমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাউন্ট কাইজারলিং যখন রবীন্দ্রনাথের ইংরিজি বক্তৃতা জর্মন ভাষায় অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন তখন সমবেত জনতা তাঁকে বাধা দিয়েছিল 'বাধা দিও না, সব বুঝতে পারছি'[১০] এই বলে। তার কারণ মোটেই এই নয় যে শ্রোতারা সবাই ইংরিজি বুঝত। তার কারণ এক ইন্দ্রিয়াতীত ভাবুক মেজাজের অতীন্দ্রিয়িক সমজদারি। একটি ছোট মেয়ে তো স্পষ্টই বলেছিল 'রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষা বাংলা আমি ঢের ভালো বুঝতে পারছি, জর্মন অনুবাদের চেয়ে।'[১১] একথাটা কিন্তু জর্মন অনুবাদের নিম্নমানের প্রতি দুষ্ট লোকের কটাক্ষ নয়। এ হলো ঋষি-কবির তপঃ মায়া, শব্দবহুল ভাষার পার্থিব বেড়া ডিঙিয়ে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যাওয়া। এ বড় ভয়ানক জিনিস, বেনোজল। এ ভুল যখন ভাঙে, তখন ভিতরের সত্যটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় ধারাটি ছিল মননশীলতার—এঁরা ছিলেন বিভিন্নতর স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানী। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে তাঁর মানবতার সাধনা দেখেছিলেন—তাঁদের ঝোঁক ছিল অন্য দিকে। 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে' বা 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়', 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' ইত্যাদির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁরা বলতে চাইছিলেন উনি তথাকথিত প্রাচ্য প্রজ্ঞাবিদ্‌দের থেকে অনেক আলাদা, ইনি চিরচরিত 'বাসি-ভাবনা' টাটকা পাতায় বেড়ে দিচ্ছেন না। রবীন্দ্রনাথের শক্তির বৈচিত্র্য এঁদের নজরে এসেছিল। কিন্তু এঁরাই ছিলেন সংখ্যায় সবচেয়ে গৌণ মুষ্টেয় ধরা কয়েকজন সংবেদনশীল শিল্পবোদ্ধা।

তৃতীয় ধারাটির মতামত একপক্ষে এঁদেরই প্রকারভেদ—যদিও গোষ্ঠীস্বভাবে এঁরা একেবারে অন্যজাতের। এঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথ যে তথাকথিত প্রাচ্যপ্রজ্ঞানের চেয়ে আলাদা কথা বলবেন তাতে আশ্চর্যের কী আছে! তিনি তো প্রতীচ্যের কাছ থেকেই তাঁর প্রজ্ঞা ধার নিয়েছেন!

তারপর প্রতীচ্যকেই সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। (কবির নিজের ভাষায়—তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি ধন!) রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বকীয়তা নেই। তিনি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অবশ্যম্ভাবী ফসলমাত্র। পশ্চিমী সভ্যতার অবক্ষয়ের খবরদারি করতে পাশ্চাত্ত্যের অধ্যাত্মবাদ এবং মরমী সাধনাই যথেষ্ট সক্ষম, প্রাচ্য থেকে দেহাতি ওঝা আমদানি করে ঝাড়ফুঁকের প্রয়োজন নেই। বিশেষত, যে যা আওড়ায় তা যখন পাশ্চাত্ত্যেরই মন্তরতন্তর।

রবীন্দ্রখ্যাতির পরিণতি ঘটেছে ওই প্রথম দলের কল্যাণেই। অজানা প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে সিংহাসনে ঠেলে রেখে একটি অবাস্তব মূর্তিকে তাঁরা পূজার বেদীতে বসিয়েছিলেন, কৃত্রিম

BanglaBook.org

শ্রদ্ধার ধূপধুনো জ্বালিয়ে মিথ্যার ধোঁয়ায় তার সত্যরূপকে ঢেকে রেখেছিলেন। মোহাঞ্জন মুছে যেতেই ঢিল ছুঁড়ে কাদা ছিটিয়ে সেই মিথ্যা মূর্তিটিকে খণ্ডবিখণ্ড করাটা এখন তাঁদের কাজ হলো। ব্যক্তিপূজার স্বাভাবিক পরিণতি যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রকৃত রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই তাঁর পূজারীদের সামনে স্বমহিমায় প্রতিভাত হননি, কবিকে তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিশক্তিতে পরিপূর্ণভাবে কোনোকালেই দেখতে পাননি, বা দেখতে চাননি পশ্চিমের ভক্তরা। তাঁরা যা খুঁজছিলেন, সেইটেই জোর করে তুলে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পূর্বেই, প্রচণ্ড থমথমে আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব ঘটল পশ্চিমে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় যখন আত্মবিশ্বাসের পাত্র প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, সেই সংকট মুহূর্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই তাঁর পতন সম্পূর্ণ হয়েছে পাশ্চাত্ত্য মননে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের পশ্চিমের তীব্র মানসিক সংকট তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন, এবং ভ্রান্তভাবে সরলভাবে সেই আত্মিক সংকট মোচনের চেষ্টায় পশ্চিমের মানসিক উন্নতি বিধানের, তার আধ্যাত্মিক শান্তিবিধানের প্রয়াস পেয়েছিলেন। সেই সাধু উদ্দেশ্যে, বিভ্রান্ত সমালোচকদের উত্তেজিত বাগ্‌বিস্তারে পথভ্রষ্ট হয়ে, কবি অনুবাদের জন্য বেছে নিতে লাগলেন একই ধরনের লেখা—যাতে আছে প্রাচ্যের বাণী, আছে আত্মানুসন্ধান, বস্তুবাদী জড়বাদী, মৃত্যুবাদী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আত্মিক মুক্তির, অমরত্বের ইঙ্গিত যেখানে নিহিত। ফলে আধ্যাত্মিক একদেশদর্শিতায় দুষ্ট হয়ে তাঁর অধিকাংশ ইংরিজি রচনাই আজকের শিল্পবিচারে ব্যর্থ। যখন 'চিত্রাঙ্গদা' অনূদিত হয়, অনূদিত হয় 'গোরা', বা 'ঘরে-বাইরে'—তখনও পশ্চিমের পক্ষপাতী পাঠকচিত্ত তাতে দেখতে পায় আপন মনের অশানুরূপ অতীন্দ্রিয় ছায়া।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ব্যক্তিপূজাকে, এই প্রাচ্যপ্রজ্ঞার ধ্বজাধারী হওয়ার কাজটাকে কেমনভাবে নিয়েছিলেন? পশ্চিমের দ্বারে দ্বারে যে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার পসরা সাজাতেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায়, লোকোত্তর সেই রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় ক্রমে ঢাকা পড়ে গেলেন সেই বাঙালি কবি, যিনি একদা 'গীতাঞ্জলী'র পশ্চিমী সাফল্যে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর পশ্চিমী পাঠকদের মনের মধ্যেও কবি রবীন্দ্রনাথের মুখের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বক্তা রবীন্দ্রনাথের মুখ। এই দুই ভাবমূর্তিকে এক করে দেখার ফলে শিল্পী রবীন্দ্রনাথই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এই বক্তা সত্তাটিকে পশ্চিমে তাঁর কবি সত্তাকে যে রাহুগ্রাসে ঢেকে ফেলেছিল, সে সর্বনাশ কি তিনি টের পাননি? টের পেয়ে থাকলে কবি কি বিচলিত হয়েছিলেন?

তাঁর চিঠিপত্র থেকে এই অনুমান হয় যে 'মিস্টিক' এই সংজ্ঞা নিয়ে যদিও তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছেন, (যেমন রটেনস্টাইনকে লেখা চিঠিতে) তবু, ধর্মসংস্থাপনার্থে পশ্চিমের দরজায় প্রাচ্যের বাণী পৌঁছে দেবার কাজটি তাঁর পছন্দই ছিল। কবির অবচেতনে হয়তো কাজ করছিল দরিদ্র, পরাধীন জাতির সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্নটি, প্রাচ্যের পুনরভ্যুত্থানের এই এক স্বর্ণ সুযোগ। ১৯২১-এ তিনি এ্যাণ্ড্রুজকে লিখলেন: "আমি জানি, আমার ডাক এসেছে, পূর্ব পশ্চিমের প্রকৃত মিলন ঘটিয়ে দেবার পুণ্য আহ্বান। আমার অজানিতেই আমি এই পুণ্য কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেম। 'সাধনা' বক্তৃতামালা রচনার সময়ে আমি বুঝতে পারিনি যে আমার আরব্ধ নিয়তিই আমি পূরণ করছি। ইয়োরোপ ভ্রমণের সময়ে সকলে আমাকে বলেছেন, 'সাধনা' সত্যিই আমার পশ্চিমী পাঠকদের মনের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। এবারে আমার নিয়তি নির্ধারিত পথেই আমি চলব। আমি জানি এই আহ্বানে নিজের মতো করে সাড়া দেওয়াই আসল কথা—তার ফলাফল যাই হোক না কেন।"[৪৯]

এখানেই ঘটে গেল সর্বনাশা ভুল। কবি কখন যেন অন্যমনেই আপন স্বধর্ম ত্যাগ করে তুলে নিলেন ধর্মপ্রচারকের গৈরিক আলখাল্লা। তিনিও নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন প্রতীচ্যের ঔপনিবেশিক মনোভঙ্গির কালো চশমার ভিতর দিয়ে। হায় দরিদ্র দেশের হীনম্মন্যতা! সেটাকে জয় করবার জন্য আমরা বুঁজে বেড়াই বিপরীত পরিস্থিতির সুযোগ—উচ্চম্মন্যতার অধিকার।

এই হলো বিভ্রান্তির গোড়া।

পশ্চিমের আধ্যাত্মিক স্বস্ত্যয়ন করা নিশ্চয়ই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনের আরব্ধ কর্ম ছিল না। বিদেশীর চাটুবাক্যে, তাদের দায়িত্বহীন প্রচারে—যাকে অপপ্রচারই বলব—বিভ্রান্ত হয়ে শিল্পী তাঁর স্বকীয় ধ্বজদণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অথচ মরমিয়া কবির অভাব তো পশ্চিমেও ছিল না। চিরকালই মরমিয়া কাব্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একটি গৌণ অংশ অধিকার করে, ধর্মীয় সাহিত্যের প্রত্যঙ্গ হয়েই রয়েছে। এদিক থেকে পাশ্চাত্ত্য মরমী কবিরা নেহাত একঘরে, কালবন্দী। যদিও তাঁদের কারবার চিরন্তনতা নিয়েই, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, চিরন্তন সাহিত্যের আসনে তাঁরা চট করে বসতে পান না। সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে না তাঁদের রস সাধনা।

ভারতীয় মরমী কবিদের সঙ্গে এখানে তাঁদের এক মস্ত তফাত। আমাদের ভক্তিসাহিত্য, আউল-বাউলের গান প্রধানত সর্বসাধারণেরই সম্পত্তি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই ঐতিহ্যটিই তাঁকে সাধারণের কাছাকাছি ধরে রেখেছে। কিন্তু পশ্চিমের ঐতিহ্য আলাদা। রবীন্দ্রনাথ না বুঝে গিয়ে পড়লেন অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মীয় সাহিত্যের কূপমাণ্ডুক্যের মধ্যে যাতে তাঁর পক্ষে শিল্প-সাহিত্যের খোলা হাটে জনপ্রিয়তা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া, দার্শনিক বক্তৃতার নিজের জন্য তো বটেই, তাছাড়া কবীর অনুবাদ করার ফলেও তাঁর অনুষঙ্গটি হয়ে পড়লো মরমিয়া, অবস্থার বিপাকে এইভাবে তিনি জীবন্ত সাহিত্য ধারার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, গোড়াতেই একটি সংকীর্ণ ধারায় গিয়ে মিশেছিলেন।

ইয়োরোপ প্রাচ্যের কাছে চিরদিন যা চেয়ে আসছে, কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই গতানুগতিক ভাবমূর্তিই দেখতে চাইল। রবীন্দ্রনাথের বিপুল বর্ণাঢ্য প্রতিভা একপাশে পড়ে রইল অস্পৃষ্ট, অদেখা—পরিবর্তে কাঁচারঙে এঁকে নেওয়া হলো গায়ের উপত্যকা থেকে আগত এক ফকিরের টাইপ চিত্র, তার কাজ হলো মুমূর্ষু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শুকনো ঠোঁটে প্রাচ্য প্রজ্ঞার সঞ্জীবনী সুধা ফোঁটায় ফোঁটায় ঢালা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এটা মেনে নিলেন, অথবা এর যথার্থ চরিত্র অনুধাবন করতে পারলেন না। ইয়োরোপের দুঃখে তিনি তখন কাতর।

'সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষ আজ দুঃখী। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। আমার ইচ্ছে করে গান দিয়ে এই বেদনাকে বিদ্ধ করি, আর বিশ্বহৃদয়ের গভীর থেকে চির আনন্দের বার্তা বয়ে এনে দিই।'[৪৪]

এইভাবে পশ্চিমী সভ্যতাকে অমৃত সিঞ্চনে পুনর্জীবিত করে তোলার দায় কবি নিজেই নিজের ওপরে নিয়ে নিয়েছিলেন। সন্দেহ হতেই পারে, 'কালান্তরে'র আগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রকৃত রূপ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন নির্মম চেহারা তিনি ঠিকমতো ধরতেই পারেননি। সভ্যতার যে সংকট পশ্চিমে সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্য তাঁর সহানুভূতি দেখে অন্তত তাই মনে হয়। এশুজকে কবি লিখলেন—'ইয়োরোপ যেন আজ একটি শিশুর মতো, যে খেলতে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। এখন সে ভিড় ছেড়ে সরে এসে মায়ের আঁচল খুঁজছে। প্রাচ্যই কি জগতে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের জননী নয়? আপন শোণিত থেকে সেই ঐতিহ্যতে সে কি প্রাণসঞ্চার করেনি?

'আমরা ভারতীয়রা যদি বুঝতে না পারি যে ইয়োরোপ আজ আশ্রয়ের আশায় আমাদের দ্বারে প্রার্থী হয়ে এসেছে, সেটা খুবই দুঃখের হবে; যদি মানবতার এই সংকটমুহূর্তে তাকে সেবা করবার এই মহান সম্মানের সুযোগ আমরা না নিতে পারি।'[৪৫] গ্রহীতার ভোলটি পালটে, এবার যদি নেওয়া যায় দাতার ভূমিকা—সেই 'মহান সম্মানের সুযোগ' নেবার লোভ কি অসংগত? কোন্ প্রজ্ঞা না চায় তার রাজার কাছে পুজো পেতে?

কেবল এই সব চিঠিপত্র থেকেই নয়, তিনি যে ধরনের রচনাগুলি অনুবাদের জন্য বেছে নিতেন তার সঙ্গে তাঁর মাতৃভাষায় রচিত লেখাগুলোর চরিত্রগত পার্থক্য খেয়াল করলেই বোঝা যাবে তাঁর ঝোঁকটা ছিল কোন্‌দিকে। গল্প কবিতা ইত্যাদি বাদ দিয়ে জনতার কাছে বক্তৃতার বিষয়বস্তুগুলি বিচার করলেই দেখতে পাই, পশ্চিমের সামনে তিনি মাত্র দু'একটি বিষয়ই তুলে ধরেছেন। বস্তুজগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মজগতের উন্নয়ন এবং মানবজীবনের অন্তর

BanglaBook.org

বাহিরের সামঞ্জস্য বিধানই যার প্রধান লক্ষ্য। অথচ মাতৃভাষায় তাঁর বক্তৃতার বিষয়-বৈচিত্র্যের কী বিপুল বিস্তার! এ থেকেই বিদেশী পাঠকের চোখে কবির ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, আংশিক চেহারাটির জন্মসূত্র স্পষ্ট হয়ে যায়

অতএব দেখা যাচ্ছে যে তাঁর 'প্রবাসী জন্মান্তরে' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনর্জাত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন সত্তায়। তা কেবলমাত্র স্বতন্ত্র সাহিত্য সত্তাই ছিল না, আরো নানা ভাবেই সেই মূর্তিটি ক্ষীণ, অসম্পূর্ণ। আমাদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওদের টেগোরের কোথাও কোথাও মিল আছে, এই পর্যন্ত। দুজনেই শিল্প ব্যক্তিত্বে অভিন্ন আত্মা তো নননই, বরং বেশ প্রভেদ রয়েছে।

একজনের সাহিত্যচিন্তায় ঈশ্বরচিন্তার পাশাপাশিই রয়েছে সমাজচিন্তা—শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান, রাজনীতি, কুটিরশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা—সবই তাঁর লেখায় জরুরী স্থান পেয়েছে। আজকের বাঙালির মুখে আনন্দ বেদনার ভাষা যুগিয়ে দিয়েছেন যিনি, বাংলা সাহিত্যকে যিনি উপহার দিয়েছেন তার আধুনিক যুগ, গদ্যে, পদ্যে, গানে, নাটকে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে সেই অনন্য রবীন্দ্রনাথের অবদান একটি ব্যক্তিমানুষের একজীবনের কীর্তির অনুপাতে প্রায় অবিশ্বাস্য। তাঁর মতো করে ঈশ্বরকে, প্রকৃতিকে, এবং ভালোবাসাকে ভালোবাসতে তিনি শিখিয়ে গেছেন আজকের বাঙালিকে—গানের মাধ্যমে তিনি হয়ে রয়েছেন আমাদের শোকের সান্ত্বনা, প্রেমের সঙ্গী। তিনি গড়ে দিয়েছেন আমাদের শিল্পরুচি জীবনরুচি, এমন কি হস্তলিপিতেও আমরা যাঁকে নকল করি, তাঁর সঙ্গে তুলনা করবো কোন্ দ্বিতীয়ের?

বিশ্বসাহিত্য চুঁড়ে ফেললে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাসনে বসানোর যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও দ্বিতীয় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখে পড়ে না, যিনি একাই একশো হয়ে আপন স্বদেশকে এতগুলি বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করেছেন। হয়ত গ্যয়টে কিছুটা তুলনীয়, কিন্তু সেই তুলনাও বেশি দূর টানা যায় না। একই ধনি থেকে এত ধরনের ঐশ্বর্য এ বড়ই অতুল সৌভাগ্য। সেই তুলনায় পশ্চিমের সভ্যতার কাছে 'টেগোর' নামক হুজুগটির অবদান কী? কতটুকু? ইংরিজি সাহিত্যে তিনি তেমন কিছু স্থায়ী, জরুরী শৈল্পিক প্রভাব ফেলতে পারেননি। শুনতে পাই দক্ষিণ আমেরিকার ইস্পানী ও পর্তুগীজ ভাষার তরুণ কবিদের ওপরে তাঁর কিছু কিছু মূল্যবান প্রভাব পড়েছিল যেমন হুয়ান রামোন হিমেনেথ বা অক্টাভিও পাথ্ এঁদের প্রথম যুগের নেরুদায়। 'গীতাঞ্জলি' একটা সময়ে কিছু ব্যক্তির জীবনে অবশ্যই প্রভাব ফেলেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিক-কবির পকেটে হয়তো 'গীতাঞ্জলি' পাওয়া গিয়েছিল, একজন চীনা বুদ্ধিজীবী হয়তো 'গীতাঞ্জলি' পড়ে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন, তবু, সাহিত্যের ইতিহাসে এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনী মাত্রই হয়ে থাকবে।

সত্যিই তো তিনি কোনও যীশু কি মহম্মদ ছিলেন না, ধর্মসংস্থাপনার্থে তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি ঔপনিবেশিক পশ্চিমে। তাঁর উদ্বেল জর্মনী ভ্রমণের মধ্যেই দিব্যি গড়ে উঠেছে হিটলারের জর্মনী। তিনি ইতালীতে গিয়েও বুঝতে পারেননি মুসোলিনির ইতালীর প্রকৃত রূপটি কী। এমন-কি তাঁরই অতিপ্রিয় ভক্তমহী 'বিক্তয়া' (ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো) যোগ দিয়েছেন ইস্পানী ফাশিস্ত দলের কর্মকাণ্ডে। স্বাভাবিক ভাবেই, পাশ্চাত্যের আদর্শ মানবধর্মের শুভ্রপ্রত্যয় সক্ষম হননি ভারতবর্ষের কবি। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' 'সাধনা' বক্তৃতাকে যেন উপহাস করেই শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—পশ্চিম বিষয়ে সমস্ত স্বপ্ন ভঙ্গ করে তাঁরই ধমনী নিংড়ে শেষ পর্যন্ত বের করে নিয়েছে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ।

অনিবার্য ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির শিকার হবার ফলে কবি রবীন্দ্রনাথের কপালে জুটে যায় পাত্রীর ভূমিকা। সেখানে তিনি সার্থক না হলে অবাক হবার কী আছে

পরিশিষ্ট :

পশ্চিমে তাঁর অসার্থকতার কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেখি আত্মপ্রকাশের অক্ষমতা। তাঁর সবের ঘোড়া ইংরিজি তাঁকে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। সেই দুর্জয় আত্মবিশ্বাস, যা দিয়ে তিনি

BanglaBook.org

বশ করেছিলেন আধা-তৈরী বাংলাভাষার তেজী ঘোড়াটিকে, ইংরিজির বেলায় তাঁর তা ছিল না। অনুবাদগুলি অযথার্থ, কাঁচা, এবং দুর্বল হওয়ায় গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় কারণ—তাঁর বক্তব্যের একদেশদর্শিতা, বিষয়বৈচিত্র্যের অভাব। তাঁর নিক্ষিপ্ত তীরে সেই তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ফলা পরানো ছিল না যাতে বিদ্ধ হতে পারত ইয়োরোপের স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ। মরমিয়াবাদের কুয়োয় পড়ে প্রথম থেকেই তিনি একঘরে, জীবন্ত সাহিত্যের মূলধারা থেকে বিযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্পের যথার্থ মূল্যায়ন না করে পশ্চিম বেশি মাতামাতি করেছিল ব্যক্তি-মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। সেইখানেই রোপিত হয়েছিল আঘাতের বীজ।

জগতে যে কেউই যখন ব্যক্তিপূজার শিকার হয়ে পড়েন, তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক সামঞ্জস্যবোধটি হারিয়ে যায়, ইতিহাসের বিচারও হয়ে পড়ে পক্ষপাতদুষ্ট। যেমন সহসা উত্থান তেমনি সহসা পতন, নিয়তির এ প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছক। তদুপরি উত্থানের মূলে যদি থাকে কোনো পক্ষের ভুল, তবে ভিত্ নড়ে যাবেই। রীতিমত ঘটবে সেই বিভ্রান্তিঘটিত একই সমস্যা।

পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের বেলাতে এতগুলি দুর্ভাগ্যের ত্রাহস্পর্শ ঘটেছিল। তাঁর 'প্রবাসী নবকলেবর' যে স্বল্পায়ু হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! বরং দুঃখিত হবার আছে অনেক কিছু। মাত্র দুটি একটি ঝাপছাড়া ব্যক্তি-মানুষ ছাড়া সারা পশ্চিম প্রকৃত রবীন্দ্রনাথের নাগাল পায়নি, তাঁর শক্তির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ই হয়নি পশ্চিমের। যাকে গ্রহণই করা হয়নি তাকে বর্জনও করার প্রশ্ন ওঠে না। পশ্চিমের সমালোচকরা শেষ বেলায় যে কবিকে নস্যাৎ করে ফেললেন, সেই টেগোর প্রকৃত রবীন্দ্রনাথের কুশপুতুল মাত্র। যেমন, যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা পুজোর বেদীতে বসিয়েছিলেন, সেটিও ছিল তাঁর নেহাত অবাস্তব একটি ছায়ামূর্তি।

রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্যপর্বের দুর্ঘটনার জন্য কিন্তু এই তিনটি কারণই মূল কারণের অনুপুঙ্খ মাত্র, নেহাতই আনুষঙ্গিক, এবং গৌণ। এই দুর্ভাগ্যের প্রকৃত শিকড় রয়েছে ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতার মধ্যে। যা ঘটেছে তার বদলে অন্য কিছু যা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না, কেননা এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বও ইতিহাসের আওতার বাইরে গড়ে উঠতে পারেন না। তিনিও বিশ্বইতিহাসেরই সৃষ্টি, তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত ঘটনা। বিদেশে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল তার মূলে ছিল ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি—যা কবি এবং তাঁর সমালোচক, উভয়পক্ষেরই প্রকৃত মোকাবিলার ক্ষতিসাধন করেছে।

প্রথমত, পশ্চিমের পাঠকদের মনে জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক উপনিবেশিত দেশগুলির সম্পর্কে একটা ভিত্তি গাঁথা হয়েই ছিল অশ্রদ্ধার—যা ভাঙা বড় সহজ ছিল না। দ্বিতীয়ত, সেই ভিত্তির ওপরে গড়ে উঠেছিল কাব্যের তুকতাক আধ্যাত্মিক সাধনা আর অতীন্দ্রিয় রহস্যের জড়িবুটির দোকান। এই দুই কায়েমী, চালু প্রভাবের বাইরে যেতে সক্ষম হননি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও, পারেননি পশ্চিমের কাছে ভারতবর্ষের কোনও নতুন ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে। পশ্চিমের ঔপনিবেশিক কারিগরদের হাতে পূর্বপ্রস্তুত মঞ্চেই তিনি তাঁর স্বকীয় খেলাটুকু সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁর ভারতীয় সুহৃদ্বর্গের সামগ্রিক মূল্যবোধ, তাঁদের তৎকালীন জীবনবেদ, ওই পশ্চিমের তৈরি করে দেওয়া শিক্ষাসূত্রেই নির্মাণ করা হয়েছে। সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষার সারে-জলে, সেই মাটিতেই তাঁদের বেড়ে ওঠা। তাঁদের উপায় ছিল না আত্মিক মুক্তির, বিমুক্ত চিন্তার। এখানেই অমোঘ ট্র্যাজিক প্যারাডক্স, যে কাঠামোর বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযান, সেই কাঠামোরই অঙ্গ তাঁরা প্রত্যেকে। সত্যিই তো তাঁরা ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতিরই অমৃতফল! ইতিহাসের শৃঙ্খলমুক্ত জীব কোনো সামাজিক মানুষই হতে পারেন না, তাই রবীন্দ্রনাথও ঔপনিবেশিক মনোভঙ্গির শিকার ছিলেন বললে অন্যায় হয় না। তাঁর চরিত্রেও স্বভাবতই কাজ করেছিল নানা বিচিত্র জটিল মানসিকতার উল্টোপাল্টা চোরা স্রোতের টান, তাঁর ভিতরেও ছিল নানা দ্বন্দ্ব, নানান

BanglaBook.org

টানাটানি। কেবলমাত্র স্বদেশের পুজো পেয়ে টলস্টয় বা গ্যয়টের তৃপ্তি হলেও আমাদের বন্দীজাতের মন তৃষিত হয়ে থাকে পশ্চিমের স্বীকৃতি পাবার আশায়। অর্জন করতে চায় অবহেলার পরিবর্তে শ্রদ্ধা, অবজ্ঞার পরিবর্তে সম্মান। উপনিবেশিতের হীনম্মন্যতা থেকে উদ্ধার পাবার একটি সুন্দর উপায় নিশ্চয় সেই বিষম অন্তর্দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত ইয়োরোপের যন্ত্রণাতাড়িত আত্মাকে শান্তিজল দানের 'মহান সম্মান'টি চিনে নেওয়া। সন্দেহ নেই যে এভাবে অঙ্ক কষে 'পুণ্য কর্ম'টি বেছে নেননি রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু আমাদের অবচেতনের অতলে তো কতরকমের গূঢ়ৈষণা আপনা হতেই কাজ করে যায়। পরাধীন জাতির লুপ্তমান পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন যদি বন্দী মানুষগুলির হৃদয়ে এধরনের জটিল জাল বিছিয়ে দেয়, তাতে বিস্ময়ের যেমন কিছু থাকে না, তেমনি কারণ থাকে না লজ্জা, ক্ষোভ বা ক্রোধেরও। যুগের হাওয়া এই ঘটনাকে সাহায্য করেছিল—রাজনৈতিক সংকটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ইয়োরোপ তখন বাইরে থেকে খুঁজছে আত্মিক-নৈতিক পুনরভ্যুত্থানের শক্তি। 'গীতাঞ্জলি'র সমালোচনা করতে গিয়ে ব্রেখ্‌টও লিখেছিলেন ১৯১৪-এর ৯ অক্টোবর তারিখে : 'এক অদ্ভুত বৈপরীত্য! আমাদের এই সময়ের গর্জমান কর্কশ রণদামামাসৃষ্ট সংজ্ঞা ঐকতানের মধ্য থেকে প্রাচ্যের এই সুমধুর সুরলহরী উদ্ভূত। প্রেম ও আনন্দের এই গান ও উল্লাস বর্তমানে আমাদের কাছে অলীক, অবাস্তব; প্রেমবেদনার এই অভিযোগ ও দীর্ঘশ্বাস আমাদের অভিভূত করার পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ ও একান্ত ব্যক্তিগত বলে মনে হয়।

'অর, এটাই বেশ আশ্চর্যের, প্রায় যেন এক অঘটন, —এই সুরগুলিতে শেষ পর্যন্ত আমরা আনন্দোদ্বেল ও বেদনাতুর হতে বাধ্য হই, ভুলতে বাধ্য হই এই জরুরী সময়কালকে, ভুলে যাই আমাদের সংঘর্ষ ও দুঃখভোগ, কবির হাত ধরে উত্তীর্ণ হই এক সূর্যালোকিত শান্তিময় দেশে। এই সময়েও যে তিনি আমাদের মুগ্ধ করতে পারেন, এটাই ভারতীয় কবি-দার্শনিকের চূড়ান্ত উৎকর্ষের প্রমাণ।

'যে কালহীন চিরন্তন মানস তার স্বদেশের সুচারু সংস্কৃতির মধ্যে সংবৃত্ত, তার নিদর্শন স্বরূপ এই কবিতাগুলি, আজকের দিনেও কিছু সময়ের জন্য আমাদের সমুন্নত আনন্দের স্বাদ দেয় '[৬] এইতার ভূমিকা বদল করে দাতার ভূমিকা নিতে না চায় কোন দরিদ্র দেশ?

আমাদের হয় তো অনুমান করা ভুল হবে না যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পাশ্চাত্যভূমিতে পূর্ণাঙ্গ সফলতা পাওয়া অসম্ভব ছিল। সেখানকার পরিস্থিতিতেই ছিল প্রকৃত সত্য গ্রহণের অক্ষমতা, ছিল এক বিশেষ ধরনের বুভুক্ষা। যে কোনও প্রাচ্য প্রতিভাকেই তারা তাদের সেই বিশেষ চাওয়ার মাপে মাপে তৈরি করে কেটেছেঁটে নিত। রাজা রামমোহন রায় যেমন—বুদ্ধিজীবী হিসেবে পশ্চিমে উপস্থিত হয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত পরিণত হলেন ধর্মপ্রচারকে, ইউনিটারিয়ানদের স্বার্থরক্ষায় ব্যবহৃত হলেন, পতনশীল রাজনীতির পুনরুদ্ধারের যন্ত্রে। তাঁর উপায় ছিল না ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার, বাতাসের মুখ ঘুরিয়ে দেবার।[৭] তেমনি রবীন্দ্রনাথও হয়েছিলেন কতগুলি আন্তর ও বাহ্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অনিবার্য শিকার।

তবে আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'শোষণবাদ' 'কর্ষণজীবী আর আকর্ষণজীবী' ইত্যাদি শব্দ সৃষ্টি করেছেন, ('রক্তকরবী', ১৯২৪) তিনি আপন জীবনধারার দ্বন্দ্বময় চেহারাটি দেখতে পাননি কেন? কেন তাঁর চৈতন্যকে যথার্থভাবে নাড়িয়ে দেয়নি তাঁর উত্থানের ধরন? এই অচেতনতা এই অন্ধতাও কি উপনিবেশবাদেরই প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া নয়? দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি যাঁর তুলনাহীন, আপনার ক্ষেত্রে তাঁর এই দৃষ্টিহীনতা কিন্তু অবাক করে দেয়।

তবু, সব ব্যাখ্যার শেষেই শেষের কথাটি বলা বাকী থেকে যায়—ব্যাখ্যার বিষয়টি যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সকল বিশ্লেষণের শেষেই মনে হয় কোথাও একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয় ফাঁক থেকে যাচ্ছে বহু, গোষ্পদে গগনের মাপ নিচ্ছি বৈ তো নয়।

BanglaBook.org

পাদটীকা

১ Ezra Pound: 'Rabindranath Tagore', *Fortnightly Review*, XCII (Jan-June, 1913), p. 573.

২ Edward C. Dimock: "Rabindranath Tagore: 'The Greatest Baul of Bengal'," *Journal of Asiatic Studies*, XIX, No I. (Nov. 1950), p. 34.

৩ Pound: *Fortnightly Review* (Also reprinted in Tagore Birthday Number, *Visva Bharati Quarterly*, 1941, P. 297).

৪ E. M. Forster: *Abinger Harvest* (London, 1936). p. 320.

৫ উইলিয়াম রটেনস্টানইকে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, রটেনস্টাইন কর্তৃক উল্লিখিত, তাঁরই বইতে: *Since Fifty* (London, N.D.), p. III.

৬ তদেব, p. 112.

৭ *Fortnightly Review*, p. 572.

৮ তদেব

৯ তদেব

১০ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৩

১১ ১৯এ এপ্রিল, ১৯১৩

১২ ৭ই নভেম্বর, ১৯১২

১৩ ২৪এ জানুয়ারি, ১৯১৪

১৪ ২৩এ জানুয়ারি, ১৯১৫

১৫ *The Nation & Atheneum*, Feb. 9, 1924.

১৬ *The Letters of Ezra pound, 1907-1941*, ed. D. D. Paige, (N Y 1950), pp. 44-45.

১৭ তদেব, p. 55.

১৮ (ক) *Since Fifty*, p. III রটেনস্টাইনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি দেখুন, সহায়তার জন্য ইয়েটসকে ধন্যবাদ দিয়ে। প্রসঙ্গত, ১৯১৫তে কবি যখন জয়েস যখন তাঁর লেখায় কিছু অদলবদল করে উন্নতিসাধন করতে চান (২০ আগস্ট রটেনস্টাইনকে এ বিষয়ে তাঁর চিঠি দেখুন, Mary Lago *Imperfect Encounter*, 1972, pp. 211-213) তখন রবীন্দ্রনাথ তা পছন্দ করেননি। কেননা তখন তিনি ইংরিজিতে আত্মনির্ভরতা বোধ করছেন।

(খ) Pound: *Letters*, p. 55—হ্যারিয়েট মনরোকে পাউণ্ড লিখছেন, 'ঈশ্বর জানেন, আমি সেধে রবিঠাকুরের লেখা সংশোধন করিনি, তিনিই আমাকে বলেছিলেন করতে।' এও প্রথম দিকের কথা।

১৯ *Since Fifty*, p. III.

২০ তদেব

২১ Pound: *Letters*, p. 55.

২২ তদেব

২৩ Joseph Hone : *W. B. Yeats, 1865-1939*, p. 459-এ উদ্ধৃত।

২৪ Yeats : Introduction to *Gitanjali* (London, 1924), p. XIII.

২৫ F. Roger-Cornaz 'Le Tolstoi Hindou Voyage en Europe', *L'Eclair*, June 20, 1921.

২৬ Romain Rolland : 'Introduction,' to Tagore, *Quatre Voix*, tr. Madelcine Rolland (Paris, 1924), p. 23.

২৭ *Le Gaulois*, July 3, 1922.

২৮ *Visva-Bharati Quarterly*, Tagore Number, 1914, pp. 299-300.

BanglaBook.org

২৯ June 20, 1921.

৩০ December 4, 1921.

৩১ November 15, 1921.

৩২ Naresh Guha 'Rabindranath in the West', *Jadavpur Journal of Comparative Literature*, I, 1961; 'Yeats in India', *JJCL*, IV, 1964.

৩৩ *Imperfect Encounter*, ed. by Mary Lago, 1972, p. 168.

৩৪ Edward Thompson *Rabindranath Tagore*, London, 1926, p. 46.

৩৫ E. Herbert Lewis *Chicago Literary Club*, Jan 15, 1917, শ্রীনরেশ গুহের (*JJCL*, I, p. 68) প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

৩৬ Frank Crane *New York Globe*, Dec. 18, 1913 উপরোক্ত প্রবন্ধে উক্ত পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৩৭ তদেব

৩৮ February 15, 1924.

৩৯ *The Nation & Atheneum*, Feb' 9, 1924

৪০ লেখক অজ্ঞাত, 'Sanctified days with Rabindranath Tagore, Darmstadt, June 10-14, 1921' *Rabindranath Tagore in Germany*, ed. D. Rothermund, (Delhi 1961) pp. 17-21.

৪১ Paul Natorp: 'Hours with Rabindranath Tagore', *ibid* p. 30.

৪২ *The Atheneum*, Jan. 23, 1915, p. 67 *The Atheneum*, May 8, 1915, pp. 420 f; *The Westminster Gazette*, December 7, 1912; Edward Shanks: in *The Queen*, May 21, p. 568; *The Church Times*, June 15, 1937 *The Birmingham Post*, Dec. 6, 1913—এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার পুষ্পিত ধুসুম বলে প্রচার করতেন।

৪৩ *Letters to a Friend*, pp. 180-182.

৪৪ তদেব, p. 161.

৪৫ তদেব, p. 169, Cf. S. Radhakrishnan *The Philosophy of Rabindranath Tagore*, London, 1918, Ch. V. pp. 254ff.

৪৬ চিত্তরঞ্জন ঘোষ: 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রেমঁ', আনন্দবাজার পত্রিকার ২৫ বৈশাখ ১৩৭৮ এই বিষয়ে A. Aronson এর *Rabindranath Through Western Eyes* (Allahabad, 1943) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ

এই প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৬১/৬২, যদিও এটি দু'ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬-তে। তারপরে এই বিষয়ে অনেক বই বেরিয়েছে। যেমন, Stephen Hay *Asian Ideas of East and West*: Tagore and his Critics in Japan, China and India. (Cambridge, 1970) Mary Lago, *Imperfect Encounter*, (Cambridge, Mass 1972), Sujit Mukherjee, *A Passage to America*, 1964. এছাড়া শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্রের ধারাবাহিক প্রবন্ধমালা 'দেশ' পত্রিকায়।

৪৭ Mary Carpenter *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*. Introduction, ed. by Swapan Majumdar (Calcutta 1976) pp. vi-vii.

১৯৬৬তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত লেখিকার দুটি প্রবন্ধ (*Journal of Asian Studies*, Vol. XXV No. 2, Chicago, February 1966, এবং (*Mahfil: Tagore Number*, Vol III. No. 1, Chicago, 1966) অবলম্বনে।

BanglaBook.org

বিবাগী ফুলের গন্ধ

'আমার বন্দনা না-পাওয়ারে'

১

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সংখ্যায় এবং গুরুত্বে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে প্রধান হয়ে আছেন কবি-সমালোচকেরাই। রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র ঐতিহ্য বজায় রেখে কবি শঙ্খ ঘোষ কবিতা ও সমালোচনা এই দুটি ধারা দিয়েই বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যবান করে তুলেছেন। যদিও মন্দ লোকে বলে যে বাংলায় নাকি সমালোচনা সাহিত্য নেই, তবু, আমরা যদি অজিতকুমার চক্রবর্তী দিয়ে আরম্ভ করে আবু সয়ীদ আইয়ুব পর্যন্ত নজর রেখাই, সাহিত্য সমালোচনার একটি শাণিত, যদিও ক্ষীণ, স্পষ্ট রেখা দেখতে পাবো, যার মেরুদণ্ড রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ নির্ভর। 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' এই ক্ষুদ্র মণিভাণ্ডারে এক নতুন সংযোজন।

দুর্ভাগ্যবশত, রবীন্দ্রনাথ এখন সমালোচনার ভোজসভায় ইতরজনের মিষ্টান্ন হয়ে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে নিয়ে আমরা যেমন খুশি ছড়াই ছিটোই, হুয়া করি। উত্তরাধিকারসূত্রে যেন তাঁর প্রতি অত্যাচার করার জন্মগত দাবি নিয়ে এসেছি আমরা। কখনো করছি তাঁর মনঃসমীক্ষন, কখনো বা গোয়েন্দাগিরি। আর বেশির ভাগই ভক্ত প্রাণের প্রেমের প্রবল টানাহেঁচড়ায় তাঁকে নামিয়ে আনি আপন আপন জ্ঞানবুদ্ধির ধুলোতে। পরিস্থিতি যখন এমন, শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রভক্তদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন তাঁর এই মনোজ্ঞ, হৃদয়ানুরঞ্জিত, শ্রমশোভন রবীন্দ্রকৃত্যের জন্য।

প্রথমেই আমাদের নজর কাড়ে গ্রন্থটির আয়তন। একশো আশি পৃষ্ঠার বই—তার মধ্যে আশি পৃষ্ঠা মাত্র ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর লেখা 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকের অনুবাদ বাকি একশোর, কুড়ি পৃষ্ঠা 'ভূমিকা', কুড়ি পৃষ্ঠা 'অনুষঙ্গ' শঙ্খ ঘোষের রচনা। এবং নির্ভয়ে বলবো ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ যতোখানি, শঙ্খ ঘোষের ওকাম্পোও ততোটাই মুগ্ধ করেন পাঠককে এই অপরিহার্য ভূমিকা ও অনুষঙ্গ অংশ দুটি না থাকলে 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' বাঙালি পাঠকের কাছে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর মতো আর একটি হৃদয়ের মূল্যবান স্মৃতির নৈবেদ্য মাত্র হয়ে থাকতো। তার ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও ভিক্টোরিয়ার সাহচর্যের যে অক্ষয় অবদান, লেখকের গভীর নিষ্ঠায় রচিত টীকায় সেই প্রসঙ্গ জীবন্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত পটভূমিতে আপন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সান ইসিদ্রোর প্রবাসকাল। শঙ্খ ঘোষের একশো পৃষ্ঠার আলোতে ওকাম্পোর আশি পাতা অনেক বেশি অর্থপূর্ণ, অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। নিজস্ব বক্তব্যগুলি নিছক ধারণার ওপর ভর করে না রেখে, লেখক বিস্তৃত, সূক্ষ্ম অনুপুঙ্খের সাহায্যে তার পাথুরে ভিত্ গেঁথে দিয়েছেন 'সূত্রাবলি'তে। এই শ্রমসাধ্য কাজটি যে আনন্দেরই কাজ, নিজেকে যথাসাধ্য পিছনে রেখে তথ্য পরিবেশনের ভঙ্গির মধ্যে তাঁর সেই তৃপ্তিটুকু ফুটে ওঠে।

শঙ্খ ঘোষের অসামান্য গদ্য নিয়ে এখানে আলোচনা করবো না, যদিও এই ছন্দোস্পন্দিত, সহজ, বলিষ্ঠ ভাষাই পাঠকের প্রথম প্রাপ্তি। তাঁর গদ্য সুকুমার ও সংহত। বাক্‌সুষমার সঙ্গে যুক্তির মেরুদণ্ড তাঁর বিশ্লেষণকে অনুকরণযোগ্য সম্মিতি দিয়েছে। এই গ্রন্থ টীকা-কণ্টকিত নয়, টীকা-কুসুমিত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, কথোপকথন, জীবনস্মৃতি আর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির নানা বিচিত্র লেখা থেকে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ উদ্ধার করে শঙ্খ ঘোষ আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন রবীন্দ্র-জীবনে বিজয়ার স্থান কী ছিলো। নানা টুকরো তথ্য একসঙ্গে জড়ো করে আমাদের চোখের সামনে

BanglaBook.org

এনে দিয়েছেন, তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণের পাশাপাশি। কিন্তু সেই বিশ্লেষণ, এবং বিজয়ার নিজস্ব বই, দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্কটি দেখার পরে, পাঠকের মনে একটি তৃতীয় দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে। সেখানেই এই গ্রন্থের সার্থকতা।

ভূমিকা থেকে জানতে পারি যে মার্কিনদেশে থাকার সময়ে ওকাম্পোর স্পেনীয় ভাষায় লেখা বইটি শঙ্খ ঘোষের হাতে আসে স্পেনীয় জানেন না, তাই ভাষাজ্ঞ এক বিদেশী অধ্যাপকের সহযোগিতায় তিনি বইটির পাঠোদ্ধার এবং ভাষান্তর করেন। এরই অংশ বিশেষ সাহিত্য অকাদমির রবীন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থে বেরিয়েছিলো, আর এক অংশ 'ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' পত্রিকায়। কিন্তু দুটি ইংরেজি আংশিক অনুবাদের কোনোটাই ওকাম্পোর মনের মতো হয়নি, পূর্ণাঙ্গ অনুবাদও ইংরেজিতে নেই।

ভূমিকাটির তিনটি ভাগ : 'বিদেশিনী', 'সঙ্গনিঃসঙ্গ' ও 'বিজয়ার অলিন্দ'।

'বিদেশিনী' এই ভাগে লেখক সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রকাব্যের সেই রহস্যময়ী বিচিত্র-রূপিণীকে। 'কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপর তাহার বাড়ি, তাহাকেই শারদ প্রাতে, মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই',...'সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদুহেসে বুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া'। যার খোঁজে কবির মন ছুটে বেড়ায় 'দূরে কোথায় দূরে দূরে'। শঙ্খ ঘোষ বলেছেন এই 'বিদেশিনী' লীলাসঙ্গিনী কোনো মানবী বিশেষ নন, নন ইউরোপ-লক্ষ্মীর রোমান্টিক কল্পমূর্তি, নন মারিয়ো প্রাজের *'exotic unknown'*, তিনি কবির অন্তর্লোকের চিরপ্রবাসের পালিকা, 'স্মৃতিতে-আশায় মেলানো এই আমাদের অন্তর্গত উন্মোচন : এই হোলো কবির সেই অপরিচিতা' (পৃ ৫)। তাই ১৮৯৫-তে রচিত 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী' গানটির প্রতিধ্বনি ফিরে আসে ১৯৩০-এ, 'নবজাতক'-এর 'সন্ধ্যা', 'দিন শেষে দেখা হোলো সে আমার বিদেশিনী— তারে চিনি তবু নাহি চিনি।' ইতিমধ্যে কবির জীবনে এসেছেন ভিক্টোরিয়া, শেষ বসন্তের প্রতি শ্রুতি নিয়ে। যে 'বিদেশী ফুলে'র সুরভি তাঁর হৃদয়ে ফিরিয়ে আনছে 'কিশোর প্রেম'-এর মাধুরী : 'আজ এসে মোর স্বপন-মাঝে পেয়েছে তার বাসা তোমার সেই কিশোরের ভাষা' (১৯২৪-এর নভেম্বর)। ঐ অক্টোবরেই তিনি লিখছেন তাঁর 'দূরের বঁধুর কথা' 'প্রথম যৌবনে' যার 'উত্তরীয়ের সুগন্ধি বাতাস' লেগেছিলো তাঁর মর্মস্থলে, 'শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও।' হারুনা-মারু জাহাজের নিঃসঙ্গতায় কবির সেই ব্যাকুল 'আহ্বান' কি ঢেউয়ে ভেসে পৌঁছেছিলো সান ইসিদ্রোর কূলে, তাই যখন প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার লেখা গানখানি অনুবাদ করে কবি অসঙ্কোচে তুলে দেন তাঁর 'বিজয়ার করকমলে' (আমি চিনি গো চিনি তোমারে) তখন নৈপথ্যে কোথাও একটা অঙ্ক মিলে যায়, ফুটে যায় বহুপ্রতীক্ষিত আ-ফোটা পারিজাতের কলি, যার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে কবির জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

এই বিদেশিনী সব শিল্পীহৃদয়েই প্রবাস আনে, অস্পৃষ্ট শুদ্ধতার সেই আকাঙ্ক্ষা, যা রিলকের 'অন্তরবাসিনী কুমারী'। শিল্পীর অন্তর্নিহিত নিঃসঙ্গতাই এই 'বিদেশিনী', যার জন্য শিল্পীমাত্রেই চিরবিরহী।

'সঙ্গনিঃসঙ্গ' অংশে এই চিরবিদেশিনী ও বাস্তবসূত্রে পেয়ে যাওয়া বিদেশী তরুণী বিজয়ার সংযোগটি নির্দেশিত। তারপরে 'বিজয়ার অলিন্দে' ব্যক্ত হয়েছে ভিক্টোরিয়ার বৈদেশিক পটভূমি : দক্ষিণ আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক আত্মসন্ধিৎসা, আর্জেন্টিনার কবিতাজগৎ, ভিক্টোরিয়ার প্রাচ্যমুখিতার কারণ খোঁজা। 'ওই নারী কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন রবীন্দ্রনাথের জন্য', তা জানার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি যথাসাধ্য সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ।

BanglaBook.org

ইয়োরোপীয় শিকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বদেশী পরিচয়ে আত্মস্থ হতে চেষ্টা করছেন তখন দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যগোষ্ঠী। ভিক্টোরিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাঁর সাংস্কৃতিক আত্মস্থীভবনের সমস্যার সঙ্গে কীভাবে, কোথায় বোর্হেস, নেরুদা, উনামুনো প্রভৃতির অন্তর্বিরোধের মিল ছিলো, স্বল্প কথায় সুষ্ঠুভাবে সেই ছবি ফুটিয়েছেন লেখক।

এই পরিপাটি ভূমিকার পরে আসে ওকাম্পোর মূলরচনার অনুবাদ। শতবার্ষিকী গ্রন্থের ইংরিজি অংশটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, বাংলা অনুবাদটির উৎকর্ষ সহজেই প্রতিভাত হয়। ভিক্টোরিয়া নিজে কবি। তাঁর শিল্পীমনের সূক্ষ্ম চেতনা, অনুভূতিপ্রবণ গতিটি শঙ্খ ঘোষের স্বচ্ছ প্রকাশ-নৈপুণ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। জানুবৃত্তটি ভগ্ন হয় না কোথাও, ভবপ্রবাহে বাধা পড়ে না, কোনো রেখাটি একটু মোটা হয়ে পড়েনি।

ওকাম্পোর বইটি চার অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'খোলা পথের ধারে', 'অলিন্দ', 'নিঃসঙ্গ পুরুষ' ও 'ভালোবাসা'। প্রথম অংশটি তাঁর মুখবন্ধ, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখা এবং দেখানো। প্রস্তুতির পাশে রবীন্দ্রনাথ রেখে 'সুখে'র সাহিত্য আর 'অনন্দে'র সাহিত্যের তফাত দেখিয়েছেন, আর বলেছেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বাদগ্রহণের জন্য পশ্চিমী পাঠকের কোনোই বিশেষ 'প্রস্তুতি' 'দরকার' নেই, শুধু দরকার 'বয়স নিরপেক্ষ এক আত্মিক সচেতনতার, এক ধরনের সূক্ষ্ম বোধের' (পৃ ৩১)।

দ্বিতীয় অংশে তিনি গান্ধীর প্রসঙ্গ তুলে আমাদের সমক্ষে পরিচিত এক সমস্যা দেখেছেন—শিল্পী না কি সন্ত? গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শগত দ্বন্দ্ব এই বিদেশিনীকেও দোলা দিয়েছিল। একই ভবে। এই অংশেই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অবিস্মরণীয় সাক্ষাতের রোমাঞ্চকর বিবরণ।

'মিরালিও'র 'অলিন্দে' রবীন্দ্রনাথের শরীরের বিশ্রাম ও মনের মুক্তি সাজিয়ে বিজয়া কবিকে উপহার দিলেন বিরাট এক নদীর শোভা, আর তরুশ্রেণীর বনানী, যা কোনোদিন মুছে যায়নি কবির মন থেকে। শেষ দুটি অংশে তাঁর স্মৃতিচারণ, সান ইসিদ্রো, চাপাদমালাল, বুয়েনোস আইরেসের—এবং ১৯৩০-এ, পারীতে রবীন্দ্রচিত্র-প্রদর্শনীর। এই অংশ দুটি নানা বিচিত্র ব্যক্তিগত খবরে ভরা, যেমন: পারীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্লোদেলের পরিচয় হয়েছিল এবং তাঁদের পরস্পরের প্রতি কেমন মনোভাব জেগেছিল। সংবাদগুলি বেশ মজার, যথা, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পশ্চিমী অনুবাদক ও গভীর ভক্ত আঁদ্রে জিদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের বেশি ভালো লেগেছিল পোল ভালেরিকে, যেহেতু জিদ ছিলেন কথাবার্তায় অপটু। চতুর্থ অধ্যায়ের নামটি মূলেই 'ভালোবাসা'—এই একটিই বাংলা শব্দ বিজয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখেছিলেন যা তিনি কোনোদিন বিস্মৃত হননি। এখানে দুজনের সম্পর্কের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, কিছুটা হয়তো দ্বিপাক্ষিক ব্যাকুলতার ছবি।

ওকাম্পোর প্রকাশ-ক্ষমতা অসাধারণ। শ্রদ্ধা, বিস্ময়, মুগ্ধতায় তাঁর দৃষ্টি, বুদ্ধি, পরিহাস-কুশলতা এবং সর্বোপরি সমর্পণের অনবদ্য ভঙ্গিটি, যেন কোনো পূজারিনীর সদ্যোস্নাত মূর্তি হয়ে শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে প্রকটিত। বয়সের বাধা, ভাষার প্রাকার ডিঙিয়ে কীভাবে কাছাকাছি আসছেন দুটি অসম মানুষ এক চিরন্তন সমতার টানে,—সেই অলৌকিক সামীপ্যের চিত্র পাই 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। নিজের বিষয়ে বিজয়ার এই অসামান্য মন্তব্য দেখি, রবীন্দ্রনাথ বিনা আয়াসে—'বশ করে নিলেন একাধারে বন্য আর নিরীহ এই নবীন প্রাণীটিকে। রাত্রিবেলায় যে-কোনো গৃহপালিতের মতো তাঁর দরজার বাইরে মেঝের টালির ওপর যে শুয়ে থাকতাম না, তার একমাত্র কারণ এই যে ব্যাপারটা খুব ভালো দেখায় না' (পৃ ৬২)।

এবং বশীভূত হলেন কি নিজেও? —'তাঁর সেই দিনগুলি আর তার কোমল শুশ্রূষার খুঁটিনাটি ধরা আছে আমার কবিতাগুচ্ছে, হয়তো আমার শ্রেষ্ঠ রচনা; পলাতক স্মৃতিগুলি আজ কথায় বন্দী। ভাষার অপরিচয়ে তুমি কোনদিন একে জানবে না।' ১৯৩৯-এর মার্চে তিনি ওকাম্পোকে লিখেছেন এই চিঠি। 'মিরালিও'র বাগানবাড়ি ছাড়ার পনেরো বছর পরেও তাঁর এই স্মৃতিব্যাকুলতা

আমাদের আশ্চর্য করে না কারণ ১৯৩০-এর ইয়োরোপ-ভ্রমণের সময়ে বিজয়াকে তাঁর সেই তারবার্তা তো আমরা ভুলতে পারি না—'Will you not come and see me?' কাপ মাত্যার সেই ভিলায় রবীন্দ্রনাথের আহ্বান রাখতে ছুটে এলেন ভিক্তোরিয়া, তাঁর অসীম মমতা ও জবর প্রতিপত্তির বলে অসাধ্য-সাধনের মতো পারী-শহরে রবীন্দ্র-চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা থেকেই আমরা জানতে পারি এ কাজটি সেযুগে সহজ ছিলো না।

বিজয়ার বই থেকে আমরা একটি জরুরী নতুন খবর পাই—রবীন্দ্রনাথের রচনার কাটকুটির শৈল্পিক মূল্যায়ন নাকি বিজয়াই প্রথম করেন, আর্জেন্টিনাতে। তিনি বাংলা পাণ্ডুলিপি পড়তে পারতেন না, কিন্তু কবির কাটাকুটির রূপেই মুগ্ধ হতেন। এবং সেগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথকে ছবি আঁকায় উদ্বুদ্ধ করেন বিজয়াই (পৃ ৭৯-৮০, ১৭১) প্রথম। এর দু-বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি কাঁধে শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন পারী শহরে, তখন তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবার নৈতিক দায়িত্বও তাই বহন করেছিলেন ওকাম্পো নিজে। পাউণ্ড যতই নিন্দে করুন, রবীন্দ্রচিত্রশিল্পের প্রকৃত মূল্যায়ন, বিশ্বশিল্পের পটভূমিকায়, এখনও হ'তে বাকি আছে। লেখক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে পরিপূরক হিসেবে মিলিয়ে দেখে তাঁর সম্পূর্ণাঙ্গ অভিমূল্যায়ন আবশ্যক। একথা তো অনেকবারই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্র-রচনায় যে-'ঈভিল'-এর অভাব, রবীন্দ্রচিত্রে তার প্রাচুর্য। শুধু কি 'ঈভিল'? এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও ওঠে—শব্দে রবীন্দ্রনাথ বিদেহ প্রেমের পূজারী, যে-যৌনতাকে পরিহার, অথবা অতিক্রম ক'রে তাঁর সাহিত্যশিল্প, মানুষের সেই অপরিহার্য আভ্যন্তরীণ জান্তবতা কি তাঁর চিত্রশিল্পে আত্মপ্রকাশ করেনি? ওইসব অত্যাশ্চর্য প্রাণীদের আগ্নেয় চোখ, পশ্চাদ্‌পটের অন্ধকার ভেদ ক'রে জাজ্বল্যমান ঐসব বিদ্যুৎগতি বহিঃরেখার মধ্যে শক্তিশালী রূপের সাধনাই কি প্রবলতর নয়? সেই সব অত্যাধুনিক মানুষ, সেই যে করুণ, বা হিংস্র অপার্থিব জন্তু, তাহ'লে আমরা কি প্রাসঙ্গিকভাবে তাদের দেখবার সঙ্গে সঙ্গে একবার সকিতে স্মরণ ক'রে নেবো আর্জেন্টিনার আশ্চর্য দিনগুলিকে—যখন অলৌকিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো একটি যুবতীর, এবং সেই উদ্দাম আবেগের নির্ঝর খুলে দিলো ষট-উত্তীর্ণ এক শিল্পী-হৃদয়ের আকৈশোর রুদ্ধ গোপন দরজাটি। নাকি সে-দরজা খুলেও খুললো না? সাহিত্যে যদি স্পষ্ট নাও খোলে, চিত্রে তবে খুলে গিয়েছিলো কি?

২

পাঠকের যে তৃতীয় দৃষ্টিকোণটির কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথকে দেখবো।

পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এলো কেন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর-প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা?
(পূরবী: 'কিশোর-প্রেম', ১১ নভেম্বর ১৯২৪, বুয়েনোস এয়ারিস)

বিজয়া তখন যুবতী, লাতিন জাতীয় চরিত্রের স্বভাবিক আবেগের বন্যা তাঁর দেহে-মনে, কবির হৃদয়ের বন্ধ দরজায় তিনি বারবার করাঘাত করেছেন—'বলিয়াছে 'খুলে দাও', উপায় জানিনা খুলিবারে।' ('চাবি', ২৭ নভেম্বর, ১৯২৪) আপন অন্তঃপুরের চাবি কবির নিজের হাতে নেই।

বারেক শুধু মনে হল,
খুলি, দুয়ার খুলি।

ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেনু ভুলি।

ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
মন শুধালো যবে,
বলেছিলেম, 'আর কিছু নয়,
স্বপ্ন আমার হবে।'

('অন্তর্হিতা', ১৬ নভেম্বর ১৯২৪, বুয়েনোস এয়ারিস)

যে 'আহ্বানে' সাড়া দেবার শক্তি তাঁর নেই সেই আহ্বানকে 'স্বপ্ন' বলে ফিরিয়ে না দিয়ে উপায় কি।

বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সেও
সুধায় ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো।

অনতিক্রম্য বাধাটি কবির নিজেরই মধ্যে। উচ্ছ্বসিতা, আবেগপ্রধানা বিজয়ার প্রবল টানে সাড়া দেবার উপায় রবীন্দ্রনাথের জানা নেই। প্রকৃতি ও শিল্পের যে দ্বন্দ্বের কথা চিরকাল পশ্চিমী সাহিত্যে দেখা গেছে—বিজয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের মধ্যেও কোনো ক্ষণিক চমক দেখি যেন তারই।

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে ঊর্ধ্ব-পানে ;
...বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।

তাঁর লাতিন চরিত্রগত উচ্ছ্বাসপ্রবণতায় (পৃ ১১৪) বিজয়া কি তপস্বীর সাধনা টলিয়ে দিচ্ছেন ? শেষ পর্যন্ত আমরা বনস্পতির জন্য যে আর্ত করুণাভিক্ষা শুনতে পাই, তাতে কি কবির নিজের কণ্ঠও বাজে না ?

দয়া কোরো, দয়া কোরো আমাদের এই তপস্বীরে
ধৈর্য ধরো, ওগো দিগঙ্গনা—

এ কী তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ—
দুরন্ত চুম্বন বেগে তব

('বনস্পতি', সান ইসিড্রো, ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৪)

কবি কামনা করছেন সেই সুদূর চিরন্তনীর প্রেম, যা ছিলো রিল্‌কেরও কাম্য। রিল্‌কের প্রেমতত্ত্বটি এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় : 'সেটাই প্রেম, যা অবিরল আসক্তি ও সাহচর্যে প্রেমিক-প্রেমিকাকে জীর্ণ ক'রে ফ্যালে না, যা রচনা করে দু-জনের মধ্যে সেই অবকাশ ও দূরত্ব, যার মধ্য দিয়ে তারা রূপান্তরিত হ'তে পারে কোনো 'দেবভোগ্য' ভাণ্ডে, পেতে পারে সৃষ্টিশীল কোনো প্রেরণা।' ('রাইনের মারিয়া রিল্‌কের কবিতা', অনুবাদ-ভূমিকা-টীকা, বুদ্ধদেব বসু, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ ৪৮-৪৯)। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বও কি এই নয় ?

আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বর তলে
শান্তিরূপে এসো দিগঙ্গনা!

BanglaBook.org

দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হোক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি।

এই গ্রন্থ আমাদের মনে যে-প্রশ্নটি প্রধানত জাগায়, তা হলো, রবীন্দ্র-জীবনে বিজয়ার প্রকৃত স্থান কী? 'পূরবী'ই কি শেষ উত্তর?

যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার
চমকি উঠিনু লাজে,
খুঁজে দেখি গৃহমাঝে—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
('বীণাহারা', সান্ ইসিড্রো, ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৪)

এই বীণাহারা প্রেমিকের রিক্ততার বেদনাই 'পূরবী'র প্রধান সুর।

শঙ্খ ঘোষের 'অনুষঙ্গ' অংশতে (যা 'সান্ ইসিড্রোর শিখরে'র সমান মাপের) কাউন্টেস কায়জারলিঙের মন্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে বিজয়ার জীবনে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র ভালোবাসা ছিলেন না। বিজয়া ছিলেন সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদিনী, স্বভাবপ্রেমিক, প্রণয় তাঁর চিত্তের ও চরিত্রের বিরল গুণে হ'য়ে উঠেছিলো এক শিল্পবিশেষ। নানা গুণীজনের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন, মোহিত করেছেন—কিন্তু এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর নিরুপম ভালোবাসার শিখাটি কখনো অনুজ্জ্বল হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর পক্ষে গভীর প্রভাববিস্তারী হয়েছিলো, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিজয়ার ভালোবাসা হয়তো প্রাপ্তি হিসেবে তুলনাহীন।

দৈবস্পর্শে তার
আমারে সে ধূলি হতে করিল উদ্ধার;

আলোকের বন্যে মোর চক্ষু দিল ভরি
বর্ণের লহরী।
খুলে গেল অনন্তের কালো উত্তরীয়;
কতরূপে দেখা দিল প্রিয়,
অনির্বচনীয়
তাই মোর গান
কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘ্যদান
প্রাণজাহ্নবীরে।
('প্রাণগঙ্গা', ১৬ জানুয়ারি ১৯২৫)

'জুলিয়ো চেজারে' জাহাজে, দেশে ফেরবার পথে রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছে এই স্বীকৃতি। কবির জীবনসূর্য যখন পশ্চিমে হেলেছে, জীবনের শেষ পনেরো বছরে পাওয়া এই যুবতীর অকৃপণ ভালোবাসার অর্ঘ্য তাঁর জীবনবোধকে, তাঁর অহংবোধকে এক নতুন কল্লোলে উজ্জীবিত ক'রে তুলেছিলো। ভাবতে ভালো লাগে যে বিজয়ার ভালোবাসায় কবি নতুন করে নিজের মূল্য পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে আছে তাঁর প্রেম বিষয়ক প্রশ্ন। প্রশ্নটি সরল নয়। সেদিকে অনন্য এক আলোকপাত করে ওকাম্পোর এই রচনা।

BanglaBook.org

'পূরবী' প'ড়ে এতদিন ধরে আমাদের যে ধারণা তৈরি হ'য়ে আছে, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নিজস্ব গ্রন্থ পাঠের পরেও কি সেই ধারণা বজায় থাকে? যুগ যুগ ধরে যেন এই মিলনের প্রস্তুতি চলছিলো—যে-সাক্ষাৎ ঘটলে মনে হয়: me voici restitute a ma, rive natale'—'আবার আমি ফিরেছি আপন তীরে' (পৃ ৯১)। রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমভাবনা কেবল 'পূরবী'তেই নয়, 'দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহি রে মনে হোলো যেন চিনি', এ চেনার জন্য তো মন তৈরি 'গীতাঞ্জলি'র দিন থেকে—'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।' 'তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে জ্বালোয় আকাশ ভরা'—এই অভিসারের প্রস্তুতিতে বিশ্বপৃথিবী লিপ্ত। তাই হারুনাকু জাহাজে বসেই তিনি লিখলেন:

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারংবার
ফিরেছি ডাকিয়া।

সান্ ইসিদ্রোর শিখরে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকবেন যে-তরুণীটি, সেই বিজয়ার সঙ্গে তখন চেনাই হয়নি কবির। যদিও কবি তার দশ বছর আগেই 'গীতাঞ্জলি'র পবিত্র উজ্জ্বল পথে বিজয়ার হৃদয়ের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছেন। বিজয়া লিখছেন: ঠিক জানি না, রবীন্দ্রনাথ না কি ঈশ্বর, কার কথা ভেবে ব'লে উঠেছি তখন:

যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু
এবার এ জীবনে
তবে তেমনি আমি পাইনি, যেন
সেকথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

..যেমন প্রতীচ্যে, তেমন প্রাচ্যে, এই মিলনক্ষুধারই তো অন্য নাম ভালোবাসা! (পৃ ৪৩-৪৪)। এই ভালোবাসাই তো রবীন্দ্রকাব্যের মূল ধ্বনি, এই ভালোবাসাই তো রবীন্দ্রসাধনার মেরুদণ্ড। 'ভানুসিংহের পদাবলি'তে যে সুরের আলাপ, তারই পরিণতি 'পূরবী'তে। 'পূরবী' ছাড়িয়ে তা ছড়িয়ে গিয়েছে 'মহুয়া'তে। তার অনুরণন শুনেছি শেষ পর্যন্ত তাঁর গানে গানে, অযুত স্বরে।

'পূরবী'তে রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার মধ্যে চাওয়া-না-চাওয়ার যে স্ববিরোধ দেখতে পাই, তার প্রকৃতিটি আর একটু বর্তিয়ে দেখা যেতে পারে।

'পূরবী'র মধ্যে ঘুরে-ফিরে আসছে দুটি মূল তত্ত্ব—দুটি থীম—'চেনা-অচেনা' আর 'বিরহ-মিলন'। এই দুটি কেন্দ্রের চারপাশে স্থির বৃত্তের মতো ঘুরছে কবির মন, তাঁর স্মৃতি ও স্বপ্নের দোলাচল। মিলনের মধ্যে সর্বদাই রয়েছে বিরহ, চেনার মধ্যে নিলীন এক চির-অচেনা।

বিজয়া ও রবীন্দ্রনাথের কাছে-আসার মধ্যেও ছিল এই অলৌকিক আধোজানার মায়া, যাকে ফরাসিতে বলা হয় deja-vu বা 'পূর্বজন্মের চেনার' মতো এক অস্পষ্ট অনুভূতি। 'পূরবী'তে পরিণত হৃদয়ের এই চেনা-অচেনা-চিরচেনার এক অসীম বিস্ময় কাঁপতে থাকে, একই সঙ্গে যেন কূলে এসে পৌঁছোনো, আর কূল ছেড়ে ভাসা।

৩

'পূরবী'তে যে প্রধান দোলাচল আমাদের চোখে পড়ে, যে-প্রশ্ন আমরা নিজেদের না-করে পারি না, তা এই: শিল্প কি শেষ পর্যন্ত চরম আশ্রয় দেয় না? তাহলে শিল্পীরও চাই সেই সনাতন অভিনব হৃদয়-উত্তাপ, সেই মানবিক প্রেম? শিল্পে তবে প্রাপ্তি শেষ নয়, শিল্পীর শেষ কথা কি:

BanglaBook.org

যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘণ্টা নারীর অলসো তার ঢের বেশি পাবে।
(বুদ্ধদেব বসু, 'রাত তিনটের সনেট : ১')

'পূরবী'তেও যে আমরা শুনছি কবি ডাকছেন :

দেখো তো, আমারে চিনিতে পারিবে না কি।
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি
দেখছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি—
উড়ে যাওয়া মোর আঁখি?

শেষের পেয়ালা ভরে দাও হে আমার
সুরের সুরার সাকী।
আর কিছু নয়, তোমারি গানের সাথি,
এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাতি।
('বকুল বনের পাখি', ফাল্গুন, ১৩৩০)

প্রকৃতির কাছে শিল্পীর এই আত্মসমর্পণ কতটা স্থায়ী? কবি যে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করছেন 'পূরবী'র পাতায় পাতায়—যায়নি সেদিন যে দিন আমারে টানে ('বকুল বনের পাখি')—

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায়নি এখনো
সময় রয়েছে বাকি;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
('শেষ বসন্ত', বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪)

শিল্পীর শেষ পরিচয় কি ব্যক্ত হয়েছে দুটি অসমভাষী অসমবয়সী মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধে?

সেদিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্‌খানে
বিশ্বহৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,
কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফুটে দিনযাম—
('মিলন', জুলিয়ো চেজারে জাহাজ, ৯ জানুয়ারি, ১৯২৫)

ভাষার সীমান্তে এসে পৌঁছলে তবেই জীবনের ফুল ফোটানোর পালা শুরু? তবে কি শিল্পশ্রীর শেষ সার্থকতা হৃদয়লক্ষ্মীর পূজার থালায় মালা হয়ে?

একদা তব মনে না রবে
স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে মরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ ক'রে
সকল-শেষ বরণে ('গানের সাজি,' ফাল্গুন, ১৩৩৪)

BanglaBook.org

এই বরণ কাকে? কোন্ অনাগতাকে? আমরা মনে রেখেছি, যে বিজয়া তখনও উদিত হননি কবির দিগন্তে। আবার বিজয়ার সঙ্গে পরিচয়ের চার বছর পরেও 'মহুয়া'তে শুনতে পাচ্ছি সেই অনাগতার প্রতীক্ষা—

অয়ি অনাগতা, অয়ি নিতাপ্রত্যাশিতা
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা,

নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা—হে কল্যাণী তুমি নিষ্কলুষা,
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস। ('প্রতীক্ষা', ১৯২৮)

একদিকে রয়েছে মানুষী প্রেমের জন্য অধীরতা:

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে। ('শেষ বসন্ত', বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪)

অথচ শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফিরতে হচ্ছে সেই রিক্ত হাতে, শিল্পের শান্তিতে:

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
('মধু', বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪)

'পূরবী'তে তাই দেখছি দুই বিহঙ্গের দোলা, এক আশ্চর্য পাখির মিতা, যা একই সঙ্গে পৃথিবীকে উত্তীর্ণ হবার জন্য ব্যাকুল। যদিও বা ঘটে যায় হেলায় খেলায় হঠাৎ মিলন রে— শেষ অবধি ঘটে না সেই অলৌকিক উত্তরণ—যা তিনি চাইছেন

মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় রব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট যাক খসে নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক-না ফেঁসে,
কীর্তি যাক-না ঢাকি ('বকুল বনের পাখি')

কিন্তু 'খ্যাতি' তাঁকে তো ঠিক কাঁটার বেড়া হয়ে জড়িয়ে ধরেনি—'মুকুট'কে 'শান্তি' বলে মনে হয় কি এই বর্ণনায়? ওকাম্পোর বইটি পড়তে-পড়তেও মনে হয় না কবির উপায় ছিলো কর্মের বর্ম থেকে মুক্ত হবার। তিনি হয়ে পড়েছিলেন শিল্পীসুলভ আত্মকেন্দ্রিকতার শিকার। নিজেরই শিল্পপ্রকৃতির শৃঙ্খলে চিরবন্দী। যা থেকে মুক্তি চাওয়া সকল শিল্পীরই স্বভাবধর্ম কিন্তু মুক্তি পাওয়া যায় কি?

শিল্পের মতো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে 'সবার উপরে সত্য' হয়ে ওঠা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় কি? যদিও চিরকাল ধরে কবিরা তাই চেয়ে আসছেন, চণ্ডীদাস থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত:

ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো।
('শ্রেষ্ঠ কবিতা', চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ৬৩ নং)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ে আরো স্পষ্ট করে এই স্ববিরোধ প্রকাশিত:

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম...

BanglaBook.org

...শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী, শুধু
কবিতার জন্য এত রক্তপাত

('আমি কি রকম ভাবে বেঁচে আছি', 'শুধু কবিতার জন্য')

বলবার পরমুহূর্তেই শোনা যায় তাঁর আর্তস্বর: 'যদি ভালোবাসা দাও, অরুন্ধতি, কবিতার পিঠে ছুরি মেরে সহমরণের ব্রতে চলে যাবো' ('চোখ বাঁধ')। যার জন্য এত রক্তপাত, সেই কবিতারই পিঠে ছুরি মারবেন কিন্তু কবির পক্ষে সেই হত্যা হবে 'সহমরণের ব্রত'।

বুদ্ধদেব বসু উনষাটের সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—কী স্পষ্ট সেই উচ্চারণ:

যৌবনে ভেবেছিলাম কবিতাই প্রেম, কিংবা কামনার উপচে-পড়া,
শোণিতের মন্থনে উৎপন্ন আরো সুস্বাদু মাখন;—
কিন্তু অন্য ধারণা সম্প্রতি
মাঝে-মাঝে হানা দেয় আমাকে; —বিশেষভাবে
এইমতো স্তব্ধ রাতে, সঙ্গীহীনতায়
মনে হয় কবিতাও প্রবঞ্চনা—সান্ত্বনা—বিকল্পমাত্র,
কবিতার চেয়ে কম্য নারীর অঙ্গের মধু ('সন্ধিলগ্ন', ১৯৬৭)

এই আকুলতাই কি 'পূরবী'তে ধ্বনিত নয়?—

মোর রজনীর ভেঙেছে তিমিরবাঁধ,
পাও নি কি সংবাদ।

খেলিব এবার সব হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

('প্রভাতী', বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪)

কিন্তু আকুলতা যেমন আছে, তেমনি সঙ্গীও আছে বাড়া। দেওয়া কি হয়ে ওঠে?

হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে,
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাবো ফিরে।

('আশঙ্কা', বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪)

রবীন্দ্রনাথের জন্য নয় 'নারীর অঙ্গের মধু'; তাঁর অধিকারে কেবল 'অধরা মাধুরী'। পরিণত বয়সের ভালোবাসা ছাড়পাত্র পায় প্রথমেই দেহকে পর হয়ে—সে অন্তর্গত যন্ত্রণার মুক্তি হবে উত্তীর্ণ-সত্তবের রং-তুলির বেপরোয়া টানে। লিরিক তার মাধ্যম নয়। কবিতায় তা মিলিয়ে যায় 'হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হয়ে'। মুক্তি কোথায় অথবা এরই মধ্যে হয়তো মুক্তি।

রূপকে অরূপ করে না নিলে মহর্ষিদেবের এই শিষ্যটির স্বস্তি নেই। 'অধরা স্বপনে'র কাছে ধরা পড়লেই তো সব শেষ। শুধুই বিশ্বভারতীর 'গুরুদেব'-এর কারণে নয়, নিজের কাছে নিজের অন্তরঙ্গ ইমেজ-এর পক্ষেও তা অসম্ভব। আর যদি তিনি সত্যি সত্যি রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন, তাহ'লে কি বিজয়ার কাছেও তাঁর মানসমূর্তিটি একই থাকতো? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সর্বথা প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের গতিনিয়ন্ত্রণ করেছেন। মনে হ'তে চায় যেন তিনি অরূপের খাঁচা

BanglaBook.org

নিয়ে রূপের পাখিটির পশ্চাদ্ধাবন করেছেন, তাকে বন্দী করে ফেলেছেন বিদেহ প্রেমের জালে।

অথচ কবি তো গান্ধীজীর মতো সন্ত নন, তিনি তো কৃচ্ছ্রসাধনায় বিশ্বাস করেন না, বরং চান মর্তো যেন না ভেঙে যায় মিথ্যে মায়াগুলি। সারাজীবন যিনি এতো ক্ষুদ্র দুঃখ এবং মহৎ শোক সহজভাবে সয়েছিলেন তাঁকে লোকভয়ে ভীরুও ভাবতে পারি না। তবে কি আর কোনো কারণ ছিলো? হয়তো রবীন্দ্রনাথ ভালোবেসেছিলেন 'ভালোবাসা'কেই। তাঁর 'প্রেম'-এরই প্রতি। নারী উপলক্ষ মাত্র, তাই ঈশ্বরের মতোই সে অধরা, বিদেহা, চিরপ্রতীক্ষিতা, চির-অচেনা চিরসঙ্গিনী। বিরহ-মিলনের অন্তহীন দোলায় তার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়, সে দেখা স্বপ্নের মতো অচিরেই মিলিয়ে যায়। এই চির-বিদেশিনী বুঝি মানবীর মধ্যে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে, কোন রহস্যের আড়ালে অন্তর্হিত হয়। তাই শিল্পীর আর্তি মানুষীর কাছে:

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু হাত ভরে
যতই দেবে বেশি করে
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপনি ধরা পড়বে না কি। ('আশঙ্কা')

এই ফাঁকি কোনো ব্যক্তিকে নয়, কোনো নারীকে নয়। ব্যক্তিগত ভালোবাসার নাগাল পাওয়া, তাকে আঁচলে বেঁধে নেওয়া কবির পক্ষে দুঃসাধ্য। তিনি ভালোবেসেছিলেন তাঁর কৈশোরের প্রথম ভালোবাসার সেই অপরূপ সুন্দর অনুভূতিকে—আঁকড়ে ধরেছিলেন নৈর্ব্যক্তিক প্রেমকে। তাই তাঁর প্রেমের গানে ও পূজার গানে এমন মেশামেশি, তাঁর পূজা প্রেমকে। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে ধ'রে দেওয়ার জিনিস নয়। এই শাশ্বত ভালোবাসা, এই তাঁর চিরন্তনী, চির-অনাগতা, চিরসাথী:

বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আমার তাতে যাঁকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি বলে নিজের মনে স্থান দিয়েছি, সেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রেম ছিলো একটি পরিশ্রুত শুদ্ধ তত্ত্ব মাত্র, এক নিগূঢ় ধ্যান! যার ক্ষীণতম স্পন্দনটি পর্যন্ত তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারতেন, তারই ব্যবহারিক প্রকাশ থেকে কবি যত্নে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রেখেছিলেন আপনার জীবনকে—এমনই ধারণা জন্মায়। সে কি শুধুই পারিবারিক, সামাজিক কর্তব্যবোধে, না শিল্পের তাড়নায়? শিল্পের দাম শুধতে হয় স্রষ্টাকে জীবন দিয়ে, এমন কথা পশ্চিমে অনেক শুনেছি: সৃষ্টিকর্মের কল্যাণে জীবনকে স্থগিত রাখতে হবে। ('টোনিও ক্রেগার': টোমাস মান) তারই কি এক স্পষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?

আমার কথা শুধাও যদি—
চাবার তরেই চাই,
পাবার তরে চিত্তে আমার
ভাবনা কিছুই নাই।
('বিপাশা', বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪)

পাওয়ার রিক্ততায় হারিয়ে না গিয়ে অবিরল চাওয়ার ঐশ্বর্যে ভরিয়ে রেখেছিলেন কবি নিজেকে। যে-পূর্ণতা শিল্পের ক্ষেত্রকে উষর করে দেয়, সেই জীবনকে তিনি চাননি, 'আমার বন্দনা না-পাওয়ারে'। ('না-পাওয়া', বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪)। এইদিক থেকে দেখলে আমাদের মনে হবে, রূপের পাখিটিকে কবি অরূপের 'খাঁচায়' ভরেননি, বরং উড়িয়ে দিয়েছিলেন অপরূপের 'আকাশে' (আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও/নয় খাঁচটার থেকে'—বিপাশা)। সেই অপরূপ, শিল্প।

তাই তরুণী বিজয়া যখন তাঁকে 'মিরালরিও'র ভূস্বর্গে গ্রীষ্মযাপন করে যেতে একান্ত অনুরোধ করছেন, কবি তখন ছুটে ফিরে আসছেন ভারতবর্ষে। আর্জেন্টিনা তাঁর সৃষ্টিকর্মের পক্ষে তুলনায়

BanglaBook.org

অনুর্বরা—এই কারণ দেখিয়ে। যদিও ফেরত জাহাজে বসে এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে চিঠিতে আফসোস করতে শুনি, তবু আমরা জানি—মুখের ভাষায় তিনি রূপ 'চাবার তরেই' চান, কাজের ভাষায় কবি বেছে নিচ্ছেন অরূপবতন, শিল্প।

৪

রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার কাছে মন্ত্রোপম, রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে ঈশ্বর-সদৃশ বললেও অসাধুতা হয় না। তথাপি সবিনয়ে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মানুষ রবীন্দ্রনাথের যে-ছবি ওকাম্পোর রচনায় ফুটে ওঠে তা অলৌকিক নয়, বরং বিজয়ার ঐশিক প্রণতির প্রেক্ষিতে তাঁর মানবিক বিচ্যুতিগুলি যেন বেশি পীড়া দেয়। এই কারণেও 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' বাঙালী রবীন্দ্রভক্তের কাছে জরুরী। এই তীক্ষ্ণধী, প্রণয়াবনম্রা আজ যে ভাবেই ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করুন না কেন, ছোটো ছোটো ঘটনাও আমাদের কাছে ভিন্নতর গুরুত্বে প্রতিভাত হয়। আমাদের নিজস্ব ভালোবাসা আমাদের নিজস্ব বিশ্লেষণের দায়িত্ব এনে দেয়।

'পূরবী', 'সান ইসিদ্রোর শিখরে রবীন্দ্রনাথ', ও তার 'ভূমিকা : অনুষঙ্গ' ভালো করে পড়লে আমাদের মনে এই ধারণাই হওয়া স্বাভাবিক যে প্রকৃতপক্ষে সব কিছু বলা এবং লেখার পরে, বিজয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে 'কান্তা'ই থেকে গিয়েছেন (যে ভালোবাসে, lover), 'বনিতা' হয়ে উঠতে পারেননি (যাকে ভালোবাসি, beloved)। বিজয় যে তাঁকে ভালোবাসে ('মোরে সে ভালোবাসে'—'আগমনী', সান ইসিদ্রো, ১৯২৪) সেই সত্যই প্রবলতর—তিনিও বিজয়াকে ভালোবাসলেন কিনা সে প্রশ্ন একবারও ওঠে না। কি রানী চন্দের সঙ্গে কথায়, কি রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিঠিতে, তাঁর পিতৃস্মৃতিতে, কি প্রতিমা দেবীর সঙ্গে আলোচনায়—সর্বত্রই ওকাম্পো কবির মুখে চিত্রিত হন তাঁর ভক্ত, সেবিকা, কান্তা হিসেবে। কবির নিজের দিক থেকে কোনো প্রতিদান ছিলো কিনা, 'সান ইসিদ্রো'তে এই ভাব-বিনিময় পারস্পরিক হয়েছিলো কিনা, তার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও তো চোখে পড়ে না একমাত্র উত্তর—'পূরবী'। কিন্তু শঙ্খ ঘোষ দুটি কবিতার প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা রবীন্দ্রকাব্যে সামগ্রিকভাবেই প্রযোজ্য—রবীন্দ্রকাব্যকে আক্ষরিক অর্থে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বাঁধতে গেলে ফস্কা গেরোর সম্ভাবনা। ভুল করা শক্ত নয়।

যদি বলি, সাধারণভাবেই সেই অর্ধোচ্চারিত 'কিশোর প্রেমের প্রবল আঘাতের পর থেকে কবির প্রেম বিষয়ে নিষ্ক্রিয় মনোভঙ্গি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো—তিনি 'গ্রহীতা'র ভূমিকা বেছে নিয়েছিলেন, করণ তাঁর দেওয়ার শক্তি আর বাকি ছিলো না—তাহ'লে কি ভুল হবে?

দিলীপ রায়কে তিনি ১৯২৭-এ বলেছিলেন :

'একটা কথা আমি বলতে পারি গৌরব করে : যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখিনি—তা সে-ভালোবাসা যে-রকমই হোক না কেন। প্রতি মেয়ের স্নেহ বলো, প্রীতি বলো, প্রেম বলো আমার মনে হয়েছে একটা প্রসাদ, একটা favour, কারণ আমি এটা বরাবরই উপলব্ধি করেছি যে প্রতি মেয়ের ভালোবাসা, তা সে যে রকমের ভালোবাসাই হোক না কেন,—আমাদের মনের বনে কিছু না কিছু আফোটা ফুল ফুটিয়ে রেখে যায়—সে ফুল হয়তো পরে ঝ'রে যায়, কিন্তু তার গন্ধ যায় না মিলিয়ে' (তীর্থঙ্কর, ২য় সং, ১৩৫১, পৃ ১৪৫)।

এই বিবাগী ফুলের গন্ধই কবির জীবনে প্রেম।

তাঁর মনে পুরুষের কর্মময় জীবনে নারীর সার্থক ভূমিকা বিষয়ে একটি ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৪০-এ মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে আলোচনায় কবি বলছেন : 'তোমরা যাই বল, মেয়েদের প্রধান কাজ, inspire করা...দুজনের মিলনে যেন একটা circle সম্পূর্ণ হল, যদি তা না হোতো তাহ'লে যে বিশেষ একটা ক্ষতি হোতো তা হয়তো নয়, কিন্তু সেই হওয়ার

দ্বারা একটা বিশেষ সাফল্য আসে,...মেয়েদের সেই কাজ, পুরুষের যথার্থ সঙ্গিনী হওয়া, জীবনের মুক্তক্ষেত্রে।...তাই বলছিলুম মেয়েদের প্রধান কাজ যদি inspire করা হয়, —inspire করা কর্মীকে তার কর্মের মধ্যে, সে কম নয়। সেই শিখা না হ'লে আলো যে জ্বলত না, তাই হৃদয়ে সে শিখা জ্বালানো চাই ...কে সামনে এলো, কে পিছনে রইলো সেটা সামান্য। অসামান্য সেইটাই যেটা তার দান, কি উপায়ে দিল তা নয়—কি দিল।...মিলন তখনই যথার্থ বড় মিলন হয় যখন সে একটা মহত্তর জীবনের মধ্যে প্রেরণা আনে। গণ্ডিবদ্ধ আঁচলচাপা দেওয়া জীবনে সে যেন ব্যর্থ না হয়। ('মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', ১৯৪৩, পৃ ১৪৩-১৪৪) উপরের দুটি প্রেম-বিষয়ক কথোপকথনেই কবির মুখ থেকে শিল্পীর জীবনে, কর্মীপুরুষের জীবনে নারীহৃদয়ের স্পর্শ 'পাওয়ার' মূল্য বিষয়ে কিছু মন্তব্য পাচ্ছি। কিন্তু গ্রহণ করা ছাড়া পুরুষের পক্ষ থেকে নারীকে কিছু 'দেবার' প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও আলোচনা ঠিকমত পাচ্ছি না। কবির মধ্যে উষ্ণতার অভাব ছিলো না—অথচ তা দেবার ক্ষমতা অথবা প্রয়োজন তাঁর ছিলো কি? শঙ্খ ঘোষের সূত্রাবলিতে 'চিঠিপত্র' থেকে একটি অমূল্য উল্লেখ রয়েছে: 'আমি কি আজ পর্যন্ত কাউকে ভিতর থেকে আলো দিতে পেরেছি? আমি কি রকম জানো? যেন সূর্যরশ্মিতে উদ্দীপ্ত অগ্নিবর্ণ সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। সে আলো চোখে দেখতে পাবে, ভালো লাগবেও হয়তো, —কিন্তু রাত্রের অন্ধকার পথে চলবার জন্যে তার থেকে কেউ কি আলো সঞ্চয় করতে পারবে, কেউ কি জ্বালাতে পারবে আপন ঘরের প্রদীপ?' (১৪ নভেম্বর, ১৯৩২, পৃ ১৫৩)। প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমাদের ধারণার পাশাপাশি তাঁর এই আত্মসমীক্ষা যদি রাখি, খানিকটা মিলে যাবে প্রতিচ্ছবি। কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একথা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়—তাঁর আলো থেকে জ্বলেছে, এবং জ্বলবে, সংখ্যাহীন আঁধার পথের পথনির্দেশ।

বিজয়ার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো মন্তব্যই ধরি না কেন, যেমন, ১৯৩৪-এ রানী চন্দর কাছে—"সেদিন বিজয়ার চিঠি পেলুম। ছোট্ট একটি কার্ডে লিখেছে: 'যদি তুমি আমায় কিছু লেখো। একবার আসতে লিখে দিলুম।' কবির এই আসতে লেখাই কিন্তু সেই স্মরণীয় তারবার্তা: Will you not come and see me? আমার জন্যে যে কী করবে নিশে পেও না।...অজস্র টাকা আমার জন্য খরচ করেছে, তাতেও যেন ওর তৃপ্তি নেই। সব সময় শুধু আশায় থাকত আমি কী চাই। আমার চাওয়া ও প্রণ দিয়েও মেটাবে, এমনি ভাব।...বিজয়া আমার "চওয়া"র কাছে ওর সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করত" (পৃ ৫৮-৫৯)। এখনেও আমরা দেখছি বিজয়া কবিকে কী চোখে দেখতেন, কবি যে তাঁকে কী-চোখে দেখলেন সেটা গৌণ। সেই গৌণ নিকটি ফুটছে ১৯৪১-এ রানী চন্দর সঙ্গে আলাপে, 'মেয়েদের ইমোশন' প্রসঙ্গে। 'বিদেশে দেখেছি, তারা যখন ভালোবাসে তখন তার ইমোশনকে একটা রূপ দেয়; একটা কাজের ভিতর দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করে। আমি পেয়েছি বিদেশেও এই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসা। সেই স্প্যানিশ মেয়ে বিজয়া, প্রথমেই আমায় বললে যে আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি।' (পৃ ৬০)। অথবা ১৯৩০ এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে: 'জার্মানিতে এবার Dr. Selig-এর দ্বারা অনেক উপকার পাব। দেখেছি এসব জায়গায় মেয়ে বন্ধু পেলেই সবচেয়ে কাজে লাগে। প্যারিসে ভিক্টোরিয়া যে রকম ছিল Dr. Selig ও সেই রকম এমন কি তার চেয়ে বেশি' (পৃ ১০৮)। কবির কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি সেই মেয়ে বন্ধুকে তিনিও তার জন্যে কিছু করতে পারতেন কিনা। তিনি তো এত পেলেন—তিনি কী দিলেন?

—'পূরবী'?

বলতে সঙ্কোচ হয়। কিন্তু কবির অহংবোধকে পরিতৃপ্তি দেওয়া ছাড়া (একেই কি 'প্রেরণা' বলবো?) আর কোনো প্রসঙ্গেই তো বিজয়ার নামোচ্চারণ দেখি না। বিজয়া বিষয়ক সমস্ত উল্লেখগুলিতে (শঙ্খ ঘোষ একত্রে সাজিয়ে ধরেছেন, পৃ ১০৭-১১০) বিজয়ার চেয়ে কবিকেই

BanglaBook.org

দেখতে পাই বেশি। বিজয়াকে দর্পণ হিসেবে ধ'রে কবি সেই মেয়ের হৃদয়পটে আপনাকেই দেখেছিলেন শুধু।

ভিক্টোরিয়ার লেখায় (যেমন মৈত্রেয়ী দেবী বা রলাঁর লেখাতে) রবীন্দ্রনাথের অগ্নিসদৃশ রূপের বর্ণনার খুঁটিনাটির অন্ত নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে আমরা কোথাও এই মুগ্ধা তরুণীর চেহারার বর্ণনা পাই না, তার রূপলাবণ্যের আভাসমাত্রও পাই না। (অথচ প্রতিমা দেবীর বিবরণে জানতে পারি তিনি ছিলেন অসাধারণ)। বাস্তি হিসেবে বিজয়াকে রবীন্দ্রনাথ চোখ মেলে দেখতে পেয়েছিলেন কি? বিজয়ার বিষয়ে আমরা অনেক খবরই পাই, তাঁর দানশীলতা, তাঁর শিক্ষা, আভিজাত্য, সবচেয়ে বেশি করে জানি কবির জন্য তাঁর সীমাহীন ব্যাকুলতার (যদিও জার্মানির ডাঃ সেলিগের কাছে তিনি উপচিকীর্ষার প্রতিযোগিতায় হেরে যান! —পৃ ১০৮) কথা কিন্তু তাঁর প্রতি কবির মনে কিছু বিশেষ অনুভূতি ছিলো কি ছিলো না, তা জানতে পারি না। কবির জন্য না হয় তিনি সব ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন, কবি তাঁর জন্য কিছুই ছাড়তে পারতেন কি?

অথচ বিজয়া যে কিছুই চাননি, তা ঠিক নয়। ভাষার বাধা তাঁকে যন্ত্রণা দিতো। বারবারই চিঠিপত্রে দেখি তিনি থমকে থেমে পড়ছেন, বলছেন, —'আমার যে ভাষা নেই!' রবীন্দ্রনাথও বলছেন, 'বিজয়া—প্রায়ই আমায় বলত কেন তুমি স্প্যানিশ ভাষা জানলে না; আমি যে সব কথা তোমায় ইংরেজিতে বোঝাতে পারিনে। আমারও দুঃখ হতো খুব, কেন স্প্যানিশ ভাষা শিখিনি।' (পৃ ৫৯)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন ৬৪ বছর বয়সে স্প্যানিশ শেখেননি, তরুণী বিজয়াও তো বাংলা শেখেননি। 'পূরবী'তে কি আছে তা জানবার জন্য 'পাগল' হলেও (পৃ ৭৭) নয়। এই 'কেন'র উত্তর আমাদের খুঁজতে ইচ্ছে হয়।

ভাষা স্প্যানিশ হলেও ভিক্টোরিয়া 'স্প্যানিশ মেয়ে' (পৃ ৬০-৮৪) ছিলেন না। বরং ইউরোপের অঞ্চলছাড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দক্ষিণ আমেরিকাকে স্বকীয় মহিমায় পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করাই সেই সময়ে তাঁর জীবনের আদর্শ ছিলো। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিকে মাতৃমূর্তি বলে মেনে নিয়েও স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া কিভাবে সম্ভব ওকাম্পো ও তাঁর শিল্পী বন্ধুরা সেই পথই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁকে 'সেই স্প্যানিশ মেয়ে বিজয়া' বলছেন তখন তাঁর নিশ্চয় দক্ষিণ মার্কিনী বিজয়ার আত্মসন্ধানী ধ্যানীমূর্তিটি মনে পড়েনি। সেই সত্তাটি কি তাঁর চোখে পড়েছিলো? আর্জেন্টিনার জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে রলাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি বিষয়ে ওকাম্পোর কাতর মন্তব্যে (পৃ ৭১) আমাদের এই ধারণার সমর্থন পাই। রবীন্দ্রনাথের বা তাঁর সহযোগীদের যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিলো না দক্ষিণ আমেরিকাকে বোঝবার জন্য। কবি 'জুলিয়ো চেজারে' জাহাজ থেকে বিজয়াকে লিখছেন যে দক্ষিণ আমেরিকাকে তিনি বোঝেন না, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অন্তরাত্মা বলতে তাঁর বিজয়াকেই শুধু বোঝেন—অথচ আমরা না ভেবে পারি না—কতোটুকু বুঝেছিলেন তিনি বিজয়াকেও? তাঁর প্রতি কতোখানি প্রকৃত মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন কবি?

যে বিজয়া তাঁর ভাষায় বলতে গেলে, কেবল দিয়েই তৃপ্ত, দিয়েই খুশি, তার দানগুলিও কি যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে গ্রহণ ক'রে তাকে চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন কবি? বিজয়ার 'দেওয়া'-গুলিকে সচেতনভাবে, 'নিতে'ও তো দেখি না তাঁকে।

যেমন তিনিই আধুনিক আর্জেন্টিনীয় সঙ্গীত শুনতে চাইলেন বলে বিজয়া ধরে নিয়ে এলেন আর্জেন্টিনার শ্রেষ্ঠ যন্ত্রশিল্পীদের রবীন্দ্রনাথের বৈঠকখানাতে। অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে শোনাতে। কিন্তু কবির সেদিন মন ভালো নেই। তিনি শোবার ঘর থেকে বেরুলেনই না। দরজা একটু ফাঁক ছিলো, সেই ফাঁক দিয়েই কবিকে সঙ্গীতের সম্ভাষণ পাঠালেন আর্জেন্টিনার শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা—শূন্যঘরে বাজালেন দেবুসি, রাভেল, বোরোদিন। কোথায় গেলো ভিক্টোরিয়ার বড়োমুখ?

সাধারণত তিনি ধৈর্য ও সৌজন্যের প্রতিমূর্তি, সেই কবির আচরণের অসঙ্গতিটুকু বিজয়া অবশ্য শিল্পীর খামখেয়াল বলে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে মার্জনা করেছেন। কবিরই দূর কৈশোরে,

BanglaBook.org

বিলেতে ঘটা একটি অপ্রিয় অভিজ্ঞতার উপর দম্ভটা চাপিয়েছেন স্মিত হাসির সঙ্গে। কিন্তু আমাদের মনে একটা খটকা বেধেই যায়। ব্যক্তি হিসেবে কবি বিজয়াকে বিজয়ার জন্যই বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন কি?

ওকাম্পো যখনই চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বকীয় জগতের সঙ্গে আধুনিক পশ্চিমের মনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, রবীন্দ্রনাথ গা করেননি। তাঁর দরজা থেকে ফিরে যেতে হয়েছিলো শুধু হুয়ান হোজে কাস্ত্রোর মতো সঙ্গীতজ্ঞকেই নয়, ব্যর্থ হয়েছিলেন স্বয়ং বোদলেয়ারও। ওকাম্পো কবির কাছে এসেছিলেন অঞ্জলি পেতে নিজেকে পূর্ণ করে নিতে। জিদের অনুবাদে 'গীতাঞ্জলি' (১৯১৪) পড়া থেকে শুরু করে তিনি সমগ্র ভারতীয় দর্শন বিষয়েই শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠলেন। বলাঁর জীবনী থেকে গান্ধীজীর প্রতি (১৯২৩) তাঁর শ্রদ্ধাও একদিক থেকে রবীন্দ্রভক্তি-সঞ্জাত বলা চলে। অথচ ভিক্টোরিয়া যখন তাঁর প্রিয় কবি বোদলেয়ার পড়ে শোনাতে চাইলেন তাঁর উপন্যা কবিকে, ('ভ্রমণের আমন্ত্রণ') রবীন্দ্রনাথ একটু শুনেই অস্থির হয়ে পড়লেন—meubles এই শব্দের জন্য: 'তোমার আসবাবের কবিকে আমার ভালো লাগছে না' বলে উঠে গেলেন। যাঁর রুচিকে, যাঁর শিক্ষাকে কবি সম্মান করতেন, সেই বিজয়ার কবিতা নির্বাচনের মধ্যে যে এমন কোনো শিল্পসত্য থাকা সম্ভব যার সঙ্গে তিনি পরিচিত নন, যার আস্বাদন তাঁকে শিখে নিতে হবে, অনাস্বাদিতপূর্ব সেই শিল্পরস, মদের মতো হয়তো তাতে রুচি তৈরি করতে হয় চেষ্টায়, চর্চায়—এসব কথা কবির মনে এলো না। বিজয়ার কাছ থেকে তাঁর যে কী নেওয়ার ছিলো, তা না বুঝেই, কবি প্রত্যাখ্যান করলেন বিজয়ার নিবেদিত বোদলেয়ার আমরা মর্মাহত না হয়ে পারি না কবির এই অসহিষ্ণুতা দেখে। জটিল আধুনিক ইউরোপের মনকে কবি চিনে উঠতে পারেননি, শুধু চিনতে চাননি বলেই, এই ভুল ফিরে এসেছিলো তাঁর নিজের ঘাটেই—ইওরোপের কাছে নিজের স্বরূপ তিনি যেচে ধরতে পারেননি। আত্মতুষ্টি সকল মানুষের পক্ষেই কালগ্রাস, বিশেষত শিল্পীর পক্ষে। সৃষ্টিকর্মে চিরঅতৃপ্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনে কিন্তু এই আত্মতুষ্টি মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিতে পেরেছে তাঁর মানবিক সম্পর্কগুলির একমুখিতায়।

বিদেশিনী বিজয়া সমানেই কবির নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে কবিকে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছেন। কবি তাঁকে জানাচ্ছেন, তাঁর ক্রমনিঃসঙ্গতার কারণ; রাখছেন নিঃশর্ত মৈত্রীর শর্তটি (পৃ ১৫৯) বলছেন সর্বগ্রাসী বন্ধুতাকে তিনি ভয় করেন তাই নতুন বন্ধুতা থেকে তিনি পিছিয়ে আসেন (এখানে কবির ভাষাটি লক্ষণীয় 'Whenever a new *gift* of friendship comes my way' বন্ধুতাও দ্বিপাক্ষিক নয়, তিনি এখানেও গ্রহীতার ভূমিকা নিচ্ছেন) তিনি চান বন্ধনহীন গ্রন্থি। বিজয়া তাঁর সেই শর্ত পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে মুক্তির মধ্যেই বন্ধু হয়ে থাকার আশ্বাস দিচ্ছেন, 'গ্রহণ করিবে যত ঋণী তত করিবে আমায়' এই মনোভঙ্গিতে (পৃ ১৫১-১৬০)।

কবি কিন্তু বিজয়ার দিক থেকে বিজয়াকে জানতে বা চিনতে সচেতন প্রয়াস পাননি। তাঁর জাতীয় সংস্কৃতি, তাঁর ব্যক্তিগত রুচি, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর শিল্পভাবনা, তাঁর ভাষা—কিছুই তিনি নিজের মধ্যে গ্রহণ করেননি। খেয়ার জাহাজে কবি লিখছেন বিজয়াকে—'আমার তো পর্যটকের স্বভাব নয়। নূতন একটা দেশকে বুঝে নেবার মতো উদ্যম বা সামর্থ্য কোনোটাই আমার নেই' (পৃ ৭৬)। এই স্বীকারোক্তি বিনয়মাত্র নয়। এমন কি বিজয়ার প্রেমও ('your ministration of love', পৃ ১৫৭) তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেনি বিজয়ার অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে। তিনি বিজয়াকে বুঝে নিতেন নিজের মতো করে, —সে ছবি প্রকৃত বিজয়ার সঙ্গে মিলুক-না-মিলুক। যেমন ধরা যাক, কবির অভ্যাগত অতিথিদের মধ্যে বিজয়ার উপস্থিত না থাকার ব্যাপারটা। বহু বছর পরে রানী চন্দর কাছে কবিকে এর যে ব্যাখ্যাটি দিতে শুনি, শ্রেণীগত আভিজাত্যের কারণে বিজয়া থাকতেন পর্দানশীন, ওকাম্পো তাতে রীতিমতো বিস্মিত ও দুঃখিত। তাঁর স্বপ্রণত ব্যাখ্যার সঙ্গে কবির ধারণার কোন মিল নেই। এখানেও অবশ্য ওকাম্পো তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধরনে নিজেই

BanglaBook.org

কবির বিভ্রান্তির পক্ষে যুক্তি খাড়া করেছেন—ভারতবর্ষের শ্রেণীবিভাজিত সামাজিক মানসিকতাকে দায়ী করছেন, কবির ওপর দায় চড়াতে তিনি রাজি নন।

কবির সব ত্রুটিকেই বিজয়া লঘু পরিহাসের সুরভিত দক্ষিণের হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন, শিল্পীর খেয়াল বলে—'মাঝে মাঝেই উনি ব্যবহার করতেন শিশুর মতো, কবিরা যেন শৈশবের কোনো কোনো লক্ষণ পুরোই বাঁচিয়ে রাখেন তাঁদের আচরণে। মহাপুরুষদের মহিমার একটা দিক কিন্তু তাঁদের এই শিশুসুলভ ধরন, অন্য সবার মতো তো নন তাঁরা। যদি কেবলই ছিমছাম, বিজ্ঞ বা প্রমাদহীন হতেন তাঁরা, তাহলে তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করতাম আরো বেশি, কিন্তু ভালোবাসতাম কম। ফরাসি লেখকেরা যেমন বলেন, পূর্ণতা হলো নির্জীবতা' (পৃ ৬৬)।

বিজয়ার ভালোবাসা যতোটা গভীরভাবে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ অধিকার করেছিলেন, মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা হয়তো সে-তুলনায় কিছুটা ব্যাহত হয়েছিলো। এই সব ছোটো ছোটো অসম্পূর্ণতার উল্লেখ থেকে এমন সংশয় জাগে।

ভিক্টোরিয়ার নিজের মনোভাবের মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম স্ববিরোধ কোথাও কোথাও উঁকি মারে। যে রবীন্দ্রনাথের জন্য বিজয়ার এত আকুলতা, বহুভাষাবিদুষী সেই নারী কি তাঁর উপাস্যের নিমিত্ত অন্তত একটি ভাষা আয়ত্ত করে নিতে পারতেন না? তাঁকে উদ্দিষ্ট 'পূরবী' পড়বার লোভেও অন্তত? অথবা কবির আপন ভাষায় কবির কথাগুলি শুনতে?

১৯২৪-এ যিনি 'যে কোনো একটি কুকুরের মতো' (পৃ ১৫৮) কবির দরজার বাইরে মেঝেয় শয়ান হ'তে রাজি, ১৯৩০-এ তিনিই অক্সফোর্ড বক্তৃতার সময়ে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গিনী হবার আহ্বান রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে পেয়েও সাড়া দিতে পারছেন না। সময় গড়িয়ে গেছে এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে—এক বৃহত্তর কৃত্যের ডাক এসেছে। তাঁর প্রধান উৎসাহ তখন আর রবীন্দ্রনাথে নিবদ্ধ নয় (পৃ ৯৪), *Sur* নামে একটি পত্রিকা বের করার প্রস্তুতিতে তিনি তখন মগ্ন, মার্কিনদেশের ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্কের সঙ্গে। যদিও তার ত্রিশবছর পরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে বৃদ্ধা ভিক্টোরিয়া লিখছেন—'এখনো আমি জোর করে বলতে পারছি না যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী না হয়ে সেদিন ঠিক কাজ করেছি। সেই ভ্রমণ আমাকে সেদিন পৌঁছে দিতে পারত একেবারে ভারতবর্ষ পর্যন্ত' (পৃ ৯৫)। ত্রিশ বছর বয়সে যেটা মনে ভাবতে ভালো লাগছে তাঁর (যৌবনের স্মৃতিমন্থন করতে বসলে অনেক পদক্ষেপই পুনশ্চারণ করতে ইচ্ছে হয়), তরুণী ভিক্টোরিয়ার মূল্যবোধে কিন্তু পাল্লার সেদিক তখন ভারি হয়নি। যেমন বিজয়া কেন বাংলা শেখেননি এই 'কেন'র জবাব নেই, তেমনি বিজয়া কেন 'নিমন্ত্রিত' হলেন না, এমন দুর্লভ ভ্রমণসাহচর্যের নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন কী করে, এবং কেন, তার উত্তর আমরা এ-গ্রন্থে পাই না।

৫

এই বইয়ে যে-প্রসঙ্গটি সবচেয়ে জরুরি বলে আমার মনে হয়, ওকাম্পো তাঁর সমগ্রিক গুরুত্ব নিজে উপলব্ধি করেছিলেন কিনা তার ইঙ্গিত এখানে নেই। শঙ্খ ঘোষও এই প্রসঙ্গটিতে হাত দেননি। একটি ছোট্ট ব্যক্তিগত ঘটনার ছিদ্রপথে প্রকাশ পেয়েছে পশ্চাত্ত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌল অনৈক্যের কারণটি। রবীন্দ্রচরিত্রের এই ভ্রান্তি, এই মারাত্মক অবুঝপনাই পশ্চিমে তাঁর যশোচক্রকে ১৯১৩-এ ঋজু ঊর্ধ্বগতি থেকে ক্রমশ ঘুরিয়ে দিয়েছিলো ১৯৩৭-এর অধঃপতনে। এই আত্মঘাতী ত্রুটিই রবীন্দ্রনাথকে প্রতীচ্যদেশে প্রতিষ্ঠিত হ'তে দেয়নি। তাঁর উদয়ও ঘটলো এক ভ্রান্ত দিগন্তরেখায়, আর অস্তমিতও হলেন এক অপতমসায়। পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথের মূল ট্রাজিডির চাবিকাঠিটি বিজয়ার একটি ছোট, মর্মন্তুদ কাহিনীর মধ্যে হঠাৎ পেয়ে যাই।

চাপাদমালালের এক মায়াবী বিকেলে কবির ঘরে এসেছেন বিজয়া, দেখেন কবি সদ্য একটি

BanglaBook.org

কবিতা লিখে শেষ করেছেন (শঙ্খ ঘোষের মতে, সম্ভবত 'কঙ্কাল'), টেবিলে রয়েছে। বিজয়া ধ'রে বসলেন—অনুবাদ করে শোনাতে হবে। "উনি অনুবাদ করতে শুরু করলেন প্রতিটি শব্দ ধ'রে ধ'রে, একটা জগৎ খুলে গেল আমার সামনে। বললাম পরে যেন এটি লিখে রাখেন। একেবারে হঠাৎ, যেন দৈবে, সরাসরি স্পর্শ পাওয়া গেল ওঁর কবিপ্রকৃতির, তাকে ধরতে হলো না অনুবাদের দস্তানাঘেরা হাতে।...পরদিন সকালবেলা সেই কবিতাটি তিনি দিলেন আমায়, তাঁর স্পষ্ট পরিমিত ইংরেজি অক্ষরে লেখা। সঙ্গে সঙ্গেই প'ড়ে নিলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম না আমার মনোভঙ্গ। ব'কেই উঠলাম, বললাম: 'কাল যা পড়েছিলেন তার অনেকটাই তো দেখছি নেই এর মধ্যে। এমন-সব ব্যাপার ছেড়ে দিয়েছেন, যা ছিল কবিতাটির প্রাণ!' উত্তরে জানলাম যে ওঁর মনে হয়েছে সেসব অংশ পশ্চিমবাসীদের ভালো লাগবে না হয়তো। এক ঝলক রক্ত উঠে এলো আমার মুখে, কেউ যেন মেরেছে আমাকে। কবি অবশ্য...আমাকে নিশ্চয় অপমান করতে চান নি।...আজ খানিকটা তীব্র স্বরেই বলতে হোলো যে একটা সর্বনেশে ভুল করছেন উনি।" (পৃ ৯২-৯৩)।

এই ভুলের সর্বনাশ যে কতো গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে, তা আজকের পশ্চিম দুনিয়ার রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হয় বয়স্কের প্রতিক্রিয়ায় থাকে কিছুটা অবহেলা, কিছুটা ভদ্রতা মেশানো। একি করুণা? নতুনদের মধ্যে দেখা যাবে হয় অজ্ঞতা নয়তো খানিক জিজ্ঞাসার ধরনে ধর্মীয়, পূর্বাভাস আগ্রহ। কেন হলো এই সর্বনাশ? কে ঘটালো এই বিভ্রাহনন? বিজয়া বলেছেন—'প্রাচ্যের মনোভাব আমরা কতটুকু ধরতে পারি এ নিয়ে বেশ খানিকটা সন্দেহ ছিল রবীন্দ্রনাথের' (পৃ ৯১)। কিন্তু সেই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য একবারও চেষ্টা করেননি তিনি একবারও চেষ্টা করেননি তাঁর শক্তির সম্পূর্ণ ওজনটা পশ্চিমের জানলায় ছুঁড়ে মারতে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতো জানলার কাঁচ, সব অবরোধ, সব অদৃশ্য আড়াল যেতো ঘুচে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রকৃত দ্বৈরথে মুখোমুখি করানো হয়নি পশ্চিমের সাহিত্য মানস। রবীন্দ্রনাথ অনিশ্চিত পায়ে এগিয়ে গেছেন, সন্তর্পণে টোকা দিয়েছেন জানলায়। কাঁচের ওপার থেকে হয়েছে ঝাপসা পরিচয়। আলতো আলাপচারিতা। কি গ্রহণে কি বর্জনে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে ভুল বোঝার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন, তার ভালো-না-লাগার ভয়কে উত্তীর্ণ হতে পারেননি বলে।

রবীন্দ্রনাথের আত্মঘাতী অনুবাদ তাঁর শত্রু, কবিকে স্বরূপে উদ্ভাসিত হতে দেয়নি পশ্চিমে, উলটে উপস্থিত করেছে এক ছদ্মবেশীকে। যখন দেখি 'শাজাহান' কবিতা অনুবাদ করার ফলে শুকিয়ে গুটিয়ে দশ পঙ্‌ক্তিতে দাঁড়িয়েছে, তখন বিজয়ার মতোই আমাদেরও কি মনে হয় না যেন মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এল, যেন কেউ মেরেছে! তিনি যেমন বিজয়াকেও পুরোটা দেখতে পাননি তেমনি দেখতে পাননি ইয়োরোপকেও।

না-দেখার কারণ তাঁর অ-সচেতন দৃষ্টি। প্রসঙ্গত সবিনয়ে প্রকাশ করা যায় আরো এক সংশয়। পশ্চিমে কবিকে ভুল বোঝার মূলে এক সংস্কৃতির বিরোধ যতটা দায়ী (মারি লাগো যাকে বলেন 'ইম্পারফেক্ট এনকাউন্টার') ততই দায়ী ছিলো ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে যথোচিত সমতার অভাব। কবির বিদেশী বন্ধুত্বগুলির পরিণতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শুধু বিজয়াই নন, ইয়েট্‌স, পাউণ্ড, রটেনস্টাইন সকলেই যে ক্রমশ দূরে সরে গেলেন তার মূলে হয়তো কিছুটা কাজ করেছিলো কবির স্বভাবের এই শিল্পীসুলভ আত্মমুখিতা। তিনি সম্পর্কগুলি অন্যদের দিক থেকে হয়তো ঝতিয়ে দেখার চেষ্টা করেননি, ফলে অজানিতে ঘটিয়েছেন তাঁদের আশাভঙ্গ। চতুর্দিকে শাণিত অসাম্যেই তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন স্বদেশে, —তাঁকে ঘিরেছিলো বেদীর উপরের নিঃসঙ্গতা।

কিন্তু স্বদেশ তাঁর কাছে এতই ঋণী যে এই ফাঁকটুকু ফাঁক হয়ে ধরা পড়েনি, অসামান্য প্রাপ্তির প্রাচুর্যে ঢেকে গিয়েছিলো। কিন্তু বিদেশে তো সেই পরিপূরক অমৃতরসের উদ্বৃত্তধারা ছিলো না, তাই সেখানে কবির ক্ষতি হয়ে গিয়েছে অপরিমেয়।

BanglaBook.org

অথচ নিরহংকার প্রণতিতে, সর্বস্ব মেলে ধরার আকুলতায় রবীন্দ্রনাথকে হার মানাতে পারেন ক'জন সন্ত? কিন্তু সে-ত্যাগ কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই প্রাপ্য। প্রকৃতপক্ষে আত্মনিবেদিত ছিলেন তিনি শুধু এই একটিই জায়গায়, যেখানে ছিলো না আশাপূরণ—আশাভঙ্গের কোনো প্রশ্ন। যেখানে একমুখিতা ভিন্ন অন্যবিধ সম্পর্কের পথ নেই।

এবার অনুবাদ প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কথা বলি। শঙ্খ ঘোষ বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, বা সাঁ জঁ পের্স প্রভৃতির উদ্ধৃতির মূলগুলি সূত্রাবলিতে দিয়ে, মূল বইতে ব্যবহার করেছেন বাংলা অনুবাদ, এটি ভারি সুরুচিকর হয়েছে। কিন্তু অন্যের করা অনুবাদ ব্যবহারে সর্বদাই কিছু ঝুঁকি থাকে। বুদ্ধদেব বসুর কৃত বোদলেয়ার যেমন যোগ্য নির্বাচন হয়েছে, র‍্যাঁবোর বেলায় ঠিক তেমনটি মনে হলো না। শুধু নির্ভুল হলেই যে কবিতার অনুবাদ সার্থক হয় না, তারই যেন উদাহরণ এই 'Elle est retrouv'ee. Quoi? L' Eternite'''-র অনুবাদ 'এবার ফিরে পেয়েছি তারে। কারে? শাশ্বতীরে।' আমার কানে অন্তত এর চেয়ে ভাল শোনায় এমন অনুবাদও বাংলাতে আছে—'এবার খুঁজে পেয়ে গেলাম। কী নাম? শাশ্বতী।' ('র‍্যাঁবো, ভের্লেন এবং নিজস্ব', শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৭০)।

ভিতরে ছ'সাতটি সুন্দর, কৌতূহলোদ্দীপক ছবি আছে, অর্জেন্টিনার, রবীন্দ্রনাথের এবং বিজয়ার। ওকাম্পোর মূল বইতে এতগুলি ছবি ছিল না। দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকলে, বিজয়া কলমের আঁচড়ে আপন মুণ্ডচ্ছেদ করেছেন কয়েকটি ছবিতে। তিনি কি নিজেকে কবির সঙ্গে চিত্রিত হবার যোগ্য মনে করতেন না, নাকি অন্য কোনো গূঢ় অভিমান ছিল? রহস্যময়ী বিজয়া আমাদের ভাবনা মন্থন করে চলেন।

সম্পাদক যখন শঙ্খ ঘোষ তখন সম্পাদনার গুণের দিকটি আমাদের আশ্চর্য করে না, কিন্তু ত্রুটির দিকটি আহত করে। শ্রীমতী ওকাম্পো যে ফাশিজমে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন, এবং ইটালী ফাশিস্টদলের কর্মী হয়ে নানা প্রত্যক্ষ কাজে লিপ্ত ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতবর্ষে যেতে পারেননি—এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা জরুরী ছিল। দুঃখের বিষয় ব্যক্তিপূজার ঝোঁক এবং অতীন্দ্রিয় আদর্শের হাতছানি অনেক সময়েই পশ্চিমের অনেক বিশিষ্ট মানুষকে ফাশিজমের দিকে টেনে নিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্ত্য-যোগাযোগের ইতিহাসে একাধিকবারই ফাশিজম-বাদী ভক্তের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখি, অথচ রবীন্দ্রনাথ কখনো এ বিষয়ে খুব একটা আত্মসচেতন ছিলেন বলে মনে হয়নি। তাঁর মতো সূক্ষ্মচেতনার ব্যক্তির পক্ষে এই বুঝতে-না-পারার দিকটি বড় বিস্ময়কর ঠেকে। কবির তীব্র, স্পর্শকাতর শিল্পচেতনো বিজয়ার ফাশিস্ট মনোভঙ্গি, সেই সম্পর্কিত জীবনবোধ, মূল্যবোধগুলি কি কোনোরকমেই ছায়াপাত করেনি? এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। কবি শঙ্খ ঘোষও এই বইয়ের টীকা ভূমিকার কোথাও বিজয়ার ফাশিজমের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন বলে খেয়াল হলো না। যখন তিনি *Sur* পত্রিকার উল্লেখ করছেন, তখন তার ফাশিস্ট ঝোঁক নিয়ে কিছু বলেননি। রয় ক্যাম্পবেল, বোরহেস প্রভৃতি ফাশিস্টবাদী লেখকরা যে বিজয়ার বন্ধু একথা আজ আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা খুব নিখুঁত খুঁটিয়ে চিনতে চাই, যেমন আমাদের জানা দরকার আপন আপন শোণিত সংস্কার, আপন পিতৃপরিচয়।

BanglaBook.org

বজ্রগর্ভ কুসুম : রাজা থেকে রক্তকরবী

১

আপাতদৃষ্টিতে আকাশ পাতাল তফাত হলেও প্রকৃতপক্ষে 'রাজা' এবং 'রক্তকরবী'র মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে আত্মীয়তা যথেষ্ট। যেন এরা একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন রূপ—আর বিষয়টি হলো ফুলের কোমল অন্তরে বজ্রনির্ঘোষ। বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করতে পারি : (ক) দুটি নাটকে ব্যবহৃত প্রতীক ও প্রতিমায়, (খ) তাদের থীমের গঠনশৈলীতে, এবং (গ) দুটি নাটকের মধ্যবর্তী সময়সূত্র বেয়ে চিন্তার পরিণতির ধারাটিও নজর করা যায়—মনে হয় দুয়ের মধ্যে কোথায় একটি অলক্ষ্য বাঁধন রয়েছে।

'রাজা' ১৯১০-এ বেরিয়েছিল, 'রক্তকরবী' লেখা হলো ১৯২৪ এ, প্রকাশিত হলো ১৯২৬-এ। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক বদলেছেন। ইংরিজিতে রবীন্দ্রনাথ টেগোর নামে এক বিশ্বকবির জন্ম হয়েছে, যিনি নোবেল পুরস্কার জয় করেছেন। মোট সাতবার বিদেশে ঘোরা হয়ে গিয়েছে তাঁর, পশ্চিমে যশোরবি উদিত এবং প্রায় অস্তমিতও হয়ে এসেছে, বিদেশের নাটইহুডে সম্বর্ধিত এবং স্বদেশের গরজে তা প্রত্যাখ্যান করে মহিমান্বিত হয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে গান্ধিজীর সঙ্গে পরিচয়, হিজলী জেল এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাবলি। যে রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্য খেয়া গীতাঞ্জলি ডাকঘর রাজা লিখেছেন এমনকি গোরাও, সেই রবীন্দ্রনাথ থেকে সমুত্থিত হয়েছেন আরেক রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী যাঁকে সম্বোধন করেছেন 'গুরুদেব' বলে, যিনি সমাজ সম্বন্ধে আরও সচেতন, 'শোষণ' ইত্যাদি শব্দ যাঁর কলমে চলে এসেছে আপনা থেকেই—'কর্ষণজীবী' আর 'আকর্ষণজীবী'র মধ্যে মারাকাটা যাঁর কাছে স্পষ্ট, যন্ত্রসভ্যতা এবং কৃষিসভ্যতার মধ্যে ভারতবর্ষের পক্ষে কোন্‌টি বেশি বাঁটি সেটি নিয়ে যিনি ভাবিত, বিমর্ষ, ক্রুদ্ধ।

'গীতাঞ্জলি' পর্বে লেখা 'রাজা'র কেন্দ্রে আছে এক গভীর অতীন্দ্রিয় ধ্যান ; 'রক্তকরবী' তার সামাজিক অর্থনৈতিক সচেতনতা নিয়ে অনেক বেশি মাত্রিক আবেদনে সমৃদ্ধ। তথাপি, স্বীকার করতেই হয়, যে এডওয়ার্ড টমসন সাহেব 'রাজা'তে যে গণতন্ত্রের বীজ ('আমরা সবাই রাজা') দেখতে পেয়েছিলেন তা কষ্টকল্পিত ছিল না, এবং একজন কবি দার্শনিকের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়বোধ অনিবার্য, 'রক্তকরবী'ও তা থেকে মুক্ত নয়। দুটি নাটকের মধ্যবর্তী কালে কবির জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির, এবং মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কোনো মৌলিক পরিবর্তন কিন্তু হয়নি। সাধারণভাবে এই পর্বে কবি মুখ্যত যে সব প্রতীক ও প্রতিমা ব্যবহার করেছেন তাদের ব্যাপক বিশ্লেষণ করলেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু এই প্রবন্ধটিতে আমি সেই ব্যাপক বিশ্লেষণে যাব না, কবির জীবনের দুটি বিভিন্ন সৃষ্টিশীল পর্বে রচিত দুটি মাত্র নাটকেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব।

নাটক দুটির পাত্রপাত্রীরা দুটি ভিন্ন জগতের অধিবাসী, তারা দুই জগতের মানুষ। আর মঞ্চে এই দুই জগতের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ঠাঁইবদল হয়ে চলে। কিছু চরিত্র পার্থিব, এই ধুলোমাটির বাস্তব জগতের বাসিন্দা, যাদের বলা যায় ফিলিস্টাইন—আর কোন কোন চরিত্রের বাস আত্মিক বোধের সচেতন ভুবনে, তারা যেন অন্য গ্রহের মানুষ। আর এই দুটি জগতের ব্যবধান ঘোচাতে সেতুবন্ধ স্বরূপ রয়েছে কিছু উভচর, যাদের ভূমিকা দূতের। দুটি জগতের মূল্যবোধ আলাদা, তাই তাদের ভাষাও ভিন্ন। যেমন :

ক. সুদর্শনা। তোর সব কথা ওই একরকম। কিছু বোঝা যায় না। ('রাজা')

খ. গোকুল। ওর রকম সকম কিছুই বুঝিনে। ('রক্তকরবী')

এই দুই ভুবনের মধ্যে আদানপ্রদানের সম্পর্কটি বড়ো সোজা নয়। তবু, বিষয়বস্তু যখন আধ্যাত্মিক, অতীন্দ্রিয়, তখনও সাধারণ মানুষের সংখ্যাধিক্য দিয়ে নাটক ভরতে রবীন্দ্রনাথ কসুর করেননি,

BanglaBook.org

'রাজা'তেও তাদেরই সংখ্যাধিক্য বেশির ভাগ দৃশ্যে। কবির মূলত মানবমুখী চেতনার প্রমাণ এখানে।

তেমনি, ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের যে নাড়ীর যোগ, বিশ্ববীণারবের প্রতি বিশ্বজনের যে অপার মোহ, যে ছন্দ বিশ্বসৃষ্টির মূলে সেই ছন্দই যে বিশ্বমানবের রক্তে, তার কথা কবি সব রচনাতেই বলবেন। যা তিনি ঋতু বিষয়ক গীতিনাট্যগুলিতে, পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায়ের সমস্ত গানে বারবার প্রকাশ করেছেন, 'রাজা' ও 'রক্তকরবী'তেও তা অপরিবর্তিত থাকে। 'রক্তকরবী'তে তা আরও পরিণত, এবং ধরা ছোঁয়ার সীমার মধ্যে চলে এসেছে। 'রাজা'তে যা ছিল অস্পষ্ট, বিমূর্ত, 'রক্তকরবী'তে তাই মূর্ত, স্বরূপ। সেই অদৃশ্য এবং অদৃশ্য শক্তি, কোমলে-কঠোরে যার দ্বন্দ্বমধুর লীলা প্রকাশ পেয়েছে 'রাজা'র বজ্রগর্ভ নামের প্রতীকে—'রক্তকরবী'তে এসে তাই অপরাজিতা নন্দিনীর দৃশ্যময়তার বাস্তব রূপ পেয়েছে। সেই লাল ফুলটি হলো রক্তকরবী, যার কোমল পাপড়ির মর্মে লুকোনো আছে অগ্নি। সেই ফুলই নন্দিনী।

তেমনি তাঁর আগেকার সঙ্গীত ও কবিতায় যে সব বিমূর্ত ভাব ছিল, 'রক্তকরবী'তে এসে তা হয়েছে স্পষ্টতর, ব্যক্ত হয়েছে, রূপায়িত হয়েছে চরিত্রের মাধ্যমে। 'রাজা'তে বাউলের গানে যে সোনার হরিণটি 'পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় যায় না তারে বাঁধা। সে যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে লাগায় চোখে ধাঁধা'—সে-ই যেন 'রক্তকরবী'তে রঞ্জন হয়ে আসে, সর্দারদের পরানো শেকল খুলে ফেলে, গরাদ ঠেলে ফেলে পালিয়ে বেড়ায়।

এইভাবে, দুটি নাটকের অন্তরাত্মার মিল তাদের মৌল ভাবনায়, ধীমে, ভঙ্গিতে যদিও পার্থক্য ঢের, নাটকীয় কৌতুক আলাদা, একটি ঈশ্বরমুখী অন্যটি মানবমুখী। বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচ্য হবে এই তিনটি দিক—ক. ধীমের সাধর্ম্য, খ. অভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমার ব্যবহার, এবং গ. তাদের প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা, দুটি নাটকে।

২

দুটি নাটকের ধীমগত কাঠামোর তুলনা করতে বসে প্রথমেই বলে রাখি কী কী দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। দুই রাজার অদৃশ্য উপস্থিতি, মুখ্য উপস্থাপনার কারণে একনজরে তুলনীয় মনে হতেই পারে, যেহেতু দুজনেই 'রাজা'-নামধারী এবং দুজনেই মঞ্চে না এসে অলক্ষিতে স্বরবিস্তার করেন। কিন্তু এই আপাত সাদৃশ্যটুকু নিয়ে যদি প্রতিতুলনায় নামতে যাই তবে তা হবে দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ। প্রকৃতপক্ষে এই দুই চরিত্রের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না। মকররের দঁত যে ব্যক্তিত্ব প্রতীক, তার সঙ্গে পদ্মের মর্মস্থলে বজ্রধারী রাজাটির কিসের মিল? মকররাজ একজন সাধারণ মানুষ যিনি নিজেকে জাহির করতে চান অতিমানবিক রহস্যময় পুরুষ হিসেবে, আর 'রাজা'র রাজা সত্যিই এক রহস্যময় শক্তিমান পুরুষ, যিনি নিজেকে মানবিক মমতায় জড়াতে চান। একজনের ক্ষমতা নেই লোকোত্তীর্ণ হবার, আর অন্যজন লোকালয়ে নিজেকে বাঁধতে ব্যাকুল। মানুষের জন্য দেবতার যে মরমী আকাঙ্ক্ষা ('আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'), 'রাজা'তে তারই প্রকাশ, আর দেবতা হতে চাইলে মানুষ যে দানব হয়ে পড়ে, মকররাজে প্রকাশিত সেই ট্রাজিক সত্য। রাজার অন্ধকার কক্ষ একটি পরম শক্তি যা বহিরঙ্গের মোহ এবং বাহ্য রূপের বিভ্রমকে অপসারণ করে, আর মকররাজের 'বাহিরদেউলে'র 'জালের জানলা' একটি বিরুদ্ধ শক্তি যা সত্যকে আড়াল করতে মোহ সৃষ্টি করে। অন্ধকার কক্ষ সত্যকে উদ্ঘাটন করে, মোহ নির্মূল করে দেয়। একজনের ক্ষমতা প্রেমের, সৃষ্টির, ছন্দের — অন্যের ক্ষমতা অপ্রেমের, ধ্বংসের, ছন্দপাতের। দুটি নাটকে যদিও আশ্চর্য মিল, সে মিল কিন্তু রাজায়-রাজায় নয়। বরং নাটক দুটিতে রাজাদের ভূমিকা পরস্পরবিরোধী।

লক্ষণীয়, যে নাটক দুটির কোনটিই প্রধান চরিত্রের নামাঙ্কিত নয়। প্রধান নাটকীয় চরিত্র বলতে

আমরা বুঝি সেই চরিত্রটি, নাটকের ঘটনাবলি যাকে পরিবর্তিত করে, মঞ্চের উপরেই যে চরিত্রে ঘটে একটি বিশেষ উদ্‌ঘাটন, একটি নাটকীয় রূপান্তর কিন্তু দুটি নাটকেরই এমন চরিত্রের নামানুসারে নামকরণ হয়েছে যারা নিজেরা অপরিবর্তিত থেকে অন্য চরিত্রের নাটকীয় পরিণতি ঘটানো সম্ভবপর করছে।

'রাজা'র কাহিনী রাজার নয়, রানী সুদর্শনার। তাঁরই আশা-আকাঙ্ক্ষা অভিমান। তাঁর প্রেমের অহঙ্কার, তাঁর যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, এবং সফলতার উপাখ্যান। সত্য, তারই মধ্যে মিশে আছে রাজারও স্বপ্ন, রাজারও আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিমান, কিন্তু 'রাজা' নাটকে রাজা চরিত্রে কোনও নব উন্মোচন ঘটে না। ঘটে না কোনও নাটকীয় পরিণতি। রাজা নাটকের আরম্ভেও যেমন, সমাপ্তিতেও তেমনি, স্থির। এ নাটক তাঁর বিকাশের ছবি নয়, তিনি শুধু রানী সুদর্শনাকে আত্মস্থ করিয়ে দেবার কাজে লাগেন। তেমনি 'রক্তকরবী' 'নন্দিনী নামক একটি কন্যার আলেখ্য' নয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন এ নাটকের নাটকীয় সংঘাত গড়ে উঠেছে একজন নামহীন রাজাকে ঘিরে—জালের জানলার অন্তরালে যিনি স্বেচ্ছাবন্দী, প্রকৃতি ও সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁরই পৌরুষের দম্ভ, তাঁর অশেষ নিঃসঙ্গতা, তাঁর বিভ্রান্তি, তাঁর যন্ত্রণা—এবং পরিশেষে তাঁর সত্য উপলব্ধির সফলের আখ্যান—'রক্তকরবী'।

সুদর্শনা যেমন তার ইন্দ্রিয়ের বেড়াজালে বন্দী, মকররাজ তেমনি তাঁর শক্তির দম্ভের জালের বেড়ায় আবদ্ধ। মিথ্যা অহংকারের মোহ এবং তার ফলে আত্মবঞ্চনার যন্ত্রণাবিদ্ধ দুটি স্বেচ্ছানিজান প্রাণ—শেষ পর্যন্ত সত্যের প্রবল আঘাতে ঘটিয়ে তাদের মোহমুক্তি, সেই আঘাতই তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে নম্রতা, আত্ম-উপলব্ধি এইভাবে, অনুশোচনা এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত অহং-ত্যাগের মাধ্যমে তারা চূড়ান্ত মুক্তি পেয়ে যায়। দীর্ঘ যন্ত্রণা এবং প্রতীক্ষার শেষেই পরম মিলনের লগ্ন আসে। দুটি চরিত্রেরই অসীম পরিবর্তন—সাময়িক রূপান্তর ঘটে গেছে, রাজোচিত মহিমা তখনই তাঁরা অর্জন করলেন যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিথ্যা রাজদম্ভ তাঁরা বিসর্জন দিলেন। সুদর্শনা যতদিন তাঁর রাজবেশ ত্যাগ করে দাসীর বসন তুলে না নিচ্ছেন ততদিন তাঁর প্রেমের মুক্তি আসে না আর মকররাজ যখন তাঁর ধ্বজদণ্ড ভেঙে ফেলে প্রজাদের পক্ষে এসে দাঁড়ান, তখনই তিনি প্রজাপালক রাজা। এই আত্ম-উপলব্ধির পথটা অতি যন্ত্রণাময়, জটিল যেন জন্মযন্ত্রণার সামিল। দুটি চরিত্রের ভ্রান্তিমোচনে, তাদের সত্য দর্শনে, তাদের নবজন্মেই নাটক দুটির উপসংহার। 'রাজা' রানী সুদর্শনার উত্তরণের কাহিনী, আর 'রক্তকরবী' মকররাজের উত্তরণের উপাখ্যান।

'রাজা'তে রাজাটি, এবং 'রক্তকরবী'তে রক্তকরবীটি, অর্থাৎ নন্দিনী, প্রগতিরিহীন স্থাণু চরিত্র। না আছে তাদের মধ্যে পরিবর্তন, না পরিণতি। নাটকের শুরুতেও তাঁরা ঠিক যেমনটি ছিলেন সমাপ্তিতেও ঠিক তেমনি একটি অবিচল লক্ষ্য সামনে রেখেই নাটকে তাঁদের প্রবেশ, এবং প্রস্থান সেই লক্ষ্য অর্জনের মুহূর্তে। দুজনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য, বন্ধ দ্বারগুলি খুলিয়ে দেওয়া।

রাজা। 'খোলো খোলো দ্বার/রাখিও না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে'—('রাজা')।

নন্দিনী। 'দরজা খোলো, আমি ভিতরে যাব'।—('রক্তকরবী')।

'রাজা'র প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার কক্ষে রাজা চেয়েছিলেন রানী সুদর্শনা আপনা হতে তাঁর কাছে আসুক ('দাও সাড়া দাও এইদিকে চাও। এসো দুই বাহু বাড়ায়ে') শেষ দৃশ্যে সুদর্শনা স্বয়মাগতা, রাজার দুয়ারে ('আমাকে সেবার অধিকার দাও।') সেবার অধিকার প্রার্থনায়। 'রক্তকরবী'র প্রথম দৃশ্যে, জালের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে নন্দিনী অধ্যাপকের কাছে কী বলেছিল? 'ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে ভিতরের মানুষটাকে উদ্ধার করি।' শেষ দৃশ্যে আমরা কী দেখি? ঠিক নন্দিনী যা চেয়েছে, তাই ঘটল। জাল ছিঁড়ে ধ্বজা ভেঙে মুক্ত হয়ে আসে প্রকৃত মানুষটি, সত্যের আশ্রয়ে, প্রেমের আলোতে।

রবীন্দ্রনাথের এই মোহমৃত্যুর জাল ছিন্ন করার চিত্রকলা নতুন নয়, অনেক আগেই 'নৈবেদ্যে'

দেখেছি—'এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভস্মজাল/এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল/ মৃত আবর্জনা। ওরে, জাগিতেই হবে...।' কি সুদর্শনা, কি মকররাজ, দুজনেরই পরিণতি এক—এই জড়ের জঞ্জাল, ভ্রান্ত মূল্যবোধের মৃত আবর্জনা ছিঁড়ে করে জাগরিত হওয়া। আর সেখানে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যান, একদিকে রাজা—আর অন্যদিকে নন্দিনী এবং রঞ্জন।

তাহলে, দুটি নাটকের প্রাথমিক কাঠামোর স্পষ্টই সমান্তরাল একটি নকশা ফুটে ওঠে। দুটি মানুষের অহংবোধ, আত্মছলনা, এবং আত্ম উপলব্ধির নাটক—মিথ্যা এবং সত্যের সংঘাত, প্রতীক্ষায় এবং যন্ত্রণায়, অনুশোচনা এবং মিলনে যার পরিসমাপ্তি। মানব অভিজ্ঞতার সেই চিরন্তন উপাখ্যান। 'রাজা'তে সে ভূমিকাটি একটি নারীর, আর 'রক্তকরবী'তে একটি পুরুষের।

'রাজা' নাটকে রাজার যে ভূমিকা, 'রক্তকরবী'তে সেই ভূমিকা নিয়েছে এক সঙ্গে নন্দিনী এবং রঞ্জন। থীমের দিক থেকে নাটকটিতে আশ্চর্য সারূপ্য। দুটি নাটকেই প্রতীকী আত্মবিনাশের ঘটনা আছে, যার মধ্য দিয়ে মূল নাটকীয় চরিত্র দুটির আত্মিকমুক্তি, ও রূপান্তর ঘটে। 'রাজা'তে চতুর্দশ দৃশ্যে যখন স্বয়ংবর সভার ঠিক আগে সুদর্শনা বুকের বসন থেকে ছুরিকা বের করে আনেন—'এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে দাগ লাগেনি—বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না...তবে আসুক মৃত্যু আসুক—সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর। তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে। সে তুমিই, সে তুমি।' এই সুদর্শনার প্রতীকী আত্মবিনাশের মধ্যে আত্মাটি মিথ্যে অহংকারে, ভ্রান্ত ধারণায় মোহাচ্ছন্ন ছিল—তাকে নির্মূল করে বেরিয়ে আসেন নতুন সুদর্শনা। তার প্রমাণ, তাঁর গানে।

এই দৃশ্যেই সুদর্শনা তাঁর একমাত্র গানটি গেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারটি খুলেছেন গানের ভাষায় ('গান দিয়ে, দ্বার খোলাব')। রানী সুদর্শনার প্রতীকী মৃত্যু এখানেই, ('এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে...ওগো মরুক না এই 'আমি'।) এবং জন্ম নিয়েছে বাঁধনকর্মী দাসী। এখানে প্রথম 'অন্ধকার'টি মকররাজার জালের আড়ালের অন্ধকার ('বাসনা মোর বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা') এবং দ্বিতীয় 'অতল অন্ধকার'টি আসলে আলোরই অন্য নাম। এ সেই অন্ধকার কল্পের বৈদূর্যমণির মতো দীপ্ত অন্ধকার—শাশ্বত সময়ের বুকে যা মিশে আছে। এখানে সুদর্শনার ভাষা পরিমিত হয়েছে সুরসমবায় ভাষাতে, এবং যোগাযোগের সেতু হয়ে উঠেছে সঙ্গীত। সুর,তাল, লয়, ছন্দের—যে অধরা মাধুরী এতদিন সুদর্শনার নাগালের বাইরে ছিল, আজ তাই এসে ধরা দিয়েছে তাঁর কণ্ঠে। গানই 'রাজা'তে হৃদয়ের ভাষা, প্রণয়ের ভাষা। সুদর্শনার সেই ভাষাটি আয়ত্ত হলো এতদিনে—ছুরিকা বের করবার পরে।

'রক্তকরবী'তেও রয়েছে এই প্রতীকী আত্মদর্শন। 'নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে' এই কথাগুলি সুদর্শনার মুখ থেকে তুলে নিয়ে কি স্বেচ্ছাবন্দী মকররাজের মুখে বসিয়ে দেওয়া যায় না? শেষ দৃশ্যে যখন রাজা তার মিথ্যে মুখোশের প্রতিভূ রক্তদণ্ডটি ভেঙে ফেললেন, সেই তাঁর আত্মদহন। তিনি আপন মিথ্যা অহংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন নন্দিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে।—

রাজা। 'এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড। তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।...'

এখানে মনে কি পড়ে না—'এ দেহমন মিলায়ে যাক হইয়া যাক হারা, সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করে মোরে, ওহে আমি বাঁধনকামী'!

মকররাজ বলেন:

'এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে, নন্দিনী?...' নন্দিনীর উত্তর—'আমি

BanglaBook.org

পাব এখান থেকেই মকররাজের ভূমিকা পালটে যায়। মকররাজের কঠিন হাত যেই নন্দিনীর মুঠোয় ঠাঁই পেল, অমনি সে হাত হয়ে উঠল রঞ্জনের হাত যা তাঙার সঙ্গে গড়ে। —'তাহলে কাছে এসো।...চলো আমার সঙ্গে। আজ আমকে তোমার সাথী করো, নন্দিনী।'

এই অনুরোধ কেবল একজনকেই মানায়—সে নন্দিনীর সাথী, যার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নন্দিনী কাজে নামতে পারে। সে রঞ্জন। মিথ্যে রাজার পালার এখানেই শেষ। এবার তার জায়গায় এসেছে সত্যি রাজা। সে রাজা রঞ্জন। তার যে কাজটি করবার কথা ছিল ঠিক সেই কাজটিতেই লাগেন এবার মকররাজ—এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল। কারাগারের ফটক ভেঙে প্রাচীর ভেঙে নির্যাতিত মানুষদের মুক্তি দেবার কাজে এগিয়ে যান রাজা স্বয়ং নন্দিনীর হাতে হাত রেখে। রঞ্জনকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে কখন নিজের অজানিতে রাজাই হয়ে উঠেছেন রঞ্জন। যে মৃতদেহটি গড়ডুপের মতো পড়ে থাকে ভয়ের জালের জড়ানো ঘরের আড়ালে সেটি নিষ্ঠুর, মকররাজেরই প্রতীকী শরীর। রঞ্জনের এইখানেই ঘটে চরম জয় নন্দিনী বলে—'আমি চেয়েছিলাম রঞ্জনকে তোমাদের মধ্যে আনতে। ওই দেখো এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে।

...রঞ্জন বেঁচে উঠবে ও কখনো মরতে পারে না।

...ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম। ও তো এল। ও আবার আসার জন্য প্রস্তুত হবে। ও আবার আসবে।'

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। জালের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসে যে; সে তো রঞ্জনেরই অবিনশ্বর, অপরাজেয় রূপ—যে রূপ সহজাত সাহস ও মুক্তির। সে নন্দিনীকে পায় তার সঙ্গিনী। এই ভাবেই ঘটে 'রক্তকরবী'র মূল চরিত্রের নাটকীয় রূপান্তর।

মকররাজ, তিনি ছিলেন মৃত্যুর প্রতীক বন্ধ আর অন্ধতার প্রতীক—তিনিই হয়ে দাঁড়ান জীবনের, মুক্তির আর আলোর প্রতিভূ। রাজা হয়ে যেন 'রঞ্জনে' রূপান্তরিত।

'রাজা' নাটকেও দেখছি এই একই জাতের রূপান্তর। রানী সুদর্শনা সেখানে পরিণত হয় দাসী সুরঙ্গমাতে। সেই কারণেই শেষ দৃশ্যে অন্ধকার কক্ষে সুরঙ্গমাকে আর খুঁজে পাই না। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নাটকের গোড়ায় সুরঙ্গমা গেয়েছিল—'আমি কেবল তোমার দাসী। ....শ্রীচরণ প্রয়াসী।' তেমনি নাটকের শেষে সুদর্শনাই প্রার্থনা জানাচ্ছেন—'আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।'

রাজার প্রথম দৃশ্যে আমরা দুজনের সংলাপ থেকেই জানতে পেরেছি দাসী বলেই সুরঙ্গমার পথ সহজ হয়েছিল। ('আমি যে দাসী, সেই জন্যই এত সহজ হল')। পথ সুদর্শনারও সহজ হয়ে যায়, পরিশেষে, যখন তিনি সেবা করতে শিখলেন। সুরঙ্গমার কাজ তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন। মকররাজ যেমন তুলে নেন রঞ্জনের কর্তব্য। সমাপ্ত করেন নন্দিনীর আবদ্ধ ব্রত। তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছে নন্দিনী:

'রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও। সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও।' সেই অনুরোধ রাজা রেখেছেন। রঞ্জনের জাগরণ মানেই মকররাজের পরাজয়। ফাগুলাল অধ্যাপককে বলছে: —'রাজা তো ওই গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।'

নন্দিনীর ডাক শুনে রঞ্জনকে জাগ্রত করেন রাজা, রঞ্জনই হলো মুক্তি, মানবতা, আনন্দ-স্বরূপ। নন্দিনীর আধখানা রঞ্জন। রাজার সঙ্গে নন্দিনীর মিলন মানেই রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর পুনর্মিলন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে দুটি নাম একাত্ম, একার্থক। নন্দিনী আনন্দিত করে, রঞ্জনও রঙিন করে তোলে—তারা দুজনে মিলে একটি একক সত্তা, একে অন্যের পরিপূরক।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে শুনি:

নন্দিনী। এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন?

অধ্যাপক। সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। ('রক্তকরবী')

BanglaBook.org

এই টুকরো সত্য জেড়ে লাগে শেষ দৃশ্যে। নীলকণ্ঠ পাখির ইশারা সত্য হয় রাজা যখন রঙনের আগুন কর্মে নামেন।

'রাজা'তে তেমনি অন্ধকার ঘরের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, সুদর্শনা যখন সুরঙ্গমার অবরুদ্ধ কর্মে নামেন, দাসীর বেশে এসে দাঁড়ান রাজার দরজায়। তখনই ঘটে তাঁর প্রকৃত রানী হওয়া—ঘটে রাজা-রানীর মিলন।

৩

মোটামুটি দেখা গেল থীমের দিকে দুটি নাটকের সাদৃশ্য যথেষ্ট। এবারে আমরা কয়েকটি প্রতীক ও প্রতিমার ব্যবহার লক্ষ্য করতে চাই। যেমন রাজা, ধুলো, সোনা, বজ্র, আগুন, ফুল, ধন ইত্যাদি শব্দের মধ্যে কবি কী ধরনের ভাবনা প্রকাশ করেছেন।

প্রথমে নেওয়া যাক সোনা। দুটি নাটকেই ভ্রান্ত মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'স্বর্ণ'। রাজা-তে ভুল-রাজা, রাজদেশীয় নাম সুবর্ণ। যার অর্থ স্বর্ণ, এবং সুন্দর বর্ণ। সুবর্ণের প্রতি সুদর্শনার অদম্য মোহ আমাদের স্বভাবতই সেই বিদেশী প্রবাদ মনে পড়িয়ে দেয়, 'যা কিছুই ঝলমল করে তাই কিন্তু সোনা নয়'। সুদর্শনার বিপত্তির মূলে সুবর্ণ মোহ।

যক্ষরাজেরও তাই। তিনিও বসুন্ধরার সজীব সম্পদ সোনালি ফসল ছেড়ে দিয়ে জীবন কাটান প্রাণ তাল স্বর্ণপিণ্ড নিয়ে খেলায়। পৃথিবীর ভিতর থেকে জোর করে 'তার মরা ধন' কেড়ে আনা, 'তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে 'হিনিয়ে' নিয়ে এসে যেন নেশায় ভোর হয়ে থাকেন। 'ওই সোনার তালগুলো যে আমাদের যক্ষরাজের মিরেট মদ।' ওদিকে সুবর্ণের মোহে সুদর্শনারও 'রূপের নেশা' লেগেছে। 'সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপ্নসুদ্ধ ঝলমল করছে।'

এই যে ঝলমল্ করা স্বপ্ন, এই নেশা, এই মোহ—এ হলো বাস্তববিরোধী, সত্যবিরোধী বুদ্ধিবিরোধী প্রবৃত্তি—একে দমন করাতেই মনস্তাত্ত্বিক 'সোনা' শব্দের দু'রকমের ব্যবহার আছে রবীন্দ্রনাথে। এই দুটি নাটকেই তার উদাহরণ পাই। 'রাজা'তে 'সকলের' গানে শুনি—'যার সোনার চোরাবালির' পরে/পাকা ঘরের ভিত গড়ে'— এখানে সোনা চোরাবালির মতো অসার, মোহময়। 'রাজা'তেই অবার পাগলের গানে যখন শুনি: —'তোরা যে যা বলিস ভাই/আমার সোনার হরিণ চাই'— সেখানে তার মর্মার্থ একেবারেই আলাদা। মানুষের চিরায়ত আকাঙ্ক্ষার ছবি।

তেমনি 'রক্তকরবী'তে পৃথিবীর বুকের মরা হাড়ের সঙ্গে তুলনীয় 'পৃথিবী আপন প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়'। সেই প্রাণের জিনিস আছে ধানের ক্ষেতে, যেখানে 'রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে।' 'রক্তকরবী'র থীম-সঙ্গীতেও এই 'সোনা' সোনালির সূর্যে উষ্ণতা, পাকা ধানের সোনার বরণ। এ তো ধরারই আনন্দ। এই আনন্দই সিঞ্চন করে নন্দিনী। নন্দিনীর সঙ্গে ধানী রঙ মিশে আছে।

পুরাণবাগীশ। একটি মেয়ে, ধানী রঙের কাপড়-পরা।

অধ্যাপক। পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী। নন্দিনীই তো ধানক্ষেত, ধরার খুশিতো সে-ই। রাজার শূন্য বুকের শুষ্ক মরুতে সেই তো তুলবে ফসলকাটার ডাক। 'রাজা'র 'সোনার হরিণ' সুবর্ণ-মোহ নয়, শাশ্বতের ডাক—সেই চিরানন্দ যা মুক্তিতেই কেবল ধরা দেয়। 'রক্তকরবী'র রঞ্জন যেন সেই 'রাজা'র গানের—'সেই মনোহরণ চপলচরণ/সোনার হরিণ চাই। .....'সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়/যায় না তারে বাঁধা/তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে/লাগায় চোখে ধাঁধা।'—('রাজা')

BanglaBook.org

(দইবা—যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়/দৃষ্টি এড়ায়/ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে)

কোটাল, মোড়ল বলে :

—'কী জানি প্রভু। শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে। ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না. আর ও কথায় কথায় সাজ বদল করে, চেহারা বদল করে আশ্চর্য ওর ক্ষমতা।

সর্দার। ওকি, ওই না রঞ্জন রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে।...

মোড়ল। তাই তো। কখন গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে।'

এক সময়ে মকররাজও বলেছিলেন নন্দিনীকে—'রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।...হাতের সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।' রঞ্জনই সেই আনন্দ, নন্দিনীর জুড়ি। সে সেই সোনার হরিণ, যাকে বাঁধা যায় না, শাশ্বত মুক্তির মধ্যেই যার অস্তিত্ব।

এইভাবে দেখছি, 'সোনা' এই শব্দটি 'রাজা'তে এবং 'রক্তকরবী'তে একই সঙ্গে দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'রাজা'তে সোনার হরিণ ছিল একটি গানে একটি প্রতীক ছবি মাত্র, 'রক্তকরবী'তে সে মূর্ত, জীবন্ত, রূপায়িত রঞ্জনে। তেমনি রাজার অন্য আর একটি গানে ব্যবহৃত আরেকটি ছবিও 'রক্তকরবী'তে এসে নন্দিনী-তে প্রাণ পেয়েছে, রূপ পেয়েছে। যেমন 'রাজা'তে—'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে/তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ.../নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু প্রাণে প্রাণে/....কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ/দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ/সে নাচের ছুটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাছে পাছে/তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।'

'রক্তকরবী'তে—

'নন্দিনী। আমার মধ্যে কী দেখছ।

নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ। ...সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারির নটবালকদের মত আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই, নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর।'

দ্রষ্টব্য—নৈবেদ্য, ২৬ 'সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব বিসর্পিয়ে/সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে/নাচিছে ভুবনে।'

বিশ্ববীণার যে ছন্দের কথা, প্রকৃতির মহানিয়মের সঙ্গে বাঁধা যে সুর তালের কথা 'মম চিত্তে' গানে গীত হয়েছে, 'নৈবেদ্য'র কবিতায় স্ফূর্ত হয়েছে, সেই ভাবটি নন্দিনী'তে হয়ে উঠেছে মূর্ত।

সুতরাং দেখছি 'রঞ্জন' এবং 'নন্দিনী' দুজনেরই বীজ 'রাজা'তে নিহিত অমূর্ত ধারণার মধ্যে, যা সপ্রাণ রূপ পেয়েছে 'রক্তকরবী'তে এসে।

এবার আমরা আসতে পারি নাটক দুটির কেন্দ্রীয় প্রতীকের প্রসঙ্গে, কেন আমি দুটি নাটককেই মনে করি মূলত বজ্রগর্ভ কুসুমের জয়ের উপাখ্যান।

৪

পতাকায় রাজার প্রতীকচিহ্নটি ঠাকুরদা বর্ণনা করেছেন এইভাবে : পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা আর মকররাজের প্রতীক হলো মকরের দাঁত। এই প্রতীকগুলিকে আমরা পরীক্ষা করে দেখবো মকরের দাঁতের সঙ্গে দুটি সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ জড়িত রয়েছে। প্রথমত—'মকর' একটি পৌরাণিক জীব, কাল্পনিক সামুদ্রিক জন্তু এখানে জান্তবতা এবং অবাস্তবতা দু'য়েরই অনুষঙ্গ যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। দ্বিতীয়ত—'দাঁত'-এর সঙ্গে কামড়, অত্যাচার, নিষ্পেষণ, ও চর্বণের অনুষঙ্গ আছে। ফ্লোরেন্সের 'কাঁদিদে' সুবিনামে ওলন্দাজী কলকারখানার মালিকদের নির্যাতনের প্রসঙ্গে যে প্রতীকী

BanglaBook.org

নামটি ব্যবহার করেছেন, ভ্যানডেনড্যুর—তাতে এই *dent dur*, অর্থাৎ 'কঠোর দাঁত' এই অনুষঙ্গটি স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথও একই প্রসঙ্গে 'মকরের দাঁত—খাঁজে খাঁজে বড় পরিপাটি করে কামড়ে ধ'রে।'—ইত্যাদি বলেছেন এখানে হাঙ্গরের দাঁতের ব কুমীরের কামড়ের অনুষঙ্গও এসে পড়েছে। তা ছাড়া আছে কলকারখানার যন্ত্রের চাকার দাঁত—কৃত্রিম শক্তির, যান্ত্রিক শক্তির প্রসঙ্গ। সব মিলিয়ে যা আমাদের ভীতি ও সন্ত্রাস, উৎপীড়ন ও যান্ত্রিকতাকে মনে পড়িয়ে দেয়।

'রাজা'র প্রতীক এর সম্পূর্ণ বিপরীত। পদ্মফুলের মাঝখানে আঁকা বজ্রের সঙ্গে রয়েছে নৈসর্গিক শক্তি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আনুষঙ্গ—এ হলো 'স্বাভাবিক' শক্তি ও সুন্দরের আদর্শ মিলন, যা মকরের অবাস্তবতা ও দাঁতের হিংস্রতা, —অর্থাৎ 'যান্ত্রিক' শক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এই ললিতে কঠোর, কোমলে কঠিন নৈসর্গিক নিয়মের, সুন্দরের ও শক্তির স্বাভাবিক মিলনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে নন্দিনীর চরিত্রে। যদি রঞ্জনের কোনো পতাকা থাকত এবং তাতে থাকত কোনো প্রতীকচিহ্নের পরিচিতি—তবে সেই চিহ্নটি হ'তো ফুলের বুকে বজ্রের ছবি নন্দিনীই সেই বহ্নিগর্ভ কুসুম—'রাজ'র পতাকাতে যার ছবি আঁকা। 'রক্তকরবী' নামটির মধ্যেই যেমন করবী ফুল আছে, তেমনি আছে রক্তও। নন্দিনী যে ভয়, রহস্য ও সুন্দরের মিলিত রূপ, সেকথা নাটকের নানা জায়গায় নানা জনের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। ভয় এবং প্রেমের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বারবার ধরা পড়েছে 'রক্তকরবী'র প্রতীকে। অধ্যাপক নন্দিনীকে বলছেন :

অধ্যাপক। এই রক্ত আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে। শুধু মেয়ে নয়।

নন্দিনী। আমার মধ্যে ভয়!

অধ্যাপক। সুন্দরের হাতে রঙের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানিনে রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ।

নন্দিনী। রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী।

...আবার দেখি গোকুলের আঁতকে ওঠা :

গোকুল। সর্বনাশী তুমি! তোমার ওই সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে।...আমি কিন্তু তোমায় বিশ্বাস করিনে।...আজ দিন না যেতেই একটা কিছু বিপদ ঘটাবে। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী

নন্দিনী। আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন?

গোকুল। দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাঙা আলোর মশাল।

(দ্রষ্টব্য : 'গীতালি'— ১৬ : 'তোমার মোহন রূপে / কে রয় ভুলে / জানি না কি মরণ নাচে / নাচে গো ওই চরণ মূলে?/...ঝড় এনেছ এলোচুলে।')

মকররাজকে দেখতে পাই দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, ভয় দেখাচ্ছেন, এবং অনুনয় করছেন :

'...তেমনি বাধ তোমার মধ্যে। কোমল ব'লেই কঠিন। ...ওই ফুলের গুচ্ছ যেন আমারই রক্তআলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। ...নন্দিনী তোমার ভিতরেও আগুন আছে, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব। ...সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্ণা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল।'

দ্রষ্টব্য : 'গীতালি'—৩৪ : 'ওই মাধুরী-সরোবরের নাই যে কোথাও তল / হোথায় আমায় ডুবতে দাও ওগো মরতে দাও।'

শেষে এমন-কি মরিয়া হয়ে নন্দিনী স্বয়ং সরদারের কাছে ঘোষণা করে :

BanglaBook.org

'আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না! বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি।' সরদারও বিদ্রূপ করে নন্দিনীকে সম্বোধন করে 'ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন'। কাজেই নন্দিনীর নিজের মুখের কথা থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি, কখনো সে রক্তকরবী ফুল, কখনো বা ইন্দ্রদেবের বজ্র। একই নন্দিনীর চরিত্রে দুটি দিক আছে, সে-ই হলো ফুলের হৃদয়ে স্থিত অগ্নি, পদ্মের মাঝখানে বজ্র।

এই কারণেই আমি বলতে চাই 'রাজা' এবং 'রক্তকরবী'তে একই থীমকে দুই ভাবে দুদিক থেকে দেখা হয়েছে একই মূল বিষয়ের দুটি ভিন্নরূপ এই দুটি ভিন্ন চরিত্রের নাটক। কারণ রাজা এবং নন্দিনী একই শক্তির দুটি ভিন্ন অভিব্যক্তি—সেই কেন্দ্রীয় শক্তি, অপরাজেয় পদ্ম যার মাঝখানে আঁকা।

পদ্মের রূপকল্পের সঙ্গে সূর্যালোকের যোগ রয়েছে, রয়েছে সুন্দর, প্রেম, অজেয় তারুণ্যের যোগ। পদ্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথে বারবার সেই 'অধরা মাধুরী'র ছবি দেখি, সেই 'অপরূপ মাধুরী', যা রঞ্জনের চরিত্রে পরিস্ফুট।

অন্যদিকে, স্বর্গীয় বজ্র হলো ঈশ্বরের করুণার এক রূপ এ হলো ঈশ্বরের নিষ্ঠুর দয়া, যা জন্ম দেয় নতুন জীবনের। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে বেদনা, যে ভয়, সে তো জন্মযন্ত্রণারই অঙ্গ। ভালো ফসলের জন্য যদি বৃষ্টি চাই, তবে সে বৃষ্টি যে বয়ে আনবে সেই ঝড়-ঝঞ্ঝাকেও তো মেনে নিতে হবে। ঝড়-ঝঞ্ঝায় রয়েছে পুনর্জন্মের শক্তি, মৃত্তিকার মৃত্যুগুলিকে সে নতুন করে তোলে। পুনর্জাগরণ, উদ্ঘাটন, বা আত্ম-উপলব্ধির প্রসঙ্গে ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং বজ্রের উল্লেখ তো রবীন্দ্র-সাহিত্যে অবিরাম।

(দ্রষ্টব্য: বুঝি বা এই বজ্ররবে / নূতন পথের বাঁশী করে / বুকের মাঝে বজ্র বাজে কী মহাতানে;/ বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি;/ ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা;/ আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার;/ যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে / জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে;/ দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো / বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামলো;/ বজ্র বেদনে জাগায়ো আমারে;/ বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে তুমিই আমার বন্ধু;/ তোমার শ্যামল শোভার বুকে / বিদ্যুতেরই জ্বালা;/ ওরে ঝড় নেমে আয়, যা উদাসীন যা প্রাণহীন যা আনন্দহারা / চরম ঘাতের অশ্রুধারায় / আজ হয়ে যাক সারা;/ সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা / ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা; ইত্যাদি।)

বজ্র এখানে বিনাশের শক্তি নয়, সৃষ্টির। সে পুড়িয়ে ফেলে প্রাচীনকে, পলকে, যা মৃত, বিগত, কেবল তাকেই ধ্বংস করে। বজ্র বর্ষণের দূত, বরা দূর করে দিয়ে সে-ই তো মাটিকে উর্বর করে তোলে, বীজবপনের প্রস্তুতি এনে দেয়। বজ্র হলো সেই প্রচণ্ড মাঙ্গলিক শক্তি যা সকল মোহের, সকল বিচ্ছেদের অবসান ঘটিয়ে সাধিত করে মহামিলন। ফুলের অন্তরে যে বজ্রের বাস তা এইরকমই—সব কাজ শিকড় সুদ্ধ উলমলিয়ে দিয়ে সাধুর পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতের বিনাশ ঘটানো; এ বিনাশ করে ধ্বংসকেই, এ মারে মরণকেই। ফুলের আয়ুধ তো জীবনেরই চূড়ান্ত অস্ত্র, মৃত্যুর নয়। 'পুষ্প দিয়ে মারো যারে / চিনল না সে মরণকে / বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে।' পদ্মের মাঝখানে বজ্র তেমনি এক বিশেষ ধরনের পুষ্পায়ুধ—এক নবীন জন্মের পুষ্পশর, প্রেমের সঙ্গে যন্ত্রণাকে, পাওয়ার সঙ্গে না পাওয়াকে একত্রে বেঁধে যে-শর আমাদের অস্তিত্বকে নবীনতর করে তোলে। বাণ হিসেবে পুষ্পই অপরাজেয়, কেননা তা কোমল, জোর করে তাকে ভাঙা যায় না। এই দ্বন্দ্বমধুর মিলন, এই বৈপরীত্যের সন্ধিই হলো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সকল মানবীয় অভিজ্ঞতার মূল ভিত্তি। এবং 'রাজা' ও 'রক্তকরবী', কোনটিই এর ব্যতিক্রম নয়। এই 'নিষ্ঠুর দরদ' রবীন্দ্রসাহিত্যের জীবনদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ, ঐশ্বরিক করুণার রূপই এই।

BanglaBook.org

(দ্রষ্টব্য : 'এ কৃপা কঠোর ; রুদ্রনিষ্ঠুর স্নেহ ; একহাতে ওর কৃপাণ আছে আরেক হাতে হার ; নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে ; তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা।' ইত্যাদি।)

'রাজা' নাটকে সুদর্শনার জীবনে এই কঠোর করুণা মূর্ত হয়ে উঠেছে রাজার প্রেমের মধ্য দিয়ে—'রক্তকরবী'তে মকররাজের জীবনে এই রুদ্র নিষ্ঠুর স্নেহের দ্বৈত অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে রঞ্জনের মৃত্যুর মধ্যে রাজার পরাজয়, এবং নন্দিনীর ক্ষমা পাওয়ার মধ্যে রাজার জিৎ। 'রাজা'তে সুদর্শনা শেষ দৃশ্যে বলছেন—'রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়েছেন, সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন, বেঁচেছি বেঁচেছি।'

চতুর্দশ দৃশ্যে তাঁর ছুরিকা বের করে 'ভগো মরুক না এই আমি' আমরা ভুলিনি।

'রক্তকরবী'তে মকররাজও এইভাবেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। তাঁর সম্পর্কে বিশুপাগল বলেছে—'যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।' যখন নিজেরই গড়া অশুভ রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন বলে মকররাজ নিজেই জাল থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন ফাগুলাল রাজাকে চ্যালেঞ্জ জানায়—'জিততে পারবে?' রাজার অনায়াস উত্তর প্রস্তুত ছিলই—'মরতে তো পারব। এত দিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি। বেঁচেছি।'—মকররাজের এই 'বেঁচেছি' এবং সুদর্শনার 'বেঁচেছি বেঁচেছি।' একই বাঁচার কাহিনী। নবজন্ম, জন্মান্তর, নবজীবনে উত্তীর্ণ হবার আখ্যান। এই ফুটাভস পুনরুক্ত হয়েছে যখন অধ্যাপক বলছেন—'কে যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে'...ফাগুলাল উত্তর দেয়—'রাজা তো ওই গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।' নন্দিনীর ডাক শুনে যে মরা, সে তো মরা নয়, সেই চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেঁচে ওঠা। রঞ্জন এবং নন্দিনী নতুন যুগের জীবনের দূত, আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচানোই যাদের ব্রত। 'লাগবে লড়াই মিথ্যে এবং সত্যিতে / আয় প্রচণ্ড আয়রে আমার কাঁচা / শিকল দেবীর ওই যে পূজাবেদী / চিরকালীকে বইবে বাড়া /...অট্টহাসো আকাশখানা কেঁপে / আয় প্রমুক্ত, আয় রে, অমাবদ্ধ আয়া। /...চিরযুবা, তুই যে চিরজীবী / জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ / অফুরান ছড়িয়ে দেবার দিবি।' —'বলাকা'য় দেখা সেই মুক্তির আহ্বান, তারুণ্যের প্রতিমাই 'রক্তকরবী'তে এসে হল রঞ্জন এবং নন্দিনী।

(দ্রষ্টব্য : নন্দিনী ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন তাহলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি)। নন্দিনী বলে রঞ্জনের মৃত্যু নেই, সে মরতে পারে না। এখানেও আবার শুনি 'বলাকা'রই প্রতিধ্বনি —'পলকে পলকে মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।'

সুদর্শনা এবং মকররাজ দুজনেই নিজেদের ভ্রান্তরূপকে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ফেলে সেই ভস্মের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হন নতুন সত্তায়, আপন আপন সত্য মূর্তিতে। দুজনেই অহং-সঞ্জাত বিভ্রান্তির শিকার হন, এবং বঞ্চনায় যন্ত্রণায় সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার পরে ঘটে তাঁদের অহংত্যাগ, এবং আত্মোপলব্ধি ঘটে। যেন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে যে যার নিজস্ব মূর্তি ধারণ করেন। এইভাবে ঘটে যায় বজ্রের বেদনায় জেগে ওঠা, 'বেঁচে ওঠা'।

৫

পৃথিবীতে বজ্রই নিয়ে আসে বর্ষণ, ধরিত্রীর গর্ভে সঞ্চার করে প্রাণ। প্রকৃতির এই মহানিয়ম রবীন্দ্রসাহিত্যে সর্বত্রই নানাভাবে অনুভূত হয়।

এই নাটকদুটিতেও, বসন্ত থেকে হেমন্তে, ফাল্গুন থেকে পৌষের দিকে গড়িয়ে যায় কালের চাকা। দু'টি নাটকেই এই প্রসঙ্গে 'ধুলো' একটি উল্লেখযোগ্য প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আগে যেমন দেখেছি 'সোনা'র ব্যবহার।

'রাজা' নাটকের প্রথম দৃশ্যেই বসন্তোৎসবের ডাক দিয়েছেন রাজা ('আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব')

BanglaBook.org

এবং সুরঙ্গম পেয়েছে 'চিরবসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।' দ্বিতীয় দৃশ্যে, ঠাকুরদাদার গান—'আজি দখিন দুয়ার খোলা', তৃতীয় দৃশ্যে 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে। / দেখিস্‌নে কি শুকনো পাতার ঝরা ফুলের খেলা রে।' চতুর্থ দৃশ্যে 'পূর্ণিমা নিশা' 'কী করুণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে'—পঞ্চম দৃশ্যে ঠাকুরদা গাইছেন - 'এই হৃদ্‌কমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ঐ উত্তরীয়', সুরঙ্গমা গায়—'কাটিল ক্লান্ত বসন্তনিশা। বাহির অঙ্গন-সঙ্গী-সমে'—অষ্টদশ দৃশ্যে ঠাকুরদা আবার গেয়ে ওঠেন—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'—ঊনবিংশ দৃশ্যে সুরঙ্গম গাইছে—'ধন্য হল মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ।'

যে বসন্ত উৎসবের শুরু হয়েছিল লাল আবীর উড়িয়ে, মরীচিকা সৃষ্টি করে, তার সমাপন হয় ধূসর ধূলির খেলায়। ঐ ঊনবিংশ দৃশ্যেই ঠাকুরদার মুখে শুনতে পাই:

'এখন আমাদের বসন্ত উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা।'—এই ধুলোয় ধূসর বসন্ত উৎসবে কাঞ্চীও যোগ দিতে চায়:

'তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না।'

সুদর্শনা তো ইতিমধ্যেই তার প্রার্থনা জানিয়ে রেখেছে।

'তারা আমার গা'য় ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অঙ্গরাগ।'

'ধুলো' এখানে 'মাটি'র সঙ্গে এক। ধুলো সত্যের প্রতীক, জীবনের প্রতীক, নিরলঙ্কৃত প্রকৃতির প্রতীক। 'ধুলো' রবীন্দ্রনাথে এক মহিমান্বিত, অস্তিবাচক শব্দ, ধরিত্রীর কাছে মানুষের ঋণ স্বীকার, প্রকৃতির প্রতি মানুষের আত্মনিবেদনের প্রতীক।

আবীরের লালে চোখভোলানো বিভ্রম আছে মিথ্যার—ধুলোয় অসীমায় আছে কেবল মাটি সত্যের স্পর্শ। (দ্রষ্টব্য—ওই আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব / তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব;/ প্রভু বল বল কবে / তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে; ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ ইত্যাদি)। এ নাটক বসন্তের, প্রেমের প্রস্ফুটনের গাথা। ধুলোর অঙ্গরাগে রানী সুদর্শনার অভিসারের প্রস্তুতি, সেই পূর্ণবিকাশের শেষ কথা।

অন্যদিকে 'রক্তকরবী'র শুরু হেমন্তের উৎসবের ডাক দিয়ে। ফসল কাটার গানে এই নাটকের সূত্র নিহিত, এর শুরু 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানে, এবং সারাও সেই একই সঙ্গীতে—শুধু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে সামান্য পরিবর্তন এনে। প্রথম দৃশ্যে ছিল—'ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে' আর শেষ দৃশ্যে তা হয়েছে—'ধুলোর আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে।' এই ধুলোর আঁচল ভরিয়ে তোলার জন্যেই ফসল পাকানোর দরকার- -আর ফসল ফলাতে হলে চাই বহুবর্ষা।

'রক্তকরবী'র শেষ দৃশ্যে কাঞ্চনলাল বলে—'ধুলায় দেখছ ওই রক্তের রেখা?' অধ্যাপক উত্তর দেন—'বুঝেছি। ওই তাদের পরম মিলনের রক্তকাঞ্চী।'

দুটি নাটকই ঋতুচক্রের পটভূমিতে স্থাপিত, দুটিরই শেষে ঋতুর চাকা গড়িয়ে যায় ধুলোর দিকে। ধুলোর প্রতি প্রণতি জানিয়েই এই ঋতু-উৎসবের সমাপ্তি। মানবজীবনের পরিপূর্ণতাও সেখানেই।

এবারে 'রাজা' শব্দটিকেও আমরা ধুলো, সোনা, বজ্র, ফুল, মকর ইত্যাদির মতো একটু নেড়ে-চেড়ে, খুঁটিয়ে দেখতে চাই।

মকররাজ একজন মিথ্যে রাজা, ঠিক সুবর্ণর মতো না হলেও, তিনিও একজন 'রাজবেশী।' ভয়ের জালের পিছনে মৃত জড়ের জঞ্জালের জগতে লুকিয়ে থেকে তিনি রাজা-সাজার খেলা খেলেন। কিন্তু ঈশ্বরের জুড়ি না হয়ে তিনি হয়েছেন শয়তানের জুড়িদার, তাঁর আঙুলে কেবল মৃত্যুই নাচে, তিনি জানেন না সৃষ্টির জাদু।

BanglaBook.org

যাত্রাদলের রাক্ষসের মতো, তিনি ভয় দেখান। ভয় পান, আঘাত করেন, এবং যন্ত্রণায় কুঁকড়ে থাকেন, মারেন এবং মরেন প্রতি মুহূর্তে।

এদিকে নন্দিনী থাকে এক সত্যি রাজার প্রতীক্ষায়—সে জানে না ভয় কাকে বলে। 'লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে অমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে।...প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে।'—এবং সবসময়েই তার জিৎ। কেননা তার মধ্যে জাদু আছে, সেই জাদু সঞ্জীবনী সুধা। (দ্রষ্টব্য। নন্দিনী। 'আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতরে প্রাণ নেচে উঠবে')। প্রাণের জয় মৃত্যুর ওপরে অবধারিত। মকররাজ এবং তাঁর পারিষদেরা যতই তাঁর ক্ষমতার, তাঁর ক্রোধের, তাঁর ভীষণতার, তাঁর রাজকীয় বেষ্টালিপনার কথা ঘোষণা করেন, ততই জেনে যাই তাঁর ক্ষুদ্রতার, তাঁর তুচ্ছতার, তাঁর অক্ষমতার কথা। তাঁর নকল রাজবেশ। রবীন্দ্রনাথ যে আগেই বলে রেখেছেন, ক্ষুদ্ররাজার এই হলো লক্ষণ। (দ্রষ্টব্য: 'নৈবেদ্য'— ৩৪ : 'ক্ষুদ্ররাজা আসে যবে ভূত্য উচ্চরবে / হাঁকি কহে 'সরে যাও দূরে যাও সবে ') 'রাজা'তে ভণ্ড সুবর্ণ যখন এলো, এক অনুচর এসে ঘোষণা করে:

'সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।'

পুরোনো প্রজারা এতে অবাক হয়ে বলে—

'লোকটা পাগল হল নাকি। আমাদের দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়।'

সত্যিকারের রাজা আসেন জনগণের শামিল হয়ে, তিনি তাদেরই একজন হয়ে যান—'সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।'

(দ্রষ্টব্য: 'নৈবেদ্য'— ৩৪ : 'মহারাজ তুমি যবে এস সেই সাথে / নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে।)

সুরঙ্গমা সুদর্শনাকে বলে—'না, আমার রাজা এমন ঘোড়ে ধুলো উড়িয়ে আসে না। সে কখন আসে কেউ টের পায় না।'

এই যে রাজার ধারণা, তার সঙ্গে রূপ যায় রঞ্জনের চেহারাটিই। 'রাজা' নাটকে যে রাজা, 'রক্তকরবী'তে সেই রঞ্জন। মকররাজ ঠিক উল্টো।

রঞ্জনকে কখনো দেখা যায় না, সে কখন আসে কেউ টেরই পায় না, কিন্তু সে মাতন ধরিয়ে দিতে জানে। 'রক্তকরবী'র অদৃশ্য রাজা মকররাজ নয়, রঞ্জন।

'রাজা'তে একটি স্পষ্ট মঞ্চনির্দেশিকা রয়েছে। 'রাজা'কে এই নাটকের কোথাও রঙ্গমঞ্চে দেখা যাইবে না।"

'রক্তকরবী'তে ছাপার হরফে কোথাও এই নির্দেশ দেওয়া না থাকলেও, কার্যত, রঞ্জনের যে ভূমিকা, তাতে নাট্যকারের ইঙ্গিত ঐ দিকেই যায়। রঞ্জনের খুব কেউ দেখি না আমরা, কানে শুনি তার কার্যকলাপের বর্ণনা অন্যদের মুখে। তাকে চোখে দেখা যায় না, কেবল তার সম্পর্কে অন্যদের বর্ণনা শোনা যায়। 'তপতী'র রাজার মতোই তাকে দেখা যায় না, অথচ তার প্রবল অস্তিত্ব নাটক জুড়ে। নাটকের শেষে রাজার জালের পিছনে মৃত্যুকক্ষে যে মৃতদেহটি শায়িত, সম্ভবত তা দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হবার কথা নয়, কেননা তা রঞ্জনের বাস্তবরূপ নয়। মৃত্যু, বা পরাজয়—সে তো রঞ্জনের নয়, সে রঞ্জন হতে পারে না। রঞ্জন মানেই প্রাণের উল্লাস। রঞ্জন মানেই শাশ্বত জীবন, মুক্তির আনন্দ, ভয়হীন আত্মবিশ্বাস। প্রাণশূন্য একটি স্থাণু জড়পিণ্ড—যা মকররাজের পদতলে পড়ে থাকে, তা কখনো প্রকৃতপক্ষে রঞ্জন নয়, তা মকররাজের প্রথম সত্তা, ভ্রান্ত সত্তা। মকররাজ তাকেই হত্যা করেন, এবং জাল ভেঙে বেরিয়ে এসে যে নন্দিনীর হাতে হাত মেলায় সে-ই তো রঞ্জন। সে-ই তো রঞ্জনের বাস্তবরূপ, মুক্তির, প্রেমের, নরনারায়ণের আত্মার রূপ। খোদাইকারদের যন্ত্র যখন রঞ্জনের দামামার ছন্দে কাজ করছে, বলেছেলাব

BanglaBook.org

মতো সহজে অনায়াসে বন্দীরা গান গেয়ে হেসে খেলে পরিশ্রম করছে স্বচ্ছন্দে—তখনই আমরা শুনতে পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের আসল রাজার পদধ্বনি। সে স্বাভাবিক নেতা, সে 'যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে যায়।'

এখানে অন্ধকার ঘরের রাজার সঙ্গে রঞ্জনের অমিল আছে। 'রাজা'র অন্ধকার কক্ষের প্রয়োজন এই 'রঞ্জনে'র নেই—তার যে নন্দিনী আছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এখানে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে—প্রেমের বুকে বোঝা হয়ে চেপে আছে যে অবুঝ অন্ধকার। (দ্রষ্টব্য : রাজার উক্তি—'প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায়') তার প্রয়োজন আগেই ফুরিয়েছে। এখন ভয়হীনতার মধ্যেই রয়েছে প্রেম। রঞ্জনের মধ্যে ফসল ক্ষেতের অপর্যাপ্ত রোদ বাতাস খেলছে। এইভাবেই 'রাজা' থেকে 'রঞ্জনে'র মধ্যে বসন্ত প্রস্ফুটিত হয়েছে হেমন্তের সোনায়।

৬

পরিশেষে, বলা যায় 'রাজা' থেকে 'রক্তকরবী' স্পষ্টতই বসন্তের লীলা থেকে ফসল কাটার পথে, অতীন্দ্রিয় থেকে মানবীয়তায়, অমূর্ত থেকে বাস্তবের দিকে সম্মুখযাত্রা।

'গীতাঞ্জলি' পর্বের সব মৌল ভাবগুলি 'রাজা'তে উপস্থিত। এবং 'রক্তকরবী'তেও। গানে ও কবিতায় যে সকল ভাবনা তিনি চিত্রকল্পে প্রকাশ করেছিলেন, 'রক্তকরবী'তে এসে সেই সব বিমূর্ত ধারণা চরিত্রে রূপায়িত হয়ে উঠেছে

দুটি নাটকে ধীমগত কাঠামোয় স্পষ্ট ঐক্য রয়েছে প্রতীকে ও প্রতিমায়, এবং বিষয়বস্তুতেও। তথাপি চূড়ান্ত পরিণতিতে নাটক দুটির মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট—বসন্ত থেকে হেমন্তের যে ব্যবধান। প্রথমটির ঝোঁক থেকে গেছে অতীন্দ্রিয়ে, পরেরটি অনেক বেশি বাস্তবমুখী এবং সেই কারণেই আমাদের অনেক বেশি কাছের 'রাজা' অনেকটাই ব্যক্তিগত মুক্তির আখ্যান। সুদর্শনা একদিক থেকে এবং কাঞ্চী আরেক দিক থেকে যাত্রা শুরু করে আলাদা আলাদাভাবে দুজনেই এসে একই পথে মিলিত হয়ে লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। কিন্তু 'রক্তকরবী'তে মুক্তির আহ্বান কেবলমাত্র স্বেচ্ছানির্বাসিত মকররাজের কাছেই এসে পৌঁছয়নি, পৌঁছেছে সামগ্রিকভাবে যক্ষপুরীর সমস্ত উৎপীড়িত শ্রমিকদের কাছে। রাজার মুক্তি তাঁর নিজের বন্ধন ছিন্ন করার মধ্যেই নিহিত নয়, তাঁর মুক্তি প্রজাদের মুক্তির লড়াই পরিচালনা করায়। 'রক্তকরবী'তে রাজা রাজা হয়ে উঠেছেন তখনই যখন প্রজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেরই অগুত শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এখানে পথ অনেক বেশি বিস্তৃত, আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সমস্যাবলি, শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমশিল্পায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-বিধান ইত্যাদি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা 'রক্তকরবী'কে যে সমকালীনতা দান করেছে তা 'রাজা'র আত্মিক সমস্যায় নেই। (আবার অন্য এক দিক থেকে 'রাজা'র যে শাশ্বত সর্বজনীন আবেদন আছে, 'রক্তকরবী' নাটকের ইতিহাসে-গ্রথিত কাহিনীতে সেটা থাকতেও পারে এক ধরনের পাঠকের কাছে)। সাধারণভাবে, আমরা যারা সাহিত্যের সঙ্গে সময়ের, সমাজের নাড়ীর যোগ থাকলেই সেটাকে বেশি পরিণত, বেশি জীবন্ত বলে মনে করি আমাদের কাছে তাই 'রক্তকরবী' ফসল তোলার দিনে পৌঁছে যায়। দুটি নাটকেরই পরিসমাপ্তিতে রুদ্রদ্বার যখন খুলে যায়, অহং-এর গর্ব যখন ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে, উন্মুক্ত দ্বার অবারিত করে দেয় বিশ্বভুবনকে, তখন আকাশে দোলে একটিই রাজপতাকা, সেখানে পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।

BanglaBook.org

একটি মেট্রোপলিটান শিল্পীমন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহের উদাহরণ

কমলকুমার মজুমদার বিষয়ে দু-একটি ভাবনা

যে কোনো ভারতীয় আজ দুই জগতের মাঝখানে পা দিয়ে টালমাটাল। জীবনের বিভিন্নস্তরে তাকে সারাক্ষণ নানাভাবে আপোস করে যেতে হয়। তার পরিবারের পরিবেশে সে সনাতনী; দেশজ ঐতিহ্যের পটভূমিতে পরিপুষ্ট। কর্মজীবনে সে প্রবেশ করে এক অতি আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাবিত পরিমণ্ডলে। ফলে স্বভাবতই, তার দুই মুখ। এক মুখে ঐতিহ্যের রং, অন্যমুখে আধুনিকতার। এবং প্রায়ই এই দ্বিধাবিভাজনের বিরুদ্ধে তার সচেতন প্রতিবাদ থাকে না, বরং থাকে ওপর-ওপর আপোসের চেষ্টা। যার ফলে আধুনিক ভারতীয় আত্মার গহনে জন্ম নেয় এক জটিল সামাজিক ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, আজকের প্রত্যেকটি ভারতীয়ই সেই দ্বন্দ্বমানসের নিরুপায় শিকার।

একদিকে চলেছে মেট্রোপলিটান শহর কলকাতায় হাই রাইজ আপার্টমেন্ট আর ভূগর্ভ রেলের আকাশ-পাতাল স্বপ্নের বিপুল বাস্তবায়ন, অন্যদিকে তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রায় সামন্ততান্ত্রিক মন। সাবেকি যৌথপরিবার, জাতিবর্ণভেদ, পণপ্রথা, শিশুশ্রম তো আছেই, একটু গ্রামাঞ্চলের দিকে পা বাড়ালেই এমনকি টটকা দাসপ্রথারও গন্ধ মেলে। না হয়েছে আমাদের সত্যকার যথাযথ শিল্পায়ন, না ঘটেছে ধর্মসংস্কার। আংশিক শিল্পায়নে মিশ্র অর্থব্যবস্থিতে ওপর-ওপর নকল আধুনিকতার একটি মুখোশ চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সাতকেলে সাধারণ জীবন-মনের ওপরে। এই নকলে-আসলে মিলে-মিশেই আজকের ভারতীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। আপাতত স্বাধীনতার বহির্বৈভবের অন্তরালে এক সদাবন্ধন স্বাধীনতাহীনতা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই।

এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যটি সাহিত্যেও আধুনিক ভারতীয় সত্তার 'আমি' হয়ে প্রায়ই প্রকাশ পায় অন্তর্দ্বন্দ্বে, দ্বিধাবিভক্তিতে, পায়ের তলায় মাটি খুঁজে না পাওয়ায় মাটি কোথায়? ঐতিহ্যে, না অধুনায়? অতীতে, না ভবিষ্যতে? আমাদের বর্তমানের অদ্বিতীয় মুখের ছায়া ধরবার মতো প্রকৃত ঐতিহাসিক দর্পণ আমরা এখনও গড়ে নিতে পারিনি, হাতে ধরতে পারিনি। খুঁজছি বটে, দেখতে চেষ্টা করছি বটে সর্বদাই, কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছি না আমাদের স্বকীয় অভ্রান্ত মুখসাদৃশ্যটি।

আমরা অতীত নিয়ে গর্ব করতে চাই কিন্তু অতীতের ভাবে সমাধিস্থ হতে চাই না। আমরা সময়ের তালে তালে পা ফেলে এগোতে চাই কিন্তু সময়ের বিস্ফোরণে বিনষ্ট হতে চাই না। পুরোনোকালের যে মূল্যবোধ আমাদের সমকালের জীবনভঙ্গির বিরোধিতা করে, তার শবভার বইতে আমরা নারাজ, আবার ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির উপজাত মানুষ হিসেবে, দুঃসময়ের ক্লেদজ সন্তান হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করতে অর্থাৎ পরদেশী মূল্যবোধ ধার করে নবজন্ম নিতেও আমরা রাজী নই।

কিন্তু অপ্রিয় সত্যকে মানতে রাজী হই বা না হই, ইতিহাসকে মুছে ফেলা আমাদের অসাধ্য, তা সে যতই আমাদের কাম্য হোক না। গত দুশো বছরের ইতিহাসের পাতা জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ছিঁড়ে ফেলা সম্ভব নয়। সে চেষ্টাও হবে শিশুসুলভ, অযৌক্তিক, তার পরিণতি শোচনীয় হতে বাধ্য। সে প্রয়াস হবে রাস্তার নাম বদলের মতন আমাদের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের জাতীয় চরিত্রের নাম পাল্টে দিতে চাওয়া। এ চেষ্টা যদি কোনো শিল্পীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিল্পগত স্তরেই সীমিত থাকে, তবুও তা অসার্থক হতে বাধ্য, কেননা সেখানে শিল্পের বিদ্রোহ সত্যের বিরুদ্ধে, ইতিহাসের বিরুদ্ধে। ঐতিহাসিক সত্যের পরিব্যাপ্তি অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী। শিল্প এবং

BanglaBook.org

শিল্পীর সামগ্রিক অস্তিত্বই সেই মহান সত্যের অন্তর্ভুক্ত, তা না হয়ে উপায় নেই। ইতিহাসবিদ্রোহ অর্থহীন প্রলাপ। কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিই তো ইতিহাসের বেড়ার বাইরে চলে যেতে পারে না? ইতিহাসকে অস্বীকার করা জীবনমৃত্যুকে অস্বীকার করার মতো।

আজকের একজন ভারতীয় শিল্পীর আত্মজিজ্ঞাসা, তাঁর আত্মানুসন্ধান, যে কোনো আধুনিক ভারতীয় মানুষের চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতর রূপমাত্র। তিনি দুই জগতের মধ্যবর্তী, একই সঙ্গে তাঁর দুই মুখ, কোনোটিকেই পরিত্যাগ করা তাঁর সাধ্য নয়। ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পশ্চিমী অভিনবত্ব, পুরাকাল এবং অধুনার দ্বন্দ্ব তাঁর অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে

আধুনিক ইওরোপীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের থেকে আধুনিক ভারতীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের চেহারা অনেক আলাদা। কেননা আধুনিকতা আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ফল নয়, তা ভারত আত্মার অন্তস্তল থেকে উদ্ভূত হয়নি। যেমন হয়েছে ইওরোপে যেখানে ক্রমশ সামন্ততান্ত্রিকতা ভেঙেছে, এসেছে বুর্জোয়াজি, ঘটেছে বৈজ্ঞানিক জাদুমন্ত্রে জীবনের মানোন্নয়ন, যথাকালে ধর্মীয় সংস্কার সাধন, শিল্পবিপ্লব—এসবই সেখানকার মাটি থেকে গজিয়েছিল ভারতবর্ষের আধুনিকত এসেছে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে। উপনিবেশবাদের লেজুড় হয়ে। এনেছে নিতান্ত আংশিক শিল্পোন্নয়ন, এলোপাথাড়ি ধর্মীয় সংস্কার, এবং ভারসাম্যহীন বিজ্ঞানচর্চা।

উদাহরণ: যেখানে এইভাবে অমানুষিক লোডশেডিং হয় সেই শহরেই বৈদ্যুতিক ভূগর্ভরেল তৈরী হচ্ছে! যেখানে বর্ষায় নর্দমাতেও জল চলে না, সেখানে হচ্ছে ভূগর্ভরেলওয়ে টানেল। ভারতীয় আধুনিকতা অনেকটা যেন ভারতীয় ইতিহাসের মঞ্চে দিউ-এক্স-মাখিনা— এপ্রেন্স নিয়েছে ঔপনিবেশিকতার স্বর্গীয় কপিকলে চড়ে, প্রবেশ করেছে জীবনের মাঝখানে। ইওরোপের আধুনিকতার মূল, ইওরোপের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মাটিতে গাঁথা। তার মহীরুহ হওয়াটা স্বাভাবিক। আমাদের আধুনিকতা টবে ফলানো, ক্ষয়া, বেঁকেচুরো নিতান্তই আরোপিত অভিজ্ঞতা। এমনকি যেসব মৌল সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে এত আলোচনা হয়, সেগুলি ভারতীয় প্রমীণ সংস্কৃতির বাইরের স্তরে কয়েকটি আইনগত আঁচড় কাটানো ভিন্ন ভেতরের দিকে কোনো প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। যে সমাজের আশি ভাগ মানুষ এখনো অশিক্ষিত যে গ্রাম্যজীবন এখনও অবৈদ্যুতিক মধ্যযুগীয় পরিবেশে অভিশপ্ত—এবং যে দেশের একমুঠি মাত্র মানুষ শহুরে সংস্কৃতির সুযোগ পেয়ে তার পূর্ণ সুবিধা নিচ্ছে, যে দেশের অধিকাংশ মানুষ অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, সেই দেশের লেখকের আত্মানুসন্ধান তাঁকে একটি অতি কঠিন জায়গায় ঠেলে দেয়; যেখানে তাঁর অস্তিত্বই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। সংবেদনশীল লেখক জানেন, বিপুল ভারতীয় আত্মার ভালোমন্দের সঙ্গে সাহিত্যের যোগাযোগ অতি সামান্য। দেশের আশিভাগ মানুষকেই তা স্পর্শ করবে না—তাঁর সৃষ্টি তাদের লাভেও আসে না, ক্ষতিও ঘটায় না। তাই একধরনের ব্যর্থতাবোধ এবং অপরাধবোধও জন্মানো শিল্পী-হৃদয়ের স্বাভাবিক পরিণতি। এই সচেতনতা শিল্পীর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। তিনি ভাবতে পারেন যেভাবেই লিখুন না কেন তাঁকে তো একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেই হবে অতএব যদি তিনি আরো ক্ষুদ্র একটি পাঠকগোষ্ঠী গড়ে নিয়ে তার মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখেন তাতেও শেষ বিচারে কিছু এসে যায় না, এইভাবে তিনি একজন বিচ্ছিন্নতাবাদি অভিবিদগ্ধ এলীটিস্ট শিল্পীতে পরিণত হতে পারেন। অথবা তিনি চেষ্টা করতে পারেন সাধারণভাবে সকল পাঠকের কাছেই পৌঁছুবার,—সহজে জনপ্রিয় হবার এবং তৃতীয় চেষ্টা হতে পারে শ্যাম এবং কুল দুই বজায় রাখবার।

যেমন:—ভাষায় এলীটিস্ট হওয়া এবং বিষয়বস্তুতে পপুলিস্ট অথবা বিষয়বস্তুতে এলীট থেকেও ভাষায় সাধারণ থাকা।

মনে রাখতে হবে, সমাজের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর শিল্পের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এক নয় কখনো কখনো দুই ধারা মিলে গিয়েছে বটে, কিন্তু সর্বদাই তা ঘটে না। আমাদের

মধ্যে ঐতিহ্য-বিরোধিতা নানা রকম চেহারা নিতে পারে।

এক। চিরন্তন ভারতীয়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও পুরোনো মূল্যবোধের বদলে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ গ্রহণ করার মধ্যে এক ধরনের বিদ্রোহ আছে;

দুই। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের (যেহেতু তা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের আমদানি) বদলে চিরন্তন ভারতীয় মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে আছে আরেক ধরনের বিদ্রোহ।

তিন। আবার একটি তৃতীয় ধরনের বিদ্রোহ হতে পারে, পুরোনো হিন্দু ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্যের বিজাতীয় সংস্কৃতি, দুয়েরই বিরুদ্ধে। যার ফলে এক আনকোরা নতুন সমকালীন চেতনায় সমৃদ্ধ স্বজাতীয় মূল্যবোধের অনুসন্ধান শুরু হতে পারে। এই সন্ধান এগুতে পারে রাজনৈতিক ও দার্শনিক মূল্যবোধের দিকে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যেমন জয়ের সম্ভাবনা আছে, তেমনি আছে ফাঁদে পড়ার ভয়। প্রথম ধরনের বিদ্রোহ, মৃত ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে পথ ভুলে শিকড়হীনতার দিকে নিয়ে যেতে পারে আমাদের। দ্বিতীয় ধরনের বিদ্রোহ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে সমকালের ও ইতিহাসের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে পারে আমাদের—হয়ে উঠতে পারে প্রগতিবিরুদ্ধ পদক্ষেপ। এবং তৃতীয় ধরনের বিদ্রোহ পূর্ব-পশ্চিম, অতীত-বর্তমান সবকিছুর বিরুদ্ধে উজান বেয়ে যাবার ফলে কিছুকালের জন্য প্রবল অনিশ্চয়তা এবং নবীন-প্রাচীন যাবতীয় মূল্যবোধের সাময়িক হারিয়ে সামগ্রিক পতন ঘটাতে পারে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা যায় উল্লিখিত সবধরনের বিদ্রোহ নিয়েই শিল্পীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ঐতিহ্য এবং অভিনবত্বের মধ্যে, সংস্কার এবং আবিষ্কারের মধ্যে চলে আসছে চিরন্তন টানাপোড়েন। যাঁরা সেই জাদু মাকুর কাঠিটা খুঁজে পেয়েছেন তাঁরাই বুনে ফেলতে পারেন সৎ শিল্পের সার্থক বালুচরী যাঁরা পাননি, তাঁরা ব্যর্থ হন। শিল্পীদের কখনো দেখেছি প্রথম ধরনের বিদ্রোহ থেকে দ্বিতীয় ধরনের মোড় নিতে—কখনো বা দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়ে বা প্রথম থেকে তৃতীয়ে। এমনকি তৃতীয় থেকে দ্বিতীয়ের দিকেও যাত্রা করেছেন অনেকে।

কমলকুমার মজুমদারকে আমার ভারতীয় ঔপনিবেশিকতার অন্তর্দ্বন্দ্বের একজন অতি উৎকৃষ্ট, শিল্পবিম্বিত উদাহরণস্বরূপ পুরাণপুরুষ বলে মনে হয়।

একটি পরিবর্তনশীল সমাজ, যে ঐতিহ্য থেকে সরে আসছে অভিনবত্বের দিকে, গ্রাম থেকে শহরের দিকে, ধর্ম থেকে বিজ্ঞানের দিকে, অন্ধ সংস্কার থেকে তীব্র বিতর্কের দিকে যাব যাত্রা চলেছে, সেই সমাজের পক্ষেই কমল মজুমদারের মতো এমন এক বিচিত্র অন্তর্বিরোধে বিক্ষত, দ্বিধাবিভক্ত মনের শিল্পীকে জন্ম দেওয়া সম্ভব। তিনি বৃটিশ ঔপনিবেশিকতা প্রসূত বিজাতীয় অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে মাতৃভাষাকে বিমুক্ত করতে চান। পবিত্র, পরিশীলিত হিন্দু বিশুদ্ধতার মূল উৎসকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে চান বাংলাভাষাকে। ফলে তিনি ঝেড়ে ফেলেন চলতি বাংলার স্বাভাবিক রূপ, আবিষ্কার করেন এক আলাদা বাংলা ভাষা প্রকরণ যা তাঁর মতে দুশ' বছরের বিজাতীয় পরদেশী সংস্কার মুক্ত।

কিন্তু এই প্রয়াস এক অসম্ভাব্যের ভজনা। অসাধ্য সাধনের প্রয়াস। ইতিহাসকে যেমন জাতির অভিজ্ঞতা থেকে মোছা যাবে না, ক্যালেণ্ডার থেকে মোছা যাবে না দুশ' বছর সময়কাল, তেমনি আবার গা থেকেও মোছা যাবে না অভিজ্ঞতা এবং সময়ের ছাপ। সময়ের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে একটি শ্রীহীনতা আছে। ক্যাবারেতে নগ্নবক্ষ নারীরা যেমন 'প্রাকৃতিক নগ্নতায় পরিশুদ্ধ' হয়ে দেখা দেয় না, তেমনিই বিশ শতকের শিল্পী যখন অষ্টাদশ শতকের ভাষা সৃষ্টি করতে যান, তা হয়ে দাঁড়ায় এক জটিল বিচিত্র সামাজিক মনস্তত্ত্বের উদাহরণ স্বরূপ।

কমলকুমার মজুমদার বিষয়ে কয়েক বছর আগের 'চতুরঙ্গে' (মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৪) আমার

প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি যে সে-ভাষাটি প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বাংলা নয়। কোনো যুগেরই নয়: তা একান্তভাবে কমলকুমারের স্বকীয়। লেখকের মধ্যে কতগুলি আশ্চর্য দ্বন্দ্ব বিরাজমান, ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার পরিণতি হিসেবে যে দ্বন্দ্বগুলি সহজেই বোধগম্য ও বৈধ

১। তিনি নিজেকে ঐতিহ্যবাদী হিন্দু বলে চিনতে এবং চেনাতে চান, হিন্দু স্বস্তিবচন দিয়ে লেখা আরম্ভ করেন। অথচ ব্যাকরণকে চূর্ণ চূর্ণ করে ফেলে চিরন্তন ঐতিহ্য এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

তাঁর ভাবনার মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে কখনো তা অত্যন্ত মানবিক, জনদরদে পরিপূর্ণ, উদার, সংবেদনশীল। দরিদ্রের ওপরে ধনীর সামাজিক অত্যাচার, শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত সম্মুখগামী ভাবনা।

আবার কখনো তা শ্রেণীবিভাগে বর্ণবিভেদে বিশ্বাসী, বংশমর্যাদায় বিশ্বাসী, অতিহিন্দু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সমকালবিরোধী, আধুনিকতাবিরোধী, ধর্ম-আচারপরায়ণ, পশ্চাদ্‌মুখী ভাবনা

এই দু' রকম ভাবনার সঙ্গেই তাঁর রচনাশৈলীর বিপুল এক অন্তর্বিরোধ রয়েছে। তাঁর উক্ত দু' ধরনের ভাবনারই মূলত পপুলিস্ট আবেদন আছে। আধুনিক সমাজনীতিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ দরিদ্র-শোষণ বিরোধী, আলোকিত মনের কাছে একটি ধরন পৌঁছুবে, অন্যটি পৌঁছুবে নিরালোক, প্রাচীনপন্থী অন্ধ-সংস্কারচ্ছন্ন ইনুয়ানার কাছে। এর ফলে প্রায় সমাজের দুই প্রান্তেই পৌঁছে যাচ্ছে তাঁর বিষয়গত আবেদন।

কিন্তু ব্যাকরণ-বিদ্রোহী রচনাশৈলী একান্তই এলীটিস্ট, উচ্চমন্য, বিদগ্ধজনোচিত—তাতে জনদরদী মনের পরিচয় নেই। পরিচয় নেই জনমানসের প্রতি সামান্যতম আনুকূল্যের। বরং আছে সাধারণ মানুষের বোধের ধরনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা এবং এক উন্নাসিক গোষ্ঠীবদ্ধতার সংকেত ওঁর ভাষাপ্রকরণকে যদি বিদ্রোহের চিহ্ন বলে ধরে নিই (ব্যাকরণকে গতানুগতিক নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতীক বলে, শাশ্বত নিয়মানুবর্তী যোগাযোগের পন্থা বলে ধরলে)—তাহলে দেখতে পাচ্ছি তাঁর বিদ্রোহী ভাষাপ্রকরণ এবং গতানুগতিক বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা অন্তর্বিরোধ জেগে উঠেছে।*

আমি সবিনয়ে এটুকুই বলব যে, এই অন্তর্বিরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ইতিহাস-সিদ্ধ। কলকাতা শহরের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক পটভূমিতে শিল্পী পুষ্ট হয়েছেন—যে দুইজগতের সদাবন্ধন বিরুদ্ধতার টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে তাঁর মনের তন্তুজাল বোনা হয়েছে, তাতে এই অন্তর্বিরোধ এতটুকুও বোধের অতীত নয়। অনৈতিহাসিক নয়। কমলকুমারের অসামান্য শিল্প-চেতনা, তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতাই তাঁর মধ্যে তীব্রতর করে তুলেছিল ঔপনিবেশিকতার বিষক্রিয়াকে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁর শিল্পের ভারসাম্য। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা।

একান্ত আধুনিক এবং একান্ত ভারতীয় একটি মহৎ শিল্পপ্রতিভা তীব্রভাবে ঔপনিবেশিক অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়লে যে কতটা ভারসাম্য হারাতে পারে নিঃসন্দেহে তার এক চরম নিদর্শন মেলে কমলকুমারের মধ্যে।

---

*এখানে হয়তো প্রশ্ন ওঠে—ঐ বিষয়বস্তু নিয়ে যদি অতি সাধারণ ভাষায় গল্প লেখা হতো, (গোলাপসুন্দরী, সুহাসিনীর পমেটম, পিঞ্জরে বসিয়া শুক, এমন কি—অন্তর্জলী যাত্রাও) তাহ'লে সে লেখা কতদূর অসামান্যতা অর্জন করত? কিন্তু এ প্রশ্নের মধ্যে আমরা এ প্রসঙ্গে যাব না।

[প্রবন্ধটি মূলত ইংরিজি ভাষায় ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাণ্ড লিটারেচার্স-এর ১৯৭৮-এর অধিবেশনে এইস্ক আঁ-প্রভঁসে পঠিত। বাংলা অনুবাদে ও সংক্ষেপকরণে সহায়তা করেছেন শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্তী—প্রবন্ধকার।]

BanglaBook.org

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী : শশী ও রিউ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলবের কামু-র উপন্যাসে নির্বাসিত নায়কের ভূমিকায় ডাক্তার

As flies to wanton boys are we to th' gods—
They kill us for their sport,— *King Lear*. Act 4 : Sc. 1.
The doctor, God's enemy he fights against death.

-Camus, *Notebooks*

A man becomes an outsider when he becomes alive to certain questions.

--Colin Wilson, *The Outsider*

'উপন্যাস' যেহেতু শিল্পধারা বা genre হিসেবে বিশেষভাবে বিদেশী, সেই এক ছুতো ধরে আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় (তা যত সামান্যই হোক না কেন) যেন একটা হুজুক তৈরি হয়ে গিয়েছে, উপন্যাসের মূল ভাব, তার শিল্পায়ন, তার চরিত্রচিত্রণ, রচনার উদ্দেশ্য প্রভৃতি নাড়িনক্ষত্র সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে ওঁকে বিজাতীয় প্রতিপন্ন করবার। যে-হীনম্মন্যতার কারণে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে একদা বলতাম 'বাংলার স্কট'—যদিও ঔপন্যাসিক হিসেবে এঁদের দুজনের অন্তর্দৃষ্টির, শিল্প-পারদর্শিতার এবং চারণভূমির বিস্তারের কোনো যথার্থ তুলনাই চলা শক্ত।

তাই, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে গত দুই বা তিন দশকে বাংলাসাহিত্যে আমরা যে বহুসংখ্যক 'নির্বাসিত নায়ক' (outsider) এর সন্ধান পেয়েছি, তাদের প্রকৃত সত্ত বা পিতৃপরিচয়ের উদ্দেশ্যে সমালোচকরা একবার চকিতে পশ্চিমের বারান্দায় দৃষ্টি নিক্ষেপ না ক'রে পারেন না।

নির্বাসিত নায়কের রক্তে একাধিক পিতৃপরিচয়, বস্তুসত্তায় একাধিক ভাষা থাকতে পারে। টোমাস মান-এর শিল্পী 'আউটসাইডার' টোনিও ক্রোয়গার থেকে আলবের কামুর খুনী 'আউটসাইডার' মারসো-র গোত্র যেমন একেবারেই অসম, তেমনি ভিন্ন জাতের মানুষ 'মৌলিনাথ'-এর নায়ক এবং 'বিবর'-এর নায়ক। কেউ জন্মেছে শিল্পের অবশ্যনীয় কলাটলিপি নিয়ে,—অদৃশ্য ঝড়োর মতো, অথবা বলির জন্তুর সিঁদুর-টীকার মতো তার কপালেও সেই শিল্পীর জাত-চিহ্ন উদ্যত হয়ে থাকে, তাকে সর্বসাধারণের মাঝখানে স্বতন্ত্র ক'রে রাখে চিরকাল। আবার কেউ-বা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আগ্রাসী যন্ত্রসভ্যতার অধিকা আত্মচেতনার শিকার। কেউ-বা শুধুই বোধান্টিক আত্মমগ্নতার ফলে বিচ্ছিন্ন, বাস্তববিমুখ, পলাতক, একক সত্তা। আধুনিক কবো, নাটকে, উপন্যাসে এই প্রচণ্ড বিচ্ছিন্নতাবোধ আধুনিক আত্মচিন্তার একটি প্রধান চিহ্ন। হয় আত্মবিলোপ, নয় আত্মপ্রকাশ—এই দুইভাবে ব্যক্তিমানুষ বিশ্বের বিশালতার সামনে ব্যক্তির ক্ষুদ্রতাকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। আজকের বিচ্ছিন্ন (alienated) নায়ক শুধু যে তার আশপাশের মানুষজন, সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আশাভরসা, সুখদুঃখের ধারণা, শুভাশুভের ধারণা থেকেই বিচ্ছিন্ন তা নয়, সে ক্রমশ নিজেরও মনন, নিজের বোধ, বুদ্ধি, হৃদয়, অনুভূতি, এমন-কি শারীরিক সত্তার সঙ্গেও স্বাভাবিক একাত্মতা হারিয়ে ফেলে—এমনটি আমরা সার্ত্র থেকে শুরু ক'রে আজকের 'অ্যাবসার্ড' নাটকে হামেশা দেখেছি। মানুষ যেন ক্রমশ অমানুষ হয়ে পড়ছে, পরিণত হচ্ছে পুতুলে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে (automaton), অথবা আরশুলা জন্তুতে।

বাংলাসাহিত্যে এই বিচ্ছিন্ন নায়কদের আনাগোনা বহুদিনের। দিলীপকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যালের ভবঘুরে, পরবাসী নায়করা, জগদীশ গুপ্তর নিষ্ঠুর জগতের নির্বাসিত নায়কদের মুখ, বুদ্ধদেব বসুর মননশীল জগতের শিল্প-সমাহিত নায়করা,

BanglaBook.org

সমরেশ বসুর লক্ষ পৃথিবীর পরবাসী নায়কদের পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বিচ্ছিন্ন নায়করা একে একে বাংলা-সাহিত্যপাঠকের মনের মধ্য দিয়ে মিছিল ক'রে চলেছে অনেক বছর ধরে। এ ছাড়া হঠাৎ হঠাৎ চলে এসেছে রবীন্দ্রনাথের তাবাপদ ("অতিথি"), শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বা বিভূতিভূষণের অপুর মতো জগতবিরহীরা। শহরে নায়কদের কারো কারো মধ্যে সাগরপারের নোনা হাওয়ার স্বাদ যদিও বা পাই, এরা কিন্তু একেবারেই গাঁ-ঘরের।

শশী কিন্তু এদের কারোই সঙ্গী নয়। না থাকে সে দিলীপকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল, অন্নদাশঙ্করের পাড়াতে, না জগদীশ গুপ্তর দুঃস্বপ্নলোকে, না পড়ে বুদ্ধদেব বসুর এলাকায় বয়সে যাদের সে সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র তো ননই, বিভূতিভূষণও তার গোষ্ঠীভুক্ত নন। তবে শশী এল কোথা থেকে? শশী কার দলে? সে কার 'মতো'? কাকে দিয়ে তার যাচাই হবে, কোন্ দাঁড়িপাল্লায় তার ওজন চলবে, কিসের তুলামূলো শশীকে আমরা চিনে নেব?—অগত্যা আবার নজর ছোটে সেই পশ্চিমের বারান্দায়। মনে পড়ে যায় আর-একজন ডাক্তারের কথা।

দেখা যাক, কাম্যুর 'প্লেগ' উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার রিউ কে দিয়ে শশী ডাক্তারকে আমরা চিনতে পারি কিনা। রিউ এবং শশীকে এক দর্পণে দেখতে চাওয়ার মূলে আছে এই দুজনের জীবনবিশ্বাসের সমতা। 'ডাক্তার'—এই প্রবল, নিষাদ সামাজিক সংজ্ঞায় নিজেদের অস্তিত্বকে অভিহিত ক'রে রিউ এবং শশী নিজেদের মনের কাছে মনুষ্যত্বের তারিফ মেটায়—অথচ এতৎসত্ত্বেও রিউ এবং শশী দুই চিরবিরহী নির্বাসিত নায়ক।

শিল্পীর বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়ে, শিল্পী-মানসের সহজাত সমাজদ্রোহিতা নিয়ে এই প্রবন্ধ নয়। যেমন নয় মূলত অনুভূতিহীন, নির্বিকার, অসামাজিক বিদ্রোহী নায়কদের সমস্যা নিয়েও। আমার আলোচ্য দুজন নায়কই সমাজসেতেন, সমাজসেবী। সমাজসেবা এবং জীবনধারণ এই দুই শব্দ এদের কাছে সমার্থক। এদের জন্ম শিল্প ও সমাজের সংঘাতের মধ্যে নয়, যন্ত্রসভ্যতার অনাচারের কলেও নয়, এবং বলা বাহুল্য পলায়নবাদের মধ্যেও তাদের বিচ্ছিন্নতার উৎস খুঁজে মরা বৃথা।

রিউ ও শশী এই দুজনেরই মূল সমস্যা হলো মৃত্যুশাসিত জীবনের অসম্পূর্ণতা মোচনে ব্যক্তিমানুষের প্রয়াসের অর্থহীনতা। যদি আমরা 'প্লেগ'-কে অতি বিশদ অনুপুঙ্খ সহযোগে অসামান্য বাস্তবভঙ্গিতে লেখা একটি রূপক উপন্যাস ব'লে স্বীকার ক'রে নিই, এবং এটাও মানতে রাজি থাকি যে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তেও বাস্তবতার নিপুণ ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে রূপক (রচনার নামের মধ্যেও সেই ইঙ্গিত), তাহলে এই দুই উপন্যাসের পরিকল্পনাগত মূল সাদৃশ্যটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'প্লেগ' উপন্যাসটিকে কাম্যু বরাবরই বলছেন মহামারীর 'ইতিকথা' (chronicle)। ইতিকথার মতোই ঠাণ্ডা নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে উপন্যাসটি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তেও সাধুভাষায় এই শীতল, নৈর্ব্যক্তিক ইতিকথনের ভঙ্গিমাটি ব্যবহৃত। দুটি কাহিনীই নিরুত্তাপ, অনুত্তেজিত, কিছুটা ভাবলেশহীন ঢঙে বর্ণনা করা হয়েছে—কোনো চরম আরোহণ ঘটানো হয়নি কোথাও।

কাহিনীদুটির 'থীম' বলতে বুঝি অবশ্যম্ভাবী দৈবের প্রবল অযৌক্তিকতার কাছে মানুষের যুক্তিনির্ভরতা ও ইচ্ছাশক্তির অসহায়ত্ব। ব্যক্তিমানুষ যতই সচেতনভাবে বাধা দিক না কেন, নৈর্ব্যক্তিক সমাজব্যবস্থার যান্ত্রিক চাপ তাকে ক্রমাগতই ঠেলে দিচ্ছে নেপথ্যে। সেইসব ব্যক্তিরা, যারা প্রচলিত যান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকেই শেষকথা বলে মেনে নিতে পারে না, বা মানে না, যাদের অন্তর্লোকে একটি ত্রুটিমুক্ত, যৌক্তিক, মানবিক জগতের স্বপ্ন জাগ্রত আছে, তারাই হয়ে দাঁড়ায় স্বগৃহে প্রবাসী—'নির্বাসিত নায়ক'। বাইরের সংকীর্ণ, বিকৃত, বিচ্যুত জগতের সঙ্গে এই নির্বাসিত নায়কের কোনো আপস নেই—বিদ্রোহই তার মুক্ত আত্মচেতনার একমাত্র রূপ। এই বিদ্রোহ কখনো প্রকাশ পায় নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেওয়ায়, কখনো বা সক্রিয়ভাবে প্রবল প্রতিবাদের ভাষায়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি অমোঘভাবে তার অব্যবহিত পারিবেশ থেকে,

তারপর আশা ও আদর্শ থেকে, শেষপর্যন্ত নিজস্ব জাগ্রত দেহ-মন থেকে পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার বিশেষ চেতনাই হলো তার তৃতীয় নয়ন, যা তাকে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত ক'রে ফেলে।

আমাদের দুজন নায়কই পেশায় ডাক্তার। বিশ শতকের বুদ্ধিজীবীসুলভ এক ধরনের নির্লিপ্ততা নিয়ে তারা জীবনকে প্রত্যক্ষ করে—প্রধানত মৃত্যুর মধ্য দিয়েই। স্বভাবে যুক্তিবাদী এবং অন্তর্মুখী, দুজনেই সবসময়ে চেষ্টা করছে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে আবেগের সংকট-মুহূর্তগুলিকে যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করে বুঝতে—যাতে বুদ্ধি এবং আবেগের মধ্যে একটা সহজ সংগতি আনা যায়।

শশী এবং রিউয়ের জীবনে স্পষ্ট, সচেতন, একান্ত লক্ষ্য হলো: স্বাস্থ্য। তারা অন্তর থেকে স্বীকার করে, তাদের জীবনের প্রাথমিক আদর্শ: আর্তকে ত্রাণ করা, মৃত্যুকে অস্বীকার করা। এই রোগজর্জর পৃথিবীকে সুস্থ সবল ক'রে তোলা, এই মৃত্যু-কবলিত জগতে জীবনের জয়কেতন ওড়ানোই হলো তাদের বাঁচার উদ্দেশ্য।

অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি উপন্যাসেরই আরম্ভ হচ্ছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। মৃত্যুর শত্রু ডাক্তার কেমন নিরুপায়ভাবে ঘটে-যাওয়া মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছে—এই একই বিচিত্র বৈষম্যের মধ্যে দুটি ইতিকথারই গোড়াপত্তন। ডাক্তার রিউ দেখছে তার ডাক্তারখানার সিঁড়ির গোড়ায় একটা মরা ইঁদুর—আর শশী দেখে গ্রামের উপকণ্ঠে একজন বক্ষাঘাতে মৃত মানুষ। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই মানুষে-ইঁদুরে পার্থক্যটা বেশিদূর যায় না। মৃত্যু যেমন ডাক্তারের প্রাতিস্বিক প্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি তার নিত্যসহচরও। মৃত্যুরই বিরুদ্ধে ডাক্তার প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালায়, যদিও জানে এ যুদ্ধে শেষপর্যন্ত নশ্বর প্রাণীর জয়ী হবার প্রশ্ন ওঠে না। মৃত্যু এমনই এক চরম অ-সুখ যার নিরাময় কোনো বদ্যির সাধ্যে নেই। সুতরাং চিকিৎসকের জীবিকাই হলো প্রকৃতির ঈশ্বরের নিয়মকে প্রতিহত করা; ভবিতব্যকে অস্বীকার করা; অনিবার্যকে, সাময়িকভাবে হলেও, নিবারণ করা। এ যেন সেই সিসিফাসের শাস্তির মতো, যে কেবলই পর্বতের চূড়াতে ঠেলে তুলছে এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড, অথচ সে-প্রস্তর নিজের ভারেই আবার গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের তলায়। ডাক্তারের নিয়তিও তেমনি অন্তহীন অসফলো লড়াই।

সিসিফাস শৃঙ্খলিত করেছিল মৃত্যুকে—সে পরম ঔদ্ধত্যের যোগ্য শাস্তি দিতে বসে গ্রীক পুরাণের দেবকুল 'ব্যর্থ, নিষ্ফল পণ্ডশ্রমের চেয়ে কঠিনতর কোনো শাস্তির কথা ভেবে পাননি।'[১] কাম্যু নিজেও হোমারের মতোই সিসিফাসকে 'মরণশীলদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ এবং বিচক্ষণ'[২] বলে মনে করতেন। সিসিফাসের অপরাধ এবং সিসিফাসের দণ্ড, দুইয়ের মধ্যে দিয়েই সে হয়ে দাঁড়িয়েছে কাম্যুর 'অ্যাবসার্ড নায়কের আদর্শ'।[৩] রিউ এবং শশী নশ্বর হয়েও মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে স্বেচ্ছায় ঠিক যেন সিসিফাসের দণ্ডই মাথায় তুলে নিয়েছে। দুজনেই তাদের নিষ্ফল প্রয়াস বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন, যদিও শেষ বিচারে আমরা দেখি যে এই উপলব্ধি শশীর চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিহিত আছে রিউ-এর মধ্যে। সে যাই হোক, দুজনেই চেষ্টা করে প্রচলিত বিশ্ববিধিকে নির্দেশ ক'রে তুলতে। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও এই মৃত্যুময় দুরারোগ্য দুনিয়ার বিপরীতে সাধ্যমতো সংগ্রাম চালিয়ে যায় শশী আর রিউ।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) এবং 'প্লেগ' (১৯৪৭) উভয় উপন্যাসেই লক্ষ করি এক বিশ্ববীক্ষা,—চিকিৎসকের দৃষ্টিতে মানব-অস্তিত্বের বিচার। এখানে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা জরুরী যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি কলকাতাতে প্রকাশিত হয়েছিল পরি-তে কাম্যুর উপন্যাস প্রকাশ পাবার এগারো বছর—প্রায় একযুগ—আগে। এমন-কি কাম্যুর 'আউটসাইডার' উপন্যাসও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র ছ-বছর পরে লেখা। ভাগ্য ভালো যে নেহাৎ সন-তারিখের প্রামাণিকতায় মানিকবাবু পশ্চিম প্রেমিক সমালোচকদের বাড়ু বাল্তির আওতা থেকে বেঁচে গেছেন। তাই ক বলি কি ক'রে, তাঁরা হয়তো বলবেন কাম্যু না থাকুন, কাম্যুর

BanglaBook.org

পূর্বসূরিরা তো ছিলেন! তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ এই যে আমরা যেমন কাম্যুর উপরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব খুঁজতে যাবো না তেমন-অরিন্দম মানিকবাবু পূর্ববর্তী হলেও,—তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অস্তিবাদী দর্শনচিন্তার প্রভাব যেন আমরা খুঁজতে না যাই। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' লেখবার সময়ে বা তার আগে (এবং বহু পরেও) ফরাসি অ্যাবসর্ড তত্ত্বের সঙ্গে, বা পশ্চিমী অস্তিবাদের সঙ্গে মানিকবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। এই বিষয়ে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি (এই প্রবন্ধ নিশ্চয়ই মানিকবাবুর বিষয়ে লেখকের নয়) তাতে অস্তিবাদী দর্শনে তাঁর কোনো কালেই যে বিশেষ উৎসাহ জন্মেছিল তা মনে হয় না। আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের 'নির্বাসিত নায়ক'দের পূর্বসূরিদের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরোক্ষ পরিচয়ের সূত্র খুঁজতে গেলে একমাত্র ডস্টয়েভস্কি ভিন্ন আর তো কোনো লেখকের প্রসঙ্গ আমি ভাবতে পারি না—এ বিষয়ে আপনাদের অন্য তথ্য জানা থাকলে, আমাকে তা জানালে উপকৃত হব। বস্তুত, যিনি অস্তিবাদী দর্শনে দীক্ষিত হননি, এমন-কি সে-তত্ত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ (বা পরোক্ষ)-ভাবে পরিচিতও ছিলেন না, এমন একজন ভারতীয় লেখকের পক্ষে শশীর মতো একজন স্পষ্টত অস্তিবাদী নায়কের জন্ম দেওয়া—যেন এক জাদুকরী সৃষ্টি! কিংবা আমরা কথাটা এভাবেও বলতে পারি যে এর থেকে বোঝা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ-চেতনা স্বনির্ভরভাবেই কতদূর বিস্তৃত, কত আধুনিক ছিল।

এই প্রবন্ধে আমি রিউয়ের জীবনবীক্ষার পাশাপাশি শশীর জীবনধারণাকে মিলিয়ে, কাম্যু ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তার সাযুজ্য দেখতে চেষ্টা করব। 'প্লেগ' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' থেকে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে এই সমান্তরাল প্রবাহ খুব সহজেই নজরে পড়ে।

প্রথমেই দেখেছি যে দুটি উপন্যাসই 'ইতিকথা'র ঢঙে লেখা। কাম্যুর 'নোট বই'তেও তাঁকে ভাবতে দেখা যায়—এই বিশিষ্ট রচনারীতি নিয়ে।[৪] মানিকবাবু তো নামের মধ্যেই শব্দটি স্পষ্টত ব্যবহার করেছেন। ধরুন যদি 'প্লেগ' না হয়ে উপন্যাসের নাম হতো 'পুতুলনাচের ইতিকথা', তার দ্বারা কাম্যুর অভিপ্রেত ব্যঞ্জনার কোনো মৌল হানি ঘটত বলে আমার মনে হয় না। ১৯৪১-এ কাম্যুর নোটবই থেকে জানা যায় যে ওরানের মহামারীকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে একটি উপন্যাস লেখবার কথা তিনি ভাবছেন:

"একজন দার্শনিক সেখানে (সেই শহরে) বসে 'অকিঞ্চিৎকর কর্মে'র ('insignificant actions') একটা ইতিকথা ('anthology') লিখেছেন। তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্লেগমারির একটি দিনপঞ্জি রাখবেন।"[৫]

'পুতুলনাচের ইতিকথা'ও তো মানুষের 'অকিঞ্চিৎকর কর্মের'ই দিনপঞ্জি। যেখানে মানুষ ঘটনাচক্রের মধ্যে পুতুল মাত্র। মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতেও সেই একই সত্য পরিবেশন করতে চেয়েছেন কাম্যু। 'প্লেগ' উপন্যাসের প্রারম্ভে ড্যানিয়েল ডিফো থেকে যে-উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন কাম্যু, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র গোড়ায় উদ্ধৃত করলে সেটি একটুও বেমানান হতো না।[৬]

'প্লেগ'-এ আমরা দেখি ডাক্তার রিউ এমন এক বিধ্বংসী পরিস্থিতির সম্মুখীন, যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে। মড়ক সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যা-কিছু শুভ, সব ধ্বংস করছে। এই প্রবল অশুভের কবল থেকে মুক্তি নেই মানুষের, মৃত্যু সবলে ছিনিয়ে নিচ্ছে জীবনকে। ওরানের নরনারীরা মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করছে, কেননা তারা আগে থেকেই অধ্যাত্মিকভাবে মৃত: 'ওরানের মহামারী তার ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে মানুষের অন্তঃস্থ মনুষ্যত্বকে বিনাশ ক'রে।'[৭] গারমেইন ব্রে অন্যত্র এই মন্তব্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করছেন—"আউটসাইডার...উপন্যাসের চরম মানবিক ঔদাসীন্য থেকেই 'প্লেগ'ও...তার সর্বনাশা শক্তি সংগ্রহ করেছে।"[৮]

এই 'চরম মানবিক ঔদাসীন্য'ই গাওদিয়া গ্রামেরও নষ্ট নিয়তি। এরই অশুভ জোরে জোর পেয়ে গাওদিয়ার আত্মধ্বংসী, মরণকেন্দ্রিক জীবনলীলা চলে—যা শশীকে অভিভূত বিধ্বস্ত ক'রে

ফেলে। আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণ বিজ্ঞানী শশী স্ব-গ্রামে ফিরে আসে অজ্ঞতা আর অস্বাস্থ্যের অন্ধকূপে মুক্ত আলো-হাওয়া ছড়াবার আশা নিয়ে। কিন্তু নিজেদের ভালোমন্দ, শুভাশুভ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের চরম ঔদাসীন্য দেখে সে হতাশ হয়ে পড়ে। যে-কোনো পরিবর্তনেই তাদের অনীহা—তারা উন্নতি চায় না, চায় নিশ্চল অবস্থা আঁকড়ে পড়ে থাকতে।

আমরা ডাক্তার শশীর প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম শববাহক হিসেবে। চিকিৎসক গ্রামে প্রবেশ করছে, নিয়তি-নিহত একটি মৃতদেহ বহন করে—দৈবের এই প্রচণ্ড পরিহাসের মধ্যে সমগ্র উপন্যাসটির মূলভাব নিহিত আছে। 'আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।'[১০] এবং তাঁর সেই লীলার আঘাতে হাক ঘোষ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বৃক্ষের গায়ে, বৃক্ষের মতোই চলৎশক্তি রহিত। অন্য শহরে গিয়ে ডাক্তারি শিখে আসা শশী কেবলমাত্র পাবে সেই বজ্রদগ্ধ দেহ প্রিয়-পরিজনের কাছে পৌঁছে দিতে। জীবনের দূত হয়ে যে এসেছে, তার প্রথম পদক্ষেপ ঘটল মৃত্যুর দৌত্য নিয়ে। উপন্যাসের প্রথম পাতাতেই ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা, তার অসহায়ত্ব, নির্মম উপায়হীনতা, সন্দেহাতীতভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। দৈবের লীলার পুতুল হয়ে, সুতোর টানে হাত-পা নেড়ে যে মনুষ্যজীবন, রিউ এবং শশীর জীবন তবুই প্রতিবাদ—কিন্তু সে প্রতিবাদ শুধু উচ্চারিতই হয় মাত্র। ফললাভ ঘটে না।

রিউ যেমন পারে না শহরে ছেয়ে-যাওয়া মহামারীকে প্রতিরোধ করতে, তেমনি শশীও পারে না গ্রামের সর্বগ্রাসী মন্দের প্রতিকার করতে। সর্বস্তরের পরিব্যাপ্ত অশুভ শক্তির (evil) জন্য মেলভিল যেমন 'মোবি ডিক' উপন্যাসে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন, কামুও তেমনি মহামারীকে একটি কেন্দ্রীভূত প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা করেননি। তাঁর বিন্যাসের ধরন কিছু আলাদা। পর পর সাজানো অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনায়, শশীর একটানা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্ষয় ও মৃত্যুর ব্যাপক প্রভাব প্রকাশ করছেন তিনি। প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখতে পাই ভালো করার জন্য শশীর ব্যর্থ প্রচেষ্টা, যেমন রিউ পণ্ডশ্রম করে প্লেগের রুগীদের প্রাণ বাঁচাতে। উভয় ক্ষেত্রেই উপলব্ধিটা এক রকম—মানুষের ইচ্ছাশক্তি, শুভৈষণা কত অর্থহীন! শশীর প্রধান সংগ্রাম ছিল চেতনাহীনতার বিরুদ্ধে। স্থিতাবস্থাই হলো গাওদিয়া গ্রামের চরম অভিশাপ। ওখানের অধিবাসীদের মতোই, গাওদিয়ার লোকেরাও তাদের বদ্ধ, দুর্গন্ধ মনের বাইরে যে-জগৎ, তার বিষয়ে কিছু জানতে চায় না। শশী ব্যাকুল হয়ে সেই অসাধ্যই সাধতে চেষ্টা করে:

> সমস্ত গ্রামকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখাইতে যাওয়া বৃহৎ ব্যাপার, ওটা না হয় সে বাদ দিল, কিন্তু নিজের গৃহে?...বাহিরে সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার ভাড়া করা সৈনিক; গৃহে তাহার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, মৃত্যুর আধিপত্য।'[১১]

ঘরে এই মৃত্যুর আধিপত্য ঠেকাতে গিয়ে শশী সকলের অপ্রিয় হয়ে পড়ে। অসময়ের ঘুম থেকে তারা কিছুতেই জাগবে না, তাদের কোনো বন্ধ বাতায়নই শশীর ধাক্কায় খুলবে না। প্রায় দেবদূতের মতোই শশী এসে দাঁড়ায়: 'দুপুরবেলা শশী ঘরে ঘরে বলিয়া যায়, ওঠ, উঠে পড় সবাই, ঘুমোতে হবে না!'[১২] তার স্বর শোনায় যেন উপনিষদের মন্ত্রপাঠের মতো—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।[১৩] কিন্তু গাওদিয়ার নিদ্রিত মানুষেরা তাদের প্রাপ্য বরগুলির বিষয়ে সচেতন নয়, জীবনের কাছে তাদের কোনো দাবি নেই, তাদের মনে কোনো অধিকারবোধই জন্মায়নি। তারা বিদ্রোহ করে শশীরই বিরুদ্ধে: 'শশী যেন পাগল, স্বাস্থ্য দিয়ে আমাদের কি হবে!'[১৪]

কিন্তু তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কান না দিয়ে শশী মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে:

> 'তোমাদের কাণ্ডখানা কি! দম আটকে মরবে যে সবাই। সব জানলা বন্ধ, বাতাস আসবে কোথা দিয়ে?

তোমারা হাসে, জানলা খুলিলে ঠাণ্ডা লাগিবে না? একঘর বাতাসে আগে এর কটি প্রাণী নিশ্বাস নিক, দম তো আটকাইবে তবে?''[১৪]

ওরান শহরকেও ছেয়ে ফেলে এই একই দমবন্ধতা। কাম্যু তাঁর নোটবইতে লিখেছেন:

'আমার ইচ্ছে আছে প্লেগের মাধ্যমে আমাদের মধ্যেকার দম-আটকানো ভাবটা ফুটিয়ে তোলবার—আমরা যে-পরিবেশের মধ্যে বাস করি, তার সন্ত্রাস আর নির্বাসনের চেহারাটা আঁকবার। এই সঙ্গে আমি আমাদের অস্তিত্বের সামগ্রিক ধারণা সম্পর্কেও একটি সাধারণ ভাষ্য রচনা করতে চাই।''[১৫]

ব্রে কথাটা সুন্দরভাবে বলেছেন:

'ডাক্তার রিউ-এর বর্ণনা অনুযায়ী ওরানের অধিবাসীদের ভালো-মন্দ বিষয়ে বাস্তব বোধ নেই বললেই চলে। এবং এই কারণেই প্লেগ অতি সহজে তাদের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বাধা দেবার কেউ নেই..., এই চেতনাহীনতার ফলে সারা শহরকে গ্রাস করে নেয়।'

গাওদিয়ারও সেই অবস্থা।

'প্লেগ এখানে বাইবেল কোনো বিমূর্ত প্রতীক নয়, ওরানের অধিবাসীদের মনের মূল্যবোধের অন্তঃস্থল পর্যন্ত তা প্রসারিত।''[১৬] এখানে দেখা যাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে শশীর চোখ দিয়ে গাওদিয়ার লোকদের দেখছেন:

'রোগে ভুগিয়া অকারণে মরিয়া ওরা বড় আনন্দে থাকে'...স্বাস্থ্যের সঙ্গে প্রচুর জীবনীশক্তির সঙ্গে, ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য ওর প্রত্যেকে কয় মুহূর্তের অভাব, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ওদের মনের বিস্ময়কর ভাঙা-গড়া চলে, পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা: তাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াসা, শ্যামল শৈবাল, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা, কলমি ফুল। সতেজ উত্তপ্ত জীবন ওদের সহিবে না।'

ফলে,

'বাড়ির লোকের স্বাস্থ্য ভাল করার চেষ্টা শশী ত্যাগ করিয়াছে। প্রথমটা ভয়ানক রাগ হইয়াছিল; ক্রমে ক্রমে সে করিয়াছে জ্ঞানলাভ।''[১৭]

ঠিক এই অপরিবর্তনীয় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তির ব্যর্থতা নিয়ে রিউ-এরও আক্ষেপ। অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে ক্রমে সেও করে, 'জ্ঞানলাভ'। তার রোষ, তার ক্ষোভও ভোঁতা হয়ে আসে:

'তখন তরুণ ছিলাম, এবং এই অনড় অবস্থার ('the whole scheme of things') ফলে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হতাম---অন্তত তখন আমার তাই মনে হতো ক্রমে ক্রমে আমি ঢের বিনীত ('modest') হয়ে উঠেছি।''[১৮]

কিন্তু রিউয়ের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে জরুরী, তা হলো, রিউ কিছুতেই 'মানুষের মৃত্যু দেখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়তে''[১৯] পারেনি ডাক্তার তো আর মরণকে নির্বাসন দিতে পারে না, পারে কেবল বিলম্বিত করতে। কিন্তু তাই বলে যদি মৃত্যুর নিশ্চয়তার কাছে হাল ছেড়ে দেয় তাহলে তো ডাক্তার আর ডাক্তার থাকে না। এবং ডাক্তার না থাকতে পারলে রিউ এবং শশীর ক্ষেত্রে নিজেদের কাছে তাদের স্বকীয় অস্তিত্বই বজায় থাকে না।

রিউ আর শশী দুজনেই তাদের অস্তিত্বের সার্থকতা খোঁজে স্বাস্থ্যের রক্ষক হিসেবে, মৃত্যুর বিপক্ষে জীবনের প্রবক্তারূপে। দুজনেই জানে যে মৃত্যুই হলো সেই শেষ বিধান যার ফলে অন্তিমে সব সুখ আর সব দুঃখ একই অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। কেননা অস্তি অনিবার্যভাবে পর্যবসিত হবে নাস্তির মধ্যে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জগতের প্রচলিত সর্বস্বীকৃত মূল্যবোধগুলির আর কোনো মানে থাকে না, দুঃখ-সুখ, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, কল্যাণ-অকল্যাণ, এমন-কি মরা-বাঁচা—সব কিছই মূলত তাদের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। এসব জেনেও রিউ এবং শশী

BanglaBook.org

নিজেদের জীবিকার প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠা বজায় রাখার মধ্যে বেঁচে থাকার সার্থকতা খোঁজে। কিন্তু পরিণতিতে রিউ এবং শশীর উপলব্ধি ভিন্ন পথ নেয়। রিউ এবং শশীর এই পার্থক্য নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। প্রথমে সামঞ্জস্যের দিকটিই দেখা যাক।

'রিউ বিশ্বাস করে, সে ঠিক পথেই চলছে—তার পথ হচ্ছে যে-সৃষ্টিকে সে জেনেছে, সেই সৃষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো।

তারু প্রশ্ন করে : 'তোমার নিজের জীবিকা সম্পর্কে তাহলে এই ধারণা ?' 'মোটামুটি তাই'...রিউ জবাব দেয়।

'এই মুহূর্তে আমি শুধু জানি যে জগতে রুগ্ন মানুষ আছে, এবং তাদের সুস্থ করা দরকার। পরে হয়তো তারা সবকিছু নতুন ক'রে ভেবে দেখবে, আমিও ভাবব। কিন্তু এই মুহূর্তের কর্তব্য হচ্ছে ওদের নীরোগ ক'রে তোলা। আমি আমার সাধ্যমতো তাদের রক্ষা করি, এই পর্যন্ত আর কি।'

'কার হাত থেকে ? (তারু প্রশ্ন করে)

'আমার কোনো ধারণা নেই, তারু ; বিশ্বাস করো, আমার কোনো ধারণা নেই।...এ-জগতের সব ব্যবস্থাই তো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মৃত্যুর বিধানে, ঈশ্বরের পক্ষে কি এটাই ভালো হয় না, যদি আমরা তাঁকে বিশ্বাস না করি, যদি সর্বশক্তি দিয়ে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাই, যে-স্বর্গে তিনি নিঃশব্দে বিরাজ করেন তার দিকে চোখ না তুলে ?'

...হ্যাঁ। কিন্তু তোমার সে বিজয় কখনোই স্থায়ী হবে না। এই যা।'

রিউয়ের মুখ কালো হয়। 'হ্যাঁ। আমি তা জানি। কিন্তু তা বলে লড়াই থামিয়ে দেবার তো কোনো মানে হয় না।'

'মানে হয় না ঠিকই।...এবারে আমি বুঝতে পারছি তোমার কাছে এই মহামারীর অর্থ কি!'

'হ্যাঁ। এক অন্তহীন পরাজয়।'

'কে তোমাকে এসব শেখালো, ডাক্তার ?'

'দুঃখ।'[২০]

এবার দেখা যাক শশী কীভাবে তার এই 'অন্তহীন পরাজয়ে'র জীবিকাকে দেখেছে।

'সে রোগ সারায়, অসুস্থকে সুস্থ করে। অথচ একেবারে চরম হিসাব ধরলে শুধু এই সত্যটা পাওয়া যায় রোগে ভোগা, সুস্থ হওয়া, রোগ সারানো, রোগ না-সারানো সমান—রোগীর পক্ষেও, শশীর পক্ষেও। এসব ভাবিতে ভাবিতে কত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে শশীর জাগে![২১]

শেষ পর্যন্ত কঠিন সত্য হলো মৃত্যু—কি রোগী কি ডাক্তার, আখেরে কারোই অস্তিত্ব থাকবে না, যুক্তি, বা আবেগ, কোনো পথই মানুষকে মুক্তি দেয় না, যেহেতু রিউয়ের ভাষায়, 'জগতের সব ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মৃত্যুর বিধানে।' আমরা জানি মানিকবাবু ও কাম্যুর ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রশ্ন অবান্তর—সেজন্যই আমরা নির্বাক বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যক্ষ করি বাংলাসাহিত্যে একজন 'অ্যাবসার্ড'-প্রবক্তার চমক জাগানো আবির্ভাব। শশী এবং রিউ কেমন একই ভাষায় কথা বলে!

'শশী ভাবে। ভাবিয়া অবাক হয় শশী। কুমুদ একদিন এই ধরনের একটা লেকচার ঝাড়িয়াছিল, পৃথিবীসুদ্ধ লোক যে কত বোকা এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য। কাপড় মাপা গজ দিয়া আমরা নাকি আকাশের রঙ মাপি, জীবনের অবশ্য হিসাবে স্থির করি মনের সুখ-দুঃখ : বলি, মানুষ দুঃখী, আর রাগে গরগর করি।'[২২]

জীবনের এই অযৌক্তিকতা, এই 'বোকামি' কি আর একধাপ এগোলেই অ্যাবসার্ড তত্ত্বের এলাকায় গিয়ে পড়ে না ?

'শশী ভাবে। শিশুর জগতে আমাদের সত্য সত্যই স্তর-বিভাগ নাই! বস্তু আর বস্তুর অস্তিত্ব

BanglaBook.org

এক হইয়া আছে আমাদের মনে। কখনো কি ভাবিয়া দেখি মানুষের সঙ্গে মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার কোন সম্পর্ক নাই?'[২৩]

আজকের পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠকের এখানে চমকে না উঠে উপায় নেই। অস্তিবাদের গোড়ার কথা নিয়ে মানিকবাবুর এই অত্যন্ত সরল মন্তব্য মর্মভেদ না ক'রে পারে না।

'মানুষটা যখন হাসে অথবা কাঁদে তখন হাসি-কান্নার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলি মানুষটাকে: মনে মনে মানুষটার গায়ে একটা লেবেল আঁটিয়া দিই—সুখী অথবা দুঃখী। লেবেল আঁটা দোষের নয়। সব জিনিসেরই একটা সংজ্ঞা থাকা দরকার। কে হাসে আর কে কাঁদে এটা বোঝানোর জন্য দু-দশটা শব্দ ব্যবহার করা সুবিধাজনক বটে। তার বেশি আগাই কেন? কেন পরিবর্তন চাই? নিঃশব্দে অশ্রু মুছিয়া আনিতে চাই কেন সশব্দ উল্লাস? রোগ শোক দুঃখ বেদনা বিষাদের বদলে শুধু স্বাস্থ্য বিস্মৃতি সুখ আনন্দ উৎসব'—ছাপিয়ে পড়ছে মারীমুক্ত ওরানে পথ-ঘাটে। আর তারই সঙ্গে কাম্যু উল্লেখ করেছেন সেই নিঃশব্দ, মৌন, আর্ত মানুষগুলিকে, মারী যাদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে গেছে, কেবল স্মৃতিটুকু ছাড়া।[২৪] পাশাপাশি এই শোকস্তব্ধতা আর আরোগ্যোদ্ভতা সাজিয়ে কাম্যু মানবিক আবেগগুলির মৌল অসারতা স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন। শশীর জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধগুলির সারমর্ম বিষয়ে সন্দিহান 'লাভ না থাকে, ক্ষতিই বা কি।' কাম্যুর পাঠকরা এই সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

জীবনের অর্থহীনতা, ঘটনার অযৌক্তিকতা, মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রম, প্রার্থনা, স্নেহ, যত্ন, বিজ্ঞান, বিশ্বাস—সবকিছুরই মূল্যহীনতা প্রমাণ করতে আমরা দেখতে পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাম্যু একই চরম প্রতীক বেছে নিয়েছেন। যেমন তাঁদের নায়কের জীবিকার চয়ন এক, তেমনি সেই জীবিকার অসার্থকতা প্রমাণ করতেও তাঁদের উদাহরণের মিল আমাদের আশ্চর্য না ক'রে পারে না।

যেমন দেখি উপন্যাসের গোড়ায় বিজয়ী মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাতের মধ্যে দিয়েই ডাক্তারের মৃত্যুবিরোধী সংগ্রাম শুরু, তেমনি তার চরম ব্যর্থতা ফুটিয়ে তুলতে দুই ঔপন্যাসিকই বেছে নিয়েছেন শিশুমৃত্যুর ঘটনা। স্পষ্টতই একটি শিশুর নিরীহ, নিষ্পাপ জীবন কেড়ে নেওয়ার পক্ষে ঈশ্বরের কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

এই নির্মম অপচয়ের কোনো মানে নেই। এর একমাত্র সম্ভবপর ব্যাখ্যা হলো এই যে বেঁচে থাকারও কোনো মানে হয় না আমরা সকলেই অদৃশ্য সুতোর টানে নৃত্যরত পুতুল,—বিধি খেলাচ্ছলে কটাক্ষ করলেই আমরা শেষ হ'য়ে যাই। 'প্লেগ' উপন্যাসে মঁশিয় অত্তোনের ছোটো ছেলেটি মারা যায়। রিউয়ের সমস্ত শিরাম, তারুর একান্ত সেবা, পাদ্রি পানেলুর বুকফাটা প্রার্থনা, পিতামাতার অশ্রুজল, কিছুই পারে না তার অনিবার্য নিয়তিকে প্রতিরোধ করতে। মানুষের স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় করা প্রয়াস ব্যর্থ ক'রে দিয়ে মৃত্যু তার খাজনা আদায় ক'রে নেয়। না বিশ্বাস, না বিজ্ঞান পারে তাকে বাধা দিতে।

ঠিক এই একই দৃশ্য ঘটতে দেখি বাসুদেব বঁড়ুজ্যের ছেলেটির মৃত্যুশয্যায়। শশীর আপ্রাণ চেষ্টা, পরিজনদের আকুল প্রার্থনা, অসহায় কান্না, সমস্ত ব্যর্থ ক'রে দিয়ে দশ বছরের বালকটি

BanglaBook.org

যায়া যায়। নিয়তিকে ঠেকানো কোনো ডাক্তার, কোনো মা, কোনো পাদ্রির সাধ্য নয়। স্রষ্টার স্বমখেয়ালিপনার কাছে মানুষ একেবারেই অসহায়, নিরুপায়,—তার সব চেষ্টা অনর্থক। এই সত্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য ১৯৩৬-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৯৪০-এ কামু ঠিক একই চিত্রকল্প বেছে নিয়েছিলেন।

'প্লেগ' উপন্যাসে রিউয়ের সামনে দিয়ে মহামারীর মৃত্যুলীলা ব'য়ে চলে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তে শশীর চোখের সামনে দিয়ে সমানে ঘটতে থাকে আধ্যাত্মিক, এবং জৈবিক মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অন্তহীন খেলা। এ-মৃত্যু আকস্মিক মড়ক-প্রসূত নয়—এ-মরণের বীজ জীবনে মূল চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। 'প্লেগ' উপন্যাসের শেষে সেই হাঁপানি রোগীটি (যে বলত 'আমি বাঁচতে জানি'—এবং থাকেও বেঁচে) মন্তব্য করে—'প্লেগ' মানে কি? ও তো জীবন বৈ আর কিছু নয়।'[২৬]

'পুতুলনাচের ইতিকথাতে'ও মৃত্যুগুলির চেহারা বড়ো ভয়ানক। দশবছর প্রতীক্ষার পরে কুসুমের প্রেম ম'রে যায়। 'কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।'[২৭] শশী ভাবে: 'কুসুম মরিয়া গিয়াছে,—তারই চোখের সামনে তারই অন্যমনস্ক মনের প্রান্তে। কি ছেলেখেলায় সে মাতিয়াছিল যে এমন ব্যাপার ঘটিতে দিল?'[২৮] শশী ডাক্তারের চোখের সামনে ম'রে যায় প্রাণচঞ্চলা কুসুম, যে, গাওদিয়া গ্রামের দূষিত স্পর্শ থেকে নিজেকে দশবছর মুক্ত রেখেছিল, এবং গ্রাম ত্যাগ ক'রে যাবার শক্তি যার আছে। সেই 'পাগলী' কুসুম—নির্বাসিতা নায়িকা কুসুম।

শুধু কি কুসুম? বিন্দুর বেলাতেও শশী ডাক্তারের পরাজয়ের চেহারা দেখি। যে বোনকে উপপত্নী-জীবনের লজ্জা থেকে বাঁচাতে শশী স্বামীর ঘর থেকে কেড়ে নিয়ে এল, সে আসলে মুক্তি চায় না। গাওদিয়ার লোকদের মতো পাপ-জীবনের বিষ তার দেহে-মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তার এখন মদের নেশা তীব্র, উত্তেজনাপূর্ণ অস্বাভাবিক জীবন ছাড়া সে আর 'বাঁচতে' পারে না। মাঝরাত্রে তাই ওষুধের গ্লাসে ক'রে বোনকে মদ পরিবেশন করতে হয় শশীকে, শেষ অবধি চরম হার মেনে নিয়ে পৌঁছে দিতে হয় সেই স্বামীরই বাড়িতে।

কিন্তু আধ্যাত্মিক মৃত্যুর অসহায় দর্শকের ভূমিকাই শশীর একমাত্র নিয়তি নয়। বাংলাসাহিত্যের পাঠকরা কোনোদিনও ভুলতে পারবেন না যাদব ঠাকুর ও পাগলদিদির যুগ্ম-আত্মহত্যার ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারী দৃশ্য—আশপাশের গ্রাম উজাড় করে যখন ভক্তরা লুটিয়ে পড়ছে এই 'ইচ্ছামৃত্যু' ঘটন-পটু সিদ্ধপুরুষের পায়ের কাছে, রুদ্ধশ্বাসে শশী ডাক্তার তখন চিনতে পারছে যাদবের মুখে তখন ফুটে-ওঠা আফিমের বিষক্রিয়া। সে জানে এই মৃত্যু ইচ্ছা মৃত্যু নয়, সামাজিক পরিস্থিতির চাপে মুখরক্ষার দায়ে তাঁকে এই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। অথচ সেই সামাজিক অবস্থারই দায়ে পড়ে শশীর পক্ষে এই নির্মম মৃত্যু অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করা ছাড়া কিছুই করবার নেই। ওখানে ডাক্তারির প্রশ্ন ওঠে না। এই দ্বৈত আত্মহত্যার সমতুল্য নিষ্ঠুর, নীতিহীন, অমানবিক মৃত্যুর দ্বিতীয় কোনো নজির বাংলাসাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। শশী শুধু পুতুল—দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কিছুই সে ক'রে উঠতে পারে না। ভাগ্যের আরো নিদারুণ পরিহাস এই, যে পাগলদিদি তাকে ডেকে অভিযোগ করেন যে সে-ই এই গুজবটি ছড়িয়েছে যে রথের দিনে যাদব ঠাকুর ইচ্ছামৃত্যু বরণ করবেন। ডাক্তার কোথায় জীবনদাতা হবে, তা নয়, কোথাকার একটি অসতর্ক মন্তব্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলে সে-ই হয়ে দাঁড়ায় দুটি মৃত্যুর উপলক্ষ।

তাছাড়া আছেন সেনদিদি। প্রাণপাত করে যার বসন্ত রোগ সে সারালো, সেই মধুর লাবণ্যময়ী সেনদিদির কিন্তু পুনর্জন্ম ঘটলো না—তার বদলে উদ্ভূত হলো এক কানা, কুৎসিত রমণী, যার দেহ-মন দুয়ের লাবণ্যই অন্তর্হিত প্রাণ বাঁচানোর জন্য শশীর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে সে শশীকেই প্রতিসম্পাত দেয় তাকে রূপহীন, দৃষ্টিহীন করে দেবার অপরাধে।

এই কুশ্রী সেনদিদিও শেষপর্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকে না, শশীর প্রতিদ্বন্দ্বী, তার পিতা গোপালের অবৈধ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে শশীরই হাতে মৃত্যু ঘটে সেনদিদির।

সেই যে তারু রিউকে বলেছিল; তোমার কোনো বিজয়ই স্থায়ী হবার নয় শশীরও তাই—সিসিফাসের মতো শশী একবার পর্বতশিখরে ঠেলে নিয়ে যায় বিশাল পাথরের চাঁই—আবার সে পাথর তার নিজের ভারেই গড়িয়ে পড়ে যায় পাহাড়ের নিচে।

রিউ এবং শশীর মধ্যে কিন্তু পরিণতিতে একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। শশী শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেয় রিউ হাল ছাড়ে না। শশী শুরু করে সাফল্যের আশা নিয়ে—'...টিলার উপর উঠিবার কি দরকার ছিল শশীর? সূর্যাস্ত দেখিবে।...কী ছেলেমানুষী শখ!'[২৯] শেষ পর্যন্ত জীবনের উপর্যুপরি ধাক্কা, অথবা মৃত্যুর উপর্যুপরি ধাক্কা শশীর ছেলেমানুষি ঘুচিয়ে, তার শখ মিটিয়ে দিল। উপন্যাসের শেষে আমরা তাকে দেখি ভগ্নোদ্যম, হতাশ্বাস, পরাজিত। 'মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।'[৩০]

কিন্তু শশীর যে-আবিষ্কারের মধ্যে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' শেষ হয় 'প্লেগ' কাহিনী আরম্ভের আগেই রিউয়ের সে তত্ত্বজ্ঞান ঘটে গিয়েছে। শশীর যাত্রা যেখানে শেষ, রিউয়ের যাত্রা সেখান থেকেই শুরু। রিউয়ের মনে সাফল্য বিষয়ে মোহ নেই, তাই অসাফল্য নিয়েও সে আর মাথা ঘামায় না যেহেতু তার মনে আশ্বাস নেই, তাই সে হতাশ্বাস হয় না, কেবল কাজ করার জন্যই কাজ করে যায়, সত্যিই ফলের কল্পনা মনে রাখে না। এখানেই রিউ শক্তিমান্—শশী দুর্বল। এখানেই রিউ অপরাজিত থেকে যায়: 'কিছুতেই মৃত্যু দেখতে অভ্যস্ত' হয়ে পড়ে না সে। অথচ শশী হার মেনে নেয়:...'কিছুই ভ্রান্ত শশীর চেতনায় পৌঁছায় না, জীবন সম্বন্ধে যে অমন তীব্রভাবে সচেতন, সে হইয়া থাকে পুতুলের মত চেতনাহীন।'[৩১]

জীবনবীক্ষার সমতা সত্ত্বেও দুই নায়কের এই অসম পরিণতির পক্ষে সম্ভবত দুটি কারণ থাকতে পারে:

ক। কাম্যুর মধ্যে পাশ্চি তার সমসাময়িক পশ্চিমী ঐতিহ্যের স্বাভাবিক পরিণতি—চিন্তার দিক থেকে রিউয়ের পূর্বসূরি আছে অনেক। এমন-কি কাম্যুর নিজস্ব ভাবধারার মধ্যেও 'আউটসাইডার'-এর নায়ক মারসোর পরে রিউ একধাপ এগিয়ে গিয়েছে। কাম্যু তাঁর নোটবইতে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন বোলঁ বার্তকে লেখা চিঠিতেও এ নিয়ে বিশদ উল্লেখ রয়েছে।[৩২] 'আউটসাইডার' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচক আঁরি এল্ 'ফঁতান্'-এর জুলাই (১৯৪২) সংখ্যায় কাম্যুর জীবনদর্শনের সঙ্গে সার্ত্র, মলরো, এবং কিয়ের্কেগার্দের তুলনা করেছিলেন। এ তুলনা 'মিথ অফ সিসিফাস' না পড়েই (কেননা তা ডিসেম্বর ১৯৪২-এ প্রকাশিত হয়) করা। এছাড়া কাফকায়, দারবুসের উপন্যাসে আবসার্ডের ধারণা পেয়েছিলেন কাম্যু। রিউয়ের ধমনীতে শোণিত সঞ্চার করেছেন অনেকেই। কিয়ের্কেগার্দ, হুসেরল, সার্ত্র, বাসপার্স, হাইডেগর, মালরো—বহুজনের অস্তিবাদী তত্ত্বে কাম্যুর জীবনদর্শন পুষ্ট হয়েছিল। মারীদমনের বিদ্রোহে রিউ তাই একা নয়, তার সঙ্গী রয়েছে চার-পাঁচজন। পশ্চিমী মননক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক শক্তির বিপরীতে ব্যক্তির এ রোমান্টিক বিদ্রোহের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের মাটিতে কাম্যুর শক্ত ভিত্ গাঁথা ছিল। তাঁর 'স্বগৃহে প্রবাসী' নায়ক তাই সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নয়, বরং প্রচলিত ভাবধারার পূর্ণ পরিণতির স্বরূপ।

এই মানসিকতার উৎস সন্ধানে গিয়ে আমাদের এখন কাজ নেই। যুদ্ধোত্তর গ্লানিতে, না নাৎসি দুঃস্বপ্নের গভীর পাপবোধে, নাকি নাগরিক সভ্যতার বিষক্রিয়াতে এর উৎস,—সে ভাবনা এখন তোলা থাক। আমাদের কাজে জরুরী শুধু এইটুকু যে আধুনিক অস্তিত্বের সামগ্রিক অধিজ্ঞতা এই নির্বাসিত নায়কের মধ্যে সর্বোচ্চভাবে প্রতিফলিত। রিউ চরিত্রের মূলে এই বিস্তীর্ণ দার্শনিক ও সাহিত্যিক পটভূমি থাকায়, রিউ আত্মপ্রকাশ করে পরিণত মন নিয়ে। সে বেশ জানে এই মৌলিক যুক্তিহীনতার মধ্যে কেমন ক'রে টিকে থাকতে হয়।

কিন্তু শশী বাংলাসাহিত্যে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত মনোভঙ্গির পথিকৃৎ। অ-রোমান্টিক নির্বাসিত

BanglaBook.org

নায়কে'র প্রথম অগ্রদূত হিসেবে তার এই আবির্ভাব। না ছিল তার পূর্বসূরির দল, না সমসাময়িক সঙ্গী। নিঃসঙ্গ নায়ক শশী যথার্থই একক এবং অদ্বিতীয়। বাংলাসাহিত্যে পাগলা শিব থেকে শুরু ক'রে ভবঘুরে, অনিকেত নায়কের আধিপত্য চিরকালই প্রবল। কিন্তু বাঙালির পরিচিত অমূলতরু নায়কের চেয়ে শশী একেবারেই আলাদা জাতের। সে ভিন্‌দেশী ঢঙের নিঃসঙ্গ নায়কদের স্বগোত্র নয়, কলকাতা ও ঢাকার রাজপথে ছড়াও কুয়াসাঘেরা লণ্ডন কিংবা বসন্তবিলোল পরী-র পথেঘাটে যাদের দর্শন মিলত—কিন্তু সে স্বভাব-পরবাসী দিশী ভবঘুরে নায়কদের দলেও পড়ে না—অপু, শ্রীকান্ত, তারাপদর মতো যারা শৈবালধর্মী মানুষ, যারা কোনো বিশেষ সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন নয়। বন্ধনহীনতা যাদের পোশাকি উত্তরীয়, শশী যেমন তাদের জাত নয়, তেমনি বন্ধনহীনতাই যাদের সহজ অস্তিত্ব—যেমন কুমুদ—শশী তাদেরও জাতে কুলে পড়ে না। অথচ শিল্পীর সৃজনীশক্তিজাত নিঃসঙ্গতাও শশীর নয়। শশীর মধ্যে একটা অন্তরীণ দ্বন্দ্ব আছে। 'শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে।'[৩৩] শশীর ভিতরটা অনেক বেশি জটিল। গ্রাম্যতা, সংস্কার, ব্যবহারিক কায়দাকানুন, এ সবই সে তার পিতার আনুকূল্যে পেয়েছে প্রথম বয়সে। তারপর শহরে গিয়ে ইংরিজি শিক্ষার ও বিজ্ঞানের আবহাওয়ায় এবং কুমুদের মতো বিচিত্র ঐশ্বর্যময় মুক্ত মনের উড়াল লেগে শশীর অন্তঃস্থ তৃতীয় নেত্রটি উন্মীলিত হয়েছে। ফলত, শশী এখন ঘরেও নহে পরেও নহে। না হতে পারবে সে তার পিতা গোপাল, না পারে হতে কুমুদ কিন্তু এই টানাপোড়েনের মধ্যেই শশী হয়ে ওঠে শশী—তার নিঃসঙ্গতা অপূর্ণীয়। 'শশীর বিষণ্ণতা ঘুচিবার নয়।'[৩৪]

শশী একেবারে একা, নির্বান্ধব। তুচ্ছ, সামান্য, একক প্রাণী সে, কিঞ্চিন্মাত্র যুক্তিকে হাতিয়ার করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপুল অযুক্তিনিষ্ঠতা প্রতিরোধ করার সংগ্রামে তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রিউয়ের বন্ধু, তারুর মতো তার পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই। শশী ভবঘুরে উড়নচণ্ডে নয়, শব্দের 'পরবাসী'ও নয়, শিল্পীও নয়। সে বিজ্ঞানী, যুক্তিবাদী। স্বেচ্ছায় বরবাদ সে সামাজিক দায়িত্ব, মন্দকে ভালো করবার দায় কাঁধে তুলে নেয় এবং বারবার ব্যর্থ হয়। নিসিফাসের ছায়া শশীর দর্পণে না দেখে আমাদের উপায় নেই। কিন্তু ব্যর্থতাকে জয় ক'রে ওদিকে কর্মে আত্মস্থ থাকে রিউ—এদিকে শশীর ব্যর্থতা শশীকে করে বিধ্বস্ত। এর জন্য হয়তো দায়ী বাংলাসাহিত্যে শশীর সামগ্রিক নিঃসঙ্গতা। কি দর্শনক্ষেত্রে, কি সাহিত্যক্ষেত্রে তার অভূতপূর্বতা শশীকে একদিক থেকে দুর্বল করেছে। রিউ সঙ্গী-পরিবৃত—তারু ছাড়াও, পাদ্রি পানেলু, সাংবাদিক রবের, কেরানি গ্র, যে নাকি একটি নিখুঁত পঙ্‌ক্তি অনন্তকাল ধরে রচনা ক'রে চলেছে—এরা সকলে রিউয়ের পাশে থেকে তার হাত শক্ত করে। যেসব চিন্তাভাবনা দ্বারা কাম্যু তখন পরিবৃত ছিলেন ওরা তারই প্রতিফলন।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ছিলেন একধারে নিঃসঙ্গ নায়ক। সমকালীন সাহিত্যিকরা তাঁর চিন্তার বা বিশ্বাসের অংশভাক্ ছিলেন না। একমাত্র জগদীশ গুপ্ত ছাড়া আর কেউ প্রকৃতপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোজগতের পড়শি ছিলেন না। যে সময়ে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' রচিত হয়, মানিকবাবু তখন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষাভাষী লেখকগোষ্ঠীর দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। শশী তাই বন্ধুহীন—বাক্যালাপের উপযুক্ত সঙ্গী তার জোটে না গ্রামের মধ্যে তারুর মতো মনন-সহচর তার নেই। গ্রামে এসে শশীর জীবনে কুমুদের ভূমিকাও ফুরিয়ে যায়।—অথচ তারু রিউয়ের অপর দিক। সে জ্ঞানযোগী, রিউ কর্মযোগী। তারু শুধু 'জানতে' চায়, সে শুধু জেনেই তৃপ্ত, শুধু শিখেই শান্ত, সে 'বিচার' করে না। আর রিউ কেবল 'কাজ' করে। ফলাফলের বিচার সেও করে না।

এই 'স্থিতধী' অবস্থায় শশী পৌঁছুতে পারেনি—তার বিচারশক্তি যেদিন রুদ্ধ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কর্ম সে ক'রে যায় যেন ভূতের

বোঝা যাওয়ার মতো; কর্ম তার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী থাকে না, কর্ম তখন বিচ্ছিন্ন, বিস্বাদ ব্যবসায়ে পর্যবসিত হয়—'জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটি প্রবেশ করে।'[৫৪]

রিউয়ের কাজ হলো 'করা', তারুর কাজ 'জানা', 'বোঝা'।[৫৫] দুয়ে মিলে তারা যেন এক 'যোগী' (Saint) যিনি সব 'বোঝেন', এবং যথাসাধ্য 'করেন'—পতিতোদ্ধারের মূল তত্ত্বই যাঁর আয়ত্তে, যিনি বাঁচান, এবং বাঁচানোর জন্য আত্মদান করেন। রিউ অসুখ সারায়, তারু রোগীর সেবা করতে গিয়ে নিজে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

লোকক্ষয়কারী কালের প্রকৃত মূর্তি প্রত্যক্ষ ক'রে অর্জুনের এক নতুন চেতনার জন্ম হয়—তারুর সংস্পর্শে থেকে পানেলুর অভিজ্ঞতা দেখে, রিউও মহামারীর করালগ্রাসের মধ্য থেকে কিছু অন্তত শেখে—কিন্তু শশী অর্জুন নয়, এমন-কি রিউও নয়। কৃষ্ণসখা তার রথের রশি ধরে নেই, বন্ধু তার তার পাশে নেই—কালের করাল রূপের অবারিত নিষ্ঠুরতা একক শশীর জীবন-মনকে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলে।

খ। এ ছাড়া রিউ ও শশীর মধ্যে প্রভেদের দ্বিতীয় কারণ হলো এই, যে রিউয়ের আত্মিক জীবনে একটি প্রধান ভূমিকা নিয়ে রয়েছেন ঈশ্বর। কামুর জীবনচিন্তার মধ্যে ঈশ্বর প্রতিনিয়তই ঘুরে ফিরে আসছে।

ঈশ্বরের সচেতন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গোড়া থেকেই, রিউ নিজেকে দেখেছে—তাই সে সামনেই জোরালো মাটিতে খাড়া রয়েছে। রিউয়ের 'কর্তব্য হলো তাই সাধন করা, খ্রীস্টধর্মের সাধ্যে যা কুলোয়নি, অর্থাৎ পতিতোদ্ধারের কাজে ঈশ্বরের করুণা টেনে আনা'।[৫৬] ভগীরথের মতো ঈশ্বরের করুণা আনতে বেরিয়েছে রিউ, যদি তা না পারে, তাহলে সে ঈশ্বরকেই সৃষ্টি করে নেবে। কী উপায়ে? 'স্বয়ং ঈশ্বর ব'নে গিয়ে'।[৫৭] কামুর নৈতিকতা তে এই মন্তব্য ভলতেয়ারের মন্তব্যের চেয়ে অনেক আলাদা—এ হয়তো বা অনেকটা শঙ্করভাবে ভজনা, রাবণের মতোই। ফাঁকিবাজ, প্রচণ্ড দায়িত্বহীন, যুক্তিবিরহিত এক স্রষ্টার প্রতি প্রবল অভিমান নিয়ে, তাঁর ভ্রম সংশোধনের কাজে, ও পরিপূরক হিসেবে প্রতিযোগিতায় নেমেছে ডক্তর রিউ। যতদিন সৃষ্টি বজায় থাকবে, ততদিনই সৃষ্টিকর্তার বদখেয়ালগুলি থাকবে এবং ততকালই একজন সংশোধকের প্রয়োজন থাকবে সংসারে। অতএব রিউয়ের হতোদ্যম হবার কারণ নেই, যদিও সে জানে চরম মুহূর্তে জয়ী হওয়া তার সাধ্যাতীত, কারণ সেও তো ঐ বিভ্রান্ত, ভ্রষ্ট, অসম্পূর্ণ সৃষ্টিরই অংশ। তবু, যতক্ষণ তার শ্বাস ততক্ষণ তার প্রয়াস। হাল ছাড়া রিউয়ের স্বধর্ম নয়। খ্রীস্টধর্মের অক্ষমতা বিষয়ে কামুর ক্ষোভ-অভিমানের অন্ত ছিল না। তাঁর জীবনদর্শনে, 'অ্যাবসার্ড যুক্তিবাদ'-এর মূলে ঈশ্বরের একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা আগাগোড়াই রয়েছে নেতিবাচক যুক্তির মধ্য দিয়ে হলেও।[৫৮] কিন্তু ধর্ম বিষয়ে মানিকবাবুর ক্ষোভ 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তে প্রধানত নৈঃশব্দের মধ্যেই থেকে গিয়েছে। পক্ষপাতদুষ্ট ঈশ্বরের অবিচারের প্রতি তাঁর অভিযোগ ছিল না তা নয়—'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মানদীর মাঝি' ইত্যাদি উপন্যাসে, 'নেকী'তে বা বৌ সিরিজের ছোটগল্পের কিছু কিছু মন্তব্যে আমরা তার চকিত আভাস পাই কিন্তু শশী ডাক্তার ঈশ্বরবিষয়ে উদাসীন। সৃষ্টির বিপুল রহস্যে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপক বিস্ময়ে তাকে আমরা টিলার উপরে স্তব্ধবাক্ হয়ে যেতে দেখি,—কিন্তু কে যে এই রহস্যের প্রণেতা, সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করতে এমন-কি ভাবতেও দেখি না।

বস্তুজগতের মৌলিক যুক্তিহীনতা, এবং ব্যক্তিমানুষের স্বভাবে যুক্তিনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা—এই দুইয়ের অনিবার্য সংঘর্ষ বিষয়ে শশী পূর্ণ সচেতন, যা হলো কামুর অ্যাবসার্ড-তত্ত্বের মূলকথা।[৫৯] শশীর আশা ছিল এক যুক্তি নিয়ন্ত্রিত, স্বচ্ছ, বোধগম্য, অর্থপূর্ণ, ছন্দোবদ্ধ জীবন—কিন্তু সে হাতে পেল ঠিক বিপরীত: যুক্তির অগম্য, অস্বচ্ছ, দুর্বোধ্য, অসমঞ্জস, অর্থহীন, খাপছাড়া এক জগৎ। শশীর আশা-নিরাশার নাটকে ঈশ্বরের কোনো স্পষ্ট বা ব্যক্তিগত ভূমিকা নেই। হয়তো

BanglaBook.org

সেই কারণেই এই প্রচণ্ড নির্মম আবিষ্কারের আঘাত শশীকে জড়বৎ ক'রে ফেলে, শশী রিউ সং ওঠে না, শশী হাল ছেড়ে দেয়। মনুষ্যত্বের সব উষ্ণতা হারিয়ে সে হয়ে যায় পুতুল। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সে বিচ্যুত হয়ে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত শশী যেন জীবনের খেই হারিয়ে ফেলে। নিরীশ্বর, নিষ্প্রাণ, প্রেরণাহীন, ভবিষ্যৎহীন, অতীতসর্বস্ব এক মরুদ্বীপে আত্মসমর্পিত শশীকে আমরা দেখি চিরপ্রবাসী, চিরনির্বাসিত, অপরিবর্তনীয় ভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে। শশীর সঙ্গে তার পিতার শেষ কথাই হলো 'অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে'[৪১] মানুষ শশী হয়ে যায় অদৃষ্টের খেলার পুতুল।

মানুষ যখন পরিণত হয় সুতো-বাঁধা পুতুলে, জীবন তখন হয়ে দাঁড়ায় এক ব্যাপক মহামারীর মতো অনিবার্য, নিয়তি তাড়িত নিষ্ঠুরতা। 'প্লেগ' এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা' পাশাপাশি রেখে পড়লে এই উপলব্ধি আমাদের চেতনায় দানা বাঁধে। কিন্তু রিউ ঠিক জানে, সে কতটা পারে—কী তার ক্ষমতার সীমানা। সে তাই পানেলুকে স্পষ্ট জানায় : 'মুক্তি ('Salvation') অনেক ঊর্ধ্বের ব্যাপার, আমি অতটা উচ্চাশা রাখি না। আমি কেবল মানুষের স্বাস্থ্য নিয়েই উদ্বিগ্ন।'[৪২] এবং সেই কারণেই টিকে থাকে, মড়ক তাকে মারে না। কিন্তু জীবনের কাছে শশীর প্রত্যাশা বড়ো বেশি। তাই আশাভঙ্গের আঘাতও তীব্র। সে-ধাক্কা থেকে আত্মরক্ষা করবার উপায় শশীর জানা নেই। ইশ্বর বিষয়ে নির্বিকার শশী স্রোতের টানে ভেসে যায়, কিন্তু রিউ বড়ো গাছে নৌকো বেঁধেছে।

নিজিনস্কি, ভ্যান গখ্, টি. ই. লরেন্স প্রভৃতি কয়েকজন বাস্তব জগতের নির্বাসিত নায়ক'দের প্রসঙ্গে কলিন উইলসন মন্তব্য করেছেন :

'এরা নিজেদেরই ঠিকমতো চিনতে পারেননি, সেজন্য নিজেদের ক্ষমতার অপচয় করেছেন। এঁরা যদি নিজেদের জানতেন....তাহলে তাঁদের জীবন এত ট্রাজিক হতো না। একজন 'আউটসাইডার'-এর প্রাথমিক প্রয়োজন হলো—আত্মজ্ঞান।[৪৩] রিউ-এর হাতে আছে সেই অমূল্য রক্ষাকবচ—আত্মজ্ঞান। কিন্তু শশী তা থেকে বঞ্চিত, তাই সে পরিণত হয় পুতুলে।*

* মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপন্যাস বিষয়ক সর্বভারতীয় সেমিনারে (২৬শে জানুয়ারি, ১৯৭৩) পঠিত প্রবন্ধের ভিত্তিতে রচিত।

BanglaBook.org

নির্দেশিকা

১ Albert Camus, *The Myth of Sisphus*, Justin O'Brien, London, 1955, p. 96.

২ ঐ।

৩ ঐ, পৃ ৯৭।

৪ Albert Camus, *Selected Essays & Notebooks*, ed, & trans. Philip Thody, Penguin, 1970, p. 277. ('Impersonal style throughout...It must definitely be an account, a chronicle.')

৫ ঐ, পৃ ২২৫।

৬ 'It is as reasonable to represent one kind of imprisonment, by another, as it is to represent anything that really exists by that which exists not'—Daniel Defoe, *Robinson Crusoe*, Preface to the third volume.

৭ Germaine Brée, 'Albert Camus & the Plague.' *Yale French Studies*, No. 8, p. 99.

৮ Germaine Brée, *Camus*, New York, 1964, p. 148.

৯ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, (কলকাতা ১৯৩৬), দশম মুদ্রণ, ১৩৭৫, পৃ ১।

১০ ঐ, পৃ ৭৮।

১১ ঐ, পৃ ৭৯।

১২ কঠোপনিষৎ, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় বল্লী, ১৪।

১৩ ঐ, পৃ ৮০।

১৪ ঐ, পৃ ৮০।

১৫ Camus, p. 128; এখানে ব্রে কাম্যুর নোটবই (p. 231) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

১৬ ঐ, পৃ ১১৮।

১৭ *পুতুলনাচের ইতিকথা*, পৃ ৮০।

১৮ Albert Camus, *The Plague*, trans, Stuart Gilbert, Pemguin, 1961, p. 107.

১৯ ঐ, পৃ ১০৭।

২০ ঐ, পৃ ১০৭-৮।

২১ *পুতুলনাচের ইতিকথা*, পৃ ৮১

২২ ঐ, পৃ ৮১।

২৩ ঐ, পৃ ৮১।

২৪ ঐ, পৃ ৮১।

২৫ *The Plague*, p. 241.

২৬ ঐ, পৃ ২৫০।

২৭ *পুতুলনাচের ইতিকথা*, পৃ ২১৫।

২৮ ঐ, পৃ ২১৬।

২৯ ঐ, পৃ ৮১।

BanglaBook.org

৩০ ঐ, পৃ ২৪৩।

৩১ ঐ, পৃ ২৪১।

৩২ *Notebooks*, p. 220.

৩৩ *পুতুলনাচের ইতিকথা*, পৃ ১১।

৩৪ ঐ, পৃ ৯।

৩৫ ঐ, পৃ ২৪৩।

৩৬ *The Plague*, p. 109.

৩৭ *Notebooks*, p. 232; 'How can one live without grace? We must...do what Christianity has never done: concern ourselves with the damned.'

৩৮ ঐ, পৃ ২২৭; 'It is our task to create God we have only one way to create God, which is to become God.'

৩৯ উদাহরণ স্বরূপ 'An Absurd Reasoning.' *The Myth of Sisyplus*, p. 39. দ্রষ্টব্য।

৪০ ঐ, পৃ ২৪, 'But what is absurd is the confrontation of the irrational and the wild longing for clarity whose call echoes in the human heart. The absurd depends as much on the man as on the world.

এ ছাড়া John Cruickshank, *Albert Camus*, New York, 1960, p. 45 দ্রষ্টব্য। সেখানে সার্ত্রের নিজস্ব ভাষায় কামুর অ্যাবসার্ড-তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত (উপরের উক্তিরই ভাষান্তর) রয়েছে, শশীর জীবনদর্শনের সঙ্গে যার মিল অতি স্পষ্ট।

৪১ *পুতুলনাচের ইতিকথা*, পৃ ২৪২।

৪২ Colin Wilson, *The Outsider*, London, 1956, p. 71.

BanglaBook.org

পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক : এবং অথবা
সিদ্ধ তান্ত্রিকের শব্দসাধনা

Pol: What do you read, my lord?
Ham: words, words, words.

Claud: My words fly up my thoughts
remain below./Words without
thoughts never to heaven go.

বাগর্থের দাম্পত্যকলহ সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে, এ কথা নতুন নয়। শব্দশক্তির গুণকীর্তন সৃষ্টির প্রথম শুভক্ষণ থেকেই হয়ে আসছে জগতে। স্বীকার করেছে সকল ধর্মেই যে শব্দের মধ্যে ব্রহ্মও আছে। মনুষ্যসভ্যতা শব্দের ইন্দ্রজালে কদাচ সংশয় রাখেনি। লেখক দ্বিতীয় ঈশ্বর—শব্দ দিয়েই তিনি নিজস্ব ভুবন সৃষ্টি করেন। সেই ভুবনের ঈশ্বরী শব্দার্থ। বাক্ যখন অর্থ থেকে বিযুক্ত, সে তখন সৃষ্টির কাজে লাগে না। অর্থবিহীন শব্দ শুধুই আওয়াজ—তাকে কথা বলে না। অর্থহীন 'কথা' কি হয়? সাধারণ নিয়মে হয় না; আবার কখনো কখনো হয়ও। ভাষার ক্ষেত্রে অর্থ-বিচ্যুত 'শব্দ' (word) অসম্ভবও বটে—কারণ একা দাঁড়ালে সব শব্দেরই নিজস্ব অর্থের মেরুদণ্ড আছে। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে অসাধ্য নয় অর্থের মেরুদণ্ডটি মুচড়ে ভেঙে ফেলে শব্দকে ব্যর্থ করে দেওয়া।

মানবসভ্যতায় শব্দের মৌল কর্তব্যই হলো ভাবনাকে উন্মোচিত করা। কিন্তু মানুষ আরো একটু এগিয়ে আসার পরে, তার পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে অনিয়ম সৃষ্টি করে শব্দের প্রাথমিক প্রয়োজনটাকে ভেস্তে দেওয়া খুবই সহজ। ব্যাকরণটা ভেঙে দিলেই হলো—শব্দরা আর থাকবে না ভাবনার রূপ হয়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে রেললাইন-ছিটকোনো কামরার মতন—অকর্মণ্য, আহত, অচল।

আবার, যেমনভাবে ঈডিপাস স্ফিংক্সকে পরাজিত করেছিলেন শব্দের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা ফিরিয়ে দিয়ে, তেমনি, মানুষের পক্ষেই সম্ভব, পুনঃপ্রত্যর্পণ করা শব্দকে তার অর্থ, আবার ফিরিয়ে আনা ব্যাকরণ, যৌক্তিকতা। ফের ছুটবে শব্দ তার গতিময়তা, ছন্দোময়তা, লক্ষ্যময়তার শক্তিতে।

শব্দরা এমনিতে তো ছড়িয়ে-ছিটিয়েই আছে জগতে—লেখকের কাজই হলো ঈডিপাসের মতো, তাদের লক্ষ্যময় করে তোলা। 'ভাষা' আসলে যে স্ফিংক্সের মতো রাক্ষসী, তাকে বশ মানানোতেই লেখকের শক্তিপরীক্ষা শব্দ থেকে অর্থকে বিযুক্ত হতে দেওয়া চলবে না—পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো সম্পৃক্ত রাখতে হবে বাক্ এবং অর্থকে। এবং তারই মাঝখানে শব্দের ধমনিতে নতুন নতুন অর্থ সঞ্চারিত করে পুরোনো শব্দের মধ্যে নবযৌবন আনতে পারা, সেটাই হলো লেখকের সৃজনলীলার মূল আনন্দ। শব্দের সঞ্জীবনশক্তির মন্ত্রটা আয়ত্ত করতে পারলেই লেখকের মন্ত্রসিদ্ধি ঘটল। তারপর তাঁর স্বকীয় ভুবন তাঁর মুঠোয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভূমিকাটা বদলে যায়। লেখক ভুলে যান তিনি ভাঙতে বসেছেন, না গড়তে বসেছেন। ঈডিপাস না হয়ে লেখক স্বয়ং যেন স্ফিংক্স হয়ে ওঠেন—আর যোদ্ধার তরোয়ালটা তুলে দেন পাঠকের মুঠোয়। পাঠকের কাজ তো নয় ধাঁধার জবাব বের করা, পাঠকের কাজ ঠিক ঠিক শব্দের মুখে আলো ধরে ধরে শব্দের মুখ চিনে নেওয়া। মুখোশ খসানোর কথা তাঁর

BanglaBook.org

নয়। চিনে-নেওয়া এক—আর ব্যাখ্যা দেওয়া আরেক। শব্দ-ব্যবহারকারীদের মধ্যে পারস্পরিক যে সৌহার্দটি থাকা একান্ত প্রয়োজন, যে সমবেদনা, যে সহ-অনুভূতি ভাষাব্যবহারের একেবারে গোড়ার কথা, লেখক যখন সেইখানেই একটা পাঁচিল তুলে দেন তখন দানগ্রহণের মূল ব্যাপারটাতেই বিঘ্ন ঘটে যায়।

ভাষা ব্যবহার করা একটি দ্বিপাক্ষিক কাজ। দুদিক থেকে দুজনে হাত বাড়িয়ে দেবেন, তবেই তো ঘটবে পাণিগ্রহণ। লেখক কখনো কখনো এই হাত বাড়ানোর ব্যাপারটাকে খুব ঘোরালো করে তোলেন, হাতটি না বাড়িয়ে, এগিয়ে দেন শংকরমাছের চাবুক কিংবা কাঁটাখেজুরের পাতা। তখন পাঠক বেচারীকে শিউরে উঠে পালিয়ে আসতে হয়, নয়তো দস্তানা পরে নিতে হয় বক্সিংগীরদের মতো প্রস্তুত হতে হয় পাণিগ্রহণ নয়- -মল্লযুদ্ধের জন্য।

সাহিত্য যখন যুদ্ধের হাঁক ছাড়ে, রণহুংকার দিয়ে পাঠকের বুকে ত্রাস সঞ্চার করে, তখন আমরা সেই সাহিত্যকে ভদ্রতা করে নাম দিই 'দুর্বোধ্য'। শত্রুভাবে যেখানে পাঠকের ভজনা করেন লেখক, তাঁরই নাম 'জটিল' লেখক। এই জটিলতা বা দুর্বোধ্যতার মধ্যে যে একটা ঘোরতর শত্রুতার মেজাজ আছে, একটা অসামাজিক মন, অথবা সমাজদ্রোহ আছে, এমনকি যাকে মানবদ্রোহিতা পর্যন্ত বলা যেতে পারে—এদিক থেকে আমরা মোটেই ভাবি না।

আজকাল যে অপ-শব্দটি মাঝেমধ্যে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃতির গোড়াতে, এখানে সাহিত্যের ভগায় সেই অপ-শব্দের ভব-কথা রয়েছে। দুর্বোধ্যতার চর্চা বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসের লক্ষণ। বিচ্ছিন্নতাবাদ নানা কারণেই ঘটতে পারে আমরা এখানে অস্তিবাদী লেখকদের কথা তুলব না, তুলব না উপন্যাসবন্দীদের কথাও—কারণ আমাদের আলোচনায় যাঁর রচনাকে উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি, তাঁর বেলায় এ-সকল শব্দ অবান্তর।

শ্রীকমলকুমার মজুমদার আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর তুল্য কবজির জোর নিয়ে খুব বেশি লেখক যে-কোনো যুগেই, যে-কোনো দেশেই জন্মান না 'অন্তর্জলী যাত্রা'র কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সিংহাসন চির-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কমলকুমারের তুল্য ঐশ্বর্যের অপচয় এবং অপব্যবহার আর কোন দেশে কোন লেখক করেছেন, অথবা কোনো দেশেই কেউই করেছেন কিনা তা আমরা জানি না। এ-হেন শক্তি, এবং এ-হেন বিনাশ—দুটোই অসামান্য, এবং সেই কারণেই লক্ষণীয়।

আজ আমরা আলোচনা করব, কিভাবে কমলবাবু পাঠক আর লেখকের মধ্যে কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বাধাই সৃষ্টি করেন না, খুবই বাস্তব, ভাষাগত বিঘ্ন তৈরি করে চেষ্টা করেন পাঠককে যথাসাধ্য সাহিত্যরসে বঞ্চিত করতে। এবং বলতে সংকোচের শেষ নেই, কমলবাবু ইদানিং তাতে রীতিমতো সাফল্যও লাভ করেছেন।

ভাষাগত বিঘ্ন সৃষ্টিতে কমলবাবুর প্রধান অস্ত্র ব্যাকরণ এবং অভিধানকে উল্টে ফেলা। তাঁর বাক্যগঠন-রীতি, তাঁর অব্যয়-ব্যবহার, কারক-বিভক্তি-ব্যবহার, পদ-ব্যবহার—সবই বাংলা ব্যাকরণ-বহির্ভূত। ব্যাকরণের মেরুদণ্ডটি ভেঙে দিয়ে তিনি প্রথমেই ভাষার গড়ন-পেটনটা পালটে তাল পাকিয়ে নেন, ভীম যেমন কীচককে। ব্যাকরণ থেকে ভাষাকে বিযুক্ত করে নেওয়ার কাজটি মোটেই সহজ নয়, এজন্য অসামান্য মননশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু ঘটনাটি একবার ঘটাতে পারলে, অত্যন্ত সহজেই বাক্ থেকে অর্থকে বিচ্যুত করে নেওয়া সম্ভব। শব্দ এবং অর্থের মধ্যে যে সুনিশ্চিত বন্ধন, মানবসভ্যতার হাতে-খড়ির সেই প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে শব্দ এবং অর্থের শৃঙ্খলার মধ্যে মানববমনের প্রাথমিক শৃঙ্খলাটি গড়ে উঠেছে। এই শৃঙ্খলা ভেঙে দিলে সৃষ্টির আদিম অনিয়মের কিছুটা স্বাদ মেলে শব্দ আর অর্থের মধ্যে ব্যবধান রচনা করা মানে শব্দশক্তিকে ইচ্ছাশক্তির কাছে হার মানানো। শব্দশক্তি সমষ্টিগত শক্তি, সামাজিক শক্তি তাকে ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির কাছে পরাজিত করা—এর মানে সমাজের বিরুদ্ধে একজন ব্যক্তির বিদ্রোহ

BanglaBook.org

শব্দ থেকে অর্থকে সরিয়ে দেওয়া মানেই একজন মানুষের মনের কাছ থেকে অন্য মানুষের মনকে দূরে হটিয়ে দেওয়া। কমলবাবুর লেখা পড়লে এই অভিজ্ঞতাটি খুব স্পষ্ট হয়। আমরা এই প্রবন্ধে দেখতে চেষ্টা করব কমলবাবু কী কী উপায়ে এই 'কাজ'টি সম্পন্ন করেন, এবং কেন। এই দ্বিতীয় অংশটির—অর্থাৎ কেন এমন করেন—যথার্থ শেষ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়, কেবল দেখা যেতে পারে, যে যে কারণ প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা। প্রাসঙ্গিক হোক, অথবা অপ্রাসঙ্গিক—আবার বলে রাখছি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শ্রীকমলকুমার মজুমদার এক তুলনাহীন নষ্ট-প্রতিভা, একটি কক্ষচ্যুত নক্ষত্রবিশেষ। তাঁর চেয়ে অনেক, অনেক কম ক্ষমতা নিয়ে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের হাটে স্থায়ী দোকান দিয়ে গেছেন। অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মূল ধারায় কমলবাবুর স্থান থাকবে না, তিনি থেকে যাবেন পার্শ্বভূমিকায়—শুধু একটি ব্যতিক্রম হিসেবে উৎসাহের খোরাক যুগিয়ে। এই ট্রাজিডির মূল খুঁজতেই এই প্রবন্ধের সূচনা।

শ্রীকমলকুমার মজুমদারের নিজের মতে, বাংলা সাহিত্যের সেই আদি-অকৃত্রিম উৎসমূলের কাছে ফিরে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। ভারতভূমিতে ইংরেজের পদধূলি না পড়লে বাংলা ভাষার যে সহজাত অভিক্রম ঘটত, তিনি সেইটিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষার বর্তমান রূপটি বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে কলুষিত। ভাষার অঙ্গ থেকে এই অবাঞ্ছিত বিকার মুছে ফেলে তিনি সেই অকৃত্রিম সৌন্দর্যটি আবিষ্কার করতে চান, যৌগোলিক স্বাধীনতা বজায় থাকলে বাংলা ভাষা যেমনটি থাকত। ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না। এবং এই প্রয়াস যে খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়, একথা অনস্বীকার্য। আজকাল নিগ্রো-আমেরিকার সাংস্কৃতিক জাগরণে এই ধরনের প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই অন্য এক স্তরে। শিকড় খুঁজতে গিয়ে কখনো কখনো যেন মধ্যেকার যুগটির অস্তিত্বটাকেই মুছে ফেলা হয়,—যেন দেশমাতৃকার শুনমূল থেকে কখনো বিচ্ছেদ ঘটেনি, যেন যোগাযোগ নিরন্তর ছিল—এই ধরনের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস তৈরির চেষ্টা দেখা যায়। বিকল্প সত্তার অন্বেষণ করতে গিয়ে এই মনগড়া সত্তা গড়ে নেওয়াটা কতদূর সুফলপ্রসূ তা আমরা এখনও জানি না—এই প্রয়াসের সামগ্রিক জটিলতা এবং ঐতিহাসিক মূল্য যে কতখানি তা আপাত নজরে স্পষ্ট নয়। কিন্তু একটি সামগ্রিক, সামাজিক অন্বেষণ, এ কোনো ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এইখানে ইতিহাস ভাঙবার প্রবৃত্তি একটি বিশেষ সামাজিক ধারা হিসেবে প্রবাহিত হচ্ছে, তার শেষ পরিণতি কিসে, এখনও জানা যায়নি।

কমলবাবুর ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রয়াসটি প্রবহমান সময়ের বিরুদ্ধে একটি ব্যক্তিগত বিদ্রোহ। ইংরেজ না এলে ফরাসিরা আসত (যেমন চন্দননগরে) বা মোগল-পাঠানরা তাদের রাজত্ব বজায় রাখতে পারত। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে কখনোই 'সনাতন হিন্দুয়ানি' বলে আলাদা জোরালো কোনো ঐতিহ্য ছিল না, এ ঘটনাটিকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। মুসলমান আমলে দরবারী ভাষা ছিল ফার্সী—বাংলা ভাষাতে তখন ফার্সীর দোর্দণ্ড প্রতাপ। অন্য ধর্মের আওতা এড়িয়ে অস্পৃশ্যস্পর্শ 'অপ্রভাবিত' হিন্দু সংস্কৃতিকে বাংলা সাহিত্যে কোথাওই খুঁজে পাওয়া যাবে কি? ইংরেজবাহিত খ্রীষ্টান সংস্কৃতির আগে ছিল মুসলমান, তারও আগে বৌদ্ধ—বাংলা সাহিত্যের গোড়া ধরে টানলে উঠে আসে বৌদ্ধ চর্যাপদ। 'হিন্দুয়ানি' বাংলা সাহিত্যে নতুনও, তা কিন্তু পুরাতনের পুনঃস্থাপনা নয়। নতুন করে হিন্দু বাঙালি সংস্কৃতি গড়তে বসলে ইতিহাসনিষ্ঠ হয়ে, ইতিহাসপ্রদত্ত ঘটনাবলির মধ্যে দিয়েই তা করা উচিত, মুসলিম বা ইংরেজ সভ্যতাকে উড়িয়ে দিয়ে নয়। বিদ্রোহ করা মানে বাস্তবকে অস্বীকার করে, কালপ্রবাহের বাইরে চলে যাওয়া নয়, স্বপ্ন কল্পনার পাল তুলে দিয়ে রূপকথার রাজ্যে ভেসে বেড়ানো নয়। ধরুন, ইংরিজি ভাষার 'পবিত্রতা বজায়' রাখার ছুতোয় কেউ যদি ইংল্যাণ্ডে রোমক এবং ফরাসি সভ্যতার অনুপ্রবেশের

ঘটনাকে অস্বীকার করে ভাষার অঙ্গ থেকে ফরাসি অক্ষর রোমক প্রভাব মুছে ফেলার প্রয়াস পেতেন, সেটা যেমন দাঁড়াত, এ ঘটনাটিও দাঁড়াচ্ছে প্রায় তেমনিই। ঐতিহ্য এবং অভিনবত্বের মধ্যে একটি সুষম ভারসাম্য বজায় রাখতে পারাই একজন সৃজনশীল শিল্পীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

ভাষা এবং সাহিত্যের শুদ্ধতম উৎসটির সন্ধানে যদি বেরুতেই হয়, তবে আমাদের ইতিহাসের সংকেত মেনেই এগোতে হবে। ভাষার সম্ভাব্য অতীতের যথার্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের হতে হবে ইতিহাসনিষ্ঠ, এবং যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই ভাষাতত্ত্বেও। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের কারোরই জানা নেই, এই কাজ আদৌ সম্ভবপর কিনা যাই হোক, বাংলা ভাষার চরিত্র আর রূপায়ণ নিয়ে কমলবাবুর পরীক্ষা নিরীক্ষা আপাতলক্ষ্যের এই উদ্দেশ্যের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে—নানা ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি বহুবার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন, (যেমন, 'সমতট', পুজো-দেওয়ালি সংখ্যা, ১৯৭৪)। আমরা হয় সেই মত গ্রাহ্য করে আমাদের বিশ্লেষণে হাত দিতে পারি, নয়তো নস্যাৎ করে তার বিশ্লেষণে অযথা কালক্ষয় না করতে পারি। আমরা এক্ষেত্রে লেখকের ব্যাখ্যাকে সম্মানিত করেই আমাদের বিশ্লেষণে অগ্রসর হচ্ছি।

২

শ্রীকমলকুমার মজুমদারের স্বকীয় ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব দিলে, আমাদের উদ্দিষ্ট বাংলা ভাষার ক্রম-পরিণতির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতি নজর দেওয়া। বিশেষত, ভাষার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করে দেখতে হবে কমলবাবু বাংলা ভাষার যে রূপায়ণটি ঘটিয়েছেন, ভাষার স্বাভাবিক নিয়মে কোনোদিন সেইরকম হবার সম্ভাবনা ছিল কিনা।

যাঁর ভাষা পশ্চিম এবং পূর্ব বাংলায় আজও সাহিত্যের ভাষার আদর্শ, সেই রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিয়ে, আমরা বরং বঙ্কিমচন্দ্র বা বিদ্যাসাগরকে নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। আদর্শ বাংলা লিখিত ভাষার কারিগর হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতি দিলে ভুল হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষা নিশ্চয়ই কমলকুমারের আদর্শ নয়, তবে কি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী? কিন্তু তাই বা হবে কেমন করে, কমলকুমার চান ইংরেজের ছায়া-ছোঁয়া-এড়ানো খাস বাংলা। বঙ্কিমচন্দ্রে তা পাওয়া যাবে না। বঙ্কিম কেন, কৃত্তিবাস ওঝা বা কাশীরামদাসের পরবর্তীকালের সব বাংলা সাহিত্যিকই কোনো-না-কোনো উপায়ে পাশ্চাত্যের প্রভাবে পড়েছেন। কমলবাবুর নিজের মতানুযায়ী, তাঁর বাংলা ভাষার শিক্ষাগুরু রাজা রামমোহন রায়, যিনি দেহরক্ষা করেছেন ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টলে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাকে ব্রিটিশ ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা অস্পৃষ্ট, পবিত্র সনাতন হিন্দু বাংলার প্রতিনিধি ঠিক বলা যায় কি? তবু কমলকুমারের কাছে তিনিই ভাষার বিশুদ্ধতার প্রসঙ্গে ভগীরথোপম। যুক্তি দিয়ে বিচার করে এ ব্যাপারটিকে ঠিকমতো বোঝা যায় না।

রামমোহনের ভাষা বোধগম্যতার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য দায়ী সে যুগের বাংলা গদ্যের যতিচিহ্নের অব্যবস্থা। রামমোহন বাংলা গদ্যে ইংরিজি যতিচিহ্নের প্রবর্তন করলেন (ফুলস্টপ সমেত), চেষ্টা করলেন বাংলা গদ্যের একটি সুনিয়ন্ত্রিত রূপ গড়ে দেবার, যাতে আছে মাত্রাবোধ। রামমোহনের আগে বাংলায় পদ্যই লেখা হতো, তেমন কোনো মননশীল গদ্য লেখা হয়নি। ঠিকমতো দাঁড়ি-কমা বসিয়ে নিতে পারলেই রামমোহনের গদ্য আর দুরূহ থাকে না। প্রাচীন বাংলায় যে পদ্য লেখা হয়েছিল তারও ভাষা অত্যন্ত সাদাসিধে, কি পূর্ব বাংলায়, কি পশ্চিমে। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতই হোক, হোক মৈমনসিংহ গীতিকার প্রণয়কাব্য কিংবা ভারতচন্দ্রের শিল্পসমৃদ্ধ শৃঙ্গাররস—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কোথাও কোনো দুর্বোধ্যতা নেই। কৃত্তিবাস এবং কাশীরামদাস একটি নির্দিষ্ট মানের সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করেন। বড়ু

BanglaBook.org

চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস সকলেই সহজবোধ্য; এমনকি, জয়দেবের সংস্কৃতও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। জয়দেবই বা কেন? চর্যাপদের ভাষাও বোধগম্য, কেননা তারও একটা ব্যাকরণগত বিধিনিয়ম আছে, যা শিখে নেওয়া যায়। অপভ্রংশ ভাষার ক্ষেত্রেও তা সম্ভবপর। (দ্র পরিশিষ্ট—এক, উদাহরণ ক।) কোনোটাকেই অবোধ্য বলা চলে না। কমলবাবুর ভাষাটি তাহলে কেমন ধরনের? ওঁর সমস্যা কি ভাষাগত দুরূহতার, নাকি আঙ্গিকের অপরিচয়জনিত মনস্তাত্ত্বিক বিঘ্নই তার মূলে? কমলবাবু বাংলা ভাষাতে অনন্য—এমন একটি দুর্বোধ্য, কৃত্রিম ভাষা গঠন করার কাজে তাঁর তুলনীয় কেউ নেই। অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর মতো অতটা দুঃসাহসিকতা করেননি, অতখানি সেয়ানা চমকও লাগাতে পারেননি।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাকে নতুন প্রাণরসে উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন ইংরিজি বা সংস্কৃত বাক্যবন্ধ এবং বাগ্‌রীতি বাংলায় ব্যবহার করে। কিন্তু কমলবাবুর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের তুলনা চলে না, কারণ সুধীন্দ্রনাথ যা লিখতেন তা সর্বতোভাবে ব্যাকরণসিদ্ধ। অতিরিক্ত সচেতন ভাষা ব্যবহারের ফলে আপাত-জটিলতার সৃষ্টি হলেও, যত্নবান পাঠকের কাছে তা দুর্লঙ্ঘ্য নয়, কেননা সে-ভাষা ব্যাকরণসম্মত। নতুন নতুন আঙ্গিকের ব্যবহার পাঠকদের কাছে অপরিচিত হওয়ার কারণে প্রথমটা যে মানসিক ব্যবধান গড়ে ওঠে, সেটাও ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্য অনেকটা দায়ী। এখানে সমস্যা মূলত ভাষাগত নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক; অভ্যাসগত। এই কারণে এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও দুর্বোধ্যতার অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যখন চলিত বাংলা ব্যবহার করছিলেন, বঙ্কিমী সাধুভাষার বদলে, অথবা যখন তিনি শব্দচিত্রের মাধ্যমে কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন।

কিন্তু কমলবাবুর লেখায় পাঠক যে সমস্যার সামনে পড়েন, তা শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক নয় তা বহুলাংশেই ভাষাতাত্ত্বিক বিঘ্ন-বিপত্তি। ফলে আমরা আবার সেই পুরোনো প্রশ্নে ফিরে আসছি; কমলবাবুর ভাষার মূল কোথায়? কার ভাষাদর্শের ছায়ায় তাঁর আঙ্গিকের সৃষ্টি হয়েছে? "বিশুদ্ধ ভাষার উৎস" সন্ধান করতে করতে আমরা ন্যায্য ঐতিহাসিক সীমা হাড়িয়ে যাচ্ছি। রামমোহন পর্যন্ত পৌঁছেও আমরা ঠিক কমলকুমারের ভাষা ব্যবহারের তুলনা খুঁজে পাই না যিনি সবচেয়ে কাছাকাছি আসেন, সেই উইলিয়ম কেরী সাহেবের মাতৃভাষা বাংলা ছিল না। তারপরে সাদৃশ্য দেখি কোর্ট-কাছারির ব্যবহারিক ভাষার সঙ্গে। আইন-আদালতের দরখাস্ত, চুক্তিপত্র ইত্যাদি যে কৃত্রিম সাধু ভাষায় লিখিত হয় (অতিমাত্রায় ফার্সী প্রভাবিত, ঘটমট, নিষ্প্রাণ, আনুষ্ঠানিক বাক্‌প্রণালী) সেটি কিছুটা কমল মজুমদারীয় শোনালেও, সে ভাষা তো কোনো দেশে কালে কদাচই সাহিত্যসৃষ্টির কাজে লাগেনি। তবে কি কমলবাবুর ভাষা বাংলার কোনো আঞ্চলিক ভাষা? সেও সম্ভব নয়, কেননা সাধু ভাষার কোনো 'আঞ্চলিক' পার্থক্য নেই। এ যে সাধু ভাষা। শ্রীয়ারসনে কিংবা ও. ডি. বি. এল-এও তো কমল মজুমদারীয় ভাষা ব্যবহারের কোনো উল্লেখ নেই। তবে নিশ্চয় এ ভাষা কোনো চেনা আঞ্চলিক ভাষার সাধুকরণ নয়। বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত ওলটপালট করেও আমরা কমলকুমারের ভাষার সাদৃশ্য অতীতে খুঁজে পাই না। অতএব অতীতে প্রচলিত ছিল এমন কোনো 'শুদ্ধ ধারা' কিন্তু কমলবাবুর প্রেরণার উৎস বলে মনে হলো না। তবে কি এ ভাষা ভবিষ্যতের ভাষা? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন একশো বছর বাদে কমলবাবুর বাংলাই হবে বাংলা সাহিত্যের ভাষা। কিন্তু স্বয়ং সৌভাগ্যক্রমে তাঁর প্রিয় লেখকের ভাষা নকল করবার কোনো লক্ষণই দেখাননি। এবং তা সত্ত্বেও কবি-ঔপন্যাসিক হিসেবে যুগ্মখ্যাতি লাভ করেছেন। আগামীকালের লেখকরা যদি কমলবাবুর ভাষার অনুকরণ করেন, এই ভাষা যদি ক্রমে আগামী দিনের বাংলা সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে, (যেহেতু কমলবাবুর একটি অন্ধ ভক্তগোষ্ঠী আছেন যাঁরা কোনো একদিন কাজেও হয়তো তাঁর অনুগামী হতে পারেন) তবে সেটি হবে বাংলা সাহিত্যের বিপুল দুর্দিন। ভাষার গোলকধাঁধা মানুষে-মানুষে বৈষম্য বাড়িয়েই চলে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে, ব্যবধান চওড়া করতে দুরূহ ভাষা একটি অত্যন্ত

BanglaBook.org

জবরদস্ত উপায়। ভাষা যেমন মানুষে মানুষে সংযোগ ঘটায়, তেমনি তার বিপরীত ফল ঘটানোর ক্ষমতাও সে রাখে। সযত্নে, সচেতনভাবে প্রচলিত ভাষাকে বিকল করে দিয়ে, গতানুগতিক যোগাযোগের ব্যবস্থাকে আঘাত করা সব সময়েই যে ধ্বংসাত্মক, তা নয়। কবিতার ক্ষেত্রে সাধারণত এই কায়দায় চমৎকার ফল পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যের পক্ষে যে এই বাক্‌ভঙ্গিমা কতদূর সহায়ক, তা কমলবাবুর রচনাশৈলী ভালো করে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। গদ্যের উদ্দেশ্য আর পদ্যের উদ্দেশ্য আলাদা, একজনের ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতেই কাজ শেষ, অন্যের ব্যাখ্যায়। কমলবাবুর গদ্য, এমনকি প্রবন্ধও, ব্যঞ্জনাসৃষ্টির খেলায় থেমে থাকে। সেদিক থেকে গদ্যের মাধ্যম হিসেবে ওঁর বাক্‌শৈলী বিশেষ কার্যকারী নয় বলেই আমাদের ধারণা হয়।

৩

ভাষার কাজ কী? ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা নানা বিভিন্ন সংজ্ঞা তৈরি করেছেন। যেহেতু ভাষাতাত্ত্বিক নই, কেবলমাত্র ভাষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারকারী এক ব্যক্তি হিসেবেই এই প্রবন্ধে আমার বিশ্লেষণকর্মটি—"অলগা ভাষাভিত্তিক সমাজতত্ত্ব, যার কোনো অনুষ্ঠানিক নৈপুণ্য নেই" (ফার্থ, ১৯৩৫) হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবুও আমি বিশ্বাস করি যে যে-কোনো সাধারণ পাঠকের সাহিত্যে ভাষার ব্যবহার নিয়ে মতামত প্রকাশ করার অধিকার আছে, যেহেতু সে সর্বদাই এই তার ভূমিকায় থাকে। আমার কাছে 'গজদন্তমিনারনিবাসী সাহিত্যিক'—এই কথাটিকে আজকের আভ্যন্তরীণ অন্তর্বিরোধের জাজ্বল্যমান উদাহরণ বলে বোধ হয়। যেহেতু 'সাহিত' থেকে 'সাহিত্য', 'সাহিত্য' থেকেই না 'সাহিত্যিক'? গজদন্তমিনারে 'সহিত' শব্দ কোথায়? সাহিত্যই বা কোথায়? আর তাহলে 'সাহিত্যিক' ওর মধ্যে কোথাও থাকেন কি? সাহিত্য কাগজনির্ভর শিল্প এবং ভাষা মানেই যোগসূত্র। 'বিশ্বিয়াতাবাদী সাহিত্যিক' কথাটিকে 'কেরোসিন পাথরবাটি'র মতো স্ববিরোধী শোনায়—সংজ্ঞাটির মধ্যেই সাহিত্যের উদ্দেশ্যের পরাজয় ঘোষিত।

ভাষা ব্যবহার একটি দ্বিপাক্ষিক পদ্ধতি। মানুষে মানুষে যোগসূত্রস্থাপনই তার উদ্দেশ্য। তাই ভাষাকে নির্ভর করতে হয় কিছু নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতীকের উপরে। তার কাজ কেবল সংকেত সরবরাহ করাই নয়, তার অতিরিক্ত কিছু এবং এই অতিরিক্ত অংশটুকু থেকেই ঘটে সাহিত্যের উৎসরণ। সাহিত্য মানেই সঙ্গ, সংসর্গ, একক্রিয়ান্বিতা, অখণ্ডতা। সাহিত্যে ভাষার দায়িত্ব এই অখণ্ডতা গড়ে তোলা; পাঠক এবং লেখকের মধ্যবর্তী ব্যবধান দূর করে দেওয়া। এর অর্থ ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা। একজন লেখক যখন অক্ষমতাপ্রবশ হয়ে নয়, সচেতন ইচ্ছাপ্রয়োগে ভাষায় কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়ে পাঠক আর লেখকের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেন, তখন তিনি জেনেশুনেই 'সাহিত্যে'র প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম করেন। একে আমি তো অন্তত 'সাহিত্যচর্চা' না বলে বলব 'সাহিত্যদ্রোহিতা'।

জার্মানির অধ্যাপক ডাঃ লোথার লুৎসে একটি মজাদার নকশা তৈরি করেছেন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের স্থান বিচারের জন্য। সাহিত্যে ভাষার ভূমিকাও এখানে খানিকটা বুঝতে সুবিধা হয়। আমাদের কাজের জন্য নকশাটি তুলে দিচ্ছি। সাহিত্যে সংযোগ বিষয়ে লুৎসের নকশা:

BanglaBook.org

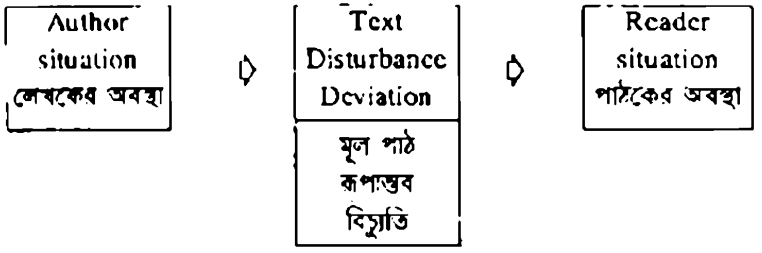

১। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি
২। উদ্দেশ্য, প্রেরণা
৩। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত=কবিতা
বিকেন্দ্রিক=নাটক
(বিক্ষিপ্ত)

১। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি
২। গ্রহণ
৩। পছন্দ, বাছাই এবং
মূল পাঠের ব্যাখ্যাকরণ

সাহিত্যদ্রোহিতার নানা পন্থা থাকতে পারে। উপায়ের ছলচাতুরীর অভাব নেই। চিত্রকল্পের, প্রতীক এবং রূপকের জটিলতায়, শব্দানুষঙ্গের এলোমেলো ব্যবহারে, পংক্তিবিন্যাসের যথেচ্ছাচারে (বা প্রথাবিরোধী অপপ্রয়োগে) এবং ব্যাকরণের বিকৃতি ঘটিয়ে ভাষাকে যোগসূত্র না করে বিয়োগসূত্র করে তোলা সম্ভব। লোথার লুৎসের একটি সমীক্ষার কথা এ প্রসঙ্গে ব্যবহার না করে পারছি না —একে ভাষার প্রতি 'সংগঠিত বলাৎকার' ('organized violence') বলা উচিত। এই হাতিয়ার ব্যবহার করে পাঠককে বিচ্ছিন্ন এবং সাহিত্যকে বিকল করে দেওয়া খুব সোজা, কেননা তার পরিণতিতে কী ঘটে? চিন্তার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়, পাঠকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় অথবা গতানুগতিক প্রতিক্রিয়ার বিনাশ ঘটিয়ে একটা চমক সৃষ্টি করে, এক অভিনব প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলে।' এই অভিনব চমকের সহায়তা পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তাকে এমন এক অতিবাস্তব প্রতীকী জগতের অচেনা আবহাওয়াতে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে প্রতীকগুলির মর্মোদ্ধার করতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক মানের শিক্ষা-সংস্কৃতি থাকা দরকার। ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশে, দুর্ভাগ্যবশত, এই মানদণ্ডটি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণীর কথাই মনে পড়িয়ে দেয়, শিক্ষা আর সংস্কৃতি যাদের হাতের মুঠোয়। অতএব স্বতন্ত্র-সৃষ্ট উদ্ভাবিত দুর্বোধ্যতা এক ধরনের অসামাজিকতা হয়ে পড়ে, যার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত নিতান্তই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হয়। আমি একেই সাহিত্যদ্রোহিতা বলতে চাই। এই ভাষাগত বিশ্ব সৃষ্টি একটি বিশিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণীর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে, এর লক্ষ্য বিকেন্দ্রিক নয়—কেন্দ্রীভূত, গোষ্ঠীগত। ভাষার অর্থ উন্মোচন করা যদি অপ্রয়োজনীয় হয়, ভাষা তখন আর মানুষের ভাষা থাকে না, প্রায় জীবজন্তুর ভাষার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তখন তা আর সৃষ্টিকর্মের পাঠক থাকে না, হয়ে যায় সৃষ্টিছাড়া, অমানুষিক কোনো সংকেত, অর্থবিহীন কিছু শব্দমাত্র। সে ভাষা সাহিত্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। সে ভাষা সাহিত্যদ্রোহীর ভাষা।

ভাষা নিয়ে কমলবাবুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি ভবিষ্যতের বাংলা ভাষার চিহ্নসূচক হয়, তবে তাঁর ভাব নিয়ে কারু-কারবার কিন্তু বিগত দিনের চিহ্নসূচক। তাঁর অতি-আধুনিক পরীক্ষামূলক ভাষাশৈলী কিন্তু তাঁর অতি-পুরাতন সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার সঙ্গে মেলে না। ভাষা হবে চিন্তার সহায়, চিন্তাকে রূপ দেবে সে। চিন্তাকে শুধু শব্দেই তো রূপায়িত করা হয় না, হয় আঙ্গিকেও। এই নব্য বাক্‌ভঙ্গির মাধ্যমে তিনি কি কোনও নবীন ভাবধারা পৌঁছে দিচ্ছেন? কই, তা তো মনে হয় না। যদি বলি পুরাতনের পথে পথেই তাঁর স্বর্গসন্ধান, তবে ভাষার এই অভিনবত্বের সঙ্গে সে-ভাবের কোনো সমতা নেই। বরং তাঁর 'আধুনিক' মাধ্যম এবং 'সনাতন' বাণীর মধ্যে স্পষ্ট এক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে যায়।

BanglaBook.org

অন্যভাবে দেখলে, একটি বিচ্ছিন্নকারী মাধ্যম কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নতার বাণীই পৌঁছে দিতে পারে। এই ধরনের ভাষাগত বিঘ্নের দ্বারা লেখক, পাঠকের মধ্যে শ্রেণীগত বিঘ্নই সৃষ্টি করতে চান, যার মূল উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতা। কমলবাবুর লেখায় একটা মজা আছে—তাঁর বাক্‌ভঙ্গিতে উপ্ত আছে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা, উন্নাসিকতা, অথচ বক্তব্যে রয়েছে জনপ্রিয়তার লক্ষ্য-সন্ধান। জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে তিনি দুটি বিপরীতমুখী পথ অনুসরন করেন।

(ক) হয় তিনি বঞ্চিত, বেদনাতুর, সহস্রের কথা বলেন—এই দরিদ্র দেশ যাদের জীবননাট্যের মঞ্চ। (যেমন—তাঁর অসংখ্য সব ছোটোগল্প, 'মতিলাল পাত্রী', 'নিম অন্নপূর্ণা,' 'তাহাদের কথা' ইত্যাদি।)

(খ) নয় তিনি জাতি-ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে মাতেন। হিন্দু জাতিবর্ণবিচার বা সাম্প্রদায়িকতা—বর্তমান ভারতের এই দুই পরম সংকীর্ণ অন্ধকার গলিতেই তাঁর পদার্পণ ঘটে। এর ওপরে আছে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের জটিল বাধা তিনটিই আমাদের আধুনিক পৃথিবীতে পা ফেলার পক্ষে বিপুল বিঘ্ন। তাঁর ভাষার দর্পণে যে মূল্যবোধগুলি প্রতিফলিত হতে দেখি—তা হলো পশ্চিমী শিক্ষায় প্রভাবিত, সামন্ততান্ত্রিক, গোঁড়া হিন্দু, উন্নাসিক ব্যক্তিত্ব-বিশেষের লক্ষণ। ভাষায় অবশ্যম্ভাবী হলো ভাষা-ব্যবহারকারী ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধগুলির বহিঃপ্রকাশ, এবং ভাষা-ব্যবহারের কৌশল সেই ব্যক্তির ভাষা-ব্যবহারের উদ্দেশ্যও ফুটিয়ে তোলে। কমলবাবুর ভাষাতে দেখতে পাই পাঠকের কাছে কিছুতেই ধরা না-দেবার জেদ, আত্মালোচকের অনিচ্ছা, সহজ না হবার, স্পষ্ট না হবার চেষ্টা—অথচ তাঁর কথা বলার তাগিদ আছে প্রচুর। শব্দশক্তির অপব্যবহার যে কাকে বলে, কমলকুমার মজুমদার তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। (শুধু কি তাই? ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার, শিল্পশক্তির চূড়ান্ত অপব্যবহারেরও কি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ তিনি নন?) কমলবাবুর কব্জিতে যথেষ্ট জোর আছে, ইচ্ছামতো ভাষাকে বিপথে চালিত করবার, এবং সেই কারণেই সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি নিশ্চিত মূল্যবান। একথা অনস্বীকার্য যে তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটি মূর্ত প্রতিবাদ, মধ্যবিত্ত বাঙালির সংহেবিয়ানার বিরুদ্ধে তাঁর হেগ্রাদ্য কিন্তু প্রতিবাদের ঝোঁকে অতিরিক্ত পেছু হেলে পড়া, অর্থাৎ প্রগতিশীল, সামনের-দিকে-তাকানো প্রতিবাদের বদলে নঞর্থক, প্রতিক্রিয়াশীল, অতীতবাদী প্রতিবাদ করা আজকের ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যহীন বলেই বোধ হয়।

এবারে বরং কমলবাবুর ভাষা-ব্যবহারের বিশেষ পদ্ধতিটির রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাক। মানুষ যে-ধরনে ভাষাকে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, সেই ধরনটার গোড়ায় ঘা দিয়ে মনের স্তর্কীন পরিবর্ত (কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স) কে এলোমেলো করে দিলেই সৃষ্টি হয় ভাষাগত এক বিপুল বিঘ্ন। রোলাঁ বার্থ একবার বলেছিলেন যে সুররিয়ালিস্তরা সাহিত্যকে তছনছ করে দেবার একটা জোরালো প্রয়াস পেয়েছিলেন কিন্তু সফলকাম হননি। কমলবাবুও যেন সেই ধরনেরই একটা চেষ্টা করেছেন, এবং সুখের বিষয় তিনিও বড় একটা সার্থক হতে পারেননি। চিরাচরিত ভাষাকে বিকৃত করা, নতুন ব্যক্তিগত শব্দ-প্রতীকের জগৎ গড়ে তোলা এবং একক উদ্যোগে বাংলা ব্যাকরণের প্রচলিত রূপটিকে নষ্ট করা—এই হলো মোটামুটি কমলবাবুর প্রয়াস। এই প্রয়াসে সিদ্ধিলাভের জন্য কমলবাবু চিত্রকল্প বা শব্দানুষঙ্গের যথেচ্ছ ব্যবহারের উপর নির্ভর করেন না, ব্যাকরণ ও যতিচিহ্নকে উলটেপালটে দিয়েই তাঁর বাঞ্ছিত ফলাফল আদায় করেন। তিনি ভাষায় বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য রূপকের উপরেও ভরসা করেন না। তাঁর পুরো বাক্‌ভঙ্গিটাই একটি ঘনসংবদ্ধ রূপক, ইতিহাস এবং যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিবাদের একটি প্রতীক। তিনি এজন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করেন তা এইরকম :

(ক) অপরিচিত ইংরিজি রীতিতে বাক্যবিন্যাস, এমন-কি ফরাসী রীতিতেই বাক্য গঠন ;

BanglaBook.org

(খ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের অবলুপ্তি ঘটানো এবং কখনো কখনো অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা;

(গ) সম্পর্কবাচক সর্বনাম (রিলেটিভ প্রোনাউন) দিয়ে বা শব্দসংযোজক অব্যয় (যেহেতু, সুতরাং, এবং, অথবা, অতএব) দিয়ে বাক্য আরম্ভ করা। অথবা মালা গেঁথে। একসঙ্গে পাশাপাশি এই সবগুলি অব্যয় ব্যবহার করা—অর্থাৎ যুক্তি-সংবদ্ধ ক্রমান্বয়িতা ধ্বংস করে ফেলা;

(ঘ) বিশেষণকে বিশেষ্যের মতো এবং বিশেষ্যকে বিশেষণের মতো ব্যবহার;

(ঙ) কারক-বিভক্তির অসংগত, ব্যাকরণবিরুদ্ধ ব্যবহার—যা ভাষার যৌক্তিকতা ভেঙে দেয়;

(চ) পরাধীন যৌগিক বাক্য লিখতে আরম্ভ করে, তার শর্তের সংগত দাবি পূরণ না করে মধ্যপথে বাক্যটি সহসা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করা—এটিও যুক্তির ভিত্তি ধ্বংস করবার চমৎকার উপায়;

(ছ) যতিচিহ্নের প্রথাবিরুদ্ধ ব্যবহার, অব্যবহার, ও অতি-ব্যবহার (যত্রতত্র বিস্ময়সূচক চিহ্ন যেমন);

(জ) বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার একত্র ব্যবহার—একই বাক্যে বিভিন্ন কালের ভাষার অযৌক্তিক সংমিশ্রণ;

(ঝ) সাধুভাষার ক্রিয়াপদের সঙ্গে চলিত ভাষার বিশেষ্য-বিশেষণ ব্যবহার—(ধাতুরূপের বেলায় তিনি এদিক ওদিক করেন না, যদিও শব্দরূপের বেলায় রক্ষে থাকেন);

(ঞ) চলিত ভাষায় মাঝে মাঝে ক্রিয়াপদ যেভাবে আগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তিনি সাধু ভাষায় সেই (বাগ্‌ক্রম) বাক্‌ভঙ্গিটি (inversion) ব্যবহার করে সাধু ভাষার নির্দিষ্ট নিয়মিত আনুষ্ঠানিক বাগ্‌ধারাটি ব্যাহত করেন, অথচ তাতে চলিত ভাষার ঊষ্ণতাও যুক্ত হয় না;

(ট) অতি-আধুনিকের সঙ্গে অতি-পুরাতন বাক্যবন্ধ ব্যবহার, বিশুদ্ধ তৎসমের সঙ্গে নেহাত কথা, বা গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার, শুদ্ধর সঙ্গে অশুদ্ধ ভাষা, এবং মৌখিক, অভিধান-বহির্ভূত অপশব্দের সঙ্গে অধুনা অপ্রচলিত সেকেলে বাগ্‌ধারার সংমিশ্রণ—উচ্চাঙ্গের ভাষার সঙ্গে মেঠোবুলির, অমৃতের সঙ্গে ইতরের;

(ঠ) বাংলায় বিকল্প আছে, অথবা সহজেই অনুবাদযোগ্য এমন সব বিদেশী শব্দবন্ধ ও বাক্যবন্ধের অযথা ও যথেচ্ছ ব্যবহার—হয় মূল ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী বঙ্গলিপিতে অনুলিখিত, রূপান্তরিত অবস্থায়, নয়তো সরাসরি, অপরিবর্তিত চেহারায়—ফরাসি, জার্মান, গ্রীক, লাতিন, ইংরেজি, সংস্কৃত—কিছুই বাদ নেই;

(ড) বিভিন্ন কালে ব্যবহৃত শব্দকে নতুন অনুষঙ্গ দান করে ব্যক্তিগত ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করা;

(ঢ) কর্মবাচ্যের বদলে ভাববাচ্যের ব্যবহার, ব্যাকরণগত কাল ইত্যাদির অপব্যবহার, মূড-এর অপ্রয়োগ, যেমন subjunctive-এর বদলে indicative,, simple indicative-এর বদলে imperative, auxiliary ছাড়াই infinitive-এর ব্যবহার ইত্যাদি;

(ণ) সমাস, সন্ধি, শতৃ-শানচ্‌-এর শাস্ত্রবিরোধী ব্যবহার;

(ত) জোড়-কলম শব্দ তৈরির খেলা, (পোর্টম্যাণ্টো শব্দ);

(থ) গদ্যে কাব্যিক বাগ্‌ধারার অকালপ্রয়োগ;

(দ) নামধাতু ব্যবহার;

BanglaBook.org

বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সীমানা নির্ধারণের চারটি মূল লক্ষণ আছে; (দ্র. প্রাইড, পৃঃ ৬৪)

(ক) ঐতিহাসিক অভিক্রম
(খ) সমসাময়িক বিবরণ
(গ) বোধগম্যতা
(ঘ) সামাজিক অনুমোদন

কমলকুমার মজুমদার একই সঙ্গে এই চারটি লক্ষণেরই বিরোধী। তাঁর ভাষা ঐতিহাসিক অভিক্রমের নিয়মসিদ্ধ নয়, সমসাময়িক বর্ণনাভঙ্গির সঙ্গে তাঁর যোগ নেই, বোধগম্যতা তাঁর ইচ্ছাবিরুদ্ধ, এবং তিনি সামাজিক অনুমোদনের পরোয়া করেন না। তাঁর সব লেখাই এমন একটি বিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতি উদ্দিষ্ট, একমাত্র শিক্ষা-সংস্কৃতির জোরেই একজন ভাবতবাসীর পক্ষে যে গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব। এই উচ্চাঙ্গের পাঠকগোষ্ঠী ভালো স্কুলকলেজে উচ্চশিক্ষা ছাড়াও আরও নানাভাবেই রুচি ও বুদ্ধির অনুশীলন করে মানসিক উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ পেয়েছেন: এদেশে সাংস্কৃতিক কৌলীন্য এখনও অনেকটাই নির্ভর করে অর্থকৌলীন্যের ওপরে।

কমলকুমার মজুমদারের বক্তব্যের যথার্থ স্বাদ পেতে হলে আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকার দরকার। আর তার জন্য উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন। দুঃখ এখানেই, এখানেই কমলবাবুর ট্রাজিক আইরনি, যে তাঁর ঐতিহাসিক অভিক্রম বাঙালি লেখকের মধ্য দিয়ে নয় বরং ইয়োরোপের সাহিত্যিকদের সঙ্গেই তাঁর ভঙ্গির চরিত্র-সাদৃশ্য, শ্রেণিতসংজ্ঞা মিলে যায়। যিনি প্রুস্তের 'পুরনো সেই দিনের কথা' বা জয়েসের 'ফিনিগানস্ ওয়েক্' পড়েছেন তাঁর কাছে বরং কমলকুমার মজুমদারের আঙ্গিক ততটা অপরিচিত নয়। বাংলা ভাষাকে প্রাক্-পাশ্চাত্য দিনের আদিম আকৃতি-প্রকৃতি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে কমলবাবুকে কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের বক্রোক্তির কাছেই নতজানু হতে হয়েছে। ফলত এডমন্ড স্পিচার্ট-বর্ণনায় সুদানের 'জদ্দে' উপজাতির সান্ধ্য ভাষা যেমন, প্রায় সেই ধরনেই কমলবাবুর একটি ব্যক্তিগত উপ-ভাষা গড়ে উঠেছে; 'This is the language of dissimilation, hinting, circumlocution, innuendo, sarcasm।' এই লুকোচুরি, ঠাট্টা-তামাশা, খোঁচাস-ইঙ্গিতের হেঁয়ালো-পাঁচালো সাঙ্কেতিক ভাষা প্রায়ই অপ্রত্যাশিত চমক লাগিয়ে অদীক্ষিত পাঠককে ল্যাবিরিন্থের মতো এক গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়। তা থেকে মুক্তি পেতে প্রবল বুদ্ধির পরিশ্রম লাগে' লেখকের এই বিশেষ শৈলীর মধ্যেই এক ধরনের অগণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে বলে আমার ভয়। এই মনোভঙ্গি স্পষ্টতই মানব বিমুখ, অতিমাত্রায় আত্মনিমগ্ন, এবং একদিক থেকে অত্যাচারী।

ভাষাকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতার চরিত্রই হলো সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতার ওপর-চালাকি দিয়ে ভাষাকে ভিন্ন হাঁড়ি করে নেবার অতিরিক্ত অনুমতিটুকু সমাজের কাছে জোরজবরদস্তি আদায় করে নেওয়া "বিশিষ্ট সামাজিক আত্মপরিচয়ের এই নির্দিষ্ট অনুভূতিটিকেই পেশাদার রাজনীতিবিদ ও প্রচারসংস্থাগুলি কাজে লাগানোর চেষ্টা করে থাকেন" (দ্রঃ প্রাইড, পৃঃ ১৯)। যেমন ধরুন 'KWALITY' বানানের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বটি যা, কমলকুমার মজুমদারের আঙ্গিকের মূল দার্শনিক তত্ত্বও এতে তেমনটিই হয়ে দাঁড়ায়। তারপরে একটা মানুষ ক্রমশ একটি কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়ে যান। মানুষ থেকে মিথ-এ পৌঁছনো খুব লম্বা দৌড়ের রাস্তা নয়। কাশিয়াস ক্লে'র স্লোগান 'আয়্যাম দা গ্রেটেস্ট' যেমন মিথ, গ্রেট গার্বোর ব্যক্তিগত রহস্যময়তা যেমন মিথ, 'নিশাকী মাতা' যেমন মিথ, তেমনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কমলকুমার মজুমদার।

"তরুণ হ্যেটেবের দুঃখ"তে গ্যয়টে যেমন 'ক্লপস্টক' এই নামটিকে মিথ হিসেবে রোমান্টিক আবেগের প্রতীকস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। দুটি প্রেমিক হৃদয়ে মুহূর্তেই সেতু বেঁধে দেয় এই

BanglaBook.org

একটি বিশেষ শব্দ। এককথায় 'ক্লপস্টক' এই নামটির সঙ্গে জড়িত সমস্ত কোমল, কাব্যিক, হার্দিক অনুষঙ্গ শব্দটিকে রোমান্টিকতার মূর্ত প্রতীক করে তোলে সাম্প্রতিকালে ঠিক তেমনই কোনো কোনো গোষ্ঠীর কাছে 'কমলকুমার' এই নামটি এককথায় উন্নাসিক মননশীলতার প্রতীক চিহ্ন। কমলকুমার মজুমদার বলতে এই ভক্তগোষ্ঠীর কাছে বোঝায় ;

(ক) রুচির কৌলীন্য, উন্নাসিকতা ;

(খ) উচ্চশিক্ষা, ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ও দর্শনে জ্ঞান ;

(গ) বুদ্ধির অনুশীলন, চটক এবং চমক ;

(ঘ) অভিনবত্বের নেশা ;

(ঙ) এক বিশেষ পলায়নী মনোভঙ্গি, যাকে 'অক্ষম ঈর্ষাকাতর আম-জনতার আক্রমণের হাত থেকে বুদ্ধিজীবীর পলায়ন' (দ্রঃ বিশ্বার, ১৯৫৮, পৃঃ ৪৪৬, প্রাইডে উদ্ধৃত) বলা চলে।

(চ) এবং বস্তুপন্থী সাহিত্যের সঙ্গে কিছুটা আপাতিক, অনুষঙ্গিক চটকদারী যোগাযোগ।

বাংলা ভাষার পবিত্র উৎস সন্ধানে কমলবাবুর এই অন্বেষাতে আমরা এক ধরনের শুদ্ধতার আতিশয্য দেখতে পাই। "সংশোধনের আতিশয্য অনেক সময়ে সামাজিক মর্যাদার ঊর্ধ্বগতির লক্ষণ হতে পারে, সুতরাং এটাকে আমরা পদমর্যাদা লাভের প্রয়াস হিসেবে ধরে নিতে পারি (ল্যাবয়, ১৯৬৬, পৃঃ ২০, প্রাইডে উদ্ধৃত) ওয়াইনারিখও বলেছিলেন : "আহত উচ্চম্মন্যতা অনেক সময়ে ভাষার প্রতি অতিরিক্ত তীব্র এক আনুগত্যের জন্ম দেয়" (প্রাইডে উদ্ধৃত)। ভাষাকে সচেতনভাবে দুর্বোধ্য করে তোলায় কমলবাবুর দুর্বার মোহ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের এই কথাগুলি মনে করিয়ে দেয়। ফরাসি সাহিত্যিক গারোদির ভাষিক ভাষা প্রসঙ্গে পণ্ডিত রোলাঁ বার্তের কথাগুলিও মনে করুন। বার্ত বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই, আমাদের নিতান্ত মামুলি ক্ষমতাকেও জায়গা করে দেওয়া উচিত বৈকি—এবং শ্রীযুক্ত গারোদির ক্ষেত্রে তা তো রীতিমতো মর্মস্পর্শী!" কমলকুমার মজুমদারের ক্ষেত্রেও যদি কেউ কেউ বার্তের মতো করেই ভেবে ফেলেন? কিন্তু না। আমরা ওভাবে ভাবতে চাই না কমলবাবুর কৃতিত্বের অসামান্যতাকে অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু এও সত্য, যে তাঁর ভাষা ব্যবহারের চমকপ্রদ পদ্ধতিটিকে চট করে অনন্যতা অর্জনের সহজ উপায় বলে মনে হতেই পারে। তাঁর অনুচ্ছেদগুলি অতি প্রলম্বিত, তাঁর যতি চিহ্নের ব্যবহার অতি-অভাবনীয়, প্রচলিত ধারাবিরোধী বিচিত্র বাক্যবিন্যাস করেন তিনি। অর্থের দিক থেকে সেই সব বাক্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ এবং দুর্বোধ্য, যেহেতু তারা ব্যাকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই দুরূহ ভাষার নিহিত উদ্দেশ্য যদি হয় হঠাৎ আঘাত সৃষ্টি করে পাঠকমনকে সচেতন করে তোলা, তবে বলব সে উদ্দেশ্যে তিনি সম্পূর্ণ সফল হননি। কেননা বেশির ভাগ সাধারণ পাঠকই তাঁর ভাষার আকস্মিক আঘাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাঠ ছেড়ে পলায়ন করেন। শেষ পর্যন্ত লেগে থাকেন কেবল তাঁরাই—যাঁরা সচেতনভাবে বুদ্ধির ব্যায়ামে উৎসাহী, এবং/অথবা, যাঁদের হাতে এ ধরনের শখের ধাঁধার জট খোলবার মতো যথেষ্ট উদ্বৃত্ত সময় আছে। এ ধরনের পাঠকদের একটিই নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণীর ফসল বললে খুব ভুল হবে না। কমলবাবু জনগণের জন্য লেখেন না। তিনি লেখকের লেখক। কমলবাবু প্রসঙ্গে পাঠকদের মতামতের পর্যালোচনা করলে আমরা তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই: হয় তদ্গত ভক্তি, নয় বিরূপতা, নতুবা নিছক কৌতুক। কমলবাবুর লেখা পড়ে যাঁদের মনে কৌতুক জাগে, অথবা প্রতিকূল ভাবোদ্রেক হয়, তাঁদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু তাঁর লেখাকে যাঁরা অকুণ্ঠ সমাদর করেন, নিজেদের অনুভূতিতে তাঁরা যথেষ্ট সৎ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। সাধারণত এঁরা নিজেরাও সাহিত্যিক। হয় সৃষ্টিমূলক নতুবা সমালোচনা সাহিত্যে অংশগ্রহণ

BanglaBook.org

করে থাকেন। কিন্তু নিজস্ব সৃষ্টিকর্মে অমিয়বাবু ভিন্ন তাঁদের কারোকেই কমলবাবুর দ্বারা প্রভাবিত হতে, বা তাঁকে সচেতনভাবে অনুসরণ করতে দেখা যায় না। নিজেদের লেখার সময় তাঁরা কিন্তু সহজবোধ্য ভাষাই ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কমলবাবুকে নিয়ে এঁরা যতটা হৈ-চৈ করেন, ততটা তাঁকে ইদানীং আর পড়েন কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ হয়। অতীতে কমলবাবুর প্রথম দিকের অসামান্য লেখাগুলি এঁরা পড়েছিলেন, এবং তাদের জেল্লায় এঁদের নয়নমন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সেই ধাঁধাই এখনও ঘোরের মতো চোখে লেগে আছে। খোলা চোখে এঁরা কমলবাবুর দিকে নজর দেন না। ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করবার প্রক্রিয়াটিতে সব সময়েই একটা supercali-fragilistic-expi-ali-docious'-জাতীয় গালভরা কাঁকির ফাঁদ থেকেই যায়।

কিন্তু বাংলা ভাষা নিয়ে কমলবাবুর এই ফুটবল খেলাকে পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক না ভাবার স্বপক্ষেও বেশ কিছু যুক্তি আছে। প্রথমত, ব্যাকরণগত পরীক্ষানিরীক্ষা তা যেভাবেই হোক না, ভাষাকে সর্বদা পুনরুজ্জীবিত করে। তাতে নতুন আলোকপাত ঘটে এবং মানুষ নতুন করে ভাষা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। তখন ভাষা সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে: যেমন জীবন ও সাহিত্যে ভাষার ভূমিকা, তার স্থিতিস্থাপকতা ও পরিধি; লেখকের সামাজিক ভূমিকা; জীবনে সাহিত্যের ভূমিকা; সাহিত্যে আদর্শ ভাষার অনুসন্ধান; ভাষাতে কোনো ধ্রুব আদর্শ সৃষ্টি সম্ভবপর কিনা ইত্যাদি। অন্ততপক্ষে এতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে একজন মাত্র লেখক তাঁর একক ব্যক্তিত্বের যথেচ্ছ আচারে কোনো সুগঠিত, প্রতিষ্ঠিত ভাষার ক্ষতি করতে পারেন না। আর ভাষা সম্পর্কিত যে-কোনো একক পরীক্ষা যদি সে ভাষার অন্তরে প্রবেশ করে, ভবিষ্যৎ লেখকদের প্রভাবিত করতে পারে, তবে তো সে-পরীক্ষা সার্থক। এবং এইসব সার্থক পরীক্ষাই তার সম্পদ বাড়িয়ে তোলে ভাষার চরিত্র পাল্টে দেয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ভাষার গায়ে আলতো টিল ছুঁড়ে কমলকুমার কোনোদিন বাংলা ভাষার ক্ষতি করতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর ভাষার অন্তরালে যে ভাবধারাটি প্রবাহিত, যে মূল্যবোধ নিহিত, তা সমাজের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক হতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রগতিবিদ্বেষী, ইতিহাসবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল। ভাষার চিরাচরিত প্রকরণকে ধ্বংসাত্মক করার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাই শেষ পরিণতিতে সে-ভাষাকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেখতে বাধ্য। ভাষার ওপর যথেষ্ট শক্তিশালী আক্রমণ বিতর্ক সৃষ্টি করে—এবং নিছক সাহিত্যপ্রেমিকদের ভাবুক নজর ভাষার বৈজ্ঞানিক দিকেও কেড়ে আনে। অতএব শত্রুভাবে ভজনা করেও এ ধরনের প্রচেষ্টা বাগ্‌দেবীর শ্রীবৃদ্ধিই করে। যেহেতু সাহিত্যের মূল্যায়ন কখনোই দেশ-কাল, সমাজ-অর্থনীতির বাইরে নয়, তাই বর্তমান যুগে সাহিত্যের সমালোচনাতে ভাষার চরিত্রের দিকটিকে হিসেবের মধ্যে আনা দরকার কেননা সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলির সমাক প্রতিফলন ঘটে ভাষার দর্পণে। কী বলছি তারচেয়ে কীভাবে বলছি সেটা কম জরুরী নয়, কেননা তা থেকেই বোঝা যাবে, কাকে বলছি। কার জন্য লিখছি। কেবলমাত্র নান্দনিক সমালোচনা করার রীতিটি ক্রমশ অস্তমিত হয়ে আসছে—সাহিত্য সমালোচনার প্রসঙ্গে সোশিও-লিঙ্গুইস্টিক দৃষ্টিকোণটি এখন উদীয়মান। আমরাও সেই চোখেই কমলবাবুর ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নটিকে পরীক্ষা করেছি।

কমলকুমার মজুমদার ভাষাকে সংশ্লেষ প্রক্রিয়া (synthetic process) তে ব্যবহার করেন। সংশ্লেষ বলতে আমি বুঝি সেই পদ্ধতি যার সহায্যে কবিতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ একই শব্দে একাধিক অর্থের অনুপ্রবেশে বাঁধাধরা অভ্যস্ত সংজ্ঞা থেকে শব্দের মুক্তি ঘটে যায়, এবং বিভিন্ন অনুষঙ্গের সমাহারে কবির হাতে প্রাণশূন্য রিক্ত শব্দের নবজন্ম ঘটে। নতুন ভাবৈশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠার ফলে কবিতায় শব্দের বহুমুখী চরিত্র অর্থকে কুয়াশাবৃত না করে বরং শিল্পের অভিজ্ঞতাকেই সর্বজনীন করে তুলতে সক্ষম হয়। এ হলো কবির ভাষা—প্রেরণার, মর্মোদ্ধারের ভাষা, যুক্তির বিশ্লেষে নয়, আবেগের সংশ্লেষে যার জন্ম; সৃজনী প্রতিভা আত্মার প্রয়োজনে এই ভাষাকে

আবিষ্কার করে, আর পাঠককেও তার সমান অংশীদার করে তোলে

কমলকুমার মজুমদারের নিজস্ব ভাষাও এক অর্থে প্রেরণার, ভাবুকতার, মর্মোচ্ছ্বাসের ভাষা, অথচ তিনি এর মধ্যে একটি অদ্ভুত সেকেলে হিতোপদেশের গন্ধ কৌশলে মিশিয়ে দেন—যার ফলে পাঠকের সঙ্গে তাঁর সুদূর বিচ্ছেদ গড়ে ওঠে। তিনি তাঁর নিজস্ব সম্পদ অন্যদের সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারা করতে তেমন পছন্দ করেন না। যক্ষের ধনের মতো নিজের ভাষাটির চাবি কেবল নিজের কাছেই রেখে দেন।

সমালোচনামূলক নয় এমন সমস্ত সৃষ্টিশীল রচনার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ গল্পে, উপন্যাসে) যতই অস্বস্তি হোক, তবুও তাঁকে সহ্য করা সম্ভব। যেহেতু এক্ষেত্রে তিনি ভাষার যে প্রকরণটিকে আত্মপ্রকাশের উপযুক্ততম বলে মনে করেন, ভাষাকে ভেঙে চুরে সেটি তৈরি করে নেবার শিল্পগত অধিকার তাঁর আছে। এটি মৌলিক সাহিত্যের জন্মগত দাবী। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। জর্জ স্টাইনার বলেন—"সমালোচকের সমস্ত রচনাই দোহাতকেতা, যেহেতু সমালোচক অন্যের লেখার বিষয়ে লেখেন।" অতএব ব্যঞ্জনার চেয়ে ব্যাখ্যাতেই সমালোচকের নজর থাকা প্রয়োজন। সমালোচনার জন্য চাই সর্বজনগ্রাহ্য, বোধগম্য, যুক্তিশুদ্ধ, ঋজু বাক্‌প্রকরণ, যা লতার মতো না লুটিয়ে মহীরুহের মতো সোজা দাঁড়াবে। যার আন্তর সত্য আলো-বাতাসে আন্দোলিত হবে।

৫

কমলবাবুর ভাষা-প্রকরণ প্রসঙ্গে আমার সংশয়গুলি নিচে সবিনয়ে নিবদ্ধ করছি।

(১) তাঁর গদ্য প্রবন্ধের যোগ্য নয়, দ্ব্যর্থহীনভাবে তথ্য উপস্থাপনের ক্ষমতা ঐ উপভাষার নেই।

(২) তাঁর ভাবনার, বিষয়বস্তুর জনদরদী উদার সংবেদন এবং তাঁর ভাষার জনবিরোধী সংকীর্ণ আবেদন—এই দুটির মধ্যে নৈতিক বিরোধ আছে। যাদের নিয়ে লেখা, তাদের জন্য লেখা নয়। আর যাদের জন্য ওঁর লেখা, তারা জনদরদী নয়। উন্নাসিকতা, গোষ্ঠীবদ্ধতার মূল সংজ্ঞাই তো জনদরদের বিপরীত। ওঁর ভাবনায় যে জনদরদ আছে ভাষায় সে জনদরদ নেই, বরং আছে জনমানসকে পূর্ণ উপেক্ষা।
কোনটিকে গুরুত্ব দেবো আমরা?

(৩) ওঁর ভাষাকে যদি বিদ্রোহের ভাষা বলে ধরে নিই (ব্যাকরণকে যদি গতানুগতিক নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতীক বলে ধরি) তাহলে তার সঙ্গে ওঁর গতানুগতিক জাতি-বর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-কুসংস্কারবিলাসী ভাবনাগুলির চারিত্রিক বিরোধ উপস্থিত হয়। আমার আপত্তি এখানেই। ভাবে ও ভাষাতে দুই দিকেই তিনি বিদ্রোহী হতে পারেননি কেন? অথবা ঐতিহ্যবাদী? তিনি ঠিক কী হয়েছেন? নিজের জন্য একটি সাহিত্যিক তথা সামাজিক বিশিষ্ট ভূমিকা গড়ে নিয়েছেন তিনি, অথচ সেই ভূমিকাটি যে ঠিক কী, সেই বিষয়ে নিজেই নিশ্চিত নন। নিশ্চিত নই আমরাও।

তিনি নিজেকে (ট্রাডিশনাল) ঐতিহ্যবাদী বলে চিনতে এবং চেনাতে চান, অন্তত হিন্দু স্বস্তিবচন দিয়ে লেখা শুরু করলে সেই ইঙ্গিতই করা হয়। অথচ ব্যাকরণ-বিদ্রোহ মোটেই ঐতিহ্যবাদের লক্ষণ নয়। সে তো ঐতিহ্য ভাঙারই জেহাদ। তাঁর বিদ্রোহ ঠিক কিসের বিরুদ্ধে? সমকালের বিরুদ্ধে? তার মানে প্রগতির বিরুদ্ধে? পশ্চাৎ অপসরণের দার্শনিক তত্ত্বে যে কী প্রগতিবাদ নিহিত, তা আমি শ্রীদেবেশ রায়ের 'কথাসাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা' যত্ন করে পড়েও ঠিক বুঝতে পারিনি। মাত্রাতিরিক্ত ভাষাসচেতনতা সাহিত্যের পক্ষে সর্বদাই যে ভালো তা নয়। সৎ সাহিত্যের

BanglaBook.org

জনা তা অত্যাবশ্যকও নয়—শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, প্রেমচন্দ, ডিকেন্স, হুইটম্যান বা টলস্টয়—এঁরা কেউই তো অতিরিক্ত ভাষা-সচেতন লেখক ছিলেন না। ভাষা যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন শিল্পীর শ্রম ও নিষ্ঠা, অনেক সময়েই অপশিল্পের দিকে ঢলে পড়ে। কমলকুমার এমনিই এক 'অপসংস্কৃতি'র শিকার। অথচ 'পরিচয়' এ দেবেশবাবু লিখেছেন: "কমলকুমার মজুমদারের ভাষা-প্রকরণ এইভাবে আমাদের অনুভূতির সম্প্রসারণ ঘটানোর ফলে বাঙলা গদ্যের বিস্তারক্ষমতা বহুগুণে বেড়েছে—ঠিক তখনই, যখন জনমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় বাঙলা গদ্যের বিস্তারক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যচ্ছে. প্রক্রিয়াটি এই মতো: ব্যক্তিমানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও সামাজিক মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়াসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাঙলা গদ্যসাহিত্য সমাজ-পরিবেশহীন, চরিত্রের নেহাত ক্ষুদ্রতর পরিবেশে সংকীর্ণ হয়েছে। এই ক্ষুদ্রতর পরিবেশ থেকে কমলকুমার মজুমদার নিজস্ব প্রকরণের সাহায্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। এই বিচ্ছিন্নতা তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। এই বিশিষ্টতা তাঁকে জীবনের নানা মূল প্রশ্নের সঙ্গে অন্বিত করেছে। ফলে এই অন্বয় তাঁকে সাম্প্রতিক বাঙলা গদ্যসাহিত্যের সংকীর্ণতা থেকে জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে মুক্তি দিয়েছে।

"তাই কমলকুমার মজুমদারের ভাষা প্রকরণের বিশিষ্টতার সাধনা সাহিত্যকে বিশিষ্ট মণ্ডল থেকে বের করে এনে বৃহত্তর বিষয়ের ভেতর মুক্তি দেয়। তাঁর ভাষার বিশিষ্টতা আসলে তাঁর বিষয়ের সর্বজনীনতাকে ধারণ করে।" (বৃহত্তর, ক্ষুদ্রতর, বিচ্ছিন্ন, বিশিষ্ট, অন্বিত, বৃহত্তর শব্দগুলি দেবেশ রায়ের মূল প্রবন্ধে মোটা হরফে ছাপা ছিল। 'পরিচয়', এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃঃ ৭১১)।

যখন একজন সমাজ-সচেতন বামপন্থী তরুণ বুদ্ধিজীবী এই কুযুক্তি প্রয়োগ করেন তখন মনে হয় 'there is something rotten in the state of Bengali literature. দেবেশবাবু নিজেই এই ভাষাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদিতা' নাম দিয়েছেন এবং বলেছেন, "ভাষায় বিচ্ছিন্নতার সাধনা কখনো কখনো...নতুন বৈপ্লবিক উপাদানের...জন্ম দিতে পারে।...কমলকুমার মজুমদারের ভাষা বাঙলা গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই নতুন বৈপ্লবিক উপাদানের জন্ম দিয়েছে।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭০৯), তারপর "কমলকুমার মজুমদার সেরা দশ বছরের বাঙলা কথাসাহিত্যের প্রধান নির্মাণকর্তাদের একজন।

"কিন্তু পাঠক ও সমালোচকের সমর্থন তিনি পান না সে অসমর্থনের পক্ষেও নাকি যুক্তি আছে। তাঁর প্রধানতম বাধা নাকি তাঁর ভাষা। এই যুক্তির ভেতর ভাষা উদ্ধারের অক্ষমতার যে-পরোক্ষ স্বীকৃতি থেকে যায় তার জন্য আমাদের আত্মসম্মানবোধে পীড়িত হয় না। নিজেদের অশিক্ষার দায় আমরা লেখকের ওপর চাপাই।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭১৫)। এই দুঃখজনক মন্তব্যের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দেবেশবাবু একজন মানবমুখী, সংবেদনশীল, জনদরদী লেখক। তিনি নিজে এই 'নির্মিতি' ভাষাটি ব্যবহার করেন না বলে বাঙালি পাঠকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন—"কমলবাবুর জনপ্রিয় না হবার কারণ—কমলকুমারের প্রকরণ নয়, ভাষা নয়, বিষয় নয়। তার কারণ কমলকুমার মজুমদার সাহিত্যের ক্লাসিকধর্মে বিশ্বাসী আর সম্প্রতিকালে সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা আমরা হারিয়েছি, ক্লাসিকসের পঠনঅভ্যাস থেকে আমরা বঞ্চিত।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭১৫-১৬)। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্লাসিকস বিষয়ে এখানে হয়ত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু সংক্ষেপে বললে—ক্লাসিকস সাহিত্যের প্রথম কথাই হলো ভাষার বোধগম্যতা, স্বচ্ছতা, ঋজুতা, সমস্ত আতিশয্যকে নিষিদ্ধ করে, ব্যাকরণের অনুজ্ঞা মেনে যাবতীয় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসংস্কার নীতিকে পূর্ণ সম্মান জ্ঞাপন করে, কোথাও কোনো সীমাকেই লঙ্ঘন-অতিক্রমণ না করে—সামাজিক অনুমোদন মেনে, তথাকথিত ক্লাসিক রীতির সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সেই যে, "ঐতিহাসিক অভিক্রম, সমসাময়িক বিবরণ, বোধগম্যতা, সামাজিক অনুমোদন"—ভাষার সীমানির্ণয়ের প্রসঙ্গে প্রাইড যা বলেছিলেন সেইগুলি সবই ক্লাসিকস সাহিত্যের সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কমলকুমার কোনোটাই মানেন না। তাই তিনি কোনো

BanglaBook.org

হিসেবেই ক্লাসিকস প্রথায় বিশ্বাসী লেখক বলে স্বীকৃতি পেতে পারেন না। সবচেয়ে বড় কথা, ক্লাসিক রীতির সাহিত্যে রূপরীতি ও বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটে। সেইটের অভাবই কমলবাবুর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ব্যাকরণবিরোধী বিপ্লবী আঙ্গিকের শিল্পগুণের সঙ্গে "ভাগবত দর্শনের একটি কাহিনী"—বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, যৌন উপভোগে পুরুষের অগ্রাধিকার, কুলীনদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ইত্যাদির অসম মিলনে যা প্রস্তুত হয়, তা যে কোনোও যুক্তফ্রন্টের মতোই, সাময়িক। অন্তর্বিরোধে ভুগে তা শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়তে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গে আরেকজন প্রগতিবাদী এশীয় লেখকের অভিমত তুলে দিচ্ছি:

"প্রথম কথা হলো—কাদের জন্য আমাদের শিল্পসাহিত্য রচনা?...তত্ত্বের বেলায় আর মুখের কথায় আমাদের কোনো কমরেডই জনতাকে পেটি বুর্জোয়াদের চেয়ে কম মূল্য দেন না। কিন্তু কাজের বেলায় কিছু কমরেড কি জনতার তুলনায় পেটি বুর্জোয়াদের বেশি গুরুত্ব দেননি? আমার মনে হয়—দিয়েছেন। বহু কমরেড বুদ্ধিজীবীদের অনুধাবন করার দিকেই বেশি সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন,...সেই সঙ্গে তাদের দুর্বলতার সাফাই গান, এমন কি দোষগুলিকে সমর্থন পর্যন্ত করেন।...আমাদের শিল্পীসাহিত্যিকদের অবশ্য-কর্তব্য হচ্ছে মূলসমেত উঠে আসা, জনতার পাশে এসে দাঁড়ানো।...দর্শক-পাঠকের সমস্যা হচ্ছে একটা মৌলিক সমস্যা—নীতির সমস্যা।" (মাও-সে-তুং, 'শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে', পৃঃ ৮৭-৯৩)—এই মৌলিক নীতির সমস্যাটিকেই কমলবাবু প্রশ্রয় দেননি। কমলবাবুর গুণমুগ্ধ সমর্থকবৃন্দের কাছেও পাঠকের সমস্যাটি জরুরী হয়ে ওঠেনি। কমলবাবুর দ্বিতীয় লেখার মধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ কীভাবে মতো স্পষ্ট বিদ্ধ করতে থাকে পাঠকের চেতনাকে। জানি না তার কতটা অকৃত্রিম, কতটা ভনিতা, কিন্তু ভাণই হোক আর সত্যই হোক, তা পাঠকের কাছে অরুচিকর, আপত্তিকর এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশেষত তাঁর তথ্যপ্রকরণ যেহেতু বৈপ্লবিক। এখানে একটা বড়ো অন্তর্দ্বন্দ্বও থেকে যায় "বুর্জোয়া শিল্পসাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মর্মটাকে বাতিল করতে হবে, এবং অত্যন্ত বিচার বিবেচনা করে তার শিল্পগুণকে গ্রহণ করতে হবে। জনক প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পসাহিত্যে—যেমন ফ্যাসিস্তদের রচনাবলীতেও কিছু শিল্পগুণ থাকা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু উঁচুদরের শিল্পগুণসম্পন্ন প্রতিক্রিয়াশীল রচনা জনসাধারণের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে, সুতরাং এ ধরনের রচনাকে বাতিল করাটা অত্যন্ত জরুরী। ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় শোষকশ্রেণীগুলোর শিল্পসাহিত্যের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের রূপরীতির উৎকর্ষের দ্বন্দ্ববিরোধ। আমরা দাবি করি শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির ঐক্য; আমরা চাই বিষয়বস্তু ও রূপরীতির সমন্বয়।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১১৫)। 'স্লোগান এবং পোস্টার' নীতির সাহিত্যকর্ম নিশ্চয় নিন্দার্হ; কিন্তু নকশা-কাটানো শিল্পশৈলীর মাধ্যমে কুসংস্কারের আর প্রগতিবিরোধী কথা বলা আরো বেশি নিন্দার্হ।

এ ছাড়া, ঐতিহ্যবাদীর পেশাকে বিপ্লব বা বিপ্লবীর মুখোশে ঐতিহ্যবাদ—দুটোর কোনোটিই বিশ্বাসযোগ্য সমাজবাদের পন্থা নয়। ক্ষয়িষ্ণু বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি, যা গণসংস্কৃতি নয়, এ বছরে যার নয়া নাম হয়েছে 'অপসংস্কৃতি', কমলকুমার মজুমদার তারই চূড়ামণি। অথচ কমলকুমারের প্রতিভার বিপথগামিতার জন্য অনেকখানি দায়িত্ব পাঠকের। যে-সৃষ্টির জমিতেই বিপরীত আদর্শের স্ববিরোধ, তার ফসল ফলবে শূন্যতায়। কমলকুমার মজুমদার সেই শক্তিহীন শূন্য পরিণাম। পাঠকের বিভ্রান্ত অনুরাগ, অযৌক্তিক অন্ধ ভক্তি সৃষ্টির পক্ষে গর্হিত ক্ষতিকর হতে পারে। এখানে লোথার লুৎসের মডেলটির অন্য একটি অংশ মনে করিয়ে দিই, পাঠক ও সমালোচকের প্রতিক্রিয়াও যে উলটে লেখকের রচনার ধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে, লুৎসে একটি সুন্দর মডেল করে দেখিয়েছেন।

লেখক। ——————→ পাঠক/সমালোচক

পরবর্তী রচনা ←——————

BanglaBook.org

কমলকুমার মজুমদারের প্রতিভা-হননের তদন্তে এই মডেলটি খুব সহায়তা করে। সমালোচকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিনি আমরা। সমালোচক লেখকের চাটুকার নন, নন ভক্ত, বা প্রেমিক। তিনি লেখকের বন্ধু, উপদেষ্টা, এবং বিচারক। যথাকালে লেখকের ত্রুটি নির্ণয় করে দিয়ে তাঁর প্রতিভার সম্যক ঔজ্জ্বল্য বিধান করাই সৎ সমালোচনার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিত্ববিলাস (পার্সোনালিটি কাল্ট) সবক্ষেত্রেই সর্বনাশ ডেকে আনে, কমলবাবুকে ঘিরে সেই মন্দ বাতাস বইছে আজ প্রায় বিশ বছর হতে চলল। যে মুহূর্ত থেকে কমলবাবু স্বকীয় শিল্পকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়েছেন—শুভানুধ্যায়ী পাঠকদের হেঁকে বলা উচিত ছিল—"মহারাজ, আপনি যে অ-বসন?" কিন্তু ভক্তিবাদের শিকার হয়েছেন তিনি। এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় তার জন্য দায়ী আমাদের মুখ্য প্রগতিবাদী পত্রিকাগুলিই—যারা কমলবাবুর প্রধান ভক্তগোষ্ঠী ও পৃষ্ঠপোষক। নিরবধিকাল হালখাশানের চমক নেয় না, তুলে নেয় চিরায়তটুকু। এক টুকরো কমলকুমার হয়তো বেঁচে থাকবেন 'নিম অন্নপূর্ণা'য়, 'মতিলাল পাদরী'তে, 'তাহাদের কথা'য়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় যুক্ত হলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে যাঁর নাম থাকলেও থাকতে পারত, তিনি পরিণত হলেন এক 'শেয়ানা চমকে', একটি উদ্দাম ব্যতিক্রমে। নিছক একটি শিল্পসামগ্রীতে। এক "খেলার প্রতিভা"য়।

পরিশিষ্ট—এক ॥ উদাহরণ—ক

রবীন্দ্রনাথ : যদি খোকা না হয়ে আমি হতেম কুকুরছানা!

বঙ্কিমচন্দ্র : পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?

রামেন্দ্রসুন্দর : সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই। কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর।

হুতোম : আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মতো মাঝিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীবা হয়েচে...বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় ক'চ্চেন। যদি এর কেউ ওয়ারিসান থাকত তাহ'লে হয়ত এতদ্দিন কতো প্রম্বুকার ফাঁসি যেতেন।

মধুসূদন : (ক) হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব/বিবিধ রতন!

(খ) থু! থু! চুঁকড়োর পাখা! প্যাঁজের খোসা!
বাবু ইদিকে আবার পরম বৈষ্টব!

বিদ্যাসাগর : (ক) এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি, যাহার শিখর-দেশ সতত সঞ্চরমাণ জলধর পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত।

(খ) গোপাল বড় সুবোধ বালক। সে যাহা পায় তাহাই খায়।

ঈশ্বর গুপ্ত : বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে।

রামমোহন রায় : ভাষা বিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তি দিবেন না...যদি বিবরণে অশাস্ত্র কথাও লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, এবং অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন...

উইলিয়াম কেরী : এক রাজকন্যা অতি বড় সুন্দরী ছিলেন।

* লেবেডফ (১৭৯৬)...ভাল ঈশ্বর অনুগ্রহ করুন, আমি করিয়া এনেছী একটি বিষয় আমার মনস্তের। সসিমুখী সন্দেহ লাস্তী আমার কথায় প্রত্তয় করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর : বড় রসিয়া নাগর হে/গভীর গুণসাগর হে।

রামপ্রসাদ : বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।

কাশীরামদাস : মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

BanglaBook.org

কৃত্তিবাস : গোলক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
চণ্ডীদাস : সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।
বড়ু চণ্ডীদাস : দেখি লাজে গেলা চাঁদ/দুই লাখ যোজনে।
চর্যাপদ : টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
ছাড়িঅ ভাউ নাহি নিতি আবেশী।
অপভ্রংশ : এ'গাব ভত্তা বঙ্ক আ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুদ্ধসজুত্তা
*কমলকুমার (১৯৭৪) : মাধবায় রামকৃষ্ণায় নমঃ এখন যাহা আমরা লিখিতে ভাবস্থ করি...এমন হইল মনস্কামনার।

পরিশিষ্ট —দুই ।। উদাহরণ—খ

১। "মাধবায় রামকৃষ্ণায় নমঃ। এখন যাহা আমরা লিখিতে ভাবস্থ করি তাহাই অব্যাভিচারিণী কৃতজ্ঞতাতে হউক তাহা শুদ্ধতাতে হউক যে এবং সুন্দর ভক্তিতে হউক যে কোনো শেয়ানা চমক না থাকে এমন হইল মনস্কামনার।"
(ক) স্বস্তিবচন। ভান ভণিতা। ভাষায় কালাতিক্রমণ। অপ্রচলিত বাক্যবন্ধ ব্যবহার।
(খ) সম্পর্কবাচক সর্বনাম ও সংযোগকারী অব্যয়ের অকারণে দ্বৈত প্রয়োগ (যে, এবং)।
(গ) নির্দেশক ভাব ব্যবহার (Indicative mood), অপেক্ষিত বা সংযোজক ভাবের (Subjunctive mood) পরিবর্তে।
(ঘ) ইংরেজি বাক্যবিন্যাস—বিপরীত পদান্বয়—অতিরিক্ত ক্রিয়া ব্যবহার।
(ঙ) দ্বিতীয়ার বদলে ষষ্ঠী (মনস্কামনার)।
(চ) ভাববাচ্য।
(ছ) মৌখিক ভাষা (শেয়ানা চমক)।

২। "যে যাঁহার বিষয়েতে এই পাট, তিনি নিশ্চিত হয়েন পুণ্যশ্লোক।"
(ক) শুরুতেই অকারণ সম্পর্কবাচক সর্বনাম এবং সংযোগবাচক অব্যয় প্রয়োগ।
(খ) 'পাট' শব্দের অপ্রচলিত প্রয়োগ।
(গ) 'হয়েন' অপ্রচলিত ক্রিয়া রূপ—রীতি-বহির্ভূত প্রয়োগ, ইংরেজি বাক্যবন্ধ।
(ঘ) বিপরীত পদান্বয়—বিচ্যুতি।

৩। "ইহাটি টানাসুর বর্জিয়া, ইহা আপ্লুতস্বরে, ইহা বুদ্ধি সুচিন্তিত কণ্ঠে পাঠক কবিতা পড়িবার যে বিন্যাসেই উচ্চারিব একই নাটকীয়তার বৈপরীত্য (কন্ট্রাস্ট নহে) আমাদিগতে ছাইবেই!"
(ক) মৌখিক লোকভাষা (ইহাটি)।
(খ) (বর্জিয়া) নামধাতু—কাব্যিক প্রয়োগ—গদ্যে অপ্রচলিত।
(গ) চ্যুত বিন্যাস (deviant syntax), ("পাঠক কবিতা") অংশ অসংলগ্ন।
(ঘ) (উচ্চারিব) নামধাতু—কাব্যিক প্রয়োগ।
(ঙ) দ্বিতীয়ার বদলে সপ্তমী (আমাদিগতে)।
(চ) (ছাইবেই) কথোপকথনের ক্রিয়াপদের প্লুত ব্যবহার।
(ছ) (কন্ট্রাস্ট নহে) অনাবশ্যক ইংরেজি শব্দ।
(জ) (বুদ্ধিসুচিন্তিত কণ্ঠে)—অর্থ কী? স্বাতন্ত্র্যসর্বস্ব শব্দযোজনা।
(ঝ) অকারণ বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহার।

॥। "এস্থেটিক জন্যত্ব নহে।"

BanglaBook.org

"তবু শব্দ বাছাই ঠিক কিন্তু তাহার জনাত্ব কেমন?"

(ক) বাংলা হরফে ইংরেজি শব্দ (এস্থেটিক্স)।

(খ) অব্যয়ের সঙ্গে তাচ্ প্রত্যয় যোগ (জনাত্ব) হয় না।

৫। "এখানে মোহহীন শব্দটির হয় ভারী সূক্ষ্মতা।"

(ক) অন্তার্থক ক্রিয়ার অপব্যবহার (হয়)।

(খ) (সূক্ষ্মতা)—বিশেষণের পরিবর্তে বিশেষ্য।

৬। "এই মাকৌওবার চাপ আমাদিগে আতাতুরে নিক্ষেপিল; আরিঃব্বাস!"

(ক) মাকৌওবার—ইংরিজি শব্দকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাচীন তৎসম শব্দের মতো চেহারা দেওয়া (পৌলবর্জিনীর মতো). ম্যাকাবার না লিখে। লৌখিন বানান।

(খ) ইংরেজি শব্দ কেন?

(গ) (আমাদিগে) দ্বিতীয়ার পরিবর্তে সপ্তমী।

(ঘ) (আতাতুরে) মৌখিক, লৌকিক শব্দ।

(ঙ) (নিক্ষেপিল) ওজনদার নামধাতুর কাব্যিক প্রয়োগ 'আতাতুরে নিক্ষেপিল গুরুচণ্ডালী।

(চ) (আরিঃব্বাস) ফার্সী—মৌখিক বিস্ময়সূচক শব্দের লৌকিক প্রয়োগ।

পরিশিষ্ট—তিন।। উদাহরণ—গ*

১। পৃঃ ১৭ কমলকুমার মজুমদার, মধুসূদন দত্ত, মাধব, রাধাকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব বসু (ইংরিজি শব্দ—কন্ট্রাস্ট, আর্ট)।

২। পৃঃ ১৮ নিপট বাঙালীত্ব, নিছক বাঙালীর সেন্ট ফ্রান্সিস অব আসিসি, অলীন্দের কুমারী জোন, লা সিয়েকাল দা লুই ১৪, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব বসু, ভোলতায়ার, জেরাবদ্যা।

৩। পৃঃ ১৯ বু. ব., ত্রৈলোক্যবাবু, 'মাকৌওবার চাপ', 'হিবোইক ব্রাহ্মণ্য', মিরাক্কাল।

৪। পৃঃ ২০ "কোনও পাশ্চাত্ত্য লেখক" (কে? নাম কেন নেই? পাঠকের জানা উচিত? তবে জোন্ অব আর্কের নামের দীর্ঘ টীকা-পরিচিতি আছে কেন? পাঠকের জ্ঞানের বৈদেশিক পরিধি বিষয়ে আশ্বাস, বা আশঙ্কা, কোন্‌টা বেশি?), বু. ব, কালিদাস, বঙ্গীয় সংস্কৃতি।

৫। পৃঃ ২১ ইংরেজ বু. ব, কল্লোল যুগ, কালিদাস, বৈষ্ণবকবি ভরতচন্দ্র, ১৮ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মতিচ্ছন্নতা।

৬। পৃঃ ২২ কেরী, সংবাদপ্রভাকর, রেভঃ কৃষ্ণমোহন, ভূদেববাবু, বু. ব., শ্রীঅরবিন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন, ত্রৈলোক্য, ১৯ শতাব্দী বাঙালীত্ব হইতে হিন্দুত্বে, ইতিহাস, নারীচরিত্র, দেশাচার।

৭। পৃঃ ২৩ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মডেলভগিনী, মমতাজ, মানিকবাবু, রাজা রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎবাবু, নজরুল, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, ডিটেকটিভ গল্পে নারী, টেকচাঁদ, কালীসিংহী, ঈশ্বর গুপ্ত, কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা, দেশীয় ধারা, হিন্দু, নব্য ইংরাজ।

৮। পৃঃ ২৪ ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, অর্ধেন্দুবাবু, বঙ্কিমবাবু, সংবাদ-প্রভাকর, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র সেন, Gaiety Theatre।

BanglaBook.org

৯। পৃঃ ২৫ অমরত বসু, মধুসূদন, দাদাভাই নৌরজী, অর্ধেন্দুবাবু, রাধাকান্ত দেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, সতীশ চক্রবর্তী, বিজাতীয় নবা, ঈশ্বর, হিউম, নিহিলিজম, কম্‌তের পজিটিভিজম, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, গীতার ব্যাখ্যা, অগস্ত কোঁৎ, মধুসূদন, জড়বাদ, নাস্তিকতা (ইংরেজি উদ্ধৃতি), রিফর্মড হিন্দু, পয়ার হইতে মুক্তির আন্দোলন।

১০। পৃঃ ২৬ মধুসূদন, ইংরেজি ভাষায় উদ্ধৃতি, লাতিন উদ্ধৃতি, ১৮শ জর্মান মতিত্ব, ফরাসীদের মনোভাব, ভূদেব, পৌরাণিক চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রবাবু, ভগবান রামকৃষ্ণের কৃপাবলে, বৈকুণ্ঠ সান্যালের 'কেশবচরিত', হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখা, আধ্যাত্মিক মধুর ভাব, বিধানবিশ্বাসী, ব্রাহ্মসমাজ, বৈদান্তিক জ্ঞান বিচার।

১১। পৃঃ ২৭ ঠাকুরের (রামকৃষ্ণের) ভাষার সারল্য, টেকচাঁদ, কালী সিংহী, বুদ্ধদেব, অবয়বান্তর (metamorphosis), মনুষ্যবৎ এর নামে সমস্ত চিন্তাধারার - হিংসা, আত্মত্যাগ, প্রতিহিংসা, ধর্ম, একান্নবর্তী, বিলাতী শিক্ষা, সততা, সত্যের জয়, অনুতাপ, বৈরাগ্য, লেখার সমালোচনা, চিত্রাঙ্কন, ঘটনাচক্র, লিপিচাতুর্য, ভিকতর আলফিয়েরী ইতালীর ট্র্যাজিক কবি (১৭৪৯-১৮০৩), মারী স্টুয়ার্ট, যেরোপ, তিমেলিও, কেশব সেনের বাচনিক অভিব্যক্তি, শিবনাথ শাস্ত্রী, মাঘোৎসব, শরৎবাবু, কল্লোল, ভারতী, প্রবাসী, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সন্তোষ ঘোষ মহাশয়, একসিডেন্ট।

১২। পৃঃ ২৮ সন্তোষ ঘোষ, একসিডেন্ট, shock, alarmer, সমন্বয়, ফ্রয়েডসাইজ, শরৎবাবু, বুদ্ধদেব, পাঠকবর্গদের প্রতি সাবধানবাণী মানবতা মনুষ্যত্বের বাজারচলতি রাজনৈতিক অভিধা বিষয়ে, ছোটজাত একতারা বাদকদের মতামত, মৎস্যেন্দ্রনাথ, নানা সম্প্রদায়।

১৩। পৃঃ ২৯ The Anglo-Saxon and the Hindu, তুলসি, কবি অজিত দত্তের উক্তিতে যেমন প্রভু গুহঠাকুরতা, ব্রজেন শীল, বঙ্কিমচন্দ্র, মাস্টার, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেববাবু, গোকুলচন্দ্র নাগ, সুচিত্রাকুমার সেনগুপ্ত।

১৪। পৃঃ ৩০ রামেন্দ্রসুন্দর, দিলীপ রায়, নলিনী গুপ্ত, পাশ্চাত্যতত্ত্ব, অজিত চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, পাশ্চাত্যের কাব্য, আর্ট, ভরউইন, গ্যেটে, রামেন্দ্রসুন্দর, বের্গসন'এর এলাঁ ভিতাল, ফ্রয়েড, 'অবচেতন', এ্যাট হোম, মাই ডিয়ার, বাস্তবতা, dogmatic, ব্রজেনবাবুর ওবজেকটিভ সমালোচনা, কন্টিনেন্টাল বিশ্লেষণ, পাশ্চাত্ত্য ১৮ শতাব্দী, ১৯ শতাব্দী, অজ্ঞাতনাম্নী 'ভদ্রমহিলা'র উক্তির উদ্ধৃতি, কানডিড্ (আদত নাম—কান্‌দিদ য়ুল ওপতিমিজম [Sic], সবিনয়ে দুঃখ করছি, কেন যে এই শুদ্ধ ফরাশি ঔচ্চারণিক অহংকার! কারণ সত্যি তো ওঁরটাও ঠিক না। জিন দা আর্ক নয়। প্রকৃতপক্ষে 'জান্‌দা'র; কান্‌দিদ য়ু'ল ওপতিমিজম নয়, 'কঁদীদ উ লোপ্‌তিমিজম', অগস্ত নয় 'ওগুস্ত্'—এসব শুধরেই বা কী লাভ? আমরা ইংরেজিটাই বুঝি—ক্যানডিড, কিংবা জোন অব আর্ক ব'লেই ঠিক চিন্‌ব। এটা তো আলজিরিয়া নয়!) লেইবনেৎসীয়ান (Sic) আশাবাদ, Humarise, ,মোপাসাঁ, মাই ফাদার গ্রন্থে জাঁ হুনোয়া।

১৫। পৃঃ ৩১ (জাঁ হুনোয়ার) পিতা বিখ্যাত শিল্পী অগস্ত পীযের হুনোয়া, মোপাসাঁ, পবিত্রবাবুর মেটারলিংক, সত্যেন দত্তর নগুচীর পদ্য, গোকুলবাবুর জাঁ ক্রিস্তফ, মণীন্দ্রলাল বসু, শরৎবাবু, স্বর্ণময়ী দেবীর শিবনাথের anglo vernacular সমাজ, কালো মেয়ে হেরোইন, সাদাত এসথেটিকস, নিটশে'র সুপারম্যান, বাইওলজিকাল নিড, বার্নার্ড শ'র চাকচিক্য, লিগাল প্রসটিটিউশন, বেকনেও, New atlantises,

বালজাক, লা কাম দা তারাত জা, ঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গ, অচিন্ত্যবাবু, বুদ্ধদেব, আর্ট।

১৬। পৃঃ ৩২ ইংরাজ সমাজ, লেডি চ্যাটারলীজ লাভ, নিরুপমবাবু ও সন্তোষবাবু, সজনীবাবুর পত্র উদ্ধৃতি (উচ্ছৃঙ্খল যৌনতত্ত্ব বিষয়ক মন্তব্য), নরেশ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র উদ্ধৃতি, বুদ্ধদেব বসু, কল্লোল যুগ, আর্টের মূলতত্ত্ব রমণীদেহ, সত্যেনবাবু, সজনীবাবু, সমাজতত্ত্ব, অশ্লীলতা বিষয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের, মধুসূদনের ইংরাজি চিঠি, রাজনারায়ণের উদ্ধৃতি, নীতিবাগীশ ব্রাহ্ম।

১৭। পৃঃ ৩৩ (মধুসূদন), ইনসেসটুয়াস লাভ অফ রাধা, বিদ্যাসাগরের 'পঞ্চসতী লইয়া টিট্টিকার', হিউমানাইজ বা মনুষ্যবৎ, র‍্যাশানালাইজ, 'রক্তের বিচিত্র কথা', ভ্রূণহত্যা, 'গোস্বামীর সাগরযাত্রা'তে incest, মডেলভগিনীতে খানসামার বডিস উন্মোচন, হরিদাসের গুপ্তকথা, হিন্দুঘরের মেয়েদের কোর্টশিপ, চুম্বন, গর্ভদান, শিবনাথ শাস্ত্রী, এ্যাঙ্গলো ভার্নাকুলার সমাজের কিস দেওয়া মানে চুম্বন, ইনসেস্ট, মধুসূদন, শরৎবাবুতে immoral বেশ্যাচরিত্র, লীলাপ্রসঙ্গ, বিবেকানন্দ ও তদীয় বন্ধুর আলোচনার উদ্ধৃতি, যুবক নরেন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বুদ্ধদেব, সত্যেনবাবু, জয়দেব, ভারতচন্দ্র, বিপরীত বিহার, বিদ্যাসাগরের গুরুপ্রসাদী।

১৮। পৃঃ ৩৪ মিস মেও, মাদার ইণ্ডিয়া, হিন্দু ছুৎমার্গ, ব্রাহ্ম নৈতিকতা ও পাপবোধ, হেরম্ব মৈত্রের শেলীর 'লাভস ফিলজফি' পড়ানো, বুদ্ধদেব বসু, ক্রোবেয়ার, লরেন্স, ইউলিসিস, বাঙলার ব্রত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৯। পৃঃ ৩৫ জাঁ পল সার্ত, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত, বুদ্ধদেব বসু, ন্যাজিতি, নিরুক্তি ও নৈতিকতায় চিরাচরিত হেলেনিক মেল, ১৯ শতাব্দী।

২০। পৃঃ ৩৬ বুদ্ধদেব, দোল দুর্গোৎসব, অজ্ঞাতপরিচয়, ১৯ শতাব্দীর খ্যাতনামা কবির বক্তব্য, দিদেরো, স্টার্ন, সুইফট, র‍্যাবেলে, নেরলাঁ কোকেঁই, পেতরো, লুসিয়া, ভোলতেয়র, জ্যা সিএকল জ্যা লুই কাতজ, সুইফট হয়েন র‍্যাবেলে পারফেক্টসিঅনে...(ফরাসী), গোলাপ, বাঁশী, গল্প, ইত্যাদির দেশভ্রমণের ইতিহাস, বিদ্যাসাগর এবং কিলিপ নাতার, ১৫ শতাব্দী ও ১৯ শতক, জাতক, কথাসরিৎ-সাগর, হোপমানের হানাবাড়ী সাতে, এবং ক্ষুধিত পাষাণের তুলনা, ওয়াল্টার স্কট।

২১। পৃঃ ৩৭ বিখ্যাত সাহিত্যিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোপাসাঁ, চেকভ, জন গলস্‌ওয়ার্দী, সিলভার স্পুন, ভারতী, বুদ্ধদেববাবু, ইমপরটান্স অফ বিং আরনেস্ট, ফর্মমী দেবী, সুবল মিত্তির, মধুসূদনের চিঠির ইংরেজি উদ্ধৃতি গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, স্তাঁদাল, ওপেরা গান, স্তাঁদালের ইতালী ভ্রমণ, ন্যাস আরগসী লিসনার (বি বি সি), মাইকেল আরলেন, 'it গার্ল সংজ্ঞা', ফাহার লেখা মনে নাই, মুইলা ক্যাথার, গার্ডিনার, ১৮ শতাব্দীতে (২) কি ফরাসীতে ও ইংরাজীতে প্রাচ্য আকর্ষণ দেখা যায়, স্বদেশ সমালোচনা, exotic হওয়া, মনতেসকিও, ইংরাজদের নিকট নবাব আমাদের কাছে ফিরিঙ্গী।

২২। পৃঃ ৩৮ এ্যাঙ্গলো স্যাকসন এণ্ড দি হিন্দু, বুদ্ধদেব, 'ইংরাজী সাহিত্য ও আমরা', বু. ব.-র তীব্র অভিমান ওউটলাইন অফ ওয়ার্লড লিটারেচর গোচের গ্রন্থে বাঙালী লেখক নাই, কানাডা, নিউজীল্যাণ্ড, সুরেশ সমাজপতি, রমাপ্রসাদ চন্দ, 'পরিচয়', হোরাইজন, নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড দি নেশন, টাইম (sic) লিটেরারী সাপ্লিমেণ্ট, লিসনার, মার্কস ইস্টম্যান আদি প্রবন্ধ লেখক, চাইকোভোস্কী (sic),

BanglaBook.org

ইম্প্রেশানিস্ট, বুদ্ধদেববাবু, রেনে গ্রুসে, চারুবাবু, বেদান্তারি তত্ত্বালোচনা, উদ্বোধন, ভারতের সাধনা, বসুমতী, ইংরেজ সাধনায় যাওয়া (বৈজ্ঞানিকতা, মূঢ়তা, নির্ণয়ে ধর্মান্ধতা)।

২৩। পৃঃ ৩৯ 'শ্রীঅরবিন্দের পর আরও মানুষের দরকার ছিল', যদিও সুধীনবাবু আমাদের একমাত্র মহৎ কবি', শরৎবাবু, দিলীপ রায়, মধুসূদন, 'কেন মহাশয় জর্মন উক্তি দিয়া পদ্যর আরম্ভ', মধ্যযুগ বা হেলেনিক পুরাণের পুনরুল্লেখ, ভগবান, শঙ্করাচার্য, মহাপ্রভু রামকৃষ্ণ, তুলসীগাছ, রামায়ণ, বুদ্ধদেব, গঙ্গার কথা, রামকৃষ্ণের উল্লেখ, দেবেন সেন, সুধীনবাবু ১৯ শতকের কবি।

২৪। পৃঃ ৪০ ইংরেজী উদ্ধৃতি (মধুসূদনের), ১৯ শতকে হিন্দুত্বকে সম্মান না ক'রে পুরাণকে মানা করার ভ্রান্তি, 'পরিচয়', রাজনারায়ণ, মধুসূদন, শিবের গীতে মিসটিফিকেশন, সত্যেন মজুমদার, দুর্বোধ্যতা, সান্ধ্য ভাষার উদাহরণ, বাউলিয়া দুর্বোধ্যতা, অনামা পাশ্চাত্য কবির বালখিলাতা, বুদ্ধদেব, সুধীনবাবু, সিরিল কনেলী, রঞ্জার ফ্রাই।

২৫। পৃঃ ৪১ মালার্মে অনুবাদ, 'মো জুস্ত'! ঠাকুর বলিয়াছেন কথা ইশারা বটে, pour l' effet। (মানে কি?), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাগলকে অজ লিখেন, সাঁবলিস্ত বা প্রতীকধর্মী, disillusion, 'অথচ ইহারা প্রত্যেকে মহ উচ্চবর্ণের কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ এবং নিশ্চয়ই শ্রী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!' (যদি এটা বিদ্রূপই হয়, তবে বুদ্ধদেবের স্মৃতিকে সম্মান করতে এসে তাঁকে 'বিদ্রূপ কর' কি উপাদেয়?), ডিসইল্লুসন, সামাতত্ত্ব, বঙ্কিমবাবু, বুর্জোওয়া, Byronic!, নেপোলিয়ন (ইংরেজি উদ্ধৃতি), বাইবেলী আক্ত।

২৬। পৃঃ ৪২ আপেল ভক্ষণের পূর্বের আহ্লাদ, সাম্যবাদ, শ্রেণীকরণ, পিপিলস ওয়র, মাও, সুবোধ ঘোষ, সুভাষবাবু, জাপানি, বুর্জোওয়া, কমুনিজম, মাস বুর্জওয়াজী, সিন্তেসিস, ডাইলেক্ট, দীনেশবাবুর 'আকাশে চাঁদ হ'ল কাস্তে' (sic), সুধীনবাবু, সোসাল কনটেন্ট, বুদ্ধদেববাবু, আ-লা ল্যাম্প পোস্ট, পৈশাচিক সেমেটিক আকোচ, ১৯ শতক, সমাজতত্ত্ববিদ, লণ্ডনেতে কোন বাঙালী বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টরের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের বিবৃতি (নাম নেই কেন? ফিল্ম আকাশের একচন্দ্র বলেই কি ধরে নিতে হবে? আরও দু'তিনজনের কিন্তু লণ্ডন-গতি হয়েছে!), বাজসিক আখের, নামী হৌসে কাজ, প্রাইজ, উচ্চপদ ইত্যাদি 'সবই মিলিল,' সেমেটিক পারসেন্ট, উপনিষদ ব্যাখ্যা, বুদ্ধদেব, সুবোধ ঘোষ, তিলাঞ্জলি।

২৭। পৃঃ ৪৩ ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্য, বুদ্ধদেব (চিঠি উদ্ধৃতি), স্পেনসরীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা, সগুণ, নির্গুণ, জীবতত্ত্ব, বঙ্কিমবাবু, ঈশ্বর গুপ্ত, কাঁটি বাঙ্গালী, বাঙলা, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন পাল, রামপ্রসাদে বাঙালীত্ব ছিল কিনা।

২৮। পৃঃ ৪৪ অজিতবাবু, বুদ্ধদেববাবু, ওস্কার ওয়াইল্ড, mon cher পদটি, বাঙালীর আবেগ, বঙ্কিমবাবু, মহান গিরিশবাবু, তদীয় অর্ধেন্দুবাবু, সাইন অফ দি ক্রশ, সুবল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুরেশবাবু, দীনেশ সেন, প্রমথ বিশী, ত্রৈলোক্যবাবু, ভোলতেয়র, সুইফট।

২৯। পৃঃ ৪৫ দিদেরো (প্রমথ বিশী), মধুসূদন, একজন ডক্টরেট লিখিলেন (কোন্‌জন? নাম নেই কেন?), 'শেলীর ভাবশিষ্য', decor, ঈশ্বর গুপ্ত, কালী সিংহী, কলকাতা, বুদ্ধদেববাবু, আমাদের মা কি বলতেন, বাঙ্গলা দেশ (এখনও পূর্ব পাকিস্তান), গ্রাম, শহর, উচ্চারণ, পূর্ববঙ্গীয়দের কানে লাগা।

৩০। পৃঃ ৪৬ সুকুমারবাবু, পাশ্চাত্ত্যে কোন ঔপন্যাসিক, কোন কবি, খৃষ্টান ভালবাসা (ক্যাথলিক

ও উইক্লিফ হইতে প্রটেস্টাণ্ট সংজ্ঞা) এক, আর বাঙালীর মন কেমন আর এক! 'এই এক বিপুল শহরের যারা ধার্মিক,...অর্দ্ধাংশ ম্লেচ্ছ ইহার হিন্দুত্ব নষ্ট করিতে পারে নাই', ভগবতশ্রেষ্ঠ নাগমহাশয় বলিয়াছেন এখানে গঙ্গা আছে, গঙ্গার কূলে ভক্তি জন্মায়, চতুরঙ্গিনী শ্রীশ্রীঅম্বিকার অধিষ্ঠান, বুদ্ধদেববাবু, মহাপ্রভুর পদরেণু, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, এবং অজস্র মহাপুরুষ, আধা বৈদিক কলকাতা, কেশব সেন, 'এখনও আমাদের ধর্ম্মোন্মাদনা রহে, ভাবাবেগ আছেই, তত্ত্বসূত্রে পৌঁছাইবে।' কবি তারাপদ রায়, অচিন্ত্যবাবু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, idiom।

৩১। পৃঃ ৪৭ রামায়ণ, মহাভারত, ম্লেচ্ছ শব্দ, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশ, সংস্কৃত সাহিত্য, মীমাংসাদর্শন, বৈষ্ণবকবি, ভারতচন্দ্র, ১৯ শতাব্দীর ভাষা মধুসূদনে, প্রমথবাবু, বুদ্ধদেব বসু, কম্পারেটিভ লিটরেচার, লাঠি বিস্কুট, ম্যাকসার ওয়েল, হরির লুঠ হরির নুট, সম্ভূতেলী, দাস্তে, নিরুপমবাবুর লিস্ট, অচিন্ত্যবাবু, ভুবনবাবু পূর্ববঙ্গীয় টান, সংস্কৃতবিলাস

৩২। পৃঃ ৪৮ সন্তোষবাবু, নিরুপম চাটুজ্যে, অরুণ সরকার, বুদ্ধদেববাবুর শনিবারের চিঠি, কাজল কমপ্লেক্স, নরেন দে (ইংরিজি উদ্ধৃতি), অরুণবাবু, মহং মণীন্দ্রলাল, কেদারবাবু, নিরুপমা দেবী, রাজশেখরবাবু, নরেশচন্দ্র, কেদার বাবু (আবার), জগদীশ গুপ্ত, সুধীনবাবু, মানিকবাবু, বনফুল, শৈলজাবাবু, প্রফুল্লবাবু, দিলীপ রায়, অচিন্ত্যবাবু, তারাশংকর, বিভূতিবাবু, বিরাট তত্ত্ব ভিসারিনিজম, প্রয়োজন ও মুক্তি, রামেন্দ্রবাবু, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনবাবু, বুদ্ধদেববাবু, ইতিহাস, বীর হিন্দু কুলতিলক সাবারকর, সুভাষবাবু, কিরিস্তিয়ানা, শালারা, মেড়ো অধিপত্য, এনারকিষ্ট, রিট্রেঞ্চমেন্ট, স্বর্ণমান হস্তান্তর, স্কুরবিয়ার।

৩৩। পৃঃ ৪৯ এ্যাট হোম, আনা পাবলুভা, শিশিরবাবু, আমেরিকানরা, কেশববাবুর সেন্টেনারী, রবিবাবুর জয়ন্তী, ক্রাইসলার, গার্ডি ক্লাব, ফৈয়াজ খান, আব্দুল করিম, অর্দ্ধোদয় যোগ, ভগবান রামকৃষ্ণ সেন্টেনারী, উদয়শঙ্কর, হোয়াইটওয়েস সুররিয়ালিজম সজ্জা, অবনীবাবুদের হিন্দুস্থান বিল্ডিঙে স্কুল, ফেক আর্ট, মহৎ গায়ক ভীষ্মদেব, সুরকার হিমাংশু দত্ত, শচীন কর্তা, নজরুলের গজল, কমলা ঝরিয়া, হবিমতী, লর্ড ব্রাবোর্নের মৃত্যু, সেভরলে গাড়ী, ডগ বেস, শীরিষবাবুর ভারতীয় architecture, আর্টের প্রবক্তা রামেন্দ্রসুন্দর, রামানন্দবাবু, ১৯ শতাব্দীর ভূমিশিয়াত্ব প্রকৃতি, ঈশ্বর গুপ্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেন, রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমস্বয়বাদী ছিলেন, ভগবান রামকৃষ্ণ, বিপ্লব, সমাজভঙ্গ, 'স্বরাজ', চিকাগো লেকচার, বুদ্ধদেববাবু, প্রগতিশীলতা, কল্লোল, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাস বা মঙ্গলকাব্যে গল্প করার রকম, তার বুনট, কবিকঙ্কণ, ধর্মমঙ্গল, সঞ্জীববাবুর এসথেটিক বৃত্তি, বুদ্ধদেববাবু, স্যানিটি অফ আর্টস, পণ্ডিচেরী, বঙ্কিমবাবুর ভেনাসের ব্যাখ্যা।

৩৪। পৃঃ ৫০ নিছক বাঙালী, মহা উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশমর্যাদার চিহ্ন, ধর্মজ্ঞান পরিপূর্ণ উপন্যাস, হিন্দু স্টাইল, এসথেটিকস জন্মত্ব, 'বঙ্গের বিচিত্র কথা', 'হরিদাসের গুপ্তকথা', বিমল সিংহ, পাকা সৌন্দর্যতত্ত্ব বা এসথেটিকস, ব্রতকথা, উপকথা, রামেন্দ্রবাবু, দক্ষিণারঞ্জন, বুদ্ধদেব বসু, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', স্বনামধন্য কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'পাশ্চাত্যের কোন বিরাট কবির নববিধি'র উদ্ধৃতি (নাম নেই), জিরোদু, আরাগঁ, প্রগতিশীল সমালোচক, পুনরাবৃত্তি, গল্পের বাস্তবতা রোমান্টিকতা, মহান শিল্প।

৩৫। পৃঃ ৫১ ঐ বিরাট পাশ্চাত্য কবির উদ্ধৃতি (এলিয়ট) সঙ্গীতের কাঠামো, কোন চিন্তাকে

organic কাঠামো করা বড় গলদঘর্ম ব্যাপার, কোন (অনামা) ঔপন্যাসিকের নির্দেশমত উপন্যাসের প্রাথমিক প্রয়োজন ঘর্ম, narration, বিশ্লেষণ, কথাবার্তা, মোনলগ বা স্ব উক্তি, কনফেসন বা আত্মকথা, পত্র আদি...বিশেষত চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, আর একজন (অনামা) পাশ্চাত্যের ধারণা, মলিয়ের (আথালি, তারতুফ, সিনা প্রভৃতি চরিত্র) fictif, উপন্যাসের বিষয়বস্তু কী? কিছুই না!

৩২। পৃঃ ৫২ মানিক বন্দ্যো, 'ভাবের উপন্যাস' প্রকৃতিবাদ, প্রতীকবাদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব, অতুলবাবু, প্রমথবাবু, 'আর্ট বলিতে তিনি কী বুঝেন', হিপোক্রাট এনড্রু মারভেল, গোর্টে, বালজাক গল্প আর জীবনস্মৃতি, নীতিবিদ, রাজনীতিকরিক, enthusiasm, ফরাসী বিপ্লব, 'আনন্দ সাহিত্য', আমাদের গ্রাম্য ধারণায় মানিকবাবু।

৩৭। পৃঃ ৫৩ নীতি, মার্ক্সিম, টোমস মান, ভারটিরেট মরালিটি, tribal and social ethic, গ্রেট জার্মান মানসের প্রতিভূ, লুথার, লাইবনীৎস, স্পিনোজা, নীটসে, 'সাসপেন্স', 'এন এক্সাব অফ গ্রীণ গ্রাস', সুব্রত চক্রবর্তী, ডবলু বি ইয়েটস, ফ্রেনজী, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে হিংসুটের প্রকৃতা।

৩৮। পৃঃ ৫৪ বুদ্ধদেব বসু, (শ্মশান ও মরদেহ বিষয়ক), সিদ্ধার্থ, নান্দীমুখ, অতনু, হিন্দু মতিত্বে অনিত্য সংসার সহ্য করিবার সংস্কার, ভগবদ্ভক্ত পূর্বপুরুষগণই সত্য, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কেওড়াতলা মহাশ্মশানে, সার্থক সাহিত্যমাত্রই ধর্মের কথা, জপ, আশ্রম, সংস্কৃত শাস্ত্রের উদ্ধৃতি, উপনিষৎ উদ্ধৃতি, জয় মাধব, জয় রামকৃষ্ণ, সতারব্রহ্মময়ী মাগো, খাতমায় লেখক শ্রীঅজিত দত্ত, সন্তোষ ঘোষ, শ্রীঅরুণকুমার সরকার, শ্রীনিকপম চট্টপে, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

উল্লেখপঞ্জি

১। Roland Barthes; *Writing Degree Zero*, London, 1967.

২। E. E. Evans-Pritchard: Sanza, a Characteristic Feature of Zande', *Bulletin of the School of Oriental & African Studies*, VIII, London, 1956

৩। J. L. Fischer: 'Social Influence in the Choice of a Linguistic Variant', *Word*, 1958.

৪। J. R. Firth: 'The Techniques of Semantics', *Transactions of the Philological Society*, 1935.

৫। A. Kondratov: *Sounds and Signs*, 1969.

৬। কমলকুমার মজুমদার: 'রেখো মা দাসেরে মনে', *কৃত্তিবাস*, প্রথম পর্যায়, শেষ সংখ্যা, ১৯৭৪।

৭। J. B. Pride. *The Social Meaning of Language*, London, 1971.

৮। দেবেশ রায়: 'কথাসাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা', *পরিচয়*, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪।

৯। G. Steiner: *Language and Silence*, London, 1967.

১০। মাও সে-তুং: 'ইয়েনান ফোরামে আলোচনা' (১৯৪২), শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে, বাংলা অনুবাদ, এন. বি. এ. সংস্করণ, ১৯৬৮।

---

* 'রেখো মা দাসেরে মনে' প্রবন্ধে ব্যবহৃত নামের ও তত্ত্বের এবং ভাবের অসম্পূর্ণ উল্লেখপঞ্জি।

পরিশিষ্ট দুই এবং তিন-এর সব উদাহরণগুলিই গৃহীত হলো 'রেখো মা দাসেরে মনে' (*কৃত্তিবাস*, প্রথম পর্যায়—শেষ সংখ্যা, বুদ্ধদেব বসুর স্মরণে) প্রবন্ধ থেকে। কেননা এই আলোচনাটি লেখার সময় পর্যন্ত ঐটিই ছিল শ্রীকমলকুমার মজুমদারের শেষতম প্রকাশিত রচনা। কমলকুমার মজুমদারের বিষয়ে লেখিকার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এপ্রিল, ১৯৭৫ সালে, ইংরেজিতে দিল্লির *'বাগর্থ'* পত্রিকায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রম্যরচনা

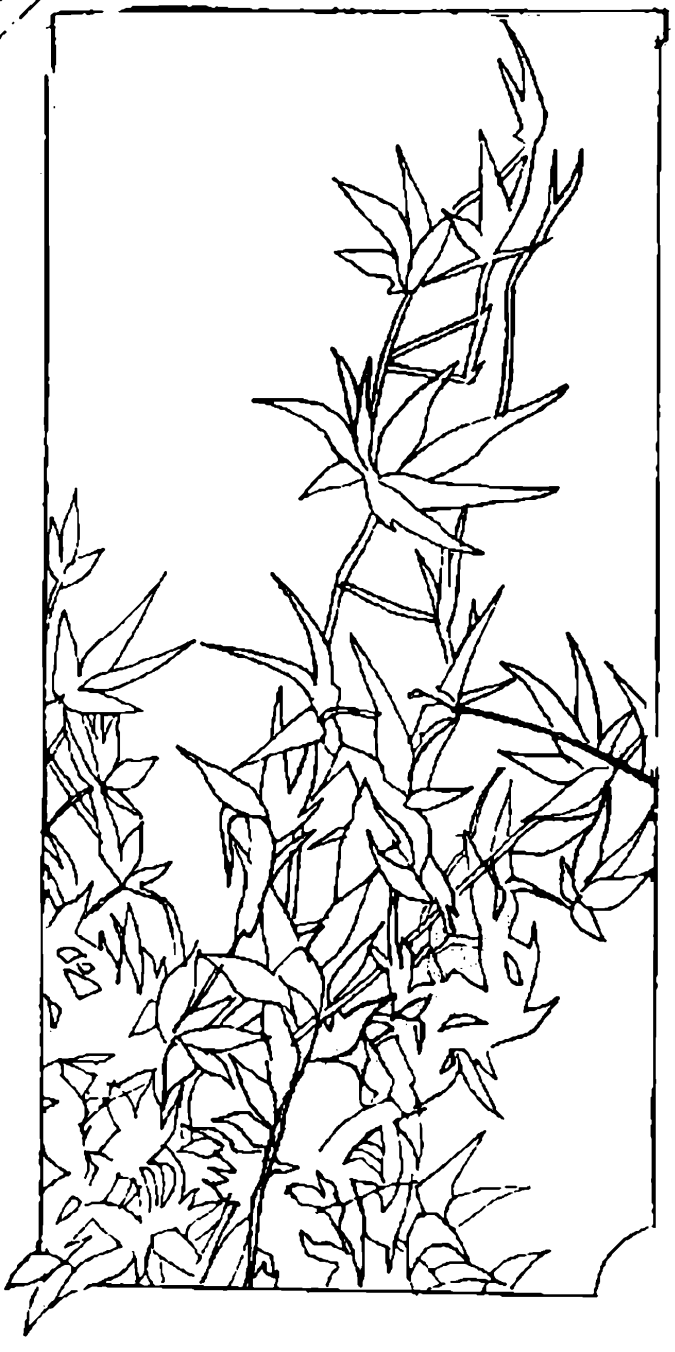

বুঝি কালান্তরে যাবে ?

জগতে আনন্দযজ্ঞে কি সবারই নিমন্ত্রণ থাকে ? মহাকবি মহত্ত্ব করে যাই বলুন, থাকে না।

আনন্দযজ্ঞে চিরন্তন গেস্ট কনট্রোল। শর্ট লিস্টেড হতে হয়। আর যজ্ঞ মানেই আগুন আর আহুতি। হবি চাই। আনন্দযজ্ঞ তো সোজা ব্যাপার নয়। সর্বস্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, আঁট গাঁঠ ছিঁড়ে। জীবনই যদি কখনও দয়া করে আঁটো গাঁঠগুলো খুলে দেয় তবেই না বেরিয়ে পড়া সম্ভব আর সেইটেই হল জগতের মহাযজ্ঞে যোগ দেবার আমন্ত্রণ।

তবে হ্যাঁ। জগতের যজ্ঞভূমিতে যার একবার ডাক এসে যায়, সংসার সুখের পঙ্‌ক্তিভোজে তার কিন্তু আর নিমন্ত্রণ থাকে না। সে তখন আলাদা প্রাণী। যদিও গায়ে নেই কোনো লেবেল আঁটা তবুও কেমন করে যেন সবাই বুঝে যায়। ওর জামার নিচে ডানা আছে। ও ভিন্ন প্রাণী।

তুমি নিজে যদি মনে কর তুমি মুক্তপ্রাণী তোমাকে বদ্ধ প্রাণী করতে পারে হেন সাধ্য কারুর নেই। জ্ঞান হয়ে ইস্তক বাড়িতে শুনে আসছি খুকুটা বড় জংলী। বড্ড অসভ্য। কেমন ন্যাপাটে। এতদিনে টের পেয়েছি জংলী হওয়াটা কিছু অন্যায় নয়। সবাই কি আর সভ্য হতে পারে ? সবাই তো আর গৃহপালিত জীব হয় না, কেউ কেউ বন্যপ্রাণী। তাদের বন চাই। আমি বুনো, তো বুনোই

তোমার বনটা কোথায় ? এই তো বুকের ভেতরে। কিন্তু অভয়ারণ্য। ও যিনি আগলে রাখার তিনি ঠিকই আগলে রাখেন।

ভ্রমণ মানে কি পালানো ?

না ভ্রমণ মানে ফিরে আসা ?

আমার কাছে ভ্রমণ মানেই ঘরবসত। শেকড় খোঁজা। ভ্রমণ চলে যাওয়া নয়, ফিরে আসা। প্রতিদিন প্রতিদিন এই যে চলে যাওয়া, এই যে হারিয়ে যাওয়া ফুরিয়ে যাওয়া, প্রতিদিনকার এই খরচ হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে একটু বাঁচানো। জমার ঘরে একটুখানি তোলা। দু' চামচে আমি।

ভ্রমণ মানে নিজের সঙ্গে দেখা। নিজের হাতটি ধরে নিজের মুখোমুখি বসা।

কি নবনীতা, কেমন আছো ? দিন কাটছে কেমন ?

সুখেও নয়। দুঃখেও নয়। তবে হ্যাঁ যেমন কথা ছিলো, তেমনটি কাটছে না।

কেমন কথা ছিল ?

কি জানি। কে জানে ? তবে এমন ধারা নয়। দিন যাচ্ছে। দিন যায়।

বিষাদে ?

বিষাদ বড় বিপুল শব্দ। বিষাদ হলেও তো ভালোই ছিলো। তুচ্ছতায়। তুচ্ছতায় দিন কেটে যায়। কী অবহেলায় সূর্য ওঠে। কখন যেন ডুবে যায়।

"নিজেই নিজের কাঁধে হাত রাখি, বলি : চিয়ার আপ ওল্ড গার্ল ! বুঝি কালান্তরে যাবে ? ছাড়পত্র চাই ?"

অথচ এমন কথা ছিলো না, ছিলো না। নেমন্তন্ন চিঠি তো পেয়েছিলুম।

কিন্তু ভোজ ঠিক জমলো না। ভুল ঠিকানায় পৌঁছেছি কি ? ভুল পঙ্‌ক্তিতে বসে পড়েছি কি ? নাকি আমিই ভুল মানুষটা ?

কি জানি। কে জানে ? পায়ে যেন বেড়ি। গলায় যেন ফাঁস। কেবল ইচ্ছে করে বেরিয়ে পড়ি। দৌড়ে চলে যাই। একটু ছুটে বেড়াই। ছোটবেলায় পড়তে পড়তে আমার ইচ্ছে করতো একটু স্কিপিং করে নেবার। বারান্দায় গিয়ে একটু লাফিয়ে আসতুম। কে জানতো এখনও সেই ইচ্ছেটা এমন করে থেকে যাবে বুকের মধ্যে ? কে জানতো।

BanglaBook.org

মধ্যদিনের রোদে যে বুকের ভেতরটায় এমনি দারুণ খরা লাগবে, কে জানতো, জ্বলে যাবে মাঠ কে মাঠ! সাধের বীজ ধানও পুড়ে লাল। ভ্রমণ অঙ্গার বৃষ্টি।

কিছুদিন না বেরুতে পারলে আমার মনে হয় গাছপাথর হয়ে যাচ্ছি। তুমি জানতেও পারবে না, চলমান জগৎ কখন তোমাকে চিঁড়েচ্যাপ্টা করে রেখে যাবে। তুমি খাচ্ছ দাচ্ছ চাকরি করছ ভাবছ বুঝি দিব্যি বেঁচে আছ। কিন্তু যারা তোমার কাছাকাছি আসবে, তারা মরা মানুষের বাসি গন্ধ পাবে। ঘুরে যে বেড়ায় তার গা থেকে তাজা ঘাসের মত টাটকা জীবনের সুরভি বেরোয়। ভ্রমণ জীবনের লবণ, অমর লাবণি।

মানুষ না হয়ে সাপ হলুম না কেন যে? বছর বছর দিব্যি খোলস পালটানো যেত। এ খোলসটা আর যে সহ্য হচ্ছে না! কিন্তু ছাড়ি কেমন করে? প্রতিটি ভ্রমণে একটু করে খোলস ছাড়ার চেষ্টা। একটু মুছে যাওয়া, একটু ফিরে হওয়া। কিছু রিক্তকর্ম। একটা নবজন্মের প্রয়াস। এক একটি মৃত্যুর পরিবর্ত।

ভ্রম ধাতুর একটি অর্থ, জরায়ুর মধ্যেনবীন প্রাণের স্পন্দন, জেগে ওঠা। সেই মানেটাই আমার সবচেয়ে যথাযথ মনে হয়। আর ভ্রম ধাতু থেকেই বিভ্রম—সেটাও অভ্রান্ত। আমার কাছে ভ্রমণ একটা যৌগ—কিছুটা ভ্রম, বাদবাকিটুকু রমণ। দুইয়ে মিলে আমার ভ্রমণ।

সাধে কি সাহেবদের জন্যে এত মায়া হয়? ওরা তো ভ্রমণ করে না, আহা, করে ট্র্যাভেল। আর ট্র্যাভেল করে মরবে কেন, হাতের কাছে এমন ভ্রমণ থাকতে? ট্র্যাভেল আর ট্র্যাভেইল একই শব্দ, উৎপত্তি ত্রাভাই থেকে—অর্থাৎ পরিশ্রম। ওরা ভ্রমণের মধ্যে দেখেছে খাটাখাটুনি, শ্রমণীয় দিকটা আর আমরা রমণীয় আর শ্রমণীয়টুকু। আরে, আজ না হয় সাহেবরা এত চোরাগুরি শিখেছে, আগে কি তাই ছিল?

গুরুদেব সক্রেটিস বলে যাননি কি, "একটা পাহাড় দেখা, একটা নদী, এক সমুদ্র—সেই যথেষ্ট?" ছি, গুরুদেব, ছিঃ। এটা জ্ঞানীর যোগ্য উপদেশ হোলো?

আর প্লেটোকেও বলিহারি যাই। তিনি বিধান দিয়ে গেছেন চল্লিশের নিচে কাউকে দেশের বাইরে পদার্পণ করতে দেওয়া উচিত নয়। এই সেদিনও আডাম স্মিথ সাহেব পর্যন্ত বলেছেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভ্রমণ মানুষকে নষ্ট করে ফেলে। তাকে বেপরোয়া, অহংকারী, উড়নচণ্ডে আর দারিদ্রহীন করে দেয়। স্বভূমে থাকলে যা ঘটতো না। কথাগুলো অবিশ্যি মিথ্যে নয়। খুব সত্যি। হাড়ে মজ্জায় খাঁটি। আমিই তার জ্যান্ত প্রমাণ। সাধে আর কালাপানি পার হতে বারণ করতেন পণ্ডিতেরা? ভ্রমণে হাত-পাগুলো লম্বা হয়ে যায়, বুকের ছাতিটা চওড়া। প্লেটো যে চল্লিশের পরে বেরুতে অনুমতি দিয়েছিলেন, সে কি আর না বুঝে? তখন মানুষ বাড়তির দিকে নয়, কমতির দিকে যায়। তখন মানুষ ছোট ছোট অভ্যেসের দাস। ছোট ছোট লাভ লোকসানের, আরাম-অসুখের দাস। দাস আর পালাবে কোথায়? যাক না।

কিন্তু চল্লিশের আগেই যার পা লম্বা হয়েছে, সে চল্লিশে পা দেয়ই না—তার পা আর বয়েসের গণ্ডিতে ধরাই দেয় না। যেমন আমার বাবা। আমার বিশ্বাস হয় না কবার কোনোদিন চল্লিশ হয়েছিল।

তাহলে কি আমরা পারতুম অমন পরমাশ্চর্য শুভক্ষণে বিলেত রওনা হতে? এ বিষয়ে সম্ভবত আমরা বাঙালির ইতিহাসে ঠাঁই পাবার যোগ্য। বিলেত যাওয়া ঠিক। বম্বেতে জাহাজ ধরব। ট্রেন বুকিং, হোটেল রিজার্ভেশন কমপ্লিট। এমন সময়ে শুভার্থীরা আছড়ে পড়লেন—সর্বনাশ হয়েছে। মঘা, অশ্লেষা, ত্রাহস্পর্শ যোগ, প্লাস বেস্পতিবারের বারবেলা এতগুলো একসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন, যে কোনো একটাতেই যাত্রা নাস্তি। বাবা থামবেন তাতে? বললেন—"আগে বরং বম্বে মেলটা থামাও। সবাই একসঙ্গে পরের ট্রেনে যাবো।" অতএব লগ্ন দেখেশুনে, মঘা, অশ্লেষা, ত্রাহস্পর্শ, বারবেলা, যাত্রা নাস্তির শুভমুহূর্তে বাবা সপরিবারে সাতসমুদ্দুর পারে রওনা হলেন। গলায় গেঁড়ের

BanglaBook.org

মালা পরে হাসতে হাসতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন—"তোমরা বাবু একটু সাবধানে বাড়ি যেও, দিনক্ষণ নাকি সুবিধের নয়।"

আজকাল যারা বিলেতে-আমেরিকায় যায়, তারা শুধু বিলেতেই যায়, সমুদ্রযাত্রা তাদের কপালে জোটে না। সে যেতুম বটে আমরা। যাচ্ছি তো যাচ্ছি, যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, পথ আর ফুরোয় না। একুশ দিন একুশ রাত্রি পায়ের তলায় ঢেউয়ের দোলা, হাঁটুর ছন্দই পল্টে যায় মানুষের, স্থলচর মস্তিষ্কের মধ্যে অন্য এক তরল গতির ধারণা ছলকে উঠতে থাকে। নোনা বাতাসে জীবনের স্বাদ গন্ধ আলাদা হয়ে যায়। আর চারিপাশে ওই নিঃসীম বিস্তার। কি আকাশ, কি সমুদ্র, চরাচরব্যাপ্ত বিশালতা, নীলিম অবকাশ, নিস্তরঙ্গ মধ্য সমুদ্রের শব্দহীন গাম্ভীর্য, বন্দরের জন্যে উতল অপেক্ষা, দূরে অন্য জাহাজ দেখা দেবার রোমাঞ্চ—উড়োজাহাজীদের এসব শোভা জানাই হয় না। আকাশপথে দৃশ্য বলতে কী আছে? ওই পঞ্চভূত। দূর থেকে বিস্ফারিত নয়নে ক্ষিতি-অপ্‌কে নিরীক্ষণ করা, আর কাছ থেকে নিবিড় নীলিমাকে অর্থাৎ তেজ-মরুৎ-ব্যোমকে দেখা। সেই বা কতক্ষণ? বর্ধমান যাচ্ছি না বিলেত যাচ্ছি বুঝতে পারার আগেই পা মাটিতে ঠেকে যায়।

আমি অনেক সমুদ্রের জল পেরিয়েছি। প্রথম বিলেত যাবার সময় জাহাজে যে সুইমিং পুল ছিল, তাতে স্নানের সময়ে বাবা বলে দিতেন, "এই জলটা কিন্তু আরব সাগরের"—"আজকের জলটা লোহিত সাগরের"—"এটা ভূমধ্যসাগরের জল"—সে যে কী পরম রোমাঞ্চ, আমি বলতে পারবে না। আর সেই বেলা এগারোটায় গোলাপী আইসক্রীম? জাহাজে ছোটদের খুব আইসক্রিম খাবার সুখ। জাহাজে সবাই ছুটিতে থাকে। জাহাজের আবহাওয়াতেই আমেজ আর স্বস্তি। প্রথমবার অতলান্তিক পার হই কুইন এলিজাবেথ টু-তে। এরোপ্লেন মানেই ভীষণ তাড়া। সুখ নেই।

যে লোকটা চাকরি করতে যায় আর যে লোকটা বেড়াতে যায় দুটো কিন্তু এক মানুষ নয় একজন খাঁচার পাখি, অন্যজন উড়াল জানে। একজন অন্যজনকে হিংসে করে।

—রঞ্জন বলে, বেড়াতে বেরুলেই দিদি অন্য লোক।

—মেয়েরা বলে, কলকাতায় ফিরেও তুমি অমনি থাকো না কেন মা?

—মা বলেন, কলকাতা ঘুকুর সয় না।

—দীপঙ্কর বলে, কলকাতায় দিদির মিনিমাম থাকা উচিত।

—আমি বলি, কলকাতায় তো আমি থাকিই না কলকাতায় যে থাকে, সে তো অন্য লোক। এই শহরটাও আমার সেই চেনা শহরটা নয়, এই মেয়েটাও আমার চেনা মেয়েটা নয়। এই অজানা শহরে ওই অজানা অদ্ভুত মেয়েটা বাঁচল কি মরল তাতে আমার কি। কী ভয়াবহ ওর জীবন। নিঃসময়, সঙ্গীহীন, সদাব্যস্ত, নিজেকে নিয়ে তিতিবিরক্ত, —ওই মেয়েটা কে? পান থেকে চুন খসলেই যার সর্বনাশ হয়? দিনরাত রুগ্ন?

কেন যে ওই মেয়েটাকে লোকে বকে ভাবে। আমার তো কোনো বিঘ্নই বিঘ্ন মনে হয় না, কোনো ক্রিয়াই অভ্রান্ত বলে আশা হয় না, সব পাঁচিলই ডিঙোনো যায়, সব ভুলই শুধরোনো সম্ভব, কোনো যুদ্ধই যুদ্ধ নয়, খেলা। ট্রেন মিস হল? হল তো হল? নেক্সট ট্রেন। একটা না একটা গাড়ি একদিন না একদিন আসবেই। তাড়া কিসের?

কিন্তু এটা তো ঠিক, সংসারের সঙ্গে লাগামবাঁধা আমি-টার মনে হয় না। তার সব কিছুরই মরণ-বাঁচন সংগ্রাম মন্থের সাধন নতুবা শরীর পাতন। শরীর পাতনটাই হয়, মন্থ অসাধিত থেকে যায়।

সংসারের দড়িদড়া ছিঁড়ে, কলকাতার আস্তাবল থেকে বেরুতে পারলেই সব সবুজ, সব শান্ত। কেবলই ইচ্ছে করে বেরিয়ে পড়ি, চলে যাই। কিন্তু কোথায়? কখন? ছুটি দেবে কে? ঘর আগলাবে কে? কে? কে? কে? কে?

আজকাল আমার প্রায়ই মধুপুরের কথা মনে হয়। মধুপুরে আমাদের ছোট্টো সাদা বাড়িটার

BanglaBook.org

সামনে একটা বিশাল সবুজ মাঠ ছিলো তার এপারে একটা লাল মাটির পথ, আর ওপারে আরো বড় নীল আকাশ। ওই মাঠটাই, আমি জেনে নিয়েছিলুম, আসলে তেপান্তর। উত্তরদিকে কয়েকটা কালোপাথরের মস্ত মস্ত চাঁই এলোপাথাড়ি বসানো, বেঁটে খাটো পাহাড়। একবার চড়তে পারলেই ব্যাস, ফুরিয়ে গেল। না আছে গুহা, না জঙ্গল। মাঠের দক্ষিণে একটা ছোট্টো, রোগা বুব সুন্দরী, বালিতিরতিরে নদী। নদীর ওপারে ছড়ানো ধানক্ষেত, এপারে কুমোরপাড়া। চাক্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওরা সাজি ভরে ছোটদের বাসনবাড়ির খেলনাতে। সেই কুমোরের চাকে চোখ রেখেই আমার দিনের চাকা ঘুরে যেতো, সন্ধে আর শীত নেমে আসতো রোগা নদীতে খুদে রুপোলি মাছেদের গায়ে রাঙা সোনা গলিয়ে। সোয়েটারের ওপর কোট চড়াতে বাড়ি ছুটতুম। পিছু পিছু ছুটতো লিলি। ইঁদারার ইঁটের গাদার কোণে চরটে কুকুরছানা হয়েছিল। মা টা কোথায় চলে গেল কে জানে? থেকে গেল কেবল লিলি। ছুটি ফুরোলে আমরা মধুপুর ছেড়ে, লিলিকে ছেড়ে, চলে এলুম ইস্কুলের রাজ্যে, কলকাতায়। সেই ধানক্ষেত আর পাহাড় নিয়ে খেলা মাঠটা, ইঁদারা আর গোলাপফুল নিয়ে সাদা বাড়িটা, রুপুলি মাছ আর সোনালি সূর্যাস্ত নিয়ে ঝিরঝিরি নদীটা পিছনে পড়ে রইলো। কিন্তু পিছনে পড়ে রইল কি? এই তো আজও, এত বছর পরেও বুকের মধ্যে সেই মাঠে স্মৃতির বাতাস শন্‌শন্? সেই কুমোরবাড়ির চাক ঘুরছে বনবন? দু'হাতের মধ্যে টকাটক উঠে আসছে নিটোল স্মৃতির ভাণ্ড, লিলি কচি গলায় ভৌ ভৌ করে ছুটে ছুটে আসছে এক্কা গাড়ির পেছু পেছু—যতক্ষণ না মালীর ছেলেটি এসে ওকে কোলে তুলে নিচ্ছে। ঐ ছেলে আমার স্কুলের সাথী; ওর সঙ্গেই আমি পাহাড়ে উঠি, পেয়ারা পাড়ি। এই তো আমি ইঁদারার পাশে গামছা পরে গুটি গুটি বসে আছি আর বুড়ি বালতি করে জল তুলে ও আমার মাথায় ঢেলে দিচ্ছে, শীতের ভয়ে আমার যতই কাঁপুনি ওর ততই হাসি—ওর হাতে সব সময় একটা ছপটি থাকে, তাই দিয়ে পেড়ে দেয় বুনো কুল, উঁচু ডালের পেয়ারা। কিন্তু ওর নাম কী? গলায় মাদুলি বাঁধা, রুক্ষু চুল ঐ ছেলেটার নাম কি? এই ছেলে, তোর নাম কী রে?

রেলগাড়ির ঝাঁকুনিতে, এক্কা গাড়ির ধুলোয় ইস্টিশানের হাঁকডাকে আমার মনের তার বাঁধা। শরীরেও। ট্রেনের মধ্যে ঘুম ভাঙিয়ে মা বকুনি দিচ্ছেন—

—"খুকুরে, ওই ওই ঐ দ্যাখ হল্‌দিঘাট দিয়ে যাচ্ছি আমরা—"

—"হলদিঘাট? পানিপথের যুদ্ধ?"

—"স্যাঁ হাঁ, রাণাপ্রতাপ রে!"

মার সেই উত্তেজনা আমার চেয়ে একটুও কম ছিল না। কিংবা, গুম গুম শব্দে গভীর রাতে ট্রেনের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল, বাবা খুশি হয়ে বললেন, "উঠে পড়িচিস? ঐ দ্যাখ্ কত বড় নদী? গোদাবরী।" সবগুলো নদী দেখিয়েছিলেন বাবা—কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা—সেবার অনেক ঘুরেছিলুম দক্ষিণ ভারতে। মহাবলীপুরম্ যা দেখেছিলুম, পরে গিয়ে দেখেছি তার অনেকখানি জলে ডুবে গেছে। কিন্তু রাত দুটোর গোদাবরী ব্রিজ বুকের মধ্যে এখনও প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে। মাঝরাতের লণ্ঠনের আলোয় গাছের তলায় হাওয়াই দ্বীপের সুন্দরীদের ঘাসের ঘাগরা পরে আলোহা নৃত্য দেখে, কিংবা হঠাৎ বাঁক ঘুরেই বরফ ঘেরা ফুজিয়ামা পাহাড়ের চূড়ো দেখতে পেয়েও সেই আশ্চর্যের তুলনা পাইনি। তবে হাঁ, ছেলেবেলায় নালন্দা দেখে যে উত্তেজনা হয়েছিল, বড় হয়ে ক্রীট দ্বীপে গিয়ে ল্যাবিরিন্থ দেখে প্রায় তেমনিই ছেলেমানুষী রোমহর্ষণ হয়েছিল আমার। তবে এত সত্যি; আথেন্স দেখে অতটা উত্তেজিত লাগেনি, ডেলফাইয়ের সূর্যমন্দির দেখে যেমন। অপরূপ গ্রীস! তখন ন'মাসের শিশু পেটে, ঈজিয়ান সমুদ্রে খুব সাঁতার কেটেছি মনের সুখে, দেড়শ মাইল বাসে পাহাড় ডিঙিয়ে ডেলফাই গেছি, জাহাজে চড়ে গ্রীসের দ্বীপে ঘুরেছি। পরে ডাক্তার বলেছেন—কী সর্বনাশ! ভগবানই শিশুটাকে বাঁচিয়েছেন! কী কাণ্ড!

BanglaBook.org

বাবা-মার সঙ্গে, সাত আট বছর বয়েসে, সদ্য 'রাজকাহিনী' পড়বার পরেই গেছি রাজপুতনা বেড়াতে। অবাক চোখে হাঁ করে গিলেছি মেবারের দৃশ্য, সেই গল্পে পড়া চিতোরগড়, উদয়সিংহের ধাত্রীপান্নার সেই পান্নামহল। রানী পদ্মিনীর জহরব্রতের কুয়োটি দেখে কেঁদে ফেলেছি, মীরাবাঈ আর রানাকুম্ভের বিয়ের সভাঘর দেখে মুগ্ধ হয়েছি, আর চিতোরেশ্বরীর সেই "ম্যায় ভুখা হুঁ" স্বপ্ন দেওয়া মাকালীর মন্দির দেখে সারা গায়ে কাঁটা দিয়েছে। ভাগ্যিস ওই বয়সে দেখেছিলুম? তখন না দেখে, আজ যদি যেতুম ওসব জায়গায়, পেতুম সেই অসীম বিস্ময় আর অগাধ আহ্লাদ? বোধহয় না। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখে যেরকম অভিভূত হয়েছিল সেই আট বছরের মেয়েটি, পরে অষ্টত্রিংশে বিক্রমশিলার অবশেষ দেখে তার অণুমাত্রও সে ফেরৎ পায়নি। কেন পেলুম না? ত্রিবিশ বছরের পাঁচিল? না সঙ্গীবিভ্রাট? ভ্রমণের পক্ষে সঙ্গটা খুব জরুরি।

হয় একলা বেড়াবো। নইলে সঠিক সঙ্গী চাই। সঙ্গী গড়বড় হয়ে গেলে সবই বৃথা ভ্রমণ। বিভ্রমণ। সঙ্গ এবং সময় দুটোই জরুরি। কার সঙ্গে, এবং কখন।

সেই ছেলেবেলায় নোতরদাম গির্জের ঘণ্টাঘর দেখে সেই যে মনে হয়েছিল—"এইখানে কোয়াসিমোদো—সেই হাঙ্চব্যাক ছিল?" পরে হাজারবার নোত্রদামে গিয়েছি, তার কথা মনে পড়েনি। লোটাস উইনডোর শিল্প-সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। সেই রোমাঞ্চ আর পাইনি।

তবে বারো বছর বয়েসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চার্চিল আর অ্যাটলিসাহেবকে দেখেছি ভেবে আজ যতটা তীব্র রোমাঞ্চিত হই, যেদিন দেখি সেদিন তা ঘটেনি। বরং বাবা-মার ওপরে দারুণ রাগ হচ্ছিল. কী দরকার ছিল আমাকে শাড়ি পরিয়ে বড়মেয়ে সাজিয়ে ভিতরে ঢোকানোর? বোরিং যত সভা চলছে রাজনীতির। চুরুট মুখে, মোটা চার্চিলকে (অনেক ছবি দেখেছি) চিনতে পেরেছিলাম সহজেই, ঐ যা এক মিনিটের জয়ের সুখ। অ্যাটলিকে চিনতে পারিনি, বাবা দেখিয়ে দিলেন। "খিদে পেয়েছে", "জল খাব", "বাথরুমে যাব" ইত্যাদি বহুৎ বলে বলে তবেই সেখান থেকে বের করতে পেরেছিলুম বাবা-মাকে

তেমনিই বিরক্ত লেগেছিল একটা দীর্ঘ শবযাত্রার পেছু পেছু যেতে। গোলডার্স গ্রীন কবরখানায় গিয়ে সেই শবাধারে বাবা-মা আবার মালা দিলেন। যিনি মারা গেলেন পরের সপ্তাহেই বাবার সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বুড়োর নাম বার্নার্ড শ'।

ভ্রমণ আমরা জীবনে বারে বারে নানাভাবে এসেছে, নানান নবনীতাকে উদ্‌ঘাটিত করেছে আমার ভিতরে। তবে বাল্যে, কৈশোরে, বাবা-মায়ের সঙ্গে সেই যে বেড়িয়েছি, পরে অমর্ত্যর সঙ্গেও প্রচুর ঘুরেছি কিন্তু দুটো আনন্দের জাত আলাদা। অমর্ত্যর সঙ্গে ঘোরার মধ্যে কোথায় যাচ্ছি তার চেয়েও আমরা দুজনে কোথাও যাচ্ছি, এটাই বেশি আনন্দের ছিল। উনি খুব ব্যস্ত মানুষ, সময় করে বেড়াতে বেরুতে পেরেছেন এটাই মস্ত ব্যাপার। বাবা-মাকে তো আলোবাতাসের মত নিঃসপত্ন অধিকারে পেয়েছি, তাঁদের সঙ্গে গেলে দ্রষ্টব্য স্থানটিতেই তাই মনোযোগ পড়েছে বেশি। অমর্ত্যর ট্যুরিস্ট স্বভাব নয়। ফোটো তোলা, ঐতিহাসিক স্থল দেখা—এসব একদম পছন্দ হতো না। ওঁর উদ্দেশ্য রিল্যাক্স করা। ছুটি উপভোগ। আমার আবার বাঙালের মত আদেখলে স্বভাব। গির্জে, মিউজিয়াম, প্যালেস এসবেও লোভ।

বোধহয় ছেলেবেলায় বাবা-মার সঙ্গে অতো ঘুরে বেড়িয়েই এই বেড়ানোর নেশাটা রক্তে ঢুকে গেছে। বাল্যের নিত্য নতুন বিস্ময়ের তুলনা নেই—সেই ইঁদুরছানার আলমারির কোণটি দেখেই—"ওরে বাবা পৃথিবীটা এত বড় নাকি"—বলার মত অবস্থা হত। র‍্যাজগীরে জরাসন্ধের পাহাড় দেখে যেমন লেগেছিল। তারপর তো দেখলুম লোহিত্যসাগরের জল মধ্যসমুদ্রে সত্যিই বেশ নালচে, দেখলুম সুয়েজখালের হাল্কা সবুজ জলের তলা থেকে মিশরীয় ছেলেরা কেমন ডুব দিয়ে পয়সা কুড়োচ্ছে, গঙ্গানদীতে ঝাঁপানো বাঙালি ছেলেদেরই মতন, ভূমধ্যসাগরের নীল জল, চির বিক্ষুব্ধ বে অব বিস্কে, সব পেরিয়ে শেষে যখন টিলবেরি ডকে পৌঁছে টেম্‌সের

BanglaBook.org

বুকে এসে থামলুম, তখনও কি বিশ্বাস হতে চায় এটাই বিলেত? কী হতশ্রীই হয়েছিলুম টেমস নদী দেখে। এই? তবে লণ্ডন ব্রিজটা মন্দ লাগেনি, তবু ভাল! বিলেতের ছবির মতই দেখতে। সহজে বিশ্বাস কি হতে চায়?

যেমন জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছকে উড়তে দেখেছি। এখানে জল ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, একটুক্ষণ বাতাস কেটে, ফের ওখানে ঝাঁপিয়ে জলে পড়ছে স্বচক্ষে দেখার আগে বইতে যখন পড়েছি উড়ুক্কু মাছের কথা, ঠিক বিশ্বাস করিনি, মাছ আবার ওড়ে। হুঁঃ।

তেমনি বইতে যতই পড়ি না কেন, সত্যি যে চোখে কোনদিন নিশীথরাতের সূর্য দেখতে পাবো, তা কি ভেবেছি? সূর্য ড্যাবড্যাব করে চেয়েই রইলেন, পাটে নামার নামটি নেই। ঘড়িতে সন্ধে পেরিয়ে মাঝরাত্তির হয়ে গেল, সূর্য আর ডোবে না। ঘুমবো কী করে? রাতই হচ্ছে না তো। শেষে বারোটা নাগাদ একটু সন্ধে সন্ধে মতন। গোধূলির মতন আলো হতেই মা মোটা মোটা পরদা টেনে কম্বল চাপা দিয়ে শুইয়ে দিলেন। শুয়েছি কি শুইনি ঘুমিয়েছি কি ঘুমুইনি বাবা চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, লেপকম্বল টেনে ফেলে দিচ্ছেন গা থেকে—"আপ্! আপ্! গেট আপ! পশা! পশা!" লাফিয়ে উঠে ঘুমঘুম চোখে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলুম কশ্যপমুনির বংশধর রাত না পড়তেই দিবা করতে আসছেন। আকাশ জবাফুল হয়ে নমস্কার করছে। বাবা বললেন—"ঘড়িটা দ্যাখ্ খুকু ঘড়িটা দ্যাখ"—ডবলশীটের কাচের পিছনে তখন উচ্ছৃঙ্খল কর্তার ভোররাতে বাড়ি ফেরার মতো অসময়ে টলতে টলতে সূর্যাদেব উদয় হচ্ছেন। কব্জিতে রাত দুটো! যা নয় তাই? রাতবিরেতে এ কী অসৈরণ বল দেখি? টাইগার হিলে যেটা ভোর চারটেয় ঘটে, ইওরোপের উত্তরতম প্রান্তের রেলস্টেশনে এসে, ওসলো থেকে নারভিক, নারভিক থেকে ট্রোমসো উজিয়ে গিয়ে, সেই ঘটনাটি মাত্র ঘণ্টা দুই এগিয়ে দেওয়া। এই বই তো নয়? তার জন্যে এত হা-পিত্যেশ, এমন দৌড়োদৌড়ি—আরে ওই দুটো ঘণ্টাই যে মোক্ষম দু' ঘণ্টা, যা রাতকে দিন আর দিনকে রাত করে ফেলেছে!

আর ফিয়োর্ড দিয়ে যেতে যেতে মেরুসমুদ্রে আইসবার্গ দেখা? ওঃ কী সুন্দর। নীলচে-সবজে বরফের বিশাল চাঁই সবুজ জলে ভাসছে, বাবা বললেন—"বিশাল আর দেখছিস কি, বেশির ভাগটাই তো জলের তলায় ডুবে।" জাহাজ একবার একটির সঙ্গে ধাক্কা খেলেই ব্যাস আমরাও টুপটাপ অক্কা পাব।

আর জাহাজও তেমনি, মায়ের লক্ষ্মী ছেলেটি হয়ে হাত ধরে ফুটপাত দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে, সাবধানে। পাড় কীরকম? যতদূর দেখা যায় শাদা বরফে ঢাকা জমিতে উঁচু উঁচু ঝাউগাছ। ঝাউগাছই ছিল তো? কি জানি ভূর্জও হতে পারে।

—"আচ্ছা মা, এটাই কি উত্তর মেরু?"

—"ঠিক উত্তর মেরু না হলেও, মেরু-অঞ্চল তো বটে।"

কলকাতার ইস্কুলের মেয়ের পক্ষে হঠাৎ এই আবহওয়ায় গিয়ে পড়া ঠিক রূপকথার মতো মনে হয়েছিল।

আর যে নরউইজীয় শিশুগুলির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, একটি ভারতীয় ছোট মেয়েকে পেয়ে ওদেরও মনে হচ্ছিল বুঝি রূপকথার গল্পে ঢুকে পড়েছে। মার শাড়ি নিয়ে ওদের কী কৌতূহল! আমাদের গায়ের রং নিয়ে ওদের কী উল্লাস!

শিশুরা তখন ইস্কুলে ইংরিজি পড়ত, গল্প করতে অসুবিধা ছিল না। এখন নিশ্চয় ভারতীয় দেখে দেখে তাদের চোখ ক্লান্ত।

ইউরোপে আমি তিন জীবনে তিনরকমের ভ্রমণ করলুম। অমর্ত্যের সঙ্গে বেড়াতে যেতুম গাড়িতে। কখনো দক্ষিণ ফ্রান্স, রিভিয়েরা, কখনো ইতালী, কখনো জার্মানী, অস্ট্রিয়া। আর বারবার শুধুই প্যারিস। বেশ ক'দিন ধরে কোলোন থেকে মেইনজ্ পর্যন্ত রাইনভ্যালি দিয়ে ঘুরেছি,

BanglaBook.org

রাইন নদীতে দুর্গের পর দুর্গ দেখতে দেখতে নৌকো বিহারও করেছি দীর্ঘ দীর্ঘ, ঘুরেছি রূপসী মোজেল নদীর ভ্যালিতেও। আঙুর ক্ষেতের দ্রাক্ষা রসের রাজ্যে। কখনো সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদে-পর্বতে। আরেকরকম ঘোরা এখন ঘুরি। নিজে নিজে জরুরি কাজের সুযোগে ফাঁক পেয়ে একটু ঘুরে নেওয়া। বাবা-মার সঙ্গে ঘুরতুম রেলগাড়িতে। স্বামীর সঙ্গে মোটরে। এখন বাঁধা হয়ে উড়োজাহাজে। সময় ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। আর বদলে গেছে ভ্রমণের উদ্দেশ্য, আর আমার পরিচয়। কুমারীকালে দ্রষ্টব্যস্থলটা প্রধান ছিল, বিবাহিত জীবনে ছিল ছুটিটাই প্রধান, এখন কাজটা প্রধান বেড়ানোটা উপরি। স্বদেশে অবশ্য বেড়ানোটাই হয় প্রধান, আর কাজটা উপলক্ষ্য। বিদেশে তা নয়। একলা ঘোরার নেশা আছে। এই আমিটা এখন ভেতরে ভেতরে বড় লক্ষ্মীছাড়া, বড় দিশাহারা। ঘরসংসার আমাকে আর টানে না, সংসারকে বড় কঠিন মনিব বলে মনে হয়। কয়েদখানা। চরকে চরকে পাপোষ তৈরি করিয়ে নেয়। সংসার মানেই হাজতবাস। মুক্ত কেবল সাধু সন্ন্যাসির। যাদের বাঁধা ঠিকানা নেই। পূর্বস্মৃতি নেই। বহতা নদী, বমতা সাধু।

ভ্রমণ মানে জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য। চৈতন্যের মধ্যে সূর্যোদয়। ভ্রমণের মধ্য দিয়ে সুতো ছুটিয়ে আনি আমি। গোড়ার কাছে ফিরি। অমন ভ্রমণ চট্ করে হয় না। কখনো কখনো ঘটে যায়। যেমন হয়েছিল গতবছর পুজোর সময়ে। হরিদ্বারে। হৃষীকেশে।

অথচ এ বছর? গ্রীষ্মে? বহুত ঘুরেছি। প্রথম আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণ, প্রচুর অবিশ্বাস্য স্থান এবং মনুষ্য আবিষ্কার (যেমন চিনুয়া আচিবি, হোর্হে লুইস বোরহেস এবং অ্যান্টনি বার্জেসের সঙ্গে আলাপ)। এই প্রথম বার রাশিয়া দর্শন, আবার আমেরিকা, আবার স্কান্ডিনেভিয়া, আরো বিশিষ্ট মনুষ্য আবিষ্কার (যেমন কার্লোস ফুয়েনতেস), একটানা চৌত্রিশ ঘণ্টা ধরে আকাশে উড়েছি, লম্বা চওড়া ব্যাপার—কিন্তু গতবছর পুজোর ছুটির মতনটি আর হবে না। আকাশে সেই আলোই দেখা দেবে না আর।

হৃষীকেশ।

আ, হৃষীকেশ। আমার হৃদয়ের মধ্যে স্থিত থাকো।

আ মরি, গঙ্গা! আমার রক্তস্রোতে প্রবাহিত থাকো।

আর, হিমালয়। তুমি থাকো আমার বিশ্বাসের গভীরে, অবিচল।

আবার বুকের ভেতরে যে কান আছে সেখানে বাজুক ব্রাহ্মমুহূর্তের সেই অশ্রুতপূর্ব দৈব নৈঃশব্দ্য। সেই প্রশান্তি।

সাধু নই, কিন্তু সংসারও আমাকে গ্রহণ করেনি। আমার মুক্তি তারায় তারায়। সত্যিসত্যিই ভবঘুরে মেয়ে, যত্র তত্র ভোজনে আমার একটুও অসুবিধে নেই, এবং হট্টমন্দিরে শয়নেও না। অথচ উড়নচণ্ডী এদেরই বলে। এবং ত্রিভুবনে উড়নচণ্ডী মেয়েদের কেউ ভালোবাসে না। তাদের নিয়ে কেউ কবিতা লেখে না, তাদের চোখ যে পাখির নীড়ের মতো হয় না, পাখির উড়ন্ত ডানার মতো হয়। সব পথ যেখানে এসে ফুরোয়, সেইখানে অপেক্ষায় থাকার কথা যে নারীর, এ মেয়ে সেই মেয়ে নয়। হাজার বছর ধরে যে পুরুষ পথ হাঁটেন, তিনি তো নারীকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটেন না, নারীরই কাছে এসে থামেন। দু' দণ্ডের শান্তিজল আছে যার অঞ্জলায়। শরৎচন্দ্রের তালপাতার পাখা আর গরম লুচিতে, বুদ্ধদেবের আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে, ওই একই প্রতীক্ষার বাণী, আতিথ্যের বাণী, "এতদিন কোথায় ছিলেন?" কিন্তু মেয়েদেরও যে দীর্ঘ পথ হাঁটতে হয়, মেয়েদেরও যে ক্লান্তি নামে, দু'দণ্ডের শান্তির তেষ্টা পায়—সে কথাটি কেউই খেয়াল করে না। ভ্রমণ আমার একক পথচলায় সেই শান্তি। নিজেই নিজের কাছে ভেসে উঠি একটা চরের মতন। যেখানে আশ্রয় নেওয়া যাবে। সত্যি ছুটি কি আমাদের আছে? সে মেলে কেবল সন্ন্যাসে। ঘড়ি-পরা মিটিং-করা সন্ন্যাসে নয়, অন্য এক ঘড়িহীন অনন্ত সময়ের চেতনায়। মঠে মন্দিরে, নয়, হয়তো অরণ্যে পর্বতে। আমার তো ভরতমুনির দশা হয়েছে। এই মায়ের গেরো না খুলতে

BanglaBook.org

পারলে মুক্তি নেই। আপাতত এই ভ্রমণই একমাত্র মুক্তি। আমার ভ্রমণের রং গেরুয়া। আমার রক্তের রংও বোধহয় গৈরিক।

কিন্তু বাবা-মায়ের ভ্রমণের স্বাদ গন্ধ ছিল একদম আলাদা। লাল টুকটুকে। মা বেরুতেন বেড়াতে, সঙ্গে যেত সংসার। গরমের ছুটিতে গেলে রেলের কামরার ভেতরে নেওয়া হত আইসবক্স, তাতে কাঠের গুঁড়োর মধ্যে বরফের চাঁই থাকতো, বরফের ওপরে রাখা থাকতো পাকা আম, লাল লিচু, সাজা পান, মিষ্টিটিষ্টি। লাল গামছা পরানো জয়পুরী কুঁজোর ভেতরে নলেও বরফ কুচি ভরা থাকতো, জলে লাগতো না বরফ, জল বরফ-ঠাণ্ডা হতো। বরফের চাঁইয়ের ওপর বন্ বন্ করে পাখা ঘুরতো, ঘরময় ঝিন্‌ঝিনে বরফ কুচির শীতলতা ছড়িয়ে পড়তো, সেই সঙ্গে পাকা ফলের সুবাস। মা খড়খড়ি নামিয়ে কামরা অন্ধকার করে দিতেন। কু-ঝিক-ঝিক শব্দে আর দোলায়, শীতলতায় আর সুবাসে, আমি ঘুমিয়ে পড়তুম হোলডল খোলা কর্সা বিছানায়।

তার আগে, অ্যাটেনডেন্টের কামরা থেকে ইকমিককুকার হাতে ঝুলিয়ে হাসিমুখে চলে আসতো গুনিয়াভাই, আমাদের সংসারের প্রাণনিধি, গুণনিধি। সে তার অ্যাটেনডেন্ট কামরায় "ইম্পিরিট লম্পো"তে ইকমিককুকার বসিয়ে রেঁধে ফেলেছে বেমাইনি লাঞ্চ। ঘি তেজপাতা দেওয়া আতপচালের ভুরভুরে সুগন্ধী সরু সরু শাদা শাদা ভাত, হালকা মাংসের ঝোল, একটা সবজী। আশ্চর্য কুশলতায় চলতি গাড়িতে গুনিয়াভাই খাবার সাজিয়ে দিতো প্লেটে প্লেটে—কী ভালোই লাগতো সেই খাবার। খেয়ে এত আনন্দ বাড়িতে কখনও পেতুম না অথচ সেই গুনিয়াভাই তো থাকতো বাড়িতেও?

রেলগাড়িতে গুনিয়াভায়ের সঙ্গে থাকতো সেই আশ্চর্য ভাঁড়ারঘর ট্রাংক! তার মধ্যে স্টোভ বাটি চাকি বেলুন হাঁড়ি কড়া থালা গেলাস চাল ডাল তেল মশলা আলু পেঁয়াজ সব থাকতো। আমি কিছুতেই বুঝতুম না এই একই জিনিসের জন্যে বাড়িতে কেন দু' দুটো ঘর লাগে, রান্নার, ভাঁড়ারের।

আর ট্রেনে স্নান? মা ছাড়বেন? ওইটুকু বাথরুমেই সাবান মাখিয়ে বালতি মগে জল ঢেলে অথবা সাওয়ারে অকরুণ ভাবে রগড়ে রগড়ে স্নান করিয়ে দিতেন। নইলে ট্রেনের ময়লা কাটবে কেন? এখন বেড়াতে বেরুলে আমি খবরদার বলে স্নান না করে তার শোধ তুলে নিই!

জীবন যতই জটিল হচ্ছে, ভ্রমণ ততই সরল হচ্ছে দেশে। হুড়ুগ পড়েছে দেশ বেড়ানোর। ভ্রমণের 'সেল' লেগেছে। দেশসুদ্ধু সবাই তোমাকে ডেকে ডেকে বলছে, ওগো, করছ কি, বেড়াতে বেরুলে না এখনও? বেলা যে পড়ে এল? সরকারী ভ্রমণ-সংস্থা বলছেন, বেসরকারী ভ্রমণ-সংস্থার বলছেন, উচ্চ, মধ্য, নিম্ন, সব স্তরের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা প্রস্তুত: লে লে বাবা ছে আনা, দীঘা-বক্রেশ্বর ছে আনা। কোন্‌টা চাও? তুমি কোন পার্টি? স্বাস্থ্যপার্টি, ধর্মপার্টি? না শপিং পার্টি? দ্বারকা-তিরুপতি, না হংকং-সিঙ্গাপুর? নাকি কালচর-পার্টি? অজন্তা-ইলোরা-খাজুরাহো? অথবা রোম-প্যারিস-লণ্ডন? ক্রাইস্ট দ্যাখো, মুজিয়ম দ্যাখো, থিয়েটার দ্যাখো। যাতায়াত জলের মতন। অর্থানুকূল্য থাকলে সব ঘরে মোর ঘর আছে। কিন্তু দর্শনে আজ আর সে রোমাঞ্চ নেই, সে বিস্ময় নেই, যা ছিল পঁচিশ বছর আগেও। এখনকার যুগে সবই সবজান্তা, সবাই রামগরুড়। ইনফরমেশন এক্সপ্লোশনের যুগে বিস্ময়ের এক্সপ্লোশনটা কমে যাবেই। সবাই যে সহজলভ্য—কেদারবদ্রী অমরনাথও আর দুর্লভ নন। কষ্ট না করেই যা মেলে, তাকে কেষ্ট বলে মানা শক্ত।

তখন হুড্রু দেখেই যত রোমাঞ্চ হত, এখন নায়াগ্রা দেখলেও মানুষের তত আহ্লাদ হয় না, আহ্লাদের ক্ষমতা কমে গেছে সবারই। তবে হ্যাঁ। আশ্চর্য হবার ক্ষমতা ঈশ্বর এখনো সবটা কেড়ে নেননি। কী উত্তেজনা হয়েছিল গিয়ে দেখি সেই বিগবুলবেন পাহাড়, গ্রেন কার ঝরনা। ইয়েট্‌সের কবিতায় পড়া জীবন্ত জায়গাগুলি দেখেছি, আর সেই রাজকাহিনীর রাজপুতানার মতই

BanglaBook.org

গায়ে কাঁটা দিয়েছে। জাফরানের ব্যবহৃত জিনিসপত্তর, কি সুইফট আর স্টেলার যুগ্ম কবর দেখেও ঠিক তাই! আর ক্রেমলিনে? ইভান দা টেরিবলের বিয়ের গির্জে দেখে কি ছোটবেলায় টাওয়ার অব লণ্ডন দেখার মতই রোমাঞ্চ হয়নি? টলস্টয়ের বসতবাড়িতে হাঁটতে হাঁটতে কি ভাইমারে গয়টের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখার কথা মনে পড়েনি? বালো শেক্সপীয়রের বাড়ি দেখবার তুল্যই কৃতার্থ, ধন্য মনে হয়েছে ঠিক এইখানেই তিনি বেঁচে ছিলেন? ভাবতেই শিহরণ হয়েছে।

কিন্তু প্যাকেজ ট্যুরে আমার রুচি নেই।

আমি বেড়াতে চাই স্বাধীনভাবে। কটিনবিহীন।

কোম্পানির ভ্রমণ আমার জন্যে নয়। অত নিয়মকানুন আমার সহ্য হয় না। সব ঠিকঠাক, ভালো হোটেলে ঘরটি, ভালো থিয়েটারের টিকিটটি, ফেরার পথে সীটটি—দূর দূর! ওকি বুড়ুটে বেড়ানো। ওতে অবার মজা আছে নাকি? ঝুপ্ করে বেরিয়ে পড়বে, ধুপ্‌ধাপ্ নেবে পড়বো, হুপহাপ লম্ফঝম্ফ মারবো, যখন খুশি গন্তব্য পালটাবো, টুক করে মার কাছে ফিরে আসবো: ঘরের মেয়ে ঘরে। কেবল একটু অন্যরকম হয়ে আসবো। যে মেয়ে যায়, সেই মেয়ে ফেরে না। একটুখানি রেখে আসে ধুলোবালিতে, আর অনেকখানি নিয়ে আসে নিশ্বাসেপ্রশ্বাসে। প্রত্যেকটি যাত্রা আমাকে একটু একটু বদলে দেয়।

সুন্দরবন ভ্রমণ এখন খুব ফ্যাশনদুরস্ত। কত কায়দার নক্ষ যাত্রা আছে। আমিও একবার গিয়েছিলুম, সে যাওয়া একেবারে অন্যরকম। গ্রামের পুজো দেখব বলে ঝোঁক হয়েছিল। একটি ছেলের সঙ্গে চলে গিয়েছিলুম গোসাবা। সে ঐ অঞ্চলে স্কুলমাস্টারি করে। সঙ্গে আমার সাঙ্গপাঙ্গ। ফেরার দিন তিনিশবার যানবাহন বদল করতে হয়েছিল, আর মোট এগারো রকমের যানে চড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল এক যাত্রায়। কাদায় আছাড়গুলো ছেড়েই দিচ্ছি। বাচ্চার কাঁদেনি, কিছু ঝামেলা করেনি। ভাঙা জেটি থেকে তাদের যখন দশফুট নিচের নৌকোয় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি অচেনা হাটুরেরা লুফে লুফে নিয়েছে তখনও তার ভয় পায়নি, কেবল মাঝনদীকে কে ছুঁড়বে, এবং কে লুফবে এইটে তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। পাগাড়ি, ডিঙি নৌকো, খেয়াতরী, সাইকেল-ভ্যান, টেম্পো, বাস, হাটুরেদের নৌকো, ইস্টিমার, বাস, সাইকেল-রিকশা, রেলগাড়ি, ট্রাম, রিকশা—এগারো রকমের যানে চড়ে আমরা এলুম সুন্দরবন থেকে হিন্দুস্থান পার্ক—বেরুবার সময় আকাশ ছিল বেগুনি রঙের, সূর্য ওঠেনি। ফেরবার সময়ে মাতলার অকূল পাড়ে আসাছে কোজাগরীর বেহিসেবি চাঁদ।

যাঁরা যান ট্যুরিস্ট লঞ্চে চেপে, সরেস্তের হাতের বানা খেতে খেতে এসব কিছুই তাঁরা জানতে পারেন না। কাঁকড়া আর মিনি-মাছ-ইঁটা শুলো বের করা এঁটেল কাদা পেরুতে গিয়ে হাঁটু পর্যন্ত কাদায় গেঁথে যান না তাঁরা, রোদ মাথায় হুতবিহীন টেম্পোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ছায়া-সবুজ গাঁ গেরাম দেখেননি তাঁরা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কুঁড়ে ঘরে খৈ ভাজার শব্দ শোনেননি তাঁরা। আঁচলে খৈ নিতে খেতে পথ চলেননি, গুণ টানতে টানতে নবেন মাঝি তাদের পার করে দেয়নি উজানের খাঁড়ি, আধঘণ্টার পথ পেরুতে তিন ঘণ্টা লেগে যাবার মজাটা তাঁরা জানতে পারেন না। বাঘে না ধরলে, তাঁরা টের পাবেন না ওটা সুন্দরবন, না ডিজনীল্যাণ্ডের ট্রিপ একটা।

অতি সুখে থাকায় আমার সুখ সহ্য হয় না। দুর্গাপুজো দেখতে গিয়ে উঠেছিলুম হ্যামিলটনের বাংলোয়। যেই না গোসাবা বাজারে চায়ের দোকানে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হওয়া, আর সে বললে তার বাড়ি অনেক ভেতরদিকে, গ্রামের মধ্যে, খাঁড়ি বেয়ে নৌকো চেপে দু'ঘণ্টার পথ, সেই চিংড়ি ভেড়ির কাছে, বনের বাঘ সাঁতরে চলে আসে মানুষ ধরতে, যাবেন নাকি দিদি, আমাদের গাঁয়ে? অমনি নেচে উঠেছি, এক্ষুনি, এক্ষুনি। রাত তখনই সাড়ে ন'টা। আর গ্রামদেশে সাতটায় রাত নিঃঝুম। সেই রাতে দু' ঘণ্টা নৌকোয়, দেড়ঘণ্টা পায়ে হেঁটে, বাচ্চাকাচ্চা সমেত,

ফুটফুটে জোছনায় হাসন্ত ধানক্ষেত আর ভাসন্ত শাপলাফুলের ধার দিয়ে ছায়াছায়া বাঁশঝাড় আর নাম-না-জানা অন্ধকার গাছের তলা দিয়ে তিন চারটে ঘুমন্ত গ্রাম পার হয়ে পৌঁছেছিলুম অতনুর বাড়িতে। রাত দুটোর সময়ে অনাহূত অতিথিদের সে কী যত্ন, কী আপ্যায়ন। চা, বিস্কুট, মুড়ি, নাড়ু। হ্যাঁ, জোয়ার দেখেছি বটে সেই রাত্রে। একই সঙ্গে জলের আর জ্যোৎস্নায় জোয়ার—নৌকো পর ভুলে উঠে ঢুকে পড়েছিল জলে ঢাকা ডাঙ্গায়। মাঝি নেমে পড়ে ঠেলেঠুলে কখনো ধানক্ষেত থেকে কখনো গেরস্তের উঠোন থেকে নৌকোকে ফিরিয়ে আনছিল নদীর জলে। কানা উপছেনো চরাচরব্যাপী চন্দ্রালোকে ঝোপঝাড়, শাপলা-শালুকগুলোকে রুসোর আঁকা ছবির ফুলপাতা বনজঙ্গলের মত অবাস্তব দেখাচ্ছিল। কুছেই বন্য ডাকতে পারত। তার বদলে তীব্র তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি চিরে ফেলেছিল বাঘের মতই এক রাতপাখি। গরাণ-বাইন গাছগুলোর কপাল পর্যন্ত জলে ডুবে গেছে। বন্যার ছবির মতোই দেখাচ্ছিল (মাইনাস শোক)।

ফেরার সময় ছিল ভাঁটা। কাদা ভর্তি খাঁড়িতে নেমে গুণ টানতে টানতে উজান বেয়ে নৌকো আনতে জান নিকলে গিয়েছিল মাঝির। জল নেমে গেছে অনেক নিচে। বাইন, গরান, গাছগুলোর উঁচু ডালে ঝুল ফলের মতো ঝুলে আছে গেঁড়ি, গুগলি, শামুক। সে যে কী বিসদৃশ, কৃষ্ণের মুখে সিঁদুর-কুমকুম লেগে থাকার চেয়েও বেশি। এবার বোঝা গেল হিমালয়ের মাথায় কী করে ঝিনুকের কংকাল পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক জোয়ার নেমে যাবার কাহিনী সেটা।

বন্ধুরা বকে; এতলোক বেড়াতে যায়, তোর বেলাই যত অঘটন ঘটে কেন? তোরই ভিসা ফুরিয়ে যায়, তোকেই পুলিশে ধরে, তোরই বাক্সপ্যাঁটরা খোয়া যায়, তোরই পাসপোর্ট, তোরই ট্র্যাভেলার্স চেকবই বারবার হারিয়ে যায় কেন? নিজের গাড়িটা না হয় অনবরত যত্রতত্র বিগড়ে ফেলিচিস, কিন্তু তুই মার্কিনী রেলগাড়ি পর্যন্ত বিগড়ে ফেললি কেমন করে? কী করে ম্যানেজ করিস এত গণ্ডগোল?

বকুনি খাওয়া ছাড়া উপায় কী? সত্যি কথাই তো। সেবার শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পথে লাঞ্চ খেতে গিয়ে গাড়ির চাবি শক্তিগড়ে হারিয়ে গেল। কী করে ফিরলুম? অন্য একটা ফিয়াট গাড়ি দাঁড় করিয়ে তার চাবি দিয়ে স্টার্ট করে নিয়ে, চাবি রেখে দিয়ে, ঐ স্টার্টই বজায় রেখে রেখে যদ্দুর যাওয়া যায়। লেতেল ক্রসিং-এ এসে? নেক্সট ফিয়াট গাড়ি ধর। ঐভাবেই গাড়ি সুদ্ধু ছত্রীদের এনে ফেলেছিলুম কিন্তু ডানলপ ব্রীজ পর্যন্ত! এই অসামান্য কীর্তির জন্যে কেউ একটা বাহাদুরি তো দিলেই না, উল্টে চাবি হারানো নিয়ে খোঁটা দিতে লাগলো। অথচ চাবিটা হারালো খোকন।

আর মার্কিনী রেল গাড়িটা কি আমি ভেঙে ফেলেছিলুম? শিকাগো টু সানফ্রান্সিস্কো যাচ্ছি, পথে এইসা ঝড় হলো যে বুড়ো বুড়ো রেড উড ট্রি উপড়ে পড়লো রেল লাইনে, আর ফেল্পার নদীর সেতু গেল ভেঙে। ট্রেন প্রায় পৌঁছে এসেছিল রসদ সংগ্রহের এক ঘাঁটির কাছে, তাই জল ফুরিয়ে গেল, খাদ্যও ফুরিয়ে গেল, সবার আগে চলে গেল বিজলী ব্যবস্থা। সে-দুর্গতি কল্পনাতীত। প্রচণ্ডভাবে যন্ত্রনির্ভর, নিশ্চিন্ত নিয়মানুগ দেশে এমন আজব কাণ্ডের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি থাকে না, সবাই খুব ঘাবড়ে যায়। সাহেবদের উদ্বেগ, শঙ্কা এবং আর্তি চরমে উঠলেও, আমাদের কাছে তো এ নস্যি। এ ধরনের আশাতীত অব্যবস্থাও ওদের হঠাৎ আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দেয়, কিন্তু আমাদের এসব তুচ্ছ। আমি তো ফোকটে অ্যাডভেন্চার পেয়ে মহা আহ্লাদিত। রোগা ফেল্পার নদীর সে কী ধ্বংসময়ী রূপ! বন্যায়, ঝড়ে, বরফে, স্ট্যানডেড হয়ে যাওয়া ট্রেনে—আমার তো খুব ভালোই হলো, দারুণ মজা। দিব্যি গীতার স্থিতধীর প্রতিমূর্তি নিরুদ্বেগ ওরিয়েন্টাল উইসডম হয়ে মহোল্লাসে বসে আছি!

একবার কলকাতা কোর্ট দেখতে ছানাপোনাদের নিয়ে গেছি, গাড়ি বেঁকে বসলো। মুহূর্তেই

জুটে গেল দুশো কুচোকাচা পরামর্শদাতা।

—"বিস্যাঞ্জিৎ-এর মটরগাড়িটাও এইখেনে খারাপ হয়ে গেস্‌ল।"

—"বিস্যাঞ্জিৎ গাড়িটা সারালেন কী করে?"

—"সারায়নি। ঠেলতে ঠেলতে থানায় নিয়ে গেল।"

—"তবে তাই চল।"

থানা দু মাইল। পৌঁছোলুম ঘন অন্ধকারে। গাড়ি উঠোনে রাখার বন্দোবস্ত করে পুলিশদের বললুম—"একবার দয়া করে একটা লক আপে আমাদের জন্যে একটু জায়গা করে দেবেন ভাই?"

—"লক্ আপে? লক আপে কেন?"

—"কোথায় থাকবো এত রাত্রে, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে? সেফটির পক্ষে তো লক্ আপই শ্রেষ্ঠ। পয়সাও লাগবে না।"

হৈ হৈ করে উঠলেন পুলিশ অফিসারেরা—"এইজন্যে? আমরা এতজন ভাই থাকতে সেফটির চিন্তা? লক আপে ছাড়া বুঝি বিনা খরচে থাকা যায় না?"

সে রাত্রে ভাইদের ব্যবস্থায় রাজার হালে থেকেছিলুম পঞ্জাব তীরে বাগানঘেরা একটি বাড়িতে।

তবে ভাইরা সব সময়ে যে একরকম হয়, তা নয়। সেবার দুর্গাপুর স্টেশনে দুটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। কথায় কথায় একজন বললে তাদের গ্রামে অপূর্ব পোড়ামাটির মন্দির আছে, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইতে তার উল্লেখ আছে। তার বন্ধু বললে—"চলে যান না দিদি, ওদের পুকুরে মাছের চাষ। পেট ভরে মাছ ভাজা খেয়ে আসবেন।" দিদি তো "আঁচাবো কোথায়?" বলে তৈরি।

গ্রামটি বাঁকুড়ায়। দুবার বাস বদল করে বড়জোড়ায় নেমে সাইকেল রিকশা নিয়ে বিশাল মাঠ পার হয়ে ওদের গ্রাম। ডাক্তারবাবুর সামনের বাড়ি বললেই নিয়ে যাবে।

—"সকাল সকালই চলে আসুন। কাল নাইট ডিউটি আছে দুপুরে বাড়িই থাকব। দুটি ভাত-মাছ খেয়ে আসবেন আমার কাছে।"

—"অবশ্যই। অবশ্যই। সে আর বলতে। কাল দেখা হবে।"

দুর্গাপুর গার্লস হাইস্কুলের টীচাররা কিছুতেই যেতে দেবেন না। পাগল নাকি? "দাঁড়ান, টানা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" (ওঁদের প্রাইজ বিতরণেই যাওয়া!) আমি তো চুপিচুপি মেয়েদের নিয়ে ভোকাট্টা। বাসটাস বদলে রিকশাটিকশা নিয়ে ঠিক হাজির হয়েছি। দীর্ঘ পথ। ঠাণ্ডা রোদ খিদেতেষ্টা বেশ জমে উঠেছে।

আমাকে হাসাবদনে সকন্যাদ্বয় দুয়োরে সশরীরে খাড়া দেখেই ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে পড়বার যোগাড়। বুঝলুম বিশেষ কেলেংকারি করে ফেলেছি। এটা কল্পনার অতীত ঘটনা এ বাড়িতে। ভাতের প্রশ্ন উঠল না। আর বুঝতেই পারলাম মাছ চাষের গল্পটা গল্পই। অবিশ্যি ব্যাপারটা সয়ে যাবার পরে, যত্নের অভাব হল না। চা-মুড়ি এল। বড়জোড়া বাস স্টপে ফিরে ডাল চচ্চড়ি পোনা মাছের ঝোল দিয়ে মোটা ভাত, খিদের মুখে দারুণ স্বোয়াদ লাগলো। মেয়েরা অবিশ্যি আপশো বলে, "কেমন খেলে মা, গরম গরম মাছ ভাজা, ভাবের বাড়িতে?"

কিন্তু দোষ তো ওদের নয়। শহুরে লোকেরা মুখে কত কীই তো বলে। আমার মত শহুরে বিবিটি কষ্ট করে সত্যি সত্যি ওদের বাড়িতে যাবে, এটা ও বিশ্বাস করতে পারেনি।

আমাদের কাজের মেয়ে শীলার বিয়েতে আমি যখন ডায়মণ্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপের বাসে চড়ে সত্যি সত্যি 'ধলের খাল' স্টপে নেবে পালান মাঝির বাড়ি পৌঁছেছিলুম, সেখানেও এই রকম অপ্রস্তুতি, সংকোচ আর সমূহ কেলেঙ্কারি ঘটেছিল। দুটো ডাব খেয়ে স্থিরতে হয়েছিল আমাদের। সাগরিকায় খেয়ে নিয়ে ট্রেন ধরে বাড়ি। গ্রামের লোকেরা আমাকে ঠিক সীরিয়াসলি

BanglaBook.org

নেয় না। (শত্রুরের লোকেরা তো নয়ই।)

লোহার সিন্দুকে হাত ডুবিয়ে চায়ের পেয়ালা বের করতে করতে পেড়ামাটির মন্দিরের গাঁয়ের ছেলেটি আমার কাছেই দুঃখু করল, —"আমার বন্ধু বলেছিল বটে, সংঘাতিক মহিলা, বলা যায় না, চলেও যেতে পারে। একা একাই নাকি কুম্ভে গেস্‌ল!...আচ্ছা দিদি, কী করে গেলেন, মেয়েছেলে হয়ে? ভয় করল না আপনার?"

নাঃ। ভয় আর করে কই? আমার দয় তো এখন ঈশ্বরের। ভয় ভাবনা তিনি বুঝুন। আমার কি?

তাই যত্রতত্র নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারি। একা তো নই? সঙ্গে তো সতর্কি বল্লম নিয়ে চলেছেন অলক্ষ্য চৌকিদারটি। তিনিই জুটিয়ে দেন চমৎকার সব সঙ্গী। সাপ্লাই করেন সহায় সম্বল, রাত্রির আশ্রয়। এই অগাধ বিশ্বাসটি যিনি বুকের মধ্যে পুরে দিয়েছেন তিনিই নেন শেষরক্ষার ভারটা। নইলে কিসের জোরে চলে গেলুম কুম্ভমেলার ভিড়ে? কি করে অমন জবরদস্তি ঢুকে পড়ি ডাঃ লালওয়ানীর শোবার ঘরে, ঘুমুতে? আমি কি নির্বোধ? নাকি মেয়েই নই? নাকি বদমতলবে? সে আপনারা যা খুশি ভেবে নিন। আমার সত্যিই গঙ্গাদ্বীপের ধুলোভরা রাস্তায় কম্বল পেতে শুয়ে পড়তে ভয় করেনি, কাশীর ধর্মশালায় অচেনা দুটি পুরুষ মানুষের সঙ্গে একটা ঢালা তক্তাপোশে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে দ্বিধা হয়নি। এমন কি তাওয়াং-এর মত পাণ্ডববর্জিত দেশে হিমালয়ের নির্জন গ্রামে মোমপা লামার তিব্বতী বাড়িতে গিয়েও বুটুমবাড়ি যাবার মতন আশ্রয়ত্ব জুটে যায় আমার কপালে। ঠিক যেমনটি জুটে রাত দুটোয় সুন্দরবনের গ্রামে। কিসের ভয়?

অনেক ঘুরেছি। তবু ক্লান্তি নেই। তৃপ্তিও না। "যথেষ্ট" বলে ভ্রমণে কোনো শব্দ নেই। এর পরে খুলে যাবে গ্রহান্তরে ভ্রমণের পথ—'কুণ্ড স্পেশাল টু জুপিটার'—অবশ্য তখনও আমি চেষ্টা করব হিচহাইক করতে—দেবে তো? দেবে, দেবে। খুব দেবে।

ভ্রমণ কি শুধু দেশই দেখায়? ভ্রমণ আমাকে মানুষও দেখায়। একা একা ঘুরেই আমি সবচেয়ে আনন্দ পাই। এই ভ্রমণের কল্যাণে আমার প্রচুর বন্ধুলাভ হয়। চিরদিনের বন্ধু কেউ হয় কিনা জানি না, তবে এরা সবাই পথের বন্ধু। কতো যে ভালো লোক আছে এই পৃথিবীতে তার ইয়ত্তা নেই। ভ্রমণে আমি মোদ্দা কথা এই শিখেছি, যে মানুষ মানুষের বন্ধু। মানুষ মানুষের আশ্রয়। রোজ রোজ কলকাতায় ট্রামে বাসে কেরোসিনের লাইনে এই কথাটা ভুলে যাই। ভ্রমণ আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় "জীবন নয় জীবনসংগ্রাম" কাদের ভরসায় আমি ঘুরে বেড়াই? ঘরে আমার লোকবল না থাক, পথে আমার লোকবল ঢের।

১৯৭৬। বুদাপেস্টে, ড্যানিউব নদীর মার্গিট দ্বীপে হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় 'কারমেন' অপেরা হচ্ছে। কিছু বুঝতে পারছি না, খুবই শীত করছে, উঠে এলুম। পাক থেকে বেরিয়ে সেতু বেয়ে এসেছি ডাঙায়, কিন্তু কী করে যে হোটেলে ফিরব, জানি না। রাত প্রায় বারোটা বাজে, পথচারী মানুষ, কিন্তু কেউই আমার ভাষা বুঝছে না। হঠাৎ একটি ছেলে এসে ইংরিজিতে বলল, "তোমায় সাহায্য করতে পারি?" হাতে চাঁদ পেয়েছি। গল্প করতে করতে ট্রামে গিয়ে চড়লুম। যেতে যেতে দেখি একটা পাহাড়ের মাথায় খুব জোর আলো। "কী ওখানে? বুদাপাহাড়ে?"—"ক্যাথিড্রালে আলো দিয়েছে, ওখানে আজ পিয়ানো কনসার্ট হচ্ছে। যাবে শুনতে?"—"কী করে যেতে হয়?"—"চলো আমি নিয়ে যাচ্ছি।" "চলো যাই।" সেই ডাক্তারী ছাত্র, লাসলো পুশকাসের সঙ্গে চলে গেলুম বুদাপাহাড়ের ওপরে, রাত্রি যদিও তখন ঢের, এবং তাকে সত্যি সত্যিই চিনি না। কিন্তু চিনে নিতে কতক্ষণ? কী ভালোই লেগেছিল সেদিন! কী চমৎকার পুরোনো ক্যাথিড্রাল, কী অপরূপ পুরোনো শহর। কী সুন্দর বাতি সাজিয়েছে!

BanglaBook.org

বিলেনের পর বিলেন। নদীর দিকে মুখ করে বসবার অজস্র আসন বাগানে। পাহাড়ের গায়ে বাগান, আমরা বাইরে বসে বসেই পিয়ানো শুনলুম। নিচে ড্যানিউব বয়ে যাচ্ছে, ওপারে পেস্ট শহর, বুদা আর পেস্ট মিলিয়ে বুদাপেস্ট নগরী। মুহূর্তেই লাসলোর সঙ্গে গভীর বন্ধুতা হয়ে গেল। রাত তিনটেয় যখন হোটেলে ফিরলুম, শুনি বন্ধু-বান্ধবরা খুব ভাবনায় পড়েছিলেন আমার জন্যে।

মানুষ তো এমনিই। কে কখন কাছে চলে আসে, কাছের মানুষ দূরে সরে যায়। ভ্রমণের সময়ে পৃথিবীটা আমার খুব কাছাকাছি চলে আসে আর সংসারে? অনেক দূরে, আউট অব ফোকাস, সরে যায়. যখন ঘুরে বেড়াই তখন প্রত্যেকটা মুহূর্ত কত সত্য, কত জীবন্ত, জগতের সঙ্গে একটার পর একটা নতুন সম্পর্ক পাতানো হয়, বসুধা যেন পরম আত্মীয় হয়ে ওঠে, এবং আত্মীয়তা হয় নিজের সঙ্গেও। নিজের হৃৎস্পন্দের ছন্দের সঙ্গে চেনাও বেশ হয়। কিছু ভ্রম, বাকিটা রমণ।

মাইসোর রিজিওনাল কলেজে সামার স্কুলে পড়াতে গেছি। ওবাই নিয়ে যাচ্ছিল বেলুড় হালিবিড় দেখাতে। পথে বাস গেল ভেঙে। আমি দু'দিন বাদে ফিরে আসব কলকাতা—খুব মন খারাপ। রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, বাস সারলে মাইসোর ফিরে যাব—হঠাৎ দেখি একটা বাস আসছে "বেলুড়-হালিবিড়" লেখা হাত দেখিয়ে চেঁচামেচি করে থামিয়ে উঠে পড়লুম। পরে বুঝলুম এটা টুরিস্ট বাস। আগে থেকে টিকিট কিনে উঠতে হয়। কিন্তু বাসের গাইড ক্লীনার আর ড্রাইভারের সঙ্গে এমন প্রাণের বন্ধুত্ব হয়ে গেল তারা আমাকে বিনা টিকিটেই বেলুড় হালিবিড় শ্রবণ বেলগোলা দেখিয়ে আনল। পরদিনও আবার নিয়ে গেল ঘুরি বেড়াতে। কিছুতেই একটা পয়সা নেওয়াতে পারলাম না—ঐ যে "সিস্টার ডেকে ফেলেছি আমরা", পয়সার প্রশ্নই ওঠে না!

আরেকবার গন্তব্য ছিল পূর্ব জার্মানি। একের পর এক প্লেনের কনেকশন মিস করে পূর্বের বদলে পশ্চিম বার্লিনে গিয়ে পৌঁছুলুম রাত সাড়ে দশটায়। ভোরবেলা পূর্ব বার্লিন এয়ারপোর্ট থেকে ভইমারের প্লেন ধরতে হবে। এখন যাই কোথায়? হাতে মার্ক নেই। এখন টার্মিনালেও থাকে নেই। শহরেও বাংক সব বন্ধ। থাকবই বা কোথায়? টার্মিনালও তো বন্ধ হয়ে যাবে। বসবার জায়গাও দেখছি না। ট্যাক্সি নিয়ে কোনো হোটেলে যাবার উপায় নেই, ট্যাক্সি ভাড়া দেবারও পয়সা নেই। পশ্চিম বার্লিনে তো আসবার কথাই ছিল না। ক্রিস মাসের আগের সপ্তাহ। বেজায় শীত। বৃষ্টিও পড়ছে। হঠাৎ দেখি দীর্ঘ একটি ভারতীয় ছেলে। দৌড়ে গেলুম। "আপনি ভারতীয়?"

—"ধরে নিন তাইই। কেন বলুন তো?" "মহামুশকিলে পড়েছি ভাই"—সব খুলে বললুম। ছেলেটি বলল, "চলুন সিস্টার আমার সঙ্গে। কিছু ভাববেন না। আমার স্ত্রী কলা আছে, আপনার থাকবার অসুবিধে নেই।" পথ থেকে নিয়ে গেল বাড়িতে। তার নাম আলম। বেশ লাহোর। পশ্চিম পাকিস্তানের ছেলে, আমাকে স্বস্তি দিতে বলেছে ধরে নিন ভারতীয়ই।

—"কিন্তু যখন জন্মেছিলাম, তখন তো লাহোর ভারতবর্ষেই ছিল। কাজেই খুব ভুলও বলিনি।" আলম সলজ্জমুখে বলেছে পরে। ভোর রাতে ৪টের সময়ে তার স্ত্রী ভরথি আমাকে তুলে দিয়ে যে পাইয়ে সঙ্গে করে নিয়ে বেরুল—ফাঁকা বন অন্ধকার, ভয় ভয়, যানবাহনশূন্য বৃষ্টিভেজা বার্লিনের রাস্তায় জুতোর প্রতিধ্বনি তুলে, ভরথি আর আমি ছুটতে লাগলুম, প্রথমে ভূগর্ভ রেলে চড়ে এক জায়গায় যাওয়া, সেখানে ট্রেন বদল করে আবার এক জায়গায়। এইখানেই বাস ধরলুম। বাস নিয়ে আমি যাব শেনেফেল্ট, পূর্ব বার্লিন এয়ারপোর্টে দিনের প্রথম বাসটিই ভরথি আমায় ধরিয়ে দিল, ৫টার সময়। উঠিয়ে দিয়েই ওর মনে পড়ল, আমার কাছে তো টাকা

BanglaBook.org

নেই। হাতে গুঁজে দিল একমুঠো নোট, না গুণেই। ভরথি-আলম আমার পুরো নামটা পর্যন্ত জানে না। পরে ওদের টাকা শোধ করেছি কিন্তু অদ্ভুত করুণা অপরিশোধ্য! এমনও মানুষ হয়? তবু লোকে ভাবে আমি একা একা ঘুরি। চতুর্দিকে আমার পূর্বজন্মের সঙ্গী-সাথীরা আছে না! কে বলেছে একা?

সাহিত্যসংখ্যা 'দেশ' ১৩৯০

BanglaBook.org

কবিতা, ফুটবল, মাছ ও মারুতি

১ ।। কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা

স্বয়মাগতা না হলে সুখ দেয় না নাকি। না কবিতা, না বনিতা। সুখ নেয় কে? কেন, পাঠক? কিংবা প্রেমিক? কিন্তু তাই কি? কবিতা, তুমি প্রথমে কার? হে স্বয়মাগতা, তুমি কার কাছে আবির্ভূতা হও? ধন্য করো কাকে? কৃতকৃতার্থ করে দাও, আপ্লুত, অভিভূত করে দাও, কাকে? কবিকেই তো! কবিতার অসহায় ক্রীতদাস, চিরবন্দী সেবক, পূজারী, অতৃপ্ত প্রেমিক, সে তো কবিই! কবির সঙ্গে কাব্যলক্ষ্মীর সেই প্রেমযুদ্ধ থেকেই একটি একটি খণ্ড কবিতার জন্ম। সেই সার্থক প্রণয়লীলাই কাব্যের সৃজনলীলা। কবির সঙ্গে কবিতার প্রেম, শব্দ আর সংকেতের লীলাবৈচিত্র্যে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কবি এবং কবিতার এই একান্ত নিবিড়, সঘন, তন্নিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে পাঠকমশাইয়ের স্থানটা তবে কোথায়?

সহৃদয় পাঠক হলেন কবির হৃদয়সঙ্গী, তার অন্তরঙ্গ সখা। পাঠক নির্জনেরসাথী, কবিরগোপন কথার শ্রোতা, তার দুঃখসুখের অংশভাক্। কবিতা, তা সে গীতিকবিতাই হোক আর নাট্যকাব্যই হোক, কোনো না কোনো একভাবে তা কবির অন্তরাত্মারই দিনলিপি। আজকের তৃতীয় বিশ্বের কবিতা, কৃষ্ণসাহিত্য, নিগ্রোসাহিত্য, লাতিন আমেরিকার সাহিত্য, যা কিছুই বুকের রক্ত দিয়ে লেখা। তা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিগত উচ্চারণে একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতার রূপলেখা। ২' লাইনের স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার মধ্যেও যেমন, ছত্রিশ লাইনের নৈর্ব্যক্তিক কাব্যনাট্যেও তেমনি কবির পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস, ভূগোল ধরা পড়ে যায়। তার রক্তচাপের ওঠাপড়া, তার হৃৎস্পন্দনের গতি, তার জীবনীশক্তি ভাইটালিটি, তার বহুত্রম আর কোষ্ঠবদ্ধতা আছে কিনা, প্রায় সবই ধরা পড়ে যায় কবিতার মোহিনী আড়ালের আলোর নিচে। এলিয়ট কি পাউণ্ড যতই নৈর্ব্যক্তিকতার ধ্বজা ওড়ান কবিতায়, তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যে তার আজ মূল্য কতটুকু ভাবা দরকার। সুকান্ত কেন এলিয়টের মতো লিখবেন? এড্রিয়েন রিচ্ কেন লিখবেন পাউণ্ডের মত? যে-কোনও শিল্প শিল্পীর ব্যক্তিত্বের নির্বিকল্প ছাপ ধরে রাখে অবিকল টিপ সইয়ের মতো। মডার্নিস্ট যত যাই বলুন, আমাদের পক্ষে কবিতা কবির আত্মপ্রকৃতি। কিন্তু কবিতা লেখার টেবিলের কবি আর মাছের বাজারে কি র‍্যাশনের লাইনে দাঁড়ানো কবি ভিন্ন ব্যক্তি। কেবল র‍্যাশনকার্ডের নামটুকুই এক।

পুজোর ঘরে ব্রহ্মাণ্ডবিস্মৃত ক্ষান্তপিসি আর কলতলায় পাড়া জাগানো ক্ষান্তপিসি যেমন দু'জন ব্যক্তি, কবিও তাই। স্বয়মাগতা কবিতা যখন কবির পিছন থেকে এসে চোখ টিপে ধরে, কবি তার গায়ে আলতো হাতটি রাখেন আর চকিতে চিনে নেন। তারপরে আরম্ভ খেলা। কবিতাকে সাজানোর, কবিতাকে নিয়ে কবির ভালোবাসার খেলা। স্বয়মাগতাতেই তো কবির তৃপ্তি নেই? যেমন বনিতার বেলায় তেমনি কবিতার বেলাতেও। আগমনেই প্রণয়ের শেষ নয়, সেই তো মাত্র শুরু। তারপরে তুমুল যুদ্ধ। তারপর উত্তুঙ্গ পর্বতে আরোহণ, তারপর ডুবুরির পোশাক পরে গহীন গাঙে ডুব দেওয়া। অক্সিজেন ফুরিয়ে আসবে, তবেই না তৈরি হবে কবিতা। কবিতার সর্ব অঙ্গে যতক্ষণ কবির পরিশ্রমের স্বেদবিন্দুর লবণটুকু এসে না মিশছে ততক্ষণ কাব্যের লাবণ্য আসে না। তার শ্রীসৌষ্ঠব সম্পূর্ণতা পায় না। এবং মুগ্ধ হন না পাঠকও। বনিতাও যেমন। তিনি স্বয়মাগতা হলে দয়িতের সুখ বটে কিন্তু প্রণয়লীলাটি পূর্ণ সম্ভোগ করতে হলে বনিতারও সুখটুকু চাই আর তাকে সেই সুখের স্বাদ দেবার জন্য প্রণয়ীর যে আয়াস, সেইটুকুই তার প্রেম। অনেকখানি তেপান্তর মাঠ জুড়তে হয় না প্রেমের অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে, চাই কেবল হাইফেনের মতো একটুখানি অত্যাবশ্যক চিহ্ন, যত্নের। আয়াসের। সচেতন আকুলতার প্রমাণটুকু

BanglaBook.org

থাকা চাই। কবিতাই বলো আর বনিতাই বলো, প্রকৃত সান্নিধ্য পেতে হলে কিছু স্বেদ দিতেই হবে তার বিনিময় মূল্য। কিছু ভাবনা, কিছু কামনা, কিছু আর্তি, কিছু শ্রম। তবেই শিল্পের সার্থকতা।

ছেলেবেলাতে কবিতার সঙ্গে বনিতার এই তুল্যমূল্যটা আমাকে খুব উল্টোপাল্টা ভাবাতো এতদিনে বোধহয় একটা মানে বুঝেছি। বুঝেছি, যে পাশাপাশি এই যে জীবন আর শিল্পের আসন দুটি পাতা এতে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরই একটি জরুরি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্ত্রীলোক এই সমাজের ব্যাকরণে কর্তা নয়, কর্ম। যেমন শিল্প। সুখদ, স্বয়মাগতা, এই সব শব্দ ব্যবহারেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে শিল্পে অধিকার কেবলমাত্র পুরুষেরই, যেমন নারীতেও। কবিতা মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর পূজা নারী করবে কেমন করে? নারীর আবার মনোজগৎ আছে নাকি? নারীর তো আছে কেবল শরীরী অস্তিত্ব, সেও অন্যের সুখের আধার হিসেবে। যেমন বনিতা তেমনি কবিতাও কেবল পুরুষেরই প্রণয়বস্তু, বিশেষত বঙ্গসন্তানের। কবিতা নাকি বঙ্গজ পুরুষের সমীপে সর্বদাই স্বয়মাগতা। বাঙালি জাত-কবি। তা প্রণয়িনী যখন স্বেচ্ছায় ধরা দেন তার চেয়ে লোভনীয় মিলনমুহূর্ত আর কীই বা হতে পারে? পুরুষের পক্ষে? [হায়। বনিতার নিজের পক্ষে সুখদ যে ঠিক কী, সেটাকে মহাজনবৃন্দ শ্লোকরচনার যোগ্য বিষয়বস্তু বলেই বিবেচনা করেননি।]

২।। শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী

বাঙালি নাকি জাত-কবি। জন্মকবি। চিরকালের কবি। যেমন বাঙালি চিরবিপ্লবী চিরপ্রেমিক। স্পষ্টতই এখানে শুধুমাত্র পুরুষের কথা হচ্ছে। যার কাছে কবিতা বনিতার মতো। ['মেয়েরা আবার কবি কিসের?' এই বিষয়ে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অতিবিশ্রাপিত মন্তব্যটি কিন্তু বাংলার সংখ্যাগুরু পুরুষের অভিমত—অন্যেরা 'শতং ভাষে তদর্ধং বদ' নীতি নেন—শক্তি কবিসুলভ অবিমৃষ্যকারিতায় (নাকি সরলতায়? নাকি দম্ভে?) যে সার্বজনীন পুরুষের মনের কু-কথাটি প্রকাশ্যে উচ্চারণ করে ফেলে হাতে M.C.P -র জন্য লিখিত হস্তক্ষেপটি পরেছেন] সত্যি বলতে কি আমরা যখন বলি: প্রত্যেকটি বাঙালি মনে মনে কবি, তখন কি আমরা মেয়েদের কথা মনে রাখি? ষোলো বছরে প্রেমে পড়েনি এমন বঙ্গসন্তান যেমন পাওয়া শক্ত ষোলো বছরে একটাও কবিতা লেখেনি এমন বঙ্গসন্তানও নাকি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বলাবাহুল্য, এখানে যাদের কথা ভাবা হচ্ছে তারা সবাই পুরুষ। মেয়েরা তো কবি নয়, তারা কবির প্রেরণা। তারা কবিতার মালমশলা? "কী লেখে সে? কবিতা? নাকি কবিতা রচনা করে তাকে?" তাকে তো রচনা করে কবিতাই। অন্তত বাঙালি পুরুষের হৃদয় তাই বলে। উচ্চকিত হৃদয় বাঙালি পুরুষের দেহেমনে যেই যৌবনচাঞ্চল্য আসে, কোকিলের কুহু কুহু এবং মলয় বাতাসের উহুঁউহু অমনি সে শুনতে পায়। এবং তোড়ে কবিতার স্বয়মাগমনের চোটে তার অন্য খাতাগুলি ফুরিয়ে যেতে থাকে। বাঙালি-অবাঙালি সকলকেই একযোগে বলতে শুনেছি, কবিতা লেখে বাঙালি (পুরুষের?) স্বভাবগত। কিন্তু বাঙালি মেয়ের কি ষোলো বছর বয়স হয় না? কোকিলের ডাক কি তার কানে পৌঁছয় না? মলয় বাতাস কি তারও বুককে রোমাঞ্চিত করে না? কবিতা তবে কেমনতর সঙ্গিনী? সে কি কেবলই পুরুষের মর্মসঙ্গিনী হয়? নারীর মর্মসঙ্গিনী হয় না? হয় বৈকি! বালো, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে ও লুকিয়ে লুকিয়ে খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখে ফেলেছে অজস্র মেয়ে। জগতে কেউই কোনোদিনই সেগুলির মুখ দেখেনি। সেইসব কবিতা সেই মেয়ের ব্যক্তিগত স্ত্রীধন, তার নিজস্ব সম্পত্তি। পুরুষ শুধু লিখেই ক্ষান্ত নয়, যতক্ষণ না লেখাটি আর কাউকে দেখছে, অন্য কোনো দ্বিতীয় মত যতক্ষণ না সংগ্রহ করতে পারছে, তার স্বস্তি নেই। অথচ সারা বিশ্ব জুড়ে বহু মেয়েই,

BanglaBook.org

পুরুষশাসিত এই জগতে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তিকেই লেখাগুলি না দেখিয়ে দিনের পর দিন টিনের বাক্সতে তালা মেরে রেখে দিয়ে শেষ দিনে চলে যেতে পারে। এমন উদাহরণ জগৎ জুড়ে ভূরি ভূরি রয়েছে। হয়তো সেই মেয়েটিই প্রকৃত তন্নিষ্ঠ শিল্পী যার অন্তর্লীনতা স্বনির্ভর। যার দরকার নেই বড়দের পিঠ চাপড়ানিতে, সমবয়সীর বাহ্‌বাহিতে, কনিষ্ঠের আরাধনায়। যার কবিতার পাঠক শুধু সেই, একাকী। ছাপার হরফে নিজের নামটি দেখবার বালখিলা মোহ তার নেই, নেই দ্বিতীয় নয়নের মুগ্ধ চাহনির লোভ। এমন অনেক নাম-না-জানা মেয়ে কবি আছেন আমাদের বাঙালি ঘরে ঘরে। এই লেখাটি চোখে পড়লে যাঁর অবাক হয়ে ভাববেন, "কী করে নবনীতা জানলো আমার কথা?" মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে যেসব গ্রামের কিশোরীর কবিতা আজ ছাপা হয়, তাদের মধ্যে অনেকেই রীতিমতো সামনে এসে দাঁড়াবে হয়তো একদিন, অথচ আরও ত্রিশ বছর আগে জন্মালে তাদের অধিকাংশই কোনওদিনই মুদ্রিত হবার কথা ভাবতো না। কিন্তু লিখতো ঠিকই। নিজের খাতায়।

এ সত্ত্বেও বাংলা ভাষার সবচেয়ে জোরালো জায়গাগুলির মধ্যে একটি এর প্রতিষ্ঠিত নারী কবির গুচ্ছ। যুগে যুগে মেয়েরা ভালো কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যের সম্মান অর্জন করেছে। আমাদের অহংকার: বাংলায় এই মুহূর্তেও আছেন কবিতা, বিজয়া, দেবারতির মতো শক্তিমতী কবিরা, ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক ভাষার যে-সৌভাগ্য নেই। নেই বাংলাদেশেও। গদ্যের ভারতীয় মেয়েরা অসাধারণ গুরুত্ব অর্জন করেছেন অথচ আধুনিক কবিতায় তাঁদের প্রয়াস তুলনায় অল্প। বাংলা কবিতাই সগৌরব ব্যতিক্রম।

তথাপি, কি আশ্চর্য, 'বাঙালি জাতকবি' যখন বলি আমরা তখন মেয়েদের কথা মনে রাখি না। অথচ একটা "জাতীয় চরিত্র" তো স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য হবে? ধরুন "বাঙালি মাছ-ভাত খায়" এক্ষেত্রে কথাটা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য করা চলবে, কিন্তু "বাঙালি কবিতা ভালোবাসে" বললেই কেউ কেউ বলতে চাইবেন "মেয়েরা বাদে"। মননশীলতার পড়ায় যে পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার। কবিতার বাগর্থের দেশে নারীর প্রবেশ বিনা পাসপোর্টে!

অথচ বাঙালিই কবিকে চিরকালই 'মেয়েলি' বলে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ, কিঞ্চিৎ অপমান দিয়ে এসেছে। 'মেয়েলি' মানে একটু কমকম মানুষ। মানুষ তো পুরুষমানুষ। সূক্ষ্ম রসবোধ, সুকুমার রুচি ও স্পর্শকাতরকতাকে দুর্বলতার সঙ্গে ও অন্তর্মুখিনতাকে মেয়েলি পর্দানশীনতার সঙ্গে অনায়াসে গুলতা, রুক্ষতা কঠোরতার সঙ্গে শক্তিকে এবং বহির্মুখিনতার সঙ্গে পৌরুষকে মিলিয়ে ফেলার এই ভ্রান্ত অভ্যাস এক্কা বাঙালিরই নয়, সারা পৃথিবীরই আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো 'মেয়েলি' এই বিশেষণে কবিদের অহংকার হওয়া উচিত ছিল। হয় না কেন? হয় না কেননা এই ধারণার অর্থ এই নয় যে পুরুষ নিজেকে ভাবে স্থূলবুদ্ধি, কর্কশরুচি বা বহির্মুখী। বরং বিপরীতটাই প্রচলিত ধারণায় সর্বত্র নারী যখন কবির 'প্রেরণা' ভিন্ন অন্য কোনও ভূমিকায়, সে তখন মননহীন, শরীরবৃত্তের মধ্যে বন্দী, জৈবপ্রকৃতির দাস, তার সৌন্দর্য মাত্র যৌবনেই আবদ্ধ। তার পরিণতি নেই, পচন আছে। নারী তুলনীয় পুষ্পের সঙ্গে, বৃক্ষের সঙ্গে নয়। তার আত্মা নেই, ইন্দ্রিয় আছে। চিন্তা নেই। সজ্জা আছে। এই সব অসঙ্গত ধ্যানধারণা নিয়ে যতকাল আমরা নিজেদের দিগ্‌ভ্রান্ত করে রাখবো, ততকালই আমরা চিরকালীন শিল্পসত্যের নাগাল পাবো না।

৩। শুধু কবিতার জন্য?

কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি পুরুষের আত্মার শান্তি প্রাণের আনন্দ বোধহয় সত্যিই ততক্ষণ নেই যতক্ষণ না একটি কবিতার বই বেরুচ্ছে। একটি আস্ত মস্ত বিশুদ্ধ বাঙালি রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা, একচ্ছত্র কর্ণধার মহান রাষ্ট্রপতি হয়েও জনাব এরশাদের তৃপ্তি নেই যতক্ষণ না "কবি" উপাধির

BanglaBook.org

সম্মানটি পাচ্ছেন। বাঙালির কি সেখানেই প্রকৃত, সাফল্য, প্রকৃত পূর্ণতা? বুদ্ধিজীব্যাতার শেষ প্রমাণ? ঠিক এরশাদের মতো উচ্চগ্রামের কবিকর্মী আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে এখনও আবির্ভূত হননি বটে তবে প্রিয় দাসমুন্সির উপন্যাস আমরা পড়েছি, কবিতাও পড়েছি তাঁর। এবারে কবিতাগ্রন্থ বেরিয়েছে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের: আগেই নানা জায়গায় পড়েছি অপরাজিতা গোপ্পীর কবিতা। সিদ্ধার্থশংকর, জ্যোতি বসু বা যতীন চক্রবর্তীর কবিতা এখনও চোখে পড়েনি, কিন্তু পড়তে কতোক্ষণ? রবীন্দ্রনাথ সত্তর বছরে তুলি ধরে তুলকালাম করে ছেড়েছেন। জ্যোতিবাবু যতীনবাবুর কবিখ্যাতির দিন এখনও যায়নি। (বার্মা গিয়ে পাইলট প্রধানমন্ত্রী যদি শায়েরী লিখতে পারেন, বাঙালি না হয়েই!) পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী কবিতা থেকেই তো মিছিলে গেলেন। এককালে নিজেই উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন, এবং এখনও যত্রতত্র অন্যের কবিতা উদ্ধৃত করা ওঁর মহৎ মুদ্রাদোষ। রামমোহন, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, কোন্ মহান্ বঙ্গসন্তান কবিতা লেখেননি? "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর" থেকে "বহুরূপে সম্মুখে তোমার"—পর্যন্ত? একমাত্র সুভাষচন্দ্রের কাব্যাভ্যাসের খবরটা এখনও জানি না।

কিন্তু ধরুন কেউ কি রাষ্ট্রপতি পদের বদলে রাষ্ট্রকবি হবেন? যদি কবি এরশাদকে বলা হয়, শামসুর রাহমান, আল মহমুদ, এঁরা সবাই তুচ্ছ, আপনিই বাংলাদেশের কবিপ্রধান। আজ থেকে রাষ্ট্রকবি হলেন, শুধু তার বদলে রাষ্ট্রপতিত্বটা ছেড়ে দিন। তিনি কি রাজি হবেন? উল্টোদিকে অনেক কবির কথাই ভাবতে পারি দুই বাংলাতে যাঁদের "আর আপনার একটাও কবিতা ছাপা হবে না। কিন্তু আজ থেকে আপনাকে রাষ্ট্রপতি করে দেওয়া হলো" বললে তাঁদের মোটেই আপত্তি থাকবে না। গোপনে বলেই ফেলি, প্রকৃতপক্ষে বাঙালি বিশ্বাসে ততটা কবিপ্রকৃতির নয়, যতটা সে নিজেকে ভাবতে ভালবাসে।

৪। আ ল্যান্ড মেড ফর পোয়েট্রি

সত্যি বলতে কি, অনেক ভেবেচিন্তে, 'বাঙালি মাত্রই কবি' এই প্রবাদ বাক্যটিকে এখন অদ্ভুত আমার কেমন যেন মনে হয় কৃত্রিম প্রণালীতে প্রক্ষেপ। কিছু সম্পাদক, সমালোচক, সাহিত্যকারের অনুচ্চারিত ষড়যন্ত্রের ফল। দরিদ্র, দুর্বল, অক্ষম বঙ্গসন্তানের আত্মতুষ্টির জন্য সাবধানে সৃষ্টি করা একটি নিরীহ আত্মপ্রতিমা কখন যেন চালু করে দেওয়া হয়েছিল এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, এবং লাউ-গড়-গড় করে তা চলতেই লেগেছে। আমাদের না হয় অর্থ নেই, মনন তো আছে? না হয় গায়ে জোর নেই। কবিত্ব তো আছে? বাঙালি কবিমানুষ, বাঙালি আত্মভোলা। বাঙালির চরিত্র নান্দনিক, সুকুমার। যে জাত-কবি এটি চতুর বাঙালির সচেতন প্রয়াসে রটনা-করা একটি শ্লোগান।

আমার এই বক্তব্য শুনে এক পণ্ডিত বন্ধু বললেন: কথাটা বাঙালিদের বানানো না হয়ে সাহেবদের বানানোও হওয়া অসম্ভব নয়। বলেই উদ্ধৃতি দিলেন; এডওয়ার্ড টমসন ১৯৩৬-এ টাইম্‌স লিটেরারি সাপ্লিমেন্টে একটি প্রবন্ধে বাংলা, মারাঠি এবং তামিল কবিতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন "Bengal: a land made for poetry: new India's hopes & fears." বুদ্ধদেব বসু নিজেও তাঁর একটি প্রবন্ধে সগৌরবে এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছিলেন, এটিই নাকি ছিল টমসন সাহেবের প্রবন্ধের শিরোনাম! প্রবন্ধটিতে টমসন লিখেছেন:

"Bengal is a land made for poetry....Its people live with the sense of boundless horizons, the word *Digantaw*hich may usually be translated 'horizon' is rarely long away from Bangali poetry...the language, too, has poetry in it, a wealth of beautiful words still close to the primitive life that created them,

BanglaBook.org

words often onomatopoeic and always expressive and musical..."

৫। যৌবনে ভেবেছিলাম কবিতাই প্রেম, কিংবা কামনার উপুচে পড়া

কবির কারখানাই বলুন আর কবিতা'র কারখানাই বলুন, ত'র নাম লিটল ম্যাগাজিন। মাস স্কেলে কবিতা উৎপাদন এবং কবি উৎপাদন এই ছোটো পত্রিকার পাতায় পাতায়। প্রায় সব বইমনস্ক বাঙালির যৌবনেই একটা না একটা ছোট পত্রিকাকে একবার না একবার ছুঁয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসু যদিও পরে মত বদল করেছিলেন তবু তাঁর মনে হয়েছিল কবিতা বুঝি যৌবনেরই জৈব আনুষঙ্গিক এলিয়ট সাহেব ভেবেছিলেন উলটো—তাঁর মনে হয়েছিল পঁচিশ পার হয়েও যাঁর কলমে কবিতা স্বয়মাগতা তিনিই প্রকৃত কবি, পরিণত কবি। তৎপূর্বে কবি-অকবি সকলেই একটু আধটু কবিতাচর্চা করেন। অর্থাৎ বাঙালির একারই বদভ্যাস নয় কামনার উপুচে পড়াকে কবিতার বঁধুনি দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা। তাহলে তো সাহেবরাও কবির জাত। ঠিক বাঙালির মতই।

যতো ছোটো পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের আর কোনো ভাষাতে এতো বেশি লিটল ম্যাগাজিন নেই। এগুলির প্রধান উপজীব্য, কবিতা। ভারতবর্ষের আর কোনো ভাষাতে এতো অধিক সংখ্যক কবিতা ছাপা হয় বলে আমি জানি না। তরুণ বাঙালি হৃদয়ের দুর্দমনীয় নেশা এই কাব্যচর্চা। বুক থেকে কবিতা এবং বুক পকেট থেকে চাঁদা—এই দুটি বস্তু সাপ্লাই দিয়ে তরুণ কবিরা অক্লান্ত পরিশ্রমে রুগ্ন সন্তানের মতো যত্নে লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে সেবা করে বাঁচিয়ে রাখেন। গ্রামেগঞ্জে মফস্বল শহরের আনাচে কানাচে রীতিমত জমজমাট লিটল ম্যাগাজিনের গুচ্ছ গুচ্ছ কবিদল বেড়ে উঠছেন। অনেকদিন বাংলা কবিতা (এবং গদ্যও) কলকাতাকেন্দ্রিক ছিল, এখন কিন্তু সেটা বলা চলে না। বাংলা কবিতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে কবিতা-বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই। আমাদের বাড়িতে, প্রায় বছর আগের এক ডাকসাইটে মহিলা কবি বলেন, প্রায় দশ বছর ধরেই বলছেন—বাংলা ভাষাতে একটি কবিতা-নিরোধ প্রকল্প অত্যাবশক। বাংলায় হঠাৎ পোয়েট্রি এক্সপ্লোশান ঘটেছে নাকি, যা সংস্কৃতির পক্ষে পুপুলেশন এক্সপ্লোশনের মতই ভয়াবহ। কাব্যজননীর স্তন্যের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। ফলন বেশি, স্বাদ কম। বছর দশ-বারো আগে একটি ছোটো কবিতা পত্রিকায় এক তরুণ ঔপন্যাসিক মন্তব্য করেছিলেন, বাংলায় কবি যতো বাড়ছে কবিতা ততো বাড়ছে না। একথা এখনও অপ্রমাণিত হয়নি। যতো কবিতা পত্রিকা বাড়ছে কবি সম্পাদকও ততো বাড়ছেন, কিন্তু কবিতা কই? ভালো কবিতা চোখে পড়ছে কই? ক'জন নতুন কবি এসেছেন পাঠকের হৃদয়মন লুট করে নিতে? এই গুরুতর সমস্যাটি নিয়ে তরুণ ও প্রবীণ প্রতিটি কবিরই দুশ্চিন্তা করা কর্তব্য। কবিতার পাঠকরা এ নিয়ে দুশ্চিন্তিত কিন্তু বহুদিনই। তাঁরা বাংলা কবিতা পড়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। বাঙালির নেশা এখন বিদেশী কবিতার বই কেনা। কবি বাড়ছে, কবিতা বাড়ছে না, এই কারণেই কি কবিতা পিপাসুর চোখ এখন অন্য নদীর ঘাটে? এখন বাঙালিকে বুদ্ধিজীবী হতে গেলে বাংলা কবিতা না পড়লেও চলে। দু'দশক আগেও তা দুঃসহ স্পর্ধা বলে পরিগণিত হতো।

৬। কিন্তু অন্য ধারণা সম্প্রতি

এক সময়ে আমি সত্যিই ভাবতুম বাঙালির কবিতাপ্রীতি ব্যাপারটি অসামান্য এক জাতীয় সম্পদবিশেষ, —রাজটীকার মতো, প্রতি বাঙালি ললাটে যে শুভচিহ্নটি নিয়েই পৃথিবীতে আসে।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরেই ক্রমশ আমার ধারণাটা পালটে যেতে শুরু করেছে। শুরু করেছে এই সব লিটল ম্যাগাজিন পড়তে পড়তেই। "যৌবনে ভেবেছিলাম কবিতাই প্রেম...কিন্তু অন্য ধারণা সম্প্রতি।" বুদ্ধদেব বসুর "অন্য ধারণা" আর আমার "অন্য" ধারণা দুটি ঠিক এক নয়

BanglaBook.org

অবিশ্যি এক্ষেত্রে—কিন্তু আজ যৌবনের কবিতাও যে কবিতার প্রতি প্রেমমাত্র নয়, সেটা বোধহয় টের পাচ্ছি।

আজকের লিটল ম্যাগাজিনগুলি খুব মন দিয়ে পড়ে যা বুঝেছি, কিছু তরুণ-তরুণী আছেন আজও সেই ভূতগ্রস্ত কবিতাপাগল, কবিতা প্রেমিক, পাবলিসিটিতে নয়, শিল্প-প্রেমেই যাঁদের কবিতার পূর্ণতা। তাঁরাই ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্যের ভরসা, যদিও তাঁরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। আর কিছু আছেন যাঁদের "দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" এঁদেরই জন্যে কি বাঙালির 'সবাই-কবি' নাম? এঁরা অলস নন, অতিমাত্রায় শ্রমশীল, কিন্তু সব প্রয়াস খরচ হয়ে যাচ্ছে স্বনামপ্রচারে। শিল্প অনুশীলনের জন্য আর বাকি থাকছে না বিশেষ সময়। পাড়ার মাঠে খেলতে নামবার আগেই এঁরা যে ওয়ার্ল্ডকাপে খেলতে ব্যাকুল। বাংলাতে লিখতে না লিখতেই হিন্দি-ইংরিজি অনুবাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কবিযশের প্রতি এঁদের শীতল, অধীর ব্যবসায়িক দৃষ্টি। অথচ স্বপন সৃষ্টির প্রতি যত্নবান নন। কবিতা যে বড় ধৈর্যের ধন; এভাবে কি হয়? (তবে, "বলা যায় না ঠিক জায়গায় ঠিক মুরুব্বি ধরতে পারলে হয়তো আকাদমি পুরস্কারটা জুটেও যেতে পারে।" এ লোভ এখন সকলের। গদ্যে যখন সম্ভব হয়েছে, পদ্যে কেন হবে না?)

কবিতার ওপরতলায় উঠতে যে মই লাগে না দরকার শুধু রক্তপাতের, এটা তাঁদের বিশ্বাস হয় না। তাঁরা মনে করেন যুগ পালটাচ্ছে কবির স্ট্রাটেজিও পালটানো দরকার। তরুণতরদের মধ্যে এই উল্টো হিসেব দেখে মন বড়ো খারাপ হয়ে যায়। এমন তো কথা ছিল না? কেন এমন হল?

কলকাতা বইমেলা এক অত্যাশ্চর্য বঙ্গীয় অঘটন যা প্রতিবছর ঘটে একথা সারা ভারতে শুনি। 'কবিতা মেলাও' হয় এই কলকাতাতেই, 'বাৎসরিক কবিতা উৎসবের' জন্মস্থানও এই পশ্চিমবঙ্গ। কবীর-কবি সুভাষ বলেছেন কলকাতাতে 'কবিতা-দিবস' উদ্‌যাপনের প্রসঙ্গ উঠলেও নিশ্চয় কারুর আপত্তি হবে না। কেন, 'কবিতা-দিবস' তো উদ্‌যাপিত হয়ই কলকাতাতে! পঁচিশে বৈশাখ সকালবেলায় জোড়াসাঁকোতে আর রবীন্দ্রসদনে তবে কী হয়? অতো লিটল ম্যাগাজিন? ওতো কবিতার প্রতি বাঙালির প্রেমনিবেদন ভিন্ন আর কিছু নয়! এই ভালোবাসাতে খাদ নেই। বাঙালি জাত-কবি হোক না হোক, পঁচিশে বৈশাখ সকালবেলা বাঙালি যুবক-যুবতীরা কবিতা-সকাল উদ্‌যাপন করেন। কোনো একজন কবিকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি, এত ব্যক্তিগত ভালোবাসাবাসি, এ আর কোনো জাতে ঘটেছে কি? শেক্সপীয়ার কিংবা পুশকিন কারুর ভাগ্যেই জুটেছে কি? সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী কিংবা ইকবালের ভাগ্যেও জোটেনি কিন্তু।

কবি তো কোনোকালেই শুধু পটে লিখন নন, তিনি চিরকালই আলো হাতে চলেছেন আঁধারে যাত্রী, সুদূর নীহারিকার পথে। সেই অরণ্যের অন্ধকারে পাতালরাজ্যে পথভ্রষ্ট কবি দান্তের হাত ধরেছিলেন যখন ছায়াতনু মহাকবি ভার্জিল, তখন থেকে। নাকি ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে বাল্মীকি মুনির মুখনিঃসৃত ছন্দোবদ্ধ বাক্য থেকেই? সেই সত্য যা রচিবে তুমি। কাব্যের সত্যই জীবনের সত্য। যা ঘটনা-দুর্ঘটনার আপাত সত্যকে ছাড়িয়ে উঠে চিরজীবী হয়। কবি চিরদিন আলোর পাখি, সত্যের ঘোষক।

বাঙালি কবির জাত? বাঙালি কি সত্য খোঁজে? নাকি সে সত্যবিমুখ, কল্পনাবিলাসী? কবিত্ব কি কল্পনাবিলাসের অন্য নাম, আর সত্যের সন্ধানকে বলা হয় বিজ্ঞান? কল্পনা কি সত্যদর্শননয়? বিজ্ঞানেও কি কল্পনা চাই না? "কবিতা কল্পনালতা" কি মিথ্যারই চর্চা? তবে কি কিছু অসামাজিক, বাস্তববিমুখ, সত্যভীরু, কর্মভীরু, দায়িত্ব এড়ানো, মেজাজী, অপরিণতমনস্ক, অসংসারী, লাজুক অথবা দাম্ভিক (একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ) মানুষকে আমরা কবি আখ্যা দিয়ে থাকি বাংলাতে?

BanglaBook.org

কেন, বাস্তবধর্মিতা, পরিণতবুদ্ধি, সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সংযতস্বভাব, নেশাবিহীন, পরিশ্রমী, সৎ নাগরিক কি 'কবি' হতে পারেন না? 'কবি' কি তবে একটা নিন্দাশব্দ? 'কবি-কবি' তো নিশ্চয়ই তাই।

সংস্কৃতে 'কবি' বলতে এককালে ঋষিদের বোঝাতো, সত্যদর্শনের শক্তি যাঁদের ছিল। বাংলাতে 'কবি' বলতে সেইজাতের ব্রহ্মার অধিকার অর্জন করেছিলেন শুধু একজনই। তাঁকে বাদ দিলে বাংলা-সাহিত্যে চলতি প্রতিমায় কবির চেহারা কিন্তু ঋষিজনোচিত নয়। চিরকালই কথাটায় মেটানো ছিল এক চিল্তে ঠাট্টা। সোনালি ফ্রেমের মধ্যে উদাস দৃষ্টি, এলোমেলো লম্বা চুল, ললিত লবঙ্গলতা চলনবলন, আলুথালু ধুতি পাঞ্জাবি, বগলে (কবিতার) খাতা, লাজুক, —এই ছিল কবির স্টিরিওটাইপ। পথে-ঘাটে এই চেহারা দেখলেই 'কবি' শব্দটি মনে উদয় হবার কথা। হতে পারে তিনি কবি নন। তেজারতির ব্যবসা তাঁর। কিন্তু এই দৃশ্যের অনুষঙ্গ, কবিতার। প্রতিমাটির সঙ্গে কিছু মূল্যবোধও সেঁটে ছিল। অসংসারী, নির্ধন, উদাস। এখন প্রতিমাটি একটু বদলেছে। দৃষ্টি আর উদাস নয়, রাগী, সোনালি নয়, মোটা ফ্রেমের চশমা, ললিত-লাজুক নয়, দর্পিত চলনবলন, ধুতি নয় জিনস, বগলে খাতা নয় কাঁধে ঝোলাব্যাগে বই, উস্কোখুস্কো চুলদাড়িতে তেল নেই। ঠোঁটে ঝুলন্ত সিগারেট। কবি আজ 'মেয়েলি' নয়, ধমকে কথা কয় সে, যদিও এখনও বড় রোগা। পঞ্চাশের গুণ্ডা কবিরা মধ্যরাত্রে কলকাতা শাসন করেও কবির 'মাসলম্যান' ইমেজটি তেমন করে গড়ে দিতে পারেননি, 'বটলম্যান' ইমেজটিতে যেমন সার্বজনীন লাভ করেছেন। কবির গায়ে চিরকালই একটু মদের গন্ধ, একটু তামাকের গন্ধ আর একটু গোলাপের সুবাস লেগে থাকতো। আজকাল ফুলটুল বাদ গেছে। সঙ্গে থাকেন বান্ধবী স্বয়ং। কি আগে, কি এখন, কবি-প্রতিমাটির পুংলিঙ্গ। 'কবি' বলতে কোনো নারীর উদাস মুখ চট করে মনে আসে না। আসবে কি করে? মেয়ের 'প্র্যাকটিকাল' মেয়েরা 'মেটেরিয়ালিস্টিক' আর কবিরা ঠিক তার উলটো যে। কবি মানুষটি চিরকালই উদাসীন, উন্মনা, বোহেমের বটে, তবে কিনা বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি আবার একটু পরশ্রীকাতরও। অন্য সাহিত্য ক্ষেত্রের তো ভেতরের কেচ্ছা জানি না তেমন? আমাদের নিজেদের ঘরের ব্যাপার যা জানি আধুনিক যুগে, রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই বাঙালি কবি ঘরের কোন্দলে বড় পটু। যুগ যুগ ধরে কিছু না কিছু বাঙালি কবি একা একা অথবা দলবাজি করে সতীর্থদের নিন্দেমন্দ করেই চলেছেন। দুঃখের কথা প্রবীণদের মতো তরুণদের মধ্যেও জাতিবিরোধ প্রবল সমালোচনার নামে সদর্থক গদ্যের চেয়ে নঞর্থক গদ্যই বেশি চোখে পড়ে আজকের মফস্বলী লিটল ম্যাগাজিনে। উল্টোপক্ষে পরস্পর (দল-সাপেক্ষে) পৃষ্ঠকণ্ডূয়নের একটা প্রবণতাও স্পষ্ট নজরে আসছে। এ লক্ষণ শরবন গড়ে ওঠার। যদুবংশ, সাবধান।

আমরা যদি সত্যিই জাত-কবি হই তাহলে তো জাত-উদারও হবো? কবির বাস হবে সব নোংরামির ঊর্ধ্বে। শিল্পের সম্মানে কবিকে সত্যের অনুশীলনেই আত্মনিয়োগ করতে হবে, শিল্প-অতিরিক্ত দড়ি টানাটানির পঙ্কর্দমে সে নামবে কী করে? ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ বলার নিরপেক্ষ আত্মপ্রত্যয় না থাকলে শিল্পের সার্থকতা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় শিল্পীর মুক্তিও।

৭ ।। কবিতা, ফুটবল এবং মাছভাত

আমরা কি সত্যিই কবিতাঅন্তপ্রাণ? হজরত মহম্মদ বলেছিলেন দুটি পয়সা পেলে এক পয়সায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে আর অন্য পয়সাটি দিয়ে ফুল কিনবে। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সমাজে মহতের এই উপদেশটি দেবি অনাদিকাল থেকে নিষ্ঠা পালিত হয়ে আসছে, মুসলিম সমাজে ততটা

BanglaBook.org

হোক না হোক। চুলে ফুল না দিলে দক্ষিণী মেয়ের সাজ সম্পূর্ণ হয় না।

আসলে কথাটা তো ফুল নিয়ে না। কথাটা নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির। বাঙালির প্রত্যহের জীবনযাপনে কতোটুকু কবিতা আছে? আমি তো দেখি মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তান কবিতার চেয়ে ফুটবল বেশি ভালোবাসে, কবিতার চেয়ে মাছভাত ভালোবাসে, কবিতার চেয়ে ইমরান খানকে ভালোবাসে, কবিতার চেয়ে টেলিভিশন তার বেশি প্রিয়।

জোড়া ইলিশ মাছের বদলে, কিংবা ফুটবলের বড় খেলার টিকিটের বদলে জোড়া কবিতার বই দিলে বেশি খুশি হবে কি আমরা? বুকে হাত দিয়ে ক'জন বাঙালি কবিই বা একথা মেনে নেবেন নিজের কাছে?

তবে হ্যাঁ, বাঙালি ছড়া কাটতে ভালোবাসে। বাঙালির মতো ছড়া কাটায় ওস্তাদ জাতি ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় আছেন কিনা জানি না। আমরা গাঁয়ের বৃদ্ধাদের দেখেছি মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করতেও ছড়া কাটছেন, আবার ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে শাপশাপান্ত করতেও ছড়া কাটছেন। বাচ্চারাও কি ছড়া কাটায় ওস্তাদ কম? তারা ফুল পাড়তেও ছড়া কাটছে, কলমি তুলতেও ছড়া কাটছে। "ঘুলঘুলি লো সই/একটা বোড়োই খেলে দে রে, গোঁসাইয়ের নাম লই!" কিংবা পুকুরপাড়ে "কলমিলতা কলমিলতা/জল শুকোলে যাবি কোথা?" কলমিও বলছে, "লুকিয়ে থাকি মাটির তলে/লাবিয়ে উঠি বর্ষা হলে।" গ্রাম নাহয় বাদই দিচ্ছি, গ্রামের জীবনে ছড়ার ছন্দ হয়তো সর্বভারতীয়। কিন্তু বঙ্গসন্তানের নাগরিকতাও ছড়ার ছন্দে বাঁধা শহরে রাজনীতির দাদাদের তো আজও দেখছি জনসভাতে দিব্যি ছড়া কাটতে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারে দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়ার তো সচেতন প্রতিযোগিতাই পড়ে যায়। আমরা পথে পথে চানাচুর বিক্রি করে বেড়াই ছড়া কেটে, আবার বিল্ডিং কন্ট্রাক্টরিও বিক্রি করি হোর্ডিংয়ের দামী রংদার বিজ্ঞাপনে ছড় কেটে। এমনকি আমরা বিনা পয়সায় বিনা অজুহাতে, সর্বসাধারণকে নীতিজ্ঞানও বিতরণ করি ছড়া কেটে। যেমন ধরুন: দমদম বিমানবন্দর থেকে রেস্টেপে আসতে পিচের রাস্তার ওপরে চকখড়ি দিয়ে লেখা আছে:

"মন্দ কাজ করে প্রাণে ভয় হয় যবে/ 'হয়ে গেছে' বলে তাহা ঢাকিতে চাও তবে।" (পড়ে বুক শুকিয়ে যায়!) ভবানীপুরে একটা মেরামতির পাঁচিলে সযত্নে খচিত আছে: "প্রস্রাব করিবেন"। যথারীতি "না"টি মুছে দেওয়া। কিন্তু আর ঠিক নিচেই আরো যত্নকরে অন্য হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে: "করিলেই মরিবেন!"...বাঙালিই এটা পারে।

কিন্তু ছড়া কবিতা নয়। বাঙালিকে 'ছড়াকাটার জাত' বললে আপত্তি করবো না কিন্তু 'কবির-জাত' কথাটা হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে আজকের দিনে।

এই কবিতা বাতিক কি বাঙালির একারই? তামিল, মারবাড়ি, পাঞ্জাবী, সিন্ধী—এঁরাও কি আমাদের মতো কাব্যবাতিক গ্রস্ত নন? কি জানি! ধানে তো আসেনি তেমন কোনো নিন্দে। তবে হ্যাঁ, বাঙালির চেয়ে উত্তর ভারতের উর্দুভাষী সমাজের কাব্যপ্রীতি একটুও কম নয়। বরং প্রবলতর, বলা যেতেই পারে। কেননা তাঁরা সবাই লেখেন না, সবাই পড়েন। সবাই মজে থাকেন। যেকোনো সভাসমিতিতে (আড্ডাতে তো বটেই, পেটে দু'পাত্র সুরা পড়লে আর কথাই নেই) উর্দুভাষীদের শায়েরী আওড়ানো শুরু হয়ে যায়। দুর্দম তাঁদের শায়েরীপ্রীতি আরো দুর্দম তাঁদের শায়েরীস্মৃতি। বাঙালির এত কবিতা মুখস্ত থাকেনা, কেননা শায়েরীর মতো শ্লোকবদ্ধ দৃঢ়সন্নদ্ধ নয় তো বাংলা কবিতা বাঙালির খাদ্যাভাস, পোশাক, বেশভূষা, প্রাকৃতিক আবহাওয়া, সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিছুর সঙ্গেই উত্তর ভারতের উর্দুভাষীদের বিন্দুমাত্র মিল নেই অথচ এই কাব্যপ্রীতিতে এমন মিল হলো কেমন করে?

বোধহয় এত দোষ এই ভাষা দুটোর। ভাষা দুটোই হয়তো মূল অপরাধী। ওদেরই চরিত্রদোষে এই ভাষাভাষীদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে এক সম্বর বিস্ময়। ভাষা দুটোরই অণুপরমাণুতে

BanglaBook.org

রোম কূপে-কূপে কবিতা ফুটে আছে—এভাষ যাদের মাতৃভাষা কবিতার নেশা থেকে তাদের মুক্তি নেই। যে ভাষার বর্ণপরিচয়ে অকবি বৈয়াকরণই লেখেন "জল পড়ে, পাতা নড়ে" তার আর উপায় কী! আ মরি বাংলা ভাষা! ভাষার অন্তরেই যে ছন্দ, তার শিরাধমনীতে যে স্পন্দন, যে রূপ, যে মিল, যে মোহ, যে ম্যাজিক, তারই ছদ্মনাম কি কবিতা? উর্দুতেও, বাংলাতেও, সেই ছলনাই কি ভেলকি দেখায়?

৮।। এসেছে বনগাঁ থেকে কবি সম্মেলনপ্রিয় তিনটি তরুণী/একলরি কবি নিয়ে...

এত কবি সম্মেলন বেড়ে গেছে, এত আবৃত্তির আসর বসছে, গ্রাম-শহর তোলপাড় করছে বাংলা কবিতা, এপার বাংলা ওপার বাংলা এক হয়ে যাচ্ছে কেবল এই একটি কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে, অথচ মাঝবয়সী বাঙালিদের মধ্যে বাংলা কবিতায় একটা অ্যালার্জির ধাতও যেন নাড়ি ধরলেই টের পাওয়া যাচ্ছে। এককালে যাঁরা নিজেরা কবিতা লিখতেন, তাঁরাও কেউ কেউ অতি আধুনিক কবি ও কবিতা দেখলেই মারমুখী হচ্ছেন। ব্যাপারটা কী? জগৎ জুড়েই যেমন মধ্যবিত্তের সন্দেহবাতিক যে বেদে মাত্রেই চোর আর হাতসাফাইয়ে ওস্তাদ, এবং বেদেনী মাত্রেই স্বেচ্ছাচারিণী, তেমন তাঁদের বিশ্বাস যে ইদানীং কবিমাত্রেই মদ্যপ। নয়তো অসচ্চরিত্র, নিদেনপক্ষে চালিয়াৎ (এমনকি জালিয়াৎ হওয়াও অসম্ভব নয়), হয়তে সবগুলি গুণেরই ঝালোকিত সমন্বয়। মধ্যবিত্ত বাঙালি মনেও এ ধারণা সঞ্চারিত হয়েছে। বাঙালি কবিরা পাত্র হিসেবের কোনোকালেই যদিও পাত্রীপক্ষের কাম্য ছিলেন না, তথাপি একক রবীন্দ্রনাথের অনন্য উজ্জ্বলের বিভায় কবির পাশাপাশি একটি জ্যোতির্ময় দিব্য লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমাদেরই কার্যকরণের কৃপায় ভালোমানুষ হিসেবেও কবির বাজারদর হুড়মুড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। মাধ্যাকর্ষণের মতোএই নিয়তির টান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে বাঙালি কবির সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন। এবং পাঠকেরও কিছু সহযোগিতা চাই।

চিরকালই বাঙালি পাঠকদের মধ্যে অর্থবোধ বাঙালি লেখকদের মতোই প্রবল। আশ্চর্য একটা দু'মুখো মূল্যবোধ ইদানীং নজরে আসছে আমার। তরুণ কবির ঠাঁইটুকু মধ্যবিত্ত সমাজে যেমনই নড়বড়ে, প্রতিষ্ঠিত কবিদের আসন তেমনই ঝরঝরে, ঝলমলে। একদিকে সংশয়ের আলো-আঁধারি, অন্যদিকে রৌদ্র ঠিকরে পড়ছে। রৌদ্র, নাকি হ্যালোজনের ফ্লাডলাইট? রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের কবিদেরও কপালে মান-সম্মান কম জোটেনি। ফুলের মালা, মিষ্টির বাক্সো নিয়ে মুগ্ধ পাঠকরা ছুটে যেতেন কবিসন্দর্শনে। ঐকান্তিক ভালোবাসায় তাঁদের প্রণাম জানাতেন। সেসব কবিদের নাম আমরা মনেও রাখিনি। কিন্তু ইদানীং এত 'কবি সম্মেলন'-এর কৃপায় দিকে দিকে যে-দৃশ্য চোখে পড়ে, প্রেমোন্মাদে যেভাবে প্রিয় কবিদের ভক্তিভরে ছেঁড়ে গিয়ে আক্রমণ করেন ও পেড়ে ফেলেন তাঁদের তরুণ অনুরাগীরদের দল, যেন রাজকাপুর কিংবা রজনীশ, তাতে কে বলবে বাঙালি কবির জাত নয়? এই কবি-মত্ততা কিন্তু বাঙালি তরুণদেরই একচেটিয়া, যা দেখলুম। ঠিক এমনটি সারা ভারতে কোথাও দেখিনি। শুনেছি কেরালাতে খোলামাঠে দশ হাজার লোকের মধ্যে কবি-সম্মেলন হয়, অবশ্য চোখে দেখিনি, সেখানেও নাকি কবিদের নিয়ে কাড়াকাড়ি অভ্যাস নেই, বাংলায় যেমন আছে। কবিরা সাফল্য পেলে, বাংলাতে সুপারস্টার হতে পারেন (যদিও সফল না-হওয়া অবধি পর অতীব দুর্গম!)

কিন্তু এটাকেই কবিতাপ্রেম বলব কি না, জানি না। সত্যি বলতে কি, ভয় করে। মনে হয় কোথাও কী যেন একটা ফাঁপা জায়গা ঠন্‌ঠন্ করে বেজে উঠছে। কবিপ্রীতির মধ্যেও, কবিতার মধ্যেও, কে বলতে পারে, কবির মধ্যেও বাজে কি না? উন্মত্ততা দেখে সন্দেহ হয় এই ভক্তি কি বিশুদ্ধ কাব্যপ্রীতি" না কি কবিতার অতিরিক্ত কিছু? ক্যারিস্মার যোগবিভূতি? আমরা

BanglaBook.org

হুজুগপ্রিয় বাঙালি বলেই কি ক্রিকেট, ফুটবল, সিনেমা, রাজনীতি, ধর্মের মতোই কবিদের নিয়েও হুজুগে মাতি? এ কি প্রচারব্যবসায়িক 'স্টার-সিস্টেমের' ফল? নাকি এই-ই প্রকৃত প্রেম? আশা করব আমার সংশয় মিথ্যা। এটাই প্রেম। কবিতারই প্রতি আনুগত্য। উদ্যাপনার প্রতি নয়। এতই নিমজ্জিত হয়ে আছি আমরা অন্তরে অন্তরে কবিতার অন্তঃসুরভিতে, যে হয়তো আর আলাদা করে চিনেও নিতে পারি না তাকে। বাংলাতে দাদের মলমেও যে কবিতা থাকার চেষ্টা থাকে!

৯।। কানের ভিতর দিয়া মরমে

যুগটা অডিওভিশুয়ালের। কবিতা-পাঠ ও আবৃত্তি এখন প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পেয়েছে। নাটকের দলের মতোই আবৃত্তির গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে পাড়ায় পাড়ায়। নতুন একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলনের শাখা সৃষ্টি হয়েছে আবৃত্তি। আগেকার দিনে পাড়ার জলসায় আবৃত্তির ঠাঁই ছিল ঠিক বড় মাসিক পত্রিকার পাদপূরণে কবিতা ছাপার মতোই। নাচ-গান-থিয়েটারের মধ্যে ঢাইকেম। পাড়ার ছোট বাচ্চাদের মঞ্চে ওঠার সুযোগ দেওয়া, 'পঞ্চনদের তীরে/বেণী পাকাইয়া শিরে', 'বাবুদের তালপুকুরে', কিংবা 'ওরে আয়ে তুই নাকি কাল'। এখন ব্যাপারটা পালটে গেছে। রীতিমত ভাড়াকরা 'আর্টিস্ট' নিয়ে আসতে হয় 'আবৃত্তি' বা 'পাঠ' করতে। কবিতা ব্যাপারটার বাজারদর হয়েছে। শুধুমাত্র 'পাঠ' আর 'আবৃত্তি'রই একটা গোটা জলসার কথা আগে শোনা যেত না, এখন টিকিট কেটে লোকে কবিতা আবৃত্তি শুনতেই যায়। (শুনতে, নাকি দেখতে?) 'আবৃত্তির আসর' কিন্তু 'কবিসম্মেলন' নয়। এখানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা কবিতা লেখেন না। পড়েন। তাঁরা মূলত কবিতা ভালবাসেন, তাই আবৃত্তি করে অন্যদের কাছেও কবিতার ভালোবাসাটি পৌঁছে দিতে চান। যাঁরা কবিতা ভালোবাসেন ও তার আবৃত্তি শুনতে চান তাঁদের জন্যই শুরু হলেও এই আসর এখন ঠিক কবিতাপ্রাণ শ্রোতাদের কাছে বিশুদ্ধ ভালো কবিতাকে পৌঁছে দেবার দৌত্যকর্মে লিপ্ত নেই।

রেডিওজাত আধুনিকতম আবিষ্কার সাধারণ মঞ্চে 'শ্রুতিনাটকের' অনুষ্ঠানের মতোই হয়ে গেছে আবৃত্তি, নাটকীয়তা থাকাটাই জরুরি তার মঞ্চ সফলতার জন্য। প্রথমদিকে কবিতা-চয়নের মধ্যে সেই নিরিখটা অজ্ঞাতসারেই ঢুকে পড়ে হয়তো; যে কবিতা কানের ভিতর দিয়া শ্রোতার মরমে প্রবেশ করে মন-প্রাণ আকুল করবে সেই কবিতাই বেছে নিতেন পাঠক বা আবৃত্তিকার। আমাদের ছেলেবেলায় 'পাঠ'-এর চল ছিল না, মুখস্থ 'আবৃত্তি' করাই ছিল কবিতার কানুন। ক্রমশ আলস্য জিতে গেল। 'পাঠ' শুরু হল। 'পাঠ' করার সময় কবিতার শ্রুতিসাঙ্কেতিকতা নিয়ে সর্বদা ভাবা হত না, কিছুটা অন্যমনস্কেই পড়তেন পাঠক, যেন নিজের কাছে নিজেই। কিন্তু কবিতার আসর যখন ব্যক্তিগত ঘরের কোণের চা-মুড়ির পরিবেশ থেকে বেরিয়ে পড়ে টিকিট বেচে মঞ্চে গিয়ে উঠল, তখনই তার কবিতা-চয়নের নীতি বদল হয়ে গেল। তখন আর শুধু একমুঠো মুগ্ধপ্রাণ কবিতাপ্রিয়ের একক্রিয়াধর্মিতার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন এখন এক হলঘর পয়সা উশুল করতে চওয়া 'অডিয়েন্স'-এর মনোরঞ্জনের। শিল্পকে যে ব্যবসায়িক হলেই মন্দ হতে হবে তা নয়। গান তো ব্যবসাই। নাটকও। কবিতাই বা হতে চাইবে না কেন? কিন্তু এ কেন-র জবাব নেই। কবিতা হয়তো একটু লাজুক। হয়তো ঠিক জনসভার যোগ্য নয় সে, কি জানি!

আমাদের আর মোটেই অবাক হওয়া উচিত নয় যে এই অডিওভিশুয়াল যুগে কবিতার সঙ্গে আলোকসম্পাত হবে। সাইকেডেলিক লাইটিং হবে, ঢাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজবে, সে সেতারই হোক, তবলাই হোক অথবা ঝিনচাক বিভিতি জগঝম্প। এ তো হতেই পারে যে কবিতার মধ্যে

BanglaBook.org

সুপ্ত যে নৃত্যগীত ছন্দোময় পদাবলীকে অক্ষর ছাড়াও নানাভাবে খোলাখুলি সবকটা ইন্দ্রিয়ের কাছে বাইরে থেকে পৌঁছে দেবার একটা সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা করা হবে। শিল্পকে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট সহ্য করতে হয়। "যে আকাশের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি তাতে যেন আমার পুণ্য হয়" বলতে বলতে কবিতাও একদিন আবার কবিতার আপন ঘরটিতে ঠিক ফিরবে। ফিরবে, নাকি পৌঁছবে? আমি তো দেখছি ইতিমধ্যে লাইন টেনে নয় বৃত্তাকারে ঘুরছে—আগে কবিতা শোনাই হত, মহাকাব্য শুনে পুণ্যবান হতেন শ্রোতা। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সুর দিয়ে গাওয়া হত কবিতা—আজকে যেমন মার্কিনী কবি অ্যালেন গিনসবার্গ একটি ছোট্ট হারমোনিয়াম কোলে করে গান গেয়েই তাঁর কবিতা পড়েন। (বিপরীত, শঙ্খ ঘোষ দেখিয়েছেন কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান ছেঁকে কবিতা তুলে নিয়েছেন পরিণত বয়সে, উজান বেয়ে গিয়ে!)

কবিতা আবৃত্তির আসরগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কবিতার আরেকটু জনপ্রিয়তা বাড়ানো; কবিতাকে সকলের মধ্যে টেনে আনা। জানি না সেটা কতদূর সার্থক হয়েছে। জানি না এতে মানুষ বেশি বেশি কবিতার বই কিনছেন কিনা? (আবৃত্তি ইস্কুলের টেক্সট হিসেবে ছাড়া!) বেশি করে আপনমনে কবিতা পড়ছেন কিনা? নাকি সেজেগুজে 'ফাংশনে' যাওয়াটাই আসল। 'যে গানটা গাইতে পারে না, কবিতাও লিখতে পারে না, সে কবিতা আবৃত্তি করে'—এক তরুণ দুর্বিনীত অনেকদিন আগে চোখ টিপে আমাকে বলেছিলেন এক কবিতার আসরে। মনে মনে পড়ে কথাটা। বিশেষত যখন দেখি আবৃত্তির প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কবির অতি সাধারণ পদ্য 'ব্যবহার' করা হয় ভাল কবিতা বাদ দিয়ে। কোন্ কবিতা কবিতার নিরিখে কত ভালো, আবৃত্তির জন্য সেটা মাপকাঠি নয়, জনমনোলোভা হলেই হবে। জীবনানন্দের কি সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে তাই তরুণ কবির আন্দিসী ঢংয়ের মিষ্টি কবিতাই বাজারি আসরে বেশি মূল্যবান। যেহেতু তা মঞ্চে বেশি কলপ্রসূ। কাব্যরুচি তৈরি উদ্দেশ্যটা বদলে গেছে। এখন এখানে মনন নয়, শ্রবণই প্রধান। আপনমনে কবিতাপাঠের ক্রিয়াটি আলাদা, তাই অবেদন শুধু ইন্দ্রিয়ে নয়।

১০ ॥ কে তুমি পড়িছো বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে?

আবৃত্তির এই গরম বাজারদর কবিতার পক্ষে প্রথমটা খুবই আহ্লাদের হয়েছিল—কিন্তু প্রকৃত কবিতাপ্রেমীর পক্ষে এটা উদ্বেগের কারণও হতে পারে। কবিতা আর কবির মধ্যে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কবি আর তাঁর পাঠকের মধ্যেও সেই ঘনিষ্ঠ সঙ্গোপন দেওয়া-নেওয়ার যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কবি আর পাঠকের মধ্যে সেতু হয় কবিতা, এক রাসায়নিক প্রক্রিয়া কবি আর পাঠকের মধ্যে একাত্মতা ঘটিয়ে দেয়। কবি যে ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন তা কে জানতে চায়! পাঠক যা পড়তে চান, তিনি তাই পড়ে নিয়েছেন একাত্মতাবোধ তাতেও ঘটে। পাঠকের সহৃদয়তাতেই কবির এবং কবিতার সম্পূর্ণতা।

কিন্তু মধ্যপথে এসে দাঁড়ান আবৃত্তিকার। তিনি তাঁর মতো করে কবিতাটি বুঝিয়ে দেন। আবৃত্তি এক ধরনের ব্যাখ্যা তো বটে? পাঠের ধরনে, বাচনভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরের ওঠপড়ায় কবিতার যে বিশেষ অর্থব্যঞ্জনা তিনি ফুটিয়ে তোলেন, সেটাই পাঠকের হৃদয়ে অদ্বিতীয় হয়ে ছাপ ফেলে যায়। কবি তো কেবল শীতল ছাপার হরফের নিরপেক্ষ পর্দায় তুলে ধরেছিলেন তাঁর বলবার কথাটুকু। পাঠক তাঁর আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের মতো করে বুঝে নিতেন যা বোঝার। সম্পর্কটা গড়ে উঠত সোজাসুজি দুজনের মধ্যে। আবৃত্তিকার এসে পড়ে কবিকে অংশত মুছে দেন। কবির কণ্ঠস্বরের বদলে শ্রোতার কাছে পৌঁছয় আবৃত্তিকারের কণ্ঠ। নাটক দেখার পরে দর্শকের মনে বেঁচে থাকেন যেমন অভিনেতাই, নাট্যকার নামেমাত্র, ঠিক তেমনিই পাঠক এবং কবির মধ্যে এসে দাঁড়ান জনপ্রিয় আবৃত্তিকার। জয় করে নেন শ্রোতাকে তিনিই এখানে খেয়াল

BanglaBook.org

করতে হবে যে গান, গীতিকার, গায়ক ও শ্রোতা, এবং কবিতা, কবি, আবৃত্তিকার ও পাঠক এঁদের ভূমিকাগুলি কিন্তু একেবারেই তুলনীয় নয়! গায়ক প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করলে ছাপার হরফে গান গানই নয়। গায়কই তাতে সুরের সোনারকাঠি ছোঁয়ান। কবিতা তা নয়। কবিতার পাঠক আছেন। গানের শুধুই শ্রোতা, গায়কই সেতু বাঁধেন গীতিকার ও শ্রোতার মধ্যে। আবৃত্তিকার কিন্তু শুধু সেতুই নয়, কখনও কখনও অনিচ্ছাকৃত দেওয়ালও গড়েন। আজকের কবিতা পঠনের জন্য। সভাশোভন না হলেও সে প্রাণবন্ত। আবৃত্তিকার মধ্যস্থ হয়ে কবিতাতে একটি অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করেন। তাতে অতিরিক্ত সরলতা অথবা জটিলতা সৃষ্টি হবার সুযোগ ঘটে। পাঠকে-কবিতে যে নির্জন নিজস্ব ঘনিষ্ঠতা, শ্রোতাতে-কবিতে ঠিক সেটা ঘটে না কবির স্বকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি শোনা কিন্তু একেবারেই অন্য জাতের মহার্ঘ অভিজ্ঞতা। এই কারণেই 'কবিসম্মেলন' শিল্পের খাতিরেও মহা মূল্যবান। কবি স্বয়ং তাঁর কবিতার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আবৃত্তির মাধ্যমে। শ্রোতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তাঁর স্বকীয় মূল ভাষাটি, সোজাসুজি

প্রায়শই মঞ্চসফল পেশাদার আবৃত্তিকারেরা সপ্রেমে, সবিনয়ে কবিদের অনুরোধ জানান তাঁদের জন্য মঞ্চে পাঠোপযোগী, আবৃত্তিযোগ্য কবিতা লিখে দিতে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই বোধহয়, অনেকদিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে লোধার লুংজে সাহেবকে বলেছিলেন যে বাঙালি কবিরা এখন দু'ধরনের কবিতা লেখেন, কবি সম্মেলনে জমিয়ে পাঠ করার উদ্দেশ্যে এক জাতের আর বিজন পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশে আরেক জাতের।

বাংলায় এই শেষ জাতের কবিতার মান ক্রমশই নেমে যাচ্ছে, এ নিশ্চয়ই পাঠক শীর্ষেন্দুর অভিযোগ ছিল বলে আমার বিশ্বাস। হাটে মাঠে বাটে বিকিয়ে যাচ্ছে কবিতা, জনমনোরঞ্জনে নেমেছে কবিতা, কোথায় গেল তার গোপন লাস্য? যা ছিল শুধু অক্ষরের মোহিনী আড়ালে লুকোনো, এক পাঠকের জন্য?

BanglaBook.org

১১॥ করেছি ভুল কিছু বটে!

কবজোড়ে আরও একটি দুর্বিনীত নিবেদন। মনুষ্য সমাজে কর্মের মূল্য যদি অর্থ দিয়ে যাচাই হয় তবে কবির কর্মের কোনো দাম নেই। সবচেয়ে সস্তা শিল্প কবিতা। তারও চেয়ে সস্তা কবি নিজে। কবির সময়েরকোনো দাম নেই। গাইয়ে অন্যের লেখা, অন্যের সুর দেওয়া গান পুনরুচ্চারণ করে দক্ষিণা নেন। আবৃত্তিকারও অন্যের লেখা কবিতা মাইকের সামনে আবৃত্তি করার নিমন্ত্রণ বিনামূল্যে গ্রহণ করেন না। একমাত্র স্বরচিত কবিতা পড়তে কবিকুল "হেথা হোথা আনমনে" সদাসর্বদাই ছুটে যান। দক্ষিণার প্রশ্ন কেউ তোলেন না না আমন্ত্রণকর্তা, না কবি। দুএকটি বেসরকারি ঘটনা ও সরকারি কবিসম্মেলন বাতীত, কবিসম্মেলনে ইলেকট্রিশিয়ান, চা-ওলা, শতরঞ্চি-ওলা সকলেই তাঁদের সহায়তার জন্য অর্থমূল্য পান—একমাত্র কবিকুলই পান না

এঁরা যে সবাই পেশাদার। গায়ক, বাদক, দোকানদার, ঠিকেদার। কিন্তু ছি ছি কবিত্বের সঙ্গে পেশাদারির কেমন একটা বিরোধ আছে না? চাঁদের আলো কি বিল পাঠায়?

কিন্তু কবি চাঁদের আলো নন। কবিতা কবির অতি কষ্টার্জিত শিল্পকর্ম। শুধুই নেশা নয়, কবিতা লেখাই কবির পেশাও। জীবিকা নাও হতে পারে। সে তো গায়ক, পাঠকদেরও অন্যান্য জীবিকা থাকে। পেশাদার শিল্পী কিন্তু কবিও। এটা কবি ও পাঠক দুজনেরই স্মরণ রাখা উচিত সুখের বিষয় আবৃত্তিকারেরা 'তু' করলেই ছুটে যান না আমাদের মতো। আমরা কবির আপন কর্মকে যথেষ্ট মর্যাদা দিই না, যথেষ্ট মূল্য দিই না কবিতাকে; তবু ভালো যে আবৃত্তিকারদের কল্যাণে আজ কবিতারও কিছু অর্থমূল্য নির্দিষ্ট হয়েছে বাজারে।

কবি যখন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে নিজের কবিতা নিজেই পড়তে স্বীকৃত হয়েছেন, স্বভাবতই

তাঁর তো আবৃত্তিকারের চেয়ে অধিকতর সম্মানমূল্য পাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। জাত-কবি বাঙালি যদি কবির কর্মকে সম্মান করত, কবিতাকে সঙ্গীতের মতো সামাজিক মর্যাদা দিত, তাহলে "কবিসম্মেলনে"র আয়োজকেরাই সেই ঐতিহ্য নিজে থেকেই স্থাপন করতেন। স্বকণ্ঠের কবিতা শুনতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই কবিকে সম্মানমূল্য দেওয়া অবশ্যকর্তব্য মনে হত। কবিকে চাইতে হবে কেন? পৌরোহিত্য, পুরস্কারদাতৃত্ব, প্রধান আতিথ্য গ্রহণ ইত্যাদি কষ্টকর অকর্মের জন্যও কবির নষ্ট সময়ের অর্থমূল্য নির্দিষ্ট থাকা উচিত। কবি বক্তৃতা দিয়ে বা কবিতা পড়ে, মালাচন্দন ছড়াও কিছু উপার্জনা করবেন এটাই স্বাভাবিক। দোষ সবটাই পাবলিকের নয়, অনেকটা দোষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। সেই যে তিনি ঠিক করে দিয়ে গেছেন কবির "পুরস্কার"—"ওই ফুলমালাখানি..." সেই থেকেই সবর ধারণা হয়েছে, —"ওই ওতেই হবে!" তাঁর মনেপ্রাণে জমিদারি ছিল, তিনি বলতেই পারেন!

"কিন্তু অর্থমূল্যে কবির মূল্য কেনই বা যাচাই করব আমরা," বলে কোনো কাব্যময় তাত্ত্বিক লিটরেচে আমি যাবো না। বর্তমান সমাজে "ফুলমালা"র সম্মান যে কত, তা নিয়েও আলোচনায় অবতীর্ণ হব না। তবে কবিকে আজ নিজের সময়ের সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করতেই হবে। মূলত এর দায়িত্বটা ছিল কিন্তু অবশ্যই কবিতাপ্রেমিক শ্রোতা-পাঠকের। আর সকলকেই কাজের জন্য যখন মূল্য ধরে দেওয়া হচ্ছে, কবিকে বিনামূল্যে খাটিয়ে নেওয়া হবে কেন?

কবি-সম্মেলনের আয়োজকদের এর পরে কবিদের আনতে হলে শুধু মালাচন্দনই চলবে না, নগদ কবি-দক্ষিণা চাই। অন্যান্য আর সব শিল্পীদের মতোই কবিরও সময় মহার্ঘ। জগতের নানান দেশে ঘুরে দেখলুম সর্বত্রই কবিদক্ষিণা দেওয়া নিয়ম। বাংলায় ছাড়া আমরা যে জাত-কবি! (কবির ছড়াছড়ি! যে টাকা চাইবে, তাকে বাদ দিয়ে, যে চাইবে না তাকেই ডাকবে। অমন ঢের পাবো!)

১২ ॥ আমাদের গোলাপ বাগানে গদ্যের বাহিনী

উমবেরতো একো লিখেছিলেন, আলগা ট্রাউজার্স পরার মেজাজের সঙ্গে টাইট জিন্স পরা আঁটসাঁট মেজাজের প্রভূত পার্থক্য আছে। আমারও তো মনে হয় বাঙালির চরিত্রের পোশাক-আশাকের বদলের সঙ্গে একটা গভীর পরিবর্তন আসছে, এসেছে, যেটা বাঙালি মানতে চাইছে না। কবিতা-মেলা বসেছে, কবিতা আবৃত্তির আসর জমে উঠেছে, কবিতা-পত্রিকার সংখ্যাও দিনে দিনে কালকেতুর মতোই বাড়ছে, কিন্তু কবিতা কোথায়? সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার কটি কবিতা মনকে স্পর্শ করে? 'কবিতা' পত্রিকা ত্রিশ বছর উঠে গেছে। 'কবি ও কবিতা' উঠে গেছে তিন চার বছর। আর নেই 'কৃত্তিবাস' 'কয়েকজন', 'অলিন্দ' কত আর নাম করব? নতুন কাগজও অবশ্য এসেছে 'সংবেদ', 'বিভাব', 'পমা'। টিমটিম করে চলছে 'একক', 'কবিপত্র'। কবিতা ভালোবেসে যাঁরা লিটল কাগজ বের করতেন যে-সব আঁতুড় থেকে বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠিত কবিরা প্রসূত হয়েছেন সেইসব কাগজ মুছে যাচ্ছে, যুগটা যে গদ্যের। কবিরা হয়ে উঠছেন গল্পকার, ঔপন্যাসিক সঙ্গে সঙ্গেই: "পদ্যের শরীর থেকে অনিবারণীয়ভাবে/উঠে আসে গদ্যের দুর্গন্ধময় লাশের আঘ্রাণ।" লাইক আজাদের এই মন্তব্য বাংলাদেশের পক্ষে কতটা সত্য জানি না তবে পশ্চিমবাংলার পক্ষে নিদারুণ সত্য। গদ্য লেখার মান যে উঁচে উঠে যাচ্ছে, সেকথা বলা যাবে না, কিন্তু কবিতার মান নেমে যাচ্ছে, বলতে কোনো বাধ নেই। বড় কবিরা কার্যত ক্রমশ ছোট কবি হয়ে যাচ্ছেন, অথচ ছোটো কবিরা বড় কবি হচ্ছেন কই? কবিতা এখন বাঙালির অন্তর্জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত একটি প্রাকৃতিক শক্তির মতো কাজ করে না আর।

আমাদের জীবনের সঙ্গে শিল্পসৌকর্যের যোগ কতটুকু? কবিতা তো একা নয়। জীবনের

BanglaBook.org

যে সুকুমার দিকটিকে কবিতা আলোকিত করে, হৃদয়মনের যে স্পর্শকাতর কোমল সূক্ষ্ম তন্তুগুলির বুননে কবিতার সৃষ্টি হয় (আমি যে চাঁদ ফুল বসন্ত বাতাসের কথা বলছি না তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন) সেই দিকটিই কি বাঙালি জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে না? যে বিশেষ গুণ বা দোষটির জন্যেই বাঙালি তার 'কবি' বদনাম, কি 'অতিরোমান্টিক' দুর্নামটি কিনেছিল, সেই দিকটি আর বাঙালির জাতীয় চরিত্রে প্রাধান্য পায় না। তুচ্ছ হতে হতে মুছেই গেছে প্রায় বলা যায়। বাকি আছে শুধু 'অড্ডা'টুকুই। যা আলস্যপ্রসূত।

আজকের বঙ্গসন্তানের একটা আতিরিক্ত সমস্যা এই অন্তর্বিরোধ। "আমি-কবি", "আমি-রোমান্টিক", "মরামরা" উচ্চারণের মতো বাঙাল নিজেকে নিজে এই অটোসাজেশন দিয়ে চলেছে বটে কিন্তু কার্যত বাঙালি আর কবি নেই, রোমান্টিক নেই। বাঙালি এখন শ্রমবিমুখ অথচ অর্থলিপ্সু, মননগর্বী অথচ বহির্মুখী। বাংলা কবিতা লিখে উচ্চাশী তরুণ কবিটি একদিন পণ্ডিয়াক গাড়ি চড়ি করেছিলেন—সেদিন সেটি ছিল অবাস্তব। বাঙালি কিশোরের উদ্ভট কবিকল্পনার চরম দুর্ধর্ষ চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এখন আর ব্যাপারটা আজগুবি নেই, বরং শুদ্ধ কবিতাই ক্রমশ অবাস্তব কবিকল্পনার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাঁরা মারুতি চড়েন, তাঁরাই কবিতাও লেখেন। এ আর এমন কি? তবে, না শুধু কবিতা লিখেই তাঁরা মারুতি চড়েননি।

আমরা বাঙালিরা নিজেকে ভাবতে চাই চিরকবি, চিরপ্রেমিক, চিরবিপ্লবী, চিরতরুণ, চিররোমাঞ্চিত রোমান্টিক—ভাবতে চাই সূক্ষ্মরুচির ও সুকুমার শিল্প অনুভূতির সর্বস্বত্বাধিকারী, পরিপূর্ণ আত্মিকবোধের তাড়নায় পরিচালিত, মানসগগনবিহারী। অতএব বাঙালির তুলনায় অন্যান্য প্রদেশের বুদ্ধিমান মনুষ্যগুলি, জীবনে যাঁরা বিষয়-সম্পত্তি করে ফেলেন, তাঁদের স্থূলবুদ্ধি, পুঁজিবাদী, মুনাফাখোর, বিষয়বুদ্ধিতাড়িত নেহাৎ নিকৃষ্ট জীব, কিঞ্চিৎ অসংস্কৃত প্রাণী মনে করে সান্ত্বনা পেতে চাই আমরা অথচ এই যে – "চারিদিকে সবে বাঁটিয়া লইছে / আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া" আমরা তাতেও শান্তি পাচ্ছি কৈ অর! তাঁদের মতো হীনমন্যতাই কি তবে আমাদেরও প্রকৃতপক্ষে কাঙ্ক্ষিত ছিল? কিঞ্চিৎ পরাজিত, পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েছি কি আমরা? অথচ জনকবির তো ছিল উদার এবং মহৎপ্রাণ হবার কথা!

কবিতা এখন বাঙালির হৃদয়ে মনে স্বপ্নে জাগরণে কোথাও নেই। কবিতা এখন লো-কেসে সাজানো কিউরিয়ো। "গদ্যে গদ্যে ভরে যাচ্ছে আমাদের পানাপুকুর থেকে শুরু করে / বঙ্গোপসাগর অবদি জলের সংসার।" আর চেখের মধ্যে মৃত স্বপ্নের শবদেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঙালি

১৩।। মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়

ধুতি পাঞ্জাবি চাদর পরা বাংলার মাস্টারমশাইরা আমাদের কিশোরদের আদর্শ নন, দামী সুটিংয়ের কবীর বেদী হতে চায় তারা। আমাদের তরুণ-তরুণীরা শর্মিলা-পতৌদির মতো হতে চায়, জয়দেব-পদ্মাবতীকে তারা চেনে না বিজনেস এক্সিকিউটিভ, ফিল্মস্টার বা প্রথম শ্রেণী স্পোর্টসম্যানের জীবনই অধিকাংশ বাঙালি তরুণ-তরুণীর আদর্শ বললে কি ভুল করব? এঁদের কি ঠিক কবির-জাত বলে ভাবতে পারছি?

ধুতি পাঞ্জাবির ঝলঝলে পোশাকে স্বপ্নদ্রষ্টা বাঙালি তরুণ হয়তো ছিল না চটপটে, পারত না সে গোখা কি শিখেদের মতো বেতনভুক সৈনা হয়ে লড়াই করা, (অনায়াসেই প্রাণ দিতে পেরেছে গুলির সামনে যদিও নির্ভয়ে, কেন না সেটাও স্বপ্ন দেখার ফল; বিনি পয়সার যুদ্ধে বাঙালির তুলনা নেই!) ধুতিপাঞ্জাবির 'ভেতো' বাঙালি ভালো নাচতে একটুও পারত না, কখনও নয়, কথাকলিও নয়, সে পারত বাঁশি বাজাতে, গান বাঁধতে, ছন্দ গাঁথতে, স্বপ্ন দেখতে। "খর হড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে" যে গৃহহারা পূবে হাওয়া, বাঙালি তরুণ ছিল

BanglaBook.org

তারই অস্বীকার দোসর।

সে বাঙালি তরুণ এখন কোথাও নেই।

১৪ ।। নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে!

কবি যতই বাড়ুক বাংলায় প্রকৃত কবি এখন সংরক্ষিত প্রাণীর তালিকায় উঠেছেন। কবিতা সত্যিই সরে গেছে বাঙালির জীবন থেকে। কেন সরে গেল কবিতা? কার দোষে? সে কি বাঙালির বাঁচার ধরন, উচ্চাশার চরিত্র, তারুণ্যের আদর্শ বদলে গেছে বলে? নাকি কবিতাও কমল সরে গিয়েছে বিচ্ছিন্নতার দিব্য সর্বনাশে? কোথায় সেই বহুদূর হৃতজগতের অংশগুলি? কবিতা কি আর তবে মানুষের বুকের ভিতরটা নিজেকে নিজে বুঝিয়ে দেবার কাজে লাগে না? সে কি উচ্চাসনে বসে অচেনা পোশাকে রহস্যময়ী সেজে চোখে চোখে কথা কইছে কেবলই কবিদের সঙ্গে? কোথায় কবিতার সেই জ্যোৎস্নাজড়িত নিশা? কবিতা তুমি কি এখন কিছু স্বপ্ন, খানিকটা স্মৃতি? বাঙালি কবি কবিতার স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছেন কি? কবি, তুমি পথ হারাইয়াছ? কবিতা ধ্যানস্বরূপা। কবিতা রক্ত চায়। কষ্টার্জিত এই কবিতার মুখ। মিলের বাঁধন খুইয়ে আধুনিক কবিতা সরল হয়ে যায়নি, জটিল হয়েছে।

"বাঙালি কবির জাত" নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হবে বলে আমি উদ্বিগ্ন শুনে আমার এক তরুণ বন্ধু একমুখ ধোঁওয়া উড়িয়ে বললেন, "কেন? এ আবার কঠিন বিষয় কেন? বাঙালি কবির জাত না-ই হল, ব্যর্থ কবির জাত তো বটে? অনেক দুঃখেই জীবনানন্দকে লিখতে হয়েছিল, 'সকলেই কবি নয়।' শতকরা নব্বুইজন বয়স্ক বাঙালিই ব্যর্থ কবি, বাকি দশজন ব্যর্থ আর কিছু!" বেশ তো। তাই-ই যদি হয়, কবিতাকে এতো ভালোবেসে কবিতার ব্যর্থ প্রেমিক হয়ে বাঙালি কী অর্জন করেছে? কোন্ সে চরিত্রবল? কোথাও আছে কি সেই নিভৃত নীল পদ্মের ইশারা? ভিতরে আছে কি কেউ? রক্তের ভিতরে কেউ আছে?

পরিণত বয়সে পৌঁছে এলিয়টকে বলতে হয়েছিল কোনো সত্য কবিই তাঁর কাব্যের চিরন্তন মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন না, তাঁর সমগ্র কবিতাই সে ব্যর্থতার বাধনময় ভ্রষ্ট হল না—তা কে জানে? বাঙালিকেও কি পিছনে ফিরে একবার তার প্রিয় কবি-প্রতিমাটির দিকে সত্যদৃষ্টিতে তাকাতে হবে না? ভাবতে হবে না, এখন কি তবে—"বিবাগী ভ্রমর ওড়ে, পাখা নাড়ে, তারপরে আর কিছু নেই?" নাকি সে অতিতরুণ কণ্ঠে ঘোষণা করে উঠবে—"প্রথাবদ্ধতার ঋণ অতিক্রম করে যাবে এ বসন্তে আমার কবিতা?"

এজরা পাউণ্ড চেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর কবিতা হবে গ্রানাইটের মতো কঠিন। তার প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকবে তার অন্তরাত্মার সতো আবেগমুক্ত, ঋজু, কঠোর সন্ন্যাসীর মতো নির্লিপ্ত হবে তার বহিরঙ্গ। ওদিকে পাস্টেরনাক বলেছিলেন লেখার মূল্য নির্ভর করছে বিষয়বস্তু চয়নের ওপরে নয়, লেখকের সঙ্গে সেই লেখাটির সম্পর্কের গভীরতার ওপরে। প্রকাশভঙ্গির অন্তরঙ্গতার ওপরেই লেখার গুরুত্ব এবং সার্থকতা নির্ভরশীল। অবশ্য প্রসঙ্গ ছিল গদ্য।

তাঁরা মহাকবি। তুচ্ছ পাঠক আমার তো মনে হয় কবিতাকে সন্ন্যাসী হতে হবে না, প্রেমিক হতে হবে। সত্যসন্ধ, আর বিশ্বস্ত প্রণয়ী। কবিতা পড়ে আমি কী চাই? কবিতা লিখে আমি কী চাই? আমি চাই একটি স্পর্শ। চাই হাতের মধ্যে আর একটি হাত ধরতে। যিনি আমার কবিতাটি এখন পড়ছেন, তাঁর পাশটিতে ঘেঁষে বসতে চাই, আমার নিঃশ্বাসবায়ু তাঁর শরীরে লাগুক, আমি চাই। বিপ্লবই হোক আর বসন্তই হোক, যাই আমার কবিতার বিষয় হোক, আমি চাই পাঠকের উষ্ণ বুকের ছোঁয়া। অর্থাৎ আমার কবিতাটি পড়ে পাঠকের যেন এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর নিজের কথাই মনে পড়ে যায়। আমার কথা নয়। আমার কবিতাটি যেন তাঁর

BanglaBook.org

হয় আজ দু'হাজার খ্রীষ্টাব্দের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমার বলতে ইচ্ছে করছে—কবিতা, তোকে খুব সহজ হতে হবে আর খুব শক্তপোক্ত। ঋজু আর ক্লান্ত। হবি মমতাময়ী, কিন্তু এলিয়ে পড়লে চলবে না। দিনকাল বড় কঠোর, বড় জটিল। চারদিকে বড় অপ্রেম। কবিতা তুই শক্ত হ'। আরও গভীর করে ভালোবাসতে শেখ। তোকে দেশ উদ্ধার করতে হবে না, মানবাত্মার মুক্তি ঘটাতে হবে না, উৎক্ষ জটিল বিদ্যেবুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হবে না তোকে, কেবল মানুষের বুকের কাছে ঘেঁষে বসতে হবে। তার হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিতে হবে। বাংলা কবিতাকে আজ বাঁচাতে পারে কেবল সৎ কবিতাই। উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্। অবশ্য সৎ কবিতা যে কী, তা নিয়ে অনেক ধরনের মত থাকাই স্বাভাবিক। আমারটি তাদের মধ্যে একটি মাত্র।

অবিষহী বাঙালি একদিন অন্তর্জগতের বাসিন্দা হতে পেরেছিল। তখন কবিতা হয়েছিল তার আত্মার প্রতীক। এখন আছে শুধু তার স্মৃতি, তার সৌরভ আর তার অহঙ্কার। সেই অন্তর্জগৎ আর আমাদের আয়ত্তে নেই। কোথায়, কেমন করে পেতে দেবো সেই আঁচলটুকু আমরা, কবিতা যার ওপরে রাখতে পারে তার চরণ? আমাদের সর্বাঙ্গে এখন ব্লু জীনসের পোশাক। বাঙালির বাস এখন বহির্বঙ্গে। বাঙালির মনপ্রাণ ছেয়ে রয়েছে মাছ আর মাংসে। সেখানে কবিতার ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই ছোট এ তরীটি যে বিজ্ঞাপিত আদর্শের সোনার ধানেই ভরে গিয়েছে আর মুখ নয়। জগৎ সুদ্ধ আর সকলের মতোই 'ভেতো' বাঙালিও এখন স্তব্ধ বড়।

আমরা আজ বাস করছি বিজ্ঞাপনের জগতে। এই জগৎটি আমাদের কাছে এখনও অভিনব বলেই একটু যেন বেশি মোহন—কাগজ, রেডিও, সিনেমা, টিভি—সবই আমাদের নয়নকে, শ্রবণকে, মননকে, ইচ্ছাকে, স্বপ্নকেও নিয়ন্ত্রণ করছে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের পৃথিবী কবিতার পৃথিবী নয়। বিজ্ঞাপন আমাদের চোখ টেনে নেয় বাইরে দূরে। বিজ্ঞাপন বাঙালিকে উন্মুক্ত বিশ্বের নাগরিক করে দেবার আশ্বাস দেয়।

কবিতা অন্তর্লোকের। যে যাই বলুক আমার গভীর বিশ্বাস অবগুণ্ঠনবতী, অন্তর্জগতের বাসিন্দা কবিতাই পারে মানুষকে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের অক্ষয় পরমাণু করে দিতে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অক্ষয় পরমাণু হতে চায় কে? যে চাইবে, —"সে জন পাগল পরাণ বিকল/ভবকূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল", সে শুধুই কবি।

কবিতা নিয়ে তবুও বাঙালির এত কষ্ট কেন? "কবিতার পৃথিবী ছোটো নয়" বাঙালির বুকের ভিতরে, খুব ভিতরে কোথাও এমন একটা নিশ্চিত, অমোঘ সংবেদ কি রয়েই গেছে? তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে?

শ্রীমতী প্রাবন্ধিকা তো এত পৃষ্ঠা লিখলেন। সম্পাদকের আক্রমণ নানাদিক থেকে বাঙালি জাত-কবি কিনা এই প্রসঙ্গটি উল্টে পাল্টে দেখার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু শ্রীমতী কবি এক্ষেত্রে কী করতেন? চার লাইনের প্রবন্ধ শেষ হয়ে যেতো যদি গোড়াতেই কবি-বন্ধুটিকে উদ্ধৃতি করতুম—

"ছোটো নয়, ছোটো নয়",—এই কথা হাওয়া বলে গেলো
"ছোটো নয়, ছোটো নয়",—এই কথা দু'একটি
মানুষ শুধু বুঝতে পেরে
কবিতার বই কিনে, বাড়ি চলে এলো।
বিশাল রঙিন বল অন্ধকারে গড়িয়ে গড়িয়ে আসে
মাটির ওপরে॥

যাঁদের কবিতার পঙ্‌ক্তি ব্যবহৃত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রফিক আজাদ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, কৃত্তিবাস রায়, বিবেকানন্দ, নজরুল, সুকুমার রায়, রামমোহন রায়, বিদ্যাপতি।

ওরা আর আমরা

মন খারাপ? মন তো খারাপ হবেই। ওদের কথা আর ভাববেন না। ওদের কথা ভাবতে গেলে দিনটাই মাটি। দিনকাল এমনই। যেদিকে চাইবেন, দেখবেন ওরাই কাজ গুছোচ্ছে। ওরা স্মার্ট, ওরা পরিশ্রমী, ওরা আইনকানুন সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল, ওরা ট্যাক্স বাঁচাতে কী কী কিনতে হয়, কোন তারিখে কিনতে হয় সব জানে। ওরা অনাদ্যনন্তকাল ধরে জীবনে উন্নতি করে যাওয়ার জন্য জান দিতে প্রস্তুত। ওরা কিছুতেই পিছপা নয়, ওরা কাউকে ভয় পায় না কেননা ওরা ওপরতলার সবাইকে চেনে, সে যে-কেউই সিংহাসনে বসুক না কেন। ওরা প্রত্যেকের হেঁশেলের সুড়ঙ্গপথের সুলুক সন্ধান রাখে, কে কোনটা ভালবাসে, কার কখন কী দরকার, কে কাকে দেখতে পারে না, কাকে কী বললে কাজ হবে, ওরা অন্তর্যামী হয়ে সর্বস্ব জেনে বসে আছে। ওরা সব পারে।

আপনি আমি যা পারিনি ওরা তা পারছে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমরা বৃথা হিংসে করব না, মিছিমিছি নিন্দেও করব না, বরং পারলে আসুন আমরা ওই করিৎকর্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। সাধ্যমত। (তদ্দুর উনুন অবধি না এগুলেই হল।) মহামতি টলস্টয় বাহাত্তর বছর বয়সে বাইসাইকেল চালাতে শিখেছিলেন। আমাদের তো এখনও উচ্চমার্গে চলাচল সাধনার অঢেল সময় আছে। সেদিক থেকে ভাবলে মনখারাপের কারণ নেই। তবে কি জানেন, বাধা অনাত্র। এসব তো অন্যরকমের ব্যালান্সিং অ্যাক্ট কিনা? এ হল লজ্জা ঘেন্না ভয়—তিন থাকতে নয়। আমার আপনার আলসেমির গেড়ায় ওই তিনটি বাঙালি শত্রু আছে—ওই তিনটেকে আগে দূর করুন...ওইগুলোই হচ্ছে আসল পরীক্ষা। চরিত্রের কথা। লজ্জা, ঘেন্না, ভয় এই তিন পরীক্ষা হটান, দেখবেন আপনা-আপনিই সফল ব্যক্তি হয়েছেন। একবার করিৎকর্ম হলে আর আমাদের সফল হওয়া কে আটকায়? সভ্যতে আর অসভ্যতে, বন্ধুতে আর শত্রুতে, মঙ্গলে আর অমঙ্গলে বিশেষ তফাৎ থাকবে না। দেখবেন ওরা মদেই নেশা হচ্ছে। বিনা যোগাভ্যাসে তুরীয়ানন্দ হচ্ছে, বিনা সহবাসে কাম চরিতার্থ হচ্ছে। ওরা আর আমরা এই দ্বৈত ভাবটাও ঘুচেমুছে যাবে তখন শুধু 'আমরা-আমরা' এই অদ্বৈত ভাবটা, আর 'আমি তুমি' নামটা কানের গভীরে বাজবে। নিজের বুকে কান পাতুন, শুনতে পাচ্ছেন? আঁা পাচ্ছেন না?

যাঃ—আপনারও তা'হলে হল না। এই আমার মতনই। আমি একজন ওয়াকিং গার্ল, একজন সিঙ্গল মাদার, একা একা দুটো বাচ্চা মেয়েকে দুটো বড় মেয়ে তৈরি করেছি, এক মধ্যবয়সী মহিলাকে বৃদ্ধা হতে দেখেছি তারপর সবাইকে টা টা বলে, একা একা রজত্ব করছি মেয়েরা তাদের নিজের জীবনে প্রবেশ করেছে। মা তাঁর ইহজীবনের কৃত্য শেষ করেছেন। কিন্তু আপনার মতনই আমার কাজ যেন আর ফুরোয় না। এটা করতে যাই তো ওটা নষ্ট হয়। ওটা করতে যাই তো সেটা ভুল হয়ে যায়। সবই তো বয়েসের ঘাড়ে চাপালে চলবে না, আমার স্বভাব ছোটবেলা থেকেই অলবড্ডে পূর্ববাংলায় যাকে বলে টালা। আপনিও ভেতরে ভেতরে বোধহয় একটু একটু টালাই। আমার ঘর টেবিল অগোছালো, আপনার ঘর টেবিল গোছানো এইটুকুই তফাৎ। আপনারও হল না, আমারও হল না। ওই যে লজ্জা-ঘেন্না-ভয়। তবে আমাদের এখনও আশা আছে। ভাগ্য যদি ভাল হয়, তবে আমাদের সন্তানদের এই প্রবলেমটা থাকবে না। আর থাকবে না আমাদের যেটা প্রধানতম বলশত্রুকারী রোগ যা আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে। তার নাম 'পিছুটান'। ওদের প্রজন্মে এটা হয়ত সেরে যাবে। কত ভাল ভাল ওষুধ বেরুচ্ছে। ভাববেন না।

ওদের পথ ওরাই কেটে নেবে। আপনিই বরং তখন সামলাতে পারবেন না। আপনারই ঘরের ভেতরে ঘুরবে 'ওরা'। আপনার ভাই-বোন, আপনার বউ, ছেলে, মেয়ে—কেউ করে

BanglaBook.org

দেখুন। দেখছেন? সবাই একে একে ওদের দলেই চলে যাচ্ছে।—সবরকম পেশাই এখন ওদের করতলগত—সবাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সবাই এখন ঊর্ধ্বগামী—এবং লক্ষণীয়—সকলেই যৎসাধ্য নিম্নবর্গীয়। এবং মহানন্দের কথা, এখন প্রত্যেকেই 'পেশাদার'। কেউ আর সংসারে অপেশাদার নেই। এই পেশাদারির জন্য কোনও শিক্ষা দরকার নেই। শুধু দীক্ষা নিলেই হল সবাই যুদ্ধং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি। 'দ্বিষো জহি' টাই সবচেয়ে জরুরি এবং জটিল।

আপনারও কি গুপ্ত উচ্চাভিলাষ কিছু ছিল না? আমারই মতন? ছিল বইকি কিন্তু কী আর করবেন। আমার-আপনার 'মনের কথা মনেতে গেল রয়ে' নেহাৎ আলসেমির জন্যেই আর বাইরে বেরুল না। জীবনে আপনার ঊর্ধ্বগতি ব্যাহত হয়েছে পদে পদে। হবে না? আপনার ঝামেলা কি একটা? সমাজ-সংসার-হৃদয়-বিবেক-সততা-কর্তব্য-চক্ষুলজ্জা...হাজারটা বাধা পড়েছে না আমাদের পথে? বলতে নেই, ওদের ওসব ঝামেলা নেই। সেদিক থেকে ঝাড়া হাত-পা।

বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার সরকারি বড়কর্তা আর কনভেনেন্টেড সার্ভিসের বড়ওয়ালারা—মানে যাঁদের পিছু পিছু ফাইল হাতে বেয়ারারা ছুটে বেড়াত—এজাতীয় অত্যুচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই এতদিন এমনধারা অত্যুচ্চ অভিলাষের মই ঘাড়ে করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বেড়াতেন। কেরানী, মাস্টার, অধ্যাপক, দোকানদার আমাদের জীবন শান্তিপূর্ণ না হলেও শান্ত ছিল, সরল না হলেও ঘোরালো ছিল না। কিন্তু এখন দিনকাল পাল্টেছে। এখন? ছয়া সুনিপুণ শান্তির নীড়গুলিতে অর্থাৎ ছোট ছোট ইস্কুল কলেজেও প্রবল পরাক্রম সহকারে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রিয়াকর্মারা ঢুকে পড়েছেন। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পকলার জগতেও ওঁদের অতুলনীয় প্রভাব প্রতিপত্তি। কী বলছেন? শিল্পীদের আহভরি টাওয়ার? বিচ্ছিন্নতা? গজদন্তমিনার? দূর মশাই, ওসব পচা শব্দ চলে না আর। সকলেই আমরা তীব্রভাবে সমাজ সচেতন, নৈতিক দায়িত্ববোধে উদ্দীপিত, রাজনীতি সচেতন, ভগ্নিত্ব-ভ্রাতৃত্ব-সাম্য-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, বিপ্লবী জনগণের বিবেকী বন্ধু। নিম্নবর্গীয়দের—যারা দলিত, নিষ্পীড়িত শোষিত, বঞ্চিত—অর্থাৎ অস্পৃশ্য, হত দরিদ্র, আর নারী—এইসব দীনহীন মানবকুলের বিষয়ে সচেতনতা, সচেতনতা 'সোচ্চারে' ঘোষণা করা বিশেষ দরকার। তা না হলে কিন্তু মনে রাখবেন এ সমাজে উচ্চবর্গীয় হওয়ার আর কোনও সহজতর পন্থা নেই। কিন্তু এই মানবচেতনা আপনার প্রাণের গহনে পুষে রাখলেই হবে না, নিয়মিত খবরের কাগজে বেরুনো দরকার। সভা-সমিতিতে, রেডিও টিভিতে প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু সাবধান!

যদি এই নিম্নবর্গ নিয়ে, সাম্রাজ্যবাদ আর স্বদেশচেতনা নিয়ে সত্যি সত্যি মেতে উঠে আপনার ছেলে-মেয়েদের হঠাৎ বাংলা ইস্কুলে ভর্তি করে দেন, তাহলে কিন্তু সর্ব ধ্বংস। বুলডোজার, কিংবা মওহস্তীর মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ মেধা না হলে (যেমন সঞ্জীব বসাকের) আপনার ছেলে-মেয়েদের আর উচ্চবর্গীয় হওয়া কিন্তু হল না। ওরা আপনাকে চিরকাল দুষবে, 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' বলে আপনি ওদের চিত্তের অপুষ্টি ঘটিয়েছেন, বিশ্বচেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে দেননি, ইংরিজি মাধ্যমে না পড়িয়ে। পরে যদি পারিবারিক আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না চান, তাহলে এইবেলা ভাল ভাল মাস্টার রেখে সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টা করে সাট, মাট, গাট কিসব যেন পরীক্ষা আছে না? সেইসব জীবনরক্ষাকারী পরীক্ষায় ফটফট বসিয়ে দিন ছেলে-মেয়েদের। দেশ বলতে তো ওই একটাই জগতে বাকি আছে। আমেরিকা নিম্নবর্গীয় নিয়ে কাজ-কম্মো করতে হলেও আগে তো কালাপানি পেরুনো দরকার?

যদি এমন হয় যে ভুল করে আপনার ছেলে-মেয়েরা সেই পুরনো পেশাগুলোয় ঢুকে পড়েছে, যেমন ধরুন, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং, ব্যারিস্টারি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস

BanglaBook.org

কিংবা ফরেন সার্ভিস—তাহলে বেশি দুঃখু করবেন না। যে যেখানেই ঢুকুক না সেযমেশ তো ঢুকতে হবে সেই রাজনীতিতে। আর যেন কোনও কিন্তুই—তা সেখানে যতই ভাঁতি হোক না কেন—ঠিক মন-প্রাণটা ভরে না। কিন্তু, সে তো বয়স হলে তারপর। আমাদের ছেলে-মেয়েদের এখনও সময় আছে। ভুল করে যদি আই এফ এস কিংবা কিভিসিস্ট হয়ে গিয়েও থাকে ক্ষতি নেই, এখনও সময় আছে। পথ বদল করে ওরা সবাই একদিন ঠিক চলে যাবে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট/ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং-এ। আমাকে আপনাকে বলে দিতে হবে না, তারা নিজেরাই যাবে। ওদের এখন প্রত্যেকের ইচ্ছে সি আর টি নিয়ে 'সুস্থ জীবনে' বাঁচা। সিগারেটের নেশা ছাড়াতে হলে যেমন চাই এন আর টি, নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, নারীর যৌবনকে অস্তে নামতে না দিতে হলে যেমন চাই এইচ আর টি, হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, আপনার ছেলেমেয়েদের জীবন আমার-আপনার মত ভ্যানতাড়া মধ্যবিত্ত মার্কা হতে দিতে না চাইলে তাদের চাই সি আর টি—সিটিজেনশিপ রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। তা সে বিষয়ে আপনাকে কিছু করতে হবে না, ওদের ব্যবস্থা ওরাই করে নেবে। হাজার হোক ওরা তো করিৎকর্মাদের যুগের লোক! 'নৃ' শব্দ যাদের ধ্যানজ্ঞান, 'N. R. I ডিগ্রির চেয়ে বড় ডিগ্রি নেই।

মনখারাপ? মন তো খারাপ হবেই!

BanglaBook.org

গল্প

ভালোবাসা কারে কয়

জগতে যতই অপ্রেম বাড়ছে, প্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ির ততই বাড়বাড়ন্ত। 'প্রেম' এখন খুবই টপিকাল বিষয়। 'সতী' কিংবা 'বধূহত্যা'র মতোই। হয়তো পরস্পরের মধ্যে যোগও থাকতে পারে। 'প্রেমসংখ্যা' বেরুচ্ছে পত্রপত্রিকায়। বিশ্বপ্রেম ছড়িয়ে পড়েছে পেরেস্ত্রৈকায়। বোফর্স কেলেংকারি মোটাতে না পারল বক্সীর গান্ধী দিল্লি বোম্বাইতে দু জোড়া প্রেমে তাপ্পি লাগিয়ে দিয়েছেন। রাজারাজড়ার ছেলেমেয়েরও গরিবগুরবোদের মতোই ঝপাঝপ্ প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন, কাশ্মীরের সঙ্গে যেমন গোয়ালিয়র 'তরুণ বিপ্লবী মুখ্যমন্ত্রী' প্রেমের ম্যাজিকে 'তরুণ সংসারী মুখ্যমন্ত্রী' হয়ে নাভু খাওয়াচ্ছেন নিমন্ত্রিতদের। যেদিকে তাকাই প্রেমের ছড়াছড়ি। খবরের কাগজে প্রেম, দূরদর্শনে প্রেম, চিত্রহারে প্রেম, চিত্রমালায় প্রেম। রক্তা খিয়েটারে প্রেম, পানশালায় প্রেম, বিড়ি সিগারেটে প্রেম, লোহার আলমারিতে প্রেম, মশার ধূপে প্রেম, এমন কি ফেলি আণ্ডারওয়্যারেরও প্রেম। প্রেম বিনে বিজ্ঞাপন নেই। প্রেমের অর্থই বন্যার ভাসতে ভাসতে আমরা মনিব্যাগ সামলাচ্ছি। এত প্রেম দশদিকে, অথচ যেই একজন সম্পাদক আমাকে একটি প্রেমবিষয়ক নিবন্ধ লিখতে আদেশ করলেন, আমার মনে হলো, জগৎ আলোবাতাসশূন্য হয়ে যাচ্ছে। প্রেম বিষয়টি সরল নয়, জটিল। প্রেম বিষয়টি খোলখুলি ঢালাও আলোচনারও নয়, চুপ্ চাপ, ফিসফিসেই তার শোভা। এখন যেন সবকিছুই কেমন খোলামেলা হয়ে যাচ্ছে। আদুড়ে-গা যেমন ফ্যাশন হচ্ছে, আদুড় মনপ্রাণও তেমনি যুগের ধর্ম হয়ে উঠছে। এরপর জগতে প্রেম বেচারী টিকবে কোথায়? সে বাঁচবে কেমন করে? তার একটু ছায়া চাই যে, একটু আড়াল চাই, একটু আঁধার, সে যে বিজন বিলাসী। প্রেমের নিবন্ধ? আমার তো মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। প্রেম বিষয়টিকে কাগজেকলমে আমি যতদূর সাধ্য পরিহার করে চলি। প্রেমের মূলতত্ত্বই হলো, যা বলবেকেও বোঝে, শুধু করো, মা বলো। আর বলাই বাহুল্য, কেউ মা লিখ। অথচ সম্পাদকরা ঠিক সেটাই করিয়ে নেন।

শেষটা আমার মনে হলো, চ্যালেঞ্জটা ছুড়লে কেন? নিয়েই নিই। প্রেম নিয়ে তিন পুরুষের জ্ঞানসঞ্চয় করে ফেলতে হবে—সম্পাদক বলছেন তিন প্রজন্মে প্রেমের বিবর্তন নিয়ে প্রবন্ধ চাই। এও বলেছেন, ইচ্ছে করলে নিজেরই পরিবারের তিন প্রজন্মের প্রেমকথা লিখতে পারি। হ্যাঁ, বাবা-মায়ের প্রচণ্ড প্রেম বিবাহ হয়েছিল বটে সেকালে। সংবাদপত্রে দারুণ দামামা বেজেছিল। দাদু-দিদিমার, ঠাকুর্দা-ঠাকুমার প্রেমজ বিবাহ নয়, কিন্তু বিবাহজ প্রেমে তাঁরা দুই দম্পতিই প্রবল প্রবাদক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আমার নিজের বিবাহটাও অবিশ্যি বেশ ঘনঘটার 'প্রেমের-বিয়েই' হয়েছিল, কিন্তু শেষ দৃশ্যে কিঞ্চিৎ লঘুক্রিয়া হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে আর ঢাক পেটানোর কিছু নেই। তবে আমার প্রজন্মের অন্য অনেকেরই অটুট, অম্লান, অবিরল প্রেমের উদাহরণ আমার সামনে। হাতের ওপর হাত রেখে চলার অসহজ কর্মটি যাঁরা খুব সহজভাবেই করে চলেছেন। কিন্তু আমার পরের প্রজন্মটাই ঝামেলা করেছে। আমার মেয়েদের প্রেমজ বিবাহ বা বিবাহজ প্রেম কোনোটাই এখনও হয়নি, ফলে ওদের যুগচরিত্রটা ঠিকমতো আমার নজরে আসেনি এখনও। তাঁদের বরিষেন যাঁরা, তাঁদের কে যে এখন কোন্ গোকুলে বর্ধমান তা কি আমি জানি? না তাঁরাই জানেন?

কিন্তু আমেরিকা থেকে আমি একটা জরুরী কথা শিখে এসেছি: 'নো প্রবলেম'। কোনো সমস্যা নেই: সেইমতো কোমর বেঁধে নেমে পড়লুম ফিল্ডে। নো প্রবলেম। বাড়িতে যেই মেয়ের বন্ধুবান্ধব কেউ বেড়াতে আসবে, তক্কে তক্কে থেকে, ফাঁক করে চেপে ধরলেই হলো। তাদের প্রজন্মের কথা তাদের মুখেই শোনা যাবে। এবং সেটাই হবে নির্ভরযোগ্য তথ্য।

আমার পূর্বপ্রজন্মের কাছে তথ্য সংগ্রহের আশায় 'বাংলার ব্রাউনিং দম্পতি'র কপোত কপোতীর

BanglaBook.org

অবশিষ্ট অঙ্গ, কপোতীকে, অর্থাৎ আমার গর্ভধারিণীকে ধরেছিলুম মা বললেন—"প্রেম শুধুই দেহ। চাব না কিছুই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ দুয়ের বেলাই এক। দিয়েই আনন্দ। প্রেমকে বিনষ্ট করতে হলে বিয়েটা করে ফেলা উচিত। সংসারের গরম বাতাসে রোমান্টিক প্রেমের সুকুমার তন্তুগুলি শুকিয়ে যায়। খসে পড়ে প্রেমের লজ্জাবস্ত্র। কেবল প্রেমহীন কর্তব্যের হিসেব-নিকেশ, সামাজিক চুক্তির দেনাপাওনার জাবদা খতা নিয়ে খাড়া থাকে বিবাহের দরোয়ান।—প্রেমকে যদি ধরে রাখতে চাও বিয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যেও না। একটু দূরত্ব ভালো। স্বার্থহীন না হলে প্রেম থাকে না বিয়ে মানেই স্বার্থ। দুটো পরস্পর-বিরোধী। রাধা কি শ্যামের বউ ছিলেন? ছিলেন না। থাকতে পারেন না।"

ও বাবা! এ তো ভীষণ মডার্ন! এর চেয়ে আলাদা কী বলবে পরবর্তী প্রজন্ম? তবু বড় মেয়েকে গিয়ে ধরলুম। কলেজে পড়ছে। তরুণ-তরুণীরা এ বাড়িতে স্রোতের মতো আসে-যায় ও জানবে।

"ধ্যাৎ তেরি!" মেয়ে তেড়ে এলেন।—"পারোও বটে মা তোমরা! আচ্ছা একটা জেনারেশন বটে! উপন্যাসে, গল্পে, যাত্রায়, সিনেমায়, কবিতায়, গানে—এতদিন কেবলই প্রেম চলছিল এবারে প্রবন্ধেও প্রেমের প্রবেশ? সর্বনাশ করেছে। বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা?" কচি মুখখানিকে সাধ্যমতো গোমড়া করে কন্যা বললেন—"জীবনে, জগতে, কতো কিছুই রোজ ঘটে চলেছে মা, যা প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। সেইসব নিয়ে লিখলে পারো না? আমার অন্য কাজকর্ম রয়েছে, আমি যাই তুমি বসে বসে প্রেম নিয়ে ভাবো।" বলেই বিয়ে মনটা বাবাপ হয়ে গেল।

যা বাবা। তাহলে এটাই এই জেনারেশনের অভিমত? প্রেম তুচ্ছতাচ্ছিল্যের জিনিস? ভাবনচিন্তারও যুগ্যি নয়? নাকি আরো অন্য মতামত, ভিন্নতর তরুণ-তরুণীও আছে? পড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে, তরুণ-তরুণীদের সঙ্গেই আমার চব্বিশ ঘণ্টা ওঠাবস কিন্তু সে তো বাইরে থেকে চেনা। চোখে যা দেখি, তাতে তো হমেশাই তাদের ভাবভাব, চটুনি, অনেকটা প্রেমের মতোই দেখায়। সেসব কি তাহলে আমার চোখের ভুল? বা বোঝার ভুল? সেসব কি তাহলে প্রেম নয়, অন্য কিছু? সন্তোষকুমার ঘোষের সেই 'কবিতা' নয়, কিন্তু 'কবিতার পথ' যেমন, তেমনি এও কি ঠিক 'প্রেম' নয়। কিন্তু 'প্রেমের প্রায়' কোনো সম্পর্ক? কিন্তু যাই হোক, খোলসা করে বলবে তো কেউ আমাকে? একটা জিনিস বুঝেছি। আমাদের জেনারেশনেই স্ত্রী-পুরুষে 'বন্ধুত্ব' শুরু হয়েছিল। ছেলে-মেয়ে জুটি মানেই প্রেমিক-প্রেমিকা নয়। স্রেফ বন্ধু হতেই পারে কিম্বা রাজনৈতিক সহকর্মী। কিম্বা কেটেগ্রাফি ক্লাব। মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব। কিম্বা সোসাইটি কত রকমের 'কমন ইন্টারেস্টের' জন্য একসঙ্গে ঘোরে ছেলেমেয়েরা। দেখে কি বোঝা যায়?

এইরকম ভাবনাচিন্তা করছি, এই সময়ে হঠাৎ আমার এক প্রাচীন সহকর্মী উত্তেজিত হয়ে এসে জানালেন ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস নেবার সময়ে বাইরের করিডরে গীটার বাজিয়ে এমনই "জুলি আই লাভ ইউ" গান হতে লাগলো যে তাঁর সন্দেহ হলো ক্লাসেই হয়তো জুলি বলে কেউ থাকতে পারে। "জুলি বলে কেউ কি আছো? তাহলে বাইরে গিয়ে কথাটা সেরে এসো"—বলতে, জুলিয়েট ডিসুজা বলে গোয়ার মেয়েটি কাঁদোকাঁদো মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি ওকে সত্যি সত্যি চিনি না স্যার! আমি নতুন মেয়ে, সবে ভর্তি হয়েছি!" তখন মাস্টারমশাই উঁকি মেরে ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলেন। চেনা ছেলে। স্বরূপ সরখেল। জিভ কেটে, "এই যে সার, গুড মর্নিং" বললে সে গীটার নামিয়ে, ডান হাতে সেলাম করে। পিছু পিছু বেরিয়ে এসে জুলিয়েট বললে—"আপনি কি আমাকে দাদুর মতো ভালোবাসতে পারেন না? আমার সত্যিই কোনো দাদা নেই—বট আই ডু হ্যাভ্ আ বয়ফ্রেণ্ড আট হোম।" স্বরূপ হাস্যবদনে বললে—"হোয়ট আ শেম! কুছ পরোয়া নেই, সিস্টার! এভরিথিং উইল বি অলরাইট!" তারপর

BanglaBook.org

পিড়িং পিড়িং করে বাজাতে বাজাতে অন্যদিকে চলে গেল। আমার সহকর্মী রীতিমতো বিচলিত। "এসব কী কাণ্ড বলুন তো?" বাড়িতে এসে মেয়েকে বললুম।—"এসব কী হচ্ছে তোদের?"—"ওঃ স্বরূপ? স্বরূপের কথা বাদ দাও। ও একটা পাগলা। সেদিন দেখলুম করিডরে চেঁচাচ্ছে: 'ওরে ববি, ববি রে আমার, স্যান্সক্রিটের ঐ মেয়েটার নাম কী যেন?'—'মন্দাক্রান্তা?' ববি বলে দিল।—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তেরি ডিফিকাল্ট টু রিমেমবার—ওকে প্লীজ একটু প্রস্নি দিয়ে দে না? আমি জিওলজির মেয়েটাকে একটু অ্যাটেন্ড করেই আসছি—ওকে বল্—" —"কি আশ্চর্য!" আমি বাক্‌রুদ্ধ। "আশ্চর্য কিছুই নয়। স্বরূপের ছ'টা গার্লফ্রেণ্ড। ওপন সিক্রেট। সবাই হাসে। আর প্রশ্রয় দেয়। স্বরূপ ছ'জনকেই বাই টার্ন সিনেমা দেখায়, আইসক্রিম খাওয়ায়। এই তো? আপত্তির কী আছে? লুকিয়ে চুরিয়ে তো কিছু করেনি। সবাইকে জানিয়ে শুনিয়েই ডেটগুলো ফিক্স করে। হি মীন্‌স নো হার্ম। সবাই সেটা বোঝে।"

"তাহলে প্রেমটা করে কার সঙ্গে?"

'প্রেম আবার কি? মোটেই প্রেম নয়।"

"তাহলে বিয়ে? বিয়েটা করবে কাকে? ছ'টা মেয়ের মধ্যে?"

"এরা কেউই স্বরূপ পাগলাকে বিয়ে করবে নাকি? মেয়েগুলোর কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই? সে আর হ্যাভিং ফান। ওর মোবাইকে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ছ'জনেই ছ'জনকে চেনে। নো ওয়ান কেয়ারস্ কার হিম।"

"সে কি রে? মেয়েগুলোও এমনি হয়েছে আজকাল?"

"হবে না কেন? তাদের কেরিয়ার নেই? প্রেম করলেই চলবে? স্বরূপ যদি ভালো পাত্র হতো তাহলে অবশ্য অন্য কথা। তাহলে হয়তো একটু প্রবলেম হতো, হয়তো কেউ সিরিয়াসলি ভবিষ্যতের কথা ভাবতো, কিন্তু আজ ইট হ্যাপেন্স, স্বরূপও সিরিয়াস নয় ওরাও নয়। যে-যার মা-বাবার পছন্দ-করা বর-বউদেরই বিয়ে করবে রোদ্দুর। আমরা সবাই যে চালু পার্টি মা। আজকাল কেউ আর তোমাদের মতো বোকা নেই।" কেউ আর আমাদের মতো বোকা নেই শুনে তো আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী? বেশির ভাগ জোড়া-কে দেখে তো মনে হয় প্রেমিক-প্রেমিকাই? অবশ্য অবশ্যই সময় যে উল্টোও হয় না, তাও নয়। দিব্যি হাবভাব দেখে এবং কথাবার্তা শুনে মনে হয় দুটি ভাইবোন, অথচ আসলে তারা কিন্তু ডিক্লেয়ার্ড, রেজিস্টার্ড প্রেমিক-প্রেমিকা। এমন জুটি অন্তত আধ ডজন তো ভালোভাবেই চিনি যারা বিয়েও করে ফেলেছে, আজও তুই তোকারি চালায়। আরও একজনকে জানি, যারা বিয়ে করেনি অথচ মনে হয়েছিল, করলো বলে। অতএব এই প্রজন্ম বড়ই প্রহেলিকাময়। কে যে কার সঙ্গে কখন প্রেমের দ্বারা যুক্ত, তা হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। বন্ধুদলের অন্তরঙ্গ সদস্যরাই একমাত্র জানে। দৃশ্যত সকলেই সমান। 'একত্রে ঘোরাঘুরি' ছাড়াও আমাদের সময়ে কিছু টেল্-টেল্ সাইন্স ছিল। 'তুই' বা 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে সরে আসা তার মধ্যে প্রধান লক্ষণ বলে পরিগণিত হতো। এখন ওটাও মুছে গেছে। 'আপনি' মানেই যেমন শ্রদ্ধা-সম্মান দেখানো নয়, 'তুমি'ও তেমনি অন্তরঙ্গতার পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করে না। আবার 'তুই' মানেই নয় ভাই-বোনের অনাবিল প্রীতি। আর প্রেম মানেই নয় বিবাহ। আমাদের সময়ে একটা কুকথা ছিল, "প্রেম করবো যেথা সেথায়, বিয়ে করবো বাপের কথায়।" কেবল বদ্ ছেলেরাই ঐ পন্থা অবলম্বন করে থাকে, এমনতর ধারণাও চালু ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে কি ছেলে কি মেয়ে এটা অনেকেরই স্বাভাবিক কর্মপন্থা, প্রেম করাটা মোটে 'প্রেম'ই নয়, একরকমের বিনোদন মাত্র। উত্তেজনায়, আনন্দে সময় কাটানোর সহজ উপায়। "হ্যাভিং ফান।" ইংরিজি ইস্কুল, বাংলা ইস্কুল, যে-কোনো পটভূমি থেকে এসেই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে এই ব্যাপারটি শিখে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। প্রেমে-পড়া নয়। প্রেম-করা। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাব না। এদের এই প্রেম-করা মোটেই

BanglaBook.org

আমাদের সেই প্রেমে-পড়া নয়। এবং অবশ্যই নয় ইংরিজি 'লাভ-মেকিং'ও। একেবারে অন্য হালকাহালকা ব্যাপার। দিশি 'ফান'। মোটামুটি হর্মলেস। ইংরিজি ভাষাটা এই প্রেম-ভালোবাসার প্রসঙ্গে কিন্তু যারপরনাই দীনদরিদ্র। স্নেহমমতা, ভাব-ভালোবাসা, প্রেমকাম, সব এক সব 'লাভ'। মা-বাবা, কুকুর-বেড়াল, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ঠাকুর-দেবতা সবার সঙ্গে সবার একটাই শব্দের সম্পর্ক। কী গরিব, কী গরিব ভাষা রে বাবা! আর ওরাই নাকি ভেভেলপ্‌ড নেশন?

সে যাই হোক, সাহেবদের দৈন্য সাহেবরা বুঝুক, আমি প্রেম বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের অধীর পিপাসায় কর্মযজ্ঞে প্রবর্তীর্ণ হই। হাতে-কলমে অবশ্য এখনই নয়। প্রথমে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আগ্রহ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, সাক্ষাৎকারভিত্তিক, পরিচ্ছন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়। তবে হ্যাঁ, এলেবেলে হলে চলবে না 'বিজ্ঞানের লাইক' হওয়া দরকার এই প্রজন্মটার মধ্যেই কেমন একটা 'বিজ্ঞানেরলাইক' ভাব আছে। কাঠখোট্টা, হিসেবী (কেমন-যেন)! এদের হাওভাব করতে হলে এদের মতনই হতে হবে আমাকে কাঠখোট্টা তো আছিই, কেবল হিসেবের ব্যাপারটার কাঁচা। প্রথমে চাই সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু।—প্রেম। তারপর প্রশ্নমালা। ওটা বরং একটু খোলামেলাই থাকুক বাঁধাধরা লিখিত প্রশ্নমালা বড্ড বোরিং। এবার স্থানকালপাত্র ঠিক করে নিতে হবে।

স্থান, এই বাড়ি। কাল, যে-কোনো ছুটির দিন। পাত্র, আমার কন্যার বন্ধুর গ্রোতের মধ্যে যে সামনে পড়বে সে-ই। ছুটির দিনে ভজনে ভজনে আসে তারা। তাদের খালি-করা চায়ের কাপে ঘরবাড়ি ছেয়ে যায়।

যেই না রবিবার আসা অমনি আমিও রেডি। ভোরে উঠে স্নান করে বাতা বগলে ঘাপটি মেরে কলিংবেলের অপেক্ষায় কান পেতে রই। দুরুদুরু বক্ষ। বৃক্ষের বন্দির জন্য শ্রীরাধিকার আকুল প্রতীক্ষাও এই অমার কাছে তুচ্ছ! নিজেই গোলমালটা পাকিয়েছি পিকোর পরীক্ষার জন্য ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করে বন্ধুদের মার্-মার্-কাট্-কাট্ শব্দে তাড়িয়েছি ক'দিন যাবৎ। বন্ধুর স্রোতটা তাই একটু কমে গেছে। আহা তখন কি ছাই জানতুম, যে...?

তবে আজ ছুটির দিন। আজ নিশ্চয়ই আসবে ওর বয়েজমেন্ট। কিন্তু কই? বেল তো বাজছে না? এমন সময়ে...বাজল কাহার বীণা?

অবশেষে বেল বেজে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে "পিকো আছে?" শোনবামাত্র আমার অন্তরাত্মার বিদ্যুৎ খেলে যায় এই তো সে! এসে গেছে। পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি! তর্জনী চেপে ধরতে হবে যেন ফস্‌কে না যায়।

"কে? টুবলু? আয় বাবা আয়। হ্যাঁ, আছে পিকো ত টুবলু তুই প্রেম নিয়ে ইদানীং কী ভাবছিস?"

টুবলুর গোলগোল নাদুসনুদুস নধর মুখখানি যেন এক মিনিটে শুকিয়ে গেল। খুবই চালাকচতুর চটপটে ছেলে সে, প্রাইজ পাওয়া ডিবেটর, সুন্দর বলিয়ে কইয়ে, ফুর্তিবাজ, আড্ডাবাজ, হাসিখুশি ছেলে। টুবলুর শুকনোমুখ কখনো দেখিনি। তাকে নিকতবও দেখিনি কখনো। খানিক চুপ থাকার পরে শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে টুবলু বেশ আস্তে আস্তে কথা বলল। টুবলু বলল—"মানে, নবনীতাদি, আমি কিন্তু...পিকোর কাছে"...গলা বুজে এল তার। গলা ঝেড়ে নিয়ে টুবলু বলল—"আমি ঠিক পিকোর কাছে, সেভাবে...কোনোদিনই...মানে আপনি হয়তো ঠিক জানেন না আমাদের মধ্যে কিন্তু ঐসব, মানে একটুও কিন্তু...ফাইই অস্পর্শ!" টুবলু হঠাৎ চুপ করে গেল। যাকে বলে "চুপ মেরে যাওয়া" তাই। এবং টুবলুর উজ্জ্বল তরুণ মুখখানি বিষাদে স্পষ্টতই প্রাণশূন্য বিবর্ণ দেখলো। তারপর টুবলু আমায় বললো—"প্লীজ! বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু কোনোদিনই পিকোর কাছে এইসব উদ্দেশ্যে—আমি ভাবতেই পারিনি..." এতক্ষণে আমার কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। হাঁহা করে শুধরে নিই নিজের ভুল। যদিও হাসি আটকাতে পারি না।

BanglaBook.org

"ওরে, নারে, তোর সঙ্গে যে পিকোর প্রেম হয়নি তা তুইও যেমন জানিস আমিও তেমনি জানি—"

তুচ্ছ বাকা! কিন্তু কী বৈপ্লবিক তার শক্তি। মুহূর্তের মধ্যে টুবলুর অন্য ব্যক্তিত্ব এসে গেল। রীতিমত চেঁচিয়ে উঠলো সাগ্রহে—"শুধু আমি কেন? কারুর সঙ্গেই হয়নি! হবে কী করে? যা দজ্জাল কন্যাটি আপনার! বাপ্‌রে!"

"আহা! সে কথাও হচ্ছে না। কে কার সঙ্গে প্রেম করছে-না-করছে সেসব পার্সোনাল ডিটেইলস্ আমি চাইছি না, আমি জানতে চাই প্রেম বিষয়ে তোর ধারণাটা কী? জেনারেলি? ইন থিওরি? আজ আ মেম্বার অব ইওর জেনারেশন?"

ইতিমধ্যে সিঁড়ির বাঁকে পিকো অবতীর্ণ হয়ে সস্নেহে টুবলুকে জানালো—"মাকে প্রেম বিষয়ে আর্টিকেল না গল্প কী যেন লিখতে হবে অথচ সেই বিষয়ে মা কিছুই জানেন না। একবার দিশাকে, একবার আমাকে অসম্ভব বিরক্ত করছেন, কব ইনফরমেশন, কব ডেটা। তুই পারলে দু'একটা পয়েন্ট দিয়েই দে না বেচারীকে।" এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে টুবলুর অট্টহাস্য।

"প্রেম নিয়ে আর্টিকেল? আপনি?" যেন এর চেয়ে আজগুবি আর আবোলতাবোল জগতে কিছু হতেই পারে না। যেন আমার ত্রিভুবনে প্রেম নিয়ে কোনো অন্বেষণ থাকা অসম্ভব। হায় রে! যদি জানতিস! প্রেম বিষয়ে না হয় তাত্ত্বিক জ্ঞানটুকু আমার কমসম, তা বলে প্রযুক্তিগত বিদ্যা কতটা, তা তো তোরা কেউ জানিস না না হয় প্রেমের গল্পই আমি লিখি না, তা বলে কি প্রেমের গল্পরা আমার জীবনে ঘটে না? কিন্তু এ-সব কথা পত্রিকায় ছেপে না বলাই ভালো: কে আবার কী বুঝবে?

অতএব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ছোটো করে গর্জে উঠি "অত জেনে কাজ নেই। কাজের কথাটা বল্। প্রেম বিষয়ে তোর কী ধারণা?"

"ওহো, তাই তো, 'কাজের' কথাটা?" (টুবলু গলা নামিয়ে দেয়, আজকালকার ছেলেগুলো মহা শয়তান)—"ইয়ে, 'কাজের' কথাটাই তবে হয়ে থাক। অর্থাৎ প্রেম তো? প্রেম অতি ভয়ানক। অতীব ভয়াবহ বস্তু। বন্ধুবান্ধবরা প্রেম করা মানেই আমার ভয়ঙ্কর খরচা বেড়ে যাওয়া। তাদের চা-অমলেটের জন্য সিনেমার টিকিটের জন্য ট্যাক্সিভাড়ার জন্য কেবলই ধার দিতে হয় (যেহেতু তাদের টিউশনি করার সময় থাকে না। আমি টিউশনি করি।) সেসব ধার কদাচ শোধ হয় না। তাছাড়া পড়াশুনোরও ভীষণ ক্ষতি হয়। বন্ধুরা এসে এসে অনবরত প্রেমের প্রগ্রেস রিপোর্ট শোনায়। বন্ধুরা জোড়ে হয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের নোটস এক্সচেঞ্জ করে, রীতিমতো বুলেটিন বের করে, এবং আমার কাছে কেন জানি না, কেবলই উপদেশ চায়। সর্বদাই আর্জেন্ট পরামর্শ দরকার হয় তাদের। সবসময়েই একটা পিরিয়ড অফ এমার্জেন্সি চলে প্রেমে। আর আমার ভালো লাগুক-না-লাগুক খুব ধৈর্য ধরে সহানুভূতি নিয়ে সেই সব কাহিনী শুনতেই হয়। না শুনলে হয় হার্টলেস, নইলে হিংসুটে ভাববে। সাকসেসফুল প্রেমে কেস তবুও খারাপ হয় না আনসাকসেসফুলে যতটা। 'ব্যর্থ-প্রেম' হলে আর রক্ষে নেই। রাতের পর রাত সেও ঘুমোবে না, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। জানলায় টোকা মেরে পাশের বুড়ো আঙুল নেড়ে ঘুম তাড়িয়ে ঘরে ঢুকে এসে দুঃখের পাঁচালি শোনাবেই সব বন্ধুই এক। আমার পড়াও শেষ। ঘুমও শেষ। পয়সা তো শেষ আগেই হয়েছিলো। বন্ধুরা প্রেম করল, আমি ফেল করলুম, এ তে কাজের কথা নয়? নাঃ নবনীতাদি, প্রেম ইজ ভেরি ডেনজারাস। ভেরি হার্মফুল টু সোসাইটি। আনপ্রডাকটিভ্—এক্সেপ্ট ইন আ হার্মফুল বায়োলজিকাল ওয়ে। প্রেম বড়ই সর্বনেশে, বড়ই ভয়ানক! বন্ধুরা প্রেমে পড়লেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে নিজে যদি প্রেমে পড়ি? তাহলে তো প্রাণেই মারা পড়বো? ওরে বাবারে! কী ভয়ঙ্কর জিনিস! আই উইল টু হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইট। পরে হবে। পাশ-টাশ করে গিয়ে।" দুটো করে সিঁড়ি টপ্‌কে ওপরে ছুটলো টুবলু,

BanglaBook.org

"পিকো!" "পিকো!" হাঁক দিতে দিতে

টুবলু ওপরে গেছে। আমি ঘরে এসে নোট নিচ্ছি এমন সময়ে কের বেল বাজবামাত্র আমার প্রাণে কী আনন্দ! রে! রে! রবে ছুটে গেছি।

"কে রে? পিকোর বন্ধু নাকি রে? যায় আয়—"

"নবনীতা দেবসেন আছেন?" ধুর! ভুল লোক? অসম্ভব বিরক্ত গলায় বলি, "আছে। কেন?"

"একটু দরকার ছিল। একটা পত্রিকা থেকে এসেছি" অগত্যা, "ওপরে আসুন।" একটি তরুণবয়সী ছেলে। পিকোর বয়সীই হবে। গ্রাম থেকে কবিতার লিটলম্যাগ বের করে। দিতে এসেছে। অমিত চায়। কবিতাও চায়। উল্টে-পাল্টে দেখলুম, অনেক প্রেমের কবিতা আছে।

"তুমি যে প্রেমের কবিতা লেখো, নিজে প্রেমে পড়েছো?"

"আজ্ঞে?"

"তোমারই তো নাম বললে অমুকচন্দ্র তমুক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই তোমার লেখা তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে তো তুমি প্রেমে বিশ্বাসী।"

"আজ্ঞে?"

"তুমি তো প্রেমে বিশ্বাস করো দেখছি। এসব প্রেমের কবিতা তো তুমিই লিখেছো বললে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! ভুল হয়েছে?"

"তোমার সঙ্গে প্রেম নিয়ে একটু কথা বলতে চাই!"

"আজ্ঞে কী বললেন?"

"বলছি, প্রেমে পড়েছো তো? প্রেমের অভিজ্ঞতা বিষয়ে আমি তোমার মতামতটা চাইছি। মন খুলে বলো দিকিনি?"

"প্রে...প্রেমের...আমার মতামত? আজ্ঞে আমি ঠিক, ঠিক বুঝতে পারছি না!"

"আঃহা, এতে না-বোঝার কী আছে? আমি প্রেম বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করতে চাইছি। প্রেম বলতে তুমি কী বোঝো?"

"কী বুঝি? তার মানে?" ভয়ে তার মুখ শুকনো।

"তার মানেটাও বলে দিতে হবে? কবিতা তো দিব্যি লিখতে পেরেছো। আর প্রেম কী বস্তু বোঝো না? আমি তোমাকে বলে দেবো?"

"প্রেম? কী বস্তু? আপনি বলে দেবেন? আমাকে?"

"অরে, নাঃ। আমি নয়। তুমি, তুমি। তুমি বলবে। আমাকে। আহঃ, এতে এত লজ্জা করবার কী আছে? আশ্চর্য! তোমার বয়েস কত?"

"আমার বয়েস কত? য্যাঃ। আপনার চাইতে অনেক কমই হবে। দিদি যে কী বলেন?" ছেলেটা কী বুঝলো কে জানে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তক্ষুনি—"আমি বরং আজ উঠি, দিদি কবিতাটা পরে বরং কখনো এসে—" কোনোরকমে, যেন প্রাণটা হাতে করে পালিয়ে বাঁচবার মতন দৌড়ে নিচে নেমে গেল চব্বিশ পরগণার [illegible] থেকে আসা তরুণ কবি সম্পাদক। কি ভয়ানক শহুরে কবিতীর পাল্লাতেই না পড়েছিল সে আজ। এমন জানলে আসে কখনও? রামোঃ!...এতক্ষণে সবটা সবল হলো। বেশ বুঝতে পারছি গ্রামে গিয়ে সে কী গল্প করবে।...

"প্রেমের আলোচনা করতে চাইছিল! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তবে কি আর বলছি? আমার সঙ্গেই। রসিয়ে রসিয়ে। কিছুতেই ছাড়বে না। ডবল বয়সী ভদ্রমহিলার লজ্জাশরম বলে কিছু নেই। আবার আমাকে

BanglaBook.org

বলছে, 'লজ্জা করবার কী আছে?' বলছে, 'মন খুলে বলো, প্রেম কী বস্তু!' এদিকে কেদারবদ্রী-কুম্ভমেলা লিখছে, পেটে পেটে এত? আমাকে একা বাড়িতে পেয়েই,...বলে, 'তোমার বয়েস কত?' মানুষ বড় আশ্চর্য হয়রে ভাই!"..বলে উদাস হয়ে যাবে। বলুকগে। জীর এখন বেরিয়ে গেছে। এর পরের বার থেকে সতর্ক হতে হবে। অমন ঝপাং করে ছেলেধরার মতন ধরলে, আর কাজের কথায় নেমে পড়লে চলবে না। ধীরে সুস্থে, রইয়ে সইয়ে। চা খাইয়ে। কবি তরুণের দোষ নেই। দোষ আমারই।

আবার রিং। এবার অন্য স্ট্র্যাটেজি সচেতন পদক্ষেপ।

"কে রে? সুদীপ? আয় আয়, বোস। কিরে, কাজকর্ম কেমন? হ্যাঁ, আছে পিকো। একটু বাথরুমে আছে। বরং দশ মিনিট পরে যাস ওপরে। একটু চা খেয়ে যা নিচেই। ততক্ষণে বরং আমার সঙ্গেই একটু গল্প কর। হ্যাঁরে সুদীপ, এই যে তোরা এত বইপত্তর পড়িস, হুইটীবি দোষস, মিস্ তুলিস, জীবন সম্পর্কে, বিশেষভাবে এই প্রেম সম্পর্কে তুই কী মনে করিস রে? মানে, ইন জেনারাল তোদের জেনারেশানটা কী ভাবছে? একটু খুলে বল্ তো বাবা? আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই।"

সুদীপ কলেজ শেষ করে ফেলেছে। এদের চেয়ে সামান্য বড়ো। ফিল্মটিল্ম তোলে। বিদেশী বইপত্তর পড়ে, 'চট্ করে অর্ধাক হই না' টাইপ। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পার্থিব জগতে সে যথেষ্ট চালুপার্টি। 'রাক্-টাক্-মাচে' সুদীপ জামার বোতাম লাগায় নাভির কাছে, কলম গোঁজে হিপ পকেটে, মোটরবাইকে পড়া কাঁপিয়ে বেড়ায়। যেন মোটেই যাবড়ায়নি, এমনভাবে সুদীপ একটা কাঠের চেয়ারে বসে পড়ে। এবং টেরচা চাউনিতে আমার দিকে তাকাতে থাকে। একে বলে 'মাপ-নেওয়া', আমি জানি। অর্থাৎ 'মেজার' করা হচ্ছে 'সিচুয়েশান'-টাকে। হিন্দি সিনেমাতে ভিলেনই হোক, হিরোই হোক এমনি একটা সময়ে নিজের দু'পাশে বাঁ-হাত বুলোতে থাকে। তারপর ডান হাতে হঠাৎ ঘুঁষি মারে। ('শাহেনশা'তে অবশ্য উলটো)

সুদীপ ঘুঁষি মারবে না, জানি।

আমিও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি ভাবতে টাইম নিচ্ছে, ভালো। ভেবেচিন্তে উত্তর দিক। আমিও তো তাই চাই। সুদীপ সিবিয়াস ছেলে, ভালো রোজগারপাতি করছে। পরিশ্রমী। বাইরে ভাবখানা যাই হোক, ছেলেটা আন্তরিক প্রকৃতির। রোজ নাকি বাড়ির বাজার করে দেয় মোটরবাইকে চড়ে। ওর মতামতে কাজ হবে।

সুদীপ গালে হাত বুলোয় না। দু'হাতে চেয়ারের দুটো কাঠের হাতল চেপে ধরে টেরচা চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। বোতাম খোলা জামার মধ্যে থেকে তার দু'টা পাঁজরাও আমার দিকে স্পষ্ট, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। রোগা হওয়ার সঙ্গে 'মাচো' ইমেজের যোগ নেই। উত্তেজনাপ্রবণ 'মাচো'রা রোগাই হয়। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে অপলকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুদীপ ঘাড় সোজা করে। নড়েচড়ে বসে চোখ নামিয়ে এক মুহূর্ত কী ভেবে নেয়। তারপর মাথা তুলে বলে "প্রেম?" একটু ফর্সা করে হাসে। "ধুস্। প্রেম দিয়ে কী হবে? আমি প্রেমে বিশ্বাসই করি না! ওসব পেমট্রেম আজকাল আর চলে না, নবনীতাদি, ওসব আপনাদেরই টাইমের জিনিস ছিল। এখন অবসোলিট হয়ে গেছে। গল্পে-উপন্যাসে-সিনেমাতেই শুধু পাবেন। লাইফে নেই। আমরা র‍্যাশনাল জেনারেশন। আমরা অবজেকটিভলি লাইফটাকে দেখি। লাভ ক্ষতির অঙ্ক কষি। আমরা অ্যামবিশাস। কই? চা তো বললেন না? প্রেম ব্যাপারটা এখন ঠিক চলে না। কেরিয়ারটাই সবার আগে। আপনি বাঁচলে প্রেমের নাম। প্রেমের জন্য আপনা কেউ তো কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করবে না? না মেয়ে, না ছেলে। কেউ কিছুই স্যাক্রিফাইস করবে না। এখন সবাই স্বার্থপর। বুঝলেন তো নবনীতাদি এখন যে যার, সে তার। ছেলেমেয়ে পরস্পর সোশ্যাল সীকিং হলে আর প্রেমটা হবে কেমন করে? কে করবে? কার সঙ্গে করবে?

BanglaBook.org

প্রেমে কেউই আর বিশ্বাস করে না, এক বোকারা আর নাকারা ছাড়া। ওটা আউটডেটেড কনসেপ্ট এখন। আমাদের এটা প্রয়োজনভিত্তিক সোসাইটি' নবনীতাদি, এখানে বিনা প্রয়োজনের কোনো জিনিস চলে না।" সুদীপ আমার সামনেই একটা সিগারেট ধরিয়ে কেমন একটু জেনুইন মমতার সঙ্গে হাসলো। চা এসে গেছে।

আমি চা, আর অ্যাশট্রে এগিয়ে দিলুম। মনে মনে নোট করতে গিয়ে আমি বোকা হয়ে গেলুম—সুদীপ আসলে কী বললে? ও কি প্রেমে বিশ্বাস করে, না করে না?

নেক্সট যেই-না বেল বেজেছে অমিও ঠিক স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো দালানে ছিটকে এসেছি এবং ভাঙা গলাকে যথাসম্ভব মিষ্টি করে বলেছি—

"কে রে? পিকোর বন্ধু কেউ এলি নাকি রে?" ভয়ে-শীতল কচিগলায় কোরাসে উত্তর হলো নিচে থেকেই—

"হ্যে, হেঁ-এঁ! মানে, না, না! আসলে আমরা টুম্পার...মানে, আর কি, আমরা থাকতে আসিনি। কেবল এক মিনিট, এক্ষুনি চলে যাবো। একটা জরুরি কাজে। এই পিকোদির কাছে, শুধু এক মিনিটের জন্যে সত্যি সত্যি।" কেউ উপরে এলো না। পিকো একদম পড়ছে না, সামনে পরীক্ষা, আমি তাই প্রায়ই বৈ-রৈ শব্দে ওর বন্ধুদের তাড়িয়ে দিই। বুঝতে পারি, এটা তারই ফলশ্রুতি। (আজকাল কেউ 'ফল' লেখে না 'ফলশ্রুতি' লেখাই নিয়ম।) এই পার্টি তারই প্রতিক্রিয়ায় ভুগছে। অতএব আমি তাদের মধ্যে মনোবল সঞ্চার করতে চেষ্টা করি।

"ভয় কিসের? ওপরে আয় না! কে রে তোরা?" "পিকোদি বাড়ি আছে!" আস্তে আস্তে সিঁড়িতে শব্দ হয়। দুটি কচিমুখের আবির্ভাব ঘটে। সিঁড়ির মাথায় 'হে মাধবী-দ্বিধা-কেন-আসিবে-কি-ফিরিবে কি'-র মতো করে আমি বলি—"কি ব্যাপার? এত কিন্তু কিন্তু কিসের? এই কি নতুন আসছিস নাকি তোরা, রিমঝিম্ আর প্রতিম? আয় না ওপরে আয়, শুধু শুধু অত ভয় পাচ্ছিস কেন? বোস এখানে। (আমি আছি গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে!) হ্যাঁ, পিকোদিকে ডেকে দিচ্ছি। আচ্ছা রিমঝিম্-প্রতিম, তোরা কি এখনও প্রেমে বিশ্বাস করিস?" বলেই 'এখনও' কথাটা নিজেরই কানে খাপছাড়া লাগে।

"প্রেম?" সমস্বরে উচ্চারিত শব্দটি শুনে ছাড়ার মতো শোনালো। ততক্ষণে পায়ে পায়ে কাছে এসেছে দুটো ছেলে। একটার এখনও গোঁফদাড়ি গজায়নি তেমন, আরেকটার মুখভর্তি কচিকচি ঘাসপাতার মতো দাঁড়িগোঁফ। ক্ষুর চলেনি বড়ো বড়ো চোখ। দুটো নেহাৎ ছেলেমানুষ ছেলে। কিশোর বলাই যথার্থ। একটা ওদের মধ্যে একটু বড়ো সদা যুবা। রিমঝিম্টা আমার ছোটো মেয়ে টুম্পার সতীর্থ। ছোটো মেয়ে এখন কলকাতার বাইরে পড়ছে। হস্টেলে থাকে। কুড়ি হয়নি।

"প্রেম? মাসি?"...শুধু এইটুকুনি বলেই ভয়ে-বলি-না-নির্ভয়ে-বলি মুখ করে হঠাৎ চুপ করে গেল দুজনে। এবং পরস্পর নিদারুণ চোখাচোখি করতে লাগলো।

"ভয় কি? বল না?" আমি যথাসাধ্য মাতৃভঃ প্রদর্শন করি। "তোরা প্রেমে বিশ্বাস করিস তো? অ্যাঁ? প্রেম নিয়ে ভাবনাচিন্তা করিস?" দাড়িওয়ালা মুখখানি প্রতিম সজোরে নাড়ালো ডাইনে-বাঁয়ে। অর্থাৎ না। করে না। স্বল্প গোঁফের রেখা-ওঠা মুখখানি প্রবলভাবে হেলিয়ে কানটা একদিকের কাঁধের সঙ্গে ঠেকিয়েই ফেললো রিমঝিম্। অর্থাৎ করে। খুব করে। আরে? এদের যে দেখি একযাত্রায় পৃথক ফল! ঠিক হ্যায় আগে অবিশ্বাসীকেই 'হাণ্ডল' করা হোক।

"প্রতিম? তুই বিশ্বাস করিস না প্রেমে? কেন? কী হয়েছে? তোদের না অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা টেক্সট?"

"রেপ অফ দা লকও টেক্সট। তারপর, টেক্সটের মধ্যে" প্রতিম অকস্মাৎ সিলেবাস নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে দেখে, তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিই।

BanglaBook.org

"থাক, টেক্সটের কথা থাক। তবে নিজস্ব থিসিসটা কী? জীবনদর্শন? প্রেমে বিশ্বাস নেই কেন রে? এই বয়েসে?"

"এই বয়েস বলেই। বড্ড টাইম কনজিউমিং। ভীষণ সময় নষ্ট হয়ে যায়।" প্রতিম আড়চোখে একবার রিমঝিমের দিকে তাকায়। রিমঝিমের চোখমুখে মেটেই সাপোর্টের চিহ্ন নেই। ভুরু কুঁচকে যুদ্ধং দেহি ভাবে চেয়ে আছে সে।

"এই স্টুডেন্ট লাইফে প্রেম করাটা ঠিক নয়। আগে পড়াশুনোটা শেষ করে নিয়ে, যখন হাতে সময় থাকবে"—প্রতিমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হঠাৎ রিমঝিম্ বলল—"একদম পিটায়ার টিটায়ার করে গিয়ে, তখন বরং প্রেমটা তুই করিস। বুঝলি প্রতিম? তখনই হাতে প্রচুর, অঢেল সময় থাকবে।" বেশ নিরীহ ভাবেই এটা বলল রিমঝিম্। "এখন তোর পড়াশুনো, তারপর তোর চাকরিবাকরি—"

"ধ্যাৎ কি মারিস ন, রিমঝিম্। কী বুঝিস তুই প্রেমের? যা জানিস না সেই নিয়ে কথা বলার না।" প্রতিম একটু রেগে গিয়ে সিরিয়াসলি বলে—"প্রেম তো করলেই হলো না? গার্লফ্রেন্ডকে টাইম দিতে হয়, সমানে পারসিউ করতে হয়, জানিস? প্রেমের জন্য কিন্তু প্রচণ্ড সময় লাগে, নইলে প্রেম ছেড়ে মেড়ে যায়। প্রেমে পড়লে পড়াশুনো, আড্ডা, থিয়েটার সবই মাটি। শুধু ওই একজন মেয়েকে নিয়েই সবটা সময় কেটে যায়। বেলা দেখা হয় না, অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলেই গার্লফ্রেন্ড সুট করে। তাকে খাওয়াতে, আর সিনেমা দেখাতে, অনবরত ধরকর্জ করতে হয়, ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যায়।—রোজ রোজ বাড়ি ফিরতে দেরি হয়, মা-বাবাও ক্ষেপে যায়—মহা প্রবলেম। যেমন সময় নষ্ট, তেমনি প্রপার নষ্ট, —পড়াশুনোও ইনএফেকটিভলি সাফার করে। একদম কনসেনট্রেশন থাকে না, পড়ায় কিছুতেই মন বসে না ওঃ সো ডিস্টার্বিং—নাঃ। প্রেম একদম ভালো না"—

"শুনে তো মনে হচ্ছে বেশ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকেই কথা বলছিস। রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স বলেই মনে হচ্ছে? তুই তো এ'বছর ড্রপ দিলি? না রে?"

"হি হি, এসব কী অ্যান-এথিক্যাল প্রশ্ন? আমার অবসেসিভ হয়ে যাচ্ছে যে। নো পার্সোন্যাল ইনভলভমেন্ট—আমি কেবল জেনারেল থিওরি দিচ্ছি! —আমার থিওরি ছাত্রকালের প্রেম খুব বাজে জিনিস, করলেই সমূহ বিপদ—সব দিক দিয়ে লোকসান। কেবল যদি কেউ স্বরূপের মতন ভেরি স্পেশাল পার্সন হয়, উইকলি ডাইরি মেনটেন করে, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, রেস্তরাঁ ওয়ার্ক, সবকিছু কাজকর্ম, হার্ট অ্যাণ্ড হেড, ডেইলি রুটিনে একদম ভাগ করে ফেলে, তবেই সম্ভব। নাঃ। ও একা স্বরূপই পারে। আমাদের মতো জনসাধারণের পক্ষে সে-মানুষের পক্ষে প্রেম ইজ নট প্র্যাকটিক্যেবল্—নট অ্যা প্র্যাকটিক্যাল প্রপোজিশন অ্যাট অল্।"

প্রতিমের মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে রিমঝিম্ মেঠো বক্তৃতার সুরে বলে—"আমি কিন্তু মোটেই মনে করি না প্রেম শক্ত কিম্বা প্রেম খারাপ। প্রেম খুব ভালো জিনিস আমি খুব প্রেমে বিশ্বাস করি—আমি খুবই প্রেম করতে চাই। কিন্তু আমাকে কেউই যে কেন প্রেম করতে চায় না—"

"সে তোর গোঁফদাড়ি বেরুলেই ঠিক দেখবি মেয়েরা হুড়হুড় প্রেমে পড়বে। আসলে এখনও তোকে ওরা বাচ্চা ভাবে—" নিজের কচি কচি দাড়িগোঁফের গায়ে হাত বুলিয়ে, দাম্ভিক হাসা দেয় প্রতিম। "কেন? কেন ভাববে বাচ্চা?" রিমঝিমের ক্রুদ্ধ উত্তর। "ভাবলেই হলো? আমিও যে-ক্লাসে পড়ি, ওরাও তো সেই ক্লাসে, তবে? —তবুও আমি বাচ্চা? বললেই হলো? এ্যা একটা কথা?" রিমঝিমের অভিমানে ভাঙা গলা বুজে আসে। বেশ তো মিষ্টি দেখতে রিমঝিমকে, কেন প্রেমে পড়ে না মেয়েগুলো? 'নওলাকিশোরে'র সেই আইডিয়াটা আজ বাংলাতে মাইগ্রেট চলছে না তাহলে? সব র‍্যাম্বো? অমিতাভ অব মিঠুন?

"ওরে রে, হবে রে, তোরও হবে," মূর্তিমতী সান্ত্বনার মতো এবার পিকোদি আবির্ভূত হয়,

BanglaBook.org

"বিশ্বাসে কৃষ্ণ পর্যন্ত মিলে যায়, আর তোর একটা প্রেম হবে না? তাই কখনও হয়?"

"তোর সেই বেগুনি সোয়েটার পরা গুণ্ডা মেয়েটার সঙ্গেই হয়ে যাবে, দেখিস, একটু ধৈর্য ধর্" —রহস্যময় হেসে প্রতিম বলে। "সবুরে মেওয়া ফলে! মেলা তড়বড় করিসনি!"—দৌড়ঝাঁপ করতে করতে তিনজনে মিলে ওপরে উঠে যায় এবার। "চলি, মাসি?" -আমার মাথা আবার গুলিয়ে যায়। এরা তবে কে কোন্ দলের?

আপনারা ভাবতে পারেন মেয়েদের দেখা নেই কেন? কেননা মেয়েদের আমি প্রশ্ন করছি না। সম্প্রতি একটি নথ, দুটি মেয়েদের পত্রিকাতে কলকাতা ও যাদবপুরের ছাত্রীদের স্পষ্টবাদী সাক্ষাৎকারে তাদের মতামত পড়ে জেনে গিয়েছি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ৯৯% প্রেমে উৎসাহী নয়। সবাই কেরিয়ারে উৎসাহী, যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছে। প্রেমকে কেরিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখছে তারা। অথবা একটি বিকল্প কেরিয়ার। প্রেম মানেই বিবাহ, বিবাহ মানেই কর্মজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা-বঞ্চিত স্ত্রীজীবনযাপন। বেশিরভাগ সাক্ষাৎদাত্রী চায় মুক্ত জীবন, স্বাধীন উপার্জন, কর্মজীবন। প্রেমে, বিবাহে জড়িয়ে পড়তে রাজী নয় তারা। অনেকদল বিবাহোন্মুখ। তারা বিবাহের প্রতি আগ্রহী, কিন্তু প্রেমের প্রতি নয়। সবাই চায় নিরাপত্তা। ইতিমধ্যে, যদি ইচ্ছে করে তবে প্রেম-প্রেম-খেলায় ('হ্যাভিং ফান') তেমন আপত্তি নেই কয়েকজনের। কিন্তু প্রেমে-পড়া? নৈব নৈব চ। মেয়েরা 'প্রেম' থেকে পালিয়ে গিয়ে 'কেরিয়ার', বাঁচাতে চায়, তা সে-'কেরিয়ার' চাকুরি'ই হোক, আর 'বিবাহ'ই হোক। প্রেমটা মেয়েদের ক্ষেত্রে কেরিয়ারের বদলই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছেলেদেরও কি তাই নয়? ছেলেদের কথা শুনেও তো তাই মনে হচ্ছে আমার। এইসব ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে যচ্ছি, রিটিশ কাউন্সিলের সামনে এসে এক ছাত্রের সঙ্গে দেখা। খুব ব্রাইট ছেলে। একটা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, আরেকটার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দেখামাত্র আমার মুখ থেকে প্রশ্ন ছুটে গেছে—"এই যে কুনাল! এক মিনিট দাঁড়াও তো? প্রেম কী জিনিস? একটা ডেফিনিশন দিতে পারো আমাকে?"

সে ছাত্রও সোজা পাত্র না। সুটপ্রেই মুহূর্তে কিছুই আমাকে অবাক করে না' আঁতেল টাইপ। ঝোলা গোঁফ। প্রশ্ন শুনে, যেন-এরই আশা-করছিল-এমনিভাবে বিনা বিস্ময়ে, বইখাতা বগলে পুরে প্রথমে কিছুক্ষণ, মিনিটখানেক হবে, উটমুখো হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। ভাবছে। ভাবুক ভেবেচিন্তে বলুক।

তারপর কুনাল তর্জনী তুলে বললো—"ইলেকট্রিকের বাল্বের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তারটা আছে, 'ফিলামেন্ট', যেটা কেটে যায় আর কি, দেখেছেন তো দিদি? প্রেম হলো ঠিক তাই। অথবা, ধরুন এই প্রদীপের সলতেটা। তা বলে কিন্তু মাইন্ড ইউ, প্রদীপের তেলটা, কিম্বা বাল্বের ইলেকট্রিসিটি, ওগুলো প্রেম নয়। ওটা আবার অন্য জিনিস। বুঝেছেন তো?" বেশ অন্তরঙ্গভাবে চোখ মটকালো ছাত্রটি। এবার আমার ঘাবড়াবার পালা

"অন্য জিনিস? কী জিনিস বাবা? ঠিক বুঝিনি।"

আমার সরল প্রশ্নে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে ছাত্র আমাকে বলে, "বোঝেননি? তাহলে আরেকদিন বুঝিয়ে দেবো দিদি, আজ হাতে সময় নেই, লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবে—" ছুটতে শুরু করেই থেমে পড়ে, নাটকীয়ভাবে হাতজোড় করে জ্যাকি শ্রফ মার্কা গোঁফের তলায় নকল করে মিষ্টি হেসে কুনাল বলে—"আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা" —বলেই লাইব্রেরির দরজায় সেঁধিয়ে যায়। অদূরেই মনে হলো যেন একটি অপেক্ষমাণা সালোয়ার কুর্তা নড়ে উঠলো, একটি ওড়না দুলে উঠে কুনালের দিকেই এগিয়ে এলো বাল্বের ফিলামেন্ট অথবা প্রদীপের সলতের মতো।

দূর হোকগে ছাই সম্পাদকীয় ফরমাশ। প্রেমের আবার এ প্রজন্ম-সে প্রজন্ম কি? কেবল

বাজে কথা। প্রেম তো জন্মজন্মান্তর ধরেই যে-কে-সেই। প্রেম সব যুগেই প্রেম। প্রেম সব দেশেই প্রেম। আমিও যেমন! তিনপুরুষ আর চোদ্দপুরুষে কিছু তফাৎ নেই। যাঁহা শাজাহান, তাঁহা এলিজাবেথ টেলর, টাইপগুলো কেবল আলাদা। কেউ ম্যারাথন, কেউ রিলে রেস। ছোটে সবাই প্রাণপণে। যে যেটুকু রাস্তা পারে। বাবা-মা ছুটেছেন তাঁদের মতন। আমরা আমাদের মতন। এরা ছুটবে এদের মতন।

বাড়িতে ফিরতেই করুণাসিন্ধু হয়ে এসে পিকো নিজেই বললে—"মা, দিবাকর এসেছে। ভাটপাড়ার বামুন। ওকে নিয়ে তোমার স্পেসিমেন স্যাম্পলিং করবে না?"

"ও, দিবাকর এসেছিস? শোন্ বাবা," আমি বসে পড়ে জুতো খুলতে-খুলতেই বলি—"বল্ দিকিনি তুই প্রেম বিষয়ে কী ভাবিস?"

"কিস্যুই ভাবি না!" হাস্যবদনে দিবাকর বললে ধুতিপরা পা নাচাতে নাচাতে। "ভাববার আছেটা কী?"

"মানে?"

"মানে কল্পনোই ভাবিনি। ভাববার কী আছে এতে?"

"প্রেমে বিশ্বাস করিস?"

"বঃ, অবিশ্বাস করলেই হলো? এত কীর্তন, বৈষ্ণব গীতিকবিতা, মেঘদূত, গীতগোবিন্দ লেখা হয়ে গেল, রবিঠাকুর এত গান লিখলেন, অবিশ্বাস করলেই হলো? আমাই ইজ ফাক্ট। ফাক্ট থাকলেই ভাবতে হবে? পিপীলিকাভুককেও তো ফাই। জগতে আছে—আমি কি তাই নিয়ে ভাবি?"

"কিন্তু প্রেম আর পিপীলিকাভুক—"

"থাকুক, তাতে আমার কি? আমার ওসব নিয়ে ভাবার টাইমও নেই, ইনক্লিনেশনও নেই।"

"তোদের তো বৈষ্ণববাড়ি।" ভয়ে ভয়ে বলি।

"তাতে কি হলো?" দিবাকর বলে। "বৈষ্ণবরা ভিগেরিয়ান বলে জীবহিংসা হয় না। নিরিমিষ্যি খাই। ব্যাস্। ঐ পর্যন্তই যা প্রেম। জীবে প্রেম নিয়ে কোনো বলতে পারেন।"

"তোর বন্ধুবান্ধবেরা তো খুব ভাবে। উমা তো এনগেজড হয়ে গেল।"

"ওঃ উমা? উমার প্রেম? তাও জানেন না বুঝি? শুনুন তবে! উমা আর রমেশের ব্যাপারটা হচ্ছে সিম্পল! টিউশনের এম্প্লয়েট ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছিল। এ পায় ছ' হাজার, তো ও নিয়ে নেয় পাঁচ হাজার। তার চেয়ে বিয়ে করে ফেললে জয়েন্ট টিউটোরিয়াল হোম খুললে বিশ পঁচিশ হাজার তুলতে পারবে। তাই প্রেম। একে আপনি প্রেম বলবেন?"

আমি নির্বাক। আমাকে নির্বাক করতে পেরে দিবাকর খুব খুশি। বেড়ালের মতন গোঁফ নাচিয়ে হাসলো।

"এসব আপনি বুঝবেন না! এরা যে-যার বিজনেস ইন্টারেস্টে পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়। আপনারা ভাবেন প্রেম। এর বাবার টাকা দেখে, ওর বাবার নাম-যশ-প্রতিপত্তি দেখে, কারুর ফর্সা রঙ দেখে, আরেকজনের মার্কশিট দেখে—হুঃ, এই তো এদের প্রেমের সব উৎস। দূর। ওসব আবার প্রেমে পড়া নাকি? ওতে ভুলবেন না দিদি।" দিবাকর সাবধান করে দেয়, কচি গোঁফ নেড়ে, খুলো বেড়ালের মতন।

"এ প্রেম সে প্রেম নয়! আপনারা যাকে প্রেম বলতেন। এ হচ্ছে অন্য মেজারমেন্টের। আমাদের যুগের আসলে মেটিরিয়লটা অন্যদা। ঐ হয় স্বার্থের হিসেব, আর নয় তো খেলা। প্রেম বলে কিছুই এখন প্র্যাকটিসড্ হয় না যা হয় সেটা একটা প্যাসটাইম। প্রেম-প্রেম খেলা। লাইক এনি আদার গেম। সময় কাটানোর প্রণালী। যেমন ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল। শব্দসন্ধান। শিকার। মৃগয়া। ক্রিকেট। তেমনি। উত্তেজনা আছে। হারজিৎ আছে। কমপেটিশন-এর মজা আছে। সবই

BanglaBook.org

আছে, কেবল প্রেম নেই। ও আপনাদের সময়েই ফুরিয়ে গেছে। আমাদের যুগে ছিটেফোঁটাও নেই।"

"তুমি একটা এতবড় পণ্ডিতবাড়ির ছেলে হয়ে, দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র হয়ে এমন বলছ? ছিঃ।"

"ছিঃ তো কি যা বুঝেছি অনেস্টলি তাই তো বলবো? নাকি বানিয়ে বানিয়ে কাব্য করতে হবে?"

মন খারাপ হয়ে যায়। একের পর এক নবীন যুবক এসে প্রেমকে নস্যাৎ করে যাচ্ছে। বিশ্বের ভবিষ্যৎ তবে কী? আমার কাতরতা আর চাপতে পারি না। বলে ফেলি: "তোর কী রে? যাকেই ধরি, সেই বলে প্রেমট্রেম সব বাজে কথা। তোদের জেনারেশনটাই—"

"আপনার যে গোড়ায় গলদ! আপনার স্যাম্পলিংয়েই ভুল হচ্ছে। র‍্যানডম তো হচ্ছে না। সবাই তো পিকোরই বন্ধু। কিছু একটা মিল না থাকলে বন্ধু হয়েছে কেন এরা? এটাই মিল। সবাই একরকম কথা তো বলবেই। আপনি বড় রাস্তার মোড়ে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে এক্রি থার্ড পথচারীকে ধরুন। সেই স্যাম্পলিং-এর রেজাল্টটা নির্ভরযোগ্য হবে যদি সায়েন্টিফিক মেথড ফলো করতে চান।"

"আমি বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে এক্রি থার্ড পথচারীকে ধরব? ধরে জিজ্ঞেস করব—আপনি প্রেমে বিশ্বাস করেন? তারপর আমাকেই ধরে মারবে না তো ওরা? নইলে মলিসিটিংয়ের জন্য পুলিস আমাকে ভেলে পুরে দেবে না?"

দিবাকর একটু লজ্জিত হয়। আঙুল কামড়ে চিন্তিত মুখে জানায়: "আইডিয়াটা অবশ্য আমার স্ট্রাইক করেনি।"

"তারপর, বরং ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা সোসিল কেটে কোয়েশ্চেনেয়ার বিলিয়ে দিন—সেটাই ভালো হবে।"

"কেউ ফেরৎ দেবে না। কে কালেক্ট করবে? তুই করবি?"

"ওরে বাবা!"

"তবে? দ্যাট্স তোদের মুখেই যত বড় বড় কথা কেউ কোনো ভার নিতে চায় না।" বকতে বকতেই টের পেলুম হঠাৎ আসল কথাটা বলে ফেলেছি এটাই এদের এই প্রেম-বিমুখতার মূল কারণ! দায়হীনতার লোভ। নির্দায়, নির্ভার, স্বাধীন, মুক্ত জীবন এদের কাম্য, কর্মময় হলেই ভালো, অলসময় হলেও ক্ষতি নেই (যতদিন ক্ষতি না থাকে)। প্রেম মানেই বন্ধন। মানেই দায়দায়িত্ব। হৃদয়ের, জীবনের। মর্মের, কর্মের। এরা জীবনে দেয়াল তুলতে চায় না।

এটা কি আদর্শবাদ? নাকি একেই বলে স্বার্থপরতা? প্রেমের মূলে আছে অংশগ্রহণ, 'শেয়ার' করা। সুখ দুঃখ, মান-অপমান, হার-জিৎ—সব ভাগ করে নেয় প্রেমিক। এ প্রজন্ম বোধহয় ভাগ নেওয়াতে বিশ্বাসী নয়। সবাই যার যার তার তার। কে যেন বলেছিল না? যে যার সে তার? সুদীপ কি? না টুবলু? না প্রতিম? না দিবাকর? সবাই একরকম শোনাতে শুরু করেছে আমার মনের মধ্যে এবারে। সত্যিই কি বদলে গেছে এই প্রজন্মে ভালোবাসার মূল্যবোধ?

ভাবছি, এমন সময়ে দিবাকর ফিরে এলো। নিচে নেমে এসে দিবাকর নিজেই বললো, "আপনি কি মন্দার সঙ্গে কথা বলেছেন? মন্দাকিনী রায়?"

"না তো?"

"বলে দেখবেন অন্য একটা অ্যাংগল পাবেন। ওই তো ওপরে বসে আছে। ডাকবো?"

"ডাকবি? তা, পিকো তো ওকে ডাকেনি?"

"ডাকবে কেন? আপনি তো মেয়েদের মতামত চাননি? এর প্রবল ওপিনিয়ন আছে!"

"এই কি কবিতা লেখে? কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলো, দাগে আর বিয়াত্রিচে—"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সেই। মন্দা! মন্দা! নিচে আয়। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে! ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু!"

পরমা সুন্দরী একটি ছবির মতন মেয়ে এলো।

"কী পড়ো?" মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো, —"এম. এ. ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছি।" গলাটিও মধুর।

"তুমি কি প্রেমে বিশ্বাস করো, মন্দা?"

একটুও না ঘাবড়িয়ে নাম ঠিকানা বলার মতো সহজে—"নিশ্চয়ই!" বেশ জোরের সঙ্গেই মন্দাকিনী জানায়।

"মানে?" আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল।

"মানে? আমি মনে করি প্রেমই সব। প্রেমের জন্যেই মানুষ বাঁচে। বাঁচতে হলে তো একটা মোটিভেশন লাগে? কেউ টাকা রোজগারের জন্যে বাঁচে, কেউ নামযশ করবে বলে, আমি বাঁচি প্রেমের জন্যে।"

"প্রেম মানে? জীবে প্রেম? গান্ধীজী, বুদ্ধদেব..."

"না না, প্রেম মানে এমনি প্রেম। একজন মানুষের জন্যে আরেকজন মানুষের ব্যাকুলতা। তাকে কাছে পাওয়ার জন্য, তাকে চোখে দেখার জন্য, তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য, তার স্পর্শ পাবার জন্য—এইসব। দিবাস্বপ্নে, নিশাস্বপ্নে, সব সময়ে তারই কথা ভাবা। সেই প্রেম।"

"আই সী।" আমি কেমন কথা বুঁজে পাচ্ছি না। মন্দাকিনী অত্যন্ত স্পষ্টবাদিনী রোমান্টিক।

"হাতে এসে গেলেই কিন্তু গেল!" মন্দা বলে।

"অ্যাঁ, কী বললে?"

"বলছি, প্রেম যতদিন অপূর্ণতার মধ্যে, অতৃপ্তির মধ্যে, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকে ততদিনই প্রেম বেঁচে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে আর যেই প্রেমে প্রাপ্তি এল, তৃপ্তি এল, অমনি সুপ্তিও চলে আসে। তারপরে প্রেম শুকিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়। তখন জীবন বুব বোরিং।" মন্দা হাসে। এ তো একেবারে আমার মার কথাই বলছে! কোথায় জেনারেশন গ্যাপ?

"ঘুম থেকে উঠতেই ইচ্ছে করে না। যতদিন না আবার প্রেমের উদয় হচ্ছে।" মন্দা আরো জানায়।

"আবার উদয় হয়?"

"বাঃ! হবে না? প্রেম তো সূর্যের মতো। অনবরত অস্ত। আর উদয়। উদয় আর অস্ত। পার্মানেন্টলি এমন সময় তো আসবে না, যখন সূর্য নেই। সেটা রাত্রি। রাত্রি কেটে যায়। প্রেমের ভোর হয়। প্রেমের সূর্যোদয় হয়। নতুন প্রেম আসে জীবনে।"

—"তুই বুঝি অনবরত প্রেমে পড়িস মন্দা?"

—"অনবরত। আমার তো প্রেমময় জীবন!"

হাসতে হাসতে মন্দাকিনী বলে—"শ্রীচৈতন্যদেবের টাইপের মেয়েছে কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না? আমি সেই টাইপ। আপাতত দিবাকরদা কিছুতেই অ্যাটেনশন দিচ্ছে না সেটাই মুশকিল। বলুন তো একটু দিবাকরদাকে? বলছি এত করে—"

"ও, এই ব্যাপার? দিবাকর!"

"মাপ করবেন, দয়া করে মন্দাকিনীর সঙ্গে প্রেম করতে আদেশ করবেন না। প্রেম আমার লাইন নয়। মন্দাকিনী আমাদের পাল্টি ঘর, চমৎকার মেয়ে, ছোড়দার সঙ্গে সম্বন্ধ করছি, হয়ে গেলে হয়ে যাবে। আমাকে কেন? ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।"

আমিও মত বদলে ফেলি

"তুমি বরং ওর ছোড়দাকেই—

"ছোড়দা বিলেতফেরৎ, পাত্র ভালো, চাকরি করে, মাছ মাংস খায়, দেখতেও ভালো, মন্দার

BanglaBook.org

সঙ্গে ওকেই মানাবে। —তখন থেকে এটাই বোঝাচ্ছি যের প্রেমের সূর্যোদয় হবে। এবারকার মতন এ সূর্যটাকে অস্তেই নামিয়ে দে!"

আমিও বলি, "দিবাকর সুবিধের পাত্র হবে না। ছোড়দাই বেটার মনে হচ্ছে।"

মন্দাকিনী মিষ্টি হাসলো। প্রশ্রয়ের সুরে বলল: "ওভাবে তো হয় না? যতদিন দিবাকরদা এই...এরকম করবে, ততদিনই আমারও যে "

"তার চেয়ে, দিবাকর তুই ওর প্রেমে পড়ে যা—তাহলেই চোঁচাঁ পালাবে মন্দাকিনী! ওর সবই ওই রোমান্টিক অপ্রাপ্তি" —এবার পিকে গভীর উপদেশ দেয়। —"প্রাপ্তির একটু লক্ষণ দেখালেই মন্দা আর সেখানে নেই। ভয়ানক prude মেয়ে! মুখেই যত!" মন্দা মিষ্টি মিষ্টি লজ্জা লজ্জা হাসে। অস্বীকার করে না।

দিবাকর বলে, "দাঁড়া, তোকে কালই নিয়ে যাচ্ছি সায়েন্স কলেজে ছোড়দার ল্যাবে"—

আরেকটা দৃষ্টিকোণই বটে। মেয়েদের পত্রিকার সাক্ষাৎকারে এটা ছিলো না। এটা কি প্রেমে বিশ্বাস? না প্রেমে অবিশ্বাস? মোদ্দা কথাটা ঠিক ধরা গেল কি? ও কি আমাদের ছোটোবেলার মতন...ও কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথের গানের মতন...রিমঝিম্ এক প্রবল প্রেমিক, আর এই মন্দাকিনী আর এক। অতিবড় ঘরণীরা না পায় ঘর। মন্দার প্রেমে বিশ্বাসটাকে কিন্তু 'প্রেমে-অবিশ্বাস' বলেই সন্দেহ হতে থাকে আমার। ওই, যাকে দিবাকর বলছিল 'পাসটাইম' সেরকম লাগছে না কি মন্দার এই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের ব্যাপারটা?

ও কেন? অনেকেই আছে প্রেমে বিশ্বাসী। আগের মতোই। চুলোলি যেমন। মস্ত-ধনীর একমাত্র আদরিণী সন্তান, স্বেচ্ছায় নিম্নমধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু একান্নবর্তী পরিবারের এক দোকলির বড় ছেলেটিকে বিয়ে করে বহাল তবিয়তে খুবই শান্তিতে ঘরকন্না করছে। কে বললে প্রেম নেই? স্যাক্রিফাইস নেই? রুপোলিকে আমি দেখিনি? ওকে প্রশ্ন করতে হয়নি প্রেম সম্পর্কে ওর ধারণা কী? নওরোজকেও দেখেছি। ওই যে থাইরয়েডের অসুখের করণে স্থূলাঙ্গিনী কিন্তু বুদ্ধিমতী গুণবতী চৈতালীকে বিয়ে করলো। পাঁচবছর বাগ্‌দত্ত থাকার পর, বিলেত থেকে ফিরে এসে চৈতালীকে নিয়েই ঘর বেঁধেছে নওরোজ। ওরাও তো আমারই ছাত্রছাত্রী। সুদীপ-দিবাকরের প্রজন্ম। আর যাই হোক সাক্ষাৎকারে কেউ সত্যি কথা বলে না। খবরের কাগজকেও না, বন্ধুর মাকেও না, মাস্টারমশাইকে তো নয়ই। প্রশ্ন করে কিছু হবে না। চোখই একমাত্র সাক্ষী, চোখটাকে তীক্ষ্ণ করতে হবে। এই সুদীপকেই তো পাঁচবছর ধরে একটাই মিষ্টি মতন মেয়েকে মোবাইকে করে নিয়ে ঘুরতে দেখছি। সুদীপের গার্লফ্রেন্ড। গার্লফ্রেন্ড কাকে বলে এরা? এদের মুখের ভাষা, আর কাজের ভাষা আলাদা। দিবাকরকে ছেড়ে আমি ঘরে যাই। নোটবই খুলে প্রবন্ধ লিখতে বসি। সঞ্চিত ডেটা অ্যানালাইজ করে দেখি, আরে, মা জননীর ঘোষিত মতামতের সঙ্গে স্বরূপের কর্মকাণ্ডের বা সুদীপের, কি দিবাকরের বস্তুনির্যোষের তো বিশেষ পার্থক্য নেই? কেবল মার স্টেটমেন্টটা পজিটিভ, ওদেরগুলো নেগেটিভ। দু'দলের বক্তব্যই মূলত 'প্রেম'-বিষয়ে এক—কথা: প্রেম অতি মূল্যবান, সূক্ষ্ম, দুরূহ, মহার্ঘ, সুকুমার, দুষ্প্রাপ্য। প্রেমকে হতে হবে নিঃস্বার্থ, নিষ্কারণ। প্রেম প্রয়োজনের চাপে বাঁচে না। প্রেম মূলহারা ফুল, ভাসে জলের 'পরে। হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে, ধরা দেবার ধন সে তো নয় অধরা মাধুরী। মোটামুটি বিভিন্ন বিপরীত অ্যাঙ্গেল থেকে এই কথাই বলা হয়েছে। প্রেম অধরা মাধুরী।

মা বলছেন প্রেমকে বাঁচাতে হলে বিয়ে কোরো না এরাও আরেকভাবে সেটাই বলছে এদের বক্তব্য: এই অতিবাস্তব অতিস্বার্থ-সংঘাতময় জীবনে প্রেমকে ধরা যাবে না ধরতে যেও না। মানুষ বেঁটে হয়ে গেছে। প্রেম জিনিসটা আর আজকের পার্থিব মানুষের হৃদয়ের নাগালে নেই। যেমন বুকের মধ্যে ভগবানের নাগাল না পেলেই লোকে বলতে থাকে ভগবানে বিশ্বাস করি

BanglaBook.org

না। অথচ যন্ত্রণা, অপমান, পরাজয়ের মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে দৈবের নাগাল পেতে চায় অবিশ্বাসীও। এখনও তেমনি। তাহলে খুব কি একটা খারাক হয়েছে? বদল হয়েছে প্রেমের তত্ত্বে? বোধহয় না। তত্ত্বটা একই আছে। তফাৎ হয়েছে প্রযুক্তিতে। প্র্যাকটিসটা বদলে যাচ্ছে। আমাদের প্রজন্ম আকছার 'প্রেমে-পড়ত'। 'প্রেম-করত' কম। এরা প্রেম 'করে', প্রেমে 'পড়ে' না। 'প্রেম'-কে ভয় পায়। দায়িত্বকে ভয় পায়। হালকা হয়ে বাঁচতে চায়। এমন সময়ে একটা ফোন এল।

এই ফোন, আর কলিং বেল। কলম ধরেছি-কি-ধরিনি, অমনি দুদিক থেকে এই সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আর যেদিন বোর হয়ে একা একা ঘরে বসে থাকি, সেদিন দুটোই নিস্তব্ধ! উঠে গিয়ে ফোন ধরি।

"হ্যালো, আন্টি? এনি নিউজ অব টুমপা?"

এই তো! সেধে এসে জালে ধরা দিয়েছে! আরো এক ধাপ নিচের প্রজন্ম, আমার ছোটো মেয়ের বন্ধু। রিম্‌ঝিমের সঙ্গে পড়ে ছোটো মেয়ে কলকাতার বাইরে পড়ছে। আমি খপ করে ধরি:

"হ্যালো, গীতু? তুই প্রেম বিষয়ে কী ভাবছিস?"

"হোয়াট? আর ইউ সিরিয়াস?"

"ভীষণ। প্রেম বিষয়ে তুমি কিছু ভাবছো কি?"

"প্রেম বিষয়ে কী ভাবছি? ডিড ইউ সে দ্যাট?"

"আজ্ঞে হাঁ। প্রেমে বিশ্বাস করিস? না করিস না?"

"ও শিওর। অফ্‌টি! হু ডাজন্ট?"

"সম সে দে ডোন্ট।"

"দে ওনলি সে সো ইভ্‌ন দে ডু।" বলল গীতু সিং। এখনও কুড়ি হয়নি ওদের। "ইউ ডোন্ট বিলীভ দেম, ডু ইউ আন্টি? জগতে কেউ নেই যে সত্যি সত্যি প্রেমে বিশ্বাস করে না। নো ম্যাটার হোয়াট দে সে!"

"বলছিস তুই?"

"নিশ্চয়। পৃথিবীতে প্রত্যেকে প্রেমে বিশ্বাস করে। ডোন্ট ইউ?"

"আমি তো করিই।"

"তবে? তুমিই বরং নাও করতে পারতে। তোমার তো, এক্সকিউজ মাই সেইং দিস, কিন্তু তোমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা তো প্রেমের খুব ভালো হয়নি, উইথ্ আংকল রানিং অ্যাওয়ে উইথ অ্যানাদার লেডি? স্টিল্ তুমিও যদি প্রেমে বিশ্বাস করো, অন্যেরা কেন করবে না? দোজ হু সে দে ডোন্ট, লাই। খবরদার বিশ্বাস কোরো না। ইটস ফ্যাশনেবল টু সে দ্যাট। বুলশিট!"

"ল্যাংগুয়েজ, ল্যাংগুয়েজ!"

"হোয়াট ল্যাংগুয়েজ? যত মিথ্যেবাদি, ওদের কথা কানে তুলো না। তুমিও যেমন!"

"তাহলে তুই বলছিস যারা বলে প্রেমে বিশ্বাসী নয় তারাও আসলে বিশ্বাস করে?"

"অফ কোর্স! দে আর ওনলি ওয়েটিং ফর ইট টু হ্যাপেন টু দেম! লুক, আন্টি! সবার জীবনে তো প্রেম আসে না? ইটস আ রেয়ার ইভেন্ট। তাই না? আ মেনি স্প্লেনডারড থিং। তুমিই বলো? ইউ আর দা পোয়েট!"

"আরে তুই মনে হচ্ছে প্রেমে পড়েছিস?"

"কে বলল?"

"কে আবার বলবে? তুই বলছিস! তোর কথাবার্তা!"

"ওয়েল? ইউ মে বি রাইট!" সলজ্জ মৃদুহাস্যের ঝংকার শোনা যায়।

BanglaBook.org

"ছেলেটা ভালো তো?"

"আই থিংক সো।"

"প্রেমে বিশ্বাস করে তো?"

"হোলি ননসেন্স—তখন থেকে বলছি সব্বাই করে, এভরি ওয়ান, তোমাকে মুখে যে যাই বলুক, মনে মনে সবলেই প্রেমে বিশ্বাস করে আসি। কে-না-কে তোমাকে এসে প্রেমস আর সাওয়ারের গল্প বলে দিল, আর তুমিও সেটা দীব্যি শুনে নিলে! ওসব গুল্ খেতে নেই! খেতে নেই! ইউ পিপ্‌ল অর অ্যাবসার্ডলি গালিব্‌ল! সত্যি তোমরা বাবা মায়েরা না, —অ্যাতো সিম্প্‌ল!"

"আমরা সিম্প্‌ল, গালিব্‌ল, আর তোরা পাকাবুড়ি?"

"কোয়াইট। লোকের মুখের কথায় কক্ষনো বিশ্বাস করবে না· কাজটা দেখবে। ট্রাস্ট ইওর কমনসেন্স, নট ইওর ইয়ার্স, যত সব আঁতলামির কথা! কে? কে বলেছে? শুনি? নামটা বলো তো? দেখিয়ে দেবো মজা।"

গীতুর মুখখানা খুবই মিষ্টি, কিন্তু স্পষ্টবাদী। লড়াকু স্বভাব একহাত লড়ে নিতে পারবে। সুদীপ, প্রতিম, দিবাকর, পিকো, কাউকেই তোয়াক্কা করবে না কাউকে বেয়াৎ করবে না। যা গুণ্ডা মেয়ে গীতু! হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মাথায় খেলে গেল।

"আচ্ছা, গীতু, তোর কি একটা বেগুনীরঙের সোয়েটার আছে?"

"বেগুনি? মভ্ আছে। একটু লাইট বেগুনীর মতোই। কেন?"

"ও কিছু না হঠাৎ এমনি মনে হলো।"

এমন সময়ে নিচে আবার রিং হলো। পিকো খেঁচা মারলো, "ওই নাও ফোন ছাড়ো, হয়তো আবার তোমার কোনো শিকার এসে গেছে। যাও ঝাঁপিয়ে পড়ো।"

সত্যিই একটি সুদর্শন তরুণ সরলবিশ্বাসে ওপরে উঠে এলো। একে আগে কখনও দেখিনি। লিট্‌ল ম্যাগাজিন, না পিকোর বন্ধু, ভাবছি, হঠাৎ পিকো চেঁচিয়ে ওঠে

"শৈবালদা! শৈবালদা! মা ফোন ছাড়বার আগেই চটপট ওপরে পালিয়ে এসো, আমার মায়ের পাল্লায় পড়ে যেও না যেন! মা তোমাকে দেখলেই প্রেমের কথা বলতে শুরু করে দেবেন কিন্তু...মার দারুণ প্রেমরোগ হয়েছে!"

অপরিচিত তরুণের চোখের সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আমি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

BanglaBook.org

মেসোমশায়ের কন্যাদায়

ভদ্রমহিলার পাতে মাছটা প্রায় দেওয়া হয়েই গিয়েছে, হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসে পড়লেন মেসোমশাই—"তুইল্যা ফ্যালও, তুইল্যা ফ্যালাও!"

পাতের ঠিক এক ইঞ্চি ওপরে তখন রুইমাছের পেটি ত্রিশঙ্কু—

—"ওনারে জিগাইসিলা?"

—"না তো।"

—"ওই তো দোষ। পরিবেশনের একটা রুলস আছে না? জিগাইয়া লইয়া তবে দিতে হয়। পয়লা কইতে হয়—"আপনি কি মাছ নিবেন?" মহিলা এই সময়ে বললেন—"হ্যাঁ।" মেসোমশাই সেটা কানে তুললেন না। আমাকে বললেন—"বল? কর্তৃ বল? আপনি কি মাছ নিবেন?" মহিলা পুনরায় স্পষ্ট গলায় বললেন—"হ্যাঁ!" আমি আর না পেরে ঝুলন্ত মাছটা ওঁর পাতে দিয়ে ফেলি। মেসোমশাই যারপরনাই হতাশ মুখে বললেন— "আজকালকার ইয়ংম্যানদের মেইন ডিফেক্ট তো এই! ঠিক যেইটা কইলাম তার অপোজিটটা করলা তো? না জিগাইয়াই দিলা। এইভাবেই ওয়েইস্টেজ হয়। সরকার তো এইটাই মানা করে। যেমন সৌম্য ডিস্‌ওবিডিয়েন্ট, তেমনই তার বন্ধু!"

আমি এবারে আরো বোকার মতো, ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করে বসি "আপনি কি মাছ নেবেন?"

মহিলা আবার বললেন— "হ্যাঁ!"

মেসোমশাই অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন।—"রাইট! লাস্ট মার্ক দিল। জিগাইয়া লইয়া তবে সেটা পাতে দিতে হয়। দ্যাও দ্যাও ওনারে আরো দুইখান মাছ দাও দেখি—মনে হয় মাছটা উনি ভালই খান। মাছ যারা ভাল খায়, তারা আবার অনেকেই খাসির মাংসটা তত ভাল খায় না।"

মহিলা বললেন— "আমি কিন্তু মাংস খেতেও ভালোবাসি।"

এবার জিতে একটা অদ্ভুত শব্দ করে মেসোমশাই অভয় হস্ত উত্তোলন করেন—

—"আহাঃ আপনের কথা হয় নাই। জেনারেল ডিসকাশন হইতাসে। আপনের লইগ্যা মাছ মাংস সবই আছে, ভয় নাই, তাড়াহুড় কইরা লাভ কি? অল ইন গুড টাইম। মাছটা খাইয়া লন, মাংসও ঠিকই পাইবেন আরে ও সৌম্য, চিংড়িমাছটা এইধারে আনস নাই?" হাঁকতে হাঁকতে ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে যেতেই পথিমধ্যে মাসিমার সঙ্গে মুখোমুখি। ক্রুদ্ধ ফেটনির মতো মাসিমা বললেন—

—"কী বলছিলে তুমি? কী উচ্চারণ করলে এইমাত্র?"

—"কইতাসি যে চিংড়িমাছটা-"

—"চিংড়িমাছ? চিংড়িমাছ হয়নি, তা জানো না?"

মেসোমশায়ের মাথায় হাওড়া ব্রীজ ভেঙে পড়ে।

—"হয় নাই? স্টেইন্‌জ। সেইদিন যে মেনু হইল?"

—"মেনু হলো, খাওয়াও তো হলো। ভেবে না সেদিন ইয়া বড় বড় গলদাচিংড়ি? চিনুর পাকাদেখার দিনে? বিয়েতে চিংড়িমাছের কথা কবে হলো?"

—"আলবৎ কথা হইসিল।"

—"কক্ষণো হয়নি।"

—"সার্টেনলি হইসিল।"

—"কখনো হয়নি। হয়নি হয়নি।"

—"ইট শাট আপ।"

BanglaBook.org

—"কেন, কিসের জন্যে আমি শাট আপ? তুমিই বরং একদম মুখ খুলবে না আজকে! ছি ছি গুলিখোর-গাঁজাখোরের মত কী বলতে কী যে বলছ! কী লজ্জা কী লজ্জা!"

—"কান্? লজ্জার হইলটা কী? শুনি? চিংড়িমাছ খাওয়াইতে না পারলেই লজ্জা? এইযার মধ্যে লজ্জার আছেটা কী?"

—"লজ্জার এই যে, তোমার বাকি শুনে সকলে ভাবলো যে মেনুতে চিংড়ি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইচ্ছে করেই এই ব্যাটে ওটা দিলুম না এটাই ভাবলো সকলে। ছি ছি—"

—"অত ছি-ছি-য়ের কী আছে? মোটেই কেউ তা ভাবে নাই। সকলেই জানে আমি সার্ভিস করি, সার্ভিস। বোঝলা? আমি কি বিজনেস করি, যে হোর্ডিং করুম? হোর্ডিং করা আমাগো নেচার না।"

বোধহয় ঐ 'হোর্ডিং করা' শব্দটাতে মাসিমার ইংরিজি হোঁচট খায়। তিনি বলেন— "ওসব জানি না বাপু, লোকে যা ভাবার তাই ভাবলো। ব্যাস যে তোমার নেচার যেমনই হোক্।"

—"আরে, ভাবে নাই, ভাবে নাই। আর যদি ভাইবাই থাকে, আমি অহনই যাইয়া অগো কইয়া দিতাসি, যে, মশয়, আইজ কিন্তু চিংড়িমাছ হয় নাই।"

এই সময়ে বুড়োদা এসে মা-বাবার মধ্যস্থলে দাঁড়ান, বাবার স্টেট হয়ে। বুড়োদা মধ্যপ্রাচ্যে শাঁসালো চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। বছর দুই বাদে এই তাঁর প্রথম ঘরে ফেরা। মাত্র তিন হপ্তার ছুটিতে, বোনের বিয়ে উপলক্ষে। প্রচুর সাড়া জেগেছে, আত্মীয়মহলে ('বুড়ার ঘড়িটা দেখসস?' 'বুড়া কোন্-দিকে?') রমরমা পড়ে গেছে। কিন্তু মেসোমশাই কিছুতেই ঠিক মত বুড়োদাকে পাত্তা দিচ্ছেন না। যেন কোনোদিনই বাইরে যাননি ছেলে। ভাবখানা এমনি। বুড়োদার স্টেট সহ্য হচ্ছে না। তাই চান্স পেলেই তিনি বাবার কাছে জোর গলায় ইম্পর্টান্স আদায় করছেন। বাবা-মায়ের মধ্যবর্তী হয়ে বুড়োদা বললেন:

—"থাক, বাবা, লেট ইট এন্ড হিয়ার ডোন্ট মেক্ট আননেসেসারি কমপ্লিকেশনস।" অবশ্য বুড়োদা বিন্দু বিসর্গও জানেন না বর্তমান প্রবলেমটা কী। অথবা সমস্যা আদৌ আছে কি নেই।

—"বুড়া, তুমি থামো তো দেহি। কমপ্লিকেশন কি আমি করি? নেভার। হেইডা যে করার সেই করসে তোমার গর্ভধারিণী" মাসিমা চোখ কপালে তুলে বিপুল এক হাঁ করতেই বুড়োদা তাঁর কাঁধটা খামচে ধরে সদরে একটি গুল্ সার্ভ করেন "চলে মা, ওঘরে চলো, চিনু তোমায় খুঁজছিলো।" সাপের কপায় মন্ত্রপড়া জল পড়লো। মাসিমা ছটফটিয়ে কনের কাছে চলে যান।

সৌম্যর বাবা, আমাদের পড়শী এই মেসোমশাইয়ের দেশ পূর্ববঙ্গে আর মাসিমা খাস ঘটি। চল্লিশ বছর একটানা কলকাতায় বাস করার ফলে মেসোমশাই এখন নিভীকভাবে সর্বত্র এক জগাখিচুড়ি বাঙলাভাষা বলেন। কিন্তু তাতে মাসিমার মুখের মিঠে শান্তিপুরী বুলির নড়চড় হয়নি। পাড়ায় যখন ঘটিবাঙালের ঝগড়া হতো, চিনুদি আর মিতুন নিতো ঘটি পক্ষ; ওর মামারবাড়ির আঁচলধরা মোহনবাগান সাপোর্টার—কিন্তু বুড়োদা আর সৌমা বাপ-ঠাকুর্দার বংশমর্যাদা রক্ষা করতে, করএভার ইস্টবেঙ্গল। সেই চিনুদির বিয়ে আজ। সৌমা বলল— "রুনু, তুই বাবাকে আজ একটু চোখে-চোখে রাখিস রে—আমি তো নানাদিকে ব্যস্ত থাকবো, বাবা ওদিকে ফ্রিড্ খালি পেলে হেভি কেলেংকারী করবেন।" এ কাজটা পাড়াশুদ্ধ সকলেরই অভ্যেস আছে পাড়াতে যখনই কোনো সামাজিক কাজ হয়, কাউকে না কাউকে তখন মেসোমশায়ের দিকে 'চোখ' রাখতে হয়— মেসোমশাই কী করতে কী করে বসেন। আর আজ তো একেবারে চরম সামাজিক মুহূর্ত সমাগত—স্বয়ং মেসোমশায়েরই কন্যাদায়! অথচ মহামান্য কন্যাকর্তা হিসেবে মেসোমশাই নিজের ডিউটিটা সম্বন্ধে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছেন না। সম্প্রদান করবেন কনের জ্যাঠা,

BanglaBook.org

নিমন্ত্রণ-পত্রেও তাঁরই নাম। রান্না-বান্নার, 'খাওন-দাওনে'র চার্জে আছেন কনের করিতকর্মা সেজকাকা। কেনাকাটার দিকটা সম্পূর্ণ দেখছেন কনের বড়লোক মামা-মাসীরা, বাড়িভাড়া, বাড়িসাজানো বুড়োদার, বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কনের ছোটকাকা এবং কাকীদের দেখার কথা। রিসেপশানের দিকে আছেন কনের পিসিরা। উৎসববাড়িতে মেসোমশাই কিছুতেই একটা নিজস্ব ভূমিকা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই বলে তিনি যে অলস, অক্ষম, অথবা এলিয়েনেটেড, অর্থাৎ কিনা পার্টিসিপেশনে নারাজ—তা একেবারেই না। অতএব চকীবাড়ির মতো সারা বাড়ি ঘুরে তিনি "কন্যাকর্তার যোগ্য" কাজ নিজেই যোগাড় করে নিচ্ছেন এবং এখানেই সকলের উদ্বেগের কারণ।

আপাতত মেসোমশাই বিয়েবাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরে ভাঙাচেয়ার, এবং ফরাসপাতানো ইন্সপেকশন করছেন। একটা ঘরে ফরাসের ওপরে গোটাকয়েক বাচ্চা আপনমনে খেলছিল। হেনকালে মেসোমশায়ের আকস্মিক প্রবেশ। ঢুকেই তিনি বাচ্চাদের বললেন— "তোমরা মনু, অই ঘরটায় বস গিয়া। ঐ ঘরে কিনা ফরাস নাই, দেখবা ক্যাবল চেয়ার আর শতরঞ্চ।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখটা টিপে—

—"আন্ডগুলো কাস্‌সা বাস্‌সা—দুই-চারিটা প্রসসাব কইরা দিলেই হইল ? —বাস্। সাধের বিয়াবাড়ি ফিনিশ্!" এত্ত অপমান ? মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চারা সব উঠে অন্যত্র পালায়। বছর বারো-তেরোর ধুতি-পাঞ্জাবি—চন্দন কাঠের বোতাম-পরা দুটো পাকা ছেলে কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে উঠে গেল না। মেসোমশাই তাদের বললেন— "তোমরাও মনু উইঠ্যা অই ঘরে যাও। এই ঘর ফর এডাল্টস্ ওন্‌লি।" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে, "পেসাপানগে কথা কওন তো যায় না। প্রস্‌সাব কইরা দিতে কতক্ষণ ?" গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলেগুলি এবারেও উঠে দাঁড়ালো না। একটু সম্মুখ সমরের প্রস্তুতি হব-হব দেখে আমি কেটে পড়তে চাইছি, এমন সময়ে হৈ-হৈ করে দই মিষ্টি এসে পড়লো। সামনেই মেসোমশাই! —"এত মিষ্টি কোথায় রাখবো ?" মেসোমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—"সো-ও-জা উপরে তিন তলায় লইয়া যাও, স-ব অ্যারেন্‌জমেন্ট করাই আছে। রুন্টু, তুমিও সাথে সাথে যাও।"

সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে দেখি সেখানে ছাদে প্যাণ্ডেল বাঁধা, ছাদনাতলা সাজানো হচ্ছে, মিষ্টি রাখার কোনও ব্যবস্থাই নেই। কিন্তু সেখানে অন্য সমস্যা—ছাদনাতলার জন্য কলাগাছ কিনতে ভুল হয়ে গেছে

মিষ্টির ঝুড়িওলাদের নিয়ে আবার নিচে এলাম, মেসোমশাই সেখানে ভাঙা চেয়ারের উঁইয়ের পাশে একটি আস্ত চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের মুখ দেখেই বললেন— "জাগ্‌গা পাইলা না বুঝি ? যাও তবে ভাঁড়ারেই লইয়া যাও "

—"ভাঁড়ারটা কোন্‌দিকে ?"

—"সেইটাও আমারেই কইয়া দিতে লাগবো ? এই বাড়িটা কি আমি প্ল্যান কইরা বানাইসি ? এইখানে তুমিও যেই, আমিও সেই। দুইজনাই অউটসাইডার। এট্টু কমনসেন্স ইউজ করবা তো রুন্টু ? কমনসেন্স লাইফে খুবই দরকার হয়। যাও তোমার মাসিমারে জিগাও গিয়া।"

মাসিমা বেন এখানে আউটসাইডার নন। যদিও প্রত্যেকেই আজ সকালে একইসঙ্গে এ বাড়িতে প্রথম পদক্ষেপ করেছি। মিষ্টিওয়ালাদের নিয়ে আবার ওপরে উঠছি, মেসোমশায় আরেকজনকে ডাকলেন—

—"এই যে লম্বোদর শুইন্যা যাও।" গণেশ সৌম্যর আরেক বন্ধু। — "তুমিও যাও, গিয়া মিঠাইটা গার্ড দাও গা। তুমি তো মিষ্টান্নটা ভালই বোঝ, এই ডিউটি তোমারেই ঠিক সুট করবো, ভাড়ারঘরের সামনাটায় খাড়াইয়া থাকবা, হাতে একটা ছড়ি লইয়া। কেও য্যান্ চুরি কইরা খায় না, মেকুর-বিরাল, কি পোলাপান—বি কেয়ারফুল, বোঝলা ? খুব সাবধান! যাও।"

BanglaBook.org

খানিক পরে একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলল— "কল্টুদা, তোমাকে গণেশদা শিগগির ডাকছে।" গিয়ে দেখি ভাঁড়ার ঘরে সারি সারি দুই মিষ্টির হাঁড়ি-থালার সামনে করুণ বিষণ্ণ গণেশ ছুঁড়ি-হাতে দণ্ডায়মান। যেন জলন্ত জাহাজের ডেকের ওপরে কসাবিহ্বল। একবার বাঁ পায়ে ভর দিচ্ছে একবার ডানপায়ে। আমাকে দেখেই বলল— "যা তো কল্টু, সেজকাকার কাছে, শিগগির একটা তালা নিয়ে, এটা কি মানুষের কাজ? এতগুলো টাটকা মিষ্টির সামনে...এভাবে...মোস্ট ইনহিউম্যান সাইকিক টরচার!"

গণেশের নাম গণেশ নয়, ধ্যানেশ। বেচারী খেটে টেতে একটু বেশি ভালবাসে। এই বয়সেই দিব্যি একটি ভুঁড়ি বানিয়ে ফেলেছে বলে মেসোমশাই ওকে আদর করে ডাকেন "গণেশ।" সেটাই পাড়ায় চালু হয়ে গিয়েছে।

সেজকাকা তো শুনে অবাক —"মিষ্টির সামনে ছুরি হাতে লোক পাহারা? এ্যাঁ? এটা কি ক্ষেত, না খামার?" তালা মজুতই ছিল হাতে, সেজকাকা নিজে যখন তালা মারার তোড়জোড় করছেন অর্থাৎ টেকনিকালি গণেশের ডিউটি অফ হয়ে গিয়েছে, সেই সূক্ষ্ম কয়েকটি মাত্র সেকেণ্ডের মধ্যেই লুকিয়ে গোটা চারেক সন্দেশ স্টাসট সেঁটে ফেলল গণেশ। এত কাইন এবং ফাস্ট ওয়ার্কের সচরাচর দেখা যায় না, এবং গণেশের মতে, এতে নীতিগত কোনো বিরোধও নেই।

এই সময়ে ওদিকে একটা গোলমাল শুনে ছুটে গেলাম

"আঃ হা কলাগাছ আনে নাই তো হইবেটা কী?" মেসোমশায়ের গলা। "চাইর চাইর খানা কলা গাছ দিয়া হইবোটা কী? জানবা যে আমাগো ফেমিলিতে ছাদনাতলায় কলাগাছ লাগে না, নেভার আমাগো গুরুর মানা। বোঝলা? কলাগাছের লেইগ্যা বাজারে গিয়া কাম নাই, সিধা ছাদে চইল্যা যাও চাইর কর্নারে চাইরখানা ইট্টা বসাইয়া দ্যাও ব্যাস্! কাস্ট ক্লাশ" উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মেসোমশাই প্রায় কনভিন্স করিয়ে ফেলেছেন, গণেশ আর আমি ইট খুঁজতে যাব, এমন সময়ে সৌম্যর ছোটকাকা হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির, দুই বগলে চারটে কলাগাছ! —"এই যে, বোকন, হে-ই যাইয়া কলাগাছ কিইন্যা আনছস? যেইটাব দরকার নাই ঠিক সেইটাই! টোটালি আননেসেসারি ওয়েস্টেজ।" বলতে বলতেই দ্রুত স্থানত্যাগ করছিলেন মেসোমশাই, কেননা ওদিক থেকে মাসিমার মঞ্চে প্রবেশ ঘটছে। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। মাসিমা মৃদু ডাক দিলেন—"কই? শুনছো?"

আর না শুনে উপায় আছে? মেসোমশাই দাঁড়িয়ে পড়েন।

"তুমি নাকি বলেছো ছাদনাতলায় কলাগাছ লাগাতে হবে না? তোমাদের গুরুর বারণ?"

—"আরে ধুর্! কে কইল? আমি তো কইলাম 'কানে—কলাগাছে কামডা কী? এইডা কি মা দুর্গার পুত্রের বিবাহ, যে কলাগাছ না হইলেই ওয়েডিং ক্যানসেল? জামাই-বাবাজী কি গণেশ ঠাকুর? নাকি এইডা বৈষ্ণবের কলীপূজা? অরা পটার বদলি কলাগাছ বলি দেয়, ষোড় দিয়া ভোগ রান্ন করে কইরা শুনসিলাম। অগো লেইগ্যা কলাগাছ ইনডিসপেনসিবল। কিন্তু আমাগো ঘরে তো সিমুই আছে।"

মাসিমা এবার বললেন—"হ্যাগা, তোমার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দেব?"

লম্বা জিভ কেটে মেসোমশাই তাড়াতাড়ি বললেন— "তুমি অমন কাঁস দিবা ক্যামনে? তুমি নিজেই তো কাঁস। আমি তো তোমারেই গলায় পইরা ফাঁসি লাগাইসি। দরির কি গলায় দরি হয়? হয় না!" এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক মেসোমশাইকে বাইরে ডাকলেন। মেসোমশায়ের মুখটি মলিন হয়ে গেল। —"অহনই আইতসি," —বলে উপরে উঠে গেলেন হন্তদন্তভাবে। যাবার আগে মাসিমার কান বাঁচিয়ে আমাকে সিঁড়িতে ডেকে এনে বলে গেলেন— "দ্যাখলা তো? মেজো ভাইরা। গাড়ি-ড্রাইভর ধার দিসে কিনা, তাই তখন থিক্যা কাজ নাই কাম নাই আমারে ডাইক্যা ডাইক্যা ক্যাবল ফালতু কথা কইতাসে। যান্ সেই আইজ কনাকর্তা। কতবড়

ডি আই পি লোক। ছঃ। আমি যদি যামুই না নিচে!" বলে, সেজো ছেলে পালালেন, যেখানে কলগাছ লাগানো হচ্ছে। [illegible] আমিই ওপরে গেলাম মেসোমশাইকে ভাত খেতে ডাকতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম বড়মামার সঙ্গে দেখা। পান চিবুতে চিবুতে উঠছেন। মেসোমশাই হঠাৎ ভদ্রতার অবতার হয়ে দাঁত জেড় করে বললেন— "খাওনদাওন ঠিকমতো হইসে তো?" সৌম্যর মামা ঢেঁকুর তুলে বললেন, —"ব্যবস্থা তো চমৎকার, কেবল ভালে নুনটা একটুখানি বেশি পড়ে গেছে, ব্যস।"

"তাইলে আপনা [illegible] লগে থাকলেই পারতেন? খাইবেন তো আপনারই! তাইলে লবণটা আপনের পাতে দিয়া দিলেই ঠিক হইতো!" হতবাক্ শালকের মুখটি কালো করে দিয়ে বীরদর্পে মেসোমশাই নেমে আসেন।

কলকাতার [illegible] বড় ঘর সৌম্যর মামার বাড়ি। উদ্ধাস্ত মেসোমশাইকে ভাল ছাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন সৌম্যর দাদু। কিন্তু মেসোমশাই নিজের শ্বশুরবাড়িকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তাদের অপরাধ, তারা একে ধনী, তায় বটি।

—"কলকাতার কায়েত তো," প্রায়ই বলেন তিনি মাসিমাকে—

—"তোমাগো প্যাটে প্যাটে প্যাঁচ জিলাবীর প্যাঁচ। বোঝলা? ওইটারে তো ভদ্রতা কয় না, কয় কুটিলতা!"

চান্স পেলেই তিনি শ্বশুরবাড়িকে ডাউন দ্যান। নিচে আসা মাত্র আবার মাসিমার একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলাম দুজনে। সাক্ষাৎ মন্ত্রের প্রেমালাপ। মেসোমশাই এবারে টাকটিক্স বদল করেছেন। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।

"এই যে, আইলেন! তোমাগো লাইগাই যত না গোলমাল। নাকি হই হই! খালি হই হই!"

—"আমি আবার হৈহৈটা কী করলুম শুনি। গোলমালের রাজা তো তুমি? তোমার বাধানো গোলমাল সামলাতে সামলাতেই...কী? কী বলেছো তুমি কৃষ্ণার ভাইকে?"

—"কী আবার কইলাম? কৃষ্ণার ভাইডা আবার কেডা?"

—"জান না? জান না তো অত কথা বলা কেন? কাজের বাড়িতে, একবাড়ি কুটুম-বাটুমের মধ্যে—ছি-ছি-ছি! কী লজ্জা, কী লজ্জা! যে বসেছিল, তাকে তুমি বসতে দাওনি, ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছ, আবার বলেছ কিনা ফলাসে নাকি হিসি করে দেবে?"

—"কে কইল? আবে—সমস্ত বাজে কথা। কী কইতে কী যে কয়। বাদ দ্যাও বাদ দ্যাও। আমি তুইল্যা দিমু ক্যান্? আমি তো ক্যাবল কইলাম কাস্সবাস্সা গিশগিশ করতাসে, কওন তো যায় না? প্রসবার কইরা দিতে কতক্ষণ? ফরাসটা শাফ কইরা দিত কি না, তুমিই কও? অ্যাকসিডেন্টালি, পোলাপানগো কথা কওন তো যায় না?"

—"অ্যাকসিডেন্টালি? কৃষ্ণার ভাই ক্লাস এইটে পড়ে সে অ্যাকসিডেন্টালি ফরাসে হিসি করে দেবে? এটা একটা কথা হলো? বেচারী কৃষ্ণা খুবই দুঃখ পেয়েছে, —তার ভাই তো আর জানে না তুমি কী বস্তু? নতুন কুটুম—ছিছি" —কৃষ্ণা সৌম্যর ছোট কাকীমার নাম, কাকার নতুন বিয়ে হয়েছে—এখনও বছর ঘোরেনি। মেসোমশাই সত্যিই এবার লজ্জা পেলেন বলে মনে হলো।

—"আমি কী কইরা জানুম সে শ্যামবা কুটুমবাড়ির পোলা? সবকয়ডা এতাগুতাই তো আসে দেহি তোমার বাপের বাড়ি থিক্যা। আমি তাই—"

—"ও আমার বাপের বাড়ির লোক ভেবে তুলে দিয়েছিলে? এবারে বোঝা গেল!"

—"না, না, না, ঠিক তাও না—একচুয়ালি—সইত্য বলতে কি—"

এমন সময়ে বুড়োদার আবির্ভাব, তাঁর দীর্ঘদেহ নিয়ে, বাবা-মার ঠিক মধ্যস্থলে। দুজনের চাইতেই একমাথা ওপর থেকে বুড়োদা বললেন— "এটা কিন্তু খুব সেন্সলেস কন্ট্রাডিক্টরি কথাবার্তা

BanglaBook.org

হচ্ছে বাবা। প্রথমত, আমি স্পষ্ট শুনেছি যে তুমি বলেছিলে—" অমনি মাসিমা ফুঁসিয়ে ওঠেন—

—"দেখলি তো' বুড়ো, দেখলি তো, তো'র বাবা কী করেন? আমাকে গালিয়ে পুড়িয়ে মারলেন চিরটাকাল"। মায়ের কাঁধে হাত রেখে বুড়োদা সস্নেহে বলেন, "যাক গে, বাবার কথা বাদ দাও মা, চলো, এবার তুমি খেতে না বসলে—"

খেয়েদেয়ে সবারই একটু ভারী ভারী লাগছে, কিন্তু মেসোমশাই হালকা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন এ ঘর ও-ঘর, এ-বারান্দা সে-বারান্দা। একবার আমাকে ডাকলেন— "শোনো, রুন্টু, এইদিকে শুইন্যা যাও" কোনো জরুরী কাজ আছে ভেবে যেই কাছে গেছি মেসোমশাই আমার কানে-কানে ফিসফিস করলেন— "যে-যার বউরে! বোঝলা রুন্টু? যে-যার বউরে!" আমার মুখের বিভ্রান্ত চেহারা দেখে এইবার দয়াবশে উক্তিটি প্রাঞ্জল করে দেন— "মেজো-ভায়রাও তার গাড়িটা দিবে, আরও একটা গাড়ি আমি রেইন্ট করসি। চিনুর মামাগুলা, সব শালার ওই গাড়ি কইরা যে-যার বউরে আনাইতাসে। এতরিওয়ান ব্রিংগিং হিজ ঔন ওয়াইফ। য়্যান্ ওই জন্যই প্যাশে কার-রেন্টাল-সিস্টেমটা চালু আছে। যত সব সেল্ফ-সেন্টারড ঘটি!"

এমন সময়ে সুন্দরী, সুবেশা, মোটাসোটা, এক মধ্যবয়সিনী, ঘামতে ঘামতে এসে ধপ করে সোফাতে এলিয়ে পড়ে আহ্লাদে-গলায় বললেন— "উঃ, বড্ড চা-তেষ্টা পাচ্ছে কিন্তু, জামাইবাবু!" সাধারণত সুন্দরী শ্যালিকার প্রতি ভগ্নীপতির যে মনোভাব থাকার কথা, এক্ষেত্রে তার ঘনঘোর ব্যতিক্রম দেখা গেল। মেসোমশাই গম্ভীর স্বরে বললেন— "ঠাকুরগুলিরে আর অহন আপসেট কইর কাজ নাই, পয়সা দিতাসি, এই লও—" বলতে বলতে প্যান্টের পকেট থেকে একটি চকচকে আধুলি বের করে অন্তত তিন হেলের মা, সম্ভ্রান্ত মহিলাটির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন— "রাস্তা থিক্যা চা খাইয়া আস গিয়া। বেশিদূরে না। বাইরাইলেই দ্যাখবা ফুটপাতে সার সার চায়ের স্টল। সার সার। সার সার।" মহিলার মুখের অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি দেখেই তাড়াতাড়ি স্বধংক্রিয়ভাবে আমার হাত এগিয়ে গিয়ে আধুলিটা নিয়ে নেয়। নিলে কী হবে? খপ্ করে আমার হাতটি ধরে ফেলেছেন মেসোমশাই। —"রুন্টু, তুমি নিলা ক্যান্? তোমারে তো দেই নাই? চা-টা খাইতে চায় মলিনা। মলিনার লগে যাসি।" আমি তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করি পয়সাটা আমি মেরে দিচ্ছিলাম না, ঐ মহিলার জন্য চা এনে দেব বলেই। উনি কী করে মিছিমিছি নিজে কষ্ট করে...ইত্যাদি। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ এমট্রীমলি আনন্দিত হয়ে উঠলেন— "খাড়াও, ইউ আর সো গুড বয়, রুন্টু। ভেরি কনসিডারেট। আরও দশ-পয়সা লইয়া যাও, দুই ঝুরি চা নিবা, তোমাগো একটা, অগো একটা। আর আমার লগেও একটা আইন্যা দিও।"

এবার মলিনা মাসিমা হেসে ফেলেন।

"আপনার আর আমার কি একটা ঝুরির থেকেই ভাগাভাগি? জামাইবাবু?" লজ্জা পেয়ে মেসোমশাই বলেন—"ওঃ হো, তিনজনার তিন ঝুরি চা! থ্রি কাপস্।" বুড়োদা তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন—"কী, চা আনা হচ্ছে নাকি বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর রেখাদি, তারপর সৌম্য, তারপর শিবু—শেষকালে একটা বড় কেটলি আর তিন টাকা নিয়ে সৌম্য আর আমি বেরুলাম। ফিরে দেখি অপরাধী-অপরাধী মুখ করে মেসোমশাই বসে বসে চা খাচ্ছেন, সুন্দরী শ্যালিকাকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুররাই চা বানিয়ে ট্রে ভরে ভরে পাঠাচ্ছে! মেসোমশাই যারপরনাই লজ্জিত। কেটলিসমেত আমাদের দেখে বললেন—"রাইখ্যা দাও রাইখ্যা দাও। কাজে লাগবেই—পরে গরম কইরা খাইলেই হইবো। কি কও, মলিনা?" মলিনা মাসিমা কেবল হাসতে থাকেন। বিয়ে-বাড়িতে আর কে কবে মনে করে তিন টাকার ফুটপাতে কেনা চা গরম করে খায়?

ইতিমধ্যে দেশবিখ্যাত রূপচর্চা বিশারদ গোপকুমার এসে গেছেন, শুধু চুল বাঁধতেই যিনি পাঁচশো টাকা নেন (এই সঙ্গে রাঁধতে বললে কত নিতেন কে জানে) এঁর আসাটা মেসোমশাই

পছন্দ করেননি তাই গলা তুলে বললেন—"আমাগো টাইমে তো মা-মাসিরাই চুল বাইন্ধা দিত। কিন্তু চিনুর মা তো তা দিবে না! অলস! তাই কাইব হানড্রেড রুপিজ ফুলে ফালাইল।" মাসিমা ধারে কাছেই ছিলেন। হৈ-হৈ করে এসে পড়লেন—"কে বললে আমি চুল বাঁধতে পারি না? তোমার ভায়েদের বৌভাতে কে বৌ সাজিয়েছিল? আমার ননদদের বিয়েতে কোন্ ভাড়াটে লোক এসে চুল বেঁধেছে, শুনি? এটা আলাদা। এ হলো চিনুর একটা স্পেশাল শখ। তা, এর খরচও তো তোমার নয়, ওটা দিয়েছে আমার ভাই। তোমার তাতে এত গা জ্বালা কিসের?"

—"আরে যে হালায়ই দিক না ক্যান ওটা কোনো কথাই না। কথাটা হইলো ওয়েইস্টেজের। ওই পাঁচশত টাকা দিয়ে তোমার আমার দুইজনারই চন্দন কাঠের চিতা হইতে পারতো জান?" কোত্থেকে বুড়োদার উদয়। পুনরায় ব্যাক্‌লওয়ালের মতো মাসিমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন—"খুবই ইন্‌লজিক্যাল কথা বললে কিন্তু বাবা। যদিও সাজসজ্জায় একবাত্রে পাঁচশো টাকা খরচ করাটা মর‍্যালি সাপোর্ট করি না, তবু আমি মনে করি, একজন জীবিত ব্যক্তির মনস্তুষ্টির জন্য পাঁচশো টাকা খরচ করাটা অনেক বেশি ওয়ার্থ হোয়াইল এক মৃতদেহের পিছনে ঐ অর্থ ব্যয় করার চাইতে। তাছাড়া যখন পনেরো টাকাতেই বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সিভিলাইজড উপায়ে একটা—"

—"পনেরো আর নাই রে বুড়া, হেই দিনকাল নাই এই বাপেরে পুড়াইতে তোমার কিন্তু চল্লিশ টাকা লাগবো। আর তোমার মায়ের বেলায় নির্ঘাত আরো বেশি ক'ই দিলা অন্তত পঞ্চাশ-ষাট তো বটেই।"

এবার মাসিমা খুবই মুষড়ে পড়েন। —"ভালো! বাপব্যাটা মিলে তোমরা আমার চিতার হিসেবটাই করো তাহলে আজকের দিনে"—

মেসোমশাই পলকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন— "তোমাগো লেইগ্যাই তো এই কম্‌প্লিকেশন শুরু। ও গোকুলচন্দ্ররে আনলো কেডা? তোমাগো বড়লোক বাপের বাড়ি থিক্যাই তো।"

বুড়োদা আবার শুধরে দেন—"গোকুলচন্দ্র না বাবা, গোপকুমার।"

—"ওই একই হইল, যিনিই গোকুলচন্দ্র তিনিই হইলেন গোপকুমার, কোনো ডিফারেন্স নাই"—

"না, ডিফারেন্স তোমার কিছুতেই কি আছে, কেবল আমার বেলায় ভিন্ন? মুড়ি-মিছরি তোমার কাছে একদর—যত ধনুয়া সবই কেবল এই একটি জায়গায়।"

বেগতিক বুঝে আমি বুড়োদার দাওয়াইটা অ্যাপ্লাই করি।

—"মাসিমা, চিনুদি বোধহয় আপনাকে ডাকছিলেন।" কী কুক্ষণেই যে বললাম। বলবামাত্র মাসিমা দৌড়ে ও ঘরে যান এবং ততোধিক দৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। রণং দেহি মূর্তিতে।

—"তোমাকে কে বলেছিল শলতা করে মেয়েটাকে এক্ষুনি হরলিক্স আর দই গেলাতে? কেন খাইয়েছ? কেন ওর অতো দামী বেনারসীতে দই ফেলে দিলে তুমি? অত কষ্টের সাজগোজ নষ্ট করে দিয়েছ কিসের জন্যে? কে বলেছিল তোমাকে? কে?"

চিবুক উঁচু করে প্যান্টের দু পকেটে দুই হাত গুঁজে, মস্তান ভঙ্গিতে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়ান মেসোমশাই। চেহারার মধ্যেই ডিফায়্যান্ট ভাবটা সুস্পষ্ট। যেন ফাঁসির মঞ্চে সূর্য সেন।

—"কইবো আর কেডা? আপন গর্ভধারিণী জননী যারে দেখে না, হিউজ নেগলেক্ট করে, আরে দেখবো তো বাপেই!" ব্যাপার কী? না পাঁচশো টাকার সাজসজ্জা কমপ্লিট হয়ে যাবার পরে, সহসা স্নেহ প্লাবিত হয়ে মেসোমশাই চিনুদিকে জোর করে হরলিক্স আর দই খাইয়ে এসেছেন নিজের হাতে ফলে সেই সব সমুদ্রপারবর্তী অমূল্য কিস্‌প্রুফ লিপস্টিক, লিপগ্লস, লিনশাইনার, লিপ লাইনার ইত্যাদি প্রেফ লেহ্য পেয় হয়ে গিয়ে, করে সর্বস্বান্ত। ওষ্ঠাধরে এখন প্রধানত

BanglaBook.org

যাদবের দই লেগে আছে। হৃদয় হা হা করে উঠলেও বেচারা চিনুদি একঘর ঘুটুম্বের সামনে বাপের অবাধ্য হতে পারেনি।

—"এই হরলিক্স আর দইটুকু এট্টু খাইয়া লও মা জননী, এ হইল গিয়া রোগীর পইথ্য, উপবাসের মধ্যে খাইলে দোষ হয় না। আহ, মাইয়াডার মুকখানি শুকাইয়া এই এতেটুক্ যে!" ফলে চিনুদির মুখ আরো বেশি শুকিয়ে খুব করুণ হয়ে গেল কিন্তু পিতার সেন্টিমেন্টাল অ্যাকশনে বাধা দেয়, এমন বুকের পাটা কোনো আত্মীয়ের ছিল না। যদিও প্রত্যেকেই পাঁচশো টাকার প্রসাধন অংশত খেয়ে কেশা নিয়ে যৎপরোনাস্তি উদ্বেগে ভুগছিলেন। চিনুদির অসীম সহ্য। বুক ফাটলেও চোখ ফাটেনি—কেননা তাতে নয়নের টিয়ার প্রুফ্-মাস্কারা এবং কপোলের ফিয়ারপ্রুফ 'ব্লাশার' পেইন্টও ধুয়ে যেতে পারতো, কে জানে?

খাওয়াবার সময় এক চামচ দই আবার কনের কোলে পড়ে গিয়েছে। পড়বামাত্র মেসোমশাই সেখানে একমগ জল এনে মুছেছেন। ফলে এখন কনের কোলের কাছে লাল বেনারসীর বেশ খানিকটা অংশ রং পালটে ধোরতর ময়লা এবং জরিটরি ভিজে ভাবি হয়ে উঠেছে। চিনুদি ঠোঁট ফুলিয়ে সেইসেন্ট অনবরত রুমের মতো দিয়ে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় আমি কেটে পড়াই ভাল মনে করি।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে, সৌমা আর আমি একটা ঘরে ঢুকে সিগারেট খাচ্ছি। চারদিকে এত স্ত্রী সিগারেট অথচ এমনই গুরুজনদের ভিড় যে না-লুকিয়ে খাওয়াটা সম্ভবই হচ্ছে না। হঠাৎ সেই ঘরেই মেসোমশাইয়ের প্রবেশ। —"কণ্টু তুমি না ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার?"

ভাগ্যিস আমার সিগারেটটা ততক্ষণে শেষ। "এখনও ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়নি মেসোমশয়।"

—"ঐ হইল গিয়া একই কথা। বিয়া তো এখনও হয় নাই, তবুও তো চিনু অহনই কনে বউ। তুমি হইলা গিয়া কনে-এঞ্জিনিয়ার। বোঝলা? ইলেকট্রিকাল অ্যাপ্লায়েন্সগুলি তো বুঝ? রেকর্ড প্লেয়ারে তুমিই বস গিয়া। যাও। যত আনট্রেইন্ড্ লোক ম্যানগো হাতে পইর মেশিনটা শ্যাষ হইয়া যায় আর কি। ঘটিরা মেশিন-টেশিনের সাবজেক্টটাই বুঝে না, —ব্রেইন্টা ভাল তো?" সৌমার মামাতো ভাইবোনেরা যে সাদামিনে রেকর্ডপ্লেয়ারে গানাই লাগাচ্ছে, এটা এই মাত্র মেসোমশায়ের খেয়াল হয়েছে।—"আর কত বি কেয়ার-ফুল, রেকর্ড দুইখান অলটারনেইটলি লাগাইবা। অলটারনেইটলি, অর্থাৎ একবার এইটা, আরেকবার ওইটা বোঝলা তো? সৌমা কই?" —সৌমা তখন দরজার পিছনে মেঝেয় ঘষে ঘষে সিগারেট নেভাতে দারুণ ব্যস্ত। ঘরময় ফরাসপাতা অথচ অ্যাশট্রে নেই। ফরাসে ছাই যাতে না পড়ে তাই অতি সতর্কতা অবলম্বন করেছি। ঘরের এককোণে ঢুকে একফালি ফাঁকা মেঝেয়ে ছাই ঝাড়া হচ্ছিল। কিন্তু মেসোমশাইয়ের চোখকে ফাঁকি দেবে কে? —"ঐ ধারে ঘেঁষার মতন দেখতাসি না? ওহানে কেডা? সৌমা নাকি?" সৌমা কাশল। —"হুঃ। ঘরময় ছাই ঝারতাসে। আঁ? চাদরটা ময়লা করতাসো। আঁ? কামের বেলায় দেখা নাই, কাবলই আকামা কামের রাজা?" বলতে বলতেই মেসোমশাইয়ের সবেগে নিষ্ক্রমণ এবং পরমুহূর্তেই কোত্থেকে একটি স্বাস্থ্যবান নতুন মুড়োঝাঁটা হাতে পুনঃপ্রবেশ। —"ছিঃ ছিঃ যত্তত ছাইভস্ম ঝাইরা পরিষ্কার-ঘরটাকে দিল শ্যাষ কইরা" —গজরাতে গজরাতে তিনি ঝাঁটা বুলিয়ে বুলিয়ে ধবধবে ফরাস থেকে কাল্পনিক ছাই ঝাড়তে থাকেন। মেসোমশায়ের নিজের পায়ে অবশ্য যথেষ্টই ময়লা ছিলো। ফরসা চাদরে সেই ময়লা পায়ের ছাপ পড়তে লাগলো, অম্লান বরফে ইয়েতির পদচিহ্নের মতো। আপ্রাণ চেষ্টাতেও ঝাঁট দেওয়ার পুণ্যকর্ম থেকে মেসোমশাইকে নিবৃত্ত করতে পারা গেল না। ফরাসটাকেও পরিচ্ছন্ন রাখা গেল না।

ইতিমধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়ির হর্ন শোনা গেল, গেটে শাঁখ বেজে উঠলো, হুলুধ্বনি হলো। অমনি, "—দেয়ার! দি বরযাত্র! দি বরযাত্র ফাইনালি অ্যারাইভড!!!" বলে চীৎকার

করে উঠে মেসোমশাই ঝাঁটা হাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। পেছন পেছন আতঙ্কিত সৌমা আর আমি—"বাবা! ঝাঁটা! ঝাঁটা! ঝাঁটা!" "মেসোমশাই, ঝাঁটা! ঝাঁটা!" বলতে বলতে ছুটি, কিন্তু সমবেত গোলমালে আমাদের কাতর আকৃতি ডুবে যায়। কে কার কথা শোনে! মুহূর্তের মধ্যে হাস্যবদন প্রফুল্লকান্তি মেসোমশাই মুড়ো ঝাঁটা হাতে বরযাত্রী অভ্যর্থনায় সদর গেটে রেডি! এই ক্রিটিকাল মোমেন্টে মিতুন, সৌমার ছোট বোন ছুটে এসে বাবার হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল, এবং মেসোমশাইকে চাপা গলায় একটি ধমক লাগালো।

অমনি তাঁর মুখের হাজার পাওয়ারের হাসিটি দপ্ করে নিভে যায়, এবং মুড-মেজাজ বুঝই খারাপ হয়ে যায়। মেসোমশাই এবার হাত জোড় করে, বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে, ঠিক শ্রাদ্ধসভার কর্মকর্তার মতো দাঁড়ান। গাড়ি থেকে বরযাত্রীরা নামতে শুরু করে। মেসোমশাই গম্ভীর। নির্বাক নিস্পৃহ। শাড়িপরা, সুন্দরী মিতুন আর তার একটি কিশোরী বান্ধবী বেলফুলের মালা আর একটি করে গোলাপ বরযাত্রীদের উপহার দিচ্ছে। একটি মিষ্টি হাসি সমেত। স্মিতহাস্য সুদর্শন এক যুবক মিতুনকে নিচুগলায় কী যেন বলতেই, লজ্জায় লাল হয়ে মালা না দিয়ে মিতুন তাকে দুটি গোলাপফুল দিয়ে ফেলে। তৎক্ষণাৎ মেসোমশায়ের মুখ খুলে যায়।

"দুইটা কইরা গোলাপফুল কারেও দিবা না, মিতুন! সব একটা একটা, ওয়ান ইচ! বোঝলা? মালা দাও।"

সপ্রতিভ যুবকটি বলে—"আমিও তো ঠিক তাই বলেছিলাম, মালা দিন, তো বলেছিলাম উনি কিন্তু দিলেন না—" এবার মেসোমশাই হেক্‌রাটির দিকে ঘুরে দাঁড়ান। ব্যালে ডান্সের পিরুয়েৎ করার ভঙ্গিতে। এক মুহূর্ত রক্ত জলকরা চাউনি, তারপর বলেন—"আপনের এট্টু মিসটেইক হইয়া গেসে না? আইজ তো আপনের মালা পাওনের দিন না? আপনের ফ্রেইণ্ডের।" তারপরে—"মিতুন, অমন যারে-তারে মালা দিবা-না এই কইয়া দিলাম, হউক সে বরযাত্র, যত সব ফাজিল ছ্যামরা।" কুটুম্ব যুবকটি বিড়ম্বিত, মিতুন লজ্জিত, আমরা উদ্বিগ্ন, সৌমা তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেটির ক্রোধে ফুলন্ত পিঠে সৌভ্রাত্রের হাত রেখে এবং ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক ভিতরে নিয়ে যায় এবং অচিরেই অকুস্থলে বুড়োদার অভ্যুদয় ঘটে।

—"আবার তুমি কন্ট্রাডিকটারি কথাবার্তা বলছো বাবা? এই তুমি নিজেই বললে মালা দাও— মালা দাও, আবার এই বলছো মালা দিও না—মালা দিও না। মিতুন তো এতে একদম কনফিউজড হয়ে যাবে!"

মেসোমশাই চোখ তুলে মনুমেন্টের মতো উঁচু মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসী পুত্রের মুখের দিকে তাকান। তারপর তার বুকের গোলাপফুলটির দিকে। তারপর বলেন "মিতুন, তোমার দাদার বুকের থিক্যা ওই গোলাপটা খুইল্যা লও তো দেহি। যত ওয়েইস্টেজ।"

ইতিমধ্যে বর-বরণ করতে কুলো- ডালা-শ্রী সমেত মাসিমাও স্টেটে উপস্থিত। চওড়া জরির পাড়ওয়ালা টুকটুকে লালপাড় দুধে-পরদের ঘোমটার নিচে তাঁর গোলগাল ফর্সা মুখখানি আধোখুশিতে, আধো কান্নাতে, উদ্বেগ উত্তেজনায় আশ্চর্য রঙীন। মাসিমার মুখের সেই লালচে আভার দিকে খানিক স্থির চোখে তাকালেন মেসোমশাই। তারপর বললেন—"মিতুন, বুড়ার থিক্যা গোলাপফুলটা খুইল্যা লইয়া তোমার মায়ের খোপায় গুইজ্যা দাও তো দেহি!"

সেই মুহূর্তেই বর নিয়ে ঢুকলেন বরের পিসেমশাই। যিনি মেসোমশায়ের অফিসের ইনকামট্যাক্স অডিটার। চেনামুখটি দেখতে পেয়ে অকূলে কূল পাবার মতো পরম উদ্ভাসিত মেসোমশাই বরের দিকে দৃকপাত মাত্র না করে বরের পিসেকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"আরে—আসেন দাদা—আসেন, আইজ তো আপনেরই দিন!" উলু এবং শঙ্খধ্বনিতে মেসোমশায়ের মহৎ উল্লাস চাপা পড়লো।

BanglaBook.org

বরপক্ষ বড্ড বেশি ধনী মেসোমশাই সেই কারণে একটু উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা চলছে না। কেননা বাড়ির আর সকলেই খুশি। বড়লোক হলেই বা। তারা লোক খারাপ নয়। একেবারে কিছু চায়নি। "হ্যাঁ একটা বিয়ের মতো বিয়ে করেছে বটে চিনু! প্রেম তো কত লোকেই করে। বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেই করে। কিন্তু এমন একটা বিয়ে ক'জনে পায়?"

অতএব বালিগঞ্জে ভাল পাড়ায় বিয়েবাড়ি ভাড়া নিয়ে, টুনিবাল্বের ঝর্ণাধারায় আর টটকা ফুলের তৈরি রাজকীয় তোরণে বাজীমাৎ করে বাড়ি সাজানো হয়েছে। এই শখ, এবং খরচ সব বুড়োদার। কিন্তু এই এলাহি ব্যাপারটা মেসোমশাই একদম পছন্দ করছেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল গড়িয়ায় তাঁর "নিজ বাসভবনে" ছাদে প্যাণ্ডেল বেঁধে যেমনভাবে সেদিনও তাঁর ছোটভায়ের বিয়ে হলো, তেমনি করেই মেয়ের বিয়ে দেন। "চিনুর বিয়ে" বলতে যে স্বপ্নটা তিনি চিরদিন দেখে এসেছেন তার সঙ্গে এসব কাণ্ডকারখানা ঠিকঠাক কিছুই মিলছে না আজকের এই বিয়েবাড়ি তাঁর যেন নেহাত অচেনা। এর মধ্যে তাঁর ভূমিকাটা কোথায়? পাত্রও তাঁকে খুঁজতে হয়নি, চিনু নিজেই খুঁজে পেয়েছে। পণও নিচ্ছে না তারা একটি পয়সা, খাটবিছানা, দানসামগ্রী কিছুই নেবে না, রাখবার জায়গা হবে না নাকি তাদের। সবই আছে। কেবল নমস্কারী কাপড় তিপ্পান্ন পীস, আর আশীর্বাদে বরের একসেট হীরের বোতাম হলেই হবে বলেছিল —নইলে নেহাত আত্মীয়দের কাছে পাত্রের মুখ থাকে না, তাই। তাই সেই বোতামটা ছেঁটে ফেলে একটা হীরের আংটিতে রফা করে নিয়েছে চিনুই। (চিনুর মতো কনসিডারেট মাইয়া ওয়ার্ল্ডে কয়জনার হয়?) কিন্তু এতেই মেসোমশায়ের গচ্ছিত প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড উঠে গেছে, বন্ধুদের কাছে ধার হয়েছে। এখনও মিতুনের বিয়ে বাকি, সৌমার ডাক্তারি পড়া শেষ হয়নি। অথচ পাঁচশো টাকার খোঁপা, চার হাজারের ফুল এবং আলো (সে যে-হালাইই দিউক না ক্যান), মেসোমশাইয়ের মাথার মধ্যে কেবলই এগুলো ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। সুতরাং বরযাত্রীরা যেই সভাসাজনোর প্রশংসা করেছে, অমনি মেসোমশাই বলে ওঠেন—"তাইলে শোনেন স্যার, ঐই যে টুনিবাল্ব আর ফুলের গেইট, তার দ্বারা কিন্তু বিয়াভা হয় নাই। তার জন্য প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড উঠাইতে হয় না। হ্যাঁ, মন্দ কি আর? ফেন্সী ব্যাপার, লাইট, ফ্লাওয়ার, এ সকল তো ভালই! ঐ যে বাইবেলে কয় না, 'লেট হান্ড্রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম—লেট দেয়ার বি লাইট!' —হকলই সইত্য। কিন্তু পার্সে কুলাইলে তবে তো? যাও সে-তুং যে কইসেন না, চাইনিজ পিপলদের লগে—কাট ইওর কোট একর্ডিং টু ইওর ক্লথ? আমিও তাই কই! খাঁটি কথা!"

বরযাত্রীরা মেসোমশায়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য শুনে বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে পড়েন। আমি কী করে যে ওঁকে সরিয়ে নেব, ভেবে পাই না। এর পর মেসোমশাই উদাস দার্শনিক কণ্ঠে বলেন—"এইজন্যই তো ঠাকুর কইসেন—সর্বদা সমানে সমানে কাজ করা উচিত। পূর্ববাংলায় আমাগো এক প্রবচন আছে —উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, যিনিই মধ্যম তিনি চলেন তফাতে। আমরা হইতাসি গিয়া সেই মধ্যম। বোঝলেন?" বরযাত্রীরা গম্ভীর হয়ে পড়লেন তাঁরা ঠিক বুঝতে পারলেন না, তাঁদের উত্তম বলা হচ্ছে, না অধম বলা হচ্ছে। কিন্তু মেসোমশায়ের তাতে কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। এবার তিনি—"এক্সকিউজ মী, আমি একটু রিফ্রেশমেণ্টের দিকটা দেইখ্যা আসি" বলে উঠে গেলেন।

আসলে "বরযাত্রীদের সঙ্গে কন্যাকর্তার বাক্যালাপ" ব্যাপারটার সবল সামাজিক গাম্ভীর্য বিষয়ে মেসোমশাই পর্যন্ত সচেতন এবং সেই কারণেই নার্ভাস হয়ে পড়লে কেউ কেউ যেমন তোৎলা হয়ে যায় মেসোমশাই তেমনি নিজের কথা খুঁজে পান না। কেবলই কোট করতে থাকেন। কিন্তু কোটেশনের উৎসগুলো তখন সব গোলমাল হয়ে যায় কোনটা প্রবাদ কোনটা মাও সে-তুং কোনটা বাইবেল কোনটা রবীন্দ্রনাথ, সে সমস্তই তখন ইমমেটিরিয়াল হয়ে যায় ওঁর কাছে এই যেমন বিয়ের আগের দিনের দুপুরবেলা গড়িয়ের বাড়িতে; বিয়েবাড়িতে হট্টগোলে বাড়ির

কুকুরটি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে এনতার তাড়া করেছিল লোকজনকে। তাড়া খেয়ে বাচ্চা চাকর কেঁদে ফেলেছে। মেসোমশাই তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত। উদ্বিগ্ন।

—"কী হইসেটা কী ?"

—"কুকুরঅ কামড়াইথিলা।"

—"একচুয়ালি কামড় দিসে কি ?"

—"না, কিন্তু - "

—"না, তবে কানসিলা ক্যান ?"

—"মোর নূতন নুগা ফটাই দিলা।"

—"ঈশ্‌শ—।" দুমিনিট—লুঙ্গির জন্য মৌন শোক। তারপর—

—"তুই অরে উল্টাইয়া মারলি না ক্যান ?"

—"বাবু আপন মতে মানা করিথিলে। কহিথিলে কুকুরকু মারিলে মোর গোড়অ ভাঙ্গি দিবে—"

—"আরে থো—! আমি হেইটা কইসিলাম তুই অরে মিছামিছি খ্যাপাইতিস বইল্যা। কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা করি নাই ?"

—"ফোঁস ? ফোঁস কঁড় বাবু ?"

—"আরে হেইটাও শোনস্ নাই ? লাঠির ঘায়ে মর মর সাপটারে দেইখ্যা সেই যে গান্ধীজী কইসিলেন—আরে, তোরে কামড় দিতে মানা করছিলাম, কিন্তু ফোঁস করতে তো মানা করি নাই ? মহাত্মাজীর সব থিক্যা ভেলুয়েবল অ্যাডভাইজ হইল এইটা। সবর্দা স্মরণে রাখবা। বোঝলা ?"

তক্ষুনি বুড়োদা বললেন, —"বাবা ওটা কিন্তু মোটেই গান্ধীজী বলেননি, ওটা তো রামকৃষ্ণের কথা।"

মেসোমশাইও ত্বরিতে জবাব দেন, —"আঃ—কথাটা যে হালাথই কউক না ক্যান, কইসে তো ? গ্রেট মেন থিংক এলাইক।"

বরযাত্রীদের কাছে ছুটি নিয়ে মেসোমশাই বললেন, —"চল রুপু, ঠাকুরগো কামকাজ একটু ইন্সপেক্ট কইরা আসি ?" হালুইকরদের কাছে উপস্থিত হয়ে যেই কন্যাকর্তার উপযুক্ত জলদগম্ভীর স্বরে গলা খাঁকারি দিয়ে—"মাছ ভাজাটা হইল কেমনি ? দ্যাখাও তো দেহি—" বলা, অমনি বামুনের সাফ্ জবাব—"এখন ওসব হবে না। ফালতু ঝামেলা করবেন না। হ্যাঁ! শুনলে বাবু কিন্তু রাগ করবেন।" রান্না-বান্নার চার্জে আছেন সৌম্যর সেজকাকা মোটাসোটা, কর্মঠ, ভুঁড়িতে তোয়ালে বেঁধে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন, সব চুল সাদা। মেসোমশায়ের একটি চুলেও পাক ধরেনি, নেহাত ছোকরা-চেহারা, পরনে স্কুলের ইউনিফর্মের মতো হাতপুরো সাদা সার্ট সাদা জিনের প্যান্টে গুঁজে পরা। উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই মুখে। (ধুতি পাঞ্জাবি কন্যাকর্তাকে কিছুতেই পরানো যায় নি। ধুতি খুলে গিয়ে কেলেংকারি হবার ভয়ে। অবশ্য মুখে বলেন ধুতি নাকি বিধবা মেয়েদের ড্রেস, পুরুষ মানুষের পোশাকই নয় মোটে!) হালুইকর ঠাকুর জানে সব বিয়েবাড়িতে ঢের ফালতু মাস্তান থাকে, তাদের প্রশ্রয় দিতে নেই। সে তো আর মেসোমশাইকে দেখেনি, চেনেও না। মেসোমশাই কিন্তু সত্যি রেগে গেলেন।—"দুলু! দুলু!"

সেই কণ্ঠস্বরে সেজকাকা আক্ষরিক অর্থে দৌড়ে এলেন—"কী ? হইল কী মেজদা ?"

—"এই রাস্কেলটারে ক্যান্ বসাইছস ? এ রাস্কেল আমারে ধাবু দ্যাখাইতাসে, আবার কয় কিনা ফালতু ঝামেলা করবেন না। আমাগো মাইয়ার বিয়া, আর আমারেই কয় কিনা 'ফালতু ?' গেট আউট! গেট আউট! অহনই আমি অনা ঠাকুর ডাইক্যা আনতাসি। অমাগো গড়িয়ায় শয়ে-শয়ে হালুইকর পথে পথে ঘুরতাসে।" ঠাকুরটি অতি চালু পার্টি। মুহূর্তেই বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটার তাৎপর্য—বিশাল এক লুচিভাজা কাঁকরি হাতেই দৌড়ে এল তক্ষুনি, পেছু পেছু দৌড়ালো তার যোগাড়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু হাতের অঞ্জলিতে কলা পাতায় মুড়ে একডজন মাছভাজার গরম

গরম নৈবেদ্য নিয়ে। —"এবারকার মতো মাপ করে দিন বড়বাবু। অপরাধ হয়ে গেছে। আপনারই মাছের পীস রক্ষা করছিলাম আমি। বিয়েবাড়িতে কত ফালতু লোকও তো থাকে"—আবার সেই শব্দ—ফালতু? মেসোমশায়ের রাগ কমল না। মাছ তুললেন না। স্তব্ধ। আস্তে করে দুলুবাবু ঠাকুরদের প্রমপট করলেন—"আরেকবার!" এবার দুই ঠাকুর গলা মিলিয়ে কোরাসে বারবার আকুল হয়ে মাপ চাইতে লাগলো এবং মেসোমশাইকে মাছভাজা খাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগলো। তখন ওদের ক্ষমা করে দিয়ে মেসোমশাই নিজে দয়া করে খানছয়েক খেলেন, আমাকেও গুণে গুণে ছখানাই খাওয়ালেন এবং—"দুলুরে, অ দুলু! শোনো, তুমিও অহনই খাইয়া লইও খনকয় মাছভাজা, ভাল পীস আর কিন্তু পরে পাইবা না!" বলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলে যেতে যেতে বলেন "হাঃ, আমার মাছের পীস রক্ষা করে কে? না হালুইকর ঠাকুর, যেই না poacher সেই হইল গিয়া gamekeeper, হুঃ!" তারপরেই মনে পড়ে গেল—"আহা, চিনুর মা-ভায়েও দুইখান গরম মাছভাজা খাওয়াইলে হইতো!" যেমনি মনে পড়া অমনি কাজ—"রুন্টু, শোনো, রান্নাঘরে আমি যামু না, তুমিই যাও। দুলুর থিক্যা দু'খান মাছভাজা চাইয়া লও, নিয়া তোমার মাসিমারে খাওয়াও গা যাও। কইবা, আমি পাঠাইছি। বোঝলা? না খাওয়াইয়া আসবা না কিন্তু! ঠিক যেইডা আমি দেখি না সেই দিকেই টোটাল কনফিউশন! আরে, চিনুর মায়েরে যে মোটেই মাছভাজা খাওয়ানো হয় নাই, হেইটাই বা দ্যাখে কে? যাও, যাও—" বলতে বলতে উনি দ্রুত লোক-খাওয়ানোর দিকটায় চলে গেলেন। আমি ছুটি মাসিমার জন্য মাছ ভাজার ব্যবস্থা করতে। মাসিমা তো প্রথমে হাসলেন, তারপর এক ধমক দিলেন, মোটেই মাছভাজা খেলেন না। সেই ব্যর্থ দৌত্যের পরে পুনরায় মেসোমশাইকে খোঁজে বাবার জায়গায় এসে দেখি চপ দেওয়া হচ্ছে। বরযাত্রীরা খেতে বসেছে। মেসোমশাই সৌম্যকে বলছেন—"বড়দের দুইটা কইবা, ছোটদের একটা। না চাইলে একদম রিপিট কইবো না। ওয়েইস্ট য্যান্ হয় না। বোঝলা?" এবার সংশিক্ষা রান্নাঘর থেকেই সই-পই করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি পরিবেশককে। কিন্তু মেসোমশাইকে চুপ করানোর প্রয়াস বৃথা। কানে কানে শেষটা ("এটা কিন্তু বরযাত্রীদের ব্যাচ, মেসোমশাই") বলে দিলেও তিনি থামলেন না।

—"আরেঃ, তয় হইসেতা কী? হউক না বরযাত্র, ওনারা তো আর পর না? আমার চিনুরই ঘরের মানুষজন—ওনারা শোনলেই বা দোষটা কোথায়? ওয়েইস্টিং ফুড ইজ অ ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া—কী কন বেহাইমশায়?" বলে, যে শুভ্র কেশ শুভ্রবাস কাঁধে মুগার চাদর ভদ্রলোকের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিক্ষেপ করেন মেসোমশাই, তাঁকে দৃশ্যত যে-কোনো বিবাহেই বরকর্তার ভূমিকায় মানাতো বটে কিন্তু আজ এখানে তিনি মোটেই বরযাত্রীই নন, চিনুদির কলেজের প্রফেসর 'বেহাই' এই অনর্জিত প্রিয়সম্বোধনে বিব্রত প্রফেসর গুপ্ত হাঁ-না দুই হয়, এমন একটি হাসি দিলেন। ফলে, যথেষ্ট কুটুম্ব কর্তব্য হয়েছে মনে করে, হৃষ্টচিত্তে মেসোমশাই বরযাত্রীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নীচে নেমে আসেন।

নেমেই অফিসের এক সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি। আর অমনি —'খুলিল হৃদ্দ্বার খুলিল!'

—"বাঃ। সুধীরচন্দ্র যে! আইস্যা পড়সো তাইলে? শেষমেষ পৌঁসাইলা? যাক্। তা-রপর? নিউজ কী? আইজ অফিসে গেসিলা? আমি তো একেবারে প্রিজনার হইয়া আছি। মাইয়ার বিবাহ কি য্যামন ত্যামন ব্যাপার? ওহ্।" বলতে বলতে বেশ মৌজ করে মেসোমশাই বরযাত্রীদের ছেড়ে-যাওয়া একটা গদি আঁটা লোকায় জমিয়ে বসে হাঁক পাড়েন "—কই পানসিগেটের ট্রেটা গেল কই?" ট্রেসহ একটি ছেলে এগিয়ে আসতেই, আবার— "কোকাকোলার চাবিটা কার কাছে?" একর চাবিসহ আরেকজন সবিনয়ে উপস্থিত হয়। "একটার বেশি কারেও দিবা না। আর তাও কাবল বরযাত্র। ভেরি এক্সপেনসিভ হইয়া গেসে। ওনলি ওয়ান ঈচ্! তুমি নিজে কয়টা বোতল খাইলা, মনু? ওনলি ওয়ান তো? বা, বা বেশ, বেশ। এইবার এইদিকে দুইটা

বোতল আনো তো দেহি! ঠাণ্ডা দেইখ্যা।" বন্ধুকে কোকাকোলা দিয়ে বললেন, "আইজ লন্ডন নোটবুকটা পড়সিলা? কী কাণ্ড কও তো দেহি? কোথায় ছিল জেম্‌স কাউলি, আর কেম্ব্রিক্যা আইসে এই ভ'! চান্দে, আর ঈ-তে। হেঃ।" তারপর নিজের বোতলে একচুমুক দিয়ে বেশ রিল্যাক্স করে বসে ভুরু পাকিয়ে বেদম উদ্বিগ্ন মুখে কন্যাকর্তা বললেন, তাঁর নিমন্ত্রিতকে—"বোঝলা সুধীর, ইংলণ্ডর প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা সত্যই ভেরি ক্রিটিকাল। অগো ইমিগ্রেশন পলিসিটা লইয়া আমাগ্যে চিন্তার ঢের কারণ আছে—থাউজ্যাণ্ডস অব কালার্ড পিপ্‌লের ফিউচার—"

সেই মুহূর্তে যাদের ওপরে তিনুদির ফিউচার নির্ধারিত হচ্ছে—জ্যাঠামশাই কন্যাসম্প্রদানে বসেছেন। শাঁখের শব্দ মেসোমশাইয়ের বিশ্বমানবিক উদ্বেগকে বিপর্যস্ত করতে পারলো না।

BanglaBook.org

চোখ

বীরুবাবু সকালবেলায় দোতলার বারান্দায় দাঁতন করছিলেন, এমন সময়ে সেই বিরক্তিকর হরিধ্বনি। কেওড়াতলার কাছাকাছি বাড়ি নেবার ফলটা এই হয়েছে যে একটা দিন যায় না মড়া না দেখে। ইচ্ছে না করলেও চোখ পড়লো নিচের দিকে, কেমন যেন চমকে উঠলেন। মৃতদেহের তো চোখ সাধারণত বোজা থাকে, না-বুজলে তুলসীপাতা চাপা দেওয়া থাকে। এই মুখটা—ঠিক যেন কোনো জীবন্ত লোক খাটিয়ায় শুয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে। রোগাটে ছুঁচলো মুখ, ফর্সাই বলা যায়, সরু কালো গোঁফ ঠোঁটের ওপরে। ওপরের ঠোঁটটা অদ্ভুতভাবে একটু কাটা—ফাঁক দিয়ে একটা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তবে চোখদুটি মেলা। একটা চোখ আরেকটার চেয়ে বড়, যেন ওপরের পাতাটা নেই—পাথরের চোখের মত—পুরো মণিটাই প্রায় দেখা যাচ্ছে। বীরুবাবুর বেজায় অস্বস্তি হলো। খাটিয়া আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে জল আলোর জন্যে—বীরুবাবুর মোটেই ইচ্ছে না করলেও, নড়তে পারলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন বারান্দায় সেঁটে, ওই জ্যান্তমতন মরা মুখখানার দিকে চেয়ে। দেখতে-দেখতে কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হলো মুখটা?

নিশ্চয় দেখেছেন। কোথায়?.....কোথায়? বাজারে কি? মাছওলা কোনো? সব্জীওলা? ট্রামে কি? কণ্ডাক্টর? কোথায়? শ্যালদা লাইনে ট্রেনের ফেরিওলা নয় তো? নাঃ—এসব অদ্ভুত সংস্রব মনেই বা আসছে কেন তাঁর? মুখখানা খুব চেনা-চেনা লাগছে—অথচ কিছুতেই ঠাহর করতে পারছেন না কী জন্য চেনা। ভাবতে ভাবতেই আলো বেড়ে গেলো, হরিধ্বনি দিয়ে ওরা চলে গেল। খাটিয়ায় শুয়ে ওঁরই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুলতে দুলতে চলে গেল লোকটা। সেই ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতটা যেন হাসছে।

বিশ্রী লাগছে সকালবেলাতে এই বিতিকিচ্ছিরি মড়ার মুখ দেখা। বীরুবাবু কলঘরে গেলেন মুখ ধুতে। চোখে বারবার জল ছড়া দিয়ে যেন ওই বিশ্রী অভিজ্ঞতাটাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলেন। মড়ার মুখে কত প্রশান্তি থাকে—মড়ার মুখে এমন কিচ্ছেল-ভাব তিনি জীবনে দেখেননি। চা-খবরের কাগজের ফাঁকে ফাঁকেও বিতৃষ্ণার অনুভূতিটা যেন ফিরে আসতে লাগলো। তিনি থলি হাতে বাজারে বেরুলেন।

চেনা মাছওলা, চেনা আলুওলা, চেনা ফলওলা। বাজারে তাঁর সবাই চেনা। তবুও বীরুবাবু আজ প্রত্যেকের দিকে নতুন চোখে চাইতে লাগলেন—যেন কোথাও কিছু লুকিয়ে আছে। বীরুবাবু দুশো পার্শে বেছে নিলেন, পঁচশো আলু, দেড়শো পেঁয়াজ একশো বেঁড়স, চারটে মুলো, শাক তিন আঁটি—হঠাৎ দেখতে পেলেন। শাকউলি বুড়ির বাঁ চোখটার মণিতে যেন ঢাকনি নেই—ছুঁচলো মতন মুখখানা। বীরুবাবুর হাত থেকে শাক পড়ে যাচ্ছিলো, বুড়ি তাড়াতাড়ি তুলে দিল, আধুলি থেকে কুড়ি পয়সা ফিরিয়ে দিলে—অন্যদিকে চেয়ে অন্ধের মত কোনোমতে পয়সাটা নিয়েই বীরুবাবু চলে এলেন।

শসা এক জোড়া—মাথা ঠাণ্ডা করে বীরুবাবু ভাবলেন, আজ বেস্পতিবার, দুটো কলা, দুটো কমলালেবু নিতে হবে। গিন্নির লক্ষ্মীপুজোর বাই আছে। সংসারে তো লক্ষ্মী উথলে উঠছে। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তবু লক্ষ্মীপুজোর ঘটটি চাই। বাতাস চাই। বীরুবাবুর ভুরুটা কুঁচকে উঠলো—তিনি এসব পুজো-টুজো-তে বিশ্বাস করেন না। তবু গিন্নিকে নিজের মনে থাকতে দেন। ছেলেপুলে হয়নি,—কিছু একটা নিয়ে থাকবে তো মানুষ। তাঁর না-হয় অফিস আছে। সন্ধ্যেবেলা নগেনবাবুর বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা আছে। গিন্নি বেচারীর ওই সিনেমার কাগজ, কখনো একটা বাংলা ছবি, আর লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ—এই নিয়েই তো জীবন। ভাবতে ভাবতে গিন্নির প্রতি করুণায় মনটা আবার নরম হয়ে এলো বীরুবাবুর। আহা করুক একটু—শখ আহ্লাদ বলতে তো ওইটুকু. কলা কত করে? —লোকটা পিছন ফিরে টঙাচ্ছিলো কলার

BanglaBook.org

কাঁদি—বললো—কোন কলাটা? —বলতে বলতে এপাশ ফিরলো। রোগাটে, ছুঁচলো মুখ; ওপরের ঠোঁটটা চেরা, ফাঁক দিয়ে একটা হলদে দাঁত বেরিয়ে আছে—সরু গোঁফে ঢাকা পড়েনি বীরুবাবুর গলার ভেতরে নিঃশ্বাস আটকে এলো—তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। গিন্নি, বেস্পতিবার, ফল, বাতাসা...ছিটকে সরে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। কলাওলা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। বীরুবাবু আপ্রাণ চেষ্টা করলেন মনের লাগামটা কষে ধরতে।

বাজারের জনস্রোতে কারুর দিকে চাইতেই ওঁর কেমন ভয় করতে লাগলো, যেন প্রত্যেকের মধ্যেই একটা চমক্ থাকতে পারে। কোনোদিকে-না-তাকিয়ে হাঁটতে গিয়ে কার বুঝি পা মাড়িয়ে দিলেন—উঃ, দেখে চলতে পারেন না? পায়ে কি খুর বাঁধিয়ে রেখেছেন দাদা? বীরুবাবুর যেন জ্ঞান ফিরলো—অ্যাঁ, লাগলো? বলতে বলতে তিনি পাশে চেয়ে দেখলেন লোকটি নিচু হয়ে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মুখ তুলে তাকালো—বাঁ চোখ ভাবলেশহীন, বিস্ফারিত, ডান চোখে রাজ্যের বিরক্তি, সরু গোঁফের নিচে চেরা ঠোঁটের ফাঁকে হলদে দাঁত যন্ত্রণায় খিঁচিয়ে রয়েছে—প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বীরুবাবু দ্রুত সরে গেলেন। বাজার কর' মাথায় উঠলো, বাড়ি পৌঁছুতে পারলে বাঁচেন। কেমন যেন দুর্বল লাগছে পা দুটো, মাথার ভিতরটায় গুম্‌গুম্ আওয়াজ হচ্ছে, ব্রীজের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি গেলে যেমন হয়, নিজের পায়ের ওপর যেন নিজের কন্ট্রোল নেই, বীরুবাবু ডাকলেন: এই রিক্শা। রিকশাওলা পাদানিতে বসে ঝিমুচ্ছিলো, ডাক শুনে জেগে উঠলো। বিস্ফারিত বাম চোখে দৃষ্টি নেই—চেরা ঠোঁটের ফাঁকে—বীরুবাবু আর তাকাতে পারলেন না, আপনি বুজে গেলো চোখ—ছুটে গিয়ে পাশের ট্যাক্সিটার দরজা খুলে উঠে পড়লেন। আঃ! সীটে গা এলিয়ে দিয়ে কী আরাম।

সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত কাঁপুনি হচ্ছে যেন—এই মুহূর্তে এই বসবার জায়গাটা না পেলে উনি নিশ্চয় রাস্তায় পড়ে যেতেন। মোটা আওয়াজে সর্দারজী জিজ্ঞেস করলো, কিধর যানা? বীরুবাবু ক্লান্ত গলায় নির্দেশ দিলেন। এতোই কাছে যে ড্রাইভার বিস্মিত হল। বাড়িতে এসে নেমে তিনি ড্রাইভারকে এক টাকা ষাট দিতে গেলেন, চেয়েই সমস্তটা। ড্রাইভার চোখ থেকে রোদের চশমাটা খুলে পয়সা গুনতে লাগলো। গুনে নিয়ে বীরুবাবুর দিকে চেয়ে বললে, বাস। ঠিক হ্যায়। বীরুবাবু দেখলেন সর্দারজীর দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে ঝলমল করছে বাঘের মত নিষ্পলক দুটো চোখ—যেন পাথরের চোখ, চামড়া ঢাকা নেই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সিঁড়ির তলায় পরিচিত স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকারে পৌঁছে তাঁর যেন বুকটা ফেটে যেতে চাইলো। হাঁটুতে হাঁটু জড়িয়ে যাচ্ছে দেখে প্রথম ধাপটাতে বসে পড়লেন। বাইরে আওয়াজ পেলেন, স্টার্ট দিয়ে ট্যাক্সি চলে গেলো। বীরুবাবুর যেন ধড়ে প্রাণ ফিরলো—সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটোও যেন ভিজে ভিজে হয়ে এলো, সেই বুক-ফাটা চাপটা যেন চোখ থেকে বেরুবার পথ পাচ্ছে। রুমাল বার করে চোখমুখ মুছলেন বীরুবাবু। এবারে ওপরে গিয়ে ভালো করে এক কাপ চা খেতে হবে। কী আশ্চর্য বিভ্রম!

বিভ্রম ছাড়া এটা কিছুই নয়। বীরুবাবু ভাবলেন, সকালে উঠেই প্রায় আধা ঘুমের মধ্যে অমন বীভৎস মড়া দেখবার যা একখানা অভিজ্ঞতা চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো—হয়েছে আরকি যত সব অবচেতনের বজ্জাতি। যাকে বলে হ্যালুসিনেশন! এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যান্ত কালী দেখতেন, শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে দেখলেন জগন্নাথ মূর্তি—আর বীরুবাবু চতুর্দিকে মড়া দেখছেন। তাঁরা ছিলেন গিয়ে পুণ্যবান ব্যক্তি—আর সরকারী কেরানীর কপালে জ্যান্ত নরক ছাড়া কিইবা জুটবে! বীরুবাবু ভাবলেন, খাওয়া-দাওয়াটায় একটু যত্ন নিতে হবে এবার। বেশি করে প্রোটিন ও ভিটামিন খাওয়া উচিত। দুধ তো বহুদিন বন্ধ। মাংস ডিমও বন্ধ হবে না? পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীরের রাসায়নিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তাই থেকেই এসব স্নায়বিক রোগের উৎপত্তি। নার্ভাস ডিসঅর্ডার ছাড় কিছু নয়। গোড়াতেই এর উচ্ছেদ দরকার। উনি আজই

BanglaBook.org

ডাক্তারের কাছে যাবেন। ভিটামিন বডি-টডি একটা কিছু খেতে হবে আরকি। বয়েস হচ্ছে শরীরের বল, রস ফুরিয়ে আসছে। এখন বাইরে থেকে বলসঞ্চার করা দরকার। ফুড সাবস্টিট্যুশন দরকার ওষুধ দিয়ে। ভাবতে ভাবতেই বীরুবাবুর পায়ে বল এলো। তিনি সহজভাবে উঠে দাঁড়ালেন। থলি হাতে উপরতলায় উঠে গিয়ে কড়া নাড়লেন সিঁড়ির মাথায় থেমে।

গিন্নি এসে দোর খুলে দিলেন—কিগো, আজ এত দেরি? আমার তো ভাবনাই হয়ে গিয়েছিলো যা দিনকাল! —বীরুবাবুর হাত থেকে থলিটা নিতে হাত বাড়ালেন গিন্নি।

—আর বোলো না! আজ এমন একটা অদ্ভুত—বলতে বলতে বীরুবাবু একমুহূর্তে থামলেন—ওকে এই হঠাৎ বলা কি ঠিক হবে? এসব ব্যাপার মনের ভেতরে ঢুকিয়ে না দেওয়াই ভালো—এমনিতেই যা ভীতু মানুষ—এসব আন-ক্যানি গল্প ওকে বলে কাজ নেই। অটোসাজেশন বলেও একটা জিনিস আছে। বীরুবাবু কথা ঘুরোনো ঠিক করে নিয়ে থলিটা গিন্নির হাতে তুলে দিলেন দিতে দিতে দেখলেন গিন্নির বাঁ চোখের মণিটায় অকূল বিস্ফারিত দৃষ্টিহীনতা, চেরা ওপরের ঠোঁটের কোকরে একটি হলদে দাঁত তারই দিকে হাসছে মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো, সহসা পিছন দিকে হেলে পড়লেন। গিন্নির আর্তনাদের মধ্যে বীরুবাবুর দেহ সিঁড়ির ধাপে ধাপে গড়িয়ে পড়তে লাগলো নিচে। আরো নিচে।

[উপসংহার: ডাক্তার এসে বলেছিলেন, স্ট্রোক। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু কতশত স্ট্রোকের পিছনে যে কি গল্প থাকে, আমরা কি জানতে পারি? বীরুবাবুর গল্পটাই তো তিনি বলে যেতে পারলেন না]।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পরীক্ষা

সর্বদাই খুঁত করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন বন্ধুকে বন্ধু বলে মনে হয় না, শত্রুকে তেমন শত্রু শত্রু লাগে না। মানুষ মাত্রেই সুদূর। মোহমুদ্গরই জগতে একমাত্র সভা—একটু বদলে নিয়ে, কন্তুব কান্ত কা তে কন্যা কিছুই ভালো লাগে না। মেয়ে যে কেবলই খেলে বেড়াচ্ছে! হয় আগাথা ক্রিস্টি, নয় ব্যাডমিন্টন, নইলে ঘুম। সারাদিন সারারাত ঘুম। পড়বে কখন? কিছু বলতে গেলেই তার দিদ্মা বলেন, —'আহা, ও বড়ো দুর্বল। ঘুমুতে দে। ঘুমতে ঘুমতে প্রিটেস্ট হয়ে গেল।

এই সময়ে? সিক্স থেকে টেনের মধ্যে এই নিয়ে চারবার। অসিতবাবুর পর প্রদীপ। প্রদীপের পর শ্যামলবাবু। শ্যামলবাবু বহু চেষ্টা করেছিলেন। হাফ ইয়ারলির রেজাল্ট বেরুনোর পরই হাসপাতালে গেলেন। পেটে মস্ত বড়ো প্রব্লেম। অপারেশনের পরে আবার সাহস করে পড়াতে এলেন, কিন্তু আমিই সাহস পেলুম না শ্যামলবাবুর পরে অলোকবাবু। অলোকবাবু একদিন টাকাটা খামসুদ্ধু ফেরত দিয়ে বললেন—'ও টাকা আমি আর নিতে পারি না।' আমি তো খ। তিনি সবিনয়ে খাতা খুলে দেখালেন—'এই দেখুন খাতা। এত মসে একটাও অঙ্ক কষাতে পারিনি। প্রত্যেকটা আমি নিজে কষেছি। নিজে অঙ্ক কষেছি বলে অন্যের কাছে টাকা নেব কেন?' ধরে বেঁধে আধখানা মাত্র নেওয়ানো গেল, বাকিটা টেবিলে রেখে গেলেন

দেখতে দেখতে টেস্টও হয়ে গেল। স্যার-বিহীনভাবেই। প্রিটেস্টে ইতিহাসে উনতিরিশ ছিল, টেস্টে হল সাতাশ। তার মানে ফাইনালে হওয়া উচিত পঁচিশ, এইরকম নিউমেরিক্যাল প্যাটার্ন অনুযায়ী—মেয়ে জানালো রসিকতা করে—"দুই দুই করে কমছে।"—হাতে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট। —"কলেজে উঠলে কক্ষনো হিস্ট্রি নেব না; যা ট্রেচারাস সাবজেক্ট!"

—"কলেজে ওঠ তো আগে?"

—"সে উঠে যাবো।" র‍্যাকেটের ওপরে শাটলকক্টা শূন্যে নাচাতে নাচাতে ঊর্ধ্বমুখেই মেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে

"উঠে যাবো" বললেই তো হলো না, পড়তে হবে। ইতিহাসের জন্য এক স্যারের বাড়িতে ওকে ধরে নিয়ে গেলো আরাধনা। টিউটর পাই কোথায়? টেস্টের পরে কেউই নতুন ছাত্র নেন না। শেষটায় আমার এক গুণ্ডা বোনপোকে দিয়ে পড়িয়ে শায়েস্তা করেছেন, পাসটাস করিয়ে কলেজেও গুঁজে দিয়েছেন, তাঁকেই ধরে আনা হলো। তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখি সিলেবাসটা।" মেয়ে বললে "দাঁড়ান, ফোন করে জেনে নিচ্ছি। আমার বন্ধুরা জানে।"

—"তুমি জানো না? লেখা নেই তোমার কাছে?"

—"ছিল তো, —হারিয়ে ফেলেছি। ফোন করি?"

—"অঙ্ক বইটা দেখি। কে সি নাগটা। ফোন পরে হবে।"

—"টেস্টের সময়ে স্কুলে ফেলে এসেছিলাম, আর পাইনি।"

—"দেখি, কলমটা আর খাতাটা দাও।"

—"ফোন স্কুলে নিয়ে গেছে কলমটা। এই যে খাতা।"

—"বাঃ বাঃ বাঃ। বাড়িতে আর কলম নেই?"

—"থাকতেও পারে। এই নিন পেনসিল।"

—"এতটুকুনি? এ তো ধরাই যাবে না।"

—"দাঁড়ান, ম্যানেজ করে দিচ্ছি। পেনসিলটাকে এই ঢাকনিতে ফিট করে নিন, ব্যাস তাহলেই ধরা যাবে। এভাবে ছোট পেনসিলও কাজে লাগে।"

—"চমৎকার একটা জিনিস শিখলুম।" এমন সময়ে চা ভালমুট এলো।

BanglaBook.org

—"এসব কে খাবে?"

—"আপনার জন্যে।"

—"এ তো বিষ। চা ডালমুট দুটোই লিভার ড্যামেজ করে। আমি ওসব খাই না।"

—"দুধ সন্দেশ খাবেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো?"

—"ইয়ার্কি হচ্ছে?"

—"সে কি? ইয়ার্কি হবে কেন? এই তো ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ওটা খাবেন না এটা খাবেন তা তো মা জানেন না? আগের স্যার চা ডালমুট ভালোবাসতেন।"

নতুন স্যার বললেন, "আপনার মেয়ে তো যত্ন আত্তি খুব করে, বুদ্ধি-শুদ্ধিও আছে। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ। আর আপনিও হয়েছেন যেমন, নিরাত্তির লেখালিখি পদ্যফদ্য নিয়েই আছেন। অমন মেয়েকে নিজে না পড়ালে হয়?"

মরমে মরে গিয়ে মনস্থির করলুম। ইংরিজি বাংলা ছাড়া আমার আর কিছুই পড়ানোর যৈর্য নেই। তাই বললুম, "বাংলা বইটা নিয়ে আয়।"

"টাকা দাও।"

—"টাকা কেন?"

—"বই তো দোকানে।"

—"এটাও হারিয়েছিস?"

—"হারাবো কেন? কেনাই হয়নি এ বছরে।"

—"হয়েছিল না?"

—"সে তো নাইনে কিনে দিয়েছিলে।"

—"সেটাই তো টেনের টেক্সট।"

—"নাইনের বই টেনে থাকে? তুমি যে কী!"

বই কিনে এনে কেন।

—"হ্যালো, আরাধনা? বাংলার সিলেবাসটা কী রে? মা জিজ্ঞেস করছেন হ্যাঁ, মার সঙ্গেই কথা বল।"

খানিক পর—"হ্যালো ভাস্কর? অঙ্কের পুরো সিলেবাসটা কী রে?"

"আরাধনাকেই তো জিজ্ঞেস করতে পারতিস। দুবার দুটো ফোন করবার কী দরকার ছিল?"

—"সে তুমি বুঝবে না। আরাধনা কী ভাবতো? আমি কোনো সিলেবাসই জানি না মনে করতো।"

—"সে তো জানিসই না।"

—"জানতুম তো। এখন না হয় ভুলে গেছি। দু বছর ধরে কখনো মনে থাকে? মা, তুমিই বলো?"

পড়ানো চলছে। এপ্রিলে পরীক্ষা। আমার এক প্রিয় ছাত্রীকে টিউটর রাখলুম ফেব্রুয়ারী মাসে। ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়িয়ে দিতে। একটা ছোট ভাই ফিজিওলজির ভালো ছাত্র ছিল তাকে বললুম বায়োলজিটা দেখিয়ে দিতে। ছাত্রীটির সঙ্গে খুবই ভাব হয়ে গেল মেয়ের। আড্ডা, গল্পের বই এক্সচেঞ্জ, পরচর্চা। একটু একটু পড়াও দিব্যি চলতে লাগলো ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু এই মামা বেচারীর সঙ্গে তার পিঠোপিঠির মতো সম্পর্ক—নিত্যই যুদ্ধ।

বই নিয়ে বসাই হলো না। দুপক্ষ থেকেই অনবরত নালিশ। তবে দীপু মামা বাঁশীটা বাজায় ভালো। বায়োলজি শেখা না হোক, টেস্টের পরই মেয়ে "এ আর এমন কি" বলে হঠাৎ আড়বাঁশী বাজানো রপ্ত করে ফেললো দিবারাত্রি বাঁশি বাজছে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে। নীরোর বেহালার

BanglaBook.org

মতো। কিছু বললেই বলে, —"একটু রিল্যাক্স করছি।"

ইতিমধ্যে একদিন একটি বাউল আমার কাছে তার দোতারাটি বিক্রি করে গেল একশো টাকায়। আর যাবে কোথায়। কোথায় অঙ্ক, কোথায় ইতিহাস দোতারা নিয়ে পড়লেন মেয়ে। দুদিনের মধ্যেই বাউলের দোতারাতে "হোয়্যার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন লং টাইম পাসিং" বাজতে লাগলো। ঠিক ফিটারের স্টাইলে! সঙ্গে ছোট বোন গান গাইতে লাগলো। এবং মামার বাঁশী। সুন্দর একটা ফ্যামিলি কনসার্ট গ্রুপ তৈরী হয়ে গেল। অগত্যা দোতারা এবং বাঁশী নিয়ে মূর্তিমতী শিল্পশত্রুর মতো আলমারিতে তালাচাবী দিয়ে রাখলুম।

মেয়ে খুব সিভিলাইজড, নিয়মিত তিনখানা কাগজ পড়ে। ইন্দিরা, মোরারজী, চরণ বিষয়ে গভীর জ্ঞানী। ভুট্টোকে নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। পরীক্ষার দিন সকালে বিশেষত টেস্টের সময়ে রেগুলারলি দেখেছি। ইদানীং দেখেছি খবরের কাগজ খুলে শিস দিতে দিতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। —যাক, তবু পরীক্ষার ভাবনাটা মাথায় ঢুকেছে। এমন সময়ে মেয়ে একদিন কথা কয়ে উঠলো—"আজকাল বেড়ালছানারা আর ছানা নেই মা। ওদের দুধটা কমিয়ে মাছটা বাড়াতে হবে। নইলে ওদের গ্রোথ হবে না ঠিকমতন!"

—"এ তুমি শিস দিতে দিতে বেড়ালের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছিলে? নিজের নয়?"

—"নিজের? নিজের কী চিন্তা?"

—"কোন চিন্তা নেই?"

—"না, মানে কোন স্পেসিফিক চিন্তাটার কথা বলছ?"

—"পরীক্ষাটা" —হাত মানা গলায় বলি।

"সে তো আছেই। জানো মা, বন্যা আর বিদ্যুৎ-সঙ্কট essay আসছে।"

সেইজন্যে বিদ্যুৎ-সঙ্কট নিয়ে গভীর ভাবনা হয়েছে মেয়ের। রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা ভাবছে। আলো নিবলেই ভাবতে শুরু করে—সকাল ৮টা পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র ভাবনা। মাঝে শতবার আলো বিদ্রলেও ভেকে তোলা যায় না।

সেদিন এক ভদ্রলোক এসেছেন আমার কাছে। কলকাতার বইয়ে একটা সাহিত্য-উৎসবে নিয়ে যেতে চান ১লা বৈশাখ। মেয়েরা পাশে এসে যথারীতি বসে আছে। চোখ গোলগোল করে শুনছে—তিনি কত যত্ন করে নিয়ে যাবেন টানা মোটরে, ওখানে কী কী দ্রষ্টব্যস্থান। যেই বললুম—"এখন তো যাওয়া অসম্ভব, পরীক্ষাটা হয়ে যাক," —অমনি মেয়ে বাধা দিয়ে ওঠে—"চল না মা, চল না? কি সুন্দর। খুব ভালো লাগবে, চল না মা—"

—"আরে! পরীক্ষা না তখন?" আমি তো তাজ্জব!

—"কী পরীক্ষা? ও তখন এম-এ চলবে বুঝি?" একেবারেই সহ্যল চোখ অসহ্য রাগ হয়! রাগ চেপে রাখা আমার স্বভাব নয়। তবু যথাসাধ্য দাঁতে দাঁত চেপে বলি—"কী পরীক্ষা? জানো না পয়লা বৈশাখ মানে চোদ্দই এপ্রিল। সতেরোই এপ্রিল থেকে কার পরীক্ষা?"

—"সতেরোই...? ওঃ হো! সরি সরি বুঝেছি।" লজ্জায় একগাল হেসে ফেলে বলে "স্কুল ফাইনাল! আমাদের তো?"

আমি মরিয়া হয়ে বলি—"এটা মার্চ মাসের সাত তারিখ? একমাস দশদিন মাত্র বাকী। এখনও জিজ্ঞেস করছো, কার পরীক্ষা মা? আমি কি বিষ খেয়ে মরব?"

সভাতাভবাতা বিস্মৃত হয়ে জনসমক্ষে ইতরজনের মতো কাতরে উঠি। বেগতিক দেখে ভদ্রলোক—"আচ্ছা, নমস্কার। এবার তাহলে থাক। বরং সামনের বছরে—" বলে ছুটে পালিয়ে যান। খুব অপ্রস্তুত মুখে মেয়ে গিয়ে পড়তে বসে। বাঁহাত কুকুরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে। তাতে পড়া ভাল হয়।

লক্ষ্মী এসে নালিশ করে—"বড়দিমণি রোজ রোজ নিজের দুধ আর সন্দেশটা মাস্টারমশাইকে

BanglaBook.org

খাইয়ে দিয়ে, নিজে চা ডালমুট খাচ্ছেন।"

—"সে কি কথা?"

—"আমি রোজ দেখতে পাই বড়দিমণি পড়তে পড়তে ডালমুট চিবোচ্ছেন, আর মাস্টারমশাইয়ের গোঁফে সর।"

—"অ। কাল থেকে কুজনকেই দুধ-সন্দেশ। চা-ডালমুট মোটে টেবিলে দিবি না।"

তিন মাস আমি কোনো নেমন্তন্ন যাই না, সভা-সমিতিতে যাই না, লৌকিকতা বন্ধ। মেয়ে এদিকে শনি রবিবার নিয়মিত টিভিতে সিনেমা দেখে, বেস্পতিবার চিত্রমালা দেখে, বন্ধুদের জন্মদিনে কার্ড আঁকে, দীর্ঘ দীর্ঘ ফোন করে। বুককেয়ারে গেলে সময় নষ্ট হবে বলে আমি সন্ধেবেলায় না গিয়ে দুপুরবেলায় নিয়মরক্ষে ঘুরে এলুম। মেয়ে কিন্তু তিনদিন পরপর মাসিপিসিদের সঙ্গে সন্ধেবেলায় রাত দশটা পর্যন্ত বুককেয়ারে বেড়িয়ে ঘুগনি খেয়ে এল! আমি উদ্বেগে অস্থির। আমার শুভার্থীরা আমার থেকেও বেশী অস্থির। সবাই আমাকে বকছেন "আমার মেয়ের জন্য সবার চিন্তার শেষ নেই। —"কেবল হিস্টিদিস্টি লেকচার মেরে বেড়ালে আর গল্পোকবিতা লিখলে কারুর ছেলেপুলে মানুষ হয়? কেবল নিজের পড়া আর নিজের লেখা নিয়েই মত্ত। তার ওপরে আজ হাঁপানি, কাল হার্টের রোগ, পরশু হাই প্রেশার, অসময়ে যত ঝামেলা বাধিয়ে তুই-ই বরং ওকে আরো ডিসটার্ব করিস। মেয়েটা পড়বে কখন?"

সবই সত্যি। মেয়েটা সত্যি খুব সেবা করে। অমলেশ কুকুর, বেড়াল, কেয়া মা, ছেলেমানুষ বোন, বুড়োমানুষ দিদ্মা প্রত্যেকের। আবার এও সত্যি যে সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা ওর পেছনেই আছি। ভোরে পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে উঠি। উঠে মেয়েকে তুলে দিই। তারপর ঘুমিয়ে পড়ি। সাড়ে পাঁচটায় আবার উঠি। আবার মেয়েকে তুলে দিই। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কাইনালি ৬টায় উঠে চা খেয়ে গায়ে জোর পেয়ে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করি। এবার মেয়ে ওঠেন। গজগজ করতে করতে পড়তে বসেন। আশ্চর্য পড়ে প্রথম Test Paperটা। কেবলই মন দিয়ে প্রশ্নগুলো পড়ে আর হিসেব কষে। তার পরে ঘর থেকে টেবিল নামিয়ে এনে আমার ঘরে পেতেছি। দিনরাত প্রশ্ন ধরে আনছি আর টুকছি প্রশ্ন ধরা মানে মেয়ের বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খাতা চেয়ে আনছি, স্কুলে সাজেস্টেড প্রশ্নগুলো (আমার মেয়ে ওসব টোকে না, যদিও রোজই ক্লাসে উপস্থিত থাকে। শুনতে শুনতে নাকি লিখতে পারে না) টুকে নিচ্ছি। মায়েতে আর ছোটো বোনেতে খাতার পর খাতা ভরে ফেলছে—উত্তর না-জানা প্রশ্নের মালায়।

What is hydro-static paradox? What is blood? What is mitosis? What is Sannyasi Bidroha? What is $K_2Cr_2O_7$? এরপর বই দেখে দেখে উত্তরগুলোও লিখতে হবে। যদি মেয়ে না লেখে। উপায় কি?

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি বিহারী দত্তকে, তাঁর সেই জাহাজে আমিও ভেসে যাচ্ছি। আমার শুভার্থী বন্ধুরা কী এসব ঘটনা জানেন? বিহারী দত্তের সমুদ্রযাত্রা? আমাকে উত্তর লিখতে হয়। আমাকে জানতে হয়।

What did the Selfish Giant see? How was Tenner rewarded?

আমাকে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বৌরিকভুলো, কঁচি, ডেটল, ব্যাণ্ডেজ আরো পঞ্চাশ রকম টুকিটাকি কিনে আনতে হয়, একটা ভালো দেখে বাক্স যোগাড় করে তাতে ধপধপে কাগজ আঠা আঁটতে হয়, তাতে লাল কাগজে রেডক্রস কেটে লাগিয়ে First aid Box তৈরী করে দিতে হয়। এই বাক্সের জন্য দশ নম্বর মাত্র বরাদ্দ আমাকে প্রত্যেকটি Practical খাতা ভাস্করের খাতা দেখে দেখে এঁকে দিতে হয়। আমি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলেই কতরকম প্যাটার্ন দেখতে পাই—কক্রোচ-এর এক্সিমেন্টারি সিস্টেম, ফ্রগ-এর ইউরিনো-জেনিটাল সিস্টেম—কীমেনটোড-এর রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম। এত কষ্টের মূল্য নাকি মাত্র দু নম্বর। তাছাড়া কিছুদিন

হলো মেয়েকে ভাত খাইয়ে দিতে হচ্ছে; তার হাতটা জ্বলে গেছে। কেননা ওয়ার্ক এডুকেশনে সাবান তৈরি করেছেন তিনি। সে সাবানের সোডা পোটেশি? একটা কাচের ট্রেতে রাখা ছিলো। তাতেই ট্রেটাতে মিক খেওার মতো ছেপ ধরে গেছে। এ সাবান কিন্তু গায়ে মাখার জন্যে। নীল, হলুদ, গোলাপী, লেভেনীয় স্বপ্নিল প্যাস্টেল রঙে, ফ্রী পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে এখনও গোটা দশেক আছে। চাই?

ওয়ার্ক এডুকেশনের জন্যে মেয়ের না হোক আমাদের হোল ফ্যামিলির যেমন ওয়ার্ক তেমনি এডুকেশন হলো। মাটি মাখা, মাটি ছানা, মূর্তি গড়া, কত কিছু আমি করতে পারি এখনও! সেই মূর্তি থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাঁচটা শিবুই বানিয়ে দিয়েছে অবশ্য। সেই ছাঁচে ফেলে final মূর্তিটি বের করেছে মেয়ে নিজেই। দীপু ওটাকে স্প্রে-পেন্টিং করে দিয়েছে টুথপেস্ট-টুথব্রাশের ছিটে মেরে। ভাস্কর্যের ইনস্ট্রাকশনে। মেয়ে বলছে, "চমৎকার।"

আধঘণ্টার মধ্যেই ইস্কুল থেকে ফিরে এলেন রিক্‌শা চড়ে। হন্তদন্ত।

পিঠে একটা বিশাল নম্বর আঁটা, ওর final পরীক্ষার হাপানো রোল নম্বর।

—ফিরে? হয়ে গেল?

—কথা বোলো না! সময় নেই! স্কুল পারফরম্যান্স খাতা লাগবে এক্ষুনি—কেউ কি দেখেছো খাতাটা কোথায়?

মেজাজ একেবারে মিলিটারি। যেহেতু সবগুলো খাতায় সযত্নে বাহারী মলাট লাগানো আমারই বৈধ কর্তব্য, আমি তক্ষুনি মনে করতে পারলুম স্কুল পারফরম্যান্স খাতাটা কোথায় দেখেছি—এবং খাত বগলে "থ্যাংকিউ" বলেই মেয়ে ছুটলো। রিক্‌শার পেছন পেছন ছুটতে লাগলো বেনটি এবং মামাটি। রিক্‌শা দাঁড়ালো না। মিনিমেলে ফিরে শুনলুম তারা ছুটতে ছুটতে স্কুল অবধিই গিয়েছিল—"ঢুকেই তনি মিক দিদিরই রোল নম্বরটা ডাকা হচ্ছে। পি টি পরীক্ষার জন্য দিদি তক্ষুনি দৌড়োতে লেডতে হলে ঢুকে গেল। বগলে খাতা। আমাদের দিকে তাকালোই না।"

—"অমন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কেমন পি টির কায়দা দেখিয়েছে কে জানে।"

পরীক্ষার তিনদিন বাকি। মেয়ে এসে বললে—তুলোমা, আবাধনাটা এত অন্যমনস্ক—অ্যাডমিট কার্ডটাই হারিয়ে ফেলেছিলো। অবশ্য এখন খুঁজে পেয়েছে।

—তোরটা আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। জানো মা, অলকা লাহিড়ীর ব্যাপারটা আরো খারাপ। ধোপার বাড়িতে চলে গিয়েছিলো কুড়মুড়ে হয়ে ফিরে এসেছে। কী হবে?

—তোরটা কই? বের কর তো?

কী হবে বের করে? এই তো ড্রয়ারে।

—তবু, একবার দেখা না?

—এই দ্যাখো বাবা, দ্যাখো!—খুব কনফিডেন্টলি ড্রয়ার খুলেই মুখ শুকিয়ে এতটুকুনি! তারপরেই ড্রয়ার তোলপাড়! তারপর সারা বাড়ি তোলপাড়। মুহূর্তেই প্রবল মাস মেবিলাইজেশন ঘটে যায়। বাড়ি শুদ্ধু প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা আনাচ-কানাচ, বাক্স ড্রয়ার, তন্ন তন্ন করে ঘাঁটছে। ঘাঁটতে ঘাঁটতে যে যা খুঁজে পাচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি। ছোট মেধে নিল একটা শক্ত ইরেজার, আমি পেলুম মর্তেপড়া কঁচিটা, মা পেলেন একটা জর্দার ডিবে, শিবু পেল স্ক্রু ড্রাইভারটা শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের ভাঁই থেকে বেরিয়ে পড়লো মেয়ের অ্যাডমিট কার্ড, আর মায়ের হারিয়ে-যাওয়া মাইনের চেকটা। পরীক্ষার ডামাডোলে খুঁজে পাচ্ছিলুম না, গত মাস থেকেই। কাউকে বলিনি। এখন কে কাকে বকবে? ডবল কেলেঙ্কারী। আমি দুটোই চটপট আলমারিতে তুলে ফেলি। মেয়েকে যেই বলেছি—"অ্যাডমিট কার্ডটা না পেলে তুই কি করতিস?" অমনি আমার মা জবাব দেন—"বোর্ডে গিয়ে তোমাকেই ডুপ্লিকেট নিয়ে আসতে হতো। কিন্তু চেক

BanglaBook.org

না পেলে তুমি কী করতে?"

হোলনাইট প্রোগ্রামগুলো আমাদের মা মেয়ের এখন যুগলবন্দী হয়ে গেছে। ঠিক লুচিভাজার প্রসেসে কাজ দ্রুত এগুচ্ছে। বেলা, ভাজা, খাওয়া। লুজশীটে আমি একটা একটা প্রশ্নের গরম গরম উত্তর লিখে এগিয়ে দিচ্ছি আর মেয়ে লুফে নিয়ে একটা একটা প্রশ্নোত্তর কপকপ গিলে ফেলছে। —হ্যাঁ। এগুলো সব আগেও লিখে দিয়েছিলুম প্রিটেস্টের আগে। টেস্টের আগেও খাতাতেই। কিন্তু সেইসব খাতা এখন আর নেই। জন্মের শোধ কিছু হারিয়ে গেলে আমার মেয়ে বলে—"কোথাও মিসপ্লেসড হয়েছে।" মেয়ের শরীরে উদ্বেগ নেই। সত্যি "স্থিতধী" প্রশ্নী। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ। মন্দ রেজাল্টেও ভীত নয়, ভাল রেজাল্টেও স্পৃহা নেই।

পরীক্ষার আগের দিন বাড়িতে বিজয়ার মত জনসমাগম—ফোনের পরে ফোনে শুভেচ্ছা আসছে—প্রণাম, মিষ্টান্ন, উপদেশ, স্মৃতিচারণ, অ্যাডভান্স সান্ত্বনা, অগাম সহানুভূতি, ফ্রী। লাস্ট মোমেন্ট সাজেশ্যনস। পুরো দিনটাই গেল। অত শুভেচ্ছায় শেষ মুহূর্তে মেয়ের অমন লোহার নার্ভও কেল করলো। মোটা মোটা চশমার কাঁচের পেছনে ঈষৎ জল চকচক করে উঠলো। সদা পঙ্কজদী হয়েছেন, ঠিক টেস্টের আগেই। খুবই স্ট্রেন-আপ ভাবছিলেন নিজেকে। এমন সময়ে দিম্মা কোলে নিয়ে বললেন—"ভয় কি রে? তোর মা আরো ফাঁকিবাজ ছিল, ঘাবড়াসনি তুই!"

মেয়ের মন ভালো করতে একটা নতুন ক্লিপবোর্ড কিনে তাতে নাম লিখে দিলুম। ওপরে শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ লিখতে গিয়ে কী রকম একটু লজ্জা করলো। লিখলুম "জয় বাবা ফেলুনাথ।" ফেলুদের নাথ তিনিই। মা সরস্বতীকে কেন আর কষ্ট দেওয়া?

পরীক্ষার দিন। ভোর চারটেয় উঠেছি। মেয়েও চারটেয় উঠেছে। আমি এখনও দ্রুত উত্তর লিখছি—কালকের সাজেস্টেড প্রশ্নের। মেয়ে অলস চোখ বোলাচ্ছে, বোরড মুখে। তুমি কার কে তোমার। বোনও চারটেয় উঠেছে। কলমে কালি ভরছে, পেন্সিল কাটছে, ইরেজার, রুলার, মোজা, কমাল এই সব গুছিয়ে রাখছে—জুতো পালিশ করছে, বোতলে জল ভরছে। দিম্মাও চারটেয় উঠেছেন। পরীক্ষার ভাত রেডি হচ্ছে, টিফিন তৈরি হচ্ছে। পোশাক প্রস্তুত। রাশন কার্ডের খাপ থেকে কার্ড বের করে ফেলে দিয়ে, অ্যাডমিট কার্ড ভরে দিলুম। যাতে ছিঁড়ে না যায়। মেয়ে চান করতে গেল। যেন গায়ে হলুদের সকাল। বাড়িময় এমন তাড়া লেগেছে ভোররাত্তির থেকে। মেয়ের চান হতে হতে মায়েরও চান হয়ে গেল—মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাও গরম গরম ভাত খেয়ে রেডি—পৌঁছুতে যেতে হবে তো? মায়ের গাড়ি যখন-তখন বিগড়ে যায়, তাই বিশ্বস্ত গাড়ি এসে গেছে অনেকক্ষণ, গাড়িতে আবেরুপস্থ টিফিন, এবং মামীমা বসে। —কিন্তু মেয়ে কোথায়? রান্নাঘরে। কুকুর-বেড়ালের লাঞ্চ বেড়ে দিতে গেছেন। ধরে এনে দিম্মাকে প্রণাম করাতেই তিনি যাত্রা করার মন্ত্র জপ করে দিলেন নাতনীর মাথায় হাত রেখে। মেয়ে এবার মাকেও প্রণাম করলো। তারপরেই ছোট বোনকে।—"ও কি দিদি? ও কী করছো?" বোনটি কুল কুলিয়ে হেসে ফেলে। —"ওঃ সরি।" গাম্ভীর্য একটুও না হারিয়ে স্থিতধী দিদি বলেন—"লাইনে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? স্টুপিড?" দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, হঠাৎ আমি দৌড়ে আবার ওপরে উঠতে থাকি।

—"আবার কোথায় যাচ্ছ মা?"

—"যাই, মাকে প্রণামটা করে আসি?"

—"তুমি?" মেয়ে এবার গাম্ভীর্য হারিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে— "তুমি প্রণাম করবে? তোমার কি পরীক্ষা? পরীক্ষা তো আমার!"

অট্টহাসির বোলের মধ্যে তো দুগ্গা বলে রওনা হলুম। গেটে দু-চারজন, বারান্দায় দু-চারজন হত নাড়তে লাগলো—মেয়ে যেন বিলেত যাচ্ছে।

BanglaBook.org

পরীক্ষার হলে মেয়েকে পৌঁছে দেওয়া আরেক পর্ব। জগৎ-পারাবারের তীরে মায়েরা করে খেলা। কিছু কিছু বাবাও আছেন। আমরাও তো একদিন পরীক্ষা দিয়েছি, মা তো ধারে কাছেও যেতেন না? বন্ধুরা বন্ধুরা মিলে চলে যেতুম, টিফিন বক্স সঙ্গে নিয়ে। —আজকালকার ছেলেমেয়েরা বেশি বেশি আদুরে হয়েছে। তারা বাপ মার কথা যত কম শোনে, আদর আহ্লাদ তত বেশি পায়। আমাদের কালে টিউটর থাকতেন মোটে একজন (যদি অ্যাট অল থাকতেন), এখন প্রতি সাবজেক্টে অন্তত একজন। যেসব ছেলেমেয়েরা একা একা বটানিকসে আমহার্স্টবারে চলে যেতে পারে, পরীক্ষার হলে তাদেরও কিন্তু প্রত্যেকদিন বাপ-মাকে পৌঁছে দিতে হবে। ফের দুপুরবেলায় অফিসে টিফিন নিয়ে মা বাবারা অফিস কামাই করে হতো দেন ইস্কুলের গেটে। বিকেলে ছুটতে ছুটতে পুনরায় হাজির, নীলমণিদের হেপাত নিতে। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক। বাপ-মায়ের এই পুণ্যে যদি বা ছেলেমেয়েরা তরে যায়! যাক, শুরু হয়ে গেল বড় খেলা।

পরের দিন সকালে, আজ অফ ডে। মেয়ে দরজা বন্ধ করে ফোন করছে। আমাদের বাড়িতে এটা'র চল নেই। আমি তো জোর করে ঢুকবোই ঢুকবো—গোপন ফোন চলবে না, চলবে না! অন্তত ষোলো বছর তো হোক? মেয়ে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিয়ে ফোনে ফিরে গেল।

আছে? কী দেখলি? আছে তো? এই প্লীজ একটু দিয়ে যাবি? আচ্ছা, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ। দশটার মধ্যে কেমন? ফোন খতম।

—কী ব্যাপার রে?

—কিচ্ছু না। বায়োলজির বইটা। আরাধনার কাছে ছিল।

—কালই তো ইংরিজি আর বায়োলজি? কবে থেকে তোর বই ওখানে আছে?

—টেস্টের পর থেকেই। আচ্ছা মা, আমাকে তো ও কতোবার কতো খাতা ধার দিয়েছে। দেব না বই?

—এতদিন কী দিয়ে পড়লি?

—কেন, খাতা? অন্য অন্য সব বই—ওর তো বই আছে।

—কিন্তু ওটাই তো টেক্সট বইটা!

—ও কিছু না।

তিনদিন পরে।

—"সকালে ফিজিক্যাল সায়েন্স, বিকেলে সংস্কৃত। এই সংস্কৃত খাতাগুলো টিফিনের সময়ে নিয়ে যেও ঠিক মা!" মনে করিয়ে দিল মেয়ে বেরুনোর সময়ে। গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখলুম ইস্কুলের সামনে আরাধনা দুলে দুলে সংস্কৃত পড়ছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। —"ও কি রে?" আমার মেয়ে যেচে জ্ঞান দিলেন "এখনই সংস্কৃত পড়ছিস? এখন যেটা পরীক্ষা সেইটে পড়বি তো?"

আরাধনা অবাক হয়ে তাকায়।—"সেইটেই তো পড়ছি। এখন স্যান্সক্রিট না?"

"কী?" আমি বিষম খাই। "এখন স্যান্সক্রিট? তবে যে বললে এখন ফিজিক্যাল সায়েন্স। সংস্কৃত বিকেলে?"

—"আবা-র?" আরাধনা আর্তনাদ করে ওঠে। "আবার তুই টেস্টের মতন করলি?" আমিও আর্তনাদ করেন করি। এবার স্থিতধী কন্যা আমাদের প্রতি সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করেন—"যাগগে মা ওবেলা না হয় একেলাই। কী এসে যায়? দিনটা তো ঠিকই, স্যান্সক্রিট খাতাপত্তর আর আনতে হবে না।" স্থিতধী নাচতে নাচতে ভেতরে চলে যান। আমরা ব্যাকুল মা-বাপেরা ঘণ্টা পঞ্চাশ অপেক্ষায় হাঁ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময়ে শুনি শূন্য থেকে দৈববাণী হচ্ছে "মা! মা! এই দাখো, আমরা কোথায়?" ভীষণ বোদে ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ উঁচিয়ে

BanglaBook.org

দেখতে পাই—ঠাণ্ডা বোদ্দুরে ছিলের ছাদে দু-তিনটে ইউনিফরম পর ঝাঁকড়া চুল মূর্তি—একগাল হাসতে হাসতে হাত নাড়ছে, যেন এভারেস্টের চূড়োয় তেনজিং ইত্যাদি।

উপসংহার :

এরপর নিশ্চয় স্কোর বোর্ডটা দেখতে চান? যেমন খেলোয়াড়, যেমন পিচ, তেমনি খেলা; আর তেমনই রেজাল্ট। হোল ফ্যামিলির অসামান্য টীমওয়ার্কের টোটাল স্কোরিং সাড়ে তিয়াত্তর পার্সেন্ট। দুটোমাত্র লেটার। তার একটা আবার বায়োলজিতেই। ঘরময় দৌড়ে বেড়ে ধপাধপ শব্দে একটা বল বাউন্স করতে করতে মেয়ে বলল "মা, তোমাদের সত্তর, আমার সাড়ে তিন—এফটিওয়ার্ল্ড দিম্মাকে সেই প্রণামটা তুমি যদি করতে, স্টারই পেয়ে যেতুম নির্ঘাত।"

BanglaBook.org

মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর

মা বললেন, "মুক্তু, এ জিনিস চলতে পারে না। তুমি কিনা তোমার মেয়েকে খুন করবার সব ব্যবস্থা করে দিলে! কেন, চার চাকা চালালে কী দোষ ছিল?"

মেয়েকে তো লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছি সেই করেই। সে কিছুতেই চারচাকা ছোঁবে না, তো আমি কী করতে পারি? আর মোপেড কি তাকে আমি কিনে দিয়েছি? একুশ হয়েছে, অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেই টাকাটা তুলে কিনে ফেলেছে, বলেছে চাকরি করে শোধ করে দেবে, একদিন না একদিন। আরে, আমারই কি ইচ্ছে মেয়ে খুন করি? মার ধারণা আমি যেমন মার সব কথা শুনে চলি, আমার মেয়েও বুঝি তার মায়ের কথায় তেমনি ওঠে বসে। আরে জমানা বদল গয়া—এখন আমিই যে দুজনের কথাতেই উঠি বসি, একজন আমার মায়ের কথায়, আরেকবার আমার মেয়ের কথায়, তা মা বুঝেও বুঝতে চান না। আসলে আমার বড় মেয়েটি প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী। তাকে বকুনি দিতে আমার প্রবলা গর্ভধারিণীও সাহস পান না, তাই ঝিকে বকে নাতনিকে শিক্ষা দেবার চেষ্টা। ওদিকে ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটিতে আমার বেশ কিছুটা ঘাটতি আছে। কাক চিলেও ঠুকরে যায় সুযোগ পেলে, মা জননী, কন্যাকুমারী এদের তো কথাই নেই।

"কী বলে এই ডেঞ্জারাস বিস্ক তুমি নিলে? রাস্তাঘাটে গাড়ির ছড়াছড়ি। লাইসেন্স সব নামেমাত্র, ঘুষ খাইয়ে বের করা। কেউই আর জানে না গাড়ি চালানোর প্রকৃত আইনকানুন। যার যেমন খুশি চালাচ্ছে—তারই মধ্যে এই কচি মেয়েটাকে তুমি একা ছেড়ে দিলে—গাড়িঘোড়ার এই অরণ্যের মধ্যে! অরণ্যেও তবু আইনকানুন আছে, বন্যপশুও কিছু নিয়ম মানে—কলকাতার গাড়িঘোড়া কোনো নিয়মই মানে না। সাইকেল যে কিছুতেই কিনে দিইনি তোমাকে ছেলেবেলায়, সে শুধু এইজন্যে আর তুমিই কি না আমার অমতে—আর বকুনি চলতেই থাকে। আমি রীতিমতো গাঢ় অভিমান বোধ করি। এ কী অন্যায় বকো দিকি, আমি যা করিনি, যে ঘটনার দায় কোনমতেই আমার নয়—তার জন্যেও আমাকেই মা বকবেন! উল্টে দিকে মন ধাইতে শুরু। অতএব:

—"এমন কি আর ডেঞ্জারাস, মা? কত ছেলেমেয়েই তো মোপেড চালাচ্ছে স্কুটার, সাইকেল, মোপেড এসব কি লোকে চালাচ্ছে না? আমি তো ভাবছি, পেট্রলের যা দাম বাড়ছে দিনকে দিন, এবার থেকে ওর মোপেডটা করেই কলেজে যাবো। মাত্র একজন লোকের জন্যে গাড়িটা চালানো বেশি বেশি এক্সপেনসিভ হয়ে যাচ্ছে।"

মার মুখে অভাবনীয় এক স্বর্গীয় আহ্লাদের বিচ্ছুরণ ঘটে—"তুমি? তুমি চালাবে মোপেড? না তুমি চালালে ভালোই চালাবে—রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানো তোমার অভ্যেস আছে—সেই ভালো। মেয়েকে বরং গাড়িটা দাও, তুমিই মোপেড নাও। মেয়েটা ছেলেমানুষ, গাড়ি বড়সড় জিনিস, চাব দেয়ালে ঘেরা থাকবে, সাবধান থাকবে মোপেড বড্ডই বোলামেলা, কোনো আড়াল-আবডাল নেই, ধাক্কা একবার লাগল তো গেল!"

অর্থাৎ আমি গেলে মার আপত্তি নেই তত, নাতনি না গেলেই হলো। গাড়ি বেশ বন্ধ দুর্গের মতো, আর মোপেড যেন অশ্বারোহী অরক্ষিত।

"মা? মা চালাবেন মোপেড?"

"হ্যাঁ। আর তুমি চালাবে মা'র গাড়িটা।" দিশার সান্ত্বনা মোটেই পছন্দ হল না মেয়ের।

"না, আমার গাড়ি চালাতে ভালো লাগে না দিশা। গাড়ি আমার চাই না। তবে মা যদি দান মাঝে মাঝে আমার মোপেডটা ওঁকে ধার দিতে আমার আপত্তি নেই, প্রোভাইডেড উনি আগে নিয়ে কলেজে না যান।"

"কেন? কলেজে যাবে না কেন? কলেজেই তো যাবে। পেট্রল বাঁচানোর জন্যে।"

BanglaBook.org

"আচ্ছা দিম্মা—কী যে বলো না তুমি?" নাতনি হেসেই আকুল। "এখান থেকে যাদবপুর কতটা পেট্রল লাগে? আর এখান থেকে সেই সেন্ট্রাল এভিনিউ কতটা? আমাকে যে গাড়ি নিতে বলছিলে, তার পেট্রল খরচটা কি ভেবেছিলে?"

—দিম্মা তাতেও অপ্রতিহত। "তুমি তাহলে মিনিবাসে যাবে। আর মা মোপেডে। আর যখন সবাই মিলে বেরুবে, তখন গাড়িও বেরুবে"

—"বারে বাঃ! আমি বলে এত কষ্ট করে মোপেড কিনলুম, হেলমেট কিনলুম, শাড়ি-গার্ড লাগালুম, সব মিনিবাসে করে যাবো বলে! না! মোটেই না।" এবার আমাকে প্রবেশ করতেই হয়।

—"আরে বাবা আমি আগে চালাতে শিখি! আমি তো মোপেড কখনও চড়িইনি, চালানো দূরের কথা। চালাতে যদি পারি তবে তো নিয়ে বেরুবো! কিন্তু কলেজে কেন যাওয়া বারণ সেটা শুনি?"

"কেন না তোমার বন্ধুরা হাসবে।"

"হাসুক গে তোমার বন্ধুরা, লোকে অমন কত হাসে! কোনো ভাল কাজই করা যায় না লোকে কী বলবে ভাবলে। মোপেড যদি চালাতে পারি, তবে সর্বত্র যাবো কিন্তু।"

"পারবে না কেন? না পারার কী আছে? খুব সোজা অতি সহজ। গাড়ি চালানোর মতন নয়। অত রকম হাতেপায়ে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম একসঙ্গে কসরত করতে হয় না সারাক্ষণ, নাচ শেখার মতন। স্টার্টিংটাই কায়দা লাগে কেবল, একবার স্টার্ট করলে, চলতেই থাকে। প্যাডলও করতে হয় না। সাইকেলের চেয়েও সোজা। তুমি একবার দেখে নিলেই শিখে যাবে, মা। কিন্তু শিখে ফেলেই আমার গাড়িটা মোনোপলাইজ কোর না বাপু। মাঝে মাঝে চড়তে দেয়ে নিও।"

এই শেষ নেবার ব্যাপারটা আমার মনের মতো হল না। কিন্তু আমি বললুম শুধু, "আগে তো শিখি।"

"চলো না, শিখবে? এখনই শিখিয়ে দিচ্ছি।" মেয়ে উদার সুরে আহ্বান জানায়। কিন্তু আমি কোথায় একপায়ে রাজি থাকব তা নয়, আমার বুক দিয়ে বেরিয়ে এল "না, না। এখন থাক। এখন নয়। এখন ভর দুপুরবেলা, চারদিকে লোকজন। সবাই দেখবে। রাত্তিরবেলা রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকবে, তখন সেফটিও বেশি। তখন শিখব। লোকে দেখলে কী ভাববে!"

"এই না বলছিলে, লোকের কথা ভাবলে জীবনে কোনো বড় কাজই করা যায় না?"

"এটা তো তেমন কিছু বড় কাজ নয়, তুচ্ছ কাজ, এর জন্য লোকের কথা ফেস্ করাটা নট ওয়ার্থ ইট। রাত্তিরে হবে এখন।"

হায়! রাত্তির তো হবেই। কখনও না কখনও। হলও। মা বললেন—"খুকু, এই তো দিব্যি রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। যা এইবেলা মেয়ের কাছে চট্ করে মোপেড চালানোটা শিখে নে বরং।" আমারও পছন্দ হল কথাটা। বয়েস হয়ে, মা দিনে ঘুমোন, রাতে জাগেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অনেক রাত্তির অবধি জেগে জেগে গুলতানি করি। রাত তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। পথঘাট সত্যি ফাঁকা। বাড়িবাড়ি আলোও নিবে গেছে। প্রতিবেশীরা নিশ্চিন্ত নিদ্রায় কাকুকে বিব্রত করার ভয় নেই। নিচে নামলুম। সঙ্গে দুই কন্যা ও কানাই। ঝকঝকে কালো ঘোড়ার মতো নতুন তেজী মোপেডে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো মেয়ে সাইকেল দিব্যি চালায়, কিন্তু মোপেডে নিরুৎসাহ। ("ওরে ব্বাবা ও আমি পারব না!") বড় মেয়ে বলল—"এই দ্যাখো হ্যানডেল। এই হচ্ছে অ্যাকসেলারেটর, এই ব্রেক। দুটোই হাতে, পায়ের কিছুই নেই এতে। শুধু স্টার্টটা পায়ে করে ওদিকে ঘোরালো অ্যাকসেলারেট করবে, এদিকে ঘোরালেই বন্ধ। এটা হচ্ছে ব্রেক। দেখে নাও। আর এই পায়ের কাছে এইভাবে এটাতে ঝাঁকি মেরে

BanglaBook.org

আচ্ছা হাতে এইটে টিপে এই যে দেখে নাও, স্টার্ট করতে হবে। এটা কিন্তু শক্ত। ভালো করে দেখেছ?"

"গীয়ার টিয়ার? কোন্‌দিকে?"

"নেই। এটা গাড়ি নয়। এটা আসলে সাইকেলই। কেবল মোটরে চলে। প্যাডলও আছে, তেল ফুরোলে প্যাডল করে চলে। তবে একটু ভারী লাগে। এই যা। নাও এদিকে দ্যাখো—কী দেখছো অন্যমনস্ক হয়ে? এদিকে তাকাও!"

"ওদের বাড়িতে একটা আলো জ্বলছে।"

"জ্বলুক, ওটা তো রোজই জ্বলে। ওটা ওদের সিঁড়ির আলো। স্টার্ট দেবার পরে, স্ট্যাণ্ডটাকে এই যে, এই জিনিসটা, আগে নামিয়ে দেবে। এমনি করে। এবার গাড়িটা চলবার উপযুক্ত হল। প্রথমেই স্টার্ট দেবে, এমনি করে, বুঝেছো? তারপর—আমি আগে চালিয়ে দেখিয়ে দিই বরং—তুমি দেখে শিখে নাও। দ্যাখো এইভাবে চড়ে বসবে—" মেয়ে তো জিন্স পরা, লাফিয়ে উঠে বসলো। আমি যতই উচ্চে তুলি না কেন শাড়িটা, কক্ষনো ওভাবে উঠে বসতে পারব না।

"স্টার্ট দেবার পরে গাড়ি স্ট্যাণ্ড থেকে নামিয়ে সিটে বসবে, একটু পরে উঠতে হয় এতে বুঝলে? গাড়ির মত নয়, আগে উঠে বসে পরে স্টার্ট দেয় না—এমনি করে অ্যাকসেলারেট..." মেয়ের গলা আর শোনা গেল না। প্রবল ভট্‌-ভট্‌ শব্দের মধ্যে দূরে মিলিয়ে গেল। দ্যাখ্‌ না দ্যাখ্‌ ঐ মোড়ের কাছে পৌঁছে গিয়ে বাঁই করে ঘুরে আসছে। ফিরে এসে স্পীড কমিয়ে—"এই দ্যাখো, মা এইভাবে ব্রেক কষছি—" বলতে বলতে মেয়ে প্রান্তে করে থেমে গেল। অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখা গেল না। কেমন ভাবেই বা সে স্টার্ট করেছিল ঐ গাড়ি, কেমনভাবেই বা সে অ্যাকসেলারেট করল, আর কেমনভাবেই ব্রেক কষেছে! কিন্তু সেটা মুখ ফুটে স্বীকার করতে আমার বাধলো। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ির রকে রোজ শুয়ে থাকে এক রিটায়ার্ড ঠিকে কাজের মেয়ে, রানী, সে মহা উৎসাহে উঠে এসেছে। আর উল্টোদিকের টিউবওয়েলে জল খাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ ভিখারি—হাতে বাটি, লাঠি, বগলে পুঁটলি। তিনিও এসে কানাইয়ের সঙ্গে বাতচিত শুরু করেছেন। দুর্গা বলে এগিয়ে যাই। প্রথমে আমি মেয়ের দেখাদেখি ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করি কিছুতেই হয় না। মেয়েই স্টার্ট দিয়ে দিল। তারপর প্রায় হাঁটু অবধি শাড়ি উঠিয়ে "যা থাকে কপালে" বাবের পিঠে জগদ্ধাত্রীর মতো তো অধিষ্ঠিত হলাম পাদপীঠে। পা রাস্তায়। ছোট মেয়েটা ঈতু। সরু গলায় "ওমা? মা? পড়ে যাবে না তো?" বলে উঠল। বড়টি সাহসিকা—"চুক্কুস্‌ তো। পড়বেন কেন? মা তো সাইকেল চালাতেন কলেজে। সাইকেল প্রতিযোগিতার তিন তিনটে মেডেল আছে না!"

"হ্যাঁ তা থাক, কিন্তু শান্তিনিকেতনেই সেবার তো সাইকেল চড়তে গিয়ে ধাঁই করে মা পড়ে গিয়েছিলেন, মনে নেই?"

ছোটমেয়ের ভুল ঘুচতে চায় না।

"সে অনভ্যাসের দরুন। সাঁতার আর সাইকেল কেউ ভোলে না। জানিস?"

"—জানি। কিন্তু মা যে আলাদা। মা তো সেবার মহালয়ায় সাঁতার কাটতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবেও যাচ্ছিলেন; আমরা স্বচক্ষে দেখেছিলুম না? অথচ মার তো লাইফ সেভিং সার্টিফিকেট আছে দিল্লীর আলমারিতে। আছে না?"

আমি আর পারি না। "হ্যাঃ—যতো সব বাজে কথা। হঠাৎ ডুবব কেন? শাড়িতে পা জড়িয়ে ধরেছিল তাই। আর সাইকেল যে আজকাল চড়তে পারি না সেটা তো কেমব্রিজের সেই অ্যাক্সিডেন্টের পরে, সাইকোলজিকাল ব্লক থেকে।"

"কী অ্যাকসিডেন্ট, মা?" দুজনেই ব্যাকুল।

"ঐ যে, টিউটরের কাছে যাচ্ছিলাম তো, অন্যমনস্ক হয়ে চলাচ্ছি হঠাৎ একটা পার্কড ভিহিকলের সঙ্গে, একটা থেমে থাকা লাল দোতলা বাসের সঙ্গে, ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে গেলুম। আর ঠিক সেইখানেই পুলিশ ব্যাটা ডিউটি দিচ্ছিল।...সেই থেকে কেমন ভয় ধরে গেছে। চলে আসার সময়ে আমার লাল টুকটুকে সাইকেলটা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পার্থ দাশগুপ্তকে দিয়ে এসেছিলুম। সে তখন ট্রিনিচিতে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। দেখা হলে জিগ্যেস করিস।"

"খুব হয়েছে। এখন এটা চালাও দিকি!"

"এই তো? এমনি করে তো? বেশ, একটু ঠেলে দে আগে, নইলে এগুবো কী করে?"

"ঠেলবো কি গো? নিজে নিজে যাবে। স্টার্ট তো দিয়েই দিয়েছি, এবার দু'পাশে পা রাখো, হ্যাঁ,...র‍্যাকটা তুলে নাও...হ্যাঁ...বাঃ, এবারে অ্যাকসেলারেট..."

বলতে না বলতেই গাড়ি উল্কাবেগে বেরিয়ে যায়। আমি সমেত। দু'পাশে দুই কন্যা প্রাণপণে ছুটছে, পিছনে পিছনে কানাই, তার পিছনে বাটি পাঠি পুঁটলি বগলে বৃদ্ধ ভিকিরি, তিনিও বুঝই জড়িয়ে পড়েছেন এই এক্সপেরিমেন্টে। আর রানী আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চেঁচিয়ে চীয়ার গার্লের কর্তব্য পালন করছে। চেঁচাচ্ছি অবশ্য আমরা সকলেই, কিন্তু ঠিক ঐকতানে নয়। যে যার স্বকীয়তা বজায় রেখে। একেই কি বলে হর্মনি?

বড় কন্যা—"ঠিক হচ্ছে মা, ঠিক হচ্ছে, চলতে থাকো"—

ছোট কন্যা—"ওরেব্বাবা মাগো পড়ে যেয়ো না যেন—দেখো বাবা ওগো, মাগো, যেন পোড়ো না"—

ভিকিরি বৃদ্ধ—"ওগো তোমরা সবাই থামো না একটু। —তোমরা একটু থামো দিকিনি—আমার বৌদিদি ঠিকই চলে যাবে এখন, দুগ্গাঃ দুগ্গাঃ—অত কথা বললে কি আর মাথার ঠিক থাকে কাউর"—

রানী "ও মাগো, কী হবে গো? এ কী কাণ্ড গো? বাড়ির গিন্নি যে মপেটও চালাচ্ছে গো"—

মোপেড—"ভটর্ ভটর্ ভাট্ ভাট্ ভাট্ ভাট্"—

আমি—(মনে মনে ইষ্ট মন্ত্র, আর মুখে)

—"ওরে ওবে নামবো যে রে—ওরে নামবো—ওরে থামবো কী করে—ওরে এটা যে থামছে না রে"—

ছুটতে ছুটতে মোপেড শিক্ষিকা দ্রুত ইন্সট্রাকশন দিতে থাকেন—

—"স্পীড কমিয়ে দাও, স্পীড কমিয়ে দাও, পা মাটিতে, পা মাটিতে ঠেকিয়ে দাও, মাটিতে পা ঠেকিয়ে—'

ছুটতে ছুটতে কাঁদো কাঁদো ছোট মেয়ে—"পা মাটিতে পা মাটিতে, অমা গো, পা মাটিতে মা—"

ছুটতে ছুটতে কানাই—

—"দিদি, দাঁইড়ে পড়ুন—পা মাটিতে নাবিয়ে ফেলুন, দাঁইড়ে পড়েন—নাবিয়ে দ্যান-পা-টা"

ছুটন্ত ভিকিরি "বৌদিদি আপনিই লেবে পড়বে- -তোমরা আর ওকে ঘাবড়ে দিওনি—বৌদিদি আপনিই লেবে যাবে বনি—তোমরা চেঁচানি থামালিই উনি লেবে পড়বে—"

উচ্চকিত রানী—"ওর উদিগে যেয়ে কাজ নি গো দিদিমুনি—ঢের হয়েচে—উদিগপানে আর যেয়োনি—উদিগে গরু শুঁতিয়ে দিবে, উদিগে গরু"

...আর 'যেয়োনি'! হুঁ, যেয়ে তো পড়েইছি। একেবারে বাটালের সামনে। ফুটপাতের ওপরে গোল হয়ে বসে নিরীহ বিহারী গয়লার দোলক বাজিয়ে গলা ছেড়ে ভোজপুরি রামায়ণ গাইছিল:

BanglaBook.org

—"রোমি রোমি পতিয়া—লিখলবা রজমোতিয়া—আবরে রোমি রেমি"—তারা প্রাণের আনন্দে আর ঢোলের শব্দে আমার প্রাণঘাতী ভ্যাট্ ভ্যাট্ শুনতে পায়নি। সহসা উদিত হয়ে তাদের জলসা থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে ঠাশ করে গাড়িটাকে ফেলে দিয়েই সার্কাসের কায়দায় লাফে তিন হাত লম্ফ দিয়ে ওদের উল্টোদিকে নেবে পড়লুম। সেও চমৎকার স্পেস সেন্সের প্রমাণ দিয়ে, গোবর গাদা থেকে আধ মিলিমিটার তফাতে। গাড়ি পপাত, গয়লারা অনাহত, আমিও অনাহত। সবাই ঠিকঠাক। শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবলুম—"অনেকটা সাইকেলের মতোই"—ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার রেজিমেন্ট এসে পড়েছে। বীরগর্বে বলি—"বেশ সোজা। ঠিকই বলেছিলি, অনেকটা সাইকেলের মতোই।"

বড় মেয়ে (সস্নেহে)—"দেখলে তো? এই তো বেশ চড়তে পেরে গেলে। গুড!"

বৃদ্ধ ভিকিরি—"কিন্তু বৌদিদি অতো ডাইনে বাঁয়ে প্যাঁচ কষছিলেন ক্যানে? সিধে যেতে পারেন নাকো? সিধে যাওয়াই তো ভালো।"

কানাই (সগর্বে) "আর একটু প্র্যাকটিস কল্লিই সিধে যেতে পারবেন—ব্যালান্সটা এসে যাবে—প্রেথম বারেই দিদি প্রায়ই শিখেই ফেলেছেন"—

ছোট মেয়ে (সভয়ে)—"থাক, আর শিখে কাজ নেই। এই পর্যন্ত থাক। মা আর একটু হলেই গয়লাদের চাপা দিয়ে দিচ্ছিলেন। নিজেও গোবরগাদাতে পড়ে যাচ্ছিলেন, অল্প একটুস জন্যে, নেহাৎ বাই চান্স —"

রানী (দূরে থেকে, অদৃশ্য দেবতাদের নমস্কার করে)—"দুগ্গা—দুগ্গা। ও বড়দিদি ছোড়দিদি তোমাদের মা জননীকে এবার ডাকো—ভলয় ভালয় ঘরে ফিইরে যে এসো বাছারা—আর মপোট্ চালিয়ে কাজ নি গে মায়েরে—ঈ কী পেহ্লাদ"—

বাইরে রাজরাজেশ্বরের মতো মুখের ভাব হলেও আমার বুকের ভিতর দুরু-দুরু। সেই যে দোলনচাঁপার ফুদে ছেলেটি বম্বেতে একটা সরু সাঁকো পার হতে হতে বলেছিলো না, —"আই অ্যাম নট আট্ অল আফ্রেইড, —কিন্তু মনে মনে বিসোন ভয়। ঠিক সেই অবস্থা।

গয়লারা তো গানবাজনা বন্ধ করে প্রাণভয়ে, "হায়-রাম!" বলে ঢোল ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। গরুগুলো নেহাত খোঁটায় বাঁধা, কিন্তু তবু বহুদ্রষ্টা প্রাণী, ঠিকই বুঝেছে একটা কিছু ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা সংঘটিত হতে চলেছে। একটা বেয়াড়া বাছুর ভয় পেয়ে গিয়ে অকস্মাৎ গলা ছেড়ে কেঁদেই উঠলো—"হাম্বু-উ-উ"...কী অলুক্ষুণে গরু রে বাবা।

নাঃ। এদিকটাতে সত্যিই আর প্র্যাকটিস করা যাবে না দেখছি। ইতিমধ্যে আমাদের দলে রাস্তা থেকে আরও একজন কর্তাব্যক্তি, এপাড়ার প্রহরী সারমেয়টি, এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি সবলে সরু ল্যাজ নেড়ে নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছেন, আমি আত্মস্থ পদক্ষেপে, হিতৈষী-স্টাইলে মোপেডটি হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছি, সঙ্গী সবমেয়ও ধীরপদে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছেন, মহাপ্রস্থানের স্মৃতি মনে না পড়ে উপায় নেই

সে যাই হোক, এদিকটায়, আর নয়। এবার বরং পূর্বদিকে, মাননীয় জ্যোতিবাবুর বাড়ির ওদিকটায় যাই। ওখানটায় খাটাল নেই, গয়লা নেই, গোবর নেই, গরু নেই, বাছুর নেই। শুধু ঘুমন্ত পুলিশ আছে কিছু। কেননা ওখানে জ্যোতিবাবুও নেই।

তেমনি ভাবনা তেমনি কাজ। আমাদের বাড়িটা যেহেতু তিনমাথার মোড়ে, তাই সম্ভবনা বহুমুখী। পশ্চিমে আর নয়, এবার পুব-দক্ষিণে। ও মোড়ে পৌঁছেই, হু-উ-শ্—সামনে টানা ফাঁকা রাস্তা...চালাও পানসি বেলঘরিয়া। স্টীয়ারিং হ্যান্ডেল এবার ডাইনে বাঁয়ে নয়, নাকের সিধে। এবারেই পারফেকশানে পৌঁছে যাবো। চমৎকার রাস্তা। একদম ফাঁকা।

কিন্তু এ কী হোলো, হঠাৎ? বাপ্‌রে! মরে গেলুম, মরে গেলুম! ছ্যাঁক্ করে পায়ের ডিমে একটা গরম আগুনের ছ্যাঁকা কে যেন লাগিয়ে দিলে! ওমনি আপনা আপনি হাত কেঁপে উঠে

BanglaBook.org

অ্যাকসেলারেটর ঘুরিয়ে ফেলেছি হাঁকার চোটে, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় রোবটের স্টাইলে লাফিয়ে উঠে জ্যামুক্ত তীরের মতো নাকের সোজা ছুটলো আমার সপ্ত-ঘোড়ার বাহন, একেবারে পুষ্পকরথের মতো—মাটিতে না আকাশ পথে তাও ঠিক বুঝতে পারছি না—কানে এলো পরিত্রাহি চীৎকার—সবার ওপরে আমারই গলা :

আমি—"আমি নামবো, ওরে আমি নামবো"...

ছুটন্ত বড় কন্যা—"ব্রেক, ব্রেক, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেলারেটরটা উল্টোদিকে ঘোরাও—ব্রেক, ব্রেক।"

ছুটন্ত ছোট কন্যা—"অ মা মাগো, নেমে পড়ো মা, ব্রেক দিয়ে দাও মা, ব্রেক—মা গো অ মা"—

ছুটন্ত কানাই—"ব্রেক ডান হাতে, অ দিদি, ব্রেকটা ডান হাতে, দিদি, ব্রেক ডান হাতে"—

ছুটন্ত ভিকিরি—"ওরে মুখপোড়া, তুই থাম না রে, বৌদিদি ঠিকঠাক বেরেক মারবে, তোরা থামলিই বেরেক মারবে, তোদেরকে চেঁচতে হবে না ব্যাটারা"—

বাড়ির সামনে দণ্ডায়মান বানী—"হায় হায় হায়—হয়ে গেল! এইবার ঠিক সব্বোনাশ হবে গো—হে মা দুগ্‌গা—হে মা দুগ্‌গতিনাশিনি—রক্ষে করো মা—"

ছুটন্ত কুকুর—"ঘৌ ঘৌ ঘৌ ভৌ ভৌ ঘৌ ঘৌ ছোঃ ছোঃ"

উড়ন্ত আমি—"ওরে, এ যে থামচে না রে—ওরে এ যে থামবেই না—"

ছোট কন্যা—"হে ভগবান"—

ভগবান শুনতে পেলেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ি 'ইন্দ্রাণী' আর শিল্পী সুনীলমাধব সেনের বাড়ির মাঝ বরাবর ভগবান প্রচুর কালি ঢেলে রেখেছিলেন। যেন আমারই প্রতীক্ষায়। পাখির মতো উড়ে গিয়ে আমার মোপেড সেই ঐশ্বরিক কালোবেলায় সজোরে ঢুকে পড়লো। মোপেড সুদ্ধু আমি কালির মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে গেলুম। চমৎকার চাঁদনি রাত। কালিতে শুয়ে শুয়ে মাথার ওপর চেয়ে দেখলুম চাঁদের মুখখানা হাসি হাসি। নক্ষত্রের শ'য়ে শ'য়ে চোখ টিপুনি। কী গো? কেমন হোলো? লাগলো কেমন? বেশ ভাই!

ততক্ষণে পাড়ার সবগুলো বারান্দাতেই আলো জ্বলছে। একটা অডিয়েন্স তৈরি হয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা সবাই বাইরে। শুধু পুলিশেরা ভিতরে। সার্কাস দেখার উত্তেজনা বাতাসে খেলে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকেই উত্তপ্ত, প্রত্যেকেই বিজড়িত, প্রত্যেকেরই একটা পয়েন্ট-অফ-ভিউ আছে। দীপঙ্করটা থাকলে একটা ওপিনিয়ন পোল নিয়ে নিতো—ভাগ্যিস সে ব্যাটা অনুপস্থিত! পড়শীরা সকলে যার যতোটুকুন সাধ্য উদ্দীপনা যোগাচ্ছেন—সেই যখন একটি ছেলে ওই কেয়াতলার মোড়ে সাত দিন টানা সাইকেল চালাবে বলে ঘোষণা করে তিন দিন একটানা সাইকেল চালিয়েছিলো—ঠিক তেমনি টেন্স আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। উত্তেজনায় উল্টো সিগারেট ধরিয়ে সামনের বাড়ির দাদা বলছেন—"পিকো, তোর মাকে চার চাকাতেই মানায় ভালো"—নাইটির ওপর হাউসকোট চড়িয়ে বৌদি বলছেন "টুম্পা, মোপেডটা মাকে ধরতেই দিস না।" বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াই। চতুর্দিকে সহানুভূতি চাঁদের আলোর মতো বয়ে যেতে থাকে!

"কী খুকুভাই? লেগেছে নাকি?"

"একটু আধটু না পড়লে হয়? জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার, সাইকেল শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়"...

—"ঘাবড়াস না রে খুকু, আর ক'টা দিন প্র্যাকটিস করলেই তুই ঠিক তোর মেয়ের মতন চালাতে পারবি—"

"ও কিছু না, লেগেছে ভাবলেই লাগবে—মনে কর পড়িসনি।"

কুকুর রূপী মহাত্মা বললেন—"নারদ নারদ লাগলাগ দূর দূর ভাগ্ ভাগ্ ভৌ ওঁউ যাও যাও

ঘরের মেয়ে ঘরে আও।" লাঠি-বাটি-পুঁটলি সামলে সমানেই কানাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়েছেন বৃদ্ধ তিকিরি। আমার এই পাবিলিক রথক্ষলনে তিনি যারপরনাই বিমর্ষ। আমার মোপেড প্রশিক্ষণের যৌথ পরিশ্রম তো কম ক্লান্তিকর ছিল না। তিনি এখন কানাইকে ডেকে বলছেন—"ভাইটি একটু টিউকলটা পম্প করে দেবে? টুকুনি জল খাবো।" দিদির কীর্তিতে সলজ্জ, নির্বাক কানাই, হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটোনো। আমার মেয়ের মোপেড ঠেলে নিয়ে আসছে। দুই মেয়ে দুই পাশে ঘন হয়ে লেপ্টে এসে দুই কানে গুনগুন করে বলছে, "বেশি লাগেনি তো? মাগো? বেশি লাগেনি তো?" আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি না খুঁড়িয়ে, সহজভাবে, এবং গ্রেসফুলি হেঁটে বাড়িতে ঢুকে পড়তে। কপিলদেব ক্যাচ লুকে আউট করে দেবার পরে ইমরান খান যেভাবে আস্তে হেঁটে সেদিন প্যাভিলিয়নের দিকে আসছিলেন, (আহা আউট হয়েও কী গ্রেস, কী পয়েজ)—অনেকটা সেইভাবে একদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে স্টাইলিশভাবে পা ফেলবার চেষ্টা করছি—পথের দু'পাশে চেনা-অচেনা উৎসাহী দর্শককুলের গার্ড অব অনারের মাঝখান দিয়ে। কিছু সদ্যোস্নাত রিকশোওয়ালার পাশাপাশি গয়লারাও ও-মোড় থেকে হেঁটে এ-মোড়ে চলে এসেছে, তামাশা দেখতে। এমনকি মহামান্য পুলিশরাও আড়মোড়া ভেঙে উঠে এসেছেন। কেবল গরুগুলোই যা বোঁটা উপড়ে ছুটে আসতে পারেনি।

কান গরম, পা জ্বলে যাচ্ছে, কোনরকমে যেন কিছুই হয়নি ভাব করে বাড়িতে এসে পৌঁছেই কাতরে উঠলুম—"বার্নল! বার্নল! আমার পা পুড়ে গেছে।"

—"পা পুড়ে গেছে? সেকি? রক্ত দুপুরেও বল্লিটা গরম ছিলো নাকি?"

—"স্কেটেকুটে যায়নি, পুড়ে গেল? সে আবার কি?"

রুনী কপাল চাপড়ে বললো—"পুড়বেনি? পুড়বেই তো! কালকাল! দিনে দিনে আরো কতো কী চোক্ষে দেখবো কে জানে?"

কানাই বড় শান্ত ছেলে। ইতিমধ্যে গাড়িটা পরীক্ষা করে খুব গরম একটা জায়গা বের করেছে যেটা চামড়াতে ঠেকলে ছ্যাঁক লাগবেই লাগবে। কিন্তু সেখনটা মোটেই চামড়াতে ঠেকার কথা নয়। আমার চড়ার গুণেই ঠেকে গেছে। কানাইয়েরও কখনো ছ্যাঁকা লাগেনি, শিকোরও না। ওরা তো দিব্যি নিরাপদে চালিয়েছে! ওদের নিরাপদ হস্য অগ্রাহ্য করে মার কাছে চলে এলুম। বোঁড়াতে খোঁড়তে। মা ঘরবন্দী মানুষ। বারান্দায় বেরুতে পারেন না। ওদিকে রাস্তায় যে কীদৃশ নৈশবিপ্লব ঘটে যাচ্ছে মা কিছুই টের পাননি। এক মুখ উজ্জ্বল হেসে মা আমাকে রিসিভ করলেন।

—"আয়। বোস। হোলো শেষ?"

—"ওই একরকম।"

—"পরলি চালাতে?"

ঠিক এমন সময়ে কানাই এসে বললো:

—"দিদি, বার্নল।"

—"বার্নল? কেন রে, বার্নল কী হবে?"

—"পা পুড়ে গেছে দিদির।"

—"খুব লেগেছে, না মা? দেখি দেখি—"

—"আশ্চর্য! আমরাও চড়ি, কখনো পা পোড়ে না, তুমি পোড়ালে কেমন করে বলো তো?"

—"পা পোড়ালি কি না গাড়ি চালাতে গিয়ে? একি রান্নাবান্না? আশ্চর্য মেয়ে বাপু!"

—"ওই মোপেডের এগজস্ট পাইপে ছ্যাঁক খেয়ে গেছেন।"

—"সেকি রে? খুকু? সত্যি!" কন্যার গাড়ি চালানোর চমৎকারিত্বে অপরিসীম বিশ্বাসী মা-বেচারীর দুই চোখে বিস্ময়-বিস্ফারিত বেদনা। অর্থাৎ মার চোখ বলছে—"আদ্দিন কলকাতা শহরে গাড়ি চালিয়ে শেষে কিনা এ-ই?" গাড়ির এগজস্ট পাইপ থেকে যে পায়ে ছ্যাঁকা লাগতে

BanglaBook.org

পারে না মাকে সে ব্যাপারটা বোঝাই কী করে?

—"বেশি লাগেনি। একটুখানি ফোস্কা।" লজ্জিতভাবে বলি।

—"দেখি, দেখি? ও বাবা! এ যে অনেক—কখানি রে?" মা কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে চুপ করে থাকেন। মেয়েরা সবসময় বর্নল লাগিয়ে দেয়। মা দ্যাখেন ফার্স্ট এড শেষ হলো, মা ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়েন। আমি তাড়াতাড়ি বলি—"ফোস্কাটা সেরে গেলেই আবার"—

—"থাকগে, থাকগে। ও আর হোলো না। তোমার আর মোপেড চালিয়ে কাজ নেই মা, তুমি তোমার চর চাকাব যন্তর নিয়েই থাকো। পিকে যেটা পারে, তুমিও সেটা পারবে, আমি এইটে ভেবেছিলুম।" মা মর্মাহত। অক্ষম সন্তানের উচিত সঙ্কোচেই আমি অনেকখানি মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকি। সত্যিই তো। পারিনি। মোপেড আমি চালাতে পারিনি। তবু সাহস করে বলে ফেলি

—"পায়ে ছ্যাঁকাটা যদি না লাগতো মা—"

—"পিকোর কি ছ্যাঁকা লেগেছিলো?"

—"ও তো জীনস পরে।"

—"তোমাকে জীন্স পরতে কে বারণ করেছিলো? যে দেবতার যা মন্তর।"

—"যাঃ বাবা! মোপেডের জন্যে জীন্স পরে শেষে যাদবপুরে? থাক মা, আমার ভাঙাচোরা গাড়িটাই ভালো।"

পরদিন কলেজে যাবো, গাড়ি বের করছি বাবী বকে বলে যাচ্ছে।

আমাকে দেখে হেসে হেসে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বললে—

—"এই তে, দিব্বি মাইনেতে এবারে। বলি। পায়ের সেই ফোস্কাটা আজগে আচে কেমনি? বুইলেনি গা দিদিমুনি, ঝাব কম্মো তারে সাজে অনারেবিল নাম বাজে। কে বয়েসের ঝা!"

BanglaBook.org

মূল-রামায়ণ

"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি।
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে!"

সুগ্রীব বললেন, "সখা তুমি হবেই। তোমার গতি জলে স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্ব বিঘ্ন অতিক্রম করে। তুমি নীতিজ্ঞ, বলবুদ্ধিবীর্য কোনোটাতেই তোমার তুলনীয় কেউ আমাদের মধ্যে নেই। হে বানরকুলশ্রেষ্ঠ, আমি নিশ্চিত তুমি পূজনীয়া সীতাদেবীর সংবাদ নিয়ে ফিরবেই, চাইকি তাঁকে উদ্ধারও করে আনতে পারো।"

হনুমান বিনীত হেসে বললেন, "মহারাজ! এ আপনার অতিরঞ্জন মাত্র। যদি থাকে আমি শ্রীরামচন্দ্রের মনে শান্তি বিধানের নিমিত্ত এই মুহূর্তেই সীতা অন্বেষণে বেরুচ্ছি কিন্তু আমার একটা পরিচয়পত্র চাই তো? সীতাদেবীর কাছে আমার গোকাস স্ট্যান্ডাইটা আমি প্রমাণ করবো কেমন করে? একটা আইডেনটিটি কার্ড জাতীয় কিছু—যদি অযোধ্যাধিপতি দিতে পারেন কিষ্কিন্ধ্যার আই ডি কার্ডে সীতাদেবীর কাছে কাজ হবে কি?"

শ্রীরামচন্দ্র এতক্ষণ মন খারাপ করে চুপচাপ বানরদের আলোচনা শুনছিলেন। লক্ষ্মণ তো অতি কষ্টে প্রবল গালমন্দ করে সুগ্রীবকে টেনে এনেছেন রানীদের মহল থেকে। সময় বয়ে যাচ্ছে। সীতা-উদ্ধারে বেরুনোই হল না। হনুমানের কথা শুনে রামচন্দ্র নিজের মধ্যমা থেকে রাম নামাঙ্কিত, সূর্যবংশের চিহ্ন সংবলিত, বহু মূল্য রত্নখচিত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি খুলে নিয়ে পবনপুত্রের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। "এই অঙ্গুরীয় সীতার অতি পরিচিত। এটি নিয়েই বিবাহের পর তিনি আংটি খেলা খেলেছিলেন বাসরঘরে।"

হনুমান আংটি মাথায় ছুইয়ে বিরাট এক সেলাম করে বললেন, "তবে আজ্ঞা করুন, রওনা হই?"

রামচন্দ্র ও সুগ্রীব একসঙ্গে বললেন, "শুভমস্তু, সফল হয়ে এসো মহাবীর!"

সুগ্রীবের রাজসভা থেকে একলম্ফে হনুমান রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হলেন। অঙ্গদ সেখানে বানর সেনাপতিদের লম্ফনের মাপ নিচ্ছিলেন।

সম্পাতি বলেছেন সীতা আছেন শতযোজন দূরে সমুদ্রপারে লঙ্কাদ্বীপে, দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যখানে। বানররাজ তাঁকে হরণ করে নিজ রাজ্যে নিয়ে গেছেন। নীল, মৈদ, সুহোত্র, জাম্ববান— প্রত্যেকেরই লংজম্পের স্প্যান কত, অঙ্গদ জানতে চাইলেন—শতযোজন লাফিয়ে পারাপার দুবার করতে কে পারবেন? দেখা গেল কেউ দশ-বিশ, কেউ আশি-নব্বুই—শতযোজন আর কেউই পারেন না। তখন মহাবীর হনুমানকেই ভয়ে ভয়ে অনুরোধ করা হল। তিনি পবনপুত্র। সহস্র যোজনও তাঁর কাছে তুচ্ছ হনুমান সঙ্গে সঙ্গে রাজী। অঙ্গদকে দেখালেন অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় নিয়ে তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। জাম্ববান বয়স্ক, জ্ঞানী, তিনি বললেন, "দেখবেন, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় যেন মাছের পেটে চলে যায় না!"

হনুমান মৃদু হাস্যপূর্বক উত্তর দিলেন, "আমি কি বিরহবিধুরা, অন্যমনা, গর্ভবতী অশোকবালিকা, জাম্ববান, যে অংটি তিমি-তিমিঙ্গিলে গিলে ফেলবে?"

বয়োবৃদ্ধ বানরদের নমস্কার করে, আকাশের সূর্যচন্দ্র, পবনদেব, অগ্নি, বরুণ, ধরিত্রী, সমুদ্র ও শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে হনুমান তো রেডি হতে লাগলেন। রেডি হওয়া মানে সমুদ্রলঙ্ঘনের যোগ্য আকৃতি ধারণ করতে হবে তো! তিনি শ্বাসরুদ্ধ করে যোগবলে ফুলতে শুরু করলেন। ফুলতে ফুলতে তাঁর আকৃতি হল ঠিক রকেটের মতো, তখন তিনি "জয় রামচন্দ্র" বলে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

BanglaBook.org

কিন্তু মহেন্দ্র পর্বত তো কেপ কেনেডি নয় যে রকেটের টেক্ অফ্ করা সহ্য করতে পারবে! সেই প্রবল ইম্পাক্টে ঝড়ঝড় করে মহেন্দ্র পর্বতের বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত হয়ে হনুমানের পিছু পিছু শূন্যে ধাবিত হল। পাথর ফেটে উষ্ণস্রোত উচ্ছ্বিত হল, শিলাখণ্ড উৎক্ষিপ্ত হল শূন্যে, "হেইও" বলে তো হনুমান শূন্যে ভেসে গেলেন। সেই সুমহান দৃশ্য দেখে দেব-দানব-গন্ধর্বকিন্নর মুনিঋষি সকলে "কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!" বলে হাততালি দিয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। অঙ্গদ ও অন্যান্য বানরবৃন্দ তখন মহানন্দে ফুল কুড়োতে শুরু করলেন। আকাশ থেকে বর্ষিত সেই ফুলের নাম আকাশকুসুম।

হনুমান এখন অনুকূল পবনের আশ্রয়ে (অর্থাৎ স্নেহময় পিতৃক্রোড়ে) নিশ্চিন্ত নির্ভার উড়ে গিয়ে হু-শ্ করে সোজা লঙ্কাদ্বীপের উপকূলে নামলেন। পাসপোর্ট ভিসার ব্যাপার তখনও ছিল, কিন্তু নামটা আলাদা। লঙ্কার দ্বাররক্ষা করতেন শ্রীমতী লঙ্কাদেবী। তিনিই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং লঙ্কার রক্ষয়িত্রী। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী না হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করা অসাধ্য। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তিনিই লঙ্কার ইমিগ্রেশন অফিসার।

বিরাশী সিক্কার এক হনুমানী থাপ্পড়ে লঙ্কাদেবীকে মুহূর্তমধ্যে ভূলুণ্ঠিতা করে হনুমান শিস্ দিতে দিতে লঙ্কায় ঢুকলেন। গলে হাত বুলুতে বুলুতে লঙ্কাদেবী টের পেলেন এবার লঙ্কার শেষের দিন সমাগত। কিন্তু তিনি কাউকে সতর্ক করতে পারলেন না, কেননা ওঁর ওয়াকিটকি ছিল না। ক্যাসাবিয়াংকার মতো, তিনি নিজের স্টেশনেই ফিক্সড হয়ে রইলেন।

স্বর্ণলঙ্কায় ঢুকে হনুমান বিস্ময়ে হতবাক্ রুদ্ধশ্বাস। শিস্ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল। কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর ধনদৌলত কম নয়, কিন্তু স্বর্ণলঙ্কার কাছে তুলনীয় একমাত্র ইন্দ্রসভা, আর ময় দানব নির্মিত পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদ। তার কোনোটাই হনুমান দেখেননি। তিনি তো রাজবাড়ী দেখার আগে, রাস্তাঘাট, পার্ক আর মার্বেলস্টোরিড 'বিমান'গুলি দেখেই পরমাশ্চর্য। সোনার তৈরি ঘরবাড়ি। কী তার এলিভেশন, কী তার আর্কিটেকচারাল একসেলেন্স। হনুমান ভুলেই গেলেন তিনি কেন এসেছেন। নিজেকে টুরিস্ট মনে করে তিনি হালকা মেজাজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমন সময় রাজপ্রাসাদের সামনে এসে, তিনি একলাফে পাঁচিল ডিঙিয়ে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হলেন। এবং সীতার খোঁজ শুরু করলেন।

রাবণের প্রাসাদ দেখে স্বর্গবাসী দেবতাদেরই মাথা ঘুরে যায়। তো বনবাসী হনুমান! কী উদ্যান, কী ফোয়ারা, কী কুঞ্জবন, কী নাচঘর, কী দীর্ঘ ডাইনিং হল, কী উজ্জ্বল সভাকক্ষ, কী স্বপ্নমদির শয়নমন্দির। আর কী সব পরমা রূপবতী সঙ্গিনী পরিবৃত হয়ে মহাবল মহাগুপ্তধারী দশমুণ্ড রাক্ষণরাজা, তাঁর বিশটি উদয়সূর্যনিভ বিশাল গোলাকার মদমত্ত রক্তচক্ষু অর্ধনিমীলিত করে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। স্বপ্নেও তাঁর চক্ষুতারকা ডাইনে-বামে ছুটোছুটি করছে না—তিনি এতই অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর বিশটি হাত বিশটি নিদ্রিত সুন্দরীর গলায় মালার মতো জড়ানো! হনুমান মুগ্ধনয়নে দেখছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হোলো অকৃতদার সচ্চরিত্র বানরদের পক্ষে ঘুমন্ত নারীদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অনৈতিক, তবু তিনি বিস্ময়ে দেখলেন, স্বর্ণপুত্তলী রূপসী যন্ত্রমানবীরা বিশাল সব রত্নখচিত মুক্তার ঝালরযুক্ত পাখা নিয়ে সারারাত্রি সারি সারি অগুন্তি রানীদের বীজন করে চলেছে রাবণরাজা সমেত। যদিও চতুর্দিকে উন্মুক্ত বাতায়নপথে মলয়বাতাস বয়ে আসছে পুষ্পচন্দনের গন্ধ মেখে বাগান থেকে।

আরে, রাবণরাজার ঠিক বাঁপাশে ঐ সোনার খাটে ও কে ঘুমিয়ে? ওই তো সীতাদেবী! কী তাঁর স্বর্ণবর্ণ, কী তাঁর শ্রাবণমেঘের মতো কুঞ্চিত কেশভার রত্নজালে শোভিত, কী তাঁর অঙ্গের গঠন, কী পেলব তাঁর আঙুলগুলি, প্রতিটি আঙুলে রত্নাঙ্গুরীয় ঝলসে উঠছে, দেহের

BanglaBook.org

সর্বত্র উপযুক্ত রত্নালঙ্কারের শোভা, বেশবাস একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে, কেননা বোঝাই যাচ্ছে তিনিও প্রমত্তা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, ঘরময় সোনার পানপাত্র ছড়িয়ে আছে, তাঁর টুকটুকে লাল ওষ্ঠাধর অল্প ফাঁক হয়ে আছে, মুক্তোর মতো দাঁত দেখা যাচ্ছে দু'চারটি। মুগ্ধনয়নে দেখতে দেখতে হনুমান ভাবলেন বেশ তো আছেন সীতা এখানে। তিনি কি আর বনে বাদাড়ে ফলমূল ভোজন আর কুশাসনে শয়ন করবার জন্যে ফিরতে চাইবেন? মহারানী রুমাদেবী বা তারাদেবী হলে নিশ্চয় থেকেই যেতেন। কে জানে অযোধ্যা কেমন? যতই ভালোমানুষ হোন, যতই নারায়ণের অংশে তাঁর জন্ম হোক, রামচন্দ্র তো এক জটাজুটবাঁধা চীরবসনপরা গৃহী, সন্ন্যিসিটাইপের রাজ্যহীন রাজা—রাবণরাজার মতো জম্পেশ চেহারা তাঁর নয়। মাত্র একটাই মাথা। দু'খানা মাত্র হাত। রাবণের ব্যক্তিত্ব কী! আহ্! ঘুমন্ত অবস্থাতেও দৃপ্ত পৌরুষ যেন ফেটে বেরুচ্ছে। জ্যোতির মত অহংকার নিঃসৃত হচ্ছে তার নিদ্রিত ভ্রূভঙ্গে, দম্ভিক ওষ্ঠের ঈষৎ বঙ্কিম রেখায়, উদ্ধত চিবুকে, পরিপাটি গোঁফে, জুলপিতে। রাম তো কেঁদেই ভাসাচ্ছেন—হা সীতা। যে সীতা! কবে নেহাৎই হনুমান রামভক্ত এবং সৎ লোক, তাই রাবণভক্ত হয়ে পড়লেন না, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, সীতা কি আর ফিরবেন! তারপর মনে পড়লো, অবশ্যই রাবণ লোক ভালো নয়। পরের বউকে চুরি করে আনে যে, সে চোর এবং বদমায়েস। সীতাদেবীকে তো সবাই বলে সতীলক্ষ্মী, ইচ্ছে করেই শ্বশুরগৃহের বিলাসবাসন ত্যাগ করে সেধেই স্বামীর সঙ্গে বনে এসেছিলেন। তবে কি কোথাও হিসেবে ভুল হচ্ছে হনুমানের? লক্ষ্য করে দেখলেন, যে-নারীকে তিনি সীতাদেবী মনে করছেন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ কটি সন্তানের মা হয়েছেন—স্তনে, নাকের পাশে, চোখের কোণে বিলম্বী জীবনের ও বয়সের ছাপ ধরতে শুরু করেছে, যদিও বাপযৌবনে ভাঁটা পড়েনি। কিন্তু সীতাদেবী তো বেশ ক' বছর বনে বনে ব্রহ্মচর্য পালন করে বেড়াচ্ছেন, তৃণশয্যায়, ফলমূলে জীবনধারণ করছেন। তাঁর রূপে মেদবাহুল্য থাকবে না বরং কৃশাঙ্গী হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া তিনি এখনও সন্তানধারণ করেননি। তাছাড়া সীতা যদি গহনা এতই ভালোবাসবেন তবে তিনি বনময় সব অলঙ্কার ছুঁড়তে ছুঁড়তে এসেছিলেন কেন, পথনির্দেশ দিতে? নাঃ, মানুষের নীতিবোধ অন্য, সীতাদেবী হয়তো রুমাদেবী তারাদেবীর মতো না হতেও পারেন। হঠাৎ মদ্যপান করে রত্নালংকার ভূষিতা হয়ে নর্মলীলা করতে রাবণের পাশে শুয়ে পড়বেন দশরথের পুত্রবধূ, জনকদুহিতা সীতা, এটা ঠিক নয়। মানুষদের সমাজে মেয়েদের কুলীত্ব নিয়ে বড্ডো কড়াকড়ি, ইচ্ছে করলেও চট্ করে সাহস পাবে না মেয়েরা পরপুরুষ গমন করতে।

অনেক ভেবেচিন্তে হনুমানের মনে হলো—নাঃ এই রূপবতী আর কেউ হবেন হয়তো, সীতাদেবী নন। এঁর মুখে শোকতাপ উদ্বেগ দুর্ভাবনার ছাপ নেই, শুধুই পরিতৃপ্তি! ইনি হয়তো পাটরাণী মন্দোদরীই হবেন।

তখন হনুমান প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরুলেন। ভাবলেন, যাই, একটু বনে-উপবনে ঘুরে ফলমূল ভোজন করে আসি, ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে বেশ। লম্ফ ঝম্ফ তো কম করিনি! শত যোজন যজ্ঞে কথা! এই বলে তিনি ফলের বাগানে ঢুকে মনের সুখে ফলপাকুড় পাড়ছেন আর খাচ্ছেন। পাড়ছেন আর খাচ্ছেন। ইচ্ছেমত এদিক ওদিক বোসা ফেলছেন, বীচি ফেলছেন, আঁটি ফেলছেন, ডাল ভাঙছেন, পাতা ছিঁড়ছেন। যথাসাধ্য নোংরা করছেন, নষ্ট করছেন রাবণরাজার সাজানো বাগান।

হঠাৎ দেখেন একটু দূরে লাল ফুলে ফুলে রাঙা হয়ে রয়েছে এক অপূর্ব অশোকবন। হনুমান এক লম্ফে অশোকবনে উপস্থিত হলেন। খাবার জন্যে নয়, বাঁদরামির জন্যে। গোছা গোছা ফুলপাতা ছিঁড়ে অশোকবন ধ্বংস করতে লাগলেন। সীতা মিলুক না মিলুক রাবণের বনসম্পদ তো নষ্ট হোক!

হঠাৎ দেখেন অশোকগাছের ছায়ায় শ্বেতবাসপরা এলোচুলে এক দেবীমূর্তি। কিন্তু তাঁর পা

BanglaBook.org

মাটি ছুঁয়ে আছে এবং তিনি অঝোরে অশ্রুবিমোচন করছেন। দেখে দেখে হনুমানের চোখ ফেরে না। কী জ্যোতির্ময়ী রূপ তাঁর। উপবাসে কৃশাঙ্গী, চুলে তেল নেই, রুক্ষ কেশ। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে লাল, অঙ্গে গহনা নেই। আরে! ওই তো দেবীমূর্তির একপায়ে নূপুর। অন্য নূপুরটি হনুমান রামের কাছে দেখেছেন।

আহ্লাদে হনুমান কিচিরমিচির করে উঠলেন এবং মহোল্লাসে অশোকগাছের ডাল থেকে ধপাধপ্ লাফ দিয়ে দিয়ে মাটিতে পড়তে লাগলেন বারংবার। সেই হুপ্ হুপ্ শব্দে সীতা তো কান্না বন্ধ করে অবাক চোখ তুলে তাকালেন। অমনি হনুমান একলাফে তাঁর সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, "মা জননী! আমি আপনার স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হনুমান। আপনাকে পতিগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি! দয়া করে আপনি আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন। আমি এক লহমায় শত যোজন অতিক্রম করে রাবণের পুষ্পকরথের চেয়ে ঢের দ্রুতবেগে আপনাকে শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে উপস্থিত করে দেবো।"

সীতা তো হনুমানের কথাবার্তা শুনে হাঁ! বলে কি বাঁদরটা? ক্ষ্যাপা বাঁদর নাকি? কামড়ে দিলেই ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, আবো কী কী হবে কে জানে? ওরে বাবা। এক তো ছিল ক্ষ্যাপা রাক্ষসের অত্যাচার! তার আবার ক্ষ্যাপা বাঁদর? নাকি এ রাবণ ব্যাটারই নতুন কারসাজি? যেমন সাধু সেজে এসেছিল সেবারে! অমনি চোখ মুছে ভুরু কুঁচকে ভীষণ রেগে সীতা বললেন, "হ্যাট্! হ্যাট্! যাঃ! ভাগ্! পাজি রাক্ষস! আবার জ্বালাতে এসেছিস? ও মাগো! এবারে বাঁদর সেজে এসেছিস? তোর মায়াতে আমি আর ভুলি? হায় পতি শ্রীরামচন্দ্র! হায় দেবর লক্ষ্মণ। তোমরা কোথায়?"

তখন হনুমান মৃদু হেসে বললেন, "হে দেবি! বৃথা বিভ্রান্ত হবেন না। আমি যথার্থই বানরী অঞ্জনার গর্ভজাত, পবনপুত্র শ্রীহনুমান। এই দেখুন, এই অঙ্গুরীটি কি আপনি চিনতে পারেন?"

আংটি হাতে করে সীতা আহ্লাদে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন। এর নাম আনন্দাশ্রু। হনুমানও সৌজন্যবশত তাতে যোগ দিলেন। খানিক আনন্দ প্রকাশের পর সীতা রাম-লক্ষ্মণের কুশল প্রশ্ন করলেন।

সৌজন্যবিনিময় সাঙ্গ হলে হনুমান বললেন, "মা জননী! আর বিলম্ব নয়। চেড়ীদের নিদ্রাভঙ্গ হলে বৃথা যুদ্ধে কালক্ষেপ করতে হবে। ভয় নেই আমার ঘাড়টি ধরে শক্ত হয়ে পিঠে বসুন। শ্রীরামচন্দ্র বড়ই অস্থির হয়ে রয়েছেন। আপনার জন্য উদ্বেগে তাঁর স্নানাহার নেই, নিদ্রা-বিশ্রাম নেই—শুধু একবার করে লক্ষ্মণকে ধমকাচ্ছেন আর একবার করে হাহাকার করছেন। বেশি দেরি করলে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটাও অসম্ভব নয়!"

সীতাদেবী তাই শুনে কালবিলম্ব না করে গাছকোমর বেঁধে, "তবে চলো, বৎস হনুমান" বলে উঠে বসলেন। হনুমানও যোগবলে পুনরায় রকেটাকৃতি হয়ে, "হেইওঃ" বলে টেক্ অফ্ করলেন।

হনুমানের সেই অমানুষিক উল্লম্ফনে যে প্রচণ্ড বায়বীয় সংঘর্ষ হলো আকাশে বাতাসে, সেই এলোমেলো বায়ুচাপের ফলে স্বর্ণলঙ্কায় অকস্মাৎ আগুন ধরে গেল, অশোকবৃক্ষগুলি উৎপাটিত হয়ে শূন্যে ছুটলো, ভিত্তিপ্রস্তর নড়ে গিয়ে সাততলা বিমান বিল্ডিংগুলি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো, লঙ্কানগরীতে হাহাকার পড়ে গেল। কেউ বুঝতেই পারলে না কী হয়েছে। কেউ বলে ভূমিকম্প, কেউ বলে উল্কাপতন, কেউ বলে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জাগ্রত হয়েছে, নাকি কোনো অস্ত্রাগারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে? লঙ্কায় তো অগুর্থাতমূলক কাজকর্মো হয় না, সেখানে সবাই সুখী। রাবণ রাজত্বে কারুর দৈন্য-দারিদ্র-দুঃখ-তাপ নেই। যা কিছু অন্যায় অত্যাচার সব অন্যদের রাজত্বে গিয়ে করে আসেন প্রজাপালক রাজা রাবণ।

BanglaBook.org

এদিকে হনুমান তো নিজের চারিপাশে মায়াময় বাষ্পজাল বুনে নিয়েছেন যাতে মা-জননী সীতাদেবী দৃশ্যমান না হন। তারপর মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র পার হয়ে তিনি এসে মহেন্দ্র পর্বতে অবতরণ করলেন। শত যোজন তাঁর পক্ষে নগণ্য বেগের কাছে কিছুই নয়। মহেন্দ্র পর্বতের চূড়ায় তাঁকে বিদায় দিয়ে মহাবল বানরগণ তখনও ফিরে যাননি। তাঁরা এরই মধ্যে হনুমানকে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কিলকিলা রব শুরু করে দিলেন। অত্যুজ্জ্বল বাষ্পজালে আচ্ছাদিতা সীতাদেবীকে দেখা গেলে তো তাঁদের উল্লাস শতগুণ বৃদ্ধি পেলো এবং তাঁদের চীৎকারে মহেন্দ্র পর্বতের সব পাখিকুল বন ছেড়ে উড়ে গেল, ছোটো ছোটো জীবজন্তুরা ভয় পেয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগলো এবং বৃহৎ জন্তুরা গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হলো। বানররা পরস্পরের দীর্ঘ লাঙ্গুল চুম্বনপূর্বক নৃত্যগীতে মেতে উঠলেন। আকাশপথে আবার দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নর ইত্যাদি ইত্যাদি আবির্ভূত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। যুবরাজ অঙ্গদ তখন বানরদের ধমকে বললেন, "চন্দন কাঠের পালকি বানাও!" সেই পালকি করে সীতাকে নিয়ে বানররা শোভাযাত্রা করে সুগ্রীবের সভায় শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যে চললেন। অহো! সে কী মধুর মিলনদৃশ্য। বাল্মীকি তা লিখে রাখেননি বলে জগজ্জন সেই স্বর্গীয় শোভার বর্ণনা থেকে চিরবঞ্চিত থেকে গেছে।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে ঘিরে বানরগণ তখন প্রচণ্ড আনন্দ উৎসবে মত্ত—তাঁরা ইতিমধ্যে মধুবন ধ্বংস করে মধুপান করে সকলেই পানোন্মত্ত হয়ে এসেছেন এবং রামচন্দ্র সে অপরাধ ক্ষমাও করে দিয়েছেন—নিজের গলার বহুমূল্য রত্নমালাটি রামচন্দ্র হনুমানের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, "হে বানরকুলশ্রেষ্ঠ! আজ থেকে আপনি অমর হলেন।" তারপর সীতাকে বাম অঙ্গে তুলে বসিয়ে, তাঁর কপাল থেকে কুঙ্কুম চূর্ণ অতি যত্নে সরিয়ে দিয়ে তাঁর গোলাপপাপড়ির মত কর্ণকুহরে মাঝে মাঝে কী সব অশ্রুত মৃদু গুঞ্জন করছেন, যে গুঞ্জনের ফলে সীতা আহ্লাদে শিহরিত হচ্ছেন এবং তাঁর গালগণ্ড সবই রক্তিম হয়ে উঠছে।

লক্ষ্মণ অবিশ্যি এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, কেননা তিনি তো সীতার পা'দুটি ছাড়া কিছুই দেখেন না। তিনি অন্য নূপুরটি যথাস্থানে পরিয়ে দিচ্ছেন—হেনকালে, সেই মধুময় মুহূর্তকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে একটি বল্মীকের স্তূপ সহসা নড়ে উঠলো। এবং তদভ্যন্তর থেকে ক্রোধোন্মত্ত বাল্মীকিমুনি নির্গত হয়ে যৎপরোনাস্তি রোষ-কষায়িত রক্তলোচনে কটুভাষণে শ্রীরামচন্দ্রকে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

বাল্মীকি বললেন—"ধিক্ ধিক্ দাশরথি, রাজীবলোচন রামরূপী লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ! এই কি আপনার উচিত কাজ হচ্ছে? মনুষ্য অবতার হয়ে জন্মেছেন বলেই কি মানুষী সংস্কার আপনার দৈবচরিত্রের এতই গভীরে প্রবেশ করেছে যে আপনি বিস্মৃত হয়েছেন, আপনার মনুষ্যজন্ম নেবার উদ্দেশ্যটা কী ছিল? রাবণের দ্বারা সীতাহরণ করানোই বা উদ্দেশ্যটা কী ছিল? কেঁদে কেটে একশা হয়ে শেষকালে কিনা একটা বাঁদরকে দিয়ে সীতা উদ্ধার করিয়ে এনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে সাত তাড়াতাড়ি প্রেমকূজন শুরু করেছেন? বলি এবারে রাবণবধের যুদ্ধটা তবে হবে কেমন করে? শুনি! সেই কৃত যুগ, ত্রেতা যুগ দুই যুগ ধরে যে-মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে স্বর্গে-মর্তে-পাতালে, যার জন্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে দশ মাথা (চার প্লাস এক প্লাস পাঁচ) এক করে প্ল্যান করতে হয়েছে, সেই যুদ্ধটারই তো মূলে হ্যা-ভাত করে ছেড়ে দিয়েছে এই ব্যাটা অতিপক্ক, ওভারস্মার্ট বাঁদর। ধরিত্রী যে রাবণের পাপে ডুবুডুবু! এখন ধর্ম-সংস্থাপনই বা হবে কেমন করে, আমিই বা রামায়ণ লিখব কী নিয়ে?"

রাম লজ্জায় অধোবদন দেখে মুনি এবার সীতাকে নিয়ে পড়লেন—"আর আপনাকেও সত্যি বলিহারি যাই মা সীতাদেবী। সুলক্ষণা রাজকন্যা রাজবধূ হয়ে, একটা সামান্য মুখপোড়া হনুমানের গলা ধরে ঝুলে পড়তে আপনার লজ্জা-ঘেন্না হোলো না? পরপুরুষের স্পর্শে আপনার কি পাপের ভয়ও করলো না? নাকি সে-সব রাক্ষসের গহ্বরে পড়ে—"

BanglaBook.org

সীতাদেবী তো রামচন্দ্রের মতো ভালোমানুষ নন। তিনি আগুনের মতো ফোঁস করে উঠলেন—"মুখ সামলে কথা বলবেন ঋষিমশাই! জানোয়ারের আবার পরপুরুষ কী? বাঁদর কি মানুষ? পিতৃগৃহে কতো অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছি কেবলমাত্র ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে, তাতে পাপ হয়নি—শ্বশুরগৃহে কতো হস্তিপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছি বায়ুসেবনের উদ্দেশ্যে, তাতেও পাপ হয়নি, আজ আমি বানর পৃষ্ঠে শত্রুগৃহ থেকে পলায়ন করেছি, এবং স্বামীর কাছে প্রত্যাগমন করেছি—তাতেই পাপ হয়ে গেছে? কেন? আমি বল্মীকের মধ্যে চাপা পড়িনি বলেই কি আমি নীতিজ্ঞা নই? অযোনিজা কন্যাকে সামান্যা রমণী ভাববেন না মুনিবর! একটু সাবধানে বাগ্‌বিস্তার করবেন, মনে রাখবেন আমারও জন্ম লক্ষ্মীর অংশে। আজ যে-হনুমানের কাঁধে আমি চড়েছি তিনি আমার পুত্রবৎ। আমাকে জননী সম্বোধন করেন। হায় সংস্কার! আজ উইপোকার কল্যাণে আপনি মুনিঋষি বনে গেলে কি হবে, ছিলেন তো সেই চোর-ডাকাতই—মনের মালিন্য আপনার কাটেনি মুনিবর। ওঙ্কার শতধৌতেন ইত্যাদি।"

সীতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধমক খেয়ে বাল্মীকি কী বলবেন ভেবে পেলেন না, রাগে তাঁর বাগ্‌রোধ হয়ে গেল। তিনি তোতলাতে শুরু করলেন। রামচন্দ্র দেখলেন সর্বনাশ। মহাকবি যদি তোতলা হয়ে যান, তবে তো আদিকাব্য রচনাই হবে না। তিনি তড়াতাড়ি ব্যাকুলস্বরে বলে উঠলেন—"থাক থাক ওসব কথা! তাহলে, সীতা, বলো তো দেখি, এখন কী করি? সত্যিই তো আমারই কথা ছিল তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাবণকে সবংশে নিধন করে স্বর্গে মর্তে পাতালে সনাতন ধর্ম পুনঃসংস্থাপন করব! রাবণের পাপে সৃষ্টি ডুবুডুবু। এখন কী হবে? কস্মিক অরডার নষ্ট হতে চলেছে—সব যে ভণ্ডুল হয়ে গেল!"

ধনুকের মতো ভুরু দুটিকে খড়্গের মতো করে সীতা বললেন, "ভণ্ডুলের কী আছে আর্যদেব? ওই উইপোকামুনির কথা ছাড়ুন তো আপনি নাথ! সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটু ভুল না হয় হয়েই গেছে, তা বলে সেটা সংশোধন করা যাবে না কেন? মহেন্দ্রপর্বত আর অশোকবন তো এইখান থেকে এইখানে! উঠলুম আর নাবলুম! চোখের পলকে পৌঁছে যাবো। চলো তো বৎস হনুমান! আরেকবারটি তোমার পিঠে চড়ে বসি! আলসে চেড়িগুলো নিশ্চয়ই এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি! তাড়াতাড়ি আমাকে আনতে যাবেন কিন্তু প্রভু! অকারণ দেরি কোর না যেন, দেবর লক্ষ্মণ! চলো বৎস ফিরে যাই। হুঃ।" বলে সীতা বাল্মীকির দিকে অবজ্ঞার চাউনি দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

"যথা আজ্ঞা মা-জননি! জয় হোক শ্রীরামচন্দ্রের!" বলে সর্বশক্তি সংহত করে আরো একবার যোগ বলে স্পেস-রকেটাকৃতি হয়ে হনুমানজী আকাশে উড্ডীন হলেন। এবার শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য উপস্থিতির করণে গাছপাথর সবকিছু স্বস্থানেই রইলো। বানরগণ উড্ডীয়মান হনুমানের দিকে সাদা রুমাল নেড়ে বলতে লাগলেন "শুভ হোক যাত্রাপথ!"

বাল্মীকি দাঁতে দাঁত চেপে সব দেখলেন। আর মনে মনে বললেন—"বড্ডো তেজী মেয়েমানুষ। না? আচ্ছাঃ আমিও মহাকবি বাল্মীকি। দেখে নেবো! স্বামীর কোলে বসে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা? হবে! হবে!—তোমার কী হাল করি, তুমি দেখো! একেবারে আমার সেই ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর অবস্থা করে ছেড়ে দেবো! কলম যার হাতে, ভবিষ্যৎ তার হাতে!"

তারপর তো সবাই জানি সীতার কী কী হয়েছিলো।

BanglaBook.org

নিজের কথা

প্রথম প্রত্যয়

এক কবির গর্ভে আরেক কবির ঔরসে আমার জন্ম। অক্ষরের জগৎটাই যার ভিটেমাটি, ঘরসংসার, সে আর কবিতা লিখবে না কেন। যেমন আমার গাছে-চড়া, বৃষ্টিতে ভেজা, কাগজের নৌকো গড়া, তেমনিই আমার কবিতা লেখা। কবিতা আমার জীবনে আক্ষরিক অর্থেই সহজ। একা বাড়ির একলা শিশু, কবিতা আমার স্বভাব-সঙ্গী। আশৈশব।

এতৎসত্ত্বেও একটি কবিতা লিখতে আমার সময় লাগে অনেক। পরিশ্রম হয় প্রচুর। কবিতা কষ্টসাধ্য। সুখদা নয় মোটেই, স্বয়মাগতা হলেও না। তাকে আপ্যায়নের অনেক ঝঞ্ঝাট। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন কবিতার ব্যাখ্যা দেওয়া।

আমার জীবিকা যদিও সাহিত্যের মাস্টারি, তবুও চেষ্টা করি পারতপক্ষে আমাকে যেন কবিতা না পড়াতে হয়। ও হচ্ছে জাগ্রত প্রজাপতির পাখনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে প্রাণীবিজ্ঞান শেখানোর মত কঠিন কাজ। আর, তারও চেয়ে কঠিন কাজ নিজের কবিতা নিয়ে নিজেই লিখতে বসা। এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় বঙ্গ! আমিই যদি সব লিখে রেখে দিই, তবে অন্যরা আমার কবিতা নিয়ে আর কষ্ট করে ভাবতে যাবে কেন? তাছাড়া নিজেকে অতটা গুরুত্ব দেবার মধ্যে কেমন একটা দম্ভের দীনতা আছে না? কতটুকুই বা লিখতে পেরেছি? কই বাল্মীকি, কালিদাস, কবীর, চণ্ডীদাস কেউই তো আপন কবিকৃতি নিয়ে ফোটোগ্রাফ-সংবলিত দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে যাননি। তাতে তাঁদের পরিচিতির অসুবিধে হয়েছে?

কিন্তু আমাদের কথা আলাদা, উদার অসীম কাল নয়, হয়তো বা গণ্ডূষ কালই মাত্র আমাদের সময়। সম্পাদক মশাই যদি সেই গণ্ডূষটুকু যুগিয়ে দেন, শব্দবীর কলমখানি থামাবে কে?

BanglaBook.org

॥ ১ ॥

আমি বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি সত্যিই আমার দু' চোখ দু' রকমের। ডান চোখটা সর্বদা মিটিমিটি হাসে, শোকের বাড়িতেও নির্লজ্জ, সে শুকনো থাকে—আর বাঁ চোখটা একদম হাসে না, তার গড়নটাই কেমন দুঃখী-দুঃখী। যেন ট্রাজিডির মুখোশ থেকে চুরি করেছি। আমি হেসে কুটিপাটি হলেও বাঁ চোখ আপনমনে দুঃখী হয়ে থাকে। এভাবেই বড় হয়েছি। মাসিমাকে বেলা একবার বলেছিল —"তোর জীবনে মাঝামাঝি কিছু নেই। সবই তুমুল, সবই তীব্র। তীব্র সুখ, তুমুল যন্ত্রণা।" কে জানে, হয়তো বা তাই। এটা ঠিকই, জীবনে আমার যা কিছু প্রাপ্তি, সবেতেই একটা চরম ব্যাপার থেকে যায়। কিন্তু শিল্পে? শিল্পেও কি তাই? তাহলে এই চোখটা দিয়ে লিখি বেশ গল্প। দুঃখী চোখটা তাকিয়ে থাকে কেবল ভিতর পানে, কবিতা লেখে। আর, দুটো চোখ সমান করে ভিতর বাইরে পাশাপাশি মেলে রেখে লিখি প্রবন্ধ, আলোচনা। কিন্তু গদ্য তো নিয়মিত লিখতে শুরু করেছি মাত্র এই সেদিন—কবিতাই আমার সাধন সাধ্যের। কবিতার দর্পণেই নিজের মুখ দেখেছি প্রথম।

আজন্ম একপা ধরে যে মানুষ, সে একাকিত্বে ভয় পায় না। কিন্তু জানি একদিন বয়স হবে, ব্যাধির প্রতাপ আরো বাড়বে, ক্ষমতা নিবে যাবে, ফাঁকা হয়ে যাবে বৈঠকখানা ঘর। বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতাকেও আমি ভয় করি না, আমার একটাই ভয়, কবিতা যেন আমাকে শেষদিনে পরিত্যাগ না করে। সে নিঃসঙ্গতা পক্ষাঘাতের মত; সে বড় ভয়ানক হবে। কবিতা আমার নাড়ীর সঙ্গে জড়ানো কবচ কুণ্ডল। কবিতা আমার অভিমান, আমার প্রার্থনা, আমার নিঃসঙ্গতা, আমার সঙ্গ,

---

এই প্রবন্ধটি লেখা, ১৩৮২র সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ' এর জন্য যে প্রিয়জন গুরুজনেরা তখন জীবিত, লেখক ছিলেন, যাঁদের কথা এখানে বলেছি, তাঁরা অনেকেই আর আমাদের মধ্যে নেই।

আমার পূর্ণতা, আমার অতৃপ্তি। কবিতাই সত্য অর্থে সেই "বিজন জীবন বিহারী"। জীবনের গহনে যে বিজন জীবন সেখানে যে ছায়াময় অনুভবের গোপন সঞ্চার, তার অনুরণনটুকুও স্বচ্ছন্দে ধরে ফেলতে যে পারে, সেই পরম ফাঁদের নাম কবিতা। শূন্য গগনবিহারী ভাবকে ভাষার মোহন মরণে বিদ্ধ করে ফেলতে জানে যে বিচিত্র ছলনা, তারই নাম কবিতা। সেই কবিতাকে কখনোই অবসনা করে ফেলে যায় না, অন্তরাল থেকে তাকে বসন যুগিয়ে যান স্বয়ং মহাকাল—কোনো দুঃশাসন কবি, সমালোচকের সাধ্য নেই যে সতীকারের কবিতাকে, তার জন্মসূত্র থেকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে শেষ কথাটি বলে দেয়। ভালো কবিতা যুগে যুগে উদ্ঘাটিত হয়ে চলে। ত্রিকালের পায়ে সে নূপুর হয়ে জড়িয়ে থাকে। যে কবিতা ফুরোয় না, আজ পর্যন্ত তেমন কবিতা কি লিখতে পেরেছি? জীবনের প্রত্যেকটি কবিতাই বোধ হয় সেই কবিতাকে খোঁজার চেষ্টা।

খুব ছেলেবেলায়, সারা দুপুর একা বাড়িতে ঘুরঘুর করতুম। মা'র খাটের পাশে পেতলের ঝকঝকে সরু শেকল থেকে ঝুলতো একটি ছবি, রঙিন। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর। ক্রুশের তলায় লেখা ছিল: INRI। আমি খাটে উঠে দাঁড়িয়ে একমনে চেয়ে চেয়ে দেখতুম, ফর্সা যীশুর হাতের পাতার কোটানো পেরেক থেকে রক্ত ঝরছে, পায়ের পাতা থেকে রক্তের ধারা, কাঁটার মুকুটের তলায় কপাল বেয়ে রক্ত, কিন্তু আকাশে-তাকানো চোখে কী শান্তি, ঠোঁটে মৃদু হাসি। ছবিটা আমাকে সারাদিন টানতো। কী আশ্চর্য ছবি। এত কৃশ লোক; সর্বাঙ্গে এত যন্ত্রণা, এত রক্ত, তবু এমন চাহনি! এমন হাসি! আর ওই যে পাশাপাশি চারটি ইংরিজি অক্ষর—ওরই বা মানে কী? রক্তের ধারায়, রহস্যময় হাসিতে, রহস্যময় অক্ষরে, সংযম দিয়ে ক্ষয় দিয়ে যন্ত্রণাকে জয় করবার ওই আশ্চর্য চেহারা, মানুষের চরম জয়ের কাহিনী—ওই যীশুর ছবি আমাকে আদু করেছিল, আমাকে ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলেছিল। এখনও ব্যথিতে যখন প্রচণ্ড কষ্ট পাই, তখন ওই ছবিটি আমার মনে পড়ে। আমাকে সহ্যশক্তি দেয়। কবিতার যদি কোনো ছবি আঁকা যেত, সে ছবিটি হতো ঠিক ছেলেবেলার ওই যীশুর ছবির মত। আজ কবিতার কথা লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ে গেল যাকে

যীশুর ওই ছবিটির নিচেই ঝুলতো ক্যালেণ্ডার। তাতে তারিখের পরে লেখা থাকতো চাঁদের নানা অবস্থার শাদা কালো ছবি—পূর্ণিমা, দুর্গা পুজোর ছোট্ট ছোট্ট প্রতীকী ছবি। তলায় ফুটনোটে জানানো থাকতো কবে কবে গৃহপ্রবেশ, উপনয়ন, গাত্রহরিদ্রা প্রভৃতি বিশেষ লেখা থাকতো কত তিথির নাম—অক্ষয় তৃতীয়া, ভূত চতুর্দশী আমার কিন্তু সব থেকে ভালো লাগতো তিনটি গোপন শব্দ। খুব মন দিয়ে আমি প্রায়ই ক্যালেণ্ডার পড়তুম। 'ফাতেহা-দোয়াজ দাহাম্' শব্দটা আমার দারুণ ভালো লাগত। 'ফাতেহ্' যেন কাঁসির 'কাঁই নানা' বলছে, আর 'দোয়াজ-দাহাম্' ঢ্যাম কুড়কুড় ভাডাংভাং বলে ঢাকের বাদ্যি জুড়ছে স্পষ্টই যেন ঢাক ঢোলের বাজনা শুনতে পেতুম ওখানে আমি। দু' নম্বর গোপন শব্দ ছিল 'ইদুজ্জোহা'। মনে মনে 'ইদুজ্জোহা' শব্দে চড়ে আমি খুব পাল্লার ট্রেনে দীর্ঘ নদীর ব্রিজ পার হয়ে যেতুম গভীর রাত্রিবেলায়। সুর করে 'ইদুঃজ্জোহা' 'ইদুঃজ্জোহা' 'ইদুঃজ্জোহা' বলতে বলতে ট্রেনটা নদী পেরিয়ে যেত। তেমনি 'ইদল্-ফিতর্' চরকা কাটত চাঁদে। চাঁদের মা বুড়ী যে চরকা ঘোরায় তার শব্দটা কেউ শুনেছেন? এই শুনুন—ইদল্—ফিতর্...ইদল্—ফিতর্...ইদল্—ফিতর্...কেমন? ঠিক বলেছি না?

এই তিনটে গোপন শব্দ আমার কাছে কবিতার মত, এরা আমাকে ছবি দেখাত, বাজনা শোনাত, অ-নেক দূরে নিয়ে যেত।

কিন্তু কই আরো তো শব্দ ছিল ক্যালেণ্ডারে। 'দোলপূর্ণিমা' কিংবা 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' এ সব কথায় তো সেই বাজনা শোনা যেত না? অথচ ছন্দ নেই তা নয় এতকাল ব্যাপারটা রহস্য ছিল। সেদিন আমার বিদেশী কন্যা রহস্য ভেদ করে দিয়েছে—"কেন ও রকম হয়? শব্দগুলোর মানে বোঝ না বলেই। যদি ফার্সি জানতে, তাহলে আর শব্দগুলো এমন কবিতাময় থাকতো

না, একাদশী-পূর্ণিমার মতই হয়ে যেত।"

সত্যিই তো? শব্দগুলোর মানে জানি না বলেই ওরা বিশুদ্ধ সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে, শুধু ধ্বনিতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় ওদের পূর্ণ পরিচয়। বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞায় বন্দী নয় বলেই ওরা আমার কাছে বিশুদ্ধ ছন্দ-ঝঙ্কার, বিমূর্ত ব্যঞ্জনা। একদম ঠিক কথা। একটু পর্দা, একটা আব্রু, কিছুটা রহস্য থাকা চাই। এটা কবিতার অত্যাবশ্যক ধর্ম. "দেখ না-দেখায় মেশা" বোধের অতীত এক বিদ্যুৎলতার উপস্থিতি চাই কবিতায়। "দা লা মুজিক আভঁ ত্যু লে শোজ", সবার আগে সঙ্গীত। ভের্লেন সাধে বলেছেন?

এক-একটা শব্দ ছোটবেলায় প্রায়ই আমাকে জাদু করে ফেলত। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া হলে কি হবে, নবনীতা নামটা আমার একদম পছন্দ ছিল না। ওতে কোনো ছবিও নেই, বাজনাও বাজে না। স্কুলে যাবার পথে একটা সাইন বোর্ড দেখতুম হজরার মোড়ে—বীণাপাণি বিপণি। সারাদিনই নামটা কানের মধ্যে গুনগুন করে গানের মতো বাজতো। একদিন বুদ্ধি করে আমার সব খাতা বইয়ের মলাটে পুরোনো নাম কেটে দিয়ে, নতুন নাম লিখলুম কুমারী বীণাপাণি বিপণি দেব। খাতা বই দেখে মা তো হেসে কুটি কুটি। বাবা পর্যন্ত হেসেছিলেন ছদ্ম কাটিয়ে। সে দুঃখু সে লজ্জা আমি ভুলিনি। 'বিপণি' মানে না জানায় এই বিপর্যয়। এখনও ছোটবেলার কয়েকটি বইতে ঐ নাম লেখা আছে।

আর একদিন স্কুল থেকে ফিরছি, রাস্তায় এক বাড়িতে রেডিও বাজছিল, কানে এল "কুয়ালালামপুর...কুয়ালালামপুর...এলাম কত দূর...এলাম কত দূর..." অমনি লাইনটা মাথার মধ্যে সেই যে জড়িয়ে গেল আজও ছাড়তে পারিনি। ছন্দ-অনুপ্রাস-ফিল ছাড়া ওতে ছিল দুটি মহা মূল্যবান বস্তু—দূরত্ব আর রহস্য। আমি তখন জানতুম না কুয়ালালামপুরের ভৌগোলিক অস্তিত্বের ঠিকানা। ওই অপরিচয়টুকুর মধ্যেই ছিল রোমাঞ্চিত আহ্বান। পুরো কবিতাটি আমি আজও জানি না বহর-রমপুর বহর-রমপুর বললে এটা মিস্ত হবে না!

পুরো কবিতা সব সময়ে না জানলে যে ক্ষতি হয় তাও নয় অবশ্য। যেমন অমিয় একবার নজরে পড়িয়ে দিয়েছিল "কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে—" এই পঙ্‌ক্তিটির অসামান্য হাহাকার মাত্র ওই এক লাইনেই শেষ। এর গৌরব নষ্ট হয়ে গেছে কবিতাটির পরবর্তী অংশে। আমাদের মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ও গানটি মাত্র এক লাইন লিখলেই যথেষ্ট হত। অযুক্তস্ত হত।

॥ ২ ॥

এম এ পড়ার সময়ে অমিয়, প্রণবেন্দু আর আমি ছিলুম অভিন্নহৃদয়। তিনজনেই কবিতা ভালবাসতুম। যে যা নতুন পড়তুম, যে যা নতুন শিখতুম তক্ষুনি পরস্পরকে না দেখিয়ে না পড়িয়ে তৃপ্তি হিল না। ভোর ছ'টার সময়েও পট ভাঙা কবিতা পকেটে নিয়ে প্রণবেন্দু চলে এসেছে কতো দিন। সেই সময়ে অমিয়র গোটা "পূর্ব মেঘ" মুখস্থ ছিল। দক্ষিণের বারান্দায় মাদুর পেতে বসে এক আষাঢ়ের প্রথম দিনে আমরা ওর আবৃত্তি শুনেছিলুম।

সদ্য নতুন নতুন বিদেশী ভাষা শিখেছি তখন, অমিয় আর আমি ফরাসী, রুমি, মানব আর অমি জর্মন শিখতুম। নিত্য নতুন ছাড়পত্র জুটছে, নিত্য নতুন বিশ্ব উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। কত যে ফরাসী কবিতা অমিয় আর আমি একসঙ্গে বসে মুখস্থ করেছি সেই সময়ে—ভের্লেন, বদলেয়ার, র‍্যাঁবো, ভালেরি, মালার্মে, আপলিনেয়ার। —"ইল প্লার দঁ মঁ ক্যর কমিল প্ল্য স্যর লা ভিল্", "ঁ সুঁফিউন ওত্‌র্", "লা ভিয়েজ লা ভিভাস এ লা বেল্ ওজুদুয়ী", "স্যু লা পঁ মিরাবো কুল্যো সোইন", "জ' সুয়ি কম্ ল্য রুয়া দাঁ পাই প্লুভিয়ু..." "লা শেবে ত্রিস্ত! এলা/এজে", "দ্যা ত্যু লে লিভ্‌র..." "দেহ দুঃখময় হায়, সব শাস্ত্র করেছি নিঃশেষ!" এই সব।

অমিয় একদিন একটা মজার কবিতা আবিষ্কার করল। নাম, "জানলা"—"ফনেত্‌র ফনেত্‌র ফনেত্‌র ফনেত্‌র/ফনেত্‌র ফনেত্‌র ফনেত্‌র ফনেত্‌র/" এরকমই চার লাইন। আমরা তো হেসেই কুটিকুটি। আজ কিন্তু কবিতাটিকে মোটেই হাস্যকর লাগে না। রীতিমতো ভালোই লাগে এই তৃপ্তিহীন বাতায়ন তৃষ্ণা।

যেমন বাবা মা। তেমনি সব বন্ধু, আর তেমনিই সব গুরু পেয়েছি বটে! আমার সৌভাগ্যের তালিকায় একটি প্রধান ঘটনা হলো কয়েকজন সত্যিকারের কবিকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়া। তেরো চোদ্দ বছর বয়সে শুদ্ধসত্ত্ব বসু আমাকে যত্ন করে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শেখান। তাঁরই উৎসাহে 'একক' পত্রিকায় আমার কবিতা বেরুত। তিনিই আমাকে শ্লোক রচনা করতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে জন্মদিনে ও বিয়ের তারিখে শ্লোকের পর শ্লোক লিখে আমি বাবা মা মামা পুরোহিতকে ধন্য করে দিয়েছিলুম কয়েক বছর। এই শিক্ষা পরে নানাভাবে কাজে লেগেছে বাংলা কবিতা লেখায়।

বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, নরেশ গুহ, অলোকরঞ্জনের কাছে ইওরোপীয়, ইংরিজি ও বাংলা সাহিত্যের ক্লাস করেছি। একবার অমিয় চক্রবর্তীর কাছেও পড়েছিলুম আমেরিকায়।

কবিদের সঙ্গে চাকরি করি। নরেশদা, জগন্নাথবাবু, প্রণবেন্দু, মানবেন্দ্র। জন্ম থেকেই আমার নিয়তি আমাকে কবিদের আয়ত্তের মধ্যে রেখে দিয়েছে। ঘরে মা তো একাই দু'জন কবি, রাধারানী, অপরাজিতা, আমি কবিতা লিখব এতে আর আমার কৃতিত্ব কিসের? কৃতিত্ব পরিবেশের।

আমার বন্ধুরা আমার কবিতা জীবনে খুবই জরুরি। বন্ধুদেরই উৎসাহে প্রথমত আমার কবিতা যেটুকু বাড়বার বেড়েছে। আমার প্রথম কবিতার বই (প্রথম প্রত্যয়, ১৯৫৯) বেরিয়েছিল অমিয়, প্রণবেন্দু আর আমার যৌথ আগ্রহে। সুনীলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একে এবং কয়েকজন', অলোকের 'আলোকিত সময়য়', মানবের 'একান্তর', প্রণবেন্দুর 'এক বসন্ত', অলোকরঞ্জনের 'যৌবন বাউল' (এবং যতদূর মনে পড়ে 'ভিনদেশী ফুল') আর আমার 'প্রথম প্রত্যয়' পরপর বেরিয়ে পড়েছিল ১৯৫৭—১৯৫৯-এর মধ্যে। আনন্দর 'স্বগত সন্ধ্যা' কোথায় তার কয়েক বছর আগে বেরোয়। তারাপদর 'তোমার প্রতিমা' দু' এক বছর পরে। ঠিক এক যুগ বাদে, বারো বছর পরে আমার দ্বিতীয় বই 'স্বাগত দেবদূত' বেরুল ১৯৭১-এ। সেও প্রণবেন্দু, অমিয়, মা এবং সুবীরের ঐকান্তিক ভালোবাসায়।

কবিতা প্রসঙ্গে আরও দুটি মানুষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা চিরদিনের। ইরা পড়ত আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে, আর রুমি ছিল পাড়ার বন্ধু। ইরা, বিষ্ণু দে-র বড় মেয়ে, রুমি বুদ্ধদেব বসুর ছোট মেয়ে। ইরাই আমাকে প্রথম শুনিয়েছিল নাইনথ সিমফনি আর পাসটোরাল (সিক্সথ) এবং কয়েকটি রেকর্ডে সম্পূর্ণ হ্যামলেটের আবৃত্তি। অসামান্য রেকর্ড সংগ্রহ বিষ্ণু দে-র। কিন্তু তাঁকে আমি খুব ভয় পেতুম, শুনেছিলুম তাঁদের সান্ধ্য আড্ডায় ভয়ানক সব ইনটেলেকচুয়াল আলোচনা হয়। ছোটদের প্রবেশের অনুমতি ছিল কিনা জানি না, আমি তো ভয়েই কখনো ঢুকতুম না ও ঘরে যখন আড্ডা চলতো। ইরাটা যেমন একগুঁয়ে গোঁয়ারগোবিন্দ তেমনি বন্ধুবৎসল। মাথায় কী ফুরল, একদিন জোর করে আমার দুটো কবিতা ওর বেগুনী কালিতে নিজেই টুকে নিয়ে গেল বাবাকে দেখাবে বলে। একেবারে ইচ্ছে ছিল না আমার। তীক্ষ্ণ বাঙ্গ-বিদ্রূপের জন্য বেশ প্রসিদ্ধি ছিল বিষ্ণু দে-র। আর আমার ধারণা, আমার ওল্ড ফ্যাশানের লেখা দেখে উনি নিশ্চয় খুব পরিহাস করবেন। কিন্তু কিছুই হলো না। বিজয় গর্বে নাচতে নাচতে ইরা এসে বলল— "দেখলি তো আমার বাবা কত ভাল লোক? তোরা শুধু শুধু ভয় করিস। একটা 'সাহিত্যপত্রে', অন্যটা 'উত্তরসূরী'তে দিয়েছেন, কিছু কারেক্ট করতে হয়নি, আরো লেখা দিতে বলেছেন।" এ কি সত্য? না মায়া? না বিষ্ণু দে-র মতিভ্রম? যাই হোক, ইরার গোঁয়ার্তুমির জন্যেই আমার কবিতা বিষ্ণু-দের চোখে পড়ল। আমি তো ধন্য। নিজের থেকে কখনো এতটা

BanglaBook.org

এলেম হত না আমার।

আর রুমির গল্পটা? এক রাত্রে আমার মা-বাবা কলকাতার বাইরে গেলেন সভা করতে। অমনি প্রতিভা মাসীমাকে ধরে বসলুম, আজকে রাত্তিরবেলা রুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে। মাসীমা স্বভাব-স্নেহময়ী, যা খুশি আবদার করা যেত ওঁর কাছে। মত দিয়ে দিলেন। আমরা তো হাতে চাঁদ পেলুম। সঙ্গে লাফাতে লাফাতে 'কাউ' এল পক্ষ। আমাদের পুরুষ প্রহরী। প্রহরীর বয়েস তখন বছর দশ-বারো হবে, এসেই তো তিনি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমরা কিন্তু ঘুমোতে গেলুম না। বৃষ্টি পড়ল রাত্তিভোর, আমরাও শূন্য বাড়িতে রাজত্ব করলুম সারারাত। প্রথমে তিনতলার শিকবিহীন জানলা দিয়ে আকাশে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছুঁলুম। অঞ্জলি ভরে অন্ধকার ছুঁলুম, ঘরের মেঝে ভেসে গেল জলে, খাট বিছানা ভিজে গেল বৃষ্টির ছাঁটে। অনেক নিচে পিচের রাস্তার চকচকে ভিজে শরীরে রাস্তার আলোর জ্যামিতিক খেলা, বিশ্ব-প্রতিবিম্বের ম্যাজিক চোখ ভরে দেখলুম, কৈশোরের নানা স্বপ্ন-ইচ্ছের স্বীকারোক্তি হলো সন্তর্পণে, প্রায় স্বগতোক্তির মতো। রক্তের উষ্ণতার মতো স্বাভাবিক সেই বন্ধুত্বের উষ্ণতা, শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার চূড়ান্ত, আমরা হাদে গিয়ে ভোররাত্রের বৃষ্টিতে প্রাণভরে ভিজলুম। কখন এক সময়ে ওরই ফাঁকে রুমিকে দেখানো হয়ে গেছে আমার প্রাণভোমরার কৌটো, আমার কবিতার খাতা! রুমি তো যত অবাক তত খুশি। আমার কবিতা, হয়ত সেই রাত্রের নিজের গুণেই, ওর খুব ভালো লেগে গেলো। যাবার সময়ে রুমি খাতাটা চেয়ে নিল সকালবেলায়, আরো পড়বে বলে।

পরদিন বিকেলে "কবিতা-ভবনে" গিয়ে দেখি সর্বনাশ বুদ্ধদেবের টেবিলে, তাঁর ওই রূপোর গেলাসের পাশেই শোভা পাচ্ছেন আমার শ্রীমান কবিতার খাতা! যাওয়ামাত্র বু ব হইহই করে উঠলেন—"আরে, বাঃ। তুমি এমন কবিতা লিখতে পারো, বলোনি তো? এক্ষুনি বসে এই দুটো কবিতা কপি করে দাও। আজই প্রেসে যাচ্ছে।" দেখি কলা ডায়েরি থেকে দুটি পেজমার্ক উঁকি মারছে। আমার মনে হলো, স্বপ্ন দেখছি।

সেই প্রথম "কবিতা"য় লেখা বেরুলো। তারপরে পাশাপাশি। তবও সেই প্রথম। রুমির, একমাত্র রুমিরই ভালোবাসার কৃতিত্বে। আমি কতদিন পাঠাতে সাহস পেতুম কে জানে? "কবিতা" তখন কবিতার সফলতার শেষ ধাপে। এখন যেমন "দেশ"। সেই ঘটনাকে ঘিরে আরেকটি স্মরণীয় কথা বলতে হবে। ওই আনন্দের ঝলশ্রুতিতে, ছোট্টো পাপ্পা আমাকে একটা সবুজ রেক্সিন বাঁধাই ডায়েরি উপহার দিল "নবনীতাদিকে, কবিতা লিখবার জন্য।" সেই আমি জীবনে প্রথম কবিতা লেখবার জন্য খাতা উপহার পেলুম। সেই আনন্দ, বিস্ময় এখনও টাটকা আছে।

"দেশে" অবশ্য কবিতা বেরিয়েছিল এর আগেই। সেই প্রথম কবিতাটি বেছে দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। একদিন প্রেমেনকাকা এসেছেন, বাবা বললেন—"ওরে বুকু, তোর লেখাগুলো আজকাল সত্যি সত্যি কবিতা হচ্ছে, না খোড়াভিম হচ্ছে, আমি তো কিছু বুঝি না। একবার প্রেমেনকে দেখা দিকি?" প্রেমেনকাকা খাতাটা নিয়ে গেলেন। খাতাটা যেদিন আনতে গেলুম, সেদিন 'কিনু গোয়ালার গলি'র লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ ছিলেন ওখানে। 'চলচ্চিত্ত' বলে একটা কবিতা প্রেমেনকাকার সব চেয়ে পছন্দ হলো। সন্তোষবাবুকেও দেখালেন। স্যাতো গেঞ্জী-লুঙ্গিপরা সুপুরুষ ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, ভালোই, দিয়ে দিক না 'দেশে'।" প্রেমেনকাকা যত্ন করেআরো অনেকগুলি কবিতা মনোনীত করে রেখেছিলেন ছাপার যোগ্য বলে, সেগুলি সবই 'পূর্বাশা' 'উত্তরা' 'একক' 'শতভিষা' ইত্যাদিতে একে একে বেরিয়ে গেছে। "দিয়ে দিক না 'দেশে' "—আমার মাথায় ঘুরতে লাগলো, দিলাম ডাকে পাঠিয়ে। "চলচ্চিত্ত" নাম মনে দেওয়া। আমি নাম দিয়েছিলাম "রাতের রেলগাড়ি"। তখন বয়েস ষোল। অন্য মিল ছিল না, রেলগাড়ির গতিটা ছন্দে, আর রাত্রির মুডটা চিত্রকল্পে ধরবার চেষ্টা ছিল কবিতাটায়। মায়ের নতুন নামকরণে কবিতাটি এক ঝলকেই একদম পালটে, অনেক গভীর অর্থবহ, মূল্যবান হয়ে

উঠেছিল। লিরিক কবিতায় নামকরণ খুব জরুরি।

আজ প্রেমেনকাকার চোখ গেছে, অথচ কত যত্ন করেই না পড়েছিলেন আমার সেইসব কাঁচা লেখা। আমার মধ্যে প্রথমিক আত্মপ্রত্যয় এনে দেন তিনিই, ওগুলো যে "ঘোড়াডিম" হচ্ছে না, তা কি আমিই জানতুম আগে?

একটা বড়ো ঘটনা ঘটলো। আমার "চলচ্চিত্ত" মনোনীত হয়েছে, নীল পোস্টকার্ড এলো 'দেশ' পত্রিকা থেকে। তখন কবিতা মনোনয়ন করতেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে 'নীল নির্জন'—'এই তো নেমেছে রাত্রি মনের নীল নির্জনপ্রান্তে'। মলাটে নাম, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সবাইকে সেই পোস্টকার্ড দেখিয়ে বেড়ালুম কলেজে। এবার থেকে আমিও তাহলে প্রায় শিশির দাস! কলেজে 'দেশ'-বন্দিত কবি! সে কী উল্লাস! শিশিরের সঙ্গেই পড়ত শক্তি। অথচ তাকে তখন আমরা চিনতুম না। সে মদও খেত না কবিতাও লিখত না। পড়াশুনো করত। শক্তি যখন লিখতে শুরু করে, আমি তখন দূর বিদেশে দ্বীপান্তরী। হঠাৎ একদিন দেখলুম, শক্তি তখন জাজ্বল্য—"অই কপালে কী পরেছো?"

॥ ৩ ॥

কবিতাকেই জীবন বলে বিশ্বাস করতেন এমন দুজন সাহিত্য সমর্পিত-প্রাণ মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখেছি দুজনে দুই যুগের, দুই ধরনের, দুই গড়নের মানুষ, কিন্তু এক জায়গায় তাঁরা এক। সাহিত্যের বাইরে তাঁরা অসহায়। এদের স্বগৃহে কোনো সাংসারিক অস্তিত্ব ছিল না—সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কেটে যেত লেখার টেবিলে, আর বৈঠকখানায়, সাহিত্যের আলোচনায় শুধু কবিতার জন্য এই যে বেঁচে থাকা, এর ফলে দু'জনের মধ্যেই ছিল অমিত তারুণ্য, বিষয়বিমুখতা, সারলা আর শান্তত বিশ্বাস। এঁদের যে এই নির্দায় চিরকৌমার্য—তার দায়িত্ব অবশ্যই এঁদের স্ত্রীদের পাওনা। সব দায়ভার নিজেরা নিয়ে স্বামীদের এঁরা ছুটি দিয়েছিলেন- -অথচ নিজেরাও ছিলেন সাহিত্যিকই। বাবা এবং বু ব-কে চেখে দেখার ছিল আমার পক্ষে ঢের শেখা। প্রতিভা বসু এবং আশাপূর্ণা পিসিমাকে দেখে শেখা উচিত ছিল—কীভাবে সংসার আর সাহিত্য একসঙ্গে চালানো যায়। মা অবশ্য সংসারের চাপে লেখা ছেড়েছিলেন

বাংলা কবিতার পঞ্চাশ বছরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো ষোলো সতেরো বছর বয়সের মধ্যেই দুটি আশ্চর্য গৃহের কল্যাণে। 'ভালোবাসা' আর 'কবিতা-ভবন' আমাকে যে-সুযোগ এনে দিয়েছিল, দুর্ভাগ্য আমি তার কিছুই কাজে লাগাতে পারিনি। মা-বাবার কাছে আসতেন প্রমথ চৌধুরী, প্রিয়ম্বদা দেবী, নজরুল, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, যতীন বাগচি থেকে অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, অজিত, বুদ্ধদেব, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষদা, অমিতাভ চৌধুরী, অরবিন্দ গুহ, আনন্দ বাগচী, শরৎ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন পর্যন্ত। গদ্য লেখকদের কথা এখানে বলছি না আর বাদবাকীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে "কবিতা-ভবনে"। - সুধীন্দ্রনাথ, অরুণ সরকার, নরেশ গুহ, তারাপদ, প্রণবেন্দু, দীপক, জ্যোতি। শঙ্কর (অঙ্কিত দত্তর মেজ ছেলে) কাছেই দীপক, প্রণবেন্দুকে প্রথম দেখি। তখন দীপক, অলোকরঞ্জন, আনন্দ বাগচী, অরবিন্দ গুহ তরুণতমদের মধ্যে প্রধান। শঙ্খবার, সুনীলের, আলোকের, কবিতাদির লেখাও খুব চোখে পড়ছে। এক একটা লাইনেই হুলুস্থুলু পড়ে যেত তখন—"উর্নিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উনতিরিশে এসে/...এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সুচতুর গোপন প্রেমিক" বা "বোবা দেয়ালটা, শাদা দেয়ালটা/হঠাৎ লাল্চে/রঙ্গনটিনী ভ্রমরার কাছে/আদর কাড়ছে।" "আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে", সুনীলচন্দ্র সরকারের "অন্য চলে এই জামতলায়/দূর থেকে দাদু বাড়ি তোর/এদিকে জানলা ওদিকে দোর" ইত্যাদি রক্তের ঘুম কেড়ে নিত এখন কবিতার বাজার মন্দা। ভাল কবিতা এখনও যথেষ্টই লেখা হয়। কিন্তু হুলুস্থুল পড়ে না। সেই উতল ভালবাসাটা মরে গেছে?

বাবা শিখিয়েছিলেন পদ্য রচনা। উত্তম মিল, অধম মিল, মধ্যম মিল। পয়ার, ত্রিপদী, মন্দাক্রান্তা। যমক, অনুপ্রাস। সিমিলি মেটাফর। "পাঠশালা" পত্রিকার উৎসাহী গ্রাহকদের বাবা হাতে করে পদ্য লেখা শেখাতেন। দেখতে দেখতে আমিও শিখে গিয়েছিলুম। ইদানীং অবশ্য অধম মিলটাকে আমার উত্তম মনে হয়! বাবা ছবিও আঁকতেন খুব সুন্দর। চাইনীজ ইংকে আর লাল কালিতে সরু নিবের সরু কলমে বাবা সুন্দর স্কেচ করতেন। আমাকে ছবিতে-ছড়াতে মিলিয়ে রঙিন চিঠি লিখতেন বাবা, দূরে কোথাও গেলেই। আমি যে ছবি আঁকি, সেও বাবারই জন্যে। অথচ বাবার ছবি আঁকার ধরণ কেউই জানে না। মা শিখিয়েছিলেন সনেট লিখতে। তখন মার প্রিয় কর্ম ছিল চতুর্দশ মাত্রার চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির, অন্ত্যমিল সমেত কবিতা। কখ খক-কখ খক ঠিক থাকবে, বাকীটা যেমন খুশি।—"কবিতা খুব আটোসাঁটো হবে, মিনিমামটুকু লিখবে, যেটাই থাকবে উহ্য," মা বলেছিলেন, "কবিতা বক্তৃতা নয়, ব্যঞ্জনা।"

আর মায়ের অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে লেখা কবিতা পড়ে আরেকটা জিনিস শিখেছি, লঘুস্বরে গভীর কথা বলা। এটা কেবল শিল্পেরই শিক্ষা নয়, জীবনের সম্বল। জীবনের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত মা আমার কবিতার আগ্রহীতম পাঠক। এখনও কিছু লিখলে মাকে আগে দেখাই। মনে পড়ে সাত বছর বয়সে যখন প্রথম আমার লেখা ছাপার হরফে বেরুলো গোখেল ইস্কুলের ম্যাগাজিন "সাধনা"য়, একসঙ্গে দুটো কবিতা, একটা গদ্য। বাংলা কবিতাটি ঝনার বচনের মতো, নাম চিনি ও নুন, ইংরিজি কবিতাটি ব্যাং বিষয়ক, নাম ফ্রগ, গদ্যটি কালবৈশাখীর বর্ণনা। মার সেই আনন্দ আমি ভুলিনি এখনও। ছন্দ মিল নির্ভুল হলে কি হবে, দুটি কবিতার একটিতেও কিন্তু কবিত্বের লক্ষণ ছিল না। (ছিল বরং গদ্যটিতে!)

জীবনে প্রথম ছাপার অক্ষরে আবির্ভাব যদিও দ্বিভাষী লেখক হয়ে, এবং গদ্য পদ্য দুই মাধ্যমে, তবু কবিতাই আমার প্রথম। আর ইংরিজিতে কবিতা লেখার কথা ভাবতেই পারি না। যখন বছরের পর বছর পরের দেশে বিলেতে মার্কিনে পড়ে থেকেছি, তখন অবশ্য লিখেছি। কি করব, যে ভাষাটা হাটেবাজারে বাসে-ট্রেনে-সর্বদা কানে আসে সেটাই হয়ে যায় কলমের ভাষা। তাই কলকাতায় বসে ইংরিজিতে লেখা অচিন্তনীয় হলেও লণ্ডনে কি বার্কলেতে মোটেও তা নয়। সেখানে ওটাই প্রাথমিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার ভাষা। জীবন-যাপনের ভাষা যখন যা, প্রকাশেরই বা মাধ্যম সেটা হবে না কেন? তাই তো স্বাভাবিক।

কবির মেয়ে বলে একটা ছাপা পোহাতে হয়েছে সারা জীবন। খুব ছোটবেলায় ত্রিকোণ পার্কের "অগ্রগামী" ক্লাবের স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের "নদী" কবিতার ভাব, আর সত্যেন্দ্রনাথের "ঝরণা" কবিতার ছন্দ মিলিয়ে বানানো আমার "নদী" কবিতাটি পুরস্কৃত হলো। পুরস্কার দিতে গিয়ে কবি সুনির্মল বসু কানে কানে বললেন—"কি রে, বাবা লিখে দেননি তো?" ঠাট্টা, কিন্তু রটে গেল "নবনীতার সব কবিতা ওর বাবাই লিখে দেন।" "ভারতবর্ষে" যখন ব্র্যাকেটে (১২) বসে কবিতা বেরুল, স্কুলে পাড়ায় সব বন্ধুরা বলল "কে না জানে, ওর বাবা লিখে দিয়েছেন?" ('ইনগ্রিড, আমি পেয়েছি তোমার পত্র আজ।') চোদ্দ বছর বয়েসে ব্রেবর্নে আরেকবার পুরস্কৃত হলুম, ম্যাগাজিনের প্রথম পাতায় কবিতা ছাপা হলো। আরতি বলল: "অধ্যাপিকারা বলছেন কবিতাটায় তোর মায়ের হাতের ছন্দ ঝংকারটি বড্ড স্পষ্ট রে।" ('ইলিনরা, ভুলি নাই তোমাকে, তোমার ইতালিকে!') ভাগ্যিস কবিতাটা শেষ দিনে ক্লাসের মধ্যে বসে লেখা, টুনু, আলো, সুমিতার সামনে! টুনু আর আলোও কবিতা লিখতো। ঠা ঠা রোদের মধ্যেও মাঠে বসে আমরা পরস্পরের কবিতা পড়তুম। যত্রতত্র মাতালের মতো সুরে-বেসুরে তালে-বেতালে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতুম। অচেনা গাছকে ভালো লাগলে নিজেরা খুশি মতন একটা নামকরণ করতুম তার, গাছটা সেই থেকে আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যেত। সেসব দিনে আমাদের কাছে একমাত্র সর্বময় সত্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই যথেষ্ট ছিলেন। আমাদের সমস্ত কবিতাতৃষ্ণা

BanglaBook.org

মিটিয়ে তিনি উপচে পড়তেন আমাদের অস্তিত্ব ছাপিয়ে। রবীন্দ্রনাথকে উত্তরণ করে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি প্রেসিডেন্সি কলেজে যাবার আগে।

॥ ৪ ॥

প্রেসিডেন্সিতে গিয়ে দেখি ছেলেরা অনেক এগিয়ে। অর্জুন সমর সেনের কবিতা নিয়ে প্রবন্ধ লেখে, অরুণাভ সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের মডেলে প্যারডি লেখে। এক ক্লাস উঁচুতে শিশির দাশ জীবন মৃত্যু নিয়ে দার্শনিক কবিতা লেখেন 'দেশে'।

এক বিপুল বিস্ময়ের জগৎ খুলে যায় চোখের সামনে। ক্লাসে বসে পরিচিত হচ্ছি ইংরিজি সাহিত্যের রসভাণ্ডারের সঙ্গে। শেক্সপীয়ার, মার্লো, ব্লেক, জন, কীটস, কোলরিজ আর ক্লাসের বাইরে এলেই দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি কত কী যে বলে ছেলেরা! কত জানে তারা! যা বুঝছি, সমর সেন, সুকান্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এঁরাই হলেন রাজারাজড়া জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ এঁরা অবক্ষয়ের কবি আর রবীন্দ্রনাথ যত নষ্টের গোড়া যত শুনি তত মাথা ঘুরে যায়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তো কিছুই পড়িনি। না প্রগতি, না অবক্ষয়!

এই সময়ে একটি ছেলে আমাকে প্রায়ই কবিতা শোনাতো। "একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চূড়ে/ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী। একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণি জুড়ে/থামিলো কালের চিরচঞ্চল গতি..." "সুরঞ্জনা,, এইখানে যেয়ো না ফিরে তুমি! বোসো নাকে কথা এই যুবকের সাথে!" "মাঝে মাঝে মনে হয় দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে/তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি।" "রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও/আমার বৈশাখী রাত্রিদিন" "চাই না তুমি বিনা শান্তিও"

"অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি করে মনের মাটিতে" "ও' বৃষ্টি আমার তৎক্ষণিকের পার কি পরম সংসারিনী?" —এতদূর খুব মনের মতো। খুব ভালো। কিন্তু তারপরেই যেই জিজ্ঞেস করতো— "বলো তো এই লাইনটা কার?" অমনি আমার বিষ হয়ে যেতো। আমি কি ছাই জানি? আমি কি কিছু পড়েছি ওসব? কাণ্ড দেখে সে ছেলে তাজ্জব হয়ে গেল! সিগনেটের সঙ্গে তার চেনাশুনো ছিল। ফলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। শুরু হলো আমার কবিতার বই উপহার পাবার পালা। সিগনেটের সেই সব অপূর্ব মলাট, আশ্চর্য ছাপা বাঁধাই কাগজ, আঠার গন্ধটা পর্যন্ত নেশার মতো ভালো লাগতো। জীবনানন্দ। সুধীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তী।

সে ছেলেটি অনেকদিন হলো অন্যদের কবিতা শোনাতে চলে গেছে। কিন্তু আমাকে ভেঙেচুরে নতুন ক'রে গড়ে দিয়ে গেল সেই সব কৃশকায় অত্যাশ্চর্য বই। বুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে নতুন রক্তের বীজ, শিরায় বইতে শুরু করেছে রবীন্দ্রোত্তর যুগ। কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়/কেমন করে বলি' এতদিনে আবিষ্কার করলুম অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে, যে বাবার বিপুল কবিতা-গ্রন্থাগারে প্রত্যেকটি বই ছিল, এক সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া। শুরু হলো অচিন্ত্য বুদ্ধদেব অজিত প্রেমেন্দ্র জীবনানন্দ বিষ্ণু দে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে অক্ষরিক পরিচয়ের গোপন উদ্দাম পর্ব। কী অবিশ্বাস্য সেই সব দিন! প্রতিটি দিন নতুন বিস্ময়ে, নতুন আবিষ্কারের স্পর্শমণিতে ভরা।

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" তখন সদ্য বেরিয়েছে। সেই সময়ে রোজই "কবিতা ভবনে" যাই। শঙ্কর কাছে, রুমির কাছে। দীপক, প্রণবেন্দু, তারাপদ, মিমি জ্যোতির সঙ্গে দেখা হয়। সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, নিরুপম, অশোকদা, নরেশদা, অরুণ সরকারদের আলোচনা শুনি। কিছুকাল পরে ওখানেই পর্দার পেছন থেকে সসম্ভ্রমে প্রথম দেখি 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে। বু ব-র সন্ধ্যা বৈঠকের এক কোণে চুপচাপ বসে থাকি কান পেতে। ঝরণাতলায় কলস পূর্ণ হয়। রোজ নতুন উদ্দীপনায় তেজীয়ান হয়ে বাড়ি ফিরি। অমূল্য কত আলোচনা শুনি,

কবিদের নাম, শিল্পীদের নাম। পরে বু ব-র কাছে ধার করে সেই সব কবিদের কবিতা পড়ি। রিল্‌কে, বদলেয়ার, মালার্মে...খুলে যাচ্ছে ইওরোপীয় কবিতার সিংদরোজা।

এম এ তে তুলনামূলক সাহিত্য পড়তে ভর্তি হয়েছিলুম এই সব আলোচনা শোনারই ফলে! বু ব-র কাছেই শিখেছিলুম যে পদ্যমাত্রই নয় কবিতা, আর গদ্যে যথেষ্ট মাটি কবিতার ভেজাল থাকে। উনিই আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন কবিতা কাকে বলে, আর শিখিয়েছিলেন কবিতাকে ভালোবাসতে।

যেদিন কবিতাদি, শক্তি, আর সুনীলের সঙ্গে দেখা হলো, সেইদিনই আমি জীবনে প্রথম কফি হাউসে গিয়েছি। দরজার কাছে দৃপ্ত সুন্দরী একটি তেজী মেয়ে এসে দাঁড়ালো প্রণবেন্দু বলে দিল "ওই যে কবিতা সিংহ।" কে যেন বলল, "ওর কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে, বিমল রায়চৌধুরীর সঙ্গে।" কবিতাদিকে দেখে আমি মুগ্ধ, আরো মুগ্ধ, যে রায়চৌধুরীর বউ সিংহ হয়। হতে পারে!

দুটি ছেলে এসে টেবিলে বসলো। দীপক আলাপ করিয়ে দিল—শক্তি, সুনীল আমার তখন দুই হাতের মুঠো ভর্তি কফি হাউসের চিনি। হাতেরা আমার তো শান্ত থাকে না, বেজায় ছটফটে, সারাক্ষণ কিছু না কিছু করছেই। কী করে নমস্কার করি? চিনিটা আগে সুনীলেরই অঞ্জলিতে অর্পণ করে, হাত খালি করে নিয়ে সুনীল-শক্তিকে নমস্কার করলুম। সুনীল বেচারা কিন্তু তখন প্রতি-নমস্কার করতে পারছে না। তার তো হাত জোড়া তখন চিনিতে? সে নিয়ে কবিতাদি, সুনীল এখনো আমাকে খ্যাপায়। দীপক সেদিন অনেক গান করেছিল কফি হাউস কাটিয়ে। মনে হয় যেন এই সেদিন!

একই সঙ্গে অনেক বিচিত্র বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছিলুম তখন। জীবনের সবচেয়ে দামী আমার ওই দিনগুলো। বিষ্ণু দে-র বাড়িতে যেমন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বাদ পেলুম, "কবিতা ভবনে" তেমনি পরিচয় হলো পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে। যদিও ছেলেবেলায় বাবা-মার সঙ্গে ইওরোপের প্রসিদ্ধ সব যাদুঘরে ঘুরে বেড়িয়েছি, দেখেছি 'লাস্ট সাপার', 'মোনালিসা', দেখেছি 'জুপিটার', 'পিয়েতা' কি 'সূর্যমুখী', 'চেয়ার'—ইত্যাদি। কিন্তু সে-দেখা দেখাই শুধু, চেনা নয়। এতদিনে চেনা হলো—ভ্যান গখ্, গগ্যাঁ, পিকাসো, মাতিস, শাগাল, মিরোর সঙ্গে। ছোট্ট পাপ্পাটা তখনই ছবি দেখেই বলে দিত—'এটা তো শাগাল্' 'এটা মাতিস!' আমি অবাক হয়ে যেতুম—আধুনিক বাংলা কবিতা, আধুনিক ইওরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে এই যে পশ্চিমের সঙ্গীত ও আধুনিক শিল্পের পরিচয় হলো, এও আমার কবিতা-লেখার কবিতা-বোঝার মনের পক্ষে একটি অত্যন্ত জরুরী অভিজ্ঞতা।

তা বলে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িনি। তখন জীবনে সবাই এসে পৌঁছেছেন, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ নক্ষত্রেরা সব,—কিন্তু সেই সৌরমণ্ডলে, সেই ইন্দ্রসভার সভাপতি ছিলেন বুকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ।

এমনি করে একদিন বড়ো হয়ে গেলুম আমরা। প্রথম কবিতার বই, প্রথম এম এ ডিগ্রি, প্রথম মা-বাবাকে ছেড়ে বিদেশে পড়তে যাওয়া, প্রায় একসঙ্গেই ঘটল। তার পরেই বিবাহ।

তারপর? তেরো-চোদ্দ বছর ঘূর্ণি বাতাসে লাট খেয়ে বেড়িয়েছি, দেশে বিদেশে। পড়াশুনো। যাযাবর হাঁসেদের মতো বাসা বেঁধেছি। মা হয়েছি। পৌঁছে গেলুম নতুন এক বৃত্তে। কিন্তু এই নতুন জগতেও দু তিনজন ছিলেন পুরোনো, যাঁরা আমার কবিতার খোঁজ করতেন, লিখতে তাগাদা দিতেন। অগ্রজপ্রতিম অশোক মিত্র, তপন রায়চৌধুরী, অশোক রুদ্র। বাল্যসখী যশোধরা। এঁরা আমাকে কবিতার কথা ভুলতে দেননি। প্রণবেন্দুও চিঠি লিখে তাগাদা লাগাত 'কবিতা লিখছ?' কলকাতায় এলে, তার পদ, সুনীল 'কৃত্তিবাসে'র জন্য তাড়া দিত।

কিন্তু জীবনের উচ্ছ্বাসে কবিতা ভেসে গিয়েছিল! লিখতুম না তা নয়, কিন্তু খুব অল্প। সেজন্য দুঃখ ছিল কি? ছিল না। 'একটা জীবন ভাঙতে ভাঙতে অন্য জীবন গড়ছি না কি?' এতই

BanglaBook.org

নেমকহারাম আমি যে, জীবন আর কবিতার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে প্রত্যেকবারই বলব—'জীবন চাই'। যদিও বেশ জানি জীবন বিশ্বাসঘাতক, শেষ আশ্রয় কবিতাই। কবিতা ঠকায় না। জেয়ার উঁটার শাসন না মেনে জীবন যখন উদ্দাম জলস্তম্ভ হয়ে আমাকে তলিয়ে দিতে এসেছে, তখন তো ছুটে গেছি কবিতারই দালান-কোঠায়। আশ্রয় পেয়েছি। বেঁচে গেছি।

কিন্তু ভিতরে অনেক কিছু অদল বদল হয়ে গেছে। লুকোবো আর কী! কবিতা তো দর্পণ, কবিতা তো সবই ফাঁস করে দেয়। শিরায় শিরায় গ্রন্থি মোচনের সাংঘাতিক একটা পালা ঘটে গেছে। আঙ্গিকের কিছু অভ্যাস পালটে গেছে। যেমন, কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল খাতাতে। আর কবিতার খাতাগুলি ছিল আমার প্রাণাধিক। একটিও কবিতা যেন হারিয়ে না যায়।

এখন লিখি যে কোনো টুকরো কাগজে। বিলের পিছনে, মেয়েদের স্কুলের খাতার মলাটে, ছেঁড়া খামের গায়ে। লিখি, পড়ে থাকে, উড়ে যায়, হারিয়ে যায়, খুঁজে পাই না, ভুলে যাই। খাতা নেই। বাক্স নেই। দেরাজ নেই। কবিতার জন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গাই নেই। ভাবলে হাসি পায় কেমন করে বেনে বউদের গয়নার বাক্সের মতো সযত্নে সামলে রাখতুম সেই হলদে প্যাকেটটা, যার ভেতরে ছিল ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত লেখা সব কবিতার খাতা। বেশি না, চার পাঁচটা খাতা। বেশি কবিতা কোনোদিনই লিখি না। দু' চার দিনের জন্যেও কোথাও গেলে—এমনকি বাপের-বাড়ি শ্বশুর-বাড়ি যাতায়াতের সময়েও—সেই হলদে প্যাকেট আমার সঙ্গে সঙ্গে যেত। কৈশোর যৌবনের মহার্ঘতম মুহূর্তগুলি তার মধ্যে বন্দী আছে! হারালেই সব গেল!

আর এখন? সে প্যাকেট এখন কোথায় আছে, কোথাও আছে কিনা, তা সুদ্ধ জানি না।

'প্রাণাধিক' বলে কোনো শব্দই নশ্বরদের অভিধানে থাকা উচিত নয়।

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

আমার কোনো কাব্যাদর্শ নেই। প্রণবেন্দুর যেমন ছিল রিল্‌কে। প্রণবেন্দু বলত কবিতার দ্বারা মহৎ কিছু সাধিত হয়। কবিরাই মানুষকে, জগৎকে উদ্ধার করতে পারে। বলত, শিল্প জীবনের চেয়ে বড়ো। আমি তখন স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ইউনিয়ন করি। প্রণবেন্দুর কথাগুলোর মানে বুঝতে পারতুম না। কিন্তু মন দিয়ে শুনতুম। প্রণবেন্দুর কাব্যভাবনা ছিল, দীপকেরও ছিল, আমার ছিল না। 'কাব্য ভাবুকেরা কাব্য নিয়ে ভাবুক, আমি বরং ততক্ষণে আর দু'খানা কবিতা লিখে ফেলি!' এই হলো মূলত আমার একমাত্র কাব্যভাবনা। কিন্তু যখন কবিতা লিখতে পারি না, কিছুতেই লেখা হয় না, ছটফট করি। তখনই কাব্য নিয়ে ভাবনায় পড়ি। (সেটাকে কি 'কাব্যভাবনা' বলা যাবে?) বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'যখন এরকম হবে, তখন অন্যদের কবিতা অনুবাদ করতে হয় নিজের ভাষায়। তাহলেই কবিতা আবার আপনি ফিরে আসবে।' কিন্তু যখন খরা উপস্থিত হয়, তখন বুদ্ধদেবের ওই দামী উপদেশটাও মনে পড়ে না। কর্ণের রথের চাকা যখন বসে গিয়েছিল, তখন কি তাঁর সূর্যমন্ত্র মনে পড়েছিল?

অতএব, কাব্যভাবনা না থাক, আমার কাব্য-দুর্ভাবনা ঢের আছে। নানান জাতের। হাংরি জেনারেশনের সময়ে যেমন এক রকমের দুর্ভাবনা জেগেছিল। এই যে এত লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেরোয়, এতে আরেক রকমের দুর্ভাবনা হয়। যা একবার বলেছিলেন: 'সরকার থেকে এবার কবিতা নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করা উচিত—দেশে পোয়েট্রি এক্সপ্লোশন ঘটেছে।' সত্যি কথাই। অনেকের ধারণা হয়েছে আধুনিক কবিতা মানে যা খুশি তাই। মিল চাই না বলে ছন্দও চাই না, সূক্ষ্মতা চাই না, শক্তি চাই না, সাধনা চাই না। চাই কেবল অহং আর ভড়ং। এমনি করলে কবিতার মানহানি হবে না? মূল্য হ্রাস ঘটবে না? হয়েওছে। যখন কোনো কোনো

ছোটো পত্রিকার তরুণ সম্পাদক বলে ফেলেন—"তা, গদ্য যদি নাই দিতে পারেন তবে কবিতা-টবিতা যা হোক একটা কিছু দিয়ে দিন?" তখন আমার সত্যি সত্যি কান্না পায়। ওরা কি জানে না "কবিতা-টবিতা-যা হোক" বলতে নেই? ওরকম বললে মা সরস্বতী বিরূপ হন? ওরা কি জানে না একটি কবিতা লিখতে কতো কষ্ট?

ভাষা তো সংকেত, তাষা তো এক বুনো ঘোড়া। তাকে পোষ মানিয়ে, জ্বলন্ত অগ্নুনের রিংয়ের মধ্য দিয়ে বজনার তালে তালে লম্ফ দেওয়ানোর নাম কবিতা। এ কি সোজা কাজ?

কবিতা মানেই যুদ্ধ। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে যখন বিজয় এবং শান্তি, মাত্র তখনই প্রস্তুত হয় কবিতা। বুকের মধ্যে গুহাশ্রিত হয়ে থাকে সেই কবিতা, প্রায় সে প্রজ্ঞার স্বগোত্র সেখানে। কিন্তু প্রজ্ঞাকে জীবন গুটি পাকিয়ে অনেক সময়ে আমাদের আঁচলে ছুঁড়েও দেয়। কবিতাকে? নৈব নৈব চ। কবিতা তোমার শমী বৃক্ষ থেকে অন্য অস্ত্রের পরীক্ষা নেয়। কবিতাকে অর্জন করে নিতে হয়।

—"অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে।" সেই বিপন্ন বিস্ময়ের যদি প্রকাশ ঘটানো যায় কবিতায়, একমাত্র তাহলেই সেই ক্লান্তিকর ক্লান্তির কবল থেকে মুক্তি মিলতে পারে তরুণ সম্পাদক, তোমরা কি একথা জানতে পারোনি?

আরেক কবিতা-দুর্ভাবনা হলো কবি সম্মেলন। নিজের কবিতা নিজে নিজে পড়ে অন্যকে শোনানো আমার দ্বারা হয় না বন্ধুদের আমি কবিতা হাতে দিয়ে বলি পড়ে দিতে। কবি সম্মেলনে গেলে সেই অসমসাহসিক অপকর্মটি করতে হয়। তারাপদ দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ে না, ওর হাঁটুতে হাঁটুতে ঠুকে যায়। মাইকে মনে হয় ড্রাম বাজছে। আমার হৃৎপিণ্ড বাজে বুকের মধ্যে। জিব জড়িয়ে যায়। গলা শুকিয়ে যায়। ফলে, মাইকে যা চতুর্গুণিত হয়ে সম্প্রচারিত হয়, তা প্রধানত আমার হাঁপানির টান। আর তার ফাঁকে ফাঁকে দু'চার টুকরো ভীরু কবিতা হাঁসফাঁস করে ঢুকে পড়ে। কবি সম্মেলনের নামেই আমার পায়ের ভিতরে পা, ফুটপাথ বদল হয় মধ্য দিনে।

কবিদের মোটামুটি পাঁচটা জনসংযোগ মাধ্যম আছে, বড় কাগজ, ছোট কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন, সভামঞ্চ। সবচেয়ে নিরাপদ প্রথম দুটি। রেডিওটা মন্দের ভালো, গলাটুকু শোনা গেলেও, কবিকে তো দেখা দিতে হচ্ছে না। টি. ভি.-টা তার চেয়েও খারাপ, কানেও শুনতে পাচ্ছে, চোখেও দেখা যাচ্ছে, আব্রু টাব্রু আর থাকে না। তবে কবি নিজে তো আর দর্শকদের দেখতে পাচ্ছে না? তার লজ্জাটা বাঁচে। সবচেয়ে মন্দ ব্যবস্থা সভামঞ্চ। কবি সম্মেলন। সেখানে কোনো আড়ালই নেই। সবাই সবাইকে দেখে ফেলছে, যেন সম্মুখ সমর। কবিতায় একটু আড়াল ভালো। দস্তানা পরে হ্যাণ্ডশেক।

এর পরে একটা বিশেষ দুর্ভাবনার কথা বলি। মেয়ে হয়ে কবিতা লেখার একটা মুশকিল হলো 'মহিলা কবি' বনে যাওয়া। কবিতাদি এই শব্দটিতে প্রচুর প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু ধারণাটি পাঠকচিত্তে বদ্ধমূল। ওটা ওপ্‌ড়াবে কার সাধ্যি? সবাই জানেন যে কবিতাটি ভাল কি মন্দ তার সঙ্গে কবিটি মেয়ে না পুরুষ, রোগা না মোটা এ প্রসঙ্গের কোনো যুক্তিসঙ্গত যোগ নেই। কিন্তু কিছু কিছু বিভ্রান্ত পাঠক কবিতা ব্যাপারটাতে মন না দিয়ে মহিলা ব্যাপারটাতেই বেশি মনোনিবেশ করে ফেলেন। যার ফলে আমাকে অনেকবারই শুনতে হয়েছে: "নবনীতা, এ সপ্তাহের 'দেশে' তোমার কবিতাটি বড়ো ভালো লাগলো!" আমাকে তখন সবিনয়ে জানাতে হয়েছে—"এবারের 'দেশে' তো? ঐ কবিতাটি অবশ্য বিজয়া লিখেছে। ধন্যবাদ।" অথবা—"হ্যাঁ ওটা আমারো খুবই ভাল লাগল, ওটা আসলে কবিতাদির লেখা।" —অথবা দেবারতির। অথবা রাজলক্ষ্মী দেবীর। এসে যায় না কিছু। মেয়েদের লেখা তো? সব চীনেম্যানকে যেমন একরকম দেখতে, সব মেয়ে কবিদেরই তেমনি একরকম লেখা।

BanglaBook.org

অথচ কথাটা কী শ্লাঘাকর! আমি যখন লিখতে শুরু করেছিলুম তখন "আধুনিক কবিতা" লিখতেন মাত্র তিনজন মেয়ে—রাজলক্ষ্মী দেবী, হেনা হালদার ও কবিতা সিংহ। প্রত্যেকে আলাদা। আমি যখন লিখছি, তখন আরেকটি মেয়েও কিছুদিন লিখেছিল, শিপ্রা ঘোষ। শিপ্রাকে আর লিখতে দেখি না। হেনা হালদারও খুব অল্প লেখেন। ষাটের দশকে লিখতে শুরু করেছে বিভ্রম (আমার সঙ্গেই পড়ত, তখন কবিতা লিখত না, কবিতার মত চিঠি লিখত) আর অনুভা দেবরায়চৌ। দু'জনেই শক্তিসম্পন্ন শিল্পী। আর প্রত্যেকেরই কলম আলাদা ধাতের। রাজলক্ষ্মী হেনার মত না। হেনা কবিতার মত না। কবিতা নবনীতার মত না, নবনীতা বিভ্রমের মত না। ঠিক যেমন শঙ্খ সুনীলের মত না, সুনীল অলোকরঞ্জনের মতো না, অলোক শক্তির মতো না, শক্তি প্রণবেন্দুর মতো না, প্রণবেন্দু তারাপদর মতো না। এই ব্যাপারটা সত্যিই কবিতা-দুর্ভাবনার। হে প্রিয় বিভ্রান্ত পাঠক, আলাদা করে আমাদের চিনে নিন। আমাদের মুখগুলো ভালো করে দেখে রাখুন। কবিতার প্রত্যেকটি লাইনেই কবির পাসপোর্ট সাইজ ফোটোগ্রাফ আঁটা থাকে।

॥ ৭ ॥

নিজের কবিতার বিবর্তন? নিজের কবিতার চরিত্র? এসব কথার উত্তর আমি কি জানি? আমার জীবন যেমনভাবে পাড় ভাঙতে ভাঙতে চলেছে, কবিতাও তেমনি পাড় ভাঙতে গড়তে এগোচ্ছে। হঠাৎ হয়ত একটা লাইন মনে চলে আসে, কিংবা পরপর কয়েকটা লাইন। কখনো বা ছন্দটাই আগে থেকে মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। এর কি কোনো নিয়মকানুন আছে? "এতদিন 'ক' স্টাইলে লিখেছি এইবার বরং 'খ' স্টাইলে লেখা যাক"—এ জাতীয় সুবুদ্ধি আমার মগজে কদাচ আসে না। হরেক রকমের কবিতা লিখি আমি, কিন্তু যখন যেটা লেখার, ও কলমই ঠিক করে দেয়। আমার কবিতায় যা যা পরিবর্তন এসেছে তা বর্ষার পরে যেমন শরৎ আসে, শীতের পরে বসন্ত, ঠিক তেমনই স্বচ্ছন্দ।

আর প্রভাব? কখন কীভাবে কার প্রভাব পড়ে লেখায় কেউ কি তা নিজে বলতে পারে? সেই যে আমি 'বেড়াল' কবিতা লিখলুম প্রথম আমেরিকার হস্টেলে গিয়ে? নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ মধ্য রাতে, বেড়ালের থাবার মত নৈঃশব্দ্য, যেন ধ্যানে, যেন স্বপ্নের মধ্যে লেখা হয়ে গেল চমৎকার, ছোট্ট এক নৈঃশব্দ্যের কবিতা। দিলুম 'দেশে' পাঠিয়ে। দিন যায়। বেরুচ্ছে না। পরের কবিতা বেরিয়ে গেল। হঠাৎ একদিন জীবনানন্দ উঁটতে গিয়ে দেখি 'বিড়াল'। আমার কবিতার খানিকটা ব্যাপার, একটি লোফালুফির চিত্রকল্প—উনি দেখলুম আগেই লিখে গেছেন, একটু এদিক ওদিক করে। সাগরময় ঘোষ নেহাৎ দয়ালু বলে আমাকে পত্রযোগে পুলিসে দেননি। অমন জাজ্বল্যমান "প্রভাব" আমার আর কোনো কবিতায় এখনও পর্যন্ত পাকড়াও করতে পারিনি। তবে ইচ্ছে করে অনেক কবির অনেক পঙ্‌ক্তিই তো আমি পুরাণের মতো করে সচেতন ব্যবহার করি। উপনিষদ্-বাইবেল থেকে ওমর খৈয়াম, গালিব, বুদ্ধদেব-অরুণ সরকার থেকে অরাপদ-সুনীল-সুব্রত চক্রবর্তী পর্যন্ত। একে বলবো 'চয়ন'। প্রভাব খুঁজুক অন্য লোকে।

"কবি তুমি গদ্যের সভায় যেতে চাও? যাও, কিন্তু পা যেন টলে না।" (—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।)

গদ্য লিখছি বলে কবিতা কম লেখা হচ্ছে? কি জানি। গদ্য লিখতে আমার প্রচণ্ড পরিশ্রম হয় ঠিকই, কেননা লেখার ধরনটা কবিতার কাছেই শেখা। বারবার কাটি, বারবার টুকি, বারবার লিখি। কিছুতেই যেন আশ মেটে না। যতক্ষণ না অগত্যা ছাপাখানায় চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ কেবলই বদলে যেতে থাকে। ছাপতে গেলেই ব্যস্। তখন আমি নিস্পৃহ বৈরাগী। কি গদ্যে কি পদ্যে। তখন প্রুফটুকুনি পর্যন্ত দেখবারও ধৈর্য থাকে না।

BanglaBook.org

গদ্যে যা লিখি, পদ্যে তা লিখি না। এটা খুব জরুরি। কবিতায় মানুষ তো তাই লিখবে, যা গদ্যে কিছুতেই লেখা যায় না? যা গদ্যেও লেখা সম্ভব, তা গদ্যেই বেশি গুছিয়ে লেখা সম্ভব, এ আমার বিশ্বাস! কবিতায় ফুটবে কেবল সেই অধরা মাধুরী, যা গদ্যে ধরা দেয় না। যা অনিবার্যভাবে, বিশুদ্ধভাবেই কবিতার।

বিভিন্ন মাধ্যমে লিখলে নিজেকে পূর্ণতর ভাবে মেলে ধরা যায়। কবিতাকেই যে সর্বত্রগামী হতে হবে, আমি তা মনে করি না। কেবল বিচিত্র পথে গেলেই হলো। ফর্মুলায় বদ্ধ হয়ে যেন পড়ে না কবিতা। সে বড় দুঃখের। জীবনের বিভিন্ন স্বাদের প্রকাশের জন্য ভিন্ন জাতের শিল্পরূপ বেছে নেওয়াই স্বাভাবিক। গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতার ছবি গদ্যে ভালো ফোটে, ব্যক্তিগত অনুভূতির জন্য আমার কবিতা। বিচার-বুদ্ধিতে সর্বতোভাবে উপলব্ধ হলেও, যে সত্য তত্ত্বমাত্র, পরোক্ষ, বুদ্ধিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা, তা নিয়ে আমি উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখতে পারি। কবিতা পারি না। যা প্রত্যক্ষ রক্তের ভিতর থেকে উঠে আসছে, যা নিজের জীবনের মূল্যে কিনেছি, কেবল তাই নিয়ে কবিতা। এটা সবার ক্ষেত্রে সত্য না হতে পারে, আমার কাছে সত্য।

লিখে ইতিহাস হয়ে যাবো এমন আশা করি না। কিন্তু যদি এক মুহূর্তের জন্যেও আরও একজন মানুষের হৃদয়ে গ্রাহ্য হয় আমার লেখা, তাকে মগ্ন করে রাখে, তাতেই আমি ধন্য, কৃত-কৃতার্থ। এইটুকুই আমার লোভ।

আসলে তো জানি, কবি সেই ভালেরির পাম গাছের মতো। বৃক্ষের কর্তব্য ফলগুলিকে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা, স্বাদে, গন্ধে, রসে পূর্ণ করা। তারপর পাকা ফলটি যখন বৃন্ত থেকে খসে পড়বে মাটিতে, সেই থেকেই সে গাছের পর। ঝরা ফলের কথা গাছ ভাবে না। ভাবে পরের ফলটি তৈরি করার কথা। তেমনি কবির কাজ কেবল কবিতাটি প্রস্তুত করা। একবার প্রকাশিত হয়ে গেলে সেই কবিতার ওপরে কবির আর প্রভুত্ব কিসের? তখন সে পাঠকের সম্পত্তি। পাঠক-সমালোচক কবিকে বকুক ঝকুক, আর মাথায় তুলে নাচুক, তাতে কবির বিকার ঘটা উচিত নয়। পাকা ফলটি বনের মাটিতে পড়লে, সে ফল যে পায় তার। সেটি গো-ব্রাহ্মণের হিতে লাগলো, না শেয়ালে শূয়োরে মাড়িয়ে গেল, গাছের তাতে কী এসে যায়?

সমালোচক আশ্রম মৃগ, ন হন্তব্যম্। আজ যদি সে তোমার ফুলকপিটা মুড়িয়ে খেয়েও যায়— তবু, সংহত করো, সংহত করো, কবি/বাক্যের ধার তীক্ষ্ণ ভয়ংকর! ফুল তুমি আবার ঢের ফোটাতে পারবে। সেই যে নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথিবীর সঙ্গে চুক্তি আছে না?

কবিতা তো দর্পণ, দেখতে জানলে ভালো কবিতায় জীবনের ছবি সম্পূর্ণই খুঁজে পাওয়া যাবে। সৎ কবিতা হলো টাইম ক্যাপসুল। তার মধ্যে অতি সংক্ষিপ্তসারে কবির অন্তর বাহিরের সবটুকুই গুছিয়ে তোলা থাকে। সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রের মতো কবিতায় ধরা পড়ে যায় পারিপার্শ্বের সূক্ষ্মতম কম্পনও—ইতিহাস, দর্শন, সমাজ, ধর্ম, মানুষের জীবন সত্য। তার জন্যে কবিকে আলাদা করে চেষ্টা করতে হয় না। একটা একটা কবিতায় নয়, কবির সমগ্র কবিতা থেকে এই সামগ্রিক ছবি ঠিক উঠে আসবে।

শুনি, কবিতা নাকি পলায়ন। অথচ আমি তো দেখি কবিতাই স্থিতি। আমার জীবনের প্রথমতম প্রত্যয়। পায়ের তলা থেকে যতবারই মাটি কেড়ে নিয়েছে জীবন, ঠেলে দিয়েছে একটা হিম-হিম অন্ধকার গর্তে, কবিতা ততবার এসে হাত ধরেছে, টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে শক্ত জমির ওপরে। আলোয়, উষ্ণতায়। ঈশ্বরের মতো, কবিতারও বড়ো মমতা। শত হেলাফেলাতেও কবিতা কবিকে একবারে পরিত্যাগ করে যেতে পারে না। ফিরে ডাকার অপেক্ষায় থাকে।

আর মানুষ?

মানুষ চন্দ্র সূর্যের মতো। ঘিরে থাকে, কিন্তু দূরে থাকে। আলো দেয়, তাপ দেয়, কিন্তু আপন হয়ে যায় না। যতেই ডাকো। আছে। কিন্তু কাছে নেই।

BanglaBook.org

আপনার বলতে সঙ্গে আছেন, সঙ্গে থাকেন কেবলমাত্র ঈশ্বর। আর, হয়তো কবিতা?

মানসগঙ্গোত্রী

চুলের মধ্যে চুইংগাম হয়ে আটকে আছে চোদ্দ বছর
বয়েস/করতলে কৈশোর/ভুরু বেয়ে গলে
পড়ছে চাঁদের মোম/যোগফল : শূন্য/—
স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নের যোগফল :
শূন্য/যেমন বাতাসের সঙ্গে শিশিরের/—

চোখের ভেতরে চোখ জুড়ে চোখ জোড়া
ধূলায় বিছনো/শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ...

একে কি ভালো বলবো/
একে কি বাসনা বলবো/
মাথার ভেতরে এই অরণ্যপ্রান্ত/বুকের
ভেতরে এই ষাট মাইল নির্জন নির্যাস মঞ্জরিত
শালবীথি/চোয়ালের ভেতরে পর্বত/গলার
গভীরে বালিয়াড়ি/মাথার মধ্যে জলপ্রপাত/
বুকের ভেতরে বুকজোড়া মাঠ/চোখের ভেতরে
চোখজোড়া চাঁদ/নখাগ্রে নক্ষত্ররাজি/
করতলে কৈশোর/পাঁচ আঙুলে পঞ্চনদে
মুষ্টিবদ্ধ কৈশোরের কান্না গলে পড়ে...
মুক্তিহীন

BanglaBook.org

কলকাতা ১৩৮২

[এই কবিতাটির চেহারা প্রথমে ভাঙা লাইনে, এইভাবে কবিতার মতোই দেখতে ছিল। অরাপদ, তার 'কয়েকজন'-এর মলাটের মাপে ধরিয়ে দেবার জন্যে পরপর টানা গদ্যে ছেপে দিয়ে বললে,—"ওটা যেভাবে ছাপা হোক, কবিতা যে, তাতে সন্দেহ হবে না।"]

আমার কোনও তাড়া নেই

মাননীয় সম্পাদক মশায়ের 'দাবি অতি সামান্য।' কী সেই দাবি? "আপনার নিজের মুখে নিজের কথা।" কী কথা? এই —'জীবন', 'কর্মক্ষেত্র', 'দুঃখসুখ', 'সাফল্য-ব্যর্থতা' এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে খেলাচ্ছলে ১২০০-১৫০০ শব্দের পুঁটলি বেঁধে ফেলা। চিঠি যখন সাগরপারে এসে পৌঁছল তখন দিন শেষ। এখন শুরু করেছি তেরাত্তির জেগে ব্রতধারণের পালা। মনস্তাত্ত্বিক চেম্বারে যাইনি কখনও, কিন্তু শুনেছি নরম কোচে আরাম করে শুইয়ে ফেলে তীব্র আত্ম-অন্বেষণের কাজটি চালানো হয়। আর সম্পাদকমশাই বপ করে সামনে একটা বড় সাইজের আয়না ধরে দিয়েছেন। পিছনে আরেকটা। আয়নার মধ্যে আয়না, তার মধ্যে আয়না, তার মধ্যে আয়না। আমার চোখ সামনে। আমার চোখ দূরে।

মা। মা, কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? আমার সামনে তুমি রয়েছ, আমাকে কেমন দেখছ? একমাত্র তোমারই গভীর গভীরতর আগ্রহ আমার কুশল শুনতে। একমাত্র তোমারই আছে অসীম সময় আর সমস্ত আকৃতি, আমার বিষয়ে। আমার সামনে তুমি রয়েছ, যেমন তুমি রয়েছ আমার দক্ষিণ দিয়ে, প্রাণবায়ু হয়ে। সেই রক্তাক্ত নাড়ির দৈর্ঘ্য এখন অন্তহীন, মা। যতদূর চোখ যায়, নাড়ির পাক, লাল রক্ত। আমরা তো মেয়ে, আমাদের ভাগ্যিস নীলরক্ত হয় না। শুধু চটচটে গরম, টুকটুকে লাল রক্ত। যা ডেলা পাকিয়ে যায়, আর সেই ডেলা থেকে আমরা তৈরি করি আর একটা মানুষ। আমার দুটো ছোট মেয়ে বড় হতে হতে এখন পূর্ণ যুবতী, কিন্তু তোমার মেয়েটাকে তুমি বাড়তে দাওনি, অশেষ কৈশোরে বন্দি করে রেখে দিয়েছ। এই হয়েছে আমার মরণ। জিয়নকাঠিটি ছিল তোমার হাতে এইবার আমাকেই আমার মা হতে হবে।

আমি কেমন আছি। এই দ্যাখো মা, আমি একটা মাঝিহীন দ্বীপে দাঁড়িয়ে নোনা বাতাসে আমার খোলাচুল উড়ছে। চারিদিক থেকে ঘিরে ধরছে বালির ঢেউ, অনেক অনেক দূরে নীলকালো সমুদ্রের সংকেত, ওইখানে আমাদের যেতে হবে। ঝা ঝা করছে মাথার ওপরে ইস্পাতের আকাশ, মধ্য দিনের রোদ ঠিকরে পড়ছে সাদা বালিতে, সিসের মতো ভারী আর গরম পায়ের তলার সেই বালি, পা আমার চলবে তো? ওই দূরে না-দেখা সমুদ্রের গুরু-গুরুতে, নীলকালো বেলায় পালতোলা রাজহংসী নৌকোটি নিয়ে তুমি রয়েছ পদ্ম ফুলে বসে, তোমার হাতে কলম। আমাকে কেমন দেখছ মা? মন্দ না থাকার নামই কি ভাল থাকা? চির-কৈশোরের অভিশাপ আমার ওপরে, কেবল চুলই পাকে, বুদ্ধি পাকে না। গোলকধাঁধা পথ হাতড়ে হাতড়ে সন্ধে থেকে সকাল, সকাল থেকে সন্ধে। যারা গুলি-সুতো মুঠোয় নিয়ে জন্মেছে তারা কী সুন্দর পথ চিনতে পারে। তুমি আমাকে কেবল আলপনাই দিতে শেখালে, হিসেব কষতে শেখালে না মা। সেই জিয়নকাঠির মন্ত্রটা আমার কানে কানে বলে দাও, এই তো তোমার সমুদ্রের শাঁখটা আমি আমার কানে চেপে ধরেছি।

সফলতা, ব্যর্থতা। 'কর্মক্ষেত্র' এই কথাটা বড় বেশি ওজনদার। কতগুলো সহজ প্রশ্নে ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারি। যেমন: তোমার নাম কী?—সবনীতা। তোমার ঠিকানা কী? 'ভালো-বাসা' বাড়ি। তুমি কী করো?—কী জানি? সে কি? যে গান করে, সে গাইয়ে। ব্যবসা করে, ব্যবসায়ী। সংসার করলে, গিন্নি। কাপড় কাচলে ধোপা। তুমি কী করো? তুমি কে? তোমার কর্মক্ষেত্রটা কী?

আমি কি পুরুষ মানুষ যে একটা চারচৌকো 'কর্মক্ষেত্র' দিয়েই আমাকে মেপে ফেলতে পারবে? আমি কি একটা? আমি মাস্টার, আমি ড্রাইভার, আমি কবি, আমি ধোপা,, আমি রাঁধুনি, আমি তাঁতুনি, আমি মেয়ে, আমি মা, আমি গিন্নি, আমার পায়ের তলায় সর্ষে। এতগুলো গাঁদা 'কর্মক্ষেত্রে' সে কখনও ফুল ফলাবার আশা মনে রাখতে পারে? মুকুল ঝরানোর মজাটা

যে আমিও চিনে ফেলেছি। যে-কাজের অর্থ নেই সেটাই ব্যর্থ তো? আমি যে-কাজই করি না কেন, তার প্রত্যেকটাই অর্থপূর্ণ, খুব জরুরি। সে ঝিনুক কুড়োনোই হোক, আর লম্ফ দিয়ে গাছের পাতা ছোঁবার চেষ্টা করাই হোক। পণ্ডিতে বলবে মুর্খামি, কেজো লোকে বলবে অকাজ, তুমি বলবে পাগলামি, কিন্তু আমি বলব জরুরি। প্রত্যেকটাই অপরিহার্য। সব কিছুরই সময় আছে, সময়কালে তার অর্থও আছে। বিচ্ছেদ হয়েছে বলে কি মিলন ব্যর্থ? মাথুরও সত্য, বৃন্দাবনও অবার্থ।

আরগো জাহাজ। বদলায় না কোন জিনিস? পাথরে তৈরি অনড় হিমালয়, বাষ্পে তৈরি আকাশ দুই-ই তো নিত্য বদলাচ্ছে। মরুভূমির কোন বালুকণাটি একবারও মরীচিকা হয়ে কেঁপে ওঠেনি? আমাদের অস্তিত্বই সেই গ্রিক জাহাজ যার প্রতিটি খুঁটিনাটি অংশ বদল হতে হতে একদিন সে একেবারে নতুন জাহাজ হয়ে গিয়েছিল, এক ছিল তার গঠন আর নামটা। দশ বছরের মেয়ে, বিশ বছরের তরুণী, পঞ্চাশ বছরের নবীন। প্রত্যেকেই অনালোক কিন্তু মানুষটি অভিন্ন। শুধু নামেই নয়, রক্তের কোষের মধ্যে ডি.এন.এর অন্দরে যে গভীর গভীরতর পরিচয়টি খেলা করছে, সেই হল আসল টিপছাপ সে পঁচেও যা, পঞ্চাশেও তাই। এই তো মজা, একদিকে এত বদল, অন্যদিকে যেমন কে সেই। আমরা সবাই আছি, অথচ পাপ্পা? সুবীর? সুপ্রিয়দা? বলে ডাকলে কোনও সাড়া পাই না। জাহাজের ওই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কখন নিঃশব্দে পালটে গেছে। অথচ গোটা জাহাজ দিব্যি ভেসে চলেছে। এই ভেসে চলার কাহিনীটা লিখে রাখাই আমার আসল কাজ। আমি কী করি? এক অত্যাশ্চর্য জাহাজের কথা লিখি। পলে পলে যার দল হচ্ছে। আর রিপেট কালই এক থাকছে। যতই টুকরো হোক, যেটা গোটা থাকবেই; তাতে না আছে সফলতার প্রশ্ন, না ব্যর্থতার?

সময়, সময়। মহা ফাঁসাদে ফেলেছেন সম্পাদক মশাই এক ধাক্কায় নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ভাবনা মানেই যন্ত্রণা। চারি ধারে মানুষ, প্রিয়জনেরা সংসারে, না ভবিষ্যতে। অনেকখানি বর্তমান বিছিয়ে নিয়ে আমি তার শীতল অথৈয় আঁচল পেতে শুয়ে আছি। যতদূর চোখ যায়। সামনেই হোক আর পিছনেই হোক আমার কাছে সবটাই বর্তমান। চোখের পাতা বন্ধ করলেই আমার দু' চোখ ভরে যা এসে বসছে, তা বর্তমান ছাড়া কী? তা হলে অতীত কাকে বলে? চোখ বুজলে আমি যাকে আর দেখতে পাই না, তার নাম অতীত। স্বপ্ন আর স্মৃতির সুতোয় বোনা এক অখণ্ড বর্তমানে আমার বাস। তাতে আলো অন্ধকারে ডেউ খেলে।

এই সেদিনও আমরা ক'জনে মিলে পরস্পর কোমর জড়িয়ে ধরে মস্ত এক মালার মতো গোল, অচ্ছেদ্য, বাঁশির সুরে সুরে পা ফেলে, তালে তাল মিলিয়ে কী সুন্দর নাচছিলুম। হঠাৎ দেখি দাঁড়িয়ে পড়েছি মুখোমুখি, প্রত্যেকে একলা, প্রত্যেকের হাতে তীরধনুক হাতে তীরধনুক, মাদলে উঠছে যুদ্ধের বোল।

যতদিন স্বপ্ন দেখা, ততদিনই বাঁশি বাজে। ততকাল নাচের ছন্দে মালা হয়ে বাঁচা। অসাবধানে থাকলেই মধ্যবয়স এসে টুকরো করে ফেলে স্বপ্ন, হাতে ধরিয়ে দেয় তীরধনুক। তখন শুরু হয় লক্ষ্যভেদ, লক্ষ্যবেধ। আর তখন থেকেই বর্তমান কুঁকড়ে গুটিয়ে ছোট হয়ে আসে, ভবিষ্যৎ দুর্ভাবনার চেহারা ধরে, আর জীবনের দখল চলে যেতে থাকে অতীতের হাতে। মালা ছিন্ন হয়।

সময়, জ্ঞানাঞ্জনশলাকা তুমি ছাড়া আর কার হাতে আছে? তীব্র স্পর্শে চোখ ফোটানোর কায়দা তুমি ছাড়া আর জানে কে? ঠোঁটের কোণে, চোখের টানে তুমি ভয়ানক সত্যদর্শন করাও। তোমার সঙ্গে এই যে আমার অন্তহীন, মুক্তিহীন মুখোমুখি, এ কি প্রণয়ে, না দ্বৈরথে?

'জলকে নেমেছি।'

তোমার প্রাণ-ভোমরাটি কোথায়?

BanglaBook.org

: কেন ? প্রেম যেখানে। ভালোবাসায়।

: বলি ভালোবাসা আর ভালোবাসা। বলি বয়েস কত হল ?

: কত হবে ? পঁয়তিরিশ।

: আর তোমার মেয়ে দুটির ?

: ওই দশ-পাঁচ বছরের এদিক ওদিক।

: কী সুন্দর অংক। 'বনং ব্রজেৎ'টা ভুলতে চাও ?

"বনং ব্রজেৎ'-এর সঙ্গে আমার কী ? পঞ্চাশ কি আমাকে পাকড়াতে পারবে কোনও দিন ? পঞ্চাশ বছর ধরে তো এটাই শিখলুম যে পঞ্চাশ আমার পেরোবে না। আমার বাবারও পেরোয়নি। আমারও পেরোবে না। আমাদের গুষ্টিতে কারুর কোনওদিন পঞ্চাশ পেরোয় না। বুঝেছ ? এ হল পাঁড় মাতালের বংশ।

: তোমার বাবা তো মদ ছুঁতেন না ? তিনি তো তিরাশি বছর বয়েস—

আরে আরে ? তিরাশির সঙ্গে পঞ্চাশ পেরুনোর কী যোগ ? কী যোগ আছে মদের সঙ্গে মাতালের ? ওই যে মাতাল হাওয়া বইছে, সে কি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে ? আমরা হচ্ছি সেই জাতের মাতাল। বাবাকে মনে করে দ্যাখো ? বাবার ছিল তিরাশিতেও হাজার মাইল বর্তমান জুড়ে বসবাস। ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্বপ্ন, ঝলকে ঝলকে স্মৃতি, বলে কেন হবে, বালাই ষাট, তাঁর বিহার ছিল জীবনের পল্লবিত কুঞ্জবনে। সত্যি সত্যি পঞ্চাশ যেদিন পেরুবে সেদিন দেখবে, অতীত স্মৃতির একমণ ওজনের বস্তা এক কাঁধে, অন্য কাঁধে ভবিষ্যতের একমণ দুর্ভাবনার পোঁটলা নিয়ে, কুঁজো হয়ে, বর্তমানের একানে বাঁশের সাঁকোটা কোনওরকমে পার হচ্ছি পা টিপে পা টিপে। সেই যাত্রা বনের দিকে যাওয়া। এখন কী ? আমার দিকে ভাল করে চেয়েও দ্যাখোনি বুঝি কোনও দিন ? সত্যি আর মিথ্যের ঝিলিমিলি কাটা আলো আঁধারির জালনে গড়িয়ে পড়েছে পঞ্চাশ বছরের পূর্ণচন্দ্রের বিভা। ছায়াময়, মায়াময়, ঘোরে বর্তমানে, একটু একটু মাতাল, আমি শুয়ে আছি। হঠাৎ সম্পাদকমশাই তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এসে, তবে খেলা করি।

: খেলা করবে ? বলি বয়েস কত হল ?

ওই তো বললুম আবার বলব ? বয়েস হল রামধনুর সমান। বিদ্যুতের সমান। বয়েস ? বৃষ্টির ফোঁটার সমান।

: তবে তো বড় মুশকিল তোমার ? বৃষ্টির ফোঁটাটি বড় একা একা দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে মাটিতে এসে পৌঁছোয়। বিদ্যুৎলতা খুব একলা চমকায় রামধনুর কোনও সঙ্গী নেই।

একা কোথায় ? অত বড় আকাশটাকেই ভুলে গেলে ? ঠিকেলে আদুরে মেয়ে আমি দর্পহারীর কোলে বসে আছি। দৃষ্টি যতদিন, শ্রুতি যতদিন, ওই 'একা'র সাধ্যি কী আমাকে ধরতে পারে ? আমার মা-কে দেখেছি না ? আর, আমি তো বেলুড়ে। আমি এই পাথর থেকে ওই পাথরে, এ-ডাঙা থেকে সেই ডাঙায় লম্ফ দিতে দিতে সব কামড়ৈভরা বাঁড়ি ঠিক পার হয়ে যাব বয়েস আমাকে কী ভয় দেখাবে ? এই কুমির ! তোর জলকে নেমে ছি!

ব্যক্তিগত। বেশ তো কুমির-কুমির খেলা হচ্ছে, বলি তোমার সমাজচিন্তা-টিন্তা গেল কোথায় ? নারীবাদ, মৌলবাদ, সাম্যবাদ, শিল্পবাদ—কিছু না হোক অনুবাদ, কোনও বিষয়েই তো কিছু বললে না।

: তুমি তো জ্বালালে বাপু ? মানুষকে একটু একা থাকতে দেবে না ? যত ভাবনাচিন্তা সবাই কি সব সময়ে চেঁচিয়ে বলতে হবে ? সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্যও এই সবই তো আমাদের খাদ্যো মাটি বাতাস, এ বাদ দিয়ে কিছু লেখা হয় ? যদি বল 'কই, নবনীতা, তোমার শরীরে তো পঞ্চভূত কোন্‌টা কোথায় কিছু দেখতে পাচ্ছি না—' সে-বলা যেমন হবে, এ-বলাও তেমনি। মানুষের কলমে যা বেরোবে তা হয় সংঘাতের, নয় সংযোগের সংকেত। ভাষা তো সমাজেরই

BanglaBook.org

কলকাঠি। বিয়োগ অত সহজ নাকি? তার জন্যে সন্ন্যাস নিতে হয়। এই যে তুমিই তো সমাজ। তোমার সঙ্গেই তো কথা কইছি। আজকের ভাবনা কেবল একজনকে নিয়ে। সেই এক ব্যক্তির অন্তর্গত রক্তের ভিতরে যে দুর্ভিক্ষ, যে দারিদ্র্যরেখা, যে মন্দির-মসজিদ, যে বধূহত্যা, সেই সব নিয়ে কথা। কেন, তোমার বুঝি পছন্দ হচ্ছে না? 'ব্যক্তিগত' ছাপমারা চিঠি, পড়া হয়ে গেলেই ছিঁড়ে ফেলা নিয়ম।

ছায়ামানুষ। এই যে শুয়ে আছি, এই শয্যা ঘরে পেতেছি, না বাইরে? নদী পাহাড় রোদ বৃষ্টি ছাড়াও, ছুটন্ত গাড়ির আলোর তীর, ভাসন্ত নৌকোর দাঁড়ের টান, সবই তো ঢুকে আসছে আমার ঘরের মধ্যে; আমি শুয়ে আছি— একটা নরম গদির বিছানা, নাকি নরম ঘাসের গালচেয়? আমি কি নদীর পাড়ে, তারার আলোয়, নাকি ঘরেই জ্বেলেছি নীল ঘুমের বাতি? জীবনভোর হেঁয়ালির মধ্যে রয়ে গেলুম—ঘরে আছি? না বাইরে? আমি তোমাদের ঘরের লোক? না বাইরের লোক? আমি তোমার ঘুমে, না জাগরণে? তোমাদের প্রণয়ে আমি, না প্রতারণায়?

মাঝে মাঝেই যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যাই, কখনও পশ্চিমের অনাত্মীয় শূন্যে ভাসি, কখনও ভারতবর্ষের চেনা মেঘ ছুঁই, আমার মনে হয়, এই বেশ। আকাশটাই আমার প্রকৃত ঠাঁই। এই যে বাঁধনবিহীন আকাশী বাতাস, এটাই আমি।

প্রায়ই আমার নিজেকে ছায়ামানুষ বলে মনে হয়। বাস্তব আর অবাস্তবে প্রভেদ থাকে না, চেনা টাকাপয়সাগুলো যেন বোলামকুচি হয়ে যায়, ছায়ামানুষের আবার কাজ-অকাজ কী? সফল বিফল কী? ছায়ামানুষ তো কেবল পিছলে বেড়াবে, মাটিতে তার পায়ের ছাপটুকুও পড়বে না। সুখ যারে কয় সকলজনে—ছায়ামানুষ তার ছায়াটিকে ঠিক ছুঁতে পারে।

অঘরা মাধুরী। কেউ মোদে মাতাল কেউ ধর্মমাতাল। কেউ কেজো মাতাল। আমি কুঁড়ে মাতাল। আলস্যের নেশায় আমি বুঁদ হয়ে আছি। বারান্দা থেকে দেখতে পাই — নৌকোর পরে নৌকো ভেসে যাচ্ছে নদীর জলে জাপানি পাখার আলপনা কেটে, চলে যেতে যেতে মাকড়সার মতো সূক্ষ্ম জাল বুনে পিছন থেকে নদীটাকে জড়িয়ে ধরছে বুকে, অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের অছিলায়।

অমন করে তো জড়াতে শিখিনি আজও। আমার হাত বাড়াতে ইচ্ছে করে না, রেখে যতটুকু ধরে সেই আমার ঢের। আমার কোনও তাড়া নেই। খুড়োর কলের মতো কোনও রসালো গোল্লা আমি ঝুলিয়ে রাখিনি আমার নাকের ডগায়।

রুখের দিদিমা ছিয়ানব্বই পার হয়েছেন সম্প্রতি। তিনমাস আগে একটি ছানি কাটিয়েছেন। ডাক্তারের নোটিস এসেছে, দু'নম্বরের ছানিটা আর তিনমাস পরে কাটাতে হবে। দিদিমা অবাক হয়ে নাকের ডগায় চশমা নাচিয়ে বললেন—'আরে? এই তো সেদিনই একটা কাটলে। এত তাড়া কিসের? আমার তো হাতে যথেষ্ট সময়।'

সত্যিই তো, তাড়াটা কিসের? সময় যথেষ্ট। সেই যে একটা নিরবধিকালের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না আমাদের, বিপুলা পৃথ্বীর সঙ্গে? ভুলিনি আমি। সেম টাইম, সেম প্লেস।

জিয়নকাঠি। কানের মধ্যে শাঁখ ধরে আছি। সমুদ্রের শাঁখ আমাকে বললে: যতদিন মগজের মধুতে হৃৎকমলটি ভরে থাকবে, ততদিনই ভালবাসার গুনগুন্। যতদিন তোমার হাতে কলম, ততদিনই তুমি নবনীতা। ওই যে, জিয়নকাঠি তোমার হাতেই রয়েছে।

এখন থেকে তুমিই তোমার মা।

কলকাতা, ১৯৯৪

BanglaBook.org

কবিতা

ডোবে ভাসে
বলেই আসে
কেউ শেখেনি থাকা

গাছের তলে
গাছের ডালে
ঠোক্‌রানো আর দেখা

হাতের কাছে
ত্রিলোক আছে
বুকের ভেতর ফাঁকা

প্রেম

আপনাকে কেউ পর ভাবলো
পরকে হৃদীশ্বর ভাবলো
তাইতেই যার ঘর ভাঙলো
ঘর ছিলো না তার
(ছিলো) ছাউনির বাহার!

ঘর-ঘরণী পর-করুনী
জাত শত্রুর দোর-ধরণী
করবি তাকেই ঘর-ভরুনী
তবেই দেবো জয়
(উহুঁ) তা নইলে নয়!
ফুটবালিতে ফুল ফোটাবি
ভর দুপুরে চাঁদ ওঠাবি
চৈত্র চড়ায় বান ছোটাবি
সেই যে যোগক্ষেম
(আমি) তাকেই বলি প্রেম!

BanglaBook.org

জন্মদিনের কবিতা

এক চোখে আধবিন্দু অশ্রু ঝুঁকে আছে
অন্য চোখ খালি
সে-মেয়ে ঘুমিয়ে আছে? নাকি জাগরণে
মগ্ন আছে? স্বপনে? মননে?
সে-মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। বামবাহু রেখেছে কপালে
ডানহাত ঠোঁটে। যদি জেগে ওঠে
এই স্তব্ধ গৃহস্থালি, সে-মেয়ে জাগবে না। তার
একচোখে অশ্রু ঝুঁকে আছে
অন্য চোখ খালি। অহর্নিশি
তার কানে বাজে
বর্ষার ঝরণার মতো মত্ত করতালি
সে-মেয়ে ঘুমিয়ে থাকে, এক চোখে
অশ্রু নিয়ে, অন্য চোখ খালি।

বহুদিন আগে এক সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা
দেখেছিলো সেই মেয়ে, দু'জন খেলুড়ি
পাখির মতন উড়ে দাঁড় থেকে দাঁড়ে বসেছিলো
চারিদিকে মহাশূন্য, মাঝখানে ঝুলন, ঝুলন—
সে-মেয়ে ঘুমিয়ে জেগে মগ্ন দিবানিশি
ট্রাপিজের স্বপ্ন দ্যাখে,
একচোখে দুলে থাকে জল—অন্য চোখ খালি।।

BanglaBook.org

আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা

এবার আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা,
আমিই তোমার প্রেম, তোমার পৃথিবী।
ব্যূহ ভেঙে এই তো ফিরেছি, 'মৃতবৎসা, সসাগরা',
শূন্যকোল, অথচ দুধের ভারে অবনতস্তনী
এই দ্যাখো তলহীন লবণাম্বুরাশি দুই চোখে।

এসো তবে, চেয়ে দ্যাখো, কৌমার্য সন্ধ্যাসূর্য হয়ে
কপালে জ্বলছে দীপ্র
ছুঁয়ে দ্যাখো নবনীততনু—আজ তোমারি সম্পদ—
আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা,

তোমার বিরহদশা ঘুচলো এবারে
যেমনটি চেয়েছিলে, অবিকল তেমনি ফিরেছি।

তবে কেন রুদ্ধবাক্—স্তব্ধদৃষ্টি,—কেন বিহ্বলতা,
মুখ তোলো, চেয়ে দ্যাখো, সরিয়ো না চোখ
প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এই যে এসেছি
আমিই তোমার সেই চির-আকাঙ্ক্ষিতা
বাল্যসখী, পুরাতনী প্রিয়া,
তোমারই নিজস্ব, নবনীতা!

আরণ্যক

BanglaBook.org

মা, আমার বনবাস সমাপ্ত এখন
মা তুমি শ্মশ্রু গুম্ফ জট ছেনে ফেলে
চিনে নাও কৈশোরের মুখ
চিনে নাও দুধের বালক
মা তুমি বুকের বাস খুলে দাও, দ্যাখো
সপ্তধারা স্তন্যসুধা মুখে ছুটে আসে-কি-না-আসে।

দ্যাখো, মা, যে-পায়ে বাজতো সোনার নূপুর—
কেমন বিক্ষত, ছিন্ন, কাঁটায় কাঁটায়
কী রুক্ষ, কীণাঙ্কিত সেই বাহু, যেখানে তোমার
কবচ পরিয়েছিলে, মন্ত্র পড়ে, জন্মের সময়ে।

মা, দ্যাখো আমার বুক, যেখানে তোমারি হাতে পোঁতা
হৃদয়ের চারা ছিলো খোলামেলা সবুজ দূর্বায়,
সেখানে প্রচ্ছন্ন গাঢ় অরণ্যের আবিল আঁধার।
এখন মাংসাশী ডালে, দন্তুর পাতায়, সর্বভুক্
জটিল জিহ্বায়, কেমন বাড়ন্ত হয়ে, বাঘের মতন
সেই বৃক্ষ অন্যান্যের হৃদয় চিবোয়।

মা, আমার বনবাস সমাপ্ত এখন,
এবারে বনের বাস
আমার ভিতরে।

মাৎসর্য সঙ্গীত

কবি মশাই, কী যন্ত্রণা! সামনে যখন আপনি থাকেন
কী আর বলব, বলতে গেলেও যার পরে নাই লজ্জা করে
মার্‌কিনী সেই পাগ্‌লা কবির বুকের মধ্যে যেমন হতো
রবি-মশাই থাকলে ঘরে। ঠিক অবিকল তেমনি আমার
বুকের মধ্যে ঝাপুর-ঝুপুর কেলেঙ্কারি। ঠিক মনে হয়
কাঁধের ওপর হাড়-পাথরের মস্ত মুগুর, বিষম ভারি,
এবং গা-ময় কী দীর্ঘ লোম, কোমর থেকে
পশুর চামড়া ডুমুর পাতার বদ্‌লি ঝোলে,
দশ আঙুলের দশখানা নোখ ভর্তি কেবল
রক্ত, মাটি, নোংরা, ধুলো—আজানু পাঁক।
যতক্ষণ না পালিয়ে বাঁচি স্বস্তি উধাও বিষম জ্বালা।

আপনি হঠাৎ সামনে পড়লে ঠিক মনে হয় এই আজীবন
গুহায় ছিলুম। হামাগুড়ি, দুইহাতে হাড় চুষছি এবং
কষ্ বেয়ে লাল রক্ত, লালা—সেই ভাবেতেই পৌঁছে গেলুম
—কোথায়? না ঠিক তাজমহলের মাঝমহলে।
কিম্বা ধরুন দিলওয়াবার মন্দিরটার গর্ভগৃহে।
কবিমশাই, আপনি যেন মর্মরফুল, সহস্রদল, মার্বেলে ঠিক
আপনি ফোটা শ্বেতকমলের মতন নরম, কী সাবলীল,
পাথর কুঁদে মর্মরে ফুল ফুটিয়ে তোলা নৈসর্গিক
ক্লেশহীনতায়, সহজ তো নয়। সহজ তো নন
আপনি, মশাই! শক্ত অমন সহজ হওয়া।

আপনি যখন সামনে আসেন ঠিক মনে হয়
এই পৃথিবী পৃথিবী নয় বনজঙ্গল, অনাগ্রহ--
এই আমি আর এই আমি নই, বনমানুষী,
উদোম, লোমশ, উকুনভরা, হিংস্র, এবং
দাঁত মাজি না।
আপনি থাকেন রেশমী হাসির সূক্ষ্ম জালের অন্তরালে
দূর বিদেশী, গ্রহান্তরে যোজন যোজন দূর থেকে তাই
তাকিয়ে থাকা নির্নিমেষে, নয়ন ভরে, জংলী চারার
যেমন সন্ধ্যাতারার দিকে ধন্য হাসি।

এমনি আপনি সভ্যভব্য, হায় রে পাঠক! কী ভবিতব্য!
বাক্য বলবে সাধ্য কী তার, শূন্যকলস-বাদ্য-বিচার?
তুচ্ছ পাঠক আত্মহারা, উদ্যত সম্ভ্রমেই সারা! দীনাতিদীন!
মাপ করবেন, কবিমশাই! অভয় দেন তো বকুনি দেই?
—কাজ কী এমন সুসভ্যতায়? অমানুষিক ও-ভদ্রতায়?

BanglaBook.org

যার তেজে নিষ্প্রদীপ কালো স্বার্থবিহীন নেহাৎ ভালোও,
খাস নিরামিষ ভালোবাসও ? কবিমশাই,
এবার একটু অসভ্য হোন। এবার একটু অশ্লীল হোন।
একটু একটু মনুষ্য হোন ? আর কতদিন ঘিয়ের প্রদীপ
উদ্ভাসিত ননীর মতন পাথর পুষ্প ? পরাগবিহীন ?
অপাপবিদ্ধ পরমশুদ্ধ বীজাণুহীন ? আর কতকাল
শুভ্র রুমাল নাকমুখে ব্যান্ডেজের আড়াল ? জৈন মুনিন্ ?

তার চেয়ে হোন তাম্রবরণ, এবার বরং
বাঘের ছালটা আপনি পরুন, এই মুণ্ডরটি
আপনি ধরুন। কবিমশাই, এবার একটু,
গুহায়-টুহায় ঢুকলে হয় না ? একটু একটু
অসভ্যতায় খুব কি ক্ষতি ? সংস্কৃতির ?
একটু না হয় নষ্ট সময় শব্দবিহীন অসৌজন্য
অরণ্যানীর অন্ধকারেই কাটতো অপার,
কাটতো বন্য—কবিমশাই, তাকিয়ে দেখুন,
নেহাৎ তুচ্ছ তৃণের গুচ্ছ, অধীন পাঠক—
ইহার জন্য ?

BanglaBook.org

পাণিগ্রহণ

কাছে থাকো। ভয় করছে। মনে হচ্ছে
এ মুহূর্ত বুঝি সত্য নয়। ছুঁয়ে থাকো।
শ্মশানে যেমন থাকে দেহ ছুঁয়ে একান্ত
স্বজন। এই হাত, এই নাও, হাত।
এই হাত ছুঁয়ে থাকো, যতক্ষণ
কাছাকাছি আছো, অস্পৃষ্ট রেখো না।
ভয় করে। মনে হয় এ মুহূর্ত বুঝি সত্য নয়।
যেমন অসত্য ছিলো, দীর্ঘ গতকাল।
যেমন অসত্য হবে অনন্ত আগামী।

আসাম, ১৯৮০

তৈজসপত্তর ভাঙছে যা দিয়ে সাজানো ছিল
দুঃখীর সংসার।
তৈজসপত্তর ভাঙছে, মস্ত বড় দালানকোঠার
কড়িবরগা ভাঙবার মতন
প্রচণ্ড আওয়াজ করে' পড়োশীর দেওয়াল কাঁপিয়ে
ভেঙে যাচ্ছে
কাচের গেলাস

কাচের গেলাস ভাঙছে এতে আর আশ্চর্য কী আছে
আশ্চর্য কেবল এই রক্তের নিনাদ
এই মত্ত আলোড়ন
ভূকম্পনের মতো নড়ে-ওঠা পায়ের জমিন্
এই রুদ্ধশ্বাস...

দুঃখীর সংসার ভাঙছে এতে আর দুঃখের কী আছে
দুঃখীর সংসারে দুঃখ নামহীন—
হৃদ্দ মিশে যায়,
বাতাসে বাতাস আর জলস্রোতে জল

এতদ্‌সত্ত্বেও, কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!
দোর্দণ্ড আওয়াজ করে' ভেঙে যায় দুঃখীর সংসার।
বাতাসে বাতাসে কাটছে
জলে ভাসে জল...

গোপন গর্জন শুনছো? মাটির গভীরে শব্দ ওঠে—
দুঃখ বাস্তুসাপ
এইবারে ধ্বংসবিষ ঢেলে দেবে বত্রিশনাড়ীতে
মাতাল মায়ের গর্ভে
উঠে আসছে
পাতাল-আগুন—
তৃণে তৃণে কৃতান্তমুষল...

BanglaBook.org

দুই গৃহস্থ, পাগলা সেপাই
(Tenso)

ক "এরা সবাই, এই মাঠটা, ওই গাছটা-আগের মতন
ভাবছে বুঝি আজও তুমি
তেমনি আমার চোখের দিকে, আজও আমি
তেমনি তোমার পায়ের শব্দে, আগের মতন—"

খ— "ওরা ভাবছে মস্ত বাড়ির কোল ঘেঁষে ওই ছোট্ট বাড়ির
সিঁড়ির মাথায় তেমনি আজও একটা আলো
জ্বলতে থাকে জ্বলতে থাকে সারাটা রাত,
সারা জীবন, আজও তেমন। আকাশপ্রদীপ,
সন্ধ্যাতারার ভয়ঙ্কর এক প্রতিদ্বন্দ্বী সেই লণ্ঠন,
জ্বলছে বুঝি আজও তেমন, সারাটা রাত, সারাজীবন।"

ক— "দেখছো, ওরা কেমন করে আগের মতন
নরম হয়ে পায়ের তলায় আদর মাখছে?
মাথার ওপর ছত্র ধরে এই বোশেখের
আগুন ঢাকছে? এই মাঠটা, এই গাছটা?
আগের মতন? ওরা ভাবছে—"

খ— "ওরাই জানে। এই ঘাসেরা, ওই পাতারা—
অবাধ্য এক পাগলা সেপাই বুকের মধ্যে
তেমনি খাড়া। ডিউটি খতম্ পয়সা হুজ্জৎ
পাগলা তবু নেয় না ছুটি, যায় না বাড়ি,
দেয় পাহারা। ঝমঝমাঝম বাজিয়ে লাঠি
গৃহস্থদের নিচ্ছে সাড়া। ক্লান্তিহারা।"

ক— "পাগড়ী মাথায়, দুই পায়ে বুট, ঠুকছে লাঠি, ঠুকছে লাঠি,
পরের সেপাই কখন্ হাজির পাগলা তবু নেয় না ছুটি
যায় না বাড়ি কেবল হাঁটে প্রহর হাঁকে। এ এক জ্বালা।"

খ— "বুকের মধ্যে দুই সেপাইয়ের অনাদান্ত সে-পায়চারি
গেরস্তকে জাগিয়ে রাখার মরণ বাঁচন সেই প্রণালী
ওরাই শুধু শুনতে জানে, ওই ঘাসেরা, ওই পাতারা।"

ক— "তুমিই বলো, ভুল শুনেছে? সিঁড়ির মাথায় সেই
লণ্ঠন জ্বলছে না কি? সারাটা রাত, সারাজীবন,
আজও তেমন, তারার মতন? তুমিই বলো, জ্বলছে না কি?"

খ— "আমি তো ঠিক আগের মতন ঘরভরা লোক তবু আমার
নিজস্ব সেই একলা চোখে তোমার দিকে আজও তেমন
মরণবাঁচন তাকিয়ে থাকি। সেই তাকানো তোমার বুকে
যায় কি না-যায়, এই ঘাসেরা এই পাতারা ঠিক
দেখে নেয়। তুমিই বলো, ভুল দেখে কি?"

ক— "তোমার পায়ের শব্দ আজো তেমনি করেই
বুকের মধ্যে শুক্লপিয়ালের চাঁদনী রাতের আদুড় মাঠের

BanglaBook.org

রাতপাখিদের কান্না বাজায়—রাত্রি ভরে।
শুনতে তুমি পাও বা না পাও এই পাতারা
এই ঘাসেরা ঠিক শুনে নেয়। তুমিই বলো, ভুল শোনে কি?"

খ— "বুকের মধ্যে পাগলা সেপাই
পায়ের তলায় এই ঘাসেরা—"

ক— "মাথার ওপর সেই পাতারা
তার ওপর ঐ সন্ধ্যাতারা—"

খ— "ভাবছে বুঝি আগের মতন আজও তেমন—"

ক— "ভুল ভাবে কি?"

খ— "তুমিই বলো?"

ক— "তুমিই বলো?"

পূর্ণিমারাত্রের দৃশ্য

BanglaBook.org

অথচ, ভিতরে কোনো শব্দ নেই।
বুকের গভীরে কোনো শব্দই ওঠে না।
পাশে বসে যুবক দেখায়
পূর্বজন্মের রাঙা, চাঁদ ঢালা পীচ
পাশে বসে যুবক দেখায়
পূর্বজন্মের চন্দ্র, পূর্ণচাঁদ, শব্দের চুম্বক
এবং গভীরে জমে নিস্তব্ধ অপার স্তব্ধতা
ড্রাই আইসের মতো, নিম্নতাপে নির্জলা বরফ।
যেন অভ্যন্তরে এক বোবা-কালা কলোনী হয়েছে।
অথচ, একদিন কোনো নিস্তার ছিলো না।

চোখ, বৃদ্ধ চোখ শুধু সব দেখে যায়
তর্জনী নির্দেশ মেনে খুঁজে পায় রুটিন সংবাদ
চোখ শূন্যচোখে দ্যাখে
মাইল মাইল দীর্ঘ নির্জন চাঁদিনী
অপমানে শুয়ে আছে
পথহীন, শব্দহীন, পূর্বজন্মহীন...

বাতিটা

(মায়ের জন্মদিন স্মরণে)

—"এইবারে শুয়ে পড়ো, মাগো,
এগারোটা বেজে গেছে।"
—"এগারোটা আবার রাত নাকি?
তুই শুয়ে পড়, তোর কাল কলেজ রয়েছে।"

মা বসে আছেন তাঁর ইজিচেয়ারে
সরু নাকে মোটা চশমা
ফর্সা আঙুলে আতসকাচটি ধরা
কোলের ওপরে বিছোনো স্টেটসম্যান।
পাশের টেবিলে ফ্লাস্কে চা, ওষুধবিসুখ,
রুপোর ডিবেতে পান আর জর্দা,
পেতলের পিকদান, পেতলের ক্যাশবাক্সো।
পিছনের টিপয়ে মাটির ঘটে
মার প্রিয় রজনীগন্ধার গুচ্ছ,
আর বেতের টেবিল ল্যাম্প, আগরতলার তৈরি—
সামনে টিকটিক করছে অ্যালার্ম ঘড়িটা।
ট্রাভলিং ক্লক।

মা জাগজেৎ পাতা ওলটালেন।
প্রচণ্ড খড়্খড়্ শব্দে শব্দহীন রাত্রি টুকরো হলো।
বই-বন্ধ করে আমি উঠে আসি।
ঘরে পা দিতেই একগলা রজনীগন্ধার
গন্ধের গভীরে ডুবে যাই।
চেয়ারে বসেই ঢুলছে নার্স মেয়েটি।
—"মাগো, শুয়ে পড়ো এইবারে,
রাত দেড়টা বাজে"—
—"রাত দেড়টা?" ধমকে ওঠেন, "এখনও
শুসনি তুই? সকালে কলেজ?"
বকুনি খেয়েও বলি, নির্লজ্জ বেহায়া—
—"শরীর যে খারাপ হবে, এভাবে জেগো না"—
—"শরীর?" এক পা গয়নার মতো ঝলমলিয়ে
হেসে ফেলেন মা।
—"আরও কত খারাপ হবে রে, শরীর?
আর—হবেই বা কী, শরীর দিয়ে?"

আরেকবার যেতেই হয়, নিজে শোওয়ার আগে।
—"আড়াইটে বাজলো, মাগো, ক্ষান্ত দাও,

BanglaBook.org

খাটে শোবে চলো।"
—"শোবো, শোবো, এইটুকুনি বাকি—
পড়া তো সহজ নেই, ছানির দৌলতে?"
সামনা অপ্রস্তুত হেসে, ডুবে যান ছাপার হরফে।
টেবিলল্যাম্পের আলোয়, আতসকাচের
উদ্ভাসিত মনোযোগে
অ্যালার্ম ঘড়িটার টিকটিক
মুছে যায়।
ফিরে আসতে আসতে শুনি
নার্সমেয়েকে বলছেন—"না, না, বাছা,
নিবিয়ে দিয়ো না আলো,
বাতিটা জ্বলুক অমনি
আরো এক পৃষ্ঠা বাকি আছে"—

আরো এক পৃষ্ঠা বাকি, আরো এক
প্যারাগ্রাফ, আরো একটা বাক্য বাকি—
আরো একটি শব্দ দাও, নার্সমেয়ে,
আরো একটি দিন॥

উৎসব

কর্মটা আর কর্তার ইচ্ছেয় নেই।

টিল হাতে করে একজন রাস্তায় এসে দাঁড়ালেই, অমনি
আমরা দু'জন এসে দাঁড়াই পাটকেল হাতে
রক্ত মেখে একজন পথে গড়িয়ে পড়লেই ডক্কুনি
চক্‌চকে চোখে আমরা নিমেষে শুইয়ে ফেলি
রক্তারক্তি সাতজনকে
জলপাখা নিয়ে ছুটে যাবার যাদ্না ছিলো,
আরাই ফুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে তালি বাজাচ্ছে।
একজনের বউকে কে তুলে নিয়ে গেল রাত্তিরবেলায় ?
চলো আমরা দিনের আলোয় ন্যাংটো করে তুলে আনি
গাঁ-সুদ্ধু মা-বউদের।
একটা ছেলের চোখ উপড়ে নিয়েছে কোন্ বজ্জাত ?
আমরা উপ্‌ড়ে নিই সারা দেশটার চোখ।

এবার থেকে চালু হলো এক নতুন রাখীপূর্ণিমা,
চমৎকার উৎসবসূচি বেঁধে দিয়েছি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার।
অদৃশ্য লোহার শেকলে ছুঁচলো কাঁটা বেঁধা ভারী লোহার
বল ঘুলিয়ে আমরা কেবল নিজেরা নিজেদের
বুকে আছড়ে মারবো, আর উঠতে বসতে খেতে শুতে
ত্রিভুবন দীর্ণ করবো আত্মার আওয়াজহীন কান্নায়
হা ভাইরে! হো ভাই রে!

উইটিপিতে কান পাতলে, শোনা যাবে সেই শব্দ

BanglaBook.org

লায়নটেমারকে

মনে থাকবে না ? বাঃ ! সবগুলো
চাবুকের দাগ, যত কালশিটে, সব
বাদামি চামড়ার নিচে ঢাকা।
খুব মনে আছে।
একবার 'সপাং' শুনলে, দুইপায়ে খাড়া।
দু'থাবায় ভিক্ষে চাওয়া। 'সপাং-সপাং'
শুনলে কেশর-টেশরসুদ্ধ শানের মেঝেয়
গড়াগড়ি, গড়াগড়ি, শীত-গ্রীষ্ম
নেই। তিনবার 'সপাং' শুনলে ? নির্দ্বিধায়
আগুনের ব্যূহের ফাঁদেও
চমৎকার ঝাঁপ দিই। আবার ?
আবার—

খুব মনে আছে।
কানেকানে নেশাতুর আদুরে 'সপাং'—
অক্লেশে লাফিয়ে পড়ি দাউ দাউ
জ্বলন্ত বলয়ে। আবার ?
আবার—
অন্ধকার থেকে
নিশিডাক বেজে ওঠে, শৃঙ্খলের মতো
ঝম্‌ঝম্ করতালি আষ্ঠেপৃষ্ঠে
সর্পিল জড়ায়। —দু'চোখ
ধাঁধিয়ে দেয় অলাতচক্রের
মায়া-দ্যুতি, এমন কি আগুনও
কিছু নয়। রিং মাস্টার,
ভুলিনি কিছুই। মনে নেই

শুধু পূর্বনাম। মনে নেই
অরণ্য কেমন ?

BanglaBook.org

নাটক

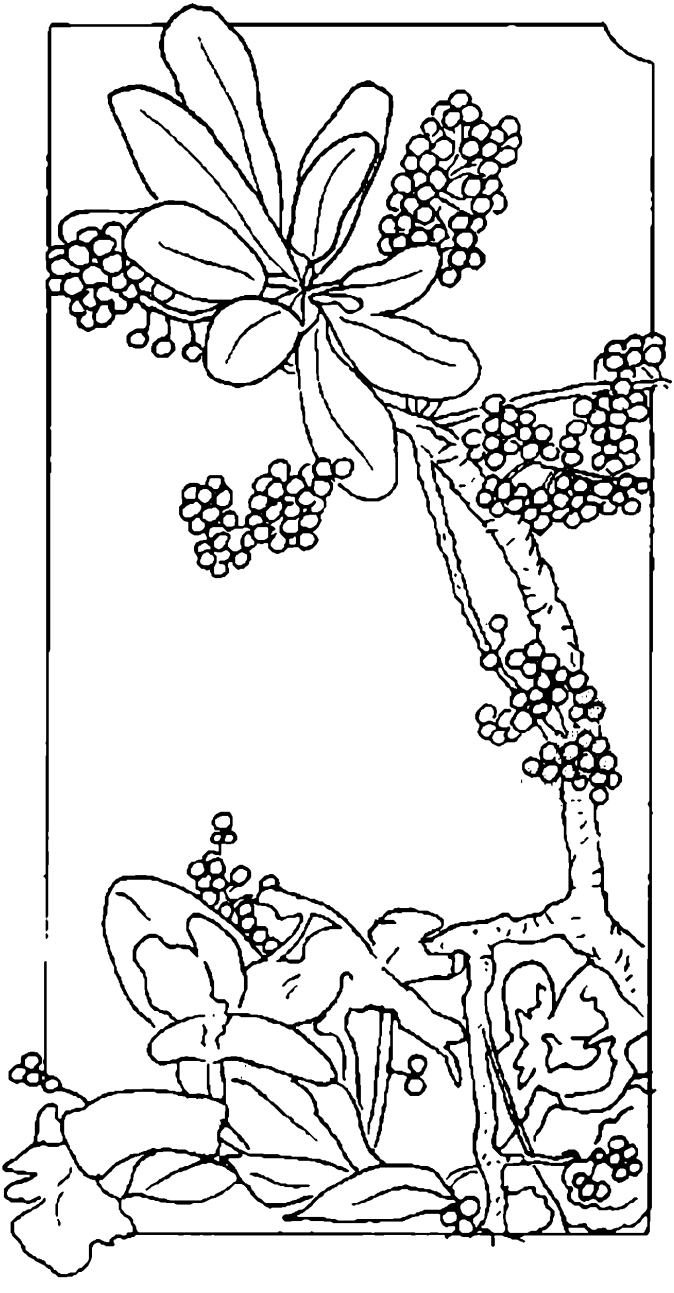

মেদেয়া

[রেল স্টেশন, মফঃস্বল। মঞ্চে গ্যাসের বাতি। নেপথ্যে ট্রেন চলাচলের শব্দ, "কুলি-কুলি", "চা-গরম", "পান বিড়ি সিগ্রেট" হাঁক। বেঞ্চে 'ক' (মধ্যবয়সী পুরুষ) বেডিঙের ওপরে বসে আছে। বারবারের চেষ্টায় সিগারেট ধরানোর জন্য দেশলাই জ্বালাচ্ছে একের পর এক। 'খ'-র প্রবেশ। হাতে সুটকেস, কাঁধে ঝোলাব্যাগ। পরনে রঙিন তাঁতের শাড়ি। দু'জনেরই মধ্যযৌবন।]

ক — আরে! কুকী কাণ্ড! [সিগারেট দেশলাই পড়ে গেল] আমি কোনোদিন ভাবতেই পারিনি এ ভাবে তোমার দেখা পেয়ে যাবো! তারপর? ভালো আছো? সব খবর ভালো? [দেশলাই কুড়িয়ে নিয়ে]

খ — হুঁ—ভালোই।

ক — ছেলেমেয়েরা?

খ — ছেলেমেয়েরা!

ক — ওরা কেমন আছে?

খ — ওরা কেমন আছে!

ক — এতে আশ্চর্য হবার কী হয়েছে! টুটু-রতনের কথা বলছি।

খ — টুটু-রতন? টুটু-রতন কে?

ক — টুটু-রতন কে? তুমি কি তাহ'লে...আপনি কি তাহ'লে রূপসা নন?

খ — হ্যাঁ, আমার নাম রূপসা। আপনি?

ক — রূপা! সত্যিই আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তো...আমি মানস!

রূপসা — মানস? কোন্ মানস বলুন তো? মজুমদার? না রায়চৌধুরী?

মানস — তুমি—তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

রূপসা — কি মুশকিল! ঠাট্টা কেন হবে? আমি তো দুজন মানসকে চিনতাম। অনেকদিন দেখা হয় না, সবাই কত বদলে গেছে। প্রত্যেকেই বদলে গেছি। সেই আগের চেহারা তো কারুর নেই। কারুর ভুঁড়ি, কারুর টাক, কেউ মেমসাহেব বনে গেছে! চেনা কি সোজা?

মানস — দু'জন মানস! দু'জন মানসকে চিনতে তুমি! তুমি কী বলছো রূপা? তোমার নাম রূপা মল্লিক নয়? নাকি এখন অন্য কিছু?

রূপসা — আমার নাম রূপসা মল্লিক।

মানস — মানস মল্লিক নামটা মনে পড়লো না?

রূপসা — মানস মল্লিক? খুব চেনা চেনা লাগছে বটে। আপনি কি রাজেন মল্লিকদের বাড়ির কেউ হন?

মানস — রূপা! ইয়ার্কি মেরো না। ইয়ার্কির একটা স্থান কাল আছে।

রূপসা — দেখুন, দয়া করে আমার সঙ্গে এই ধরনের কথা আর বলবেন না। আপনাকে আমি চিনি না পর্যন্ত—রসিকতা করবার কোনো প্রশ্ন নেই। স্পৃহাও নেই। বরং আপনিই তখন থেকে কী-সব রঙ্গ-রসিকতা করছেন—রতন-টুটু কে?

মানস — রতন-টুটু কে?

রূপসা — হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনিই তো বললেন, রতন-টুটু কারা?

মানস — রতন-টুটু কারা!

BanglaBook.org

রূপসা কি আশ্চর্য, আমি কী করে জানবো রতন-টুটু কারা ?

মানস তুমি কী করে জানবে! রূপসা! রূপু! তুমি কি সত্যিই আমাকে চিনছো না ?

রূপসা কেন বলুন তো ? আপনাকে কি আমার চেনার কথা ? কোথাও আলাপ হয়েছিলো কি ?

মানস টুটু-রতনকেও চিনলে না ?

রূপসা আহা, চিনি না বলেই তো জিজ্ঞেস করছি। কে বলুন তো ? টুটু রতন কে ?

মানস টুটু-রতন তোমার কে ?

রূপসা আমার সঙ্গে কি পরিচয় থাকার কথা ?

মানস আমার সঙ্গেও তো বলছো পরিচয় নেই।

রূপসা আমার কিছুই মাথায় ঢুকছে না। আপনি একটু খুলে বলুন যদি বলতে চান। আমার ট্রেন এসে পড়বে।

মানস থাক। আর খুলে বলবার কিছু নেই তুমি কোথায় যাবে ?

রূপসা ম্যাকলাস্কিগঞ্জে যাচ্ছি। ছেলেমেয়েদের আনতে। পুজোর ছুটি তো।

মানস ছেলেমেয়েদের আনতে ? তারা কারা ?

রূপসা রত্না আর টাটু ওখানে হস্টেলে আছে।

মানস রত্না আর টাটু ? ওখানে হস্টেলে আছে ?

রূপসা ওরা অনাথ শিশু।

মানস ওরা অনাথ শিশু ? কোথায় পেলে তুমি ওদের ?

রূপসা মাদার টেরেসার দয়ায় প্রথমে রত্নাকে এনেছিলাম, তারপর টাটুকে।

মানস মাদার টেরেসা! রূপু। রূপুসোনা! রতন-টুটুকে তুমি অনাথ বলছো ? তোমার মনে নেই, রতনের বেলায় তোমার সে কি কষ্ট! তিন দিন ধরে অসহ্য ব্যথা। আর টুটুর বেলা তো সীজারিয়ানই করতে হলো। তুমি, তুমি পরিষ্কার বলছো, ওরা অনাথ!

রূপসা সীজারিয়ান-টীয়ান কী যা-তা বলছেন ? তিনদিন ধরে ব্যথা আবার কী ? ওরা আমার পালিত শিশু—রত্না আর টাটু। আমরা ওদের পুষ্যি নিয়েছিলাম

মানস রূপা, তোমার মনে নেই ? রতনের জন্মের দিনে কী প্রলয় ঝঞ্ঝা! সে কী ঝড়! কী বৃষ্টি! তোমার ঐ রকম যন্ত্রণা, ব্যথা উঠেছে তিন দিন, তার মধ্যে আবার কী যে ঝড় শুরু হলো, ঘন বাজ, ঘন ঘন বিদ্যুৎ! আর বাজ পড়লেই, বিদ্যুৎ চমকালেই তুমি দারুণ ভয় পাচ্ছিলে। আমাদের নার্ভের তখন প্রচণ্ড দুরবস্থা, রূপাই—তোমার মনে পড়ছে না, রতনের জন্মের দিনটা ? সেটা ছিলো শ্রাবণ মাস! বিরামহীন বৃষ্টির মধ্যে...

রূপসা (স্বগত) সেটা ছিলো, শ্রাবণ মাস। বিরামহীন বৃষ্টি' তারই মধ্যে একদিন মাদার টেরেসার আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎই পছন্দ করে ফেললাম রত্নাকে। কী স্বাস্থ্য—গোলগাল বাচ্চাটা, একমাথা ঝাঁকড়া কালোচুল, ভাসাভাসা চোখ—একটু কান্না নেই। কেবলই যেন হাসে। আমি বলে ফেললাম—মাদার, এই মেয়েটা আমাকে দিয়ে দিন! সেই প্রথম! প্রথম শিশু আমাদের।

মানস সেই প্রথম শিশু আমাদের! রতন! কিন্তু এসব আজেবাজে গল্পো ফেঁদেছো কেন ? এখন বাজে কথা কেন বলছো ? রতন তোমার গর্ভে ছিলো চল্লিশ সপ্তাহ। পুরোপুরি। আমরা তখন প্যাটেলনগরে থাকতাম পার্কটার ঠিক সামনে।

রূপসা প্যাটেলনগরে আমি কোনোদিন ছিলাম না। আমি তো আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে

BanglaBook.org

চাণক্যপুরীতে ছিলাম।

মানস হ্যাঁ, সে তো অনেকদিন আগে। তারপর তুমি মিরাণ্ডা হস্টেলে থাকতে। বিয়ের পর আমার সঙ্গে প্যাটেলনগরে এলে। সেখানেই রতন জন্মলো

রূপসা আমি কোনো কালে প্যাটেলনগরে থাকিনি।

মানস প্যাটেলনগরে থাকোনি? আমরা কোথায় ছিলাম তবে?

রূপসা আপনারা কোথায় ছিলেন তা আমি কেমন করে জানবো?

মানস কেন, রূপু, তুমিও ছিলে আমার সঙ্গে। তুমি আর আমি। আর রতন। আমরা তিনজনেই তো ছিলাম একসঙ্গে।

রূপসা আপনি এ ধরনের লজ্জাকর কথা আর বলবেন না দয়া করে। আপনি ভুল করছেন। আপনি খুব ভুল করছেন। আমি কোনদিনই ছিলাম না আপনার সঙ্গে। কী লজ্জা! রতন-টতন কেউ ছিলো না।

মানস লজ্জা? রতন বলে কেউ ছিলো না? আর টুটু। টুটুও ছিলো না? সেই আজাদনগরের বাড়িতে? রতন টুটু তুমি আর আমি—সেই আজাদনগরের বাড়িটায় থাকতাম—তুমি বারান্দায় বসতে খুব ভালোবাসতে মনে পড়ে রূপু—সামনেই একটা ঝিলমতন ছিলো, তার মাঝখানে একটা দ্বীপ—সন্ধে হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ফিরতো দ্বীপটাতে?

রূপসা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যেতো ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে। জলটা তখন গোলাপি।

মানস হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বাড়ি—তোমার বৌদি সোনালিও তখন ছিলো আমাদের সঙ্গে। (নেপথ্যে ট্রেন চলে যাবার শব্দ)

রূপসা সোনালি? আমার বৌদি? আমার কোনো বৌদিই ছিলো না কখনো বৌদি হবে কোত্থেকে?

মানস (নৈঃশব্দ্য)—রূপু! এখনও রাগ? সে তো কবেই চুকে-বুকে গেছে। আজ সোনালি কোথায় তাও আমি জানি না। হয়তো এমনিই কোনো রেলের স্টেশনে দেখা হয়ে যাবে। রূপু, ব্যাপারটা আমাকে বলতে দাও—

রূপসা আমি নই। আপনার ভুল হচ্ছে আপনি অন্য কেউ ভেবেছেন আমাকে।

মানস রূপা, বিশ্বাস করো, আমার যে-উ-ব কষ্ট টুটু-রতনের জন্যে। তোমার তো ঠিকানা পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না যখন বর্মা থেকে ফিরলাম তোমরা বাবা মারা গেছেন, বাড়ি-টাড়ি বেচে দিয়ে তুমি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছো। কেউ একটা ঠিকানা পর্যন্ত দিতে পারলো না। দিল্লিতে যে কত খোঁজ করেছি—রূপু, শোনো, আমি পাঁচ বছর হলে ফিরেছি—আমি পাঁচটা বছর তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি—আমাকে বিশ্বাস করো রূপু, রতন-টুটুকে আমি সত্যিই—আমাকে—ক্ষমা কি এতই শক্ত? (হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে)

রূপসা [হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়] (বিচলিত স্বরে) ছি ছি, আপনি কী সব যা-তা বলছেন! এসব আবার কী কথা! আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন কোনো। আমি সত্যিই তো আজাদনগরে কোনোদিন ছিলাম না। তাছাড়া সোনালি বলে কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। বুঝে দেখুন, সত্যি সত্যি আপনার ভুল হচ্ছে।

মানস রূপা! আমাকে বিশ্বাস করো সোনা!

রূপসা (শান্ত স্বরে) মল্লিকমশায়, আপনি বৃথা বিচলিত হবেন না। আমি আপনার পরিচিত রূপসা নিশ্চয়ই নই। দেখছেন না, তার সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই! আচ্ছা, তার কি বাঁ পায়ে এমনি ছ'টা আঙুল ছিলো? (শাড়ি তুলে ধরে বাঁ পা প্রদর্শন

BanglaBook.org

করে।)

মানস [পায়ের দিকে না চেয়ে গভীর ভাবে মুখের দিকে তাকায়] (যেন স্বপ্নে) রূপা, তোমার মনে আছে সেই দুপুরটা, সেই রেজিস্ট্রেশনের দিনটা? তাড়াহুড়োয়—ব্যাকডেটেড নোটিস দিয়ে—মনে পড়ে? দরিয়াগঞ্জের সেই রেজিস্ট্রারের অফিসটা—ওঃ, বাইরে এত নোংরা, ওঁই করা বাসি ফলের খোসা, নীল মাছি ভন্ ভন্ করছে, একটা মোদো গন্ধে বাতাস ভারি—মনে আছে? একটা ফলের রস বিক্রির দোকান ছিলো মোড়টাতে। তুমি নাকে রুমাল দিয়ে অনেকখানি শাড়ি তুলে ধরে জঞ্জাল ডিঙিয়ে ওই আপিসে ঢুকলে। চওড়া সবুজ পাড়ের নিচে সেই তোমার ফরসা পায়ের গোছ—আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। যেন সেদিনের কথা।

রূপসা দেখুন মশাই, এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আমার এরকম কোনো ঘটনার কথা জানা নেই। শানাই বাজিয়ে লোক বাইয়ে, পুরুত ডেকে আমার বাবা বেশ ঘটাপটা করেই আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। যজ্ঞ, সপ্তপদী, সবই আমার স্বামী...

মানস তোমার স্বামী কী করতো রূপা? কে ছিলো তোমার স্বামী?

রূপসা (হাসি-হাসি, সুদূর চোখে) রেলে কাজ করতেন। রেলোয়ে কোয়ার্টার্সে থাকতাম আমরা। তিনি বদলির কাজ করতেন বলে খুব ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হত আমাদের। এই মাদ্রাজ, এই খড়্গপুর, এই বরোদা। স্থিতি হতে পারিনি এক জায়গায়। তাই তো যেবার কলকাতায় এলুম, মাদার টেরেসার কাছ থেকে—

মানস রূপসা! এ তুমি কোন্ স্বামীর কথা বলছো?

রূপসা কোন্ স্বামী মানে? স্বামি আবার ক'জন থাকে?

মানস তোমার স্বামী এখন কোথায়? (নেপথ্যে মৃদু ট্রেনের শব্দ ক্রমবর্ধমান)

রূপসা (চোখে বিষাদ) রেল-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ট্রেন চলে যাবার জোর শব্দ। দুজনের মুখের ওপর দিয়ে এক ঝলক আলো ফিরে গেল। শব্দ মিলিয়ে আসে।) ধানবাদের কাছে একটা ট্রেন ভেঙে পড়েছিলো ওঁদের কামরার ওপরে। সেও অনেক কাল হলো। সাত বছর। কিংবা দশ বছরও হতে পারে।

মানস ধানবাদের ট্রেন দুর্ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র গেল হপ্তায়। রূপসা, তোমার কি কিছুই মনে থাকছে না? তোমার কি স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে রূপা? সাত-আট দিনকে তুমি—

রূপসা আট-দশ বছরই হলো বোধ হয়। ওঁর বয়স তখন ছত্রিশ বছর মাত্র। আমাদের বিয়ে হয়েছিলো আট বছর।

মানস রূপা! সত্যিই আমার বয়স তখন ছত্রিশ। টুটুটার বয়স ছিলো মোটে তিন। আমাকে ডাকতো 'বাবুজি' বলে, ধ্যান সিং-এর শুনে শুনে। তোমাকে ডাকতো...

রূপসা 'মাইজি'। ধ্যান সিং-এর মতো সুর করে ডাকতো—'বাবুজি, নাশ্‌তা লগা দিয়া!'

মানস তখনও স্পষ্ট কথা শেখেনি টুটু—আধো আধো বলতো...

রূপসা তখনও 'ক' বর্গ উচ্চারণ শেখেনি—'ত' বলতো...

মানস বলতো—'তল খুলে দাও, দল থাকে...

রূপসা কতো আদর করতেন উনি ওকে...

মানস এখন নিশ্চয় আমাকে চিনবে না ও, রতনই কি চিনবে?

রূপসা কতো ভালোবাসতেন উনি ওদের। যেদিন মাদার টেরেসার ওখান থেকে রতনকে নিয়ে এলাম...

মানস আঃ, কী মাদার টেরেসা মাদার টেরেসা করছো তখন থেকে—পাগলের মতন কথা...আমার দিকে তাকাও তো দেখি—রূপু—

BanglaBook.org

রূপসা উনি সে কি অসম্ভব খুশি! আর কী কৃতজ্ঞ! ওঁর একটা দোষ ছিলো বলে কিছুতেই আমাদের বাচ্চা হচ্ছিলো না—আমি তাই ওঁকে সারপ্রাইজ দিতে—

মানস চুপ করো রূপসা। যা-তা বোকো না। 'দোষ ছিলো' আবার কি? হুঁ—সারপ্রাইজ বটে! তবে সারপ্রাইজটা একটু উল্টো পথে এসে গিয়েছিলো, এই যা!

রূপসা অবশ্য আমারও যে খুব একটা প্ল্যান-করে-আনা তা নয়, বাচ্চাটাকে দেখে কী যে হলো, হঠাৎই আবেগের বশে সেই বৃষ্টির রাতে রতনকে...

মানস ঐ রতনের জন্যেই আমাদের বিয়ে! বিয়ের সাত মাসের মধ্যেই তো...আর তুমি বলছো আমার একটা দোষ ছিলো? দোষ থাকলেই বরং বেঁচে যেতাম!

রূপসা (দর্শককে) ওঁর একটা দোষ ছিলো। হঠাৎ সেটা জেনে ফেলে অবধি আমার কী উদ্বেগ। পাছে ওঁর মনে কষ্ট হয় তাই আমি নিজেই বলতাম 'বাচ্চা টাচ্চায় কাজ নেই বাপু, এই দিব্যি আছি দুজনে ঝাড়া হাত পা'—আমি যে দোষটা জানি সেটা ওঁকে জানতেই দিইনি!

মানস ঈশ্! অসহ্য!

রূপসা আগে আগে আমাকেই শুধু রাত্তিসুদ্ধ ডাক্তার দেখানো হতো। আমার মাঝে মাঝে মনে হতো, উনিও তো ডাক্তার দেখালে পারেন? দোষটা তো ওঁরও থাকতে পারে? পারে না? বলুন?

মানস (আরো রেগে) আ-শ্চ-র্য!

রূপসা তারপর একদিন আমাকে ডাক্তার দেখানো বন্ধ হয়ে গেলো। আসলে আমি ভুল বুঝেছিলাম ওঁকে। নিজেই চেক্ আপ করিয়ে এসেছিলেন। যদিও আমাকে কিছু জানাননি। এমন একটা কথা কেউ যেচে নিজে বলতে পারে? কেউ তা পারে না। উনিও পারেননি!

মানস ইম্-পসিব্‌ল্!

রূপসা একদিন, একদম হঠাৎই, আমি পাৎলুনের পকেটে রেজাল্টটা কুড়িয়ে পেলাম ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে!

মানস অই সো শার্ট আপ্! মিথ্যা কথারও একটা সীমা থাকে রূপসা!

রূপসা আর আমার না, ওটা দেখে, কি বলবো, মমতায় আর করুণায় সমস্ত মনটা ওঁর জন্যে যেন গলে গলে যেতে লাগলো...

মানস নাঃ—মাথাটাও একেবারেই গ্যাছে...

রূপসা আ-হা! কী কষ্ট ভাবুন! নিয়তির কী নির্মম অবিচার? পুরুষমানুষের পৌরুষের ভিতটাতেই ওকে ফাঁকি দিয়েছেন ঈশ্বর! তার ওপর আমার কখনো রাগ করা মানায়? উনি নিজে কতো না দুঃখ পেয়েছেন—সে দুঃখ একা একাই বহন করেছেন—আত্মসম্মান হারানোর ভয়ে আমার সঙ্গেও ভাগ করে নিতে পারেননি সেই তীব্র বেদনা।

মানস কি আশ্চর্য—এ যে সবই আবোলতাবোল বকছে! ওর সঙ্গে যা ভাগ করে নিইনি, নিতে পারিনি—যার ভাগ দিয়েছিলাম সোনালিকে, —সে আমার তহবিল তছরুপের সমস্যা। সে ধাক্কা সইবার শক্তি রূপুর ছিলো না। তাছাড়া, রূপুর সামনে নিজেকে জুয়াড়ী বলে, চোর বলেও স্বীকার করা অসম্ভব ছিলো আমার পক্ষে রূপু যে আমাকেই দেবতা মনে করতো!

রূপসা লুকিয়েই রেখেছিলেন। ওঁর মতে মানুষের পক্ষে এই পৌরুষের অপমান যে কী রকম বাজবে, তা আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। তাই জন্যেই তো—

BanglaBook.org

মানস আমাকে ঠিকঠাক চিনেছিলো সোনালি। সোনালির কাছে নিজেকে মেলে ধরা যেতো। সোনালির বুদ্ধিতেই তো দেশ ছেড়ে পালাই—বেঁচেও তো গিয়েছি বাপু। জেলে পচতে হতো হয়তো দেশে থাকলে। রূপু পরতে আমাকে বাঁচাতে? ও তো কেঁদেকেটেই একশা হতো—ওর মন যা নরম, আর যা নার্ভাস মেয়ে! বাজ পড়লেই ভয়ে সর হয়...না পালিয়ে আমার উপায় ছিলো না, কোনো উপায় ছিলো না, কোনো উপায় ছিলো না।

রূপসা উপায় ছিলো না, কোনো উপায় ছিলো না বাস্তা হবার। তাই জন্যেই তো আমি যখন কোনো প্রশ্ন না-করে নিজে থেকে রত্নাকে নিয়ে এলাম—ওঁর সে কী আহ্লাদ! রত্না যখন পাঁচ বছরটি হলো, তখন টাটুকে আনতে গেলাম। এবার দুজনে মিলে একসঙ্গে গেলাম। উনিই বেছে নিলেন নীল চোখের ফরসা ছেলেটিকে রত্নার ময়লা রংটা নিয়ে ওঁর বরবরই একটু খুঁতখুঁতুনি ছিলো। বলতেন না অবশ্য মুখে কিছু...

মানস রূপু যে সমস্তই এলোমেলো বকছে। রূপা! কী বলছো তুমি সোনা? বতন তো ধপধপে ফরসা—

রূপসা রত্না কিন্তু এখন অত কালো নেই। বেশ মাজা-মাজা হয়ে এসেছে রংটা বরং টাটুটাই যেন রোদেজলে ঘুরে কেমন তামাটে মেরে যাচ্ছে। (স্বপ্নের মধ্যে, অন্যমনে) আমরা সকলেই কেমন তামাটে মেরে যাচ্ছি—রোদে জলে, তেতে... পুড়ে...ঘুরে...ঘুরে...আমরা সবাই কেমন যেন...

মানস রূপসা! (হাত ধরে) আমার রূপাই! আমার রূপু! আমার রূপুলী (জড়িয়ে ধরে) আর আমি রোদে জলে ঘুরতে দেবো না তোমাদের, আর তেতেপুড়ে মরতে দেবো না আমি—আমার সোনা রূপুলী, আমার রাঙনমণি, আমার টুটুনবুড়ো, এই তো আমি এসে গেছি—

রূপসা (স্বপ্নের মধ্যে, অন্যমনে) কতদিন দেখা হয় না, কত রোগা হয়ে গেছে ওরা, এবার মাদার টেরেসার কাছে ফিরে আসবো ওদের...

মানস (চিবুক তুলে ধরে) এখনও ক্ষমা করতে পারলে না? রূপুন্। আমার দিকে তাকাও, দ্যাখো, আমার চোখের মধ্যে কি প্রতারণা দেখছো? তাকাও (ঘ তাকায় না) রূপু, তাকাও এখনও বিশ্বাস হলো না? রূপসা? (ঝাঁকিয়ে) শোনো, রূপু, প্লীজ, ওরকম করে থেকো না, লক্ষীটি, রূপু! সত্যিই আমার উপায় ছিলো না, কোনো উপায় ছিলো না, সোনা? রূপাই? বিশ্বাস করো

রূপসা (ক্রমশ চেতনা জাগ্রত হয়—নিজের মধ্যে ফিরে এসে, রূপসা আস্তে আস্তে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে নেয়। এবার ধমকের সুরে)—ছিঃ। আপনি দেখছি একটি বদ্ধ উন্মাদ। পথে-ঘাটে বেলেল্লে উচিত নয় আপনার ছিঃ ছিঃ কী কাণ্ড করেন বলুন তো? আচ্ছা নাইসেন্স হয়েছে এক, —যতো সব বাজে ঝামেলা—এখানে কি পুলিশও নেই ছাই?

মানস রূপসা! আমি মানস। টুটু রতনের বাবা। তুমি পুলিশ ডাকবে?

রূপসা বললাম না আমার স্বামী বহুকাল মৃত। তাছাড়া তিনি টাটু-রত্নার বাবা ছিলেন না।

মানস রূপসা! এতো নিষ্ঠুর হোয়ো না। তুমি না ওদের মা?

রূপসা কে বললে? আমি তো ওদের সত্যি সত্যি মা নই। আমি বলছি, আপনার ভুল হচ্ছে।

BanglaBook.org

মানস কীসের রাগে এমন ছারখার করছো সর্বস্ব? ট্রু-ব্লুতনের কথাটাও ভাবো? রূপু, সোনা, দ্যাখো, আমি এসেছি! (হঠাৎ পায়ের কাছে ঘুমে পড়ে তার উরুতে মুখ গুঁজে) ভুল হয়েছিলো, --ও' বলে রূপাই, এতো নিষ্ঠুর হোয়ো না—এবার বিশ্বাস করো—ভুল কি মানুষ করে না? কে যে কখন কী হারিয়ে বসে...

রূপসা (সহৃদয় চাহনিতে, মাথায় আশীর্বাদের ভঙ্গিতে দুই হাত রেখে) আপনি আবার ভুল করছেন. তাতে কী হয়েছে? ভুল কি মানুষে করে না? কে যে কোথায় কী হারিয়ে বসে!...দয়াময় ঈশ্বর আপনার হৃতমানিক ফিরিয়ে দিন! কত যে কী কষ্ট! আমরা আর কতোটুকুই বা জানি?

[দূরে ট্রেনের শব্দ মৃদু থেকে জোর হচ্ছে। ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল। রূপসা পা বাড়ালো। মানস-কে সরিয়ে দিলো সাবধানে।]

মানস কোথায় যাচ্ছো? যেও না, রূপু!

রূপসা আমাকে যেতে হবে।

মানস (উঠে দাঁড়িয়ে) আমিও যাবো তবে তোমার সঙ্গে।

রূপসা (যেতে যেতে) কোথায় যাবেন?

মানস (চেঁচিয়ে) কেন—ম্যাকলাকসিগঞ্জে?

রূপসা (চেঁচিয়ে) [যেতে যেতে] ম্যাকলাকসিগঞ্জ? সেটা আবার কোথায়? (মিলিয়ে যায়)

মানস (ছুটতে ছুটতে, চেঁচিয়ে) তুমি যে বললে বাচ্চারা সেখানে হস্টেলে আছে?

রূপসা (অদৃশ্য নেপথ্যে চেঁচিয়ে) হস্টেল? কিসের হস্টেল? কার বাচ্চা? (নেপথ্যে জোরে ট্রেন আসার ও থামবার শব্দ)

মানস (থেমে পড়ে, চেঁচিয়ে) থামো, রূপা, একটু দাঁড়াও -(হঠাৎ ছুটে যায়) শোনো, রূপু, প্লীজ—("কুলি-কুলি", "পান-বিড়ি-সিগ্রেট", "গ-গরম", গোলমাল। নেপথ্যে জোরে শব্দ হয়, 'মানস'-কে দেখা যায় না। আলো কেবে)

[ট্রেন ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দেবার শব্দ হয়। শব্দ মিলিয়ে আসে। মানস মঞ্চে স্তব্ধ, স্থির। নিশ্চল পুতুলের মত মুখের ওপর দিয়ে চৌকো চৌকো সবুজ লাল তারপর স্বাভাবিক ট্রেনের কামরার আলো সরে যেতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ছায়াগুলিও সরতে থাকে—ক্রমশ আলো মিলিয়ে যায়। মঞ্চের আলোও নিবে এসেছে, কেবল অতীব ম্লান গ্যাসবাতি: প্রায়ান্ধকার, নিঃশব্দ, শূন্য মঞ্চে মানস দাঁড়িয়ে থাকে আওয়াজ ও আলো মিলিয়ে যাবার পরে মানস আস্তে আস্তে বেঞ্চিওব ওপরে বসে পড়ে। মাইকে ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বলার শব্দ হয়। একটার পর একটা দেশলাই ধরিয়ে মানস সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করে। মঞ্চের ওপর ক্রমশ অন্ধকার, এবং পর্দা, ও নৈঃশব্দ্য নেমে আসে।]

[আলো জ্বলে উঠলো, মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে পরিচালক এসে নমস্কার করে বলবেন: এ নাটকটার নাম মেদেয়াও হতে পারে—আবার জেসনও হতে পারতো। আপনাদের যার যেটা খুশি বেছে নিতে পারেন। সত্যি সত্যি এ নাটকটি কার? জেসনের, নাকি মেদেয়ার?]

BanglaBook.org

অনুবাদ কবিতা

[বীরশৈব কবি বাসবান্নার বচন থেকে]

॥ ১ ॥

যার আছে, সে বানিয়ে দেবে শিবমন্দির
আমি কি পারি ? গরীবদুঃখী মানুষ, প্রভু!
আমার পা-দুটো থাম, এই দেহটাই নাটমন্দির
এই মাথাটাই স্বর্ণকলস হোক—
শোনো হে প্রভু কুড়লসঙ্গমের
স্থাবর যা, তা বিনষ্ট হয় বটে
জঙ্গমের তো বিনাশ নেই জগতে।

॥ ২ ॥

চকোর কেবল চাঁদেরই জন্য কাঁদে
সরোজিনী কাঁদে সূর্যোদয়ের জন্য
ভ্রমরা যেমন মধুর আশাতে কাঁদে
আমি কাঁদি প্রভু তেমনই তোমার জন্য!
হে কুড়লসঙ্গমদেবতা!

॥ ৩ ॥

ঘরের মানুষ কি ঘরে আছেন ? না, নেই ?
চৌকাঠে ঘাস
মেঝে ভর্তি ধুলো
ঘরের মানুষ কি ঘরে আছেন ? না নেই ?

দেহভরা মিথ্যা
মনভরা বাসনা
নাঃ, ঘরের মানুষ ঘরে নেই—
আমার কুড়লসঙ্গমের দেবতা!

॥ ৪ ॥

বচনে নামামৃত ভরে
নয়নে রূপামৃত ভরে
মননে স্মৃতির মধু ভরে
শ্রবণে কীর্তির মধু ভরে
হে কুণ্ডলসঙ্গমদেব
তোমার চরণকমলে
আমি ভ্রমরা

॥ ৫ ॥

উনুনে যদি আগুন লাগে, দাঁড়াতে পারো
কিন্তু মাটিটাতেই আগুন লাগলে—
দাঁড়াবে কোথায় ?
পাড়ই যদি জল খেতে সুরু করে,
বেড়াই যদি
শুরু করে ক্ষেতটাকে গিলতে,
গিন্নি যদি সুরু করেন ভাঁড়ার চুরি,
মায়ের দুধেও বিষ মিশলে,
হায় দেবতা
কোথায় আমার নালিশ জানাই, পিতা ?
কুণ্ডলসঙ্গমদেব !
তুমিই যদি রাগ করলে, আমার ওপর
সইব আমি কিসের জোরে
বলো, প্রভু ?

॥ ৬ ॥

পরের চিন্তা কেন করি ?
নিজেরই কি ঢের চিন্তা নেই ?
কুণ্ডলসঙ্গমদেব আমার দিকে চেয়ে
হাসলেন কি না—
সেই চিন্তাটাই তো মস্ত, বিশাল—
মেঝেয় পেতে, সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
গড়াগড়ি দেবার মতো
বড়ো সড়ো।

সমাপ্ত